তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বাদশ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬১

দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮৫

উপদেষ্টা পরিষদ :

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডক্টর সুকুমার সেন

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোকচিত্র :

শ্রীমোনা চৌধুরী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও জয়ন্ত বাকচি কর্তৃক পি. এম. বাকচি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

তামস-তপস্যা

শ্রীযুক্ত কিরণকুমার রায়

বন্ধুবরেষু

এক

বিচিত্র পান্নু দাস—তাহার দুই স্ত্রী রাজু দাসী ও ছুটকী একসঙ্গে ভাত খাইতে বসিয়াছিল। ছুটকীর খাওয়া শেষ হইল আগে। সে উঠিয়া হাত গুটাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাজুর খাওয়া শেষ হইলে একজন দুইখানা থালা লইয়া যাইবে, অপর জন এঁটোকাঁটা গুছাইয়া নিকাইয়া এ বেলার কাজ শেষ করিবে।

হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ অমানুষিক চীৎকারে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরটা যেন চমকিয়া উঠিল। ছুটকী 'ও মাগো' বলিয়া ছুটিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিল। রাজু কিন্তু নড়িল না, সে মুখ মচকাইয়া বলিল—মরণ! পিঠে তো কড়া পড়ে গিয়েছে, আর কেন? ভয় কিসের?

চীৎকারটা পান্নুর। ক্রুদ্ধ হইলে পান্নু দাস এমনি চীৎকার করিয়া থাকে। বর্বর জানোয়ারের মত স্বভাব পান্নুর। যেমন হিংস্র তেমনি নিষ্ঠুর!

রাজু জলের ঘটিটা তুলিয়া আলগোছে জল খাইতে শুরু করিল। সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা চীৎকার উঠিল। এ চীৎকারটাও অমানুষিক, প্রচণ্ড, বর্বর। কিন্তু প্রথম চীৎকারটা হইতে বিচিত্র রূপে স্বতন্ত্র। প্রথমটা শুনিয়া ভয় হইবার কারণ ছিল। এবারকার চীৎকারে সমস্ত অন্তরাত্মা যেন কেমন শ্বাসরুদ্ধের মত হাঁপাইয়া উঠিল। রাজু জলের ঘটিটা নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছুটকী বলিল—হয়ে গিয়েছে। নিয়েছে কার রক্ত। পান্নুর চীৎকারের ধারা দুইজনেরই জানা। প্রথমটা কাহাকেও প্রহারের পূর্বের চীৎকার। পরেরটা প্রহার করার পরের। এমনিই পান্নুর অভ্যাস। রাজু দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। কি ঘটিল! কাহাকে মারিল? বাহিরে আসিয়া দেখিল—পান্নু আপনার চুল টানিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সামনে একটা বাছুর পড়িয়া আছে। মানুষ নয়, গরু। পান্নু গো-হত্যা করিয়া বসিয়াছে। গরুটা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যায় নাই, তবে মরিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

কারণ অতি সামান্য—একটি হাস্নাহানার কলমের চারা। পান্নু তাহার দোকানের বারান্দার দুই পাশে অতি যত্নে মাটি তৈয়ারী করিয়া সেখানে কিছু ফুলের চারা বসাইয়াছিল। বর্ষার শেষে বসাইয়াছিল কিছু গাঁদার চারা, কয়েকটি অতসী, গোটা-দুয়েক মোরগ ফুল, তাহারই মধ্যে একটি হেনার কলম। হেনার গাছ এ অঞ্চলে নাই। সে শহরে গিয়াছিল, সেখানে হেনার গন্ধে বিভোর হইয়া একটি ডাল ভাঙিয়া আনিয়া কলম কাটিয়া পুঁতিয়াছিল। দিনে দশ-বিশবার যখনই সে অবসর পাইত, তখনই গাছটির কাছে গিয়া বসিত, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডালটির সর্বাঙ্গ খুঁজিয়া দেখিতে চাহিত—সবুজ একটি অঙ্কুরকণা। ক্রমে সেই ডালটি বর্ষার স্নেহ-সিঞ্চনে, পান্নুর সযত্ন পরিচর্যায় সর্বাঙ্গ ভরিয়া অঙ্কুর বিকাশ করিল—ধীরে ধীরে সেই অঙ্কুর পত্রঘন সরস সবুজ পল্লবে পরিণত হইল। গাছটি সতেজ নধর একটি শিশুর মতই দিন দিন নব নব লাবণ্যে ও পরিপুষ্টিতে বাড়িয়া উঠিতেছিল। পান্নু হুঁকা হাতে গাছটির পাশে বসিয়া মায়ের মত স্নেহে তাহার পত্রপল্লবগুলিতে হাত বুলাইত। পাতার উপর এতটুকু ধূলামাটি লাগিয়া থাকিলে মুছিয়া দিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মুখের মত তাহার মুখ—আকারে প্রকাণ্ড, চোখের পাশে হনুর হাড় দুইটা উঁচু, থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, অতি বিস্তৃত মুখগহ্বর। পান্নুর সেই মুখ, গাছটির পাশে বসিয়া হাসিতে ভরিয়া উঠিত। পান্নু শক্তিতে আকৃতিতে দৈত্যের মত। একা কোদাল চালাইয়া সে বাড়ীর পাশে একটা ছোট গড়ে

কাটিয়াছে, গড়েটির পাড়ের উপর তরিতরকারি, কলা আম জাম কাঁঠালের গাছে ভরিয়া তুলিয়াছে। বৃক্ষশিশু তাহার অনেক। কিন্তু এই হেনার চারাটি তাহার কাছে যেন শত পুত্রের মধ্যে একমাত্র কন্যা। বর্বর পানু ছেলেবয়সে হা-ঘরে অর্থাৎ বেদেদের দলের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল; তারপর পলাইয়া আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে—গাছটি তাহার হা-ঘরের ঘরের তুলসীমঞ্চের মত প্রিয় এবং পবিত্র।

সেদিন সবেমাত্র পানুর ভাতের নেশাটি ধরিয়া আসিয়াছে; মৃদু মৃদু নাক ডাকিতে শুরু করিয়াছে, এই অবসরে একটা দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার বাছুর কোথা হইতে আসিয়া সরস সবুজ গাছটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। পশুর মেধা নাই, কিন্তু বোধ-শক্তি আছে; সে অজ্ঞান, কিন্তু অভিজ্ঞতাকে সে ভোলে না। গরু-ছাগল সযত্নপালিত গাছ চিনিতে পারে এবং সেগুলিকে অতি দ্রুত খাইয়া সারিয়া পড়ে; কিন্তু এ বাছুরটা এত দুর্বল এবং হেনার চারাটির রস এত মধুর যে, সে খাইতেছিল অতি ধীরে ধীরে। গাছটাকে লইয়া প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে এমন সময় পানুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। দুঃখে, ক্ষোভে, দুর্দান্ত পানু প্রথমটা যেন মূক হইয়া গেল। সদ্য-ঘুমভাঙা লাল চোখ বিস্ফারিত করিয়া সে কয়েক মুহূর্ত গাছটা ও বাছুরটার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর অকস্মাৎ প্রচণ্ড রাগে বুদ্ধি-বিবেচনা সব হারাইয়া ফেলিয়া পাকা বাঁশের লাঠিখানা টানিয়া লইয়া ঝাড়িয়া দিল বাছুরটার উপর। বাছুরটার এতক্ষণে বোধশক্তি জাগিয়াছিল, দুর্বল দেহে সে ছুটিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু লাটিখানা হইতে বাঁচিবার মত দূরত্ব অতিক্রম করিবার পূর্বেই লাঠিখানা আসিয়া পড়িল কোমরের পাশে—পিছনের একখানা পায়ের উপর। সঙ্গে সঙ্গে বাছুরটা একটা অতি কাতর শব্দ করিয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল।

পানুর রাগ তবু গেল না। বাছুরটার বেদনাবিস্ফারিত বড় বড় কালো চোখ দুইটার সম্মুখে লাঠিগাছটা বার বার ঠুকিয়া বলিল—ওঠ্ শালা, ওঠ্! আবার কলা করে পড়ে আছে দেখ। ওঠ্! লাঠির ডগার খোঁচা দিয়া বাছুরটাকে আবার সে ঠেলিয়া দিল।

ভয়বিহ্বল জীবটা বার-কয়েক বাকি পা তিনটা আছড়াইয়া উঠিবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। নিরুপায়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার সে শিথিল দেহে নিশ্চেষ্ট হইয়া এলাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা ঘন আন্দোলনে বার কয়েক কাঁপিয়া উঠিল; সে কম্পিত আন্দোলনের চাপে চোখের কোণ হইতে অশ্রুর দুইটি দীর্ঘ ধারা গড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। কয়েকটি বিন্দু চক্ষুপল্লবের দীর্ঘ রোমের প্রান্তে শিশিরবিন্দুর মত লাগিয়া রহিল। পশুটার দিকে পানু চাহিয়া ছিল স্থির দৃষ্টিতে।

বর্বর পানু দাস স্বাভাবিক ভাবেই প্রকৃতিতে নিষ্ঠুর। মায়া নাই, দয়া নাই, ভয় নাই, ধর্ম নাই, শুধু সে নিষ্ঠুর। অত্যন্ত রূঢ়—মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুর। হত্যা যে সে কত করিয়াছে তাহার হিসাব নাই। অবশ্য মানুষ নয়, জীবজন্তু পাখী-পতঙ্গ। কথায় কথায় সে মানুষের অপমান করে, দুই-চারি কথার পরেই সে লাঠি চালাইয়া বসে। আহত মস্তক, মানুষের রক্তাক্ত মুখ সে অনেক দেখিয়াছে। কিন্তু আজ ওই জীবটার চোখের জল দেখিয়া অকস্মাৎ সে বিচলিত হইয়া পড়িল। হাতের লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে সসঙ্কোচে বাছুরটার গায়ে হাত দিল।

অস্থিচর্মসার পশু-শাবক। গায়ের রোঁয়াগুলি পর্যন্ত অধিকাংশই উঠিয়া গিয়াছে। বিরল রোমগুলির উপরেই মাঝে মাঝে তাহার মায়ের সস্নেহ লেহনের চিহ্ন চিকণ হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। বেচারার মায়ের দুধের শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত গৃহস্থে টানিয়া বাহির করিয়া লয়। ক্ষুধার জ্বালায় কঙ্কালসার বাছুরটা ওই ঘনসবুজ নরম গাছটির উপর মুখ বাড়াইয়াছিল; মুখের

পাশ বাহিয়া সবুজরস-মিশ্রিত লালা এখনও গড়াইয়া পড়িতেছে; কয়েকটা পাতা এখনও গোটাই রহিয়াছে। পানু ধীরে ধীরে স্নেহভরেই বাছুরটার পাঁজরাগুলির উপর হাত বুলাইয়া দিল।

বাছুরটা ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছিল; বড় কালো চোখের অসহায় ভয়ার্ত দৃষ্টিও কাঁপিতেছিল। থাকিতে থাকিতে সে জিভ দিয়া পানুর হাত চাটিতে আরম্ভ করিল।

পানুর চোখ অকস্মাৎ সজল হইয়া উঠিল। বেশ ভাল করিয়া নাড়িয়াচাড়িয়া দেখিল, বাছুরটার পিছনের পাখানা একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ কি হইয়া গেল! তাহার স্মৃতির লোহার কপাটখানা যেন এক মুহূর্তে অকস্মাৎ খুলিয়া গেল। মনে পড়িয়া গেল তাহার বাল্যজীবনের কথা।

ওই বাছুরটার অবস্থার সঙ্গে তাহার সেই অবস্থার যেন একটা মিল আছে। অতি নিকট সাদৃশ্য। সেদিন সেও ছিল ওই বাছুরটার মত অসহায়। পানুর মনে পড়িয়া গেল, তাহার বাবা দারোগার কাছে প্রচণ্ড নির্যাতনে নির্যাতিত হইয়া সামান্য কয়েকটা আশ্বাসের কথায় হাসিয়াছিল—আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিল। সে আপনার পিঠে হাত দিল। চামড়া জমাট বাঁধিয়া লম্বা টানা চলিয়া গিয়াছে পিঠের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। একটা নয়—একটার পর একটা। সারি সারি। পানুর প্রকাণ্ড প্রশস্ত পিঠের কালো চামড়ার উপর গাঢ়তর কালো রঙের লম্বা টানা সারি সারি দাগ দেখা যায়।

বেতের দাগ।

বহুদিন পূর্বের কথা।

বাংলা তেরো শো তেরো সাল; জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনা।

পানুর বয়স তখন বারো-তেরো বৎসর। সে তখন স্কুলের ছাত্র। হাকিম অথবা উকিল হইবার কিংবা লেখাপড়া শিখিয়া গাড়ী-ঘোড়া চড়িবার সাধ পানুর ছিল কি না সে কথা পানুর মনে নাই। তবে স্কুলে সে শান্ত বোকা ছেলে ছিল। পৃথিবীর মধ্যে নিরীহ পোস্টমাস্টারটিকে তাহার বড ভাল লাগিত—এমনই একটি পোস্টমাস্টার হইবার সাধ মধ্যে মধ্যে তাহার হইত।

পানুর বাপের ছিল জাতীয় ব্যবসা, বেনেতী মশলার দোকান। বড় ভাই জীবন বাপের সঙ্গে দোকান দেখিত। বেচাকেনা মন্দ ছিল না। গ্রামখানি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পোস্ট আপিস, সাব-রেজেস্ট্রি আপিস, হাইস্কুল, সবই আছে। থানা পানুদের বাড়ীর একেবারে সামনে; ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তার এপারে পানুদের বাড়ী, ওপারে থানা। থানার জমাদার মধ্যে মধ্যে তামাক খাইতে আসিত। বাপ বলিত—বন্ধুলোক। কিন্তু বন্ধুলোক একদিন বিগড়াইয়া গেল। পানুদের বাড়ীর পাশের প্রতিবেশী মহাজন নাকু দত্ত অকস্মাৎ একদিন রাত্রে খুন হইয়া গেল। নাকু দত্ত ছিল কৃপণ অর্থশালী লোক, সোনা-রূপার অলঙ্কার বাঁধা রাখিয়া চড়াসুদে মহাজনী কারবার করিত। নাকু দত্তের বাড়ীর এক দিকে পানুর বাপ শ্যামাদাসের দোকান ও বাড়ী, অন্য পাশে মাধব ময়রার বাড়ী, সামনে ডিস্ট্রিক-বোর্ডের রাস্তা, তাহার ওপারে পুলিসের আস্তানা—থানা। নাকু দত্ত ছিল সংসারে একা মানুষ। স্ত্রী অনেক পূর্বেই মারা গিয়াছিল। তিনটি কন্যার সকলেই থাকিত স্বামীর ঘরে, নাকু দত্ত সম্মুখের থানার ভরসায় রাস্তার ধারের বারান্দায় নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে শুইয়া থাকিত। বলিত—সামনে রাম পাহারা, দেখেছিস! সেদিন কিন্তু সকালে দেখা গেল, নাকু দত্ত দোকানের বারান্দা হইতে গড়াইয়া রাস্তার উপরে পড়িয়া আছে, আতঙ্কবিস্ফারিত নিস্পলক দৃষ্টি, তাহার গলার নলীটা কে বা কাহারা দুই ভাগে কাটিয়া

দিয়া গিয়াছে। বিছানাটা রক্তাক্ত, ফোয়ারার মত রক্তের ফিনকিতে দেওয়ালটাও রক্তাক্ত। নাকুর দেহের পাশে রাস্তার খানিকটা অংশের ধূলা কাদার মত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। নাকুর দরজা ভাঙা, ঘরের জিনিসপত্র ছড়াইয়া পড়িয়া আছে, বন্ধকী সোনা-রূপার অলঙ্কারের নাকি এক টুকরাও নাই।

নাকু দত্তের মৃতদেহের সে বীভৎস রূপ আজও পানুর মনে আছে। জীবনে বিভীষিকার মধ্যে একমাত্র নাকু দত্তের মৃতদেহের স্মৃতি এবং স্বপ্ন। বালক পানু সেদিন অঝোরে কাঁদিয়াছিল। ভয়ে দুঃখে তাঁহার কচি মন দুরন্ত আঘাত পাইয়াছিল। কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যায় তাহার বাপকে যখন থানায় ধরিয়া লইয়া গেল, তখন নাকু দত্তের জন্য দুঃখ এক মুহূর্তে বিলুপ্ত হইয়া গেল। অসহনীয় আতঙ্কে সে অধীর হইয়া উঠিল।

'খুন করিলে খুন দিতে হয়', যে খুন করে তাহাকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়া খুন হইতে হয়। প্রতিমুহূর্তে নাকু দত্তের ছিন্নকণ্ঠ দেহের পাশে সে তাহার বাপের দেহ ফাঁসিতে ঝুলানো দেখিতে পাইল। বালকের কল্পনা সে দেহখানাকে দুলিতে পর্যন্ত দেখিতে পাইল। সমস্ত রাত্রি তাহার ঘুম পাইল না।

পরদিন সকালে পুলিস আসিয়া তাহাদের বাড়ীর সমস্ত জিনিসপত্র ছড়াইয়া তছনছ করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। এমন কি ঘরের মেঝে, বাড়ীর উঠান পর্যন্ত খুঁড়িয়া বাড়ীটাকে চষা মাঠে পরিণত করিয়া ফেলিল। কিন্তু তবু পানু খানিকটা আশ্বস্ত হইল—নাকু দত্তের সোনা-রূপার এক কণাও তাহাদের বাড়ীতে পাওয়া গেল না। তবে তাহার বাবা খুন করে নাই। আরও আশ্বস্ত হইল যখন পুলিস তাহার বাপকে ছাড়িয়া দিয়া গেল।

শ্যামাদাস স্তব্ধ হইয়া নতমুখে বসিয়া ছিল—চোখ দিয়া কেবল ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

পানুর মনে বার বার একটি প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল,—বাবা, তোমাকে মেরেছে? কিন্তু শ্যামাদাসের এই মূর্তির সম্মুখে তাহার সে প্রশ্ন মূক হইয়া গেল। সে মাধব ময়রার বাড়ীও একবার ঘুরিয়া আসিল। মাধবকেও পুলিস ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহার বাড়ীর অবস্থাও ঠিক তাহাদের বাড়ীর মতই হইয়াছে। মাধবও ঠিক তাহার বাপের মত বসিয়া আছে। সেও কাঁদিতেছে, কিন্তু তাহার বাবার মত নীরবে নয়, হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতেছে। ওদিকে থানায় গণ্ডার হাড়িকে ধরিয়া আনিল। সোনা-রূপার ঢাকাই কারিগরকে কাল সন্ধ্যায় আনিয়াছে—আজও এখনও ছাড়ে নাই। পানু হাঁপাইয়া উঠিল। এই অবস্থার মধ্যে স্কুলে যাওয়া হয় নাই—অকস্মাৎ অসময়ে সে বই লইয়া স্কুলে চলিয়া গেল। কিন্তু সেখানে অবস্থা হইল আরও অসহ্য।

সহপাঠীরা প্রশ্নে ব্যঙ্গে শ্লেষে তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল।

—কিসে করে খুন করলে? ছুরি দিয়ে, না, ক্ষুর দিয়ে?

—তুই জেগে ছিলি পানু?

—হ্যাঁ রে পেনো, তোর বাবা দালানবাড়ী করবে কবে রে?

পানু পাগলের মত ছেলেটার ঘাড়ের উপর লাফ দিয়া পড়িল। ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল ক্লাসেই; ওদিকে মাস্টার পড়াইতেছিলেন, এদিকে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত মৃদুস্বরে এই আলোচনা চলিতেছিল। অকস্মাৎ পানুর এই উন্মত্ত আক্রমণ দেখিয়া মাস্টার ছুটিয়া আসিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া দিলেন। মার খাইয়াছিল আক্রান্ত ছেলেটাই, কিন্তু আঁ-আঁ করিয়া কাঁদিতেছিল পানু।

বিচার করিবার প্রয়োজন ছিল না, বিচারক স্বচক্ষেই সমস্ত দেখিয়াছেন, তিনি পানুর পিঠেই কয়েক ঘা বেত কষাইয়া দাঁড় করাইয়া দিলেন। পানু উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিল না—ছুটিয়া স্কুল হইতে বাহির হইয়া পলাইয়া আসিল। বাকী দিনটা মাঠে মাঠে ঘুরিয়া সন্ধ্যায় যখন সে বাড়ি ফিরিল, তখন তাহাদের দুয়ারে কনস্টেবল দাঁড়াইয়া আছে। শ্যামাদাসের আবার তলব পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পর ডাক পড়িল বড় ভাই জীবনের। তারপর তাহার মা। মায়ের পর পানুর বড়দিদি চারু। সব শেষে—সে।

থানায় গিয়া সে আতঙ্কে কেমন হইয়া গেল। শ্যামাদাস একটা থামের সঙ্গে আবদ্ধ। বড় ভাই জীবনও তাই। ওদিকে তাহার মা জমাদারের পা ধরিয়া কাঁদিতেছে। দিদি চারু নাই, দারোগাবাবু তাহাকে ঘরের মধ্যে প্রশ্ন করিতেছে। দরজা বন্ধ। পানু ভয়বিস্ফারিত চোখে সকলের দিকে চাহিয়া রহিল।

জমাদার শ্যামাদাসকে প্রশ্ন করিল—কবুল করবি কিনা ?

ঠিক এই সময়ে ফিরিয়া আসিল পানুর বড়দিদি চারু। চারুর অবস্থা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মা মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চারু সুন্দরী মেয়ে ; গোলাপ ফুলের মত তাহার গায়ের রঙ। এক পিঠ ঘন কালো চুল ; দেহভঙ্গিমা সরল দীঘল। চারু রূপে ছিল সুচারু—কথাটা একবর্ণ অতিরঞ্জন নয়। রূপের জন্য শ্যামাদাস ও তাহার স্ত্রী কন্যাকে দুর্লভ সম্পদের মত ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিত। চারুর সেই রূপকে কে যেন বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। চারু টলিতে টলিতে আসিয়া মায়ের কোলের কাছে অবশ দেহে লুটাইয়া পড়িল ; মা মেয়েকে বুকে টানিয়া লইল। এতক্ষণে চারুর দুই চোখ হইতে ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতে আরম্ভ করিল। পানুর মনে হইল—চারুকে বোধ হয় পায়ে দড়ি বাঁধিয়া হেঁটমুখে এতক্ষণ ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। শরীরের সমস্ত রক্ত তাহার মুখে আসিয়া জমিয়াছে, চোখ দুইটাও গাঢ় লাল—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, কাপড়চোপড় বিশৃঙ্খল—মাথার চুল বিপর্যস্ত, মুখে চোখে চারিপাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পানুর ইচ্ছা হইল, দারোগা জমাদারের পায়ে উপুড় হইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদে—ও গো দারোগাবাবু—জমাদার বাবু—পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও গো। ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি—আমরা কেউ কিছু জানি না। ভগবানের দিব্যি।

সে চারুর মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল। অকস্মাৎ একটা ভীষণ চীৎকারে সে চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, থামে আবদ্ধ তাহার বাপ শ্যামাদাস পশুর মত এই চীৎকার করিয়া থামের গায়ে মাথা ঠুকিবার চেষ্টা করিতেছে। অদ্ভুত তাহার চোখের দৃষ্টি ; গোটা চোখ দুইটাই যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিবে। জমাদার নীরবে হাতের বেতখানা শ্যামাদাসের পিঠের উপর চালাইতেছে। আঘাতের পর আঘাত।

কেমন করিয়া কি হইয়া গেল! বিড়ালকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া আক্রমণ করিলে এক মুহূর্তে যেমন তাহার চেহারা পাল্টাইয়া যায় তেমনি ভাবেই মুহূর্তে পানুর পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। কালো ছোট নিরীহ পানু কালো বিড়ালের মতই একটা চীৎকার করিয়া জমাদারের ঘাড়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। জমাদারের কাঁধে গেঞ্জির উপরেই দুরন্ত শক্তিতে কামড় বসাইয়া দিয়া প্রায় ঝুলিতে আরম্ভ করিল। জমাদার চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তবু পানু ছাড়িল না। ছাড়াইয়া দিল একজন কনস্টেবল। তাহারই প্রতিফলে পানুর পিঠে ওই দাগগুলার সৃষ্টি হইয়াছে। হাতে পায়ে বাঁধিয়া জমাদার হাতের বেত দিয়া নির্মম আঘাতে দাগগুলা আঁকিয়া দিল। সেদিন দাগগুলার রঙ কালো ছিল না, ছিল গাঢ় রাঙা। দারোগা

মীর সাহেব, জমাদার ধর্মদাস ঘোষের নাকি পদাবনতি ঘটিয়াছিল, নানা কারণের মধ্যে এই নির্যাতনও একটা কারণ, কিন্তু তাহাতে পানুর কি ? পিঠে হাত দিলেই পানুর সব কথা মনে পড়িয়া যায়।

পরের দিনই পানু বাড়ী হইতে পলাইয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই বিপুল তাহার দৈহিক শক্তি। বোধ হয় রূপ ও বুদ্ধি হইতে বঞ্চনার এটা ছিল পরিপূরক। এমন শক্তি যে, এই কঠোর প্রহারেও পানু অজ্ঞান হইল না, শয্যাশায়ী হইল না। শুধু থানার সম্মুখে বাড়ীতে কোনমতে সে আর তিষ্ঠিতে পারিল না। পিঠে তেলের প্রলেপ দিয়া একটা মাদুরের উপর বালিশে বুক দিয়া উপুড় ভাবে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়াছিল তাহার মা। কিন্তু সম্মুখে থানা, থানা-প্রাঙ্গণে কনস্টেবল চৌকিদার গিস-গিস করিতেছিল ; আর ভিতর হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল মানুষের চীৎকার।

মাধব ময়রা—নাকু দত্তের ওপাশের প্রতিবেশী।

গণ্ডার হাড়ি—প্রকাণ্ড দেহ এবং প্রচণ্ড বলশালী বলিয়া লোকে তাহাকে গণ্ডার বলে।

ঢাকার সেকরা—ঢাকা হইতে এখানে সোনা-রূপার ব্যবসা করিতে আসিয়াছে।

হাতেম মিঞা দর্জি—পানুদের দোকানের পরেই তাহার দোকান।

কেবল নাকি মধু সিংকে একবার ডাকিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকটা কবুল খাইয়াছে। বলিয়াছে, সে পা ধরিয়াছিল, নাকু দত্তের গলা কাটিয়াছিল দারোগা মীর সাহেব। অকাতরে নির্যাতন সহ্য করিয়াও সে দ্বিরুক্তি করে নাই। যুক্তিও সে দিয়াছে, নাকু দত্তের বাড়ীর সামনে থানা, সেখানে দারোগা জমাদার মোতায়েন, অন্য কার ঘাড়ে দশটা মাথা যে আপনারা থাকতে এ কাজ করে যাবে ?

অন্ধকার রাত্রে পানু ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল, ওই মধুর কথাই পুলিস সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে জানাইতে।

দুই

গভীর রাত্রে আক্রোশের তাড়নায় প্রায় দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্যের মত সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। থানায় তখন চীৎকার করিতেছিল গণ্ডার হাড়ি। চারিটা পায়ে দড়ি বাঁধিয়া হাড়িকাঠে ফেলিবার সময় মহিষে যেমন চীৎকার করে তেমনি মর্মান্তিক চীৎকার। পানু উঠিয়া বাড়ীর খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার বাবা, মা, দিদি চারু, দাদা সকলেরই তখন সবে ঘুম আসিয়াছে। গত রাত্রের নির্যাতনের পর আজ সন্ধ্যায় যখন অপর ব্যক্তির চীৎকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তখনই তাহারা অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। পানুর কিন্তু ঘুম আসে নাই ; অবসর পাইয়া সে বাহির হইয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া গ্রাম অতিক্রম করিয়া পাকা সড়কে আসিয়া উঠিল। সদর শহরে যাইবে সে। পুলিস সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়া মধু বেনের কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। নিজের পিঠের ওই বেতের দাগগুলা দেখাইবে। সে শুনিয়াছে, সাহেবেরা অন্যায় কখনও করে না। দারোগার অন্যায় জানিতে পারিলে সাহেব একেবারে ক্ষেপিয়া যায়। এখানকারই কুমী কলুনী হেম দারোগার অন্যায় সাহেবকে জানাইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে হেম দারোগাকে জমাদারিতে নামাইয়া দিয়া

সাহেব তাহাকে অন্য থানায় বদলি করিয়া দিয়াছিল। চণ্ডী দারোগা ঘুষ লইয়াছিল, সাহেব তাহার চাকরির মাথা খাইয়া দিয়াছিল। বাবুরা হালে 'বন্দেমাতরম্' 'বন্দেমাতরম্' করিয়া যতই সাহেবদের বিরুদ্ধে চীৎকার করুক, তবুও পুলিশ সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের উপর পানুর অগাধ বিশ্বাস। এইবারেই স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় হাতজোড় করিয়া কবিতা বলিয়াছে—

"সকলে দাঁড়াই এস সারি সারি হয়ে,
ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন অত্র বিদ্যালয়ে।"

পণ্ডিত মহাশয় বলেন—রাজপ্রতিনিধি। রাজা দেবতা ; সেই দেবতার প্রতিনিধি।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। সুদীর্ঘ পথ। তাহাদের গ্রাম হইতে সদর শহর বিশ মাইল দূর। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের পাকা সড়কটা জনহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে, বিশ মাইলের মধ্যে গ্রাম পাওয়া যায় মাত্র দুইখানি। প্রচণ্ড আবেগোচ্ছ্বাসিত আক্রোশের বশে সে রওনা হইয়া গেল। মনের মধ্যে এমন তন্ময় হইয়া সে সাহেবদের সঙ্গে ভাবী সাক্ষাৎকারের কল্পনায় বিভোর ছিল যে, সুন্দীপুরের জঙ্গলের সম্মুখীন হইবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাহার পথের কথা একবারও মনে হয় নাই। জঙ্গলটার মধ্য দিয়াই সড়কটা চলিয়া গিয়াছে। এই ভয়াবহ স্থানটার সম্মুখে আসিয়াই সে অকস্মাৎ সচেতন হইয়া উঠিল। এই মুহূর্তে মনের অন্তস্তলের ঘুমন্ত ভয় সুন্দীপুরের বটগাছ ও জঙ্গলের যত ভয়াবহ ইতিহাস লইয়া জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

সুন্দীপুরের বটতলায় ঠ্যাঙাড়েরা লুকাইয়া থাকিত। রাত্রে পথিক একা হইলে তাহার আর রক্ষা থাকিত না। ঠ্যাঙাড়েরা এখন লোপ পাইয়াছে, কিন্তু গাছতলার ভয় এখনও যায় নাই। লোকে বলে—ঠ্যাঙাড়েরা এখন প্রেত হইয়া গভীর রাত্রে ওই বটতলায় আড্ডা জমায়, গাছের ডালে লম্বা পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকে, অট্টহাসি হাসে। আর যে হতভাগ্যেরা একদা ঠ্যাঙাড়ের হাতে মরিয়াছে, তাহারা মাটিতে লুটাইয়া অতি করুণ আর্তনাদে কাঁদে।

শুধু তাই নয়, আরও আছে। ক্রোশ-ব্যাপী প্রান্তরের বুকে ঘন জঙ্গলের প্রায় মাঝখানটিতে ওই যে বটগাছটি,—যে-বটের নামেই এ স্থানটা পরিচিত—ওই বিরাট গাছটার এখন অসংখ্য কাণ্ড। কতদিনের পুরানো গাছ কেহ জানে না, তাহার মূল কাণ্ডটাও এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, পুরানো আমলের ঝুরিগুলাই এখন কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। দিনের বেলায় গাছটার ঘনছায়াচ্ছন্ন তলদেশে দাঁড়াইলে মনে হয়, এ যেন কোন খেয়ালী শিল্পীর গড়া এক বিচিত্র স্তম্ভ-ভবন। মধ্যে মধ্যে গভীর রাত্রে ওই গাছতলা হইতে 'এক-শেয়ালী' ডাক শোনা যায়। একটিমাত্র শেয়ালের অস্বাভাবিক উচ্চ এবং অসাময়িক প্রহর-ঘোষণার শব্দ। শেয়ালের ডাক নয়, ডাকাতদের সঙ্কেত। হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়া শেয়ালের ডাকের অনুকৃতি অসময়ে প্রহর-ঘোষণা করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ; অন্য কোন শেয়াল সে ডাক শুনিয়া ডাকিয়া উঠে না ; আশপাশের গ্রামগুলিতে নিরীহ গৃহস্থ নরনারী সভয়ে শিহরিয়া উঠে। পরদিন শোনা যায় কোথাও ডাকাতি হইয়াছে। রাখাল ছেলেরা দিনের বেলায় গরু চরাইতে আসিয়া বহুদিন বটগাছতলায় দেখিতে পায় পোড়া মশালের ছাই, কাঠকুটার আগুনের আঙার, পোড়া বিড়ির টুকরা, কখনও কখনও দুই-একখানা এটো পাতা ; বর্ষাবাদলে মাটি নরম থাকিলে অস্পষ্ট-স্পষ্ট কতকগুলা পায়ের দাগ। চকিতের মধ্যে বিদ্যুদালোকিত মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত সুবিস্তৃত ভয়ঙ্কর ইতিহাসের স্মৃতি পানুর জাগ্রত চেতনায়

ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা গুর-গুর করিতে শুরু করিল। ভয়ের স্মৃতিই যেন গর্জন করিয়া উঠিল। পানু থমকিয়া দাঁড়াইল। পা দুইটা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল।

সে ফিরিয়া যাইবে? কিন্তু তাহার দুরন্ত আক্রোশ মনের মধ্যে পাক খাইয়া উঠিল ক্রুদ্ধ অজগরের মত। ভয় এবং আক্রোশের দ্বন্দ্বের মধ্যে সে পঙ্গুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনের চোখের সম্মুখে পাশাপাশি ভাসিতে লাগিল ভয়ঙ্কর এক প্রেতের মুখ এবং প্রহার-জর্জরিত তাহার বাপের সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা-কাতর মুখচ্ছবি; বটতলার অন্ধকারে প্রতীক্ষমাণ ডাকাতের হিংস্র জ্বলন্ত দুইটা চোখ এবং দিদি চারুর জলভরা ডাগর চোখ দুইটি। এক কানে বাজিতেছিল ঠ্যাঙাড়ের হাতে অপঘাতে মৃত্যুকবলিত আত্মার করুণ ক্রন্দন, অপর কানে বাজিতেছিল তাহার মায়ের কান্নার সুর। ঠ্যাঙাড়েদের প্রেতাত্মার অট্টহাসি এবং গণ্ডার হাড়ির সেই মহিষের মত আর্তনাদ। স্তব্ধ জঙ্গলটাকে সম্মুখে রাখিয়া ভাবিতে ভাবিতে সে যেন পাগল হইয়া উঠিল। জঙ্গলটার স্তব্ধতার মধ্যে তাহার সাহস বাড়িয়া উঠিতেছিল বর্ষাসিক্ত বীজের অঙ্কুরের মত, যে অঙ্কুর বীজ ফাটাইয়া এক রাত্রে বাহির হয় তাহারই মত। সে পা বাড়াইয়া কিন্তু পর-মুহূর্তেই নিদারুণ ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। লঘু দ্রুত পদক্ষেপে পাশ দিয়া চলিয়া গেল কে? না, কেহ নয়, প্রেত নয়, ডাকাত নয়, একটা শেয়াল। তাহার চীৎকারে ভয় পাইয়া শেয়ালটা ছুটিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। পানু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শেয়ালটার দিকে চাহিয়া রহিল। কিছু দূর গিয়া শেয়ালটা দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া বোধ হয় পানুকেই ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর ধীর পদক্ষেপে আবার অগ্রসর হইল সম্মুখের পথে ওই ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া। পানু যেন বাঁচিয়া গেল, শেয়ালটার মধ্যেই সে খুঁজিয়া পাইল দোসর,—সঙ্গে সঙ্গে ওই জঙ্গলের ভিতর দিয়া সেও আগাইয়া চলিল।

জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার প্রগাঢ়তর, যেন অখণ্ড; মনে হয় যেন হারাইয়া গিয়াছি। তবু কিছুখানি পথ চলিয়াই পানু অনুভব করিল, অন্ধকার তাহার সাহসের কাছে হার মানিয়াছে; সে যেন স্পষ্ট দেখিল, অন্ধকারের অন্তরের সকল ভয়ঙ্কর স্তব্ধ হইয়া তাহাকে পথ দিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছে। সে যেমনি আগাইয়া চলিয়াছে তেমনি তাহার পাশের জঙ্গলের পতঙ্গ-কীটের ডাক বন্ধ হইয়া যাইতেছে; পাতার উপর খরখর শব্দে বোধ হয় সাপ চলিতেছিল, পানুর পায়ের শব্দে সে শব্দ বন্ধ হইল; খ্যাক-খ্যাক শব্দে শেয়ালেরা ঝগড়া করিতেছিল, মুহূর্তে ঝগড়া বন্ধ হইয়া গেল, নিঃশব্দে তাহারা ছুটিয়া পলাইল; প্রেতাত্মার করুণ কান্না, নিষ্ঠুর অট্টহাসি, রহস্যময় সঞ্চরণের কানাকানি সব স্তব্ধ, কোথাও কিছু নাই। ক্রমশ নির্ভয় পদক্ষেপে বটগাছটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। স্থির দৃষ্টিতে বটগাছটার দিকে চাহিয়া স্তম্ভকাণ্ডময় তলদেশ হইতে নিবিড় পুঞ্জিত অন্ধকারের মত উপরের ঘনপল্লব আচ্ছাদনীর সমস্তটা দেখিয়া লইল। কেহ কোথাও নাই, কোথাও কিছু নাই। সব তাহার ভয়ে লুকাইয়াছে। পানু হা-হা করিয়া উচ্চ হাসিতে স্তব্ধ অন্ধকারটাকে সচকিত করিয়া তুলিল। ভয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারানোর জন্য নয়, ভয়কে জয় করার উন্মাদনায় সে সেদিন অট্টহাসি হাসিয়াছিল। ভয়কে সেদিন সে সেই মুহূর্তে জয় করিয়াছিল। ভয়ের কথা হইলে সেই অট্টহাসি সে আজও হাসে। জীবনে অভয় সে পায় নাই, কিন্তু সেই দিন হইতে সে নির্ভয়। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দর্পিত পদক্ষেপে সে অতিক্রম করিতে পারে, অন্তত তাহার নিজের এই বিশ্বাস। সে অট্টহাসিতে তাহার নিজেরই সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিয়াছিল।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ পানু আসিয়া পৌছিল সদর শহরে। তখন তাহার মূর্তি হইয়া উঠিয়াছে অদ্ভুত। লাল ধুলায় সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন, কাপড় লাল, জামা, বুক, পিঠ, মুখ ধুলা ও ঘামের সংমিশ্রণে লাল কাদার দাগে বিচিত্রিত, ভুরু ও মাথার চুল লাল ধুলায় পিঙ্গল। দীর্ঘ-পথ-হাঁটার পরিশ্রমে, রাত্রিজাগরণের অবসাদে চোখের ক্ষেত রাঙা, দৃষ্টি রুক্ষ; আক্রোশ ক্রোধ ভয় হতাশার দ্বন্দ্বে মনের যন্ত্রণার অভিব্যক্তির ছাপে তাহার কালো গোল শ্রীহীন মুখখানা বিকৃত হইয়া এমন কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে যে, দেখিয়া মানুষের মন মুহূর্তে বিরূপ হইয়া উঠে। পানু কিন্তু আপনার এ অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অচেতন, এসব কথা পানুর ভাবিবার অবসর পর্যন্ত নাই। পথের পাশে পুকুর অনেক পড়িয়াছে, কিন্তু সে সব পানুর চোখে পড়ে নাই; তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল পাকা সড়কটার দূরবর্তী মধ্যস্থলে, যেখানে পথটির পার্শ্ববর্তী দুইটি সমান্তরাল রেখা একটি বিন্দুতে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, সেইখানে।

শহরে ঢুকিতেই শহরতলীর সামান্য একটু বাজার, তারপর রেল-লাইন; রেল-লাইন পার হইয়া সাহেবদের গোরস্থান; গোরস্থানের পরই বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে কতকগুলা লম্বা একতলা বাড়ী। পানু এতক্ষণে চমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে প্রশ্ন জাগিল, কোথায় পুলিস সাহেব থাকে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠিই বা কোথায়? তাহার কানে আসিল কাহারও জোর উচ্চ আদেশধ্বনি। আবার তাহার মন ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অন্ধকার, ভূত-প্রেত, জানোয়ার, সরীসৃপ এদের ভয়কে সে জয় করিয়াছে, কিন্তু মানুষের ভয় একতিল কমে নাই। পরক্ষণেই তালে তালে একটা কঠোর উচ্চ শব্দ ধ্বনিত হইতে আরম্ভ করিল—মনে হইল কোন একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত মানুষ অথবা দৈত্য জোরে জোরে পা ফেলিয়া আশে-পাশে কোথাও আসিতেছে। আরও কিছুক্ষণ পর পানুর নজরে পড়িল একটা লম্বা দালানের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে সারিবদ্ধ সিপাহীর দল। হাঁ, সিপাহী। পরনে হাফপ্যাণ্ট, গায়ে হাতকাটা খাকী কামিজ, মাথায় খাকী পাগড়ী, পায়ে পট্টি ও জুতা, কাঁধে বন্দুক, সারি বাঁধিয়া তালে তালে সকলে একসঙ্গে পা ফেলিয়া চলিয়া আসিতেছে। আর্মড পুলিস। মুহূর্তে পানুর বুকের ভিতরটা প্রচণ্ডতম ভয়ে অধীর অস্থির হইয়া উঠিল। জমাদারের সগোত্র—ইহারা সকলেই যেন জমাদার। মুখে চোখে পদক্ষেপে তেমনি কর্কশতা, তেমনি রূঢ়তা, তেমনি হিংস্রতা। অন্ধকারের বুকের মধ্যে পানুর সম্মুখে ভয়ঙ্করের যে মুখ মিশাইয়া গিয়াছিল, সেই ভয়ঙ্কর মূর্তিমন্ত হইয়া অকস্মাৎ উন্মুক্ত দিবালোকে কঠোর দীর্ঘ পদক্ষেপে দলবদ্ধ হইয়া তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে বলিয়া পানুর মনে হইল। পর-মুহূর্তেই সে ছুটিতে আরম্ভ করিল। পথ ধরিয়া নয়, মাঠের মধ্য দিয়া।

খানিকটা মাঠ পার হইয়া আসিয়া একটা প্রান্তরের মধ্যে কতকগুলি বাড়ী পাইয়া পানু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বেশ নূতন ঝকমকে কতকগুলি বাড়ী, কতক সম্পূর্ণ, কতক সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, কতক তৈয়ারী হইতেছে। শহরের প্রান্তে নূতন শহরবাসীদের একটি পাড়া গড়িয়া উঠিতেছে। একটা সম্পূর্ণ-হইয়া-যাওয়া বাড়ীর দাওয়ায় সে বসিয়া পড়িল। মনে মনে সে নিষ্ঠুর আক্রোশে ওই সিপাহীর দলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনের অবস্থা এক রাত্রেই অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে। ভয়কে গতরাত্রে সে জয় করিয়াছিল মনে হইয়াছিল,—কিন্তু ভয় তাহার যায় নাই; কিন্তু ভয়ের কারণে আপনাকে একান্ত অসহায় ভাবিয়া অভিমানাহত প্রার্থনার সুরে আগে সে যেমন করিয়া ভাঙিয়া পড়িত, কাঁদিয়া উঠিত, তেমন ভাবে কান্নাও আর আসিতেছে না। এমন কি সিপাহীগুলো যদি তাহাকে ধরিয়াও ফেলিত, তবুও সে কাঁদিত

না, তাহাদের পায়ে ধরিত না ইহা নিশ্চিত। সমস্ত রাত্রি খায় নাই পান্নু, পেটটা তাহার জ্বলিয়া যাইতেছিল। এমন সুন্দর ঝকঝকে বাড়ী, ইহারা চারিটি খাইতে দিবে না? সে প্রায় মরীয়া হইয়াই ডাকিল—বাবু! বাবু! বাবু!

কেহ সাড়া দিল না। আবার সে ডাকিল—মা! মা! মা-ঠাকরুণ! তবুও কেহ সাড়া দিল না। এবার সে দুয়ারে ধাক্কা দিয়া ডাকিল—বাবু! বাবু! মা-ঠাকরুণ!

—কে? এবার ভিতর হইতে সাড়া আসিল।

—কাল থেকে কিছু খাই নাই বাবু। দয়া করে দুটি—

দরজা খুলিয়া এবার বাহির হইয়া আসিলেন এক ভদ্রলোক। পান্নুর আপাদ-মস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—বাড়ী কোথা তোর?

—আজ্ঞে, রত্নপুর।

—রত্নপুর? থানা রত্নপুর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

—কাদের ছেলে তুই? কি জাত?

—আজ্ঞে গন্ধবণিক।

—গন্ধবণিক? বেণে? কি নাম তোর?

—আমার নাম প্রাণকৃষ্ণ দে। কাল থেকে খাই নাই বাবু, আমাকে চারটি খেতে দেন।

—হুঁ। ভদ্রলোক খানিকটা ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—চাকরি করবি?

চাকরি? কথাটা পান্নুর কাছে এমন আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত যে সে অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভদ্রলোক আবার বলিলেন—কি, চাকরির নামেই চুপ করলি যে? ভিক্ষে বড় মজার জিনিস, না? হরি বললেই কাঁড়া বালাম চাল মেলে যখন, তখন আকাঁড়া চালের ভাত খাব কেন—চাকরি কে করে? অ্যাঁ? এদিকে গতর তো বেশ! ভাগ্। বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন।

পান্নু তাড়াতাড়ি ডাকিল—বাবু!

—কি?

—আমি চাকরি করব। আমাকে চারটি খেতে দেন।'

—খেতে পাবি, মাইনে দেড় টাকা, বছরে দু জোড়া কাপড়।

পান্নু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, তাহাতেই সে রাজী।

—আয়, তবে ভেতরে আয়। ঘরদোর পরিষ্কার করতে হবে, কাপড় কাচতে হবে, কুয়ো থেকে জল তুলতে হবে।

—আজ্ঞে, করব।

—ওগো, এই ভিখারী ছোঁড়াটাকে চারটি মুড়ি দাও তো।

এবার গৃহিণী বাহির হইয়া আসিলেন। পান্নুর দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—এ তো ভিখিরীর ছেলে নয়।

—না হোক, ক্ষেতি কি! চাকরি করবে, মাইনে নেবে, বাস্।

গৃহিণী হাসিয়া সস্নেহেই বলিলেন—তোমার বাপ-মা আছে তো খোকা?

পান্নুর বুকের মধ্যে এতক্ষণে একটা উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিল, সে কথা বলিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল—আছে।

—বাড়ী থেকে রাগ করে পালিয়ে এসেছ?

ঘাড় নাড়িয়া পানু জবাব দিল, না, রাগ করিয়া আসে নাই।

—তবে ?

কর্তা মারাত্মক রকম চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—চুলোয় যাকগে তবে। দাও, দুটো মুড়ি দাও ছোঁড়াটাকে। মুড়ি খেয়ে—এই ছোঁড়া, মুড়ি খেয়ে কুয়ো থেকে জল তুলে এই গাছগুলোর গোড়ায় দে। বুঝলি ?

পানু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাই দিবে সে।

একখানা শালপাতায় কতকগুলি মুড়ি ও একটু গুড় দিয়া গৃহিণী বলিলেন—ওই চৌবাচ্চার জলে হাত-পাটা ধুয়ে ফেল বাছা। নোংরা জামাটা খুলে রাখ, কেচে ফেলবি আজ।

সম্মুখে আহার্য পাইয়া পানুর আর কোন কিছুই মনে হইল না। আহার্য ও তাহার মধ্যে যেটুকু আদেশের বাধা ছিল, সেটুকু তৎক্ষণাৎ পালন করিয়া সে মুড়ির পাতাটার সম্মুখে ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মত বসিয়া পড়িল। আদেশমত হাতমুখ ধুইয়া, জামাটা খুলিয়া সে বসিয়া গেল।

গিন্নী শিহরিয়া আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করিলেন—আহা বাছা রে! হ্যাঁরে তোকে এমন করে কে মেরেছে রে ?

পুলিসের বেতের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত পিঠটার কথা পানুর মনে ছিল না, এমন কি জামা খুলিবার সময়ও যে বেদনা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল সে বেদনাও তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিতে পারে নাই। গিন্নীর কথার উত্তর দিবার তাহার সময় ছিল না ; গুড়েতে জল দিয়া মুড়িগুলোকে নরম করিয়া লইয়া মাখিয়া সে গ্রাসের পর গ্রাস গিলিতে লাগিল।

গিন্নী আবার প্রশ্ন করিলেন—পানু!

কয়েক গ্রাস গিলিয়া খানিকটা জল খাইয়া পানু বলিল—আঃ!

—এমন করে কে মেরেছে রে ?

আর একটা বড় গ্রাস মুখে তুলিবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তেই পানু বলিল—পুলিসে। বলিয়া সে গ্রাসটা মুখে পুরিয়া ফেলিল।

তিন

ভদ্রমহিলা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—পুলিসে ?

বুভুক্ষু পানুর সমস্ত মুখটা ভরিয়া ঘুরিতেছিল—মুড়ি-গুড়ের দলা ; কথা বলার উপায়ও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। কর্ত্রীর কণ্ঠস্বরের বিস্ময়ে তাঁহার চর্বণ মুহূর্তে বন্ধ হইয়া গেল। সে বুঝিল, সে অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। আহার্যভরা মুখেই আতঙ্কিত দৃষ্টিতে পানু কর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—পুলিসে মেরেছে তোকে ?

শঙ্কিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া পানু জানাইল—হ্যাঁ।

—কেন ?

পানুর মুখ এবার দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল, বুভুক্ষু গরু যেমনভাবে অদূরবর্তী মানুষের সাড়া পাইয়া ফসল খাইয়া যায় তেমনি ভাবে সে গ্রাসটা গিলিয়া আবার একদলা ভিজা মুড়ি মুখে পুরিয়া দিল।

বাড়ীর কর্ত্রী আবার প্রশ্ন করিলেন—কারও বাড়ী কিছু চুরি করেছিলি বুঝি ?

ঘাড় নাড়িয়া পানু জানাইল—না। এবং চোখ মুছিয়া সে গ্রাসটাও কোঁৎ করিয়া গিলিয়া ফেলিল।

—তবে? তবে তোকে মারলে কেন তারা?

ভিজা মুড়ি-গুড়ের বড় দলাটা কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়া অতি কষ্টে যাইতেছিল—নাটের মধ্য দিয়া কড়া বোল্টুর মত; দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। পানু জলের ঘটিটা তুলিয়া খানিকটা জল মুখে ঢালিয়া দিয়া বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল।

কর্ত্রী এবার ডাকিলেন—ওগো, বলি শুনছ? কানের মাথা খেয়েছ না কি?

কর্তা আসিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—এমন করে চেঁচাচ্ছ কেন? বাইরে যে মক্কেল এসেছে। ভদ্রলোক মোক্তার।

—চেঁচাচ্ছি সাধে। ওই দেখ।

—কি?

—ছোঁড়ার পিঠে।

কর্তাও শিহরিয়া উঠিলেন—আরে বাপ রে! এ কি?

—পুলিসে মেরেছে ওকে।

—পুলিসে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—তা বলছে না। গোগ্রাসে শুধু গিলেই যাচ্ছে।

—চোর নয় তো? এই ছোঁড়া। চুরি করেছিলি না কি?

ঘাড় নাড়িয়া পানু উত্তর দিল—না। তখনও সে খাইয়া চলিয়াছে।

—তবে? এই ছোঁড়া! এই! উত্তর না পাইয়া এবার তিনি বকরাক্ষস যেমন ক্রোধ-ভরে আহাররত ভীমকে চাপিয়া ধরিয়াছিল, তেমনি ভাবেই পানুর হাত চাপিয়া ধরিলেন—এই ছোঁড়া!

কর্তা যখন এইভাবে পানুকে নির্যাতন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কিন্তু কর্ত্রী প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন—ও কি? তুমি মানুষ, না অসুর? খেতেই দাও আগে।

কর্তা কঠিন ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—কি বললে, আমি অসুর?

—খাচ্ছে বেচারা, খেতেই দাও আগে।

—তা হলে তুমিও তো ওর খাবার পর চিলের মত চেঁচাতে পারতে। তুমি চেঁচালে কেন?

গৃহিণী এবার মোক্ষম উত্তর প্রয়োগ করিলেন; হাত জোড় করিয়া বলিলেন—ঘাট হয়েছে, আমার ঘাট হয়েছে। ঘাট মানছি আমি।

কর্তা স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

গৃহিণী বলিলেন—পুলিসে ছেলেটাকে এমন করে মেরেছে, দেখে আমি চীৎকার করে তোমাকে ডেকেছি—আমার ঘাট হয়েছে।

কর্তা বিপদাপন্ন হইয়া পড়িলেন। অকপট ভাবেই আপনার অসহায় অবস্থা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া ফেলিলেন—কি বিপদ!

গৃহিণী বলিলেন—তুমি মোক্তার। পুলিসে এমনি করে দুধের ছেলেকে মেরেছে, তাই তোমাকে দেখাবার জন্যে চীৎকার করে ডেকেছি, আমার ঘাট হয়েছে।

কর্তা এবার বলিলেন—ওঃ, ব্রুটাল অ্যাসাল্ট! নে রে ছোঁড়া, খেয়ে নে, তোকে আমি

নিয়ে যাব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, এস্‌. পি-র কাছে।

পান্নুর আর খাওয়া হইল না। সে দুই হাতে কর্তার পায়ে ধরিয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমাকে মেরেছে, আমার বাবাকে মেরেছে, আমার দিদিকে মেরেছে, আমার দাদাকে মেরেছে। বাবু!—সে তাহার অশ্রুসিক্ত কুৎসিত স্থূল মুখখানা উপরের দিকে তুলিয়া কর্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—নে নে, আগে খেয়ে নে।

—আর খেতে পারব না আমি। পান্নু ফোঁপাইতে আরম্ভ করিল।

কর্তা বলিলেন—না পারিস তো গরুর ডাবায় দিয়ে আয়, যা।

গৃহিণী বলিলেন—গরুর ডাবায় দিয়ে আসবে? মুড়ি গুড় ভারি সস্তা, না। এই ছেলে, খেয়ে নে বলছি। নইলে ভাল হবে না। খেয়ে নে। তর্জনী নির্দেশ করিয়া তিনি কঠিন হইয়া দাঁড়াইলেন এবার।

পান্নু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না, আর খেতে পারব না।

—খুব পারবি। পেটটা তোর এখনও ধক্‌ধক্‌ করছে। খেয়ে নে। না যদি পারবি তো গোড়ায় দেবার সময় বললি নে কেন তুই? শহরের ধান চাল ঘাসের বীজ নয়। খেয়ে নে বলছি।

কাঁদিতে কাঁদিতেই পান্নুকে মুড়িগুলি শেষ করিতে হইল।

গৃহিণী বলিলেন—বল্‌ এইবার কি হয়েছে! কর্তাকে বলিলেন—তুমি ওইখানে বস। তা হলে আমারও শোনা হবে। ওই মোড়াটা নাও না টেনে।

সমস্ত শুনিয়া গৃহিণীর চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

কর্তা গম্ভীর চিন্তিত বাঁ হাতের মুঠায় দাড়িহীন চিবুকটা ধরিয়া রঙ্গমঞ্চের কুটিল বাদশাহের ভূমিকায় অভিনেতার মত মৃদু ঘাড় নাড়িয়ে আরম্ভ করিলেন—হুঁ! তারপর একটা পাক মারিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—তোকে আজই আমি নিয়ে যাব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

গৃহিণী বলিলেন—হ্যাঁ গা! ওরা কি—

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কর্তা বলিলেন—অ্যাঁ?

—ওরা কি সত্যিই—? এই ছোঁড়া, যা না, বাইরে গিয়ে বোস না।

—বালতি নিয়ে গাছগুলোয় জল দিয়ে দে ততক্ষণে। আমি স্নান করে নিই।

পান্নু বাহিরে যাইতে যাইতে শুনিল, গৃহিণী বলিতেছেন—সত্যি ওরা খুন করেছে না কি?

কর্তা বলিলেন—সমস্ত আমি টেনে বের করব। তুমি দেখ না। কেসটা নিয়ে তুমুল কাণ্ড করব আমি। ছোঁড়াটার উপর নজর রেখো একটু, না পালায় যেন।

—না। ওরকম ছেলেকে আমি ঘরে ঠাঁই দেব না।

—কি বিপদ!

গৃহিণী চিৎকার করিয়া উঠিলেন—না না না।

* * * *

পান্নু ছুটিয়া আসিয়াছিল দুরন্ত ক্রোধে। মনে মনে সংকল্প করিয়াছিল—সাহেবের পায়ে সে আছাড় খাইয়া পড়িবে। ওই কর্তাটির কাছেও সে একরূপ সকাতর উচ্ছ্বাসে গড়াইয়া পড়িয়াছিল—হাত জোড় করিয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়াছিল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আসিয়া সে যেন পঙ্গু হইয়া গেল। উর্দি-পরা পিওন, প্রহরারত কন্‌স্টেবল, সাহেবের ঘরের অস্বাভাবিক স্তব্ধতা, তাঁহার গম্ভীর ভাবলেশহীন মুখ দেখিয়া একটা দুরন্ত ভয় তাহাকে

যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার পা দুইটা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। মোক্তারবাবু তাহার ময়লা জামাটার প্রান্তদেশ টানিয়া তাহার ক্ষতবিক্ষত পিঠটা দেখাইলেন। সাহেবের মুখে সহানুভূতির প্রকাশ প্রত্যাশা করিয়াই পানু তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু সাহেবের মুখ ভাবলেশহীন, কোন একটি নূতন রেখাও সেখানে ফুটিয়া উঠিল না। শুধু একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া খসখস করিয়া কি লিখিয়া মোক্তারের হাতে দিলেন। সাহেব তদন্তের ভার দিলেন এস. ডি. ও-র উপর, পুলিস সাহেবকেও লিখিলেন বিভাগীয় তদন্তের জন্য। পুলিস সাহেবের আপিসে আসিয়া পানুর ইচ্ছা হইল, সে ছুটিয়া পলাইয়া যায়। খাকী পোশাক পরা কত দারোগা এখানে! বাহিরে বারান্দায় কন্‌স্টেবল গিস্‌গিস্ করিতেছে! যে দুরন্ত ভয় সে তাহাদের থানা হইতে সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছে, যাহার প্রতিক্রিয়ায় উন্মুক্ত প্রান্তরে তাহার ক্রোধের আর সীমা ছিল না, যাহার আবেগে সে এতটা দীর্ঘপথ রাত্রির অন্ধকারে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, সেই ভয় যেন শতগুণে বাড়িয়া গিয়া তাহার বুকের উপর পাহাড়ের মত চাপিয়া বসিল। ব্যাপারটা শুনিয়া ইন্সপেক্টর এবং সাব-ইন্সপেক্টরের দল তাহার দিকে একবার তির্যক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। পানুর মনে হইল, উহাদের ওই তির্যক দৃষ্টির মধ্যে কঠিন আক্রোশ লুকানো রহিয়াছে।

পুলিস সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নোট পড়িয়া মোক্তারবাবুকে কি ইঙ্গিত করিলেন। মোক্তার আবার তাহার জামাটা টানিয়া তুলিয়া প্রহারের চিহ্নগুলি দেখাইলেন। সাহেব বাংলাতেই প্রশ্ন করিলেন—কে মেরেছে? সাহেব বাঙালী।

পানু হাঁ করিয়া মুখে নিশ্বাস লইতেছিল, নাক দিয়া নিশ্বাস লইয়া সে যেন কুলাইতে পারিতেছিল না। কোন উত্তর সে দিতে পারিল না, ফ্যালফ্যাল করিয়া সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মোক্তারবাবু বলিলেন—কে মেরেছে বল?

সাহেব বলিলেন—ভয় নেই; বল তুমি, বল।

শুষ্ককণ্ঠে পানু বলিল—জল!

সাহেব পিওনকে বলিলেন—পানি দো। পানি।

এক নিশ্বাসে এক গ্লাস জল খাইয়া পানু বলিল—জমাদারবাবু।

সাহেব সমস্ত শুনিয়া পানুকে সঁপিয়া দিলেন একজন ইন্সপেক্টারের হাতে। হুকুম দিলেন, একজন কন্‌স্টেবল সঙ্গে দিয়া উহাকে তাহাদের থানার সার্কেলের ইন্সপেক্টারের কাছে পৌছাইয়া দাও; ইন্সপেক্টারকে নোট দিলেন—অবিলম্বে বিভাগীয় তদন্ত কর।

মোক্তার চেষ্টা করিলেন পানুকে নিজের কাছে রাখিবার জন্য; কিন্তু সাহেব বলিলেন—এর জন্যে আপনি জেদ করবেন না। ওকে মেরেছে এ তদন্তের চেয়ে জরুরী তদন্তে ওকে আমাদের দরকার আছে। খুনের তদন্তে ওকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলেই মনে হয়।

পানুর মনে হইল, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সাহেব তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন তাহাদেরই থানায় সেই দারোগার কাছে, সেই জমাদারের কাছে।

মাটির পৃথিবীর মোহাচ্ছন্ন মানুষ; মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রেম, রাগ-রোষ, হিংসা-আক্রোশ তাহার হৃদয়গত সম্পত্তি; মানুষের আক্রোশ মানুষ সহ্য করে, তার সঙ্গে মানুষ লড়াই করে, কখনও হারে কখনও জেতে; মানুষের সে সহ্য হয়। কিন্তু পক্ষপাতশূন্য শাসনকার্যের জন্য, সূক্ষ্ম বিচারের জন্য মানুষ যখন শাসকের আসনে বসিয়া মায়া-মমতা, স্নেহ-

প্রেম, রাগ-রোষ, হিংসা-আক্রোশ সব ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ নির্বিকার হইয়া বসে তখন সাধারণ মানুষ তাহাকে সহ্য করিতে পারে না। ভগবানের মতই সে তাহাকে ভয় করে। তেমনি ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া পানু কন্‌স্টেবলের সঙ্গে চলিয়া ছিল। ভগবানের বিচার, আপন কর্মের প্রতিফলও যেমন মানুষের অসহ্য হইয়া উঠে, মধ্যে মধ্যে তেমনিভাবেই বর্তমান অবস্থাটা তাহার অসহ্য বলিয়া মনে হইতেছিল। অদৃষ্টের কঠিন নির্যাতনে বিদ্রোহী হইয়া মানুষ যেমন মধ্যে মধ্যে আত্মহত্যা করিয়া বসে, তেমনি ভাবেই তাহারও মনে হইতেছিল ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মরিয়া যায়।

কন্‌স্টেবলটির কাজটা মোটের উপর কঠিন কাজ ছিল না। এক ফোঁটা একটা ছেলেকে ট্রেনে চড়াইয়া সদর শহর হইতে মফঃস্বলের একটা শহরে সার্কেল ইন্সপেক্টারের আপিসে পৌঁছাইয়া দেওয়া। সে খইনি টিপিতে টিপিতে গান ধরিয়াছিল। গরমের দিনে সন্ধ্যার পর ট্রেনে বেশ আরামই বোধ হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে সে পুলিসোচিত তদন্ত-কৌশলের পরিচয়ও দিতেছিল। পানুর সঙ্গে মিষ্টি কথায় আলাপ জমাইয়া খুনের সত্য সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিল।

—আরে, বোল্ না। এই ছোকরা!

—অ্যাঁ?

—বোল্ না! তোহার বাপকে সরকারী সাক্ষী করিয়ে দিবে। কে—কে খুন করলে—বোল্ না?

—আমি জানি না। সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—জানিস না তো কানছিস কাহে? অ্যাঁ? আরে! তোরা বাপকে সাজা হোবে বোলে কানছিস? সমঝিয়েছি আমি। জরুর জানিস তু।

পানু তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া চুপ করিল।

কন্‌স্টেবলটি কিছুক্ষণ পর আবার বলিল—আরে। অ্যাঁ! বোল্ না কি জানিস তু?

এবার সবিনয়ে ম্লান হাসি হাসিয়া পানু বলিল—আজ্ঞে না, আমি জানি না।

কন্‌স্টেবলটিও হাসিয়া বলিল—জানিস তু। জরুর জানিস। তু হাসছিস!

পানুর এবার ইচ্ছা হইল, সে ওই কন্‌স্টেবলটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে। কিন্তু জমাদারের কথা মনে করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

গাড়ীটা সেই মুহূর্তেই আসিয়া থামিল একটা স্টেশনে। সেটা একটা রেলওয়ে জংশন। এইখানে গাড়ী বদল করিয়া অন্য গাড়ীতে চড়িতে হইবে। দেরি ছিল। কন্‌স্টেবল তাহাকে এক জায়গায় বসাইয়া একটা ঠোঙায় কিছু খাবার কিনিয়া দিল। সরকার হইতে এ জন্য পয়সা দেওয়া হইয়াছিল। নিজেও খাবার কিনিয়া খাইয়া আরাম করিয়া বসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল।

ছোট জংশন স্টেশন। রাত্রিকাল। প্ল্যাটফর্মে কয়েকটা আলো জ্বলিতেছে, তবুও সমস্ত স্থানটা প্রায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গ্রীষ্মের দিন, যাত্রীর দল এখানে ওখানে আপন-আপন মোটের উপর ঠেস দিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। পানুরও ঘুম পাইতেছিল সেও ঢুলিতেছে। কন্‌স্টেবলটি তাহাকে বলিল—কি রে? ঘুমাইবি?

পানু বলিল—হ্যাঁ।

—আভি ট্রেন আসবে, ঘুমাস না।

পানু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সজাগ হইয়া বসিল।

—হাঁ রে পানুয়া! একটা বাত সাচ বোল্ দেখি?

পানু তাহার মুখের দিকে চাহিল।

হাসিয়া কনস্টেবলটি হঠাৎ তাহার বুকের উপর হাত দিল, হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করিয়া বলিল—হ্যাঁ, ঠিক জানিস তু। আরে বাপ রে, কলিজার অন্দরে তোহার ট্রেন চলছে রে! ঠিক জানিস তু।

পানুর আর সহ্য হইল না। মুহূর্তে আত্মহত্যাকামী উন্মত্তের মতই স্থান কাল, তাহার নিজের শক্তি, ক্ষমতা, সমস্ত বিস্মৃত হইয়া লাফাইয়া উঠিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল সম্মুখের দিকে।

—আরে! আরে! কনস্টেবলটিও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া ছুটিল;—আরে!

জ্ঞানশূন্য পানু ছুটিয়াছে। প্ল্যাটফর্ম পার হইয়া রেল-লাইন। অন্ধকারের মধ্যেও লাইন পার হইয়া সে ছুটিল। কিন্তু হঠাৎ একটা কিছুতে হুঁচোট খাইয়া রেল-লাইনের মাটির বাঁধ ডিঙাইয়া অতল একটা গহ্বরের মধ্যে যেন গড়াইয়া পড়িয়া গেল। একটা মাটি-কাটা খাদের মধ্যে পড়িল। সেইখানেই সে পড়িয়া রহিল চেতনাহীনের মত। কঠিন আঘাতে তাহার সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করিতেছে; স্টেশনে শোরগোল শোনা যাইতেছে। চারিপাশে কোলাহল কলরব ঘুরিয়া বেড়াইল কিছুক্ষণ। তারপর সরিয়া গেল। পানু তখন অসাড়।

কতক্ষণ পর তাহার জানার কথা নয়। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে তখন কাস্তের মত এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছে। পানুর মনের সাড় ফিরিয়া আসিল। সমস্ত কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ভয়ে সে শিহরিয়া উঠিল। পায়ে বুড়া আঙুলের ডগায় বিষম যন্ত্রণা। কিন্তু সে যন্ত্রণার কথা সে ভুলিয়া গেল। কান পাতিয়া সে মানুষের সাড়ার সন্ধান করিতেছিল। কিন্তু কোন সাড়াই নাই। চারিদিকে শুধু ঝিঁঝি পোকার ডাক উঠিতেছে। এবার সে খাদটা হইতে অল্প মাথা তুলিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল। ওই দূরে প্ল্যাটফর্মটা। আলো সব নিভিয়া গিয়াছে। জাগ্রত মানুষের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। কেহ দাঁড়াইয়া নাই, কেহ বসিয়া নাই, কোন শব্দও আসিতেছে না। সে একাই চতুষ্পদের মত হামাগুড়ি দিয়া খাদ হইতে উঠিয়া আসিল। যথাসাধ্য লাইনটাকে পাশে আড়াল রাখিয়া সে সেই আহত পায়েই খোঁড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। দিক ঠিক নাই, কিছুদূর আসিয়া চোখে পড়িল একটা জঙ্গলের মত ঘন কালো কিছু, সেই দিকেই সে অগ্রসর হইল।

চার

তারপর আর তাহার মনে নাই। কেমন করিয়া, কোন্ পথ দিয়া, কয় দিন বা কয় ঘণ্টা হাঁটিয়া সে কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহার কোন স্মৃতিই তাহার মনের মধ্যে নাই, অত্যন্ত অস্পষ্টভাবেও কিছু মনে পড়ে না। বন্দুকের গুলিতে আহত পাখী যখন কিছুদূর উড়িয়া গিয়া লুটাইয়া পড়ে, তখন যেমন তাহার আপনার ভীষণতম অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা থাকে না, কোন্ দিক দিয়া কোন্ আশ্রয়ের দিকে উড়িয়া চলিয়াছে তাহারও কোন হিসাব থাকে না, থাকে শুধু ভয়ঙ্কর শব্দের স্মৃতি, যাহার নিষ্ঠুরতম আঘাত হইতে সঞ্জাত প্রচণ্ড ভয়াতুর জীবনের একমাত্র মৌলিক কামনা—বাঁচিবার উন্মত্ত আশায় পলায়নের চেষ্টা—তেমনি একটা উন্মত্ত চেষ্টায় অচেতনতার মধ্যে সে পায়ের ওই কঠিন আঘাত লইয়াও পলাইয়াছিল।

তাহারই মধ্যে আসিয়াছিল জ্বর। সেই জ্বরে তাহার স্মৃতির সচেতনতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল. কিন্তু তবুও ভয় যায় নাই। তাহাদের গ্রামের থানা হইতে এই স্টেশন পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপেই তাহার ভয় বাড়িয়া গিয়াছিল। কাঁদিলে পরিত্রাণ নাই, হাসিলে পরিত্রাণ নাই, না-হাসিয়া না-কাঁদিয়া সকরুণ ভাবে 'না' বলিলেও বিশ্বাস করে না, এই অবস্থায় সে জলে-ডোবা মানুষের মতই হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দেহের প্রতিটি দেহকোষের মধ্যে বিকাশকামনায় আনন্দশিহরণ-মুখর জীবনকণিকাগুলি পর্যন্ত দুরন্ত ভয়ে দ্রুততম আবেগে আবর্তিত হইয়া তাহাকে ঐ অবস্থাতেও পলায়নের শক্তি যোগাইয়াছিল। অন্য কোন অধিকারই সে আর চায় নাই। বিচার পাইবার অধিকার না, মান-মর্যাদার অধিকার না, প্রতিবাদের অধিকার না, কেবল চাহিয়াছিল বাঁচিবার অধিকার। যখন তাহার মনে হইল সে অধিকারও তাহাকে ইহারা দিবে না, তখনই সে ছুটিয়া পলাইয়া সেই অধিকার অর্জন করিতে চাহিয়াছিল আপন শেষ এবং সকল শক্তি প্রয়োগে। জ্বরটা তাহার আসিয়াছিল কতকটা শরীরের উপর অত্যাচার এবং আঘাত হেতু, কতকটা এই নিদারুণ উত্তেজনা হেতু। সেই জ্বরে সে অচেতন হইয়া গিয়াছিল একদিন—সে দিন, ঐ ঘটনা হইতে এ দিনটি কতদিন পরে সে তাহা স্মরণ করিতে পারিল না। সে সজ্ঞান চৈতন্যে অনুভব করিল—চোখে দেখিল—একটা দুর্গন্ধময় কুঁড়েঘরে সে শুইয়া আছে। ঘরটাকে ঘর বলিয়া চিনিলেও, সে ঘর কোথায়, সে ঘর কাহার, সেও বুঝিতে পারিল না। ঠিক এই সময়ে একজন প্রকাণ্ডদেহ লোক ঘরে ঢুকিল। লোকটি যেমন কালো, দেখিতেও তেমনি ভয়ঙ্কর। পানুর দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আসিয়া ঢুকিল ওই পুরুষটারই অনুরূপ এক ভীষণদর্শনা মেয়ে। নাকে বড় বেসর, কানে সারি সারি মাকড়ি, মাকড়িগুলা এত ভারী যে কানের ছিদ্রগুলি নাসারন্ধ্রের ছিদ্রের চেয়েও বড় হইয়া গিয়াছে, গলায় হাঁসুলি, পাথরের মালা, উল্কিতে চিত্র বিচিত্র মুখ—দেখিয়া পানুর সদ্যোলব্ধ চেতনা আবার যেন অসাড় হইয়া পড়িল।

নিম্নতম স্তরের যাযাবর সম্প্রদায়। পানু তাহাদের গ্রামে এই শ্রেণীর যাযাবরদের দুই-একবার দেখিয়াছে। পানুরা বলিত—হা-ঘরে।

যেটাকে পানু কুঁড়েঘর ভাবিয়াছিল, সেটা কুঁড়ে নয়—কালো কাপড়ের তাঁবু। পানুকে তাহারা অজ্ঞান অবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়াছিল। পথ-প্রান্তর, লোকালয়, অরণ্য—সর্বত্রচারী হা-ঘরের দল এক জায়গায় তাঁবু ফেলিয়াছিল, একটা রেল স্টেশনের ধারে। সেই জংশন স্টেশনের পরের স্টেশনের কাছে। পুরুষের দল ভোরবেলায় শিকারে বাহির হইয়াছিল। সাপ গোসাপ, ইঁদুর, কাঠবেড়ালী, শেয়াল, সজারু, খরগোশ—যাহা পাওয়া যায় সন্ধান করিতে গিয়া ঐ পুরুষটি একটা জঙ্গলের মধ্যে পানুকে পাইয়াছিল। ধান দিলে খই হইয়া যায়—এমনি তখন তাহার গায়ের উত্তাপ। সম্পূর্ণরূপে অচেতন, কেবল পানুর চওড়া বুকটা উঠিতেছে নামিতেছে হাপরের মত, আর কণ্ঠনালী দিয়া বাহির হইতেছে যন্ত্রণাকাতর একটা অনুনাসিক শব্দ, জানোয়ারের মত একটা গোঙানি। ঐ পুরুষটি—বুধন—তাহাকে কুড়াইয়া আনে। বুধন ভূত প্রেত পিশাচ তাড়াইতে পারে, বহুবিধ গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিয়া রাখে, রোগের চিকিৎসা করে; মরা বাঁদরের, মানুষের, প্যাঁচার খুলি তাহার আছে; ধনেশ পাখীর তেল, কুমীরের দাঁত, বাঘের পাঁজরা লইয়া সে ঔষধ তৈয়ারী করে, সে যাযাবর দলের মধ্যে গুণী লোক! পানুকে দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল, একটা ভীষণ শক্তিশালী জিন ছেলেটাকে তাড়া করিয়া আনিয়া এইখানে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। সে আপন গুণপনার প্রেরণাতেই ওই শক্তিশালী

জিনটাকে পরাজিত করিবার কল্পনা করিয়া তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া আসিয়াছিল। জিনকে পরাজিত করিয়াছে সে।

আরও একটু গোপন গূঢ় কারণ ছিল। বুধন ছিল নিঃসন্তান। শিশু বালকের উপর তাহার একটা গভীর মমতা ছিল। তাহাদের সম্প্রদায়ের ছেলে-পিলেদের সঙ্গে তাহার একটি ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ ছিল—কিন্তু গোপন সম্বন্ধ। কারণ তাহাদের সম্প্রদায়ের সকলে তাহাকে শুধু খাতিরই করিত না, ভয়ও করিত। বুধন শুধু গুণী এবং চিকিৎসকই নয়, সে আরও ভয়ঙ্কর মানুষ—সে ডাইন। মানুষের রক্ত সে দৃষ্টি দিয়া শুষিয়া লইতে পারে, বিশেষ করিয়া শিশুর নধর কোমল দেহে তাহার বড় লোভ। দুই-তিন বার সে পল্লীগ্রাম হইতে ছেলে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। একবার জেল খাটিতে হইয়াছে। বাকি কয়েকবার গ্রামের লোকে তাহাকে এমন প্রহার দিয়াছিল যে, তিন-চারি দিন ধরিয়া তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল। এই সব কারণে সম্প্রদায়ের লোকেরা আপন আপন শিশুদের যথাসম্ভব বুধনের নিকট হইতে আগলাইয়া রাখে। মৃতকল্প পানুকে জনহীন প্রান্তরের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বুধন তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে কাঁধে ফেলিয়া আপন তাঁবুতে আনিয়া তুলিয়াছিল।

তাহার স্ত্রী ভয়ে বিরক্তিতে হাউ-মাউ করিয়া উঠিয়াছিল। পানুকে শোয়াইয়া দিয়া বুধন দাঁতের উপর দাঁত ঘষিয়া বলিয়াছিল—দাঁতে কামড়ে তোর নলীটা কেটে ফেলব আমি।

সম্প্রদায়ের লোকেরাও আপত্তি তুলিয়াছিল।

বুধন প্রথমটায় বলিয়াছিল, গাঁইয়ারা তো ওকে মরবে বলে ফেলেই দিয়েছে। তাদের আবার দাবি কিসের? দারোগা যদিই আসে—তোমরা বলবে।

তবুও দুই একজন আপত্তি করিয়াছিল—তোমার জন্যে এসব ফ্যাসাদ আমরা সইতে পারব না।

—চিল্লাও তো আমি বাণ জুড়ব। অত্যন্ত সহজ স্বরেই বুধন কথা কয়টি বলিয়াছিল। বাণের ভয়ে সমস্ত সম্প্রদায়টা চুপ করিয়া গিয়াছে।

পানু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিল দীর্ঘ চল্লিশ দিন। জ্বরের উপর বুকে সর্দি বসিয়াছিল। বুধনের গাছ-গাছড়া মন্ত্র আর নিজের জীবনশক্তির জোরে সে বাঁচিয়া উঠিয়াছে। যখন জ্ঞান হইল, তখন তাহার সমস্ত দেহের মধ্যে এক বিন্দু শক্তি নাই। এই অপরিচিত ভয়ঙ্কর আবেষ্টনীর মধ্যে পঙ্গুর মতই সে পড়িয়া রহিল।

কিন্তু অসহনীয় উৎকট দুর্গন্ধ তাঁবুর মধ্যে। নিরুপায় পানু। চোখে জল আসে। অল্পক্ষণ পরেই ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়, ঘুমাইয়া পড়ে বেচারা।

সকালে বেদেদের পুরুষরা বাহির হইয়া যায়; ফিরিয়া আসে ধূলি-ধূসরিত রক্তাক্ত দেহে। কাঁধে বাঁকের দুই পাশে ঝুলাইয়া আনে অনেক বড় বড় দাঁড়াস সাপ, গোসাপ, বনবিড়াল, শেয়াল, সজারু, খরগোশ; সেগুলার চামড়া ছাড়াইয়া কতক আগুনে ঝলসাইয়া লয়, কতক রান্না করে; মাংস ঝলসানোর গন্ধে পানুর দম যেন বন্ধ হইয়া যায়; ঘরের মধ্যে রান্না মাংস পচে, সেই গন্ধের মধ্যে পানুর বমি আসে।

মাথার কাছে কোথাও ঝাঁপির মধ্যে সাপ ফোঁস-ফোঁস করে। বুধন একটা গোখরো সাপকে মালার মত গলায় ঝুলাইয়া বেড়ায়। বহুদিনের ধরা প্রকাণ্ড বড় একটা সাপ। সাপটা বুধনের গলায় ঝুলিয়া থাকে আর মুখটা তুলিয়া বুক হইতে বুধনের মাথা পর্যন্ত নড়িয়া-চড়িয়া বেড়ায়।

বড় বড় শিকারী কুকুরগুলার ছিপছিপে শরীর, চোখে হিংস্র দৃষ্টি। তাঁবুর দরজায় বসিয়া ঝিমায়, সামান্য শব্দে মুখ তুলিয়া তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি মেলিয়া দেখে। ক্ষীণতম সন্দেহ হইলেই গোঁ গোঁ শব্দ করে। কখনও কখনও প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া যায় কোন দিক লক্ষ্য করিয়া, আবার ফিরিয়া আসে।

নাকে বেসর, গলায় হাঁসুলী, দুর্গন্ধময় কাপড়ে কাঁচুলী পরা বুধনের স্ত্রী আসে, পান্নুর গায়ে-কপালে হাত বুলাইয়া দেয়, দুর্বোধ্য ভাষায় প্রশ্ন করে; উত্তর না পাইয়া ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে প্রশ্ন জানায়—কেমন আছ ?

পান্নু উত্তর দেয়। মিষ্ট হাসিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতেই জবাব দেয়—ভাল। ভাল আছি। বেদেরা পান্নুর ভাষা কিছু কিছু বোঝে, পান্নু কিন্তু একবিন্দু বুঝিতে পারে না।

পেটে হাত বুলাইয়া মুখে আহার তুলিবার ভঙ্গি করিয়া বুধনের স্ত্রী প্রশ্ন করে, ভুখ—ভুখ ?

পান্নু বুঝিতে পারে, ক্ষুধা পাইয়াছে কিনা প্রশ্ন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে 'ভুখ' শব্দটাও শিখিয়া লয়—ক্ষুধাই বোধ হয় ভুখ !

বুধন সত্যই গুণী ব্যক্তি। গ্রামে প্রতিপালিত এই ছেলেটির রুচির সঙ্গে তাহাদের রুচির পার্থক্য সে বোঝে। স্ত্রী বলিয়া দিয়াছে—গরুর দুধ মহিষের দুধ ছাড়া আর যেন ছেলেটাকে এখন কিছু দেওয়া না হয়। প্রথম প্রথম আহার্য দিলেই পান্নু সভয়ে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিত; দুধের সাদা রঙ দেখিয়াও সন্দেহ যাইত না। সে মুখের কাছে তুলিয়া শুঁকিত। কোন কিছু অপরিচিত তীব্র গন্ধের সন্ধান না পাইয়া একবার জিভ দিয়া স্পর্শ করিয়া স্বাদ অনুভব করিত। তারপর নিশ্চিন্ত হইয়া দুধটুকু খাইয়া মনে মনে গাঢ় স্নেহে প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত ওই বুধন ও বুধনের স্ত্রীর প্রতি।

বুধনের স্ত্রী আপন বুকে হাত দিয়া বার বার তাহাকে শিখাইয়াছে—মা! মা! বুধনকে দেখাইয়া শিখাইয়াছে—বা! বা! বাবা!

শক্তিহীন কঙ্কালসার-দেহ পান্নু ডাকে—মা! মনে পড়ে নিজের মাকে। চোখ সজল হইয়া ওঠে, কিন্তু চোখের জল ফেলিতে সাহস করে না।

বুধনের স্ত্রী আসিয়া দাঁড়ায়।

অশ্রু সম্বরণ করিয়া পান্নু পেট দেখাইয়া বলে—ভুখ।

বুধনের স্ত্রী ছুটিয়া যায় দুধের সন্ধানে।

সেদিন শিকারের ফিরত বুধন ঘরে আসিয়া হাসিমুখে তাহার কোলের কাছে সযত্নে রাখিল একটি শিকার করা পাখী। সুন্দর বিচিত্র রঙ। এ পাখী পান্নু চেনে। তাহাদের গ্রামের প্রান্তে বড় বড় অশত্থ বট গাছগুলায় যখন ফল পাকে, তখন ইহারা ঝাঁক বাঁধিয়া আসে। যেমন সুন্দর পালকের রঙ ইহাদের, তেমনি সুন্দর ইহাদের ডাক। জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির মত মিষ্ট স্বরে ডাকে। বাবুদের বাড়ির ছোকরাবাবুরা বন্দুক ছুঁড়িয়া গুলি করিয়া মারে। মাংস নাকি ভারি সুস্বাদু। হরিয়াল পাখী।

বুধন হাসিয়া বলিল—খায়গা ? মুখে আহার তুলিবার ভঙ্গি করিয়া সে প্রশ্ন করিল।

শুধু দুধ খাইয়া পান্নুর আর নিজেরও ভাল লাগিতেছিল না। সে সাগ্রহে সম্মতি জানাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ।

সেদিন বুধনের স্ত্রী তাহার সামনে ওই হরিয়াল পাখীর মাংস ধরিল। মুখের কাছে পাইয়া-

এতক্ষণে পানুর কিন্তু মুখ শুকাইয়া গেল। ইহাদের রান্না!

বুধনের স্ত্রী বলিল—খা খা।

সভয়ে ঘাড় তুলিয়া সে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

হাসিয়া বুধনের স্ত্রী আবার বলিল—খা।

দ্বিধা এবং সঙ্কোচের মধ্যেও সে সভয়ে এক টুকরা মাংস মুখের কাছে তুলিল, ওই নতুন মায়ের দেওয়া আহার্য প্রত্যাখ্যান করিতে তাহার সাহস হইতেছে না। মনে মনে হিসাব করিয়াছে সে অনেক; এখান হইতে পালানো অসম্ভব। বুধন হিংস্র হইয়া উঠিবে—বাণ মারিয়া শোধ লইবে। বুধনের মন্ত্রে সে বিশ্বাস করিতে শুরু করিয়াছে। আর পালাইয়া যাইবে কোথায়? সেখানে যে বাড়ির সামনেই থানা!

বুধনের স্ত্রী আবারও বলিল—খা খা। লবণযুক্ত সিদ্ধ মাংস। সামান্য একটু গন্ধ সত্ত্বেও লবণাক্ত মাংসের আস্বাদ দীর্ঘকাল পরে তাহার ভাল লাগিল। খুব ভাল লাগিল। তাহার জিভের ডগা হইতে পাকস্থলী পর্যন্ত একটা লোলুপ শিহরণ বহিয়া গেল। লোভাতুর আগ্রহে সে মাংসখণ্ডটা চিবাইতে আরম্ভ করিল। নরম সুস্বাদু মাংস। হাড়গুলা মুড়-মুড় করিয়া ভাঙিয়া যাইতেছে। সে খণ্ডটার পর আবার এক খণ্ড। সমস্তটাকে সে নিঃশেষে খাইয়া সর্বশেষে কয়েক টুকরা অপেক্ষাকৃত শক্ত মোটা হাড় লইয়া চুষিতে আরম্ভ করিল।

বুধনের স্ত্রীর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে ডাকিল বুধনকে আপন ভাষায়—দেখে যা, দেখে যা,—ও মিন্সে!

বুধনও আসিয়া দেখিয়া খুব খুশী হইল। বলিল—খা খা। তারপর নিজের হাত দুইটা দুই পাশে ঝাঁকি দিয়া দেখাইয়া বলিল—এইসা—এইসা।

পানু ইঙ্গিতটা বুঝিল—বুধন বলিতেছে খাইলে এমনি শক্তিশালী দেহ হইবে। পানু একটু মিষ্টি হাসি হাসিল।

সেই দিনই অপরাহ্ণে বুধন তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাঁবুর বাহিরে বসাইয়া দিল।

•

দীর্ঘদিন পরে মুক্ত আকাশের তলে পরিপূর্ণ রৌদ্র এবং অবাধ বাতাসের স্পর্শ পাইয়া পানু যেন সঞ্জীবনীর স্পর্শ অনুভব করিল। তাহাদের বাড়ির উঠান কাঁচা মাটির। মধ্যস্থলটা নিকানো হয়, নিত্য ঝাঁটা বুলানো হয়, সেখানে ঘাস হয় না। কিন্তু চারিপাশে দূর্বাঘাস জন্মায়। সেই ঘাসের উপর তাহার বাপ কি প্রয়োজনে একখানা বড় পাথর আনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল। দীর্ঘদিন পর একদা পানুই সেই পাথরখানা সরাইয়াছিল। পাথরটার নীচে দূর্বার পাতাগুলির রঙ একেবারে সাদা এবং লতাগুলি পাথরের চাপে মাটির সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছিল। আশ্চর্যের কথা—পাথরখানা তুলিয়া দিবা মাত্র ওই দূর্বার লতাগুলির মধ্যে একটা কম্পন জাগিয়া উঠিল। দূর্বার দীর্ঘ পাতাগুলি মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেহে মনে তেমনি একটা কম্পন জাগিয়াছে যেন।

কোন এক অজ্ঞাত গ্রামপ্রান্তের এক অবাধ প্রান্তরে যাযাবরদের তাঁবু পড়িয়াছিল। বর্ষা তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আকাশ ঘন নীল, মধ্যে মধ্যে পেঁজা তুলার মত সাদা সাদা হাল্কা চাপবন্দী মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। কখনও কখনও নীল আকাশের কোল জুড়িয়া প্রকাণ্ড বড় বড় সাদা পদ্মফুলের মালার মত ভাসিয়া উড়িয়া যাইতেছে বকের সারি। তাহাদের 'কক্-কক্' শব্দে পানুর শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। সম্মুখে দিগন্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত। প্রান্তরটার পরে চাষের মাঠ। বিস্তীর্ণ মাঠখানি সবুজ ধানে ভরিয়া উঠিয়াছে। হা-ঘরেদের

তাঁবুর বাহিরে গাছের তলায় ইটের চুলায় রান্না চাপিয়াছে। উলঙ্গ ছেলেদের দল ছুটিয়া বেড়াইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে কয়েকটা কুকুরের বাচ্চা। অদূরেই একটা তাঁবুর সম্মুখে অনেক কয়জনে বেশ একটি ভিড় জমাইয়া বসিয়াছে। বেশ একটা উল্লাস কলরোল চলিয়াছে সেখানে। বাতাসে একটা তীব্র ঘ্রাণও আসিতেছে। বেশ জোরে বার দুয়েক নিশ্বাস লইয়া পানু বুঝিল, মদের গন্ধ।

কয়েকজন তাহাকেই আঙুল দিয়া দেখাইতেছে। পানুও সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর বুধন একটা পাত্র হাতে উঠিয়া আসিল। তাহার সঙ্গে একটা মেয়ে। বুধন বলিল —খা—খা।

পানু সভয়ে বলিল—না।

মেয়েটা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চোদ্দ-পনেরো বছরের একটা হা-ঘরের মেয়ে। কালো, খাঁদা কিন্তু চোখ দুইটা বড়। বড় বড় চোখ দুইটা মদের নেশায় ঢুলঢুল করিতেছে। মাথায় রুক্ষ চুল। পরনের কাঁচুলিটা খাটো, খুব আঁট হইয়া গায়ে চাপিয়া বসিয়াছে—কিন্তু তাহাতেই তাহাকে বেশ একটি শ্রী দিয়াছে।

মেয়েটা এবার বলিল—খা। খা। দারু। পিয়ো।

পানু বলিল—না।

মেয়েটা হাসিয়া আকুল হইল। হাসিতে হাসিতে বসিয়া পড়িল। বসিয়া মত্ততার ঘোরে মাটির বুকে হাত বুলাইয়া হাসিতে লাগিল।

ওদিকে সূর্য অস্ত যাইতেছে।

গ্রামের মধ্যে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকও বাজিতেছে। ঢাকের বাজনার মধ্যে সে শুনিতে পাইল ধুমুল বাজনার বোল। পূজার আগে নিত্য সন্ধ্যায় ঢাকীরা ধুমুল দেয়। নীল আকাশ, ফল-ভরা মাঠ, আকাশের কোলে বকের সারি, দূরাগত ঢাকের ওই বাজনা বলিয়া দিল, পূজা—পূজা আসিতেছে। হা-ঘরের দলের পূজা নাই। তাহারা আপন মনে মত্ত হইয়া আছে।

পাঁচ

হা-ঘরের দলটি বড় নয়, দশটি পরিবার সম্প্রতি বারোতে পরিণত হইয়াছে। দুইটি ছেলে বড় হইয়াছে, বিবাহ করিয়া স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র গৃহস্থালী পাতিয়াছে। ভ্রাম্যমাণ গৃহস্থালী। পানুর আশ্রয়দাতা, তাহার স্ত্রী পানুকে আশ্বাস দেয়—পানুও একদিন এমনি করিয়া গৃহস্থালী পাতিবে। উহাদের কথাবার্তা পানু এখন অনেকটা বুঝিতে পারে, অল্প-স্বল্প বলিতেও শিখিয়াছে। প্রৌঢ় গুণীন বলে—আমার মন্ত্র-তন্ত্র, জড়ী-বুটি সব তুকে শিখাইব। তামাম আদমি ডরকে মারে তুকে খাতির করবে। এই দলের মধ্যে সর্দার তুকে পালা বৈঠনে দিবে। হাঁ।

প্রৌঢ়া বলে—নয়া কাপড়ার তাঁবু বানিয়ে দেগা। থালা দিব, লোটা দিব, নতুন হাঁড়ি দিব, বহুৎ রঙদার দড়ি দিয়ে শিকে বানিয়ে দিব। বহু আসবে তুহার, বিস্তারা দিব, তুহার তাঁবু পড়বে হামার তাঁবুর পাশে।

প্রৌঢ় বলে—বহুৎ আচ্ছা তীরধনুক বানিয়ে দেব, আচ্ছা 'কুলাঢ়' বানিয়ে দেব, লড়কী

বানিয়ে দেব, ডাণ্ডা বানিয়ে দেব। একটো ভঁইসা দিব, যিসকা বেটীকে তু শাদি করবি উভি দেবে একটো ভঁইসা ; দুটো আচ্ছা কুত্তাভি দেব, শিকার খেলবি।

প্রৌঢ়া বলে—এ বুড়োয়া, তুহার সাঁপকো ভি দিস বাচ্চাকে।

প্রৌঢ়ের তাহাতেও আপত্তি নাই, সে বলে—দেঙ্গে, জরুর দেঙ্গে। এই বয়স্ক ছেলেটিকে সব ভুলাইয়া একান্তভাবে আপনার করিবার জন্য তাহার জীবনের সব কিছু সম্পদ সে দিতে প্রস্তুত।

পান্নু ভীতিত্রস্ত হৃদয়ে শুষ্ক হাসি হাসে, আর সম্মতি জানাইয়া ঘাড় নাড়ে। তাহার মুখে রোগের পাণ্ডুরতা মনের ভীতি-সঙ্কোচ বিরূপতা ঢাকিয়া রাখে। কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও সে ইহাদের সঙ্গে এক হইয়া যাইতে পারে না, একান্ত ভাবে আপনার জন হইতে পারে না।

অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর মানুষ ইহারা। ইরাণী বলিয়া পরিচিত, ইউরোপের জিপ্‌সীদের অন্যতম শাখার যাযাবর শ্রেণীকে বাদ দিয়াও এই দেশেই আরও যাযাবর শ্রেণী আছে, তাহারা ইহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত শ্রেণীর। দলে তাহারা প্রকাণ্ড, ঘোড়া-গাধা পর্যন্ত তাহাদের আছে। বেশভূষায় ইহাদের অপেক্ষা অনেক সভ্য। হিন্দুর পল্লীতে গিয়া তাহারা মাথায় নামাবলী বাঁধে, ফোঁটা তিলক কাটে, বহির্বাস পরে, গলায় পরে রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কমণ্ডলু নেয়। পুরাদস্তুর সন্ন্যাসী সাজিয়া 'নমো নারায়ণায়' হাঁকিয়া গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া দাঁড়ায়, মুখ দেখিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ বলে। মুসলমানদের পল্লীতে ফকির সাজিয়া মুসলমানী বোল হাঁকিয়া ভিক্ষা করে, দাবী করে, কাড়িয়া লয়, ছোট ছোট বাজার হাট সুবিধা পাইলে লুঠ করিয়া লয়। ধর্মের রীতি নীতি আচার পালন করে না ; কিন্তু ধর্মের ছোঁয়াচ তাহাদের যাযাবর জীবনে লাগিয়াছে। একই দলের মধ্যে ধর্মে হিন্দু এবং ধর্মে ইসলাম উভয় সম্প্রদায়েরই লোক আছে। অবশ্য সে নামেই ; তাহাদের খাদ্য এক, পানীয় এক, ভাষা এক, আচার এক, প্রথা এক, দলের মধ্যে আইন এক, কোন পার্থক্য নাই। না থাক, তবুও মানুষের মনের মধ্যে সভ্যতার যতটা প্রভাব পড়িলে জীবনে ধর্ম আসে, ততখানি সভ্যতা তাহাদের মধ্যে আছে। ইহারা কিন্তু আজও পড়িয়া আছে মানব-জীবনের অনেক নিম্নস্তরে। ভীমদর্শন বর্বর হিংস্র মুখের গঠন, কালো রঙের উপর পুরু ময়লার একটা স্তর জমিয়া আছে, গরম লাগিলে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, অঙ্গমার্জনা জানে না, শীতে স্নানই করে না। গায়ের লোমকূপে উকুন হয়, পরনের এককালি কৌপীনের মত কাপড়ে সাদা রঙের উকুন থিকথিক করে, উহারা বলে, 'চিল্লড়'। কামড়ে মধ্যে মধ্যে অস্থির হইয়া আঙুল চালাইয়া মারিয়া ফেলে, মট-মট শব্দ উঠে। অখাদ্য বলিয়া কিছু নাই, গরু ভেড়া মহিষ শিয়াল হইতে ব্যাঙ, এমন কি সাপ পর্যন্ত খায়, অর্ধসিদ্ধ লবণাক্ত মাংস হইলেই হইল, মাংসের সঙ্গে খায় মদ ; এ সমস্ত হজম করিবার শক্তি ইহাদের দেহের কোষে কোষে পিতৃপুরুষক্রমে সঞ্চিত আছে। হজম করিলেও গায়ে কিন্তু একটা অত্যন্ত দুর্গন্ধ উঠে। পান্নু এই গন্ধটা বিশেষ করিয়া বরদাস্ত করিতে পারে না। তাহার আশ্রয়দাতা গুণী লোক, তাহার মন্ত্র, তাহার ঔষধ সবই সে তাহাদের সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পাইয়াছে। বনে জঙ্গলে পাহাড়ে প্রান্তরে ঘুরিয়া নিজেও সে কিছু কিছু আবিষ্কার করিয়াছে। তাহার বুদ্ধি তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক তীক্ষ্ণ। সে পান্নুর কষ্ট বুঝিতে পারে, আরও বুঝিতে পারে তাহাদের সকল খাদ্য পান্নু হজম করিতে পারিবে না। তাই পান্নুকে সে পাখী, খরগোশ, ভেড়া, ছাগল ছাড়া অন্য কোন জন্তুর মাংস খাইতে দেয় না। কিন্তু পান্নু তাহাদের গায়ের গন্ধ সহিতে পারে না—এই সত্যটা মধ্যে মধ্যে যখন একান্ত প্রকটভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন সে একান্ত আহত হয়।

ধীরে ধীরে পান্নু সারিয়া উঠিল। তখন প্রায় চার মাস অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। শীতের আমেজ ক্রমশ ঘন হইয়া উঠিতেছে। স্থান হইতে স্থানান্তরে উন্মুক্ত অবাধ বায়ু-প্রবাহের মধ্যে ঘোরা-ফেরা বাস, অর্ধসিদ্ধ লবণাক্ত পাখীর মাংস খাদ্য, নিত্যনিয়মিত বিপুল পরিশ্রমের ফলে আজন্ম-সবল-দেহ পান্নু সবলতর দেহ লইয়া সারিয়া উঠিল। অন্য দিকে বিপদ বাড়িয়া উঠিল।

মানব-জীবনের বিবর্তনবর্জিত রাক্ষসাচারসর্বস্ব মানুষগুলির সঙ্গে তাহার রুচির প্রভেদ, তাহার অন্তরের ঘৃণা দুর্বল পান্নুর পক্ষে গোপন করা সম্ভবপর হইয়াছিল কিন্তু সুস্থ সবল পান্নুর পক্ষে গোপন করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তাহার আশ্রয়দাতা এখন মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত বিরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তাহার স্ত্রী দাঁতে দাঁত ঘষিয়া গর্জন করে। একদিন সে পান্নুর চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে কঠিন নির্যাতনে নির্যাতিত করিল। পান্নু অকাতরে সব সহ্য করিল, তবু সে পলাইবার চেষ্টা করিল না। ইহাদের মধ্যে সে আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ মনে করে। পলাইবার কথা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়ে ছিন্নকণ্ঠ নাকু দত্তের কথা,—থানা, পুলিস, দারোগা, জমাদার, ফাঁসি! বুক তাহার ধড়ফড় করিয়া উঠে। এখানে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইহাদের মধ্য হইতে তাহাকে পান্নু বলিয়া কেহ আবিষ্কার করিতে পারিবে না। তাহার প্রমাণ সে পাইয়াছে। এই কয়েক মাসের মধ্যেই অনেকবার পুলিস এই হা-ঘরেদের আড্ডা দেখিয়া গিয়াছে, তল্লাশ করিয়াছে, কেউ তাহার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিয়াও দেখে নাই।

পান্নু সুস্থ হইয়া চেতনা লাভ করার পর প্রথম যেদিন সে হা-ঘরেদের তাঁবুতে পুলিসকে হানা দিতে দেখিয়াছিল, সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল, পুলিস আসিয়াছে তাহারই সন্ধানে। দুর্বল হৃৎপিণ্ডটা উদ্বেগে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। পুলিস চলিয়া যাইবার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত সে পড়িয়া ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গুর মত। ক্রমে সে দেখিল, ইহাদের তাঁবুতে পুলিসের আসা-যাওয়া অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। পুলিস আসে, তাহাদের নাম লিখিয়া লয়, শাসাইয়া যায়—চুরি-লুঠ করিলে কঠিন সাজা দেওয়া হইবে। তাহার আশ্রয়দাতা অনেক দারোগা-জমাদারকে জড়ী-বুটি রঙিন পাথর দেয়, যাহার গুণে দুর্লভ স্ত্রী লাভ হইবে, প্রচুর টাকা পাওয়া যাইবে, দুশমন নাশ হইবে কঠিন অস্ত্রের আঘাতও ব্যর্থ হইবে, অবশেষে একদিন দুনিয়ার রাজাও বনিয়া যাইবে। এত লোককে সে জড়ী-বুটি এবং পাথর দিয়াছে যে ভাবীকালে দুনিয়ার রাজত্বের জন্য পরস্পরবিরোধী হাজার রাজার মধ্যে একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। নারী এবং অর্থ মধ্যে মধ্যে পুলিসের লাভ হয় ইহাদেরই কল্যাণে। সভ্যতায় বঞ্চিত এই হা-ঘরেরা সভ্যসমাজের কোন আইনই মানে না। সুতরাং পুলিসের কবলে ইহারা পড়িয়াই আছে। হা-ঘরের দল গ্রামের পাশে বাসা গাড়ে, তাহাদের গরু মহিষ ছাগল প্রভৃতি পশুগুলির জন্য গাছপালা কুড়াইয়া পাতা কাটিয়া লয়, কাহারও অনুমতি লয় না। গাছ যে কোন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে পারে এ আইনই তাহারা মানে না। গাছ মাটিতে জন্মিয়াছে, গাছ তো মাটির, বাচ্চা যেমন মায়ের তেমনি। গাছের মালিক গ্রামের লোক আপত্তি করিলে দাঙ্গা বাধাইয়া দেয়। গ্রামের লোকের অরক্ষিত ছাগল ভেড়া দেখিলে লুকাইয়া মারিয়া খায়। তাহাদের ছাগল ভেড়া আছে; ওগুলার অধিকারীত্ব অবশ্য তাহারা মানে। নিজের নিজের সম্পত্তি ছাড়া অপরের কোন সম্পত্তির অধিকারীত্ব উহারা মানে না। অপরাধপ্রবণতা উহাদের রক্তকণিকায় মিশিয়া আছে। রাত্রে চুরি করে। চৌকিদার পুলিস মোতায়েন থাকিলে—উহাদের মেয়েরা উহাদের সঙ্গে রসিকতা জুড়িয়া দেয়, যুবতীরা

তাহাদের ভুলাইয়া দূরে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে, সেই অবসরে পুরুষেরা বাহির হইয়া পড়ে নৈশ অভিযানে। পরদিন প্রাতে পুলিস আসিয়া হাঙ্গামা জুড়িয়া দেয়, খানাতল্লাশ করে। মধ্যে মধ্যে দুই-একজনকে ধরিয়াও লইয়া যায়। ইহারা দুই-চারিদিন অপেক্ষা করিয়া দেখে, ধৃত ব্যক্তি তাহার মধ্যে ছাড়া পাইলে তাহাকে লইয়া বাসা তুলিয়া স্থানান্তরে চলে; ছাড়া না পাইলেও চলে; ধৃত ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করিয়া একদিন ফিরিবেই। সত্যই তাহারা অদ্ভুত উপায়ে ভ্রাম্যমাণ দলের সন্ধান করিয়া ফেরে।

পুলিসকে গ্রাহ্য করিলেও ভয় করে না। পানু দেখিল, তাহারা অর্থাৎ গ্রামের লোক পুলিসকে যেমন ভয় করে, ইহাদের ভয় তেমন নয়। কখনও কখনও পুলিসের সঙ্গেও হাঙ্গামা করে ইহারা, পুলিসও ইহাদের বর্বর ক্রোধোন্মত্ততাকে এড়াইয়া চলিতে চায়। এই মাস কয়েকের মধ্যেই দুইজন কন্‌স্টেবলকে প্রহার দিতে পানু দেখিয়াছে। আজই বৈকালে একজন জমাদার-বাবু মার খাইয়াছে। পানুর আশ্রয়দাতাই প্রচণ্ড এক চড় কষাইয়া দিল। জমাদার এই তাঁবুর দিকেই আসিতেছিল, পথে সদ্য-বিকশিতযৌবনা একটা হা-ঘরের মেয়েকে দেখিয়া তাহার সঙ্গে রসিকতা জুড়িয়াছিল। মেয়েটি—সেই কিশোরী মেয়েটি, যে একদিন পানু মদ খাইবে না শুনিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া হাসিয়াছিল—মেয়েটার নাম রুকণী। রুকণীও তাহার সে রসিকতার উত্তরে সমানে রসিকতা করিয়াছিল, ফলে তরুণ জমাদারটি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারে নাই, ধরিয়াছিল রুকণীর আঁচল। মুহূর্তে আঁচলটা টানিয়া লইয়া রুকণী ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল, এবং বলিয়াও দিয়াছিল সব কথা। জমাদারটি দ্বিধাভরেই অগ্রসর হইতে-ছিল। রুকণী না হইলেও অন্য হা-ঘরের দলের ছলনাময়ী হা-ঘরের মেয়ের সঙ্গে একা নির্জনে দুই-একবার তাহার পরিচয় হইয়াছিল; সেই পরিচয়ের উপরেই ছিল তার ভরসা। কিন্তু পানুর আশ্রয়দাতা গুনীন কথাটা শুনিবামাত্র অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, রুকণীও সঙ্গে গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল পানু। মনে পড়িয়া গেল তাহার গ্রামের সেই জমাদারকে। জমাদারের সঙ্গে দেখা হইল পথে। দেখামাত্রই গুনীন তাহার গালে প্রচণ্ড চড় কষাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে পানুর কি হইল কে জানে—সে চিতাবাঘের মত ঝাঁপ দিয়া পড়িল জমাদারের উপর। কিন্তু বুধন ছাড়াইয়া লইল। জমাদারকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—যাও, ভাগো। নেহি তো জান মার দেগা হামার লিড়্‌কা। অর্থাৎ পানু। জমাদার চলিয়া গেল। রুকণীর সে কি হাসি! সেদিনের মতই গড়াইয়া পড়িয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

রুকণী মেয়েটা দুরন্ত মেয়ে। পানুর চেয়ে বয়সে কিছু বড়। চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়স হইলেও মেয়েটা দেহে শক্তিতে ইহারই মধ্যে বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যেমন চতুর, তেমনি হিংস্র, তেমনি শক্তিশালিনী; গৃহস্থের বাড়ি হইতে ঘটি বাটি চুরি করিবার দক্ষতা তাহার অদ্ভুত; পথে মাঠে ঘাটে ছাগল ভেড়া পাইলে মুহূর্তে সেটার মুখ চাপিয়া ধরিয়া ঘাড়টাকে এমন কৌশল ও শক্তির সঙ্গে মোচড়াইয়া দেয় যে, আক্রান্ত জানোয়ারটা বারেকের জন্যও অস্ফুট চীৎকার করিবার অবসর পায় না। ওই মেয়েটা তাহার এখানকার জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ। এ সম্প্রদায়ের অনেকেই পানুকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখে, কিন্তু রুকণীর মত কেহ নয়। তাহাদের হইতে পৃথক, গ্রাম্যসমাজের এই ছেলেটিকে ওই সন্তানহীন বৃদ্ধ গভীর মমতায় ঘিরিয়া রাখিয়াছে। বৃদ্ধের যাদুবিদ্যাকে সম্প্রদায়ের সকলেই ভয় করে, নতুবা এ সম্প্রদায়ের কেহই পানুকে ভাল চোখে দেখে না। পানু যে তাহাদের সকল খাদ্য খায় না, সে যে তাহাদের ভাষা ভাল বলিতে পারে না, পানু যে আজও পর্যন্ত চুরি করিতে বাহির হয় নাই, ইহার জন্য

তাহারা তাহাকে ঘৃণা করে। শুধু ঘৃণাই নয়, তাহার উপর আক্রোশও পোষণ করে। সামাজিক নিয়ম উহারা মানে না, যে মানে সে তাহাদের কেহ নয়। কিন্তু রুকণীর আক্রোশ যেন সব চেয়ে বেশী। বুধনের ভয়ে প্রত্যক্ষ নির্যাতন কিছু করিতে পারে না, কিন্তু পরোক্ষ নির্যাতন করার চেষ্টার তাহার অন্ত নাই। ঠাট্টা-বিদ্রূপ সে অহরহই করে, মধ্যে মধ্যে কঠিনভাবে অপদস্থ করিয়া নিষ্ঠুর হাসি হাসে। মদের ভাঁড় লইয়া রসিকতাটা তাহার একটা সাধারণ রসিকতা। নিজে মদের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে পানুকে ভাঁড়টা আগাইয়া দিয়া বলে—পিয়ো।

পানুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠে। সে কোন উত্তর দেয় না।

রুকণী আরও খানিকটা কাছে আসিয়া বলে—পিয়ো।

পানু বিরক্তিভরে পিছাইয়া যায়।

রুকণীর হাসি শুরু হয়। হাসিতে হাসিতে পানুর কাছে সে আগাইয়া গিয়া বলে—পিয়ো।

পানু আবার পিছাইয়া যায়, রুকণী সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া আসে। নিদারুণ বিরক্তি এবং ক্রোধ সত্ত্বেও তাহাকে কিছু বলিতে সাহস করে না। দলের সমস্ত লোক তাহার বিপক্ষে; সামান্য অপরাধে হয়তো কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে। যদি খুন করিয়া কোন প্রান্তরের মধ্যে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দেয়, তবেই বা সে কি করিবে! তাহার আশ্রয়দাতা একা গোটা দলটার সমস্ত লোকের সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করিবে?

শেষ পর্যন্ত রুকণী তাহার উচ্ছিষ্ট মদ পানুর গায়ে ঢালিয়া দেয়। পানুর সর্বাঙ্গে পচাই মদের দুর্গন্ধ উঠে। রুকণী হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে।

হা-ঘরের দলের কুকুরগুলার ভীষণ হিংস্র প্রকৃতি; পানুর সঙ্গে তাহাদের পরিচয় এখনও অল্প, অন্তত পানুর দিক হইতে অল্প। কুকুরগুলা তাহাকে চিনিয়াছে, পানুকে দেখিয়া তাহারা গোঙায় না, লেজও নাড়ে; কিন্তু পানু তাহাদের কাছে ঘেঁষে না। রুকণী এবং অন্য হা-ঘরের ছেলেমেয়েরা কুকুরগুলাকে লইয়া খেলা করে। তাহারা ছুটে—কুকুরগুলাও ছুটে, লাফ দিয়া কাঁধে ঘাড়ে ওঠে, খেলাচ্ছলে কামড়াইয়া ধরে, রুকণীরা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া আবার ছুটিয়া যায়। কখনও কখনও কুকুরের খেলার কামড়েও ছেলেমেয়েদের গায়ে রক্ত ঝরে, সে তাহারা গ্রাহ্যও করে না। তাহারাও তাহাদের টুঁটি টিপিয়া ধরে। পানু সভয়ে দূর হইতে দেখে। রুকণী কুকুর লইয়া পানুর পিছনে লেলাইয়া দেয়। পানু প্রথম প্রথম বিব্রত হইত, এখন কিন্তু একটা ডাণ্ডা লইয়া দাঁড়ায়। ডাণ্ডা দেখিয়া কুকুরগুলা রাগিয়া যায়, ক্রুদ্ধ গর্জন করে।

জমাদার ও রুকণী-পর্বের পর, রুকণী উল্লাসে উচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিল। সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে একটা পরম উপভোগ্য কৌতুক। জমাদার তাহার আঁচল ধরিয়াছিল—সেটাও কৌতুক, গুণীন তাহাকে প্রচণ্ড চড় কষাইয়া দিয়াছে—সেটাও কৌতুক। সব চেয়ে বড় কৌতুক পানু জমাদারের ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক তাঁবুতে সে উচ্ছ্বসিত হাসি হাসিয়া ব্যাপারটা বর্ণনা করিয়া বেড়াইল। তারপর হঠাৎ আসিয়া মেয়েটা তাহাকে লইয়া পড়িল।

মদের ভাঁড় লইয়া রুকণী আসিয়া ভাঁড় আগাইয়া দিয়া বলিল—পিয়ো। আজ তো তুম মরদ বন গিয়া, দারু আজ জরুর পিনে হোগা। পিয়ো।

পানু এখন সুস্থ, পূর্বাপেক্ষা অনেক সবল হইয়াছে। সে বলিল—না।

—কেঁও?

—না। নেহি পিয়েগা। পানু প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

পানুর সবল প্রতিবাদে রুকণী আজ একটু আশ্চর্য হইলেও কৌতুকটা তাহার কাছে আরও উপভোগ্য হইয়া উঠিল। যে সাপ ফণা তুলে না, তাহার সঙ্গে খেলা করিয়া মজা নাই। পানুর সবল প্রতিবাদকে অপ্রতিভ উপহাসাস্পদ করিবার উল্লাসে হাসিয়া সে অধীর হইয়া উঠিল। সেও আজ বরাবর যাহা করে তাহা করিল না, মদটা তাহার গায়ে ঢালিয়া দিল না। ভাঁড়টায় চুমুক দিয়া একমুখ মদ টানিয়া লইয়া কুলকুচার মত ফু-ফু করিয়া পানুর মুখে গায়ে ছিটাইয়া ভাসাইয়া দিল। পানুর আর সহ্য হইল না, ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মতই রুকণীর দিকে আগাইয়া গেল। মুহূর্তে রুকণী মদের ভাঁড়টা নামাইয়া রাখিয়া কুস্তীর প্রতিদ্বন্দ্বীর মত বলিল—আও! চলে আও! বলিয়া সে-ই লাফ দিয়া পড়িল পানুর ঘাড়ে। তারপর আরম্ভ হইল প্রচণ্ড বিক্রমে লড়াই। পানু ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া যুঝিতেছিল, তাহার সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতে সে দ্বিধা করিল না, কিন্তু রুকণী পানুর অপেক্ষা বয়সে বড়, সে হা-ঘরের মেয়ে, তাহার শক্তি পানুর অপেক্ষা বেশী; কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পানুকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়া হি-হি করিয়া নিষ্ঠুর হাসি হাসিতে লাগিল। পানুর নড়িবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না, অদ্ভুত কৌশলে পানুর হাত দুইটাকে মাটিতে ফেলিয়া হাত দুইটাকে পায়ে চাপিয়া ধরিয়া রুকণী বুকে বসিল। একটা হা-ঘরে ছেলে পানুর পা দুইটা টানিয়া ধরিল। পানু শুধু রাগে ফুলিতেছিল। চারিপাশে ততক্ষণে হা-ঘরের দলের ছেলেমেয়েগুলা জমিয়া গিয়াছে, তাহারাও হাসিতেছিল নিষ্ঠুর কৌতুকের হাসি। হঠাৎ রুকণী তাহাদের বলিল—দো। দারুকে ভাঁড়। লা—য়ো। জলদি!

একটা ছেলে ভাঁড়টা আগাইয়া দিল।

বোতলের মতই মুখ-সরু মাটির ভাঁড়টা লইয়া রুকণী বলিল—আব পিয়ো।

পানু দাঁতে দাঁত টিপিয়া ধরিল। রুকণী ডান হাতে এবার চাপিয়া ধরিল পানুর গলা; দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বলিল—পি য়ো। বায়ুর ব্যাকুলতায় রুদ্ধশ্বাস পানুর মুখ আপনি হাঁ হইয়া গেল। রুকণী তাহার গলা ছাড়িয়া দিয়া গলগল করিয়া মুখের হাঁয়ের মধ্যে ঢালিয়া দিল মদ। তারপর চাপিয়া ধরিল পানুর নাক। আশ্চর্য চতুরা মেয়ে!

ছয়

মদের দুর্গন্ধ এবং অম্লকটু আস্বাদ' জীবনে প্রথম এমনিভাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াও মদের ক্রিয়ায় সে মত্ত এবং দুর্দান্ত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ গা-বমির কষ্ট হইল, তাহার পর সারা দেহ-মন চনচন করিয়া উঠিল। তাহার ভয় কাটিয়া গেল—সে হাত-পা ছুঁড়িয়া প্রবল আস্ফালনের সঙ্গে রুকণীকে গালি-গালাজ জুড়িয়া দিল। ঢিল ছুঁড়িতে শুরু করিল। তারপর হঠাৎ চীৎকার শুরু করিল। সে চীৎকার অদ্ভুত চীৎকার! সে চীৎকার শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গেল।

রুকণী এবং ছেলেগুলো হি-হি করিয়া হাসিতেছিল। পানুর আশ্রয়দাতা এবং তাহার স্ত্রীও হাসিতেছিল। ছেলেটা আজ মদ খাইয়াছে তাহাদের ভারি আনন্দ। তাহারা এ চীৎকার শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। পানু তখনও চীৎকার করিতেছে। মাথার চুল টানিতেছে। কিন্তু, না, কাঁদিতেছে না তো।

এবার রুকণী কুকুর লইয়া আসিল। পানু চীৎকার বন্ধ করিয়া নিজেদের কুকুরগুলার

সবচেয়ে বলবানটাকে লইয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বসিল। এতক্ষণে বুধন মহা খুশী হইয়া হঠাৎ তাঁবুর ভিতর হইতে তাহার সেই পোষা বুড়া সাপটাকে আনিয়া পানুর গলায় জড়াইয়া দিল। সাপের শীতল স্পর্শে এবং সাপটার নিমেষহীন চাহনি দেখিয়াও নেশার উত্তেজনার শক্তিতেই পানু ভয়ে এমন কিছু করিল না যাহা দেখিয়া রুকণী ও অন্য ছেলেমেয়েগুলা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িতে পারে। পাথরের মূর্তির মত স্থির হইয়া সেও নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সাপটার দিকে চাহিয়া রহিল।

বুধন বলিল—ডর নাই। বিষ নিকাল দিলাম। এই দেখ। বলিয়া সে সাপটার গোটা মাথাটা খপ করিয়া আপনার মুখের মধ্যে পুরিয়া স্তনপান-রত শিশুর মত চকচক করিয়া চুষিতে আরম্ভ করিল।

সেদিন সে আহার করিল বক-রাক্ষসের মত। ঘুমাইল কুম্ভকর্ণের মত। পরদিন সকালে উঠিয়া মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করিতেছিল, গত সন্ধ্যার ঘটনাগুলা কেমন ঝাপসা মনে হইল। তবুও আপন শৌর্যে বেশ খানিকটা অহঙ্কার অনুভব করিল। অনুশোচনা তাহার হইল না; বিগত জীবনের প্রতি মমতা তাহার ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া জমাদারকে প্রহার করিয়া এ জীবনের প্রতি আসক্তি যেন বাড়িয়া গিয়াছে। রুকণী বাহির হইয়া যাইতেছিল গ্রামে ভিক্ষা করিবার জন্য—তাহাদের বেসাতী বিক্রয়ের জন্য। বেসাতী তাহাদের মাটির ঝুমঝুমি; বল্কলতা দিয়া বোনা অত্যন্ত ছোট বাটির আকারের টুকরী; কিছু পথে প্রান্তরে কুড়াইয়া সংগ্রহ করা কালো-লাল মসৃণ উপলখণ্ড—বিষপাথর এবং রক্তপাথর বলিয়া বিক্রী করে। গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া প্রথমেই হাঁকে—এগে খোখার মা, ঝুমঝুমি লে-বি? এগে খোখার মা!

ক্রমে বাহির করে লতার টুকরি, তারপর পাথর। শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় দিবার জন্য কখনও কখনও ছুরি দিয়া নিজের হাত খানিকটা কাটিয়া ধুলামাখা রক্তপাথরটাকে এমন জোরে টিপিয়া ধরে যে, সামান্য ক্ষতমুখের রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। বিষপাথর দেখাইয়া বলে—সাঁপ কাটে, বিচ্ছু কাটে, পাথর লাগা, বিষ খা লেবে। তারপর বলে—লেবি? লৈবি? লে। লে।

প্রত্যাখ্যান করিলে স্থান পাত্র বুঝিয়া জবরদস্তি করে, আবার ঝোলাঝামটা গুটাইয়া পলাইয়াও আসে। রুকণী ভিক্ষায় বাহির হইতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়া মুখ ভেঙাইয়া দিয়াও হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে পানুও দাঁত বাহির করিয়া মুখ ভেঙাইয়া হাসিল। আজ আর রুকণীর ভেঙানোর মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ নাই। সে হাসিয়াছে।

রুকণী আগাইয়া আসিল। বলিল—গাঁওমে যাবি? হামরা সাথ?

পানু চুপ করিয়া রহিল।

রুকণী বলিল—বকরী মিলেগা তো মারেগা, আও। গোস খায়েগা রাতমে। আও।

পানু বলিল—নেই। নেই যায়েগা।

রুকণী আবার ঘৃণাভরে বলিল—ডরফোকনা! অর্থাৎ ভীরু, কাপুরুষ! বলিয়া সে ঘাঘরা দোলাইয়া প্রায় একপাক নাচিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পানু অপমানে রাগে ফুলিতেছিল। কিছুক্ষণ পর তাহার নজরে পড়িল দূরে ধানক্ষেতের ধারে সাদা রঙের চতুষ্পদ কি একটা জানোয়ার ঘাস খাইয়া ফিরিতেছে। কিছুদূর সে আগাইয়া গেল। এবার স্পষ্ট বুঝিতে পারিল—জানোয়ারটা একটা ছাগল। রুকণীর 'ভীরু কাপুরুষ' গালটা তাহার কানে তখনও বাজিতেছিল—মনটা রি-রি করিতেছিল; সে ওই অপবাদ

খণ্ডনের জন্যই চুপিচুপি আগাইয়া গেল জানোয়ারটার পিছন দিকে। কাছে আসিয়া হঠাৎ ছাগলটার উপর লাফাইয়া পড়িল শিকারী চিতার মত। ছাগলটা একটা ভয়ার্ত চীৎকার করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে পান্নু তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া সবলে ঘাড়টা পাক দিয়া মোচড়াইয়া দিল। এমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে কাজটা সম্পন্ন করিল যে মরা ছাগলটার মুখটা ছাড়িয়া দিতেই মৃত পশুটার কণ্ঠনালীতে অবরুদ্ধ খানিকটা স্বর মুখ দিয়া শব্দ করিয়া বাহির হইয়া গেল। পান্নু চারিদিক দেখিয়া সেটাকে ঘাড়ে ফেলিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া তাঁবুতে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

রুকণীর জন্য সে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল। রুকণী যখন ফিরিল, তখন সে পথের উপরে দাঁড়াইয়া ছিল। রুকণী আজ শুধু-হাতে ফিরিতেছিল। পান্নু বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, না, রুকণীর কাঁধের কাপড়টা এতটুকু ফুলিয়া ফাঁপিয়া নাই। অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিল। ব্যঙ্গ-ভরে হাসিয়া ভ্রূ নাচাইয়া প্রশ্ন করিল—কাঁহা?

শ্রান্ত রুকণী তাহার ওই ভ্রূ নাচাইয়া ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ প্রশ্নে অত্যন্ত চটিয়া উঠিল। প্রশ্নটাও সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। রুক্ষস্বরে বলিল—কেয়া?

—বকরী?

রুকণী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া গভীর তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যঙ্গের সঙ্গে আস্তে আস্তে শুধু বলিল—ড়-র-ফো-ক-না! বলিয়াই সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু পান্নু খপ করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আও।

উগ্র ক্ষিপ্রগতিতে রুকণী উদ্যত-ফণা সাপিনীর মত ঘাড় ফিরাইয়া দাঁড়াইল, বলিল—কাঁহা?

পান্নু হাসিয়া বলিল—আও, দেখো।

—কেয়া?

—বকরী। বকরী।

—বকরী?

—হাঁ, হাঁ। আও, দেখো।

এবার রুকণীর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল চঞ্চল কৌতূহল, ব্যগ্র মৃদু কণ্ঠস্বরে বলিল—দেঁখে, দেঁখে?

—আও।

তাঁবুর মধ্যে মরা ছাগলটাকে দেখিয়া হা-ঘরেণীর চোখ দুটা ঝকমক করিয়া উঠিল, তাহার মাংসলোভী মন লোলুপতায় ভরিয়া গেল। ঝকমকে দৃষ্টিভরা চোখে সে প্রশ্ন করিল—তুম? তুম শিকার কিয়া?

—হাঁ। পান্নু বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল—হাম। হাঁ। শেষে নিজের বুকেই সে একটা চাপড় মারিল।

হা-ঘরেণী দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, যাইবার সময় বলিল—আতা। আভি।

মিনিট কয়েক পরেই সে ফিরিল, তার এক হাতে মদের ভাঁড় অন্য হাতে ছুরি। পান্নুর দিকে সে ভাঁড়টা অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল—পিয়ো।

এখন কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে আর ব্যঙ্গ-শ্লেষ নাই।

গত রাত্রের নেশায় উত্তেজনাময় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মদের আস্বাদ এবং গন্ধের জন্য পান্নুর মদের প্রতি এতটুকু আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু তবুও সে মদের ভাঁড়টা রুকণীর হাত হইতে তৎক্ষণাৎ টানিয়া লইল, কোনমতেই সে তাহার সদ্য-অর্জিত শৌর্যের সম্মানকে আহত হইতে

দিবে না। দম বন্ধ করিয়া সে ভাঁড়ে চুমুক দিল।

রুকণী বলিল—আওর পিয়ো।

সে আবার চুমুক দিল। এবার রুকণীকে ভাঁড়টা দিয়া সে বলিল—তুম পিয়ো।

রুকণী মদ্যপান করিল—দুর্লভ বস্তুর মত, পরম তৃপ্তির সহিত। তারপর ছাগলটাকে টানিয়া লইয়া হাতের ছুরিটা দিয়া চামড়া ছাড়াইতে বসিল। পানুকে বলিল—পাকড়ো।

বুক ফুলাইয়া পানু ছাগলটাকে এক দিকে টানিয়া ধরিল। রুকণী তাহার সঙ্গে আজ সহকর্মীর মত ব্যবহার করিয়াছে—এই অহঙ্কারে সে চরম খুশি হইয়া উঠিয়াছে। মদের নেশাতেও মাথাটা বেশ চনচন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সেদিন রাত্রে বুধনের তাঁবুর সামনে মদের আসর বসিল। বুধন ও তাহার স্ত্রী প্রচুর মদ্যপান করিয়া নাচিয়া গাহিয়া হুল্লোড় লাগাইয়া দিল। রুকণীও নাচিল, তাহার পায়ের পিতলের নূপুরের ক্ষিপ্র হইতে ক্ষিপ্রতর শব্দের সঙ্গে বাজনদারটা শেষ পর্যন্ত তাল রাখিতে পারিল না। তাল কাটিতেই রুকণী বাজনদারটার মাথায় তাহার পাতলা হাতে বাজনা বাজাইয়া দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া হাসিয়া সারা হইয়া গেল।

* * *

দেখিতে দেখিতে বৎসর দুয়েক কাটিয়া গেল। তের-চোদ্দ বৎসরের পানু পনের-ষোল বৎসরের হইয়া উঠিল। তাহার মুখের চেহারার বদল হইল, মাথায় বাড়িয়া উঠিল উর্বর ভূমির বুনো গাছের মত। মুখ ভরিয়া দেখা দিল ফিন্‌ফিনে গোঁফ-দাঁড়ি। পিঠের সেই বেতের দাগগুলা ছাড়া পানুর পূর্ব-জীবনের সকল পরিচয়-চিহ্নই বিলুপ্ত হইয়া গেল। মদে তাহার এখন প্রবল আসক্তি। এক গরুর মাংস ছাড়া আর কোন মাংসেই তাহার অরুচি হয় না। গরুর মাংসটা সে এখনও খাইতে পারে না। নাম শুনিলে ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠে। এখন সে শিকারে যায়, সাপ ধরিতে পারে। বাঁশের খুঁটার মাথায় লম্বা দড়ি টাঙাইয়া—বাঁশ হাতে তাহার উপর নাচিয়া গ্রামে গ্রামে খেলা দেখায়। গ্রামের লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া দাঙ্গাও করে। কেবল গরুর মাংস খাইতে না পারার মত পারে না চুরি করিতে। মনে পড়িয়া যায় সেই জমাদারের কথা, দারোগার কথা, তার বাপের মুখ, মায়ের কান্না, দিদি চারুর সেই বিহ্বল চেহারা। খুন করিলে ফাঁসী হয়, চুরি ডাকাতিতেও জেল হয়। ওই দুইটা অপরাধের কায়দায় পাইলে পুলিসের চেহারা—সেই চেহারা। নহিলে পুলিসকে কিসের ভয়? তাহার মনে পড়ে, জমাদারের গালে বুধনের হাতের সেই প্রচণ্ড চড়ের কথা, নিজের ঝাঁপাইয়া পড়ার কথা। সে কামনা করে, এমনি অপরাধে অপরাধী অবস্থায় সেই জমাদারটাকে একবার পায় সে! আপন মনেই সে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া হিংস্র ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। টুঁটিটা সে ছিঁড়িয়া দেয় তাহা হইলে।

মধ্যে মধ্যে মা-বাপ-দাদা-দিদিকে মনে পড়ে। এ মনে পড়া জমাদার বা পুলিস প্রসঙ্গে মনে পড়া হইতে স্বতন্ত্র। গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়া কোন বাড়িতে তাহাদের বাড়ির সঙ্গে কোন সাদৃশ্য দেখিলে, অথবা কাহারও মুখের সহিত আপনজনের মুখের আদল দেখিলে তাহার এ ধারার স্মৃতি জাগিয়া উঠে। বিশেষ করিয়া কোন সুন্দরী তরুণীকে দেখিলে তার মনে পড়ে দিদি চারুকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া যায় বাড়ির কথা। এই ধারার মনে পড়ার আরও একটা ভিন্ন রূপ আছে। গ্রামে গিয়া ঢাকের বাজনা শুনিয়া তাহার মন চঞ্চল হয়, সে সমস্ত গ্রামখানা খুঁজিয়া দেখে, কোথায় কোন্ ঠাকুরের পূজা হইতেছে। সেদিন তার মনে পড়ে বন্ধুদের কথা, গ্রামের লোকের কথা, বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপের কথা; মনে পড়ে প্রতিমা-গঠনকারী

কারীগরদের, বলিদানের ছেত্তাদারকে, পালকের প্রকাণ্ড ফুলওয়ালা ঢাক কাঁধে শ্রীমন্ত বায়েনকে ; মনে পড়ে বলিদানের সময়ের জনতার মত্ততা, মনে পড়ে বিসর্জনের সমারোহ, আলো, বাজনা, রাত্রির আকাশে ছুটন্ত এবং জ্বলন্ত হাউই বাজি, বিসর্জনের দীঘি, দীঘির পাশে হাটতলা, হাটতলার কাছে স্কুলের খেলার মাঠ, খেলার মাঠের পরে সবুজ মাঠ, মাঠের ওপারে আবার গ্রাম। সেদিন সে উদাস হইয়া থাকে।

রুকণী সেদিন তাহার কাছে আসিয়া সামান্য কয়েকটা কথা বলিয়াই অকস্মাৎ চলিয়া যায়, আবার আসে—আবার চলিয়া যায়, শেষ পর্যন্ত পানুর সঙ্গে দুর্দান্ত কলহ জুড়িয়া দেয়। এখন আর সে তাহার সঙ্গে মারামারি করিতে আসে না। পানু এখন তাহার চেয়ে মাথায় অন্তত ছয়-সাত আঙুল বড় হইয়া উঠিয়াছে, হৃষ্টপুষ্টতায়ও সে রুকণীর চেয়ে অনেক হৃষ্ট-পুষ্ট। রুকণী এখন বরং আগের চেয়ে শীর্ণ হইয়াছে, আগের সেই গোলগাল মোটাসোটা চেহারার মেয়েটি নয়। এখন খানিকটা লম্বা দেখায়, তাহার ঝাঁকড়া চুলগুলি বেশ খানিকটা লম্বা হইয়াছে, সেই মোটা গাল দুইটা ঝড়িয়া গিয়াছে, থাঁদা নাকটা খানিকটা টিকলো হইয়াছে, গলার আওয়াজও তাহার এখন আর এক রকম হইয়াছে। একটা যেন সুর আসিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত পানু উদাস হইয়া থাকে ততক্ষণ আর রুকণীরও স্বস্তি থাকে না, পানুকে সে স্বস্তি দেয় না। ঝগড়া করিয়া কখনও বা কাঁদিয়া চলিয়া যায়, আবার আসে—আবার আসে—আবার আসে। শেষ পর্যন্ত পানুও অতীত কথা ভুলিয়া রুকণীর সঙ্গে ঝগড়ায় মাতিয়া উঠে। রুকণী নিজের কুকুর আনিয়া পানুর কুকুরের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া দেয় ; কখনও বা নিজেই লাঠি দিয়া পেটে। মোট কথা পানুর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা হয় না।

এই মেয়েটা যেন তাহাকে গভীর আকর্ষণে টানিয়া অতীত কালের জীবন—জীবন-স্মৃতি হইতে লইয়া চলিয়াছে তাহাদের এই জীবনে। অরণ্য-প্রান্তরের বুকে একান্তে সমগ্র সভ্য-সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা ধ্যান-ধারণাকে বর্জন করা বিচিত্র সমাজ। তাহাদের মস্তিষ্ক গ্রহণ করিতে পারে কি পারে না—কে জানে! হয় তো পারে—অন্তত কিছুটা পারে, কিন্তু তাহাদের যেন শপথ আছে কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। উন্মত্ত আনন্দে উল্লাসের স্বাদে বিভোর হইয়া কত যুগ পশ্চাতের অরণ্য জীবন, যাযাবর সভ্যতা। পানু বিংশ শতাব্দীতে জন্মিয়া—কত সহস্র শতাব্দী অতীত কালের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে ; ভুলিয়া যাইতেছে—শত শত শতাব্দীর সাধনায় পরিশ্রুত রক্ত তাহার ক্রমশ গাঢ় হইয়া সে সাধনার ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। নদী যেন উজানে ফিরিয়া অরণ্য উপত্যকায় ফিরিয়া চলিয়াছে। সমুদ্র-সঙ্গমে আর যাইবে না।

কিছু দিন পর।

হঠাৎ সেদিন তাহার জীবনে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তাহার জীবনে সে যেন একটা ভূমিকম্পের মত ঘটনা। সে কম্পনে তাহার মনের অতীত জীবনের পুরাতন অধ্যায়গুলি প্রাচীন জীর্ণ কুটিরশ্রেণীর মত ধ্বসিয়া পড়িয়া গেল।

রুকণীর সঙ্গে সেদিন তাহার প্রচণ্ড ঝগড়া বাধিয়া গেল।

সেই ঝগড়ায় তাহার জীবনের অতীত যেটুকু গোপন অন্তস্তলে লুকাইয়া বাঁচিয়াছিল, একটা ধ্বস নামিয়া সেটুকুও বুঝি শেষ হইয়া গেল।

দুপহর বেলায় রুকণী একটা গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। সঙ্গে ছিল পানু। বোধ হয় সেটা চৈত্র মাস। গরমের আমেজ, বাতাসে ধুলা এবং অশোক ও লাল কাঞ্চনের ফুল দেখিয়া পানুর মনে হইল মাসটা চৈত্রের শেষ বা বৈশাখের প্রথম। গৃহস্থ-বাড়িতে লোকজনেরা ঘুম শুরু করিয়াছে। হা-ঘরেদের পক্ষে সময়টা ভারি সুবিধার। জনবিরল বাড়িতে দরজা খোলা

পাইলে যাহা সম্মুখে পড়িবে তাহা লইয়াই সরিয়া পড়িতে পারা যাইবে। অবশ্য পান্নু রুকণীকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছে যে, চুরি সে করিতে পারিবে না।

রুকণী হাঁকিতেছিল—এ খোকার মা, ঝুমঝুমি লেবি ?

পান্নু হাঁকিতেছিল—বিষ পাথল। খুন পাথল! লে—লে—লে। বিষ পাথল। সাঁপে কাটে, বিচ্ছু কাটে, খুন গিরে, সব আরাম হো যায়গা।

একটি সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির দরজা খুলিয়া একটা ঝি ডাকিল—এই, শোন্।

—ঝুমঝুম লেবি ? টুকরী লেবি ?

—না। শোন্। তোরা কাঁউরের বিদ্যে জানিস ?

রুকণী সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—হাঁ, হাঁ, জানি কামিচ্ছা-মায়ীকি জয়! জয়।

—আমাদের বউয়ের ছেলে হয়ে বাঁচে না ; মাদুলী আছে তোদের ?

—হাঁ। জড়ী আছে, ভূত-পিশাচ ভাগ যায়।

—না না। জড়ী ওষুধ তোদের খাবে কে ? মাদুলী আছে ? মন্তর-তন্তর জানিস ?

—হাঁ হাঁ, খানে নেই হোগা। জড়ী বেঁধে লিবি হাঁতমে। লাল ডুরিসে বাঁধবি।

—বেঁধে রাখলেই হবে ?

—হাঁ। জরুর হোবে, কামিচ্ছা-মায়িকী দয়াসে।

—আয়, তবে আয়। কিন্তু চেঁচামেচি করিস নে বাপু, বাবুরা কি গিন্নীরা উঠলে মুশকিল হবে।

—হাঁ হাঁ। চল্।

একটি সুন্দরী বধূ। বিষণ্ণ মুখ, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে, ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ পান্নুর মনে পড়িয়া গেল দিদি চারুকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, রুকণী ইহাকে প্রতারণা করিবে। তাহার মন চঞ্চল ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, কি করিয়া মেয়েটিকে বুঝানো যায়—তামাম ঝুট, সব মিথ্যা।

এদিকে রুকণী তখন তাহার কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। মেয়েটির হাত দেখিয়া, তাহার চুল শুঁকিয়া, তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বলিল—এক পিচাশ ভর করেছে, সেই তোর ছেলে মেরে দেয়।

ঝি এবং বধূটি দুইজনেই শিহরিয়া উঠিল। রুকণী বলিল—ইসকে বাদ তোকে সুদ্ধ মারবে পিচাশ! শরীরের রক্ত চুষে নেবে, এই এমনি কাঠির মত হয়ে যাবি, সাদা প্যাঙাশ রঙ, তারপর একরোজ পিচাশ তোর ঘাড়টাও মট করে ভেঙে দেবে।

ঝি বলিল—তুই মাদুলী দিবি বললি, তাতে পিচাশ যাবে ?

—আলবৎ। তবে মাদুলী দেবার আগে ওকে ঝাড়তে হবে। মন্তর—মন্তর! একঠো কাপড়া আন্।

—কাপড়া! কাপড়া-ফাপড়া নয়। মাদুলী দিবি, কি নিবি তাই বল ?

—ডরো মৎ। কাপড়া নেবে না হামি। সব তোমাদেরই থাকবে ; তবে চাই।

—দেখিস ?

—হাঁ হাঁ। দেখবে। কাপড়া আন্। আওর 'চাউল' আন্ 'পান' সের।

—পাঁচ সের ? চাল কি হবে ?

—মন্তর। মন্তর। হামি মন্তর দেবে। ওই চাউল খাবি। পিচাশ ভাগ যায়গা।

চাল-কাপড় আসিল। ওদিকে পান্নু ক্রমশ অধীর হইয়া উঠিল। ঝিটা দেখিয়া শুনিয়া

একখানা পুরানো কাপড় আনিল। রুকণী কিন্তু তাহার অপেক্ষা অনেক হুঁশিয়ার, সে বলিল —রাখ্।

তারপর বিড়-বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া, একটা শিকড় মাথা হইতে পা পর্যন্ত বুলাইয়া দিয়া বলিল—পাকড়ো। বধূটি শিকড়টি লইল। রুকণী বলিল—আর কাপড়টা বদল কর। মন্তর। মন্তর। যেটা তুই প'রে আছিস, ওটা বদল কর্। ওটাতে এখনও পিচাশের বাতাস লেগে আছে। কর—বদল কর।

বধূটি জীর্ণ কাপড়খানা পরিয়া পরনের নূতন কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিল।

রুকণী কাপড়খানার উপর চালগুলাকে তুলিতে আরম্ভ করিল। ঝিটা শঙ্কিত হইয়া বলিল —মন্তর! মন্তর! মন্তর দেগা?

চাল তুলিয়া বধূটির দিকে চাহিয়া রুকণী বলিল—একটুকরা সোনে—সোনে দে ইসকা উপর।

—সোনা? না। কাজ নাই আমাদের ঝাড়িয়ে।

—দেও। দেও।

—না।

—নেই দেগা?

—না। চালাকি করবি তো লোক ডাকব।

সঙ্গে সঙ্গে রুকণী চোখ দুইটা বড় এবং স্থির করিয়া বলিল—আব কামিচ্ছা-মায়ীর গোসা হো গেয়া। আঁ—আঁ—আঁ! বলিয়া সে ভয়ঙ্করীর মত তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল। পানু দেখিল, ঝি ও বধূটি ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। চীৎকার করিবার মত সামর্থ্যও তাহাদের নাই। এইবার রুকণী গিয়া কাছে দাঁড়াইয়া মাথার চুলগুলো মুখের উপর ফেলিয়া আঁ-আঁ করিয়া যেই বলিবে—দো সোনে দো, অমনি উহারা কিছু একটা সোনার গহনা ফেলিয়া দিবে। পানু জানে। তাহার আর সহ্য হইল না। সে লাফাইয়া গিয়া রুকণীর হাত ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া বলিল—খবরদার!

রুকণী তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই সমস্ত বুঝিল, কিন্তু তবু শেষ চেষ্টা করিল। বলিল—সোনে দেনে কহো। সোনে—সোনে। নেহি তো কামিচ্ছা-মায়ী নেই শুনেগা।

—খবরদার! চলে আও। আও। পানু আবার ঝাঁকি দিয়া তাহাকে টানিল।

এবার রুকণী আর চেষ্টা না করিয়া একসঙ্গে বাঁধা চাল ও কাপড় কাঁধে তুলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিল। পানু তখনও তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল।

গ্রাম পার হইয়া একটা জঙ্গল, সেইখানে তাহাদের ঝগড়া আরম্ভ হইল। গ্রামের পথে রুকণী কিছু বলিতে সাহস করে নাই। রুকণী এবার বলিল—কাহে, কাহে? কেন তুই এমন করলি? ছোড় দে হামকো।

পানুর মুখে তখনও সেই বুলি—খবরদার!

রুকণী বলিল—শয়তান—বেইমান!

—খবরদার!

রুকণী তাহার হাতে একটা কামড় বসাইয়া দিল। পানু তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া অন্য হাতে চোয়ালের কশ দুইটা চাপিয়া ধরিল নির্মমভাবে। যন্ত্রণায় রুকণীও কামড় ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, পরক্ষণেই সে তাহার বোঝা এবং চাল-বাঁধা কাপড়টা ফেলিয়া দিয়া পানুর উপর লাফাইয়া পড়িল। দুইজনে ক্রুদ্ধ আক্রোশে পরস্পরকে নির্মমভাবে আক্রমণ করিল। রুকণীর

নখের আঁচড়ে পান্নুর বুক-হাত ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল ; পান্নু তাহার চুল ছিঁড়িয়া দিল, প্রচণ্ড আক্রমণে সে তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। পান্নু এখন রুকণী অপেক্ষা অনেক সবল। চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে টানিয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া পান্নু রুকণীর বুকে চাপিয়া বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। রুকণী তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। পান্নু হিংস্র আক্রোশে ব্যঙ্গভরে হাসিতেছিল। সহসা সে দেখিল, রুকণীর দৃষ্টি বদলাইয়া আসিতেছে। অদ্ভুত সে দৃষ্টি ! সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিচিত্র মদির হাসি। পান্নুর বুকের মধ্যে জাগিয়া উঠিল এক প্রচণ্ড আবেগ। রুকণী দুই হাত বাড়াইয়া পান্নুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখটা টানিয়া আনিল আপনার মুখের উপর, প্রচণ্ড আবেগে পান্নুর মুখটা চুমায় চুমায় ভরিয়া দিল। উষ্ণ নিশ্বাসে চুম্বনে পান্নুর শরীরে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

সাত

সব শেষ হইয়া গেল। সব ভুলিয়া গেল পান্নু। তাহার পূর্বপুরুষেরা অন্ধকার নরকে ডুবিয়া গেল। পুরাণে আছে জরৎকারু মুনি একদা অন্ধকার গহ্বরে তাঁহার পূর্বপুরুষদের এক গোছা ঘাসের শিকড় ধরিয়া ঝুলিতে দেখিয়াছিলেন। সে শিকড়ও আবার একটা ইঁদুর কাটিতেছিল ; কাটিলেই ওই বিস্মৃতির অন্ধকূপে পড়িবার কথা। পান্নুর পূর্বপুরুষ সেই অন্ধকূপে পড়িয়া গেল বোধ হয়। রুকণীকে লইয়া পান্নু উন্মত্ত হইয়া সব অতীত ভুলিয়া একেবারে উহাদের একজন বনিয়া গেল।

রুকণীর সাহচর্য তাহার জীবনের অক্ষয় স্মৃতি। সমস্ত পৃথিবী তাহার কাছে পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিল। সে সব ভুলিয়া গেল ; অতীত জীবনের কথা দিনান্তে তাহার একবারের জন্যও মনে হইত না। ধীরে ধীরে সে উপলব্ধি করিল, পেট পুরিয়া আহার—বিশেষ করিয়া পশুমাংস আহার তাহার সঙ্গে মদ্যপানজনিত সুগভীর উত্তেজনার বিহ্বলতা আর ওই রুকণীর উন্মত্ত সাহচর্য, এই হইল পরম সুখ। এ সুখ উপভোগের জন্য চাই দুর্দান্ত সাহস এবং প্রচণ্ড শক্তি। ও দুইটা না থাকিলে পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া যায় না। পাইবার অধিকারও নাই কাহারও। উপলব্ধিটা অবশ্য জন্মিল ক্রমশ—অভিজ্ঞতা হইতে।

পূর্বেই রুকণীর একজনের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহ নামক প্রথাটা ইহাদের আছে, অতি সামান্য কিছু অনুষ্ঠানও আছে। উহাদের গুণীন বিবাহের স্থান নির্দেশ করে, অর্থাৎ প্রান্তরে পথে বনে চলিতে চলিতে একটা দেবতাশ্রিত স্থান সে আবিষ্কার করে। পাহাড়ের কোন অন্ধকার গুহা-মুখ, বনের মধ্যে প্রকাণ্ড কোন বনস্পতির তলদেশ অথবা ধূ-ধূ করা প্রান্তরের মধ্যে কোন এক শিলাস্তূপের পাদদেশ, সেইখানে দেবতার দরবারে বিবাহ হয়। গুণীন প্রধান ব্যক্তি। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদও হয়, অতি অল্প কারণেই হয়। তিনবার, চারবার, পাঁচবার—কতবার হয় তার স্থিরতা নাই। তবে প্রতিবারই বিচ্ছেদের সময় খানিকটা রক্তারক্তি হইয়া যায়, কখনও কখনও খুনও হয়, সে খুনের কথা পুলিসের খাতায় উঠে না ; সে ক্ষেত্রে মৃতদেহটা তাহারা জ্বালাইয়া দেয়। বিচার করে দলপতি, সাজা হয়। বৃদ্ধবয়সের বিবাহই ইহাদের বিবাহ, সে বিবাহে আর বিচ্ছেদ ঘটে না। কিন্তু রুকণী তরুণী। রুকণীর স্বামী তরুণ নয়, বয়স্ক জোয়ান। লোকটি এই হা-ঘরের মধ্যে সম্পন্ন ব্যক্তি, বয়সে রুকণীর সঙ্গে তাহার ব্যবধান খানিকটা বেশী। লোকটির সম্পন্নতার কারণ, তাহার চুরিবিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা।

লোকটি শক্তিতে খুব সবল নয়, বয়সও চল্লিশের ওপারে ; কিন্তু দীর্ঘদেহ ব্যক্তিটি সিঁধ কাটিয়া চুরি করিতে শৃগালের চেয়েও চতুর। রাত্রে বাহির হইয়া সে কখনও রিক্ত হস্তে ফেরে না। আর পারে ছুটিতে। লম্বা লম্বা পায়ে ঈষৎ হেঁট হইয়া সে ছোটে খরগোশের মত। মধ্যে মধ্যে এক-একটা লাফ দিয়া একেবারে পাঁচ-সাত হাত ডিঙাইয়া চলিয়া যায়। ইহার পূর্বে তাহার তিনটা বিবাহ হইয়া গিয়াছে, রুকণী তাহার চতুর্থতমা স্ত্রী। পূর্বের তিনটার মধ্যে দুইটার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়াছে, একটা—সেটা তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রী—সতীন সত্ত্বেও ঘর করিতেছে। রুকণীকে প্রৌঢ় টাকা দিয়া কিনিয়াছিল। রুকণীর বাপের জেল হইলে সে-ই রুকণীর মা ও রুকণীর ভরণ-পোষণ চালাইয়াছিল।

ওই সতীনটাই স্বামীকে রুকণীর সঙ্গে পানুর গোপন সম্বন্ধের সংবাদ দিল। গভীর রাত্রে রুকণী তাঁবু হইতে বাহির হইয়া যায়।

ওদিকে পানু অশ্রান্ত পদক্ষেপে নির্দিষ্ট স্থান হইতে রুকণীদের তাঁবুর প্রান্ত পর্যন্ত কুকুরগুলার দৃষ্টি বাঁচাইয়া আনাগোনা করে।

ওই মেয়েটা একদিন ব্যাপারটা দেখিয়া ফেলিল। রুকণীর নির্যাতনে তাহার পরম আনন্দ। সে একদিন স্বামীকে জাগাইয়া সব দেখাইয়া দিল। স্বামীর সে কি গভীর ঘুম! কিছুতেই ভাঙে না। মায়াবিনী রুকণী পানুর মারফতে বুধনের কাছ হইতে ঘুমের ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছিল, নিত্য স্বামীকে আহার্যের সঙ্গে খাওয়াইত। ভুল হইয়াছিল, সতীনকে খাওয়ায় নাই। রুকণীর সতীন স্বামীকে অনেক ঠেলিয়া খোঁচা দিয়া জাগাইয়া দেখাইল, রুকণী নাই। দুইজনে বাহির হইয়াও রুকণীকে পাইল না। অগত্যা অপেক্ষা করিয়া রহিল। রুকণী ফিরিতেই লোকটা খপ করিয়া তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিল। নলীর দুই পাশে নখ দিয়া টিপিয়া ধরিয়াছিল—অল্প সময়ের মধ্যেই রুকণীর জীবন শেষ হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু ব্যাপারটা পানুও দেখিয়াছিল। সে রুকণীকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছিল। ছুটিয়া আসিয়া পানু লোকটার চোয়ালে বসাইয়া দিল প্রচণ্ড এক ঘুষি!

তারপর আরম্ভ হইল দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ।

পানুর বয়স কচি, এখনও শক্তি পরিপক্ব সামর্থ্যে জমাট বাঁধিয়া উঠে নাই। পানু প্রচণ্ড মার খাইল। কিন্তু তবু হার মানিল না।

আবার একদিন দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হইয়া গেল। সেদিন বুধন না থাকিলে লোকটা পানুকে শেষ করিয়া দিত। সর্দার বিচার করিয়া সাজা দিল রুকণীকে একা। অন্যায় তো রুকণীর। তাহাদের বিচারে অন্যায় নারীর—এদিকে অন্যায় পুরুষের নাই। শাস্তি অনুযায়ী একটা খুঁটি পুঁতিয়া সেই খুঁটির সঙ্গে রুকণীকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া প্রহার করা হইল। রুকণীর পিঠ কাটিয়া দড়ির দাগ বসিয়া গেল!

পানু উন্মাদ হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িয়া গেল নিজের পিঠের দাগগুলার কথা, সেদিনের সেই যন্ত্রণার কথা। সারাটা দিন সে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়া সারা হইল। বুধন এবং তাহার স্ত্রী তাহাকে অনেক বুঝাইল, অন্য একটি কিশোরী মেয়েকে আনিয়া দেখাইয়া বলিল—ইহাকেই তুমি সাদি কর। আজই সাদির ব্যবস্থা করিব। কিন্তু পানু শুনিল না।

সেই দিনই গভীর রাত্রে সে ছুরি লইয়া বাহির হইল। বুকে হাঁটিয়া তাঁবু কাটিয়া রুকণীদের তাঁবুতে প্রবেশ করিল, তারপর চাপিয়া বসিল রুকণীর স্বামীর বুকে।

রুকণীর স্বামী জাগিয়া উঠিল কিন্তু তখন তাহার নিরুপায় অবস্থা।

পানু ছুরিখানা লইয়া নিষ্ঠুর আনন্দে ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া লোকটাকে সে হত্যা

করিবে! একেবারে বুকে বসাইয়া দিবে? অথবা গলার নলিটা কাটিয়া দিবে, যেমন করিয়া তাহারা পশুর নলিটা সর্বাগ্রে কাটিয়া দেয়! হঠাৎ তাহার নাকু দত্তের কথা মনে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্দান্ত আবেগ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তাহার সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ সে চীৎকার করিয়া উঠিল—সেই বিস্ময়কর চীৎকার। নিজের চুল টানিল, তারপর ধীরে ধীরে লোকটাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—আমাকে তুই খুন করে ফেল।

লোকটা আশ্চর্য হইয়া গেল। সেও পান্নুকে কিছু বলিল না। নিজে আসিয়া রুকণীর বাঁধন খুলিয়া দিয়া বলিল—যা, নিয়ে যা তুই।

রুকণীকে লইয়া সে পৃথক করিয়া ঘর-সংসার পাতিল। ঘর-সংসার মানে ছেঁড়া একটা তাঁবু, পুরু লম্বা একখানা চট। দুইটা বাঁশের খুঁটির মাথায় আর একটা লম্বা বাঁশ বাঁধিয়া তাহার উপর চটখানা ফেলিয়া চটটার দুই দিকে কয়েকটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া দেয়। চটখানা এবং ঘর-সংসারের সব সামগ্রীই তাহাকে দিল বুধন ও তাহার স্ত্রী। সংসার শুরু করিতে গিয়া পান্নুর অতীত জীবন মনে পড়িল। সে জীবনের ঘরের শৃঙ্খলা, রুচি, পরিচ্ছন্নতা—অনেক কিছু মনে পড়িল, সেগুলি কাজেও আসিল। গোটা বেদে পাড়াটা অবাক হইয়া গেল।

রুকণী যে রুকণী, সেও বলিল—তাহার মত আদমী সে দেখে নাই। দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া পান্নুকে সমাদর করিয়া ঝুলিতে আরম্ভ করিল। বলিল—দেখিস তুই, রুকণী তোর সঙ্গে কখনও বেইমানী করবে না। তাহার ঘাড়টি নাড়িয়া এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত মাথাটি নাড়িয়া বলিল—ক—ভি—না।

পান্নু গলিয়া গেল।

সে দিন সে কাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া একটা বনস্পতিতুল্য শিমুল গাছে চড়িয়া এক আঁচল টকটকে রাঙা শিমুলফুল পাড়িয়া আনিয়া গুচ্ছ বাঁধিয়া রুকণীর খোঁপায় পরাইয়া দিল। কালো মেয়ের মাথায় রুক্ষ কালো চুলে এক গুচ্ছ রক্তরাঙা ফুল!

রুকণী কিন্তু সাক্ষাৎ শয়তানী। স্বভাবের মধ্যে তাহার শয়তান বাস করিত, সে কি করিবে? মাস কয়েক যাইতে না যাইতে সে অন্য একটি তরুণের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। পান্নুও উভয়কে একসঙ্গে আবিষ্কার করিল।

বুধন বলিল—ওটাকে ছোড় দে। দুসরা সাদি কর।

পান্নু কিন্তু রুকণীর প্রেমে পাগল। নিষ্ঠুর নির্যাতনে রুকণীকে নির্যাতিত করিয়া সে তাহাকে শাসন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহিল। একদিন এই দ্বন্দ্বের মধ্যে রুকণী তাহার হাতে বসাইয়া দিল ছুরি।

এবার সর্দার বিচার করিয়া রুকণীর মাথা মুড়াইয়া দিতে হুকুম দিল এবং বলিয়া দিল—মেয়েটাকে কেহ সাদি করিতে পাইবে না। লোকে বলিল ঠিক হইয়াছে। রুকণী কিন্তু বিচিত্র মেয়ে। সে বলিল—তাহার চুল সে মুড়াইতে দিবে না। সে হিংস্র বাঘিনীর মত দাঁড়াইল। কিন্তু এতগুলি লোকের কাছে সে কি করিবে? জোর করিয়া তাহার মাথা মুড়াইয়া দেওয়া হইল। পরদিন সকালে দেখা গেল একটা গাছের ডালে দড়ি বাঁধিয়া রুকণী গলায় ফাঁস লাগাইয়া ঝুলিতেছে।

পান্নু বুক চাপড়াইয়া কাঁদিল। তারপর দেখা গেল, সে কেমন অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছে। বুধন এবং তাহার স্ত্রী তাহাকে সাদির জন্য ধরিল, কিন্তু সে বলিল—না। সে এবার মাতিয়া

গেল বুধনের সংসার লইয়া। তাহাদের ভঁইষা দুইটার পরিচর্যা করে, ঘাস কাটিয়া আনে, ডাল কাটিয়া আনে, দুধ হইতে ঘি তৈয়ার করে, সঞ্চয় করে। যেখানে তাহারা তাঁবু ফেলে, সেখানে নিকটস্থ গ্রামে গিয়া ঘি বেচিয়া আসে। বন হইতে লতা কাটিয়া আনিয়া টুকরি বোনে, ঝুমঝুমি তৈয়ারী করে। তাহার প্রথম জীবনের সামাজিক সংসারজ্ঞান এবং সেই জীবনের রুচি হইতে সে এই সব বস্তুর অনেক পরিবর্তন করিল। যাহার ফলে বুধনের স্ত্রীর জিনিস পল্লীর লোকেরা আদর করিয়া কিনিতে আরম্ভ করিল। বুধনের সংসারে স্বাচ্ছল্যের সীমা রহিল না। অন্য পরিবারগুলি ঈর্ষাতুর হইয়া উঠিল। এমন কি দলের সর্দার পর্যন্ত।

ক্রমে পান্নু দেখিল, হা-ঘরেদের কিশোরী যুবতী মেয়েগুলি তাহার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য লালায়িত হইয়া ফেরে। তাহারা চোর ডাকাত দুর্দান্ত জোয়ান দেখিয়াছে; পান্নুর সে শৌর্যেরও অভাব নাই; উপরন্তু তাহার এ এক অদ্ভুত শক্তি! ঘরকে এমন পরিপাটি করিয়া গুছাইয়া সাজাইয়া তুলিতে তাহাদের কেহ পারে না। এমন তীক্ষ্ণ ব্যবসায় বুদ্ধি তাহাদের কাহারও নাই। এমন রুচি কোন পুরুষের নাই, এমন পরিচ্ছন্ন কেহ নয়। মেয়েগুলা সপ্রেম দৃষ্টিতে কটাক্ষ হানিয়া কথা বলে, হাসে। পান্নু হাসিয়া বলে—ভাগ।

একদা স্বয়ং সর্দারের মেয়ে তাহার কাছে আসিল। একটা প্রান্তরে তাঁবু পড়িয়াছিল, বড় বড় পাথরের চাঁই চারিদিকে। একখানা পাথরের উপর বসিয়া দুলিতে দুলিতে বলিল—সর্দারের বেটী এল।

পান্নু কথা বলিল না।

সে বলিল—তুহার পাশে এল।

পান্নু কথা বলিল না।

সে বলিল—হামাকে সাদি করবি?

পান্নু হাসিল।

সর্দারের মেয়ে বলিল—কোইকে পাশ যাবে না হামি।

পান্নু এবার বলিল—যাও হিঁয়াসে।

—না।

পান্নু ডাকিল—বাবা! বুধনকে ডাকিল।

বুধনকে এ-দলের সকলের বড় ভয়। সে গুণিন, তাহার উপর এখন সে দলের মধ্যে সকলের চেয়ে অবস্থাপন্ন লোক। সর্দার পর্যন্ত তাহার কাছে টাকা ধার করিয়াছে। মেয়েটা সকরুণ স্বরে বলিল—পান্নু!

পান্নু আবার ডাকিল—বাবা!

এবার সে উঠিয়া গেল।

দলের অন্য মাতব্বরেরা আপন আপন কন্যার জন্য বুধনকে ধরিল—তোমার বেটার সঙ্গে আমার বেটীর সাদি দাও। ভঁইসা দিব, কুত্তা দিব।

বুধন পান্নুকে বলিল। কিন্তু পান্নু বলিল—নেহি। বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ন, ন, ন, ন। বুধনেরা বিস্মিত হইয়া গেল। বুধন বলিল—আরে বেটা, ইয়ে তুমারা বেওকুফি। যো গিয়া—সো গিয়া। ঝুটমুট—বিলকুল ঝুটমুট!

তবু না। পান্নু কেমন হইয়া গিয়াছে। ক্রমে অবশ্য রুকণীর শোক কমিল। কিন্তু রুকণীর মোহ কাটিলেও ইহাদের মেয়েগুলিকে দেখিয়া কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মায় তাহার। বিশেষ করিয়া সে যখন গ্রামে যায়, গ্রামের কন্যা-বধূগুলিকে দেখে, তখন তাহার সমস্ত অন্তর হা-ঘরেদের

উপর ঘৃণায় ভরিয়া উঠে।

গ্রামের মেয়েরা যখন বলে—দেখিস দেখিস, ছোঁয়া পড়বে! মাগো, কি গন্ধ গায়ে! তখন তাহার চীৎকার করিতে ইচ্ছা করে, সেই বিচিত্র চীৎকার। সেদিন রাত্রে ঘুম হয় না, সে বসিয়া থাকে—ভাবে। এক এক সময় মনে হয়, গভীর রাত্রে উঠিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু ভয় হয়। তাহাকে পান্নু বলিয়া চিনিলে পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে। গত্যন্তরহীন হইয়া সে হা-ঘরেদের মধ্যেই কাটাইয়া চলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর, এক জেলা হইতে অন্য জেলায়, বাংলা দেশ পার হইয়া সাঁওতাল পরগণায়, সেখান হইতে বিহারের গ্রামে। আবার পাক দিয়া ফেরে। পৌষ-মাঘ মাসটা তাহারা বাংলা দেশে আসে। পৌষ হইতে আষাঢ়—বর্ষার প্রারম্ভ পর্যন্ত, বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে ফেরে। এ সময়ে দেশটায় লোকের হাতে সম্পদ থাকে।

হঠাৎ আবার জীবনে আসিল একটা বিপর্যয়।

সময়টা পৌষ মাস। তাহারা সাঁওতাল পরগণা পার হইয়া বাংলা দেশের প্রান্তদেশে তাঁবু গাড়িয়াছিল। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে সরকারী পাকা সড়কের দুই পাশে ছোট কয়েকটা দোকান। সাঁওতাল পরগণা হইতে শালপাতা, কাঠ লইয়া যে সব গাড়ী যায়, তাহারা এইখানে 'আঁট' দিয়া বিশ্রাম করে। ময়ূরাক্ষীর ওপারেও আর একটা বাজার। ওদিকের বাজারটাই বেশ বড়। অনেকগুলি দোকান, পাশে পল্লীও আছে। পান্নু বাজার দেখিয়া হাঁড়ি লইয়া নদী পার হইয়া ওপারে গিয়া উঠিল।

—ঘিউ লেবে বাবু, ঘিউ! ভঁয়ষা ঘিউ।

কেহ কেহ আঙুলে লইয়া শুঁকিয়া হাতের উপর ঘষিয়া দেখিল, তারপর বলিল—চর্বি হ্যায়। সাঁপকে চর্বি দিয়া।

পান্নু দাঁত বাহির করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল।

বাংলা ভাষায় লোকে তাহাকে গাল দিল। পান্নুর বুঝিতে দেরি হইল না। গোটা বাজারটা ফিরিয়াও কেহ তাহার ঘি লইল না। লইল না নয়, যে দরে তাহারা লইতে চায়—সে দরটা যে অত্যন্ত অসঙ্গত, তাহারা যে তাহাকে ঠকাইয়া লইতে চায়, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। রুকণী যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত, তবে সে ছুরি বাহির করিয়া বসিত। সে চলিল পল্লীটার মধ্যে। বহুদিন পরে বাংলা কথা তাহার বড় ভাল লাগিতেছে। বড় মিষ্ট মনে হইতেছে। বিহার হইতে সাঁওতাল পরগণায় আসিয়া লোকের কথার মধ্যে এই ভাষায় যেন একটা দূরাগত সুর শুনিয়াছিল। বহু দূরের বাঁশীর ক্ষীণ আওয়াজের মত সাঁওতাল পরগণার ভাষার মধ্যে এই ভাষার ক্ষীণ সুর মিশিয়া আছে; আজ সেই ভাষা শুনিয়া তাহার কান যেন জুড়াইয়া গেল। ইচ্ছা হইল, সেও এই ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সাহস হইল না।

—ঘিউ লেবে বাবু, ঘিউ! ভঁয়ষা ঘিউ!

—এই ঘি! এই! গ্রামের মোড়েই একজন দোকানদার ডাকিল।

—ভঁয়ষা ঘিউ। বহুৎ আচ্ছা। পান্নু হাঁড়িটা মাথা হইতে নামাইয়া দুই হাতে তাহার সম্মুখে ধরিল।

লোকটি আঙুলের ডগায় ঘি লইয়া বার কয়েক শুঁকিয়া দেখিয়া বলিল—চর্বি-টর্বি নাই তো রে?

—নেই বাবু! রামজী কসম।

—হুঁ! কসম তো মুখে লেগেই আছে তোদের! আবার একবার শুঁকিয়াও সে বোধ হয় নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। ডাকিল—ওগো! শুনছ! ওগো!

বাহির হইয়া আসিল সুন্দরী যুবতী একটি মেয়ে।—কি? কি বলছ?

পান্নুর হাত-পা সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দুই হাতে আলগোছা ধরিয়া রাখা হাঁড়িটা অকস্মাৎ তাহার হাত হইতে খসিয়া দাওয়ার উপর পড়িয়া গেল।

গৃহস্থের স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই বলিয়া উঠিল—যা!

পান্নু একটা চীৎকার করিয়া উঠিল, সেই বিচিত্র চীৎকার। তারপর দুই হাতে চুলের মুঠা ধরিয়া ছুটিতে শুরু করিল। দিদি—দিদি—তাহার দিদি চারু!

এ মেয়েটি তাহার দিদি চারু। চিনিতে তাহার ভুল হয় নাই। তাহার মুখ দাড়ি-গোঁফে ভরিয়া উঠিয়াছে, চোদ্দ বছরের পান্নু আঠারো বছরের জোয়ান হইয়া উঠিয়াছে, চারু তাহাকে চিনিতে পারে নাই। পান্নু ঠিক চিনিয়াছে। চিনিয়াও কিন্তু 'দিদি' বলিয়া ডাকিতে পারিল না, ওই বিচিত্র চীৎকার করিয়া পাগলের মত ছুটিতে লাগিল। বাজারের লোক চমকিয়া উঠিল।

আট

তাহার দিদি চারু! হাঁ, সে তাহার দিদি চারুই। ভুল হয় নাই। মনের ছবির সঙ্গে মুহূর্তে মিলিয়া গেল; তাহার বুকের ভিতরের ছবি মুহূর্তে অস্পষ্টতা আবছায়া কাটাইয়া জলজলে ডগডগে হইয়া উঠিল। মুহূর্তে কত কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। ঠিক জলছবির মত। ইস্কুলের কথা মনে পড়িল। ইস্কুলে বইয়ের উপর জলছবি লাগাইত। কাগজের উপর ছবিগুলা থাকিত ঝাপসা মত। জলে ভিজাইয়া কাগজটার ছবির দিকটা বইয়ের উপর বসাইয়া দিত। তারপর টানিয়া তুলিয়া লইত কাগজখানা। ছবিগুলা তখন বইয়ের পাতার উপর ডগডগে হইয়া ফুটিয়া উঠিত। আজও ঠিক যেন এই মুহূর্তে কাগজখানা মন হইতে উঠিয়া গেল। ঘরের—গ্রামের ছবিগুলা ঝলমল করিতেছে, টাটকা আঁকা ছবির মত। তাহার দিদি চারু। বুকের ভিতর তাহার অন্তরাত্মা মাথা কুটিতেছে, পান্নু চীৎকার করিতেছে। তাহার দিদি চারু।

দিদি চারু এখানে কেন? হয়তো তাহারই মত পলাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ও লোকটা কে? ও তো দিদির স্বামী নয়। তাহার দিদির বিবাহ হইয়াছিল গ্রামে। কৃষ্ণলালকে তো তাহার মনে পড়িতেছে। কোঁকড়া লম্বা চুল, বড় বড় ড্যাবা-ড্যাবা চোখ, মুখে বসন্তের দাগ; কুস্তি-করা মুগুর-ভাঁজা শরীর। এ তো সে নয়!

বাবা কোথায়? মা কোথায়? দাদা কোথায়? একজনের কথা লইয়া মন কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। একজনের কথা মনে হইতে-না-হইতে আর একজন সম্মুখে দাঁড়াইতেছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন। বাবাকে কি ফাঁসীকাঠে···? ভাবিতে গিয়া তাহার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল। দুঃসহ ক্রোধে দেহের পেশীগুলি ফুলিয়া উঠিল, দাড়ি-গোঁফ সমাচ্ছন্ন মুখখানা হইয়া উঠিল ভীষণ, ভয়াবহ। আরও জোরে সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

চলিয়াছিল সে অপথে। ময়ূরাক্ষীর তীর ধরিয়া শনবন-কুলঝোপের পাশ দিয়া কুশাঙ্কুর-

আস্তীর্ণ বালুভূমির উপর দিয়া। কোন দিকেই লক্ষ্য ছিল না। কেন, সে তাহা জানে না। শুধু সে চীৎকার করিতেছে।

প্রায় সারাটা দিন দূর দূরান্তরে এমনি একা চীৎকার করিয়া শেষে শ্রান্ত হইয়া সে তাঁবুতে ফিরিল অপরাহ্ণবেলায়। বুধন এবং তাহার স্ত্রী তাহার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারা ইতিমধ্যেই বাজারে ঘিয়ের হাঁড়ি ভাঙার খবর পাইয়াছে। তাহারা ভাবিয়াছিল, এই জন্যই বোধ হয় পান্‌কু দুঃখে ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে।

পান্নু ফিরিতেই বুধন বলিল—গেয়া তো কেয়া হুয়া? ভঁইষা তো তুহার হ্যায়। ঘিউভি তুহার। তু বনায়া। তোহারা হাঁতসে গির গিয়া—ঘিউ বরবাদ হুয়া, তো কেয়া হুয়া? যানে দো।

তাহার স্ত্রী বলিল—ইসব বিলকুল চিজ তোহারা হ্যায়। হামলোক তো বুঢ্‌ঢা হো গয়া, যব যায়েগা, সব তুহার হোগা।

পান্নুর চোখে জল আসিল। ঝরঝর করিয়া কাঁদিল। কাহার জন্য কাঁদিল সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। বুধন এবং তাহার স্ত্রী সযত্নে তাহার চোখ মুছাইয়া দিল। ভবিষ্যতের কত গল্প শুনাইল।

পান্‌কুর যদি এই দলের মেয়েদের কাহাকেও পছন্দ না হয় তবে তাহাদেরই গোত্রীয় অন্য দল হইতে মেয়ে বাছিয়া তাহার বিবাহ দিবে। সে জন্য যদি দরকার হয় তাহারাই অন্য দলে চলিয়া যাইবে। পান্‌কুকে একটা 'হারা' অর্থাৎ সবুজ রঙের তেরপলের তাঁবু কিনিয়া দিবে। তেরপলের তাঁবুতে জল পড়ে না, তেমনি মজবুত হয়। কোন শহরে গেলে—যে শহরে থাকে সাহেব লোক, গোরা লোক, সেই শহর হইতে পান্‌কুর জন্য সংগ্রহ করিয়া দিবে একটা সফেদ রঙের আর একটা কালো রঙের ডালকুত্তার বাচ্চা। নেপালীদের সঙ্গে মুলাকাৎ হইলে খুব ভাল একটা ভোজালি কিনিয়া দিবে। বুধন বলিল, এইবার তাহার সব চেয়ে তাজা মন্তরগুলি সে পান্নুকে শিখাইবে। সে মন্তরের বহুৎ গুণ। সেই মন্তর পড়িয়া যাহাকে ইচ্ছা কুত্তার মত বশীভূত করা যায়। আর একটা মন্তর পড়িয়া বালি, খেজুর কাঁটা, সাপের দাঁত আকাশে ছাড়িয়া দিলে, সে সনসন করিয়া ছুটিয়া, যাহার নাম তুমি করিয়া দিবে তাহার বুকে গিয়া মোক্ষম আঘাত করিবে। লোকটা যেমনই বলবান হউক, হউক না কেন সে ভীমের মত, তাহাকে ঘায়েল হইতেই হইবে। কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়া শুকাইয়া শুকাইয়া মরিবে। আর একটা মন্তর আছে সেটা পড়িলে যেমনই বন্ধনে বাঁধুক না তোমাকে, খুলিয়া যাইবে। এমন কি সরকার বাহাদুরের হাতকড়িও যদি তোমার হাতে পরাইয়া দেয়, তবে সেও খুলিয়া যাইবে।

বুধনের স্ত্রী বলিল—পান্‌কু বলুক না কেন, কোন্ ছুঁড়ীকে তাহার পছন্দ, সে তাহাকেই আনিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া দিতেছে। পান্‌কু সাদি করিতেছে না, এ কি তাহার কম দুঃখ। পান্‌কুর সাদি হইবে, তাহার ছোট্ট বাচ্চা হইবে, 'ওঁয়া-ওঁয়া' শব্দ করিয়া কাঁদিবে, সে তাহাকে কোলে তুলিয়া দোলা দিবে—কত আদর করিবে। তাহার গলার হাঁসুলিয়া খুলিয়া সে তাহাকে পরাইয়া দিবে। পান্‌কুর বধূকে সে দিবে নাকের বেঁসর, কানের মাকড়ী। তাহার সব গহনাই একে একে দিবে। সে বুঢ্‌ঢী হইয়াছে, কি প্রয়োজন তাহার গহনায়? পান্‌কুকে সে দিবে তাহার গলার মাদুলীটা। এই মাদুলীটা তাহাকে দিয়াছিল তাহার বাপ। সেও ছিল মস্ত বড় গুণিন। সে নাকি এমন মন্তর জানিত যে, সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া তালা চাবি দিলেও সে তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিত। তাহার দেওয়া এই মাদুলীর বহুত গুণ। কোন

ডাইনীর দৃষ্টি তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না। ভূত, প্রেত, পিশাচ যাহারা হাওয়ার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ফিরিতেছে, তাহারা সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিবে।

ওদিকে গল্পের মধ্যে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখর কণ্ঠ ক্রমশ মৃদু এবং মধ্যে মধ্যে স্তব্ধ হইয়া আসিতে আসিতে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পান্নুর কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। তাহার দিদি চারু! সেই টকটকে ফরসা রঙ, সেই সুন্দর মুখ, ছোট চোখ দুইটির অদ্ভুত স্তিমিত দৃষ্টি, সেই বিড়ালের মত চোখের তারা, একপিঠ চুল, সেই সব—তাহার দিদি চারু, তাহাতে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

প্রান্তরের বুকে চারিদিকে শেয়াল ডাকিয়া উঠিল এক সঙ্গে। এই প্রথমবার নয়, এইবার তৃতীয় প্রহরের ডাক। যাহারা চুরি করিতে যায়, এই ডাক শুনিয়া তাহারা ফেরে। ইহার পর আর কেহ তাঁবুর বাহিরে থাকে না।

পান্নু ভাবিতেছিল—চারু! চারু! তাহার দিদি চারু!

পরদিন উঠিয়া আবার সে গেল সেই দোকানে। দোকানী তাহাকে চিনিল। সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল—কাল তোর বহুৎ ঘিউ বরবাদ হয়ে গেল।

সে এক পাশে বসিয়া বলিল—হাঁ।

—কাল তোকে খুব মেরেছে তোর বাপ মা?

—নেহি।

—তবে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলি? দু-তিনবার খুঁজতে এল এক বুঢ্‌ঢা আর এক বুঢ্‌ঢী।

—হাঁ। অর্থহীনভাবে পান্নু বলিল—হাঁ।

ঠিক এক সময়েই বাহির হইয়া আসিল তাহার দিদি। হাঁ, এই তাহার দিদি। ঘাড়ে, ঠিক কানের নীচে সেই কালো জড়ুল রহিয়াছে। তাহার দিদি বলিল—কালকের সেই ছোঁড়া না?

—হ্যাঁ।

সস্নেহে তাহার দিদি বলিল—ঘিয়ের হাঁড়ি ভেঙে ছুটে পালাল কাল। আহা-হা!

লোকটি বলিল—দাও, চারটি মুড়ি দাও ওকে।

মুড়ি লইয়াও পান্নু বসিয়া রহিল। তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া লোকটি বলিল—কি রে? আবার বসে রইলি যে?

পান্নু বসিয়া আছে—ওই মেয়েটির নাম শুনিবার জন্য। কিন্তু সে প্রশ্ন সে করিতে পারিল না।

—কি? কি মতলব আছে আর? লোকটি এবার সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

তাহার দিদি বলিল—হ্যাঁ, ওরা আবার চোরের একশেষ।

—ভাগ বলছি, ভাগ!

পান্নু উঠিল। হতাশ হইয়া উঠিল। তাহার চেহারার মধ্যে বাল্যকালের চেহারার কি এতটুকু সাদৃশ্য আর নাই, যাহা দেখিয়া দিদির মনে বারেকের জন্যও মনে হয়—পান্নুর মত মনে হইতেছে যেন?

পথে একটা পানের দোকানে সে দাঁড়াইল। দোকানে একখানা বিবর্ণ আয়না ঝুলিতেছিল। সেই আয়নাখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে নিজেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিল। নিজেকে দেখিয়া সে যেন কিছুতেই চিনিতে পারিল না। গোল গোল শরীর—সুন্দর না হইলেও, একখানি কালো কচি মুখ, ক্ষারে-কাচা মোটা কাপড়, ছিটের কামিজ গায়ে ছেলেটির সঙ্গে তাহার কোন মিল নাই।

নিজেরই তাহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

সেদিনও সমস্ত রাত্রিটা তাহার জাগিয়া কাটিয়া গেল। তৃতীয় প্রহরে আজও শিয়ালগুলা ডাকিল, তখনও সে জাগিয়া রহিয়াছে। ভাবিতেছে—কেমন করিয়া জানা যায়, মেয়েটির নাম চারু কি না? কেমন করিয়া বলা যায়—দিদি, আমি পানু, তোমার ভাই পানু!

হঠাৎ বাহিরের লঘু-দ্রুত পদধ্বনি শুনিয়া সে উঠিয়া বসিল। আজ দলের লোক চুরি করিতে বাহির হইয়াছিল, তাহারাই ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকখানা দ্বিগুণিত হতাশায় ভরিয়া উঠিল। আজ রাত্রে ইহারা চুরি করিয়াছে। তবে কালই এখান হইতে তাঁবু উঠিবে। ভোর হইতে না হইতেই এখান হইতে রওনা হইবে।

তাহার দিদি, তাহার দিদি চারু! তাহাকে ফেলিয়া কোথায় যাইবে সে? আর কখনও দেখা হইবে কি না সন্দেহ।

অনুমান তাহার মিথ্যা নয়, ভোর হইবার পূর্বেই হা-ঘরের দল তাঁবু উঠাইয়া রওনা হইল। পানু বার বার পিছাইয়া পড়িতেছিল। দলের লোক বিরক্ত হইল। বুধন জিজ্ঞাসা করিল—কেয়া রে বেটা? তোর তবিয়ৎ কি খারাপ মালুম হচ্ছে?

পানু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ক্লান্তভাবেই বলিল—হাঁ।

বুধন তাহাকে একটা ভঁইষার পিঠে সওয়ার করিয়া দিল। দলের অন্য লোকে হাসিল, মেয়েরা টিটকারি দিল। পানু কিন্তু উদাস বিহ্বল।

প্রায় সমস্ত দিনটা হাঁটিয়া মিলল একটি শহর। সেইখানে তাঁবু পড়িল। দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, হা-ঘরেদের ভিক্ষায় বা জিনিস-পত্র বেচিবার জন্য বাহির হইবার আর সময় নাই। তবু অনেকে শহরটা দেখিবার জন্য, অথবা প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র—নিমক, মরচাই, তেল কিনিতে বাহির হইল।

শহর পানু অনেক দেখিয়াছে। তবু মনিহারীর দোকান, বড় বড় বাড়ি বাগান দেখিতে ভাল লাগে। আজ কিন্তু তাহার সে সব ভাল লাগিল না। একটা চৌমাথার উপর তাহাদের দল দাঁড়াইয়া ছিল। চৌমাথাটার চারিদিকে দোকান—এইখানেই প্রয়োজনীয় সব জিনিস মিলিবে। দুই-চারিজন করিয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা এ-দোকানে ও-দোকানে সওদা করিতে আরম্ভ করিল।

সামান্য কয়েকটা জিনিস কিনিয়া পানু রাস্তায় নামিয়া দাঁড়াইল। সামনেই একটা টিনের চালা, বাঁধানো মেঝে; সেই মেঝের উপর বসিয়া নৌয়া অর্থাৎ নাপিত এই অপরাহ্নবেলাতেও লোকের দাড়ি চাঁচিয়া দিতেছে। হঠাৎ তাহার চোখের উপর একটা লোকের চেহারা অন্য রকম হইয়া গেল। লোকটা বেশ বড় একজোড়া গোঁফ লইয়া বসিয়া ছিল। নৌয়া'টা হাতের অস্ত্র দিয়া নিঃশেষে তাহার গোঁফগুলা চাঁচিয়া ফেলিয়া দিল। মনে হইল, সে লোকই এ নয়। এ আর কেউ। এ যেন যাদু!

তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। ফিরিবার পথে বার বার সে আপন দাড়ি-গোঁফে হাত বুলাইল। তখন এগুলা ছিল না। এগুলা চলিয়া গেলে—এ চেহারা তাহার যাদুর মত পাল্টাইয়া যাইবে।

তাঁবুতে ফিরিয়া জিনিস-পত্রগুলি দিয়াই সে আবার বাহির হইয়া পড়িল—সকলের অলক্ষ্যে। একবার কোমরে হাত দিয়া দেখিল, তাহার গেঁজলেতে কঠিন গোলাকার বস্তুগুলি ঠিক আছে। সে দ্রুতপদে আসিয়া শহরের মধ্যে ঢুকিল। কয়েকবার রাস্তা ভুল করিয়া অনেকটা

ঘুরিয়া সে সেই টিনের চালাটা বাহির করিল। নৌয়াটা তখনও বসিয়া আছে। সে গেঁজলে হইতে বাহির করিল একটা গোল কঠিন বস্তু। সেটা আধুলি। আধুলিটা সে নাপিতটার সামনে রাখিয়া বলিল—হাঁ, দেও। বলিয়া সে দাড়ি-গোঁফে হাত বুলাইয়া মাথার লম্বা বাবরী চুল দেখাইয়া দিল।

নাপিতটা প্রথমটা অবাক হইয়া গিয়াছিল। কুৎসিতদর্শন, সর্বাঙ্গে দুর্গন্ধ, গলায় লাল পলার মালা—দেখিবামাত্র হাম্বরে বলিয়া চেনা যায়, সে চুল কাটিবে, দাঁড়ি-গোঁফ কামাইবে! কিন্তু আধুলিটা দেখিয়া সে তাহার মনের বিস্ময় মনে চাপিয়া গেল। ভাবিল, তরুণ যাযাবর ছোকরাটির সাধ হইয়াছে শহরের বাবুদের দেখিয়া। সে হাসিয়া বলিল—একদম বাবু বনা দেগা। তারপর সে কাঁচি চালাইয়া দিল তাহার চুলে। তাহার কামানো যখন শেষ হইল তখন আর বেশী বেলা নাই। নাপিতটা তাহার সম্মুখে ধরিল একখানা আয়না। আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া পানু অবাক হইয়া গেল। হা-ঘরে হারাইয়া গিয়াছে! এ কে? এ কে?

সেই ছোট কালো, কচি মুখের সঙ্গে এ মুখের অনেকটা মিল যেন খুঁজিয়া পাওয়া যায়! হাঁ, পাওয়া যায়। কিন্তু বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে না পাইলে বুধন উৎকণ্ঠিত হইয়া খুঁজিতে বাহির হইবে, বুধনের স্ত্রী বাহির হইবে। সে আর দাঁড়াইল না। শহর হইতে বাহির হইয়া যে পথ ধরিয়া তাহারা আসিয়াছিল, সেই পথেই ফিরিল। চারু—তাহার দিদি চারু!

চারু—তাহার দিদি চারুর বাড়ির মুখে চলিল। প্রথম খানিকটা সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল। যখন সে চারুর বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখনও রাত্রি আছে। সে দাওয়াটার উপরেই শুইয়া পড়িল।

তাহার ঘুম ভাঙিল চারুর কণ্ঠস্বরে—কে? কে? এ কে শুয়ে আছে?

পানু উঠিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বহুদিন-না-বলা—তাহার কাছে বড় মিঠা-লাগা বাংলায় টানিয়া টানিয়া বলিল—দিদি! হামি পানু।

নয়

—দিদি! হামি পানু।

স্থির দৃষ্টিতে চারু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—চিনতে পারছিস না? শঙ্কাতুর করুণ দৃষ্টি মেলিয়া চারুর মুখের দিকে চাহিল।—হামি পানু, তোহার সেই ছোট ভাই?

চারু এবার খানিকটা ঝুঁকিয়া তাহাকে দেখিতে আরম্ভ করিল।

পানুর মনে পড়িয়া গেল জমাদারের বেতের দাগের কথা। তৎক্ষণাৎ সে পিঠ বাঁকাইয়া দেখাইয়া বলিল—এই দেখ, পিঠে সেই জমাদার মারিয়েছিল, বেত চালাইয়েছিল। দেখ, দাগ দেখ! বুঢ়্‌চা নাকু দত্তকে গলা কাটিয়ে দিল। থানামে বাবাকে ধরিয়ে নিয়ে গেল, মায়ীকে নিয়ে গেল, তুকে নিয়ে গেল, হামাকে নিয়ে গেল। বাবাকে বাঁধলে জমাদার, বেত চালাইলে। তুকে মারলে দারোগাবাবু। হামি জমাদারকে মারলাম—

চারু এবার ঝুঁকিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল কিছুক্ষণ। তারপর বলিল—পানু! হ্যাঁ, তুই পানু। পানুই তো বটে আমার। কোথায় ছিলি ভাই? কোথা থেকে এলি? পানুই তো বটে আমার। ঝরঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

পানুরও কান্না পাইতেছিল, কিন্তু কান্নার চেয়েও প্রবলতর আবেগে একটা গভীর উৎকণ্ঠায় তাহার বুকটা কেমন করিতেছিল ; সে বলিল—দিদি, বাবা ? হামাদের বাবা ? পুলিস—পুলিস—পুলিস বাবাকে ঝুলাইয়ে দিলে ফাঁসিকাঠে ? বাবার ফাঁসি হইয়ে গেল ? দিদি ?

চারু কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল—না। বাবা বেঁচে আছে ভাই, মা আমাদের চলে গিয়েছে। মা নাই।

—মা নাই ? মা মরিয়ে গেল ? পুলিস মাকে ফাঁসি দিলে ?

—ছি। বার বার পুলিস, ফাঁসি বলছিস কেন ? মায়ের ফাঁসি হবে কেন—কিসের জন্যে ! মায়ের অসুখ করেছিল। তোর জন্যে মায়ের সে কত দুঃখ ! তুই এতদিন কোথায় ছিলি ভাই ?

পানু বলিল—পুলিসকে ডরকে মারে দিদি, জঙ্গলমে, পাহাড়মে, এক মুল্লুকসে আওর এক

পানু বলিল আপনার কথা।

চারু বলিল বাপের কথা, মায়ের কথা, বড় ভাইয়ের কথা। পানু স্থির হইয়া বসিয়া শুনিল।

চারু সর্বাগ্রে বলিল—নাকু দত্তের খুনী ধরা পড়ে নাই। কে যে খুন করিয়াছে, সে তথ্য পুলিস দেশ তোলপাড় করিয়া তদন্ত করিয়াও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। পানু যে সদরে গিয়া পুলিস সাহেবের কাছে নালিশ জানাইয়াছিল, তাহার ফলে সে কি কাণ্ড ! বাপকে তাহার চালান দিল, ইন্সপেক্টার আসিল, গোয়েন্দা পুলিস আসিল। দিনের পর দিন ডাক পড়িত তাহাদের। বিশেষ করিয়া চারুর।

সে সব কথা পানুকে বলিতে গিয়া সে বার বার শিহরিয়া উঠিল। তবে জমাদারের সাজা হইয়াছিল। জমাদার হইতে তাহাকে কনস্টেবল করিয়া অন্য থানায় বদলির হুকুম হইয়াছিল সরকারের। ওদিকে দিন-কতক সমস্ত গ্রামখানায় মানুষের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বড় বড় বাবুদের বাড়ি পর্যন্ত খানাতল্লাশ হইয়া গেল। বাবুদের দুইজন ছেলেকেও চালান দিল পুলিস। গণ্ডার হাড়ি, মুরশিদাবাদের দর্জি, মাধব ময়রাও চালান গেল। তারপর একদা সকলকেই পুলিস ছাড়িয়া দিল। বলিল—প্রমাণ ঠিক পাওয়া গেল না। কিন্তু ততদিনে চারুর বাপের যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। ব্যবসা গিয়াছে, সঞ্চিত অর্থ গিয়াছে, চারুর ইজ্জৎ গিয়াছে, পানু নিরুদ্দেশ। চারুর বাপ বলিল—এর চেয়ে ফাঁসি হল না কেন আমার ? হে ভগবান্ !

—ভগবান ! ভগবান নাই সে আমি হাজার বার বলব। চারু বলিল।—নইলে এমনি হয় ? যদি হয়, তবে যারা করে তারা ধনে-পুত্রে মানে-সম্মানে বাড়ে দিন দিন !

—নাই। ভগবান নাই। আবার একটু ভাবিয়া বলিল—যদি থাকে তবে কানাও বটে, কালাও বটে। আমার বাবার কি দোষে এ শাস্তি তা বলুক !

—ঘটি বাটি জমি জেরাত যা ছিল, পরানের ডাহাতে তা বেচে উকীল মোক্তারকে ঢেলে দিতে হল সব। ওদিকে আমার শ্বশুররা বলল—ও বউ আর নোব না। গাঁয়ের লোক, তাদের কাছে গোপন তো কিছু ছিল না। জেনে শুনেই বা তারা আমাকে নেয় কি করে ? সোয়ামী আমার মনের দুঃখে পাগল হয়ে গেল। পানু, সে এখন গায়ে ধুলো-কাদা মেখে বেড়ায়। সে আমাকে ভালবাসত। সত্যিই ভালবাসত।

পানু সেদিন কথাটার মর্ম বুঝিতে পারে নাই। অবাক হইয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

চারু বলিল—জ্ঞাতিরা সব পতিত করলে বাবাকে। বললে—ও কন্তে তোমার ঘরে থাকলে তোমার সঙ্গে আমরা চলব না। তুমি পতিত। বাবা চুপ করে থাকল। কোনও জবাব দিল না। তারপর—। চারু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

ইহার পরের স্মৃতি বড় মর্মান্তিক।

নিঃস্ব-রিক্ত সর্বস্বান্ত আত্মীয়-স্বজন-জ্ঞাতি গ্রামবাসীদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত পানুর বাপের বাড়ির চারিদিকে ক্ষুধার্ত লোলুপ নেকড়ের দৃষ্টির মত মানুষের দৃষ্টি ফিরিতে লাগিল। হরিণীর মত চারু আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।

রামমুণি বেণেনী, এককালে তরঙ্গময়ী স্বৈরিণী ছিল, বৃদ্ধ বয়সে সে গ্রামের রতনবাবুর দৌত্য বহন করিয়া লইয়া আসিল চারুর মায়ের কাছে।—রতনবাবু বলেছে, পঁচিশ টাকা দেবে। পাঠিয়ে দে চারুকে।

চারুর মা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—কি বলছ ঠাকুরঝি? তুমি না চারুর পিসী?

—তাতেই তো বউ। মেয়েটার ভালর জন্যেই বলছি। নইলে আমার আর কি বল?

চারুর মা বলিল—না না না। হতভাগীর কপালে যা ছিল ঘটেছে। কিন্তু আমি মা হয়ে পেটের ভাতের জন্যে সে পারব না। তুমি ওসব কথা বলো না।

রামমুণি চারুর মায়ের মুখের দিকে চাহিল সাপের মত স্থির দৃষ্টিতে। তারপর বলিল—তা হলে সত্যি বল?

—কি?

—নাকু দত্তের টাকা তোরাই পেয়েছিস?

—কি বলছ দিদি?

—লোকে বলে, বিশ্বাস করি নাই। এইবার বুঝলাম। রামমুণি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। শিহরিয়া উঠিল চারুর মা। রামমুণি যাহা বলিয়া গেল সে কথা প্রচার করিবে না তো? আবার পুলিস হাঙ্গামা হইবে না তো?

তারপর আসিল কৃষ্ণচন্দ্র স্বর্ণকার। স্বর্ণকার গহনা গড়ে; তাহার কারবার মেয়েদের সঙ্গে,—কেহ মাসি, কেহ পিসি, কেহ দিদি, কেহ বউদিদি, কেহ খুড়ী। চারুর মাকে কৃষ্ণচন্দ্র বলিত খুড়ী। তাহাদের ঘরে সোনার গহনার রেওয়াজ নাই; গহনা তাহাদের সবই রূপার। সোনার গহনার মধ্যে নাকছাবি, কানের টাপ্। তাহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহাদের গলায় সরু বিছাহার, হাতে শাখাবাঁধা দেখা যায়। বড়লোক যাহারা, তাহারা গলায় মোটা দড়িহার পরে। কৃষ্ণচন্দ্র নীল কাগজের একটি মোড়ক হাতে আসিয়া ঘরে ঢুকিল।—খুড়ী, খুড়ী কোথায় গো?

চারুর মা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহাদের বাড়ির রূপার গহনাগুলি সে কৃষ্ণচন্দ্রের হাত দিয়াই বিক্রয় করিয়াছে। সে লইয়া কোন গণ্ডগোল বাধিল নাকি?

কেষ্ট আসিয়া হাসিয়া বলিল—ভাল আছ খুড়ী?

শঙ্কিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়া চারুর মা জানাইল—হাঁ, ভাল আছি।

হাতের নীল কাগজের মোড়কটি খুলিয়া কেষ্ট বলিল—দেখ দেখি খুড়ী জিনিসটা কেমন হল?

গিনি সোনার বিছাহার একগাছি। আগুনের মত দীপ্তি এবং বর্ণ।

চারুর মা মুগ্ধ হইয়া গেল। অক্ষম অন্তরের কামনা লোভ হইয়া জাগিয়া উঠিল দুইটি চোখের দৃষ্টিতে। সে কাঙালের মত বলিল—বড় সুন্দর হয়েছে বাবা, বড় সুন্দর হয়েছে। তুমি গড়লে বাবা?

--গড়েছি আমিই। হাসিল কৃষ্ণচন্দ্র।

চারুর মা হার ছড়াটা কৃষ্ণচন্দ্রের হাতে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল।

কেষ্ট খানিকটা সরিয়া গিয়া বলিল—না। তারপর একটু মৃদুস্বরে বলিল—দাও, চারুর গলায় পরিয়ে দাও, দেখি কেমন মানায়!

—না বাবা। পরের জিনিস, বড়লোকের সামিগগিরি, আমাদের গলায় তো উঠবার নয়। নাও।

—দাও না তুমি চারুর গলায় পরিয়ে। আমি বলছি। তারপর ফিসফিস করিয়া বলিল—যতীনবাবু দিয়েছে চারুকে।

যতীনবাবু ধনীর ছেলে, শৌখীন তরুণ, রাস্তা দিয়া সে যখন যায়—তখন আশপাশ ভরিয়া উঠে মিষ্ট পুষ্পসারের গন্ধে, আকাশের রৌদ্রের ছটা তাহার গায়ের সিল্কের পাঞ্জাবিতে প্রতিফলিত হইয়া ঝলমল করে। পল্লীর মানুষগুলি, চিরজীবন যাহাদের একমাত্র কামনা মোটা ভাত আর মোটা কাপড়, সেই সব মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। যতীনবাবু লক্ষপতি ধনীর সন্তান। জুড়িগাড়ী হাঁকাইয়া যায়। যতীনবাবু এখানে ইন্দ্ররাজার পুত্র জয়ন্ত।

চারুর মা তবুও বলিল—না।

কেষ্ট অনেক অনুনয় করিল। চারুর মা তবুও সম্মত হইল না। ঘরের মধ্য হইতে চারু সব শুনিয়াছিল। তাহার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিল। যতীনবাবু! রাজাবাবু! সোনার হার! যে বস্তুটাকে অমূল্য দুর্লভ বলিয়া যতীনবাবুর দিকে চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে চিরদিন চোখ ফিরাইয়া লইয়াছে, সে বস্তু ওই দারোগা আর জমাদার ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছে। শাস্তি তাহাদের হইয়াছে। পুলিস সাহেব তাহাদের চাকরিতে নামাইয়া দিয়াছেন, অনেক কটু কথাও নাকি বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার তাহাতে কি? যাহা ধূলায় মিশাইয়া যায় মাটি খুঁড়িলে তাহা কি ফিরিয়া পাওয়া যায়? পাড়ার মেয়েরা তাহাকে দেখিয়া হাসে। তাহার শ্বশুর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, স্বামী পাগল হইয়া গিয়াছে। বাপ সর্বস্বান্ত। ঘরের মধ্যে সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। পানু নিরুদ্দেশ। গন্ধবেণের ছেলে হইয়া তাহার বড় ভাই পেটের জ্বালায় গ্রামেই লইয়াছে চাকরের কাজ। ময়লা কাপড় কাচে, ঘর ঝাঁট দেয়, বাবুদের জুতা পরিষ্কার করে। কিসের জন্য, কেন সে কেষ্টদাদার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবে? রাজাবাবু—যতীনবাবু! আগুনের মত রঙের গিনি সোনার হার! সে খিড়কীর পথে ছুটিয়া আসিয়া একটা গলির মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল—কেষ্টদাদা!

কেষ্ট ফিরিয়া তাহাকে দেখিয়া হাসিল।

চারু হাত পাতিয়া বলিল—দাও। দিয়ে যাও।

কেষ্ট গলিপথে আসিয়া হার ছড়াটি হাতে দিয়া হাসিয়া বলিল—আমার ইচ্ছে ছিল নিজের হাতে তোর গলায় পরিয়ে দি। তা—। গলির এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া কেষ্ট বলিল—তা, কে কে কোথায় দেখবে! থাক, আমার মনের সাধ মনেই থাক।

চারুর অন্তরে তখন একটা জোর আসিয়াছে। যতীনবাবু, রাজাবাবু! যাহার গায়ের সৌরভে আশপাশ ভরিয়া যায়, সে গন্ধ যাহার বুকের মধ্যে প্রবেশ করে তাহার বুকটা তোলপাড় করিয়া উঠে। আগুনের বর্ণ সোনার হার দিয়াছে সে! তাহার মনে হইল, অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রির পর্দাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে হঠাৎ পূর্ণ চাঁদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। চাঁদের রাজ্যে থাকে কলঙ্ক, তাহার জীবনের চারিদিক স্নিগ্ধ নীলাভ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কেষ্টচন্দ্রের কথার উত্তরে চারু লীলাভরে হাসিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—মরণ। তারপর বলিল—তা তোমার

সাধই বা বাকি থাকবে কেন ? দাও, পরিয়ে দাও।

তারপর চারুর জীবনে সে এক বিচিত্র অধ্যায় !

রাজপুত্রের সঙ্গে আসিল মন্ত্রীপুত্র, সেনাপতিপুত্র, কোটালপুত্র, সওদাগরপুত্র, আরও কত জন। কৃষ্ণচন্দ্র স্বর্ণকারও আসিল।

চারুর মা কেমন হইয়া গেল—বোকা, নির্বোধ। কন্যার কীর্তিকলাপ চোখে দেখিয়াও একটা কথা বলিতে পারিল না। কন্যার উপার্জন দেখিয়া সে ফ্যালফ্যাল করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। ধনী সহৃদয় আগন্তুককেও কোনদিন বলিতে মনে হইল না—আমার কাপড় ছিঁড়েছে বাবা, একখানা নতুন কাপড়—

চারুর অনুপস্থিতিতে কোন দূতী বা দূত আসিয়া তাহার হাতে টাকা দিয়া গেলে সে 'না' বলিতেও পারিত না, আবার কয়টা টাকা গণিয়াও লইত না। মেকী কি আসল সে দেখিয়া লইতেও তাহার বুদ্ধি হইত না। প্রবৃত্তিই যেন মরিয়া গিয়াছিল। কেবলমাত্র কোন জনের নিকট হইতে আহার্য উপঢৌকন আসিলে সে খানিকটা সজীব হইয়া উঠিত। চারুকে না জানাইয়া খানিকটা অংশ সে তুলিয়া লইত। অন্ধকার ঘরে বসিয়া অথবা নির্জন পুকুরঘাটে সেগুলা গবগব করিয়া পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাইয়া যাইত।

চারুর বাপ কিন্তু ধীরে ধীরে ধাক্কাটা কাটাইয়া উঠিল। সে ঘর হইতে বাহির হইল। অত্যন্ত ধার্মিকের বেশে বাহির হইল। ফোঁটা তিলক কাটিল, গলায় একটা ঝুলি ঝুলাইল; কন্যার উপার্জনে আহার্যের উপাদেয়তায় এবং প্রাচুর্যে—সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চিন্ততায় চিক্কণ দেহে নির্বিকার চিত্তে লোকসমাজে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। মুখে অবিরাম ধ্বনি—হরিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেই সে হাসিয়া বলিত—হরিবোল ! অনিত্য সংসার। এ সংসারে কেউ কারু নয়। আমিও আমার নই। ভাল—সব ভাল। হরিবোল !

তারপর সহসা চারুর জীবনে আসিয়াছিল আবার এক নূতন অধ্যায়। আবার একটা বিপর্যয়।

আয়নায় একদা আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া চারু নিজেই শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার রূপ যেন শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। কূলে কূলে জলে-ভরা দীঘি জল-ভরা পদ্মবনের শোভায় যেন ঝলমল করিতেছে। তাহার দেহে রূপ যেন আর ধরে না। বুকের ভিতরটা তাহার তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছিল। এ কি হইল তাহার ?

চারু বলিল—সে কি দিন ভাই ! সে কি বলব ! মা তো হাবা হয়েই গিয়েছিল, বাবার মুখে শুধু—হরিবোল। আমার মাথায় ভেঙে পড়ল বাজ। কি করব ? কোলে কে আসবে তাকে নিয়ে কি করে পথে বের হব ? মনে হল, বিষ খাই, গলায় দড়ি দি। তাও পারলাম না। রামমুণিকে বললাম, কেষ্টদাদাকে বললাম—তারা বললে, ভয় কি ? কাঁটা তুলে দোব। কেউ জানবে না। আমি তাও পারলাম না। আমার কোল-আলো-করা ধন, সাতরাজার ধন মানিক—

আজও চারু ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পানু অবাক হইয়া শুনিতেছিল। সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে সেদিন সে বুঝিতে পারে নাই। সে অবাক হইয়া গিয়াছিল।

চোখ মুছিয়া চারু বলিল—সেই দিন এল এই মানুষটি। বললে—ভয় কি ; আমি তোমাকে মাথায় করে রাখব। বিদেশী মানুষ। এসেছিল চাকরি করতে ওই রাজাবাবুদের বাড়ি। রাজা-বাবুর খাস খানসামা ছিল সে। আমি যেতাম, আসতাম। আমাকে নিয়ে যেতে আসত, আবার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যেত। যেত-আসত চাকরের মত, কোন দিন একটা হাসি-তামাশা পর্যন্ত করে নাই। সেদিন আমি মাটিতে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছি। এসেছিল আমাকে ডাকতে, আমার কান্না দেখে বললে—তুমি কেঁদো না।

আজও সে লোকটি দোকানের তক্তপোশে বসিয়া তামাক টানিতেছিল, সে হাসিয়া বলিল—ওসব কথা এখন থাক না কেন। পরে বলবার ঢের সময় পাবে। এখন হারানো ভাইকে পেলে—চান করাও ভাল করে। একখানা সুগন্ধি সাবান ঘষো গায়ে। খেতে দাও।

চারু তাহার কথা গ্রাহ্য করিল না। সে বলিয়াই গেল। সেদিনের স্মৃতি তাহার জীবনের অক্ষয় সম্পদ।

পাড়া-প্রতিবেশী, গ্রামের মানুষ তাহাকে পাপ বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছে, ঘৃণা করিয়াছে, বর্জনের অভিনয় করিয়াছে, গোপনে আবার তাহাকেই লইয়া বিলাস করিয়াছে। যেদিন তাহাদের পাপ সুদ্ধ চারুর ঘাড়ে চাপিল, পাপের বোঝার ভারে চারু যেদিন ডুবিতে বসিল, সেদিন সমস্ত জানিয়া শুনিয়া এই লোকটি বলিল—তুমি কেঁদো না।

চারু বলিয়াছিল—যাও যাও, বিরক্ত করো না তুমি। আমি যাব না, তোমার বাবুকে বলগে তুমি।

তবু লোকটি যায় নাই। বলিয়াছিল—তুমি কেঁদো না। তুমি যদি রাজী হও, আমি তোমাকে মাথায় করে রাখব।

চারু অবাক হইয়া গিয়াছিল।

লোকটি বলিয়াছিল—তুমি যদি রাজী থাক, তবে বোষ্টম হয়ে মালা-চন্দন করে তোমাকে আমি বিয়ে করব। দেশান্তরে চলে যাব। বলব—আমারই ছেলে।

গলায় কলসী বাঁধিয়া যাহাকে দশজনে জলে ডুবাইয়া দিল, সেই গলার ভরা-কলসী সমেত তাহাকে এই লোকটি মুহূর্তে মাথায় করিয়া জল হইতে উদ্ধার করিল। তাহাকে বুক ভরিয়া দিল মুক্ত বাতাস, মুক্ত আকাশের তলায় রৌদ্রের আলোকচ্ছটার জ্যোতি, তাহার উত্তাপের সঞ্জীবনী স্পর্শ, দিল ঘাসে ভরা পৃথিবীর এই নরম বুকে মাথা তুলিয়া চলিবার অধিকার। সে কথা কি না-বলিয়া থাকা যায় ?

চারু বলিয়াই চলিল।

দশ

—গাঁয়ে সে কি হৈ-হৈ কাণ্ড ভাই! সে কি মজলিস! সে কি ছি-ছি! লোকে আমাদের দোরের সামনে দিয়ে যেত, চীৎকার করে বলে যেত—'যাকে দশে করে ছি, তার জীবনে কাজ কি ?' দারোগাবাবু—

পানু চমকিয়া বলিল—সেই দারোগা ?

—না। এ নতুন দারোগা। বাবাকে ডেকে শাসালে, যেন কোন বে-আইনী কাজ না হয়। থানার সামনেই বাড়ি, পুলিস চিলের মত চোখ রেখে বসে রইল।

—কাহে ? কেনে ? পানু সভয়ে প্রশ্ন করিল।

চারুর সেই লোকটি হাসিল ; চারুও একটু হাসিল। তারপর সে বলিয়া গেল, অকুণ্ঠিতভাবে হাত নাড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল। এ চারু সে চারু নয়। সঙ্কুচিতা, ভয়ত্রস্তা হরিণীর মত মেয়েটি নয় ; এ এক অসঙ্কুচিতা মুখরা বাঘিনীর মত মেয়ে, অসঙ্কোচে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিল —তাহার সহোদরের সম্মুখে সপ্রতিভ ভাবেই ব্যক্ত করিল। কথাটা পানুকে শুনাইতেই তার বাকী ছিল, নতুবা ও-কথা সে তাহার এই বাঘিনীত্ব প্রাপ্তির দিন হইতেই সংসারকে এমনি ভাবে ঘোষণা করিয়া শুনাইয়া আসিয়াছে। সে পানুকে বুঝাইয়া দিল—সমাজে স্বামীহীনা, স্বামী-পরিত্যক্তার সন্তানবতী হওয়ার মত পাপ বা অপরাধ আর হয় না। সেই পাপ গোপনের জন্য, হতভাগিনীদের গর্ভে আবির্ভূত হয় যে সব সাত রাজার ধন মানিক, তাঁহাদের হয় পরিত্যাগ করিতে হয় ; নয় বিষ-প্রয়োগে ভ্রূণ অবস্থাতেই তাহাদের হত্যা করিয়া জননীর বত্রিশ নাড়ীর বন্ধন ছিঁড়িয়া বাহিরে আনিয়া আবর্জনার স্তূপে কিংবা নদীর জলে ফেলিয়া দেয়, নয়তো ফেলে মাটির তলায়। ভ্রূণহত্যা রাজার আইনে অন্যায়। সাজা হয়।

চারু হাসিল। বলিল—বাবা হয়েছিল ধর্মের ঢেঁকি—কপালে তেলক, নাকে রসকলি, গলায় কণ্ঠি, মুখে হরি—হরি ; 'হরি হরি' বলতে বলতেই ফিরে এল বাড়ি। এসে চুপ করে বসল। আগে বিড়বিড় করে বলত—হরি হরি। এবার চেঁচাতে লাগল। মা কাঁদতে লাগল। আমি আর থাকতে পারলাম না। নেমে চলে গেলাম থানায়।

চারু থানায় গিয়া প্রথম এই মূর্তিতে দাঁড়াইয়াছিল। বলিয়াছিল—বাবাকে ডেকেছিলেন কেন ? দারোগা তাহাকে ধমক দিয়া পাপটার গুরুত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু চারু তাহাকে বাধা দিয়া উচ্চকণ্ঠে সেই থানায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমার কোঁকে আমার সাগর-ছেঁচা ধন, আকাশের চাঁদ, আমার জল-পিণ্ডির আধার। হ্যাঁ, আমার সন্তান হবে। আমার কোল হবে, জীবন সার্থক হবে। তাকে কেন আমি মারব ? কিসের জন্য সে পাপ করব ? তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোও।

দারোগা ভড়কাইয়া গিয়াছিল।

একটা কনস্টেবল শুধু বলিয়াছিল—এই মাগী, থাম ! সরম লাগছে না তোর ?

—না না না। চারু বলিয়াছিল—সরম ? সে হাসিয়া উঠিয়াছিল।—না, সরম আমার নাই। এ তুই বুঝবি না—দারোগার চাকর তুই—দারোগার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে, তার মধ্যে কথা বলতে তোর সরম হচ্ছে না ? সে দারোগা যখন ছিল, তখন যখন তুই আমাকে ডাকতে যেতিস তোর সরম লাগত না ?

কনস্টেবলটা পলাইয়া গিয়াছিল।

চারু হাসিয়াছিল। তারপর দারোগাকে বলিয়াছিল—শোন দারোগাবাবু, তুমি অবিশ্যি সে-হিসেবে ভাল লোক। তোমাকে সে দোষ দিতে আমি পারব না। কিন্তু শোন, তুমি আর আমার বাবাকে ডেকে এমন করে শাসিয়ো না। ভয় নাই, আমার কোল-আলো করা চাঁদ নিয়ে তোমাকে দেখিয়ে যাব। প্রণাম করে যাব।

—বাড়িতে ফিরলাম ভাই। বলিয়াই চারু স্তব্ধ হইয়া গেল। সে যেন মনশ্চক্ষে কি দেখিতেছিল। সে ছবি তাহার ভুলিবার নয়। জীবনে, সময় মানে না—অসময় মানে না, এই ছবিটা তাহার চোখের সম্মুখে অকস্মাৎ আসিয়া দাঁড়ায়। কাজ করিতে করিতে হাত থামিয়া যায়, খাইতে খাইতে মুখ বন্ধ হয় ; রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে ভাসিয়া উঠে, ঘুম ভাঙিয়া যায়। বাড়িতে ফিরিয়া চারু দেখিয়াছিল, মা উঠানের উপর পড়িয়া আছে অসাড় নিস্পন্দ, কাদায় সর্বাঙ্গ মাখা,

স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টি—শুধু মধ্যে মধ্যে ঠোঁটের দুইটা পাশ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া চীৎকার করিতেছে - হরি হরি হরি! হরিবোল! হরি! হরিবোল! হরি!

চারুর মা গিয়াছিল স্নানের ঘাটে।

সেখানে প্রতিবেশিনীরা তাহাকে প্রশ্নে, বিদ্রূপে, তিরস্কারে জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল। বুদ্ধিভ্রংশা নির্বোধ চারুর মা প্রথমটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া ছিল। তারপর অকস্মাৎ এক সময় যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ গভীর ভাবে তাহার মর্ম বিদ্ধ করিয়া তুলিল—মর্মস্থলবিদ্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতই তখন সে সচেতন হইয়া উঠিয়া সভয়ে পলাইয়া আসিয়াছিল। বাড়িতে ঢুকিয়া উঠানের উপর সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বাড়ির ঠিক সম্মুখেই রাস্তার ওপারেই থানা, থানার প্রাঙ্গণ হইতে ভাসিয়া আসিতেছে চারুর উচ্চ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

—আমার কোঁকে আছে আমার সাগর-ছেঁচা ধন, আকাশের চাঁদ, জল-পিণ্ডির আধার।

চারুর মা বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

চারুর বাপ তারস্বরে হরিনাম করিতেছিল। সে চাপা গলায় বলিল—দারোগাবাবু আমাকে বললে, চারুর কাঁটা খসাবার যদি চেষ্টা করিস তবে গুষ্টিসুদ্ধ চালান দেব। বললে—বলিস তোর পরিবারকে, বেটিকে।

চারুর মার কোমর হইতে জলের ঘড়াটা হঠাৎ খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেও পড়িয়া গেল মাটির পুতুলের মত।

চারুর চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া পড়িল। সে আক্ষেপ করিয়া বলিল—আঃ! সে কি যাতনা মায়ের! হাত পা ছোঁড়ে নাই, মুখে আঃ-উঃ করে নাই, তবু সে কি যাতনা চোখের দৃষ্টিতে চাউনিতে দেখেছি আমি! সে চাউনি মনে হয়, এখনও বুঝি মা চেয়ে রয়েছে। দুদিন বেঁচে ছিল, আমি মাথার শিয়র থেকে নড়ি নাই।

পানুর চোখ দিয়াও জল গড়াইয়া পড়িল। মায়ের ছবি আজ তাহার মনে স্পষ্ট। মায়ের প্রতি অঙ্গটি মনে পড়িতেছে, প্রতি ভঙ্গিটি মনে পড়িতেছে ; কত কথা মনে পড়িতেছে। তাহার মা মরিয়া গিয়াছে!

মৃত্যু সে দেখিয়াছে দুইটা।

একটা নাকু দত্তের ছিন্নকণ্ঠ দেহ। অন্যটা দড়ি গলায় বাঁধিয়া ঝুলানো রুকণী। তাহার মায়ের চেহারাও কি এমনি হইয়াছিল? উঃ, সে কি ভয়ঙ্কর!

চারুই সান্ত্বনা দিয়া বলিল—কাঁদিস না ভাই, কাঁদিস না। কেঁদে আর কি করবি?

চারুর সেই লোকটি গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া উঠিল—গোবিন্দ, গোবিন্দ!

চারু তীব্রস্বরে বলিল—এমন করে গোবিন্দ গোবিন্দ করো না তুমি।

লোকটি হাসিয়া বলিল—কেন? কি হল?

—কি হল? চারু স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল—কি হল? মনে মনে মানুষ যখন পাপের ফন্দি আঁটে তখনই ডাকে—গোবিন্দ! গোবিন্দ! হরি হরি! দুর্গা দুর্গা! বুড়ো ষাট বছর বয়েস হেমবাবু অহরহ ডাকে—কালী! কালী! দুর্গা! দুর্গা! রাত্রে আমাকে ডাকত। তার সঙ্গী জ্ঞানোবাবু হরিনাম করত—আমাকে ডাকত রাত্রে। চরণবাবু ওদের চেয়েও বুড়ো, তার ঘরেই সে রেখেছিল মতি গোয়ালিনীকে।

তারপর সে হাসিয়া উঠিল। বলিল—বাবা, আমার বাবা দিনরাত বলত, হরি হরি, হরিবোল! যে সব বাবুরা আমার পায়ে গড়াগড়ি যেত, তাদের কাছে বকশিশ নিত। শেষ-

কালে—শেষকালে বাবা কি করলে জানিস পানু ?

চারুর বাপ সেই দিনই স্ত্রীর সৎকারের অবকাশে চারুকে ফেলিয়া পলাইয়াছিল। স্ত্রীর সৎকারও সে করে নাই। কোন চেষ্টা পর্যন্ত না।

গ্রামের লোক মৃতদেহ সৎকারে সাহায্য করে নাই। কেন করিবে, তখন তাহারা সমাজে পতিত! চারুর বাপ কেবল হরিনামই করিতেছিল। চারু বলিয়াছিল—যাও, একবার জাতি-দের কাছে। হাত জোড় করে বল। আমার জন্যে আপত্তি হয়, আমাকে ত্যাগ কর।

—হরিবোল হরিবোল! তার চেয়ে ফেলে রেখে দে। তুইও পথ দেখ। হরি বলে আমিও পথ দেখি। গাঁয়ের মধ্যে মড়া পচুক, চিল শকুনি নামুক। পচা মড়ার মাছিতে গাঁয়ে মড়ক লাগুক, হরিবোল! বলিয়াই সে আরম্ভ করিয়াছিল—বোল্ হরিবোল্, বোল্ হরিবোল্, বোল হরিবোল্! চারু আর তাহাকে বিরক্ত করে নাই। বরং ওই কথাটাই তাহার ভাল লাগিয়াছিল। সেই ভাল। পচুক মড়া। নামুক শকুনি চিল। লাগুক মড়ক।

এই লোকটি বলিয়াছিল—তা কি হয়! তোমার মা! বলিয়া সে ভাড়া করিয়া আনিয়াছিল একখানা গরুর গাড়ী, অস্পৃশ্য জাতির গাড়ী। ভাড়া নয়, গোটা গাড়ীটার দাম লাগিয়াছিল। গাড়ীতে শব চাপাইয়া ওই লোকটিই গরু চালাইয়াছিল। চারুর বাপ এবারও হরি বলিয়া 'না' বলিয়াছিল। বলিয়াছিল—আমি হরি বলে যেতেও পারব না মুখে আমি আগুনও দিব না, হরিবোল, সংসারে কে কার ? যেতে হয় তুই যা। আমি হরি বলে বরং ঘুরে আসি খানিক।

চারু আর কোন অনুরোধ বাপকে করে নাই। এই লোকটিকে সঙ্গে করিয়া সে গাড়ীর সঙ্গে গিয়া মায়ের শব নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল।

চারু আজ সে কথা বলিতে গিয়া চোখের জল ফেলিল। সেদিনও ফেলিয়াছিল। বলিয়াছিল—অনেক জ্বলেছ ; পোড়াতে পারলাম না, কিন্তু তার জন্যে খেদ নাই। জলে ভেসে জুড়াও তুমি। সেখান হইতে বাড়ি ফিরিয়া আর বাপকে দেখিতে পায় নাই। প্রথমটা ভাবিয়াছিল, বোধ হয় কোথাও নির্জনে বসিয়া সে হরিনাম জপ করিতে গিয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত যখন ফিরিল না, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। কিন্তু খোঁজ কে-ই বা করিবে ? সে নিজেই একবার পথে নামিয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইয়াছিল, কোথায় খোঁজ করিবে ?

ঠিক সেই সময়েই এই লোকটি আসিয়া বলিয়াছিল—চাকরিতে আমি জবাব দিয়ে এলাম চারু।

—জবাব দিলে ?

—আমি দিলাম না। বাবুই জবাব দিলেন। বললেন—তোমার বদনাম শুনেছিলাম, গ্রাহ্য করি নাই। আজ তুমি সদর রাস্তা দিয়ে ওই মেয়েটার মায়ের মড়া নিয়ে শ্মশানে গেলে! লজ্জা হল না তোমার ? এই নাও তোমার মাইনে। আমার বাড়ি থেকে চলে যাও। চলে এলাম।

চারুও আর দ্বিধা করে নাই, সে সম্ভাষণ জানাইয়া তাহাকে সেই গোধূলিলগ্নে জীবনে আবাহন করিয়া বলিয়াছিল—এস।

বাড়ির দুয়ারে তাহারা পা দিয়াছে, এমন সময় রাস্তা হইতে কে ডাকিল—কে ? কারা ?
চারু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিয়াছিল—কেন ?

—চারু ? শ্যামাদাসের মেয়ে ?

—হ্যাঁ। কে তুমি ?

—আমি নরোত্তম সিং !

নরোত্তম সিং ! তাহাদের গন্ধবেণে সমাজের ধনী ব্যবসায়ী নরোত্তম ! নরোত্তমই তাহাদের সমাজের সমাজপতি। কি চায় সে ? শাসন করিতে আসিয়াছে ? সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়াছিল —কি চাই ?

নরোত্তম কাছে আসিয়া বসিল—তোমার বাবা আজ আমাকে এ বাড়ি বিক্রী করেছে।

—বিক্রী করেছে ? চারু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

—হ্যাঁ। দুশো টাকা—রেজেস্ট্রী আপিসে গুনে নিয়ে দলিল রেজেস্ট্রী করে দিয়ে গিয়েছে।

—গিয়েছে ? কোথায় গিয়েছে ?

—সে জানি না। তবে গাঁ থেকে চলে গিয়েছে। বোধ হয় তীর্থ-ধর্ম করতে যাবে।

চারুর মুখে আর কথা ফুটে নাই।

নরোত্তম বলিয়াছিল—আজ রাত্রে তুমি অবিশ্যি থাকতে পার। কিন্তু কাল সকালেই আমায় বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

চারু কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—দাঁড়ান। না, দাঁড়াবেনই বা কেন ? আসুন আমার সঙ্গে। বাড়ীর ভেতরেই আসুন।—এস গো, এস। শেষে ডাকিয়া ছিল তাহার নবজীবনে বরণ করা এই মানুষটিকে।

বাড়ির ভিতর আসিয়া আপনার তোরঙ্গটা লইয়া লোকটির মাথায় তুলিয়া দিয়া বলিয়াছিল —চল।

নরোত্তমকে বলিয়াছিল—নেন আপনার বাড়ি, আজই এখুনি নেন।—চল গো চল।

নরোত্তম অবাক হইয়া গিয়াছিল; তারপর বলিয়াছিল—আজই তো আমি যেতে বলি নাই। আজ তো থাকতেই বলছি।

—বলেছেন। কিন্তু আমি তো আপনার হুকুমের দাসী নই। আমি আজই যাব।

—কিন্তু জিনিস-পত্র ? ঘড়া ঘটি বাসন হাঁড়ি-কুঁড়ি বিছানা—

—ওসব আমার নয়। আমার এই তোরঙ্গটা আর—হ্যাঁ, ভাল মনে করিয়ে দিয়েছেন— এই পুরু তোশক বিছানা আমি করিয়েছিলাম। ওটা নিতে হবে। বাকী যা সব থাকল। ইচ্ছে হয় ফেলে দেবেন। দয়া হয় রেখে দেবেন। দাদা আছে কাতরাসের কয়লা-কুঠীতে—জানেন তো ? আমাদের গাঁয়ের বাবুদের সঙ্গে খানসামার কাজ করতে গিয়েছে। সে এলে তাকেই দেবেন। নয়তো বাড়ি কিনেছেন, ওগুলো ফাউ হিসেবে নেবেন।—চল গো চল।

—বাক্স বিছানা মাথায় করে দুজনে পথে এসে দাঁড়ালাম ভাই। অন্ধকার রাত। দুনিয়াতে কোথা যাব, কি করব কিছু ঠিক নাই। আমি বললাম, চল। চল তো বটে। কিন্তু কোথা চল তার কিছু ঠিক নাই। শেষে ও বললে, দাঁড়াও। একখানা গাড়ী ভাড়া করে আনি।

গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহারা দুইজনে সেই রাত্রেই অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছিল। চারু বলিল—সেই আঁধার রেতে মনে হল যেন গেরাম নয়, পিথিবী ছেড়ে মায়াপুরীই বুঝি চললাম। গাড়োয়ান গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে। সে জানে, গাড়ী ভাড়া করে লোক ইস্টিশানে যায়। সে সেই পথেই গাড়ী ছেড়েছে। গরু দুটো ঠুকঠুক করে চলেছে। পথে জন-মনিষ্যির দেখা নাই, সাড়া নাই। শেষে গাড়ী যখন ইস্টিশানে এল তখন রাত তিন প্রহর। গাড়োয়ান বললে—নাম। আমরা নামলাম। ইস্টিশান দেখে মনে হল, বাঁচলাম। ভাড়ার ওপরে

গাড়োয়ানকে আমি দু-আনা পয়সা বেশি দিয়েছিলাম জলখাবার জন্তে। সে-ই যেন পথ দেখিয়ে দিলে—ধরিয়ে দিলে।

চারু চুপ করিল।

—তারপর কত জায়গা ঘুরলাম! এখান—ওখান। আমার খোকা হল। রাজপুত্তুরের মতো খোকা। সেই খোকা আমার দেড় বছরের হয়ে মারা গেল। ছিলাম রামপুরহাটে। ঘরদোর করেছিলাম। সেখান থেকে এলাম এখানে।

আবার সে স্তব্ধ হইল। এ স্তব্ধতা আর ভাঙিতে চায় না। দরদরধারে চারুর চোখ দিয়া শুধু জলই গড়াইতেছিল, কিন্তু এতটুকু শব্দ মুখ দিয়া তাহার ফুটিল না। তাহার সে খোকার জন্য এমন কান্নাই সে চিরদিন কাঁদিয়াছে, সেই প্রথম দিন হইতেই। এ বোধ তাহার জাগ্রত বুদ্ধি-বিচার করা বোধ নয়, সে বিলাপ করিয়া তাহার দুঃখ ঘোষণা করিয়া কাঁদিতে পারে নাই। সে জানে, তাহার দুঃখ পৃথিবীর লোক শুনিলে ঘৃণা করিয়া বলিবে—কি নির্লজ্জ মেয়েটা, পাপের ফলের জন্তে কাঁদে?

বহুক্ষণ পর লোকটি বলিল—ওঠ। আর কেঁদো না। পানুকে ফিরে পেলে; ওকে যত্ন করো। কিছু খেতে দাও। তারপর নিজ হাতে সাবান মাখিয়ে চান করাও দেখি।

স্নান করিয়া পানুর মনে হইল, সে যেন নূতন মানুষ হইয়াছে। এ যেন নূতন জীবন।

এগার

স্নান করিয়া মনে হইয়াছিল, সে নূতন হইয়াছে। হা-ঘরের জীবন ঘুচিয়া আবার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। ঘটনাটা আজ হইতে দীর্ঘকাল পূর্বের ঘটনা।

আজ পানুর বয়স প্রায় চল্লিশ। হা-ঘরের সংস্রব হইতে পলাইয়া যখন আসিয়াছিল তখন সে সত্ত জোয়ান। বয়স তখন ষোল কি সতের। তেইশ চব্বিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা। ঘটনাগুলি তাহার মনে পড়িয়া গেল বলিলে ঠিক হইবে না। চোখের সম্মুখে যেন সব ছবির মত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া একটির পর একটি পর পর ভাসিয়া গেল।

চোখের সম্মুখে বাছুরটা পড়িয়া আছে। তাহার চোখেও জল গড়াইতেছে, পানুর চোখ হইতেও ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সব তাহার মনে পড়িল। এইটুকুই তাহার শেষ নয়। ইহার পর আবার আরম্ভ হইল জীবনের নূতন ধারা। বিচিত্র ঘটনাচক্রে সে গিয়া পড়িয়াছিল আদিম সভ্যতার অন্ধকারে। আলোর আকর্ষণে সে ফিরিল। উঃ, কি মমতা এই জীবনের!

হঠাৎ তাহার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। নূতন জীবন, না, ছাই। তুলনা করিয়া দেখিল, হা-ঘরের জীবন এর চেয়ে ভাল ছিল। অনেক ভাল। তাহাদের মধ্যে থাকিলে সে এ জীবনের অপেক্ষা বহুগুণে সুখী হইতে পারিত। জমিদারের প্রজা নয়, মহাজনের খাতক নয়,—জ্ঞাত-জ্ঞাতের বালাই নাই, ঘর-দুয়ারের ঝঞ্ঝাট নাই, জমিজেরাত লইয়া মামলা নাই, সে জীবন এর চেয়ে অনেক ভাল। হাজার—লক্ষ গুণে ভাল। কতবার সে ভাবিয়াছে, এ সব ছাড়িয়া আবার সে বাহির হইয়া পড়ে তাহাদের সন্ধানে। কিন্তু আশ্চর্য মমতা ঘরদুয়ার, জমিজেরাত এবং এই সব মানুষগুলির, যাহাদের কোনক্রমেই সে আপনার করিতে পারিল না, সে নিজেও

যাহাদের আপনার হইতে পারিল না। যাহাদের অত্যাচারে অবিচারে সে জীবনে ঘর বাঁধিয়াও হা-ঘরেদের মত বার বার ঘর বদল করিয়াছে।

পানুর এই ঘরছুন্নার চতুর্থতম নীড়। ইহার পূর্বে সে আর তিন জায়গায় ঘর পাতিয়াছিল। কিন্তু ওই গ্রামের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া অথবা জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া সে সব ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। বর্বর জীবনের অভ্যাস লইয়া সে ফিরিয়াছে। ওই বর্বর জীবন তাহার শৈশবের অত্যাচারিত জীবনে—স্বজনচ্যুতির বেদনা, আহারে বিহারে আচারে আচরণে হাজার অভ্যাসের বিপরীত বন্য অভ্যাসকে জীবনে গ্রহণ করার অস্বস্তিকর দুঃখ সত্ত্বেও একটা মুক্তি আনিয়া দিয়াছিল। ভালবাসিতে সে জানে, ভাল সে বাসিয়াছে। কিন্তু ভালবাসার অপমান তাহার সহ্য হয় না; আঘাতকে সে ক্ষমা করে না। ভালবাসার জীবনে দুঃখ আসিলে দুঃখ মোচনের জন্য পানু প্রাণ দিতে পারে; কিন্তু তাহাকে প্রতারণা করিলে, দুঃখ দিলে, অপমান করিলে পানু তাহার জীবন লইয়া শোধ তুলিবে। এই শিক্ষা সে অর্জন করিয়া ফিরিয়াছিল। সে শিক্ষা তাহার দিন দিন কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া রুক্ষ পাহাড়ের মত আত্মঘোষণা করিয়া চলিয়াছে। কাহারও সঙ্গে তাহার মিলে না। প্রতিটি মানুষ তাহার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছে। ওই দিদি? ওই চারু? যাহাকে দেখিয়া মমতায় প্রায় আত্মহারা হইয়া বাবা বুধনকে, মায়ীকে, হা-ঘরের দলকে ছাড়িয়া পলাইয়া আসিল, সেই দিদির সঙ্গে কি ঘটিল?

তাহার সঙ্গেই কি বনিল? না, বনিল না। সে জন্যই তো জীবনে কোন দিন কাহাকেও ক্ষমা করে নাই। কেন সে ক্ষমা করিবে? লোকে তাহার উপর অত্যাচার করিলে সে তাহার শোধ লইবে। মানুষ, জানোয়ার, এমন কি পাখিকেও সে কোন দিন ক্ষমা করে নাই। কত কাক যে তাহার বাঁটুলের আঘাতে লুটাইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন জিনিস রৌদ্রে দিয়াছে, কাকে আসিয়া তাহাতে মুখ দিল, একবার তাড়াইয়া দিল—দুইবার, তিনবারের বার পানু বাঁটুলের ধনুকটা লইয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে হানিল মাটির গুলি; কাকটা মরিতেই কাক-সম্প্রদায়ের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী ঝাঁক বাঁধিয়া কাকগুলা কলরব আরম্ভ করিল; পানুরও বাঁটুল ছুটিতে আরম্ভ করিল। একটার পর একটা করিয়া কাক মরিল।

কুকুর সে ভালবাসে। নিজের পোষা কুকুর তাহার আছে। কিন্তু অন্য কুকুর আসিয়া কোন কিছুতে মুখ দিলে তাহার রক্ষা নাই, সে তাহাকে দুর্দান্ত প্রহার করে; নিষ্ঠুর কৌতুকে পিছনের পা দুইটা ধরিয়া বন-বন শব্দে পাক দিয়া ছাড়িয়া দেয়, হতভাগ্য জানোয়ারটা ছিটকাইয়া গিয়া পড়ে।

•

কিন্তু আজ তাহার এ কি হইল? এই বাছুরটাকে আঘাত করিয়া সমস্ত অন্তরাত্মা যেন হায়-হায় করিয়া উঠিল, তাহার বুকের মধ্যে যেন একটা ভূমিকম্পের কম্পন বহিয়া যাইতেছে।

শরৎকালের দুপুরবেলা।

পূজা চলিয়া গিয়াছে। আশ্বিনের শেষ। পৃথিবীর বুক গাঢ় সবুজ রঙে ভরিয়া উঠিয়াছে; আকাশ গাঢ় নীল। রৌদ্রের রঙ আতশী কাচের মত ঝলমল করিতেছে। গাছের পাতায় পাতায় সে প্রভার দীপ্তি, দূর্বার অগ্রবিন্দুগুলি পর্যন্ত রৌদ্রচ্ছটায় সবুজ মণিকণার মত মনে হইতেছে। এই সবুজের নেশা পানুর বড় ভাল লাগে। তাহার মনে হইল, সব যেন কালো কুৎসিত হইয়া গিয়াছে। বাছুরটা ততক্ষণে তাহার হাত চাটিয়া অনেকখানি যেন সাহস পাইয়াছে। সে পানুর মুখের দিকেই চাহিয়া আছে। তাহার কালো চোখটার উপর

মধ্যদিনের সূর্য একটি বিন্দুর আকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া জ্বলিতেছে।

পান্নু গভীর মমতার সহিত বাছুরটার পাঁজরাগুলির উপর হাত বুলাইয়া দিল। তারপর সে সযত্নে বাছুরটাকে তুলিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাছুরটা মাটির উপর পড়িয়া গেল। পিছনের একটা পা বোধ হয় একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে।

পান্নু এবার বাছুরটাকে কোলে তুলিয়া দাওয়ার উপর শোয়াইয়া দিল। হঠাৎ নজরে পড়িল, এখনকার বড় বউ রাজু একটা বড় বাটি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—কি? রাজু বলিল—মাড় আর দুধ। রাজু বাটিটা বাছুরটার মুখের কাছে ধরিল। বাছুরটা একবার তাহার দিকে চাহিল, তারপর বাটির খাদ্যবস্তুটা শুঁকিল; একবার জিভ দিয়া লেহন করিয়া দেখিল, শেষে গ্রীষ্মকালের বালিতে যেমন করিয়া জল শুষিয়া লয়, জলের ভিজা দাগটুকু পর্যন্ত যেমনভাবে মিলিয়া যায়, তেমনি ভাবেই বাটির দুধ-মেশানো মাড় খাইয়া শেষ করিয়া চাটিয়া মাড় ও দুধের চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিল। বহুদিন বোধ হয় এমন করিয়া কোন সুপেয় পানীয় খাদ্য খাইতে পায় নাই। পান্নু জানে, কেমন করিয়া নিঃশেষ করিয়া হতভাগ্য জীবটার মাতৃস্তন্য গৃহস্থেরা দোহন করিয়া লয়। সন্ধ্যা হইতে বাছুরটা বাঁধা থাকে, সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায়, তৃষ্ণায় ক্ষুধায় বাছুরটা চেঁচায়; দূরে বাঁধা থাকে তাহার মা; শুভ্র ক্ষীরভার তাহার স্তনভাণ্ডের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতে চায়, শিরাগুলা টনটন করে। সেও স্নেহের বেদনায়, দৈহিক যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া শাবককে ডাকে, শাবকের ডাকে সাড়া দেয়; রাত্রি শেষ হয়, মানুষ আসিয়া বাছুরটাকে আনিয়া বারেকের জন্য মাতৃস্তন্য লেহন করিতে দেয়। মাতৃস্তন্য-ভাণ্ডে—উথলিয়া উঠে শুভ্র ফেনিল ক্ষীর-সমুদ্র, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বাছুরটাকে টানিয়া ধরে, তারপর সেই উচ্ছ্বসিত ফেনিল দুগ্ধধারার শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত টানিয়া বাহির করিয়া লয়। বাছুরটা ইহার পর নিঃশেষিতক্ষীর মাতৃস্তনে মুখ দিয়া আঘাতের পর আঘাত করে, যেন মাথা কুটিয়া মরে, কিন্তু এক বিন্দুও পায় না। আবার দিনের অগ্রগতির সঙ্গে মাতৃস্তনে দুধ জমিতে শুরু হয়; মানুষ আবার শাবকটাকে সরাইয়া আনিয়া বাঁধে। অপরাহ্ণে আবার একবার দোহন করিয়া লয়। তাহারই মায়ের দুধে মানুষের দেহ নধর হইয়া উঠিয়েছে আর তাহার কচি লাবণ্য শুকাইয়া অস্থিপঞ্জসার হইয়া গিয়াছে।

আঃ, এখনও বাছুরটা জিভ দিয়া আপনার মুখ ঠোঁট চাটিতেছে!

পান্নুও সেদিন এমনিভাবে আপনার উচ্ছিষ্ট-মাখা হাতখানা বার বার চাটিয়াছিল।

সেদিন অর্থাৎ চারুর বাড়িতে যেদিন সে প্রথম ফিরিয়াছিল সেই দিন। স্নান করিয়াছিল প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া। দিদি একখানা সাবান দিয়াছিল। সাবান ঘষিয়া শরীর হইতে সে কী ক্লেদ বাহির হইয়াছিল! সাবান মাখার ক্ষীণ স্মৃতি তাহার ছিল। দিদি বলিয়াও দিল। হাতের উপর হাত ঘষিয়া বলিল—এমনি করে ঘষবি।

দিদির সেই লোকটি, তাহার নাম দীনু—দীননাথ। দীননাথ হাসিয়া বলিয়াছিল—তেল মাখ হে। নইলে শরীরে একেবারে চড়চড় করে ফেটে যাবে।

সাবান মাখা শেষ করিয়া তেল মাখিয়া আবার সে স্নান করিয়াছিল। সে যে তাহার মুক্তিস্নান। সভ্য সমাজের মধ্যে জন্মিয়া, তের-চোদ্দ বৎসর পর্যন্ত সেই সমাজের মধ্যে মানুষ হইয়া তাহার সুখ-দুঃখের সঙ্গে বত্রিশ বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছিল, ঘর বাড়ি সংসার, ঘোমটা-দেওয়া টুকটুকে বউ; বারো মাসে তেরো পার্বণ, দুর্গা-কালী-কার্তিক-ঠাকুর, যাত্রা-পাঁচালী-গান; বাংলা বুলি, ধানে ভরা ক্ষেত, মরাই ভরা খামার, পৈত্রিক বেনেতির দোকান—এই সব লইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের যে কল্পনা ওই চোদ্দ বৎসরের মধ্যেই অক্ষয়মূল দূর্বার মত তাহার

মনের ক্ষেত্রে জন্ম লইয়া ছিল, সে কল্পনা ওই যাযাবর জীবনের দীর্ঘ কয় বৎসরের প্রখর গ্রীষ্মেও মরিয়া যায় নাই। উপরের লতাজাল শুকাইয়া গিয়াছিল, রুকণী তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল, তবুও মনের ক্ষেত্রের গভীর তলদেশে তাহার মূলজাল ছিল অমর হইয়া। তাই যে মুহূর্তে আবার সে ফিরিয়া আসিল তাহার দিদির ঘরে, বাঙালীর সংসারে—সজল বর্ষার মত যাহার রূপ—সেই মুহূর্তেই আবার ক্ষেত্রের উপর দেখা দিল দূর্বাজালের সবুজ অঙ্কুরকণা। স্নান করিয়া সে বলিয়াছিল—বাঁচলম গো দিদি! আরে বাপ্ রে, কি গর্দা! আঃ, মন লিছে কি নতুন মানুষ হলম আমি।

তারপর তাহার দিদি তাহাকে খাইতে দিল। ভাত, ডাল, তরকারী, অম্বল। তাহার মাংসাসী রসনা যেন অমৃতের আস্বাদ পাইল। সে সেদিন রাক্ষসের মত আহার করিয়াছিল।

চারু বলিয়াছিল—আর খাস না পানু, অসুখ করবে।

দীনু ধমক দিয়াছিল—আঃ! না না, খাও, তুমি পেট ভরে খাও।

লজ্জিত হইয়া পানু তাহার হাতখানা চাটিতে চাটিতে উঠিয়া গিয়াছিল। ওই বাছুরটা যেমন বার বার জিভ দিয়া মুখ চাটিতেছে, তেমনি করিয়াই সে হাত চাটিয়াছিল।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! যেন গ্রীষ্মের সাঁওতাল পরগণার তৃণহীন লাল মাটিতে একটা প্রবল বর্ষণ হইয়া গেল, আর পরদিন প্রভাতে দেখা দিল তৃণাঙ্কুর! কোথায় ছিল এই তৃণাঙ্কুরের বীজ কি মূল? কেমন করিয়া ছিল মরুভূমির মত প্রান্তরে অগ্নিবর্ষী গ্রীষ্মে? সত্যই ধীরে ধীরে আবার তাহার মনের ক্ষেত্র সবুজ দূর্বার আস্তরণের মত কত আশা আকাঙ্ক্ষার জটিল জালে ভরিয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটা এমনভাবে জড়িত যে, একটাকে ধরিয়া টান দিলে সমস্ত লতার জালটাতেই টান পড়ে।

প্রথম টান সে অনুভব করিল কয়েক দিন পরেই। টান দিল তাহার দিদি।

সে নিজেই দিদির সংসারের কতকগুলা কাজ গ্রহণ করিয়াছিল। বাড়িতে দুইটা গরু ছিল, পানু সেই দুটার সেবা লইয়া পড়িল। ঘরের কাঠ কাটিত। ময়ূরাক্ষীর পার-ঘাটার উপর বাজার জায়গা, কাঠের গুঁড়ি কিনিতে হয়, মজুর লাগাইয়া সেই কাঠ খানা-খানা করিয়া লওয়ার রেওয়াজ। পানু বলিল—উ হামি করবে। কুড়াল দে দিদি।

একা সে প্রায় দেড়া মজুরের উপযোগী কাঠ চেলা করিয়া ফেলিল।

দীনু লোকটি অদ্ভুত। সে বার বার বারণ করিল—আর থাক—আর থাক।

পানু নিজের শক্তি দেখাইয়া তাহাদের বিস্মিত করিয়া দিতে চায়, আপনার সকল শক্তি প্রয়োগে কাজ করিয়া অকৃত্রিম আত্মীয় হইতে চায়, সে হাসিয়া বলিল—না, না, পারব, হামি অনেক পারব। আরও পারব।

চারু বলিল—হ্যাঁ, পানু পারবে। দেখ না তুমি। শরীর দেখছ না!

পানুর দেহ গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিল।

পরের দিনই সে কুড়ুল কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া গেল। কাহাকেও কিছু বলিল না। ময়ূরাক্ষীর তটভূমিতে সুদীর্ঘ ঘন জঙ্গল, বড় বড় গাছ; সেই জঙ্গলে চলিয়া গেল। জঙ্গল দেখিয়া সেদিন মনে পড়িয়াছিল যাযাবর জীবনের বন্য আস্বাদের তৃপ্তি; রুকণীকে মনে পড়িয়াছিল। ওই রুকণীর স্মৃতিই সেদিন তাহার যাযাবর আত্মীয়দের বিরহবেদনাকে লাঘব করিয়া দিল। রুকণী নাই, সেখানে আর কি সুখ আছে? বুড়া কাঁদিতেছে, বুড়ী কাঁদিতেছে, তাহাদের জন্য তাহারও চোখে জল আসিল। কিন্তু বুড়া-বুড়ী কয়দিন? তাহার পর? তাহার পর কোন্ সুখ সে সেখানে পাইত? সে জঙ্গলের একটা প্রাচীন গাছের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

বুড়া হা-ঘরে ওস্তাদ লোক—তাহাকে অনেক শিখাইয়াছিল; সেই শিক্ষা হইতে পানু জটিল লতাজালে আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড বড় গাছটাকে দেখিয়াই বুঝিল—এইখানে থাকেন জঙ্গলকে দেও, বনের দেবতা।

সে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেওতাকে প্রণাম করিল। বুড়ার শিখানো মন্ত্র পড়িল। তারপর বলিল—হে দেওতা! হে বাপা! তুমি বুড়া-বুড়ীকে দয়া করিয়ো—তাহাদের দুঃখে তুমি দেখিয়ো, আমার জন্য রাত্রে যখন বুড়া-বুড়ীর চোখে নিদ আসিবে না, জাগিয়া দুইজনে কথা বলিবে আর কাঁদিবে তখন তুমি ফুরফুর করিয়া বাতাস দিয়া তাহাদের চোখে নিদ আনিয়া দিয়ো। যখন তাহাদের অসুখ করিবে, তখন হে জঙ্গলকে দেও, বাপা, তুমি চোখের সামনে তাহাদের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়ো শিকড়-জড়ি। কিংবা সামনের মাটিতেই গাছ হইয়া থাকিয়ো, যেন তাহারা দাওয়াই পায়। আর হে জঙ্গলকে দেও, হে বাপা, আমার কসুর তুমি মাফ করিয়ো বাপা। আমি দল হইতে পলাইয়াছি—রুকণী নাই, আমি পলাইয়া আসিয়াছি। আমি তো হা-ঘরে নই, আমি ঘর-সংসারী জাতের ছেলে, আমি ঘর-সংসারে আসিয়াছি, তবুও আমি তোমাকে ভুলিব না। তোমার পূজা আমি করিব। তোমাকে 'পরণাম' আমি করিব। আমার কসুর তুমি মাফ করিয়ো। আমার দিদির ঘর তোমার জঙ্গলের কাঠে ভরিয়া দিয়ো। তোমার লতার ফুল দিয়ো, আমি সাদী করিয়া আমার পিয়ারীর চুলে পরাইয়া দিব। তোমাকে পরণাম করিতেছি বাপা।

তারপর সে অন্য একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখিয়া সেইটার উপরে উঠিয়া বড় একটা ডাল কাটিয়া ফেলিল। প্রকাণ্ড ডাল। সে ডাল বহিতে কয়েকখানা গাড়ীরই প্রয়োজন। পানু ডালটার খানিকটা অংশ কাটিয়া লইয়া কাঁধে বহিয়া বাড়ি ফিরিয়া দুম করিয়া ফেলিল।

—এ কি? এ কোত্থেকে আনলে? জিজ্ঞাসা করিল দীনু।

—জঙ্গলসে! গামছা দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া পানু বলিল—থোড়া পানি।

চারু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—ওইটা তুই জঙ্গল থেকে কাঁধে করে আনলি?

পানু অহঙ্কার করিয়া বলিল—হাঁ। আনলম। আওর বহুৎ কাঠ আছে দিদি। আনব। রোজ লিয়ে লিয়ে আসব। থোড়া পানি—জল দিদি।

জলের কথাটি চারু আমলেই আনিল না। বলিল—তোকে নিয়ে তো আমার বিপদ হবে পানু। জঙ্গল সরকারের। জঙ্গলে মহলদার আছে। ধরে যখন থানায় দেবে, তখন আমাদের নিয়ে টানাটানি করবে যে। এ তোমার হা-ঘরের দল নয় যে, এল, দু দিন থাকল, দুটো কাঠ-কুটো কাটল—মহলদার কিছু বললে না। এ দেখলেই পুলিসে দেবে।

পানু পুলিসের আর ভয় করে না। তবু তাহার মনে একটা সুপ্ত ভয় আছে। সে বিস্মিত এবং ঈষৎ আতঙ্কিত হইয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রইল।

দিদি বলিল—আগার সুসার করে তোমার কাজ নাই। ওসব করলে ভাই আমার ঘরে তোমাকে ঠাঁই দিতে পারব না।

দীনু বলিল—আঃ কি বলছ? ওকে সে আমি বুঝিয়ে দোব পরে। এখন বেচারা জল চাইছে, জল দাও।

পানু অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছিল। দিদির কথায় সে একটু বেদনাও অনুভব করিল। মনে পড়িল হা-ঘরের দলের কথা।

চারু গজগজ করিতে করিতে একটা ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া বলিল—নে, হাত পাত।

দীনু বলিল—একটা কিছুতে করে দাও না।

—কিছুতে করে? আমার বাসনে ওকে খেতে দোব নাকি? ওর কি জাত আছে? হা-ঘরের দলে কি না খেয়েছে? মায়ের পেটের ভাই বলে ওর দায়ে জাত-ধর্ম্ম সব জলাঞ্জলি দেব নাকি?

পানুর বুকে কথাটা তীরের মত গিয়া বিঁধিয়াছিল। দিদি বলিতেছে, তাহার জাত নাই। তবে সে দিদির ভাই কি করিয়া হইবে? তবে সে কেন ফিরিল? অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে হয়তো সেই বিচিত্র চীৎকার করিয়া উঠিত; কিন্তু তাহার পূর্বে দীনু নিজেই একটা টোল খাওয়া কলাই-উঠিয়া-যাওয়া স্টীলের গেলাস আনিয়া দিয়া বলিল—পানু, এইটাতে তুমি জল খাবে।

চারু বলিল—খাবে, কিন্তু ওটা বাইরে রাখবে। আমাদের বাসনের সঙ্গে ঠেকাবে না।

জল খাইতে গিয়া পানুর চোখের জল গেলাসের জলের সঙ্গে মিশিয়া গেল।

বারো

সেই স্টীলের গেলাসটা আজও তাহার কাছে আছে। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রাখিয়া দিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষকেই সে ঘৃণা করে, কিন্তু দিদির উপর ঘৃণা তাহার সবচেয়ে বেশী। না, সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে সে ঘৃণা করে না। দিদির সেই মানুষটি—সেই দীনুকে সে ভালবাসে। আরও ভালবাসে সেই হা-ঘরেদের—সেই ওস্তাদ বুড়া, সেই বুড়ী আর রুকণী। হ্যাঁ, রুকণী তাহাকে প্রতারণা করিয়া থাকিলেও তাহাকে সে ভালবাসে। রুকণী প্রতারণা করে নাই, ওটা তাহার ভুল। আঃ, রুকণী যদি না মরিত, তবে সে কখনই আবার ফিরিয়া এই স্বার্থপর বদমাইশ মানুষগুলার মধ্যে আসিত না। কখনই না। রুকণী! রুকণী! তাহার রুকণী! রুকণীকে তো সে নিজেই মারিয়া ফেলিয়াছে। রুকণী তো তাহারই ছিল। সে তো তাহার পানুয়াকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসিত; এ কথা সে নিজেই তো সকলের চেয়ে বেশী জানে! রুকণীর দোষ, রুকণী একমাত্র তাহাকেই ভালবাসে নাই। অল্প খানিকটা ভালবাসা সে অন্যকেও দিয়াছিল। পানু নিজে তাহার জীবনে বেশ করিয়া বুঝিয়াছে, রুকণীর মত অন্যকে অল্প খানিকটা ভালবাসা দিবার জন্য প্রাণ কতখানি ব্যাকুল হয়! সে নিজে এই বয়সে চারবার বিবাহ করিয়াছে—একটা মরিয়াছে, একটা পলাইয়াছে, এখনও দুইটা ঘরে রহিয়াছে। রুকণীর কথা মনে হইলেই মন তাহার উদাস হয়, সে কাঁদে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহার স্ত্রীদের সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠে। তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখে। স্ত্রীদের কেহ কাহারও সহিত হাসিয়া কথা বলিলে তখন দুর্দান্ত প্রহারে তাহাকে শাস্তি দেয়। ঘরে বন্ধ করিয়াও রাখে।

রুকণী মরিয়াছে, সে দুঃখ তাহার যাইবার নয়। কিন্তু তাহার দিদি যদি এমন কঠিন দুঃখ না দিত, তবে সে এমন দুর্দান্ত ক্রোধী হইত না। তাহার নিজের জীবনের চেহারাটা যেন এই মুহূর্তে তাহার চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কত মানুষকে যে সে মারিয়াছে! চড়-চাপড় মারার হিসাব নাই, লাঠির আঘাতে কত জনের রক্তপাত সে করিয়াছে তাহার হিসাব যেন স্পষ্ট হইয়া অঙ্কের যোগফলের মত পানুর চোখের সামনে ভাসিতেছে! প্রথমেই সে মারিয়াছিল—লাঠি মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল দিদির ও দীনুর গুরুঠাকুরের, তাহার নিজেরও গুরুঠাকুর ছিল সে।

ওই জল খাওয়ার ঘটনা হইতেই ঘটনাটার উদ্ভব। দীনু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ভাঙা

তোবড়ানো স্টীলের গেলাসটা দিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার মনের দুঃখ গেল না। কেমন করিয়া তাহার জাত ফিরিয়া পাইতে পারে এই ভাবনায় সে আকুল হইয়া উঠিল। জাত ফিরিয়া পাইলে সে তাহার দিদিকে ফিরিয়া পাইবে। দিদি তাহাকে ছুঁইলে স্নান করিবে না। পিঠে গায়ে হাত বুলাইয়া দিবে। তাহার মায়ের পেটের দিদিকে সে সত্য সত্য ফিরিয়া পাইবে।

দিদির বাড়ির বাহিরে বসিয়া থাকিত সে। একদিন গিয়াছিল বাজারে। দুপুরবেলা। বাজারে লোকজন বেচা-কেনা কম। একজন বুড়ো দোকানী সুর করিয়া কি পড়িতেছিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাহার বাবাও সন্ধ্যাবেলায় এমনি করিয়া কি পড়িত! রামায়ণ পড়িত। দীর্ঘদিন হা-ঘরেদের দলে থাকিয়া অন্যান্য পুরাণ-কাহিনী অনেক গোলমাল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রামায়ণটা মনে আছে। হা-ঘরেদের দলে রামনাম আছে। সীয়ারাম সীয়ারাম ধ্বনি তাহাদের মুখস্থ। অনেকের সর্বাঙ্গে উল্কি দিয়া রামনাম লেখা থাকে। বুধনের গোটা কপালটায় রামনামের উল্কি ছিল। সে দাঁড়াইল। দোকানীর সুরেলা কথাগুলির মধ্য হইতে রামনামটা কয়েকবার কানে আসিয়া ঢুকিল। মুদী পড়িতেছিল—

"মনুষ্য গো-হত্যা আদি যত পাপ করে।
একবার রামনামে সর্বপাপ হরে॥
মহাপাপী হইয়া যদি রামনাম কয়।
সংসার-সমুদ্র তার বৎস-পদ হয়।"

পানু বসিল। রামজীর নাম হইতেছে! সীয়ারাম! সীয়ারাম!

মুদী সুর করিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত কথার অর্থ না বুঝিলেও শুনিতে শুনিতে মনের মধ্যে অতীত কালের শোনা গল্প ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। মনে পড়িল, চোর রত্নাকর নামে এক ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল, সে মানুষ মারিত। তারপর একদিন ছলনা করিয়া ব্রাহ্মণের বেশে তাহার কাছে আসিল নারদমুনি। ব্রহ্মাকে তাহার মনে পড়িল না। মুদী বার বার ব্রহ্মার নাম করিল। নামটা পানুর চেনা-চেনা মনে হইল, কিন্তু সে যে কে, সঠিক ঠাওর করিতে পারিল না। কিন্তু নারদমুনিকে তাহার মনে আছে। যাত্রার দলে. পাঁচালীর দলে কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। ঢেঁকিতে চড়িয়া যায়, ঝগড়া বাধাইয়া বেড়ায়, একতারা লইয়া গান করে। পাকা চুল, পাকা দাড়ি—নারদকে তাহার মনে আছে।

নারদ মুনি রত্নাকরকে রামনাম দিয়াছিল। যে মহাপাপ রত্নাকর করিয়াছিল সেই পাপক্ষয়ের জন্য রামনাম দিয়াছিল। রত্নাকরের মুখে কিন্তু কিছুতেই রামনাম আসে না। শেষে অনেক কষ্টে বলিল—মরা। মরা মরা বলিতে বলিতে আসিল রাম রাম রাম।

মুদিও পড়িল—

"মরা মরা বলিতে আইল রামনাম।
পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ॥
তুলারাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়।
একবার রামনামে সর্ব পাপ ক্ষয়॥"

পানু পরম আশ্বাস পাইয়া বাঁচিল। সে রাম রাম সীতারাম জপ করিতে করিতে ময়ুরাক্ষীর নির্জন তটভূমিতে গিয়া সেদিন সমস্ত অপরাহ্ণবেলাটা অবিরাম উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়াছিল—রাম রাম সীতারাম। তারপর সন্ধ্যায় সে ময়ুরাক্ষীতে একবার স্নান করিয়া বাড়ি ফিরিল।

চারু ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল—বলি আবার গিয়েছিলি কোথা?

দীনু আলো জ্বালাইয়া একখানা বই লইয়া বসিয়াছিল। সে হাসিয়া সস্নেহে বলিয়াছিল

—কি হে, গিয়েছিলে কোথা? আবার চান করলে যে?

চারু বলিল—করবে না! শরীরে ওর ডাহ কত! কত কত অখাদ্যি কুখাদ্যি খেয়েছে—শরীর একেবারে গরম হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র ঘৃণার ভঙ্গিতে শিহরিয়া উঠিবার ভান করিয়া উঠিল।

পান্নু ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল দীনুর কাছে। চারুর কথাগুলি তাহাকে যেন চাবুক মারিল।

চারু চলিয়া গেল ঘরের মধ্যে। সে ঘরের মধ্যে যাইতেই পান্নু মৃদুস্বরে দীনুকে বলিয়াছিল—আজ হামার সব পাপ গেল। বহুৎ বললাম—রাম রাম রাম—সীয়ারাম সীয়ারাম সীয়ারাম।

দীনু তাহার মুখের দিকে চাহিল।

পান্নু আবার বলিল—হামার জাত তো আমি পেলম। হামার পাপ তো গেল—তাহার কথার মধ্যে প্রশ্নের সুর ছিল না; সঠিক উপলব্ধির বার্তা ছিল।

দীনু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কিছু ভাবিতেছিল।

পান্নু তাহার হাতের বইটার দিকে আঙুল দেখাইয়া প্রশ্ন করিল—রামায়ণ? বলিয়া সে অসঙ্কোচে বইটা খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু কালো গুটি গুটি চিহ্নগুলার একটাকেও সে চিনিতে পারিল না।

দীনু বলিল—যাও, কাপড় ছাড়। তোমার জাতের ব্যবস্থা করছি।

পান্নু ও-কথাটা বিশেষ বুঝিল না। কিন্তু বইখানার অক্ষরগুলা চিনিতে না পারিয়া অত্যন্ত বেদনাবোধ করিল। মনে পড়িল তাহার স্কুল-জীবনের কথা। কত বই, কত ছবি, কত গল্প, কত ছড়া—বই খুলিয়া সে পড়িত। অনেক গল্প অনেক ছড়া তাহার মনে আছে। কিন্তু আখরগুলা দিদির মত পর হইয়া গেল নাকি? অন্তরটা তাহার হায় হায় করিয়া উঠিল।

পরদিন বাজারে গিয়া তাহার চোখে পড়িল একটা মনিহারীর দোকানে কতকগুলা রঙচঙে বই। বইগুলাকে চেনা মনে হইল। একটা বই লইয়া খুলিয়াই সে আনন্দে অধীর হইয়া গেল। রঙচঙে বইটার প্রথম পাতাতেই বড় বড় হইয়া বিচিত্র বর্ণে ফুটিয়া আছে—অ-আ-ই-ঈ। দেখিবামাত্র সে চিনিল। যেমন দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল তাহার দিদির মুখ, যেমন দেখিবামাত্র চিনিতে পারিবে তাহার বাপের মুখ, তাহার মরা মা যদি আজ ফিরিয়া আসে তবে তাহার মুখও যেমন দেখিবামাত্র সে চিনিতে পারিবে, তেমন ভাবেই সে চিনিতে পারিল—অ-আ-ই-ঈ।

সে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল—কেতনা দাম।

দোকানী বলিল—দু আনা।

গেঁজলে খুলিয়া সে সঙ্গে সঙ্গে বইখানা কিনিয়া বাড়ি ফিরিল। সেদিন দুপুরবেলায় আবার সে ময়ূরাক্ষীর নির্জন তটভূমিতে তন্ময় হইয়া বইখানার মধ্যে ডুবিয়া গেল। একে একে সব মনে পড়িল। চোদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত সে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলাকে আয়ত্ত করিয়াছিল—এই কয় বৎসরের অপরিচয়ে তাহার উপর যে বিস্মৃতির আবরণ পড়িয়াছিল তাহার পরিমাণ যতই হোক, দেখিতে দেখিতে সেগুলা কাটিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। তখন সে পড়িতেছিল—জল পড়ে, পাতা নড়ে।

বাড়ি ফিরিতেই দীনু তাহাকে বলিল—পান্নু তোমার ব্যবস্থা করলাম হে। আমাদের গুরু গোসাঁই আসছেন, তুমি ভেক নাও, আমরাও বোষ্টম হয়েছি, তুমিও ভেক নাও। নিলেই সব গোল মিটে যাবে।

বোষ্টম! মনে পড়িল তিলক কাটিয়া মালা পরিয়া বাবাজীরা ভিক্ষা করিতে আসিত।

মন্দিরা বাজাইয়া গান করিত। সে গানেরও খানিকটা মনে আছে।

মনে পড়িয়া গেল, 'হরিনামের গুণে গহন বনে ডাকলে নিতাই পার করে' গান গাহিয়া বৈশাখে সংকীর্তনের দল বাহির হইত। মাখন মশায় ছিলেন মূল গায়েন। সেও কতদিন দলের সঙ্গে বাহির হইত। গানের সঙ্গে নাচিত।

কয়েক দিন পরেই গুরুঠাকুর আসিলেন। পানুর মাথা ন্যাড়া করিয়া দেওয়া হইল। গলায় মালা পরাইয়া দিল। তিলক ছাপ দিল কপালে। পানু বোষ্টম হইয়া গেল।

পানুর দিদি তাহাকে স্পর্শ করিল। কিন্তু তবু খাইতে দিবার সময় খাইতে দিল পাতায়। পানুর উৎসাহ আনন্দ যেন নিবিয়া গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা। দীনু তাহাকে বলিল—এস হে পানু, নদীর ধারে গুড়ের গাড়ী এসেছে দেখে আসি। পানু তাহার সঙ্গে গেল। পথে দীনু তাহাকে কত বলিল; বলিল—ভিয়েনের কাজ শেখ। তারপরে নিজে দোকান কর, বিয়ে কর। ঘর সংসার হোক।

নদীর ধারে গুড়ের গাড়ী আসিয়াছে। দোকানীরা ভিড় করিয়া ঘিরিয়া বসিয়াছে। এখন গুড় কিনিয়া রাখিবে। গোটা বৎসর এই গুড় হইতে মুড়কী পাটালি তৈয়ারী করিয়া বেচিবে। দীনুও কিনিয়া ফেলিল কয়েকটা টিন।

পানুকে বলিল—ওহে, একটা কাজ যে ভারী ভুল হয়ে গেল। ভার বইবার বাঁকটা আনলে তুমি দুটো টিন নিতে, আমি একটা নিতাম। যাও, একটা টিন বাড়িতে রেখে তুমি বাঁকটা নিয়ে এস।

বাঁক আনিবার জন্য পানু ফিরিতেছিল, ময়ূরাক্ষীর তীরভূমি ধরিয়া বসতির পিছনে শর-জঙ্গলে ভরা পতিত ভূমি—তাহারই মধ্য দিয়া পায়ে-চলা পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাজারের পথটা ঘুরপথ। তা ছাড়া বাজার-পথে লোকের ভিড়। এই কারণেই পানু বাজারের পথের চেয়ে এই পথটাই পছন্দ করে বেশী। হা-ঘরেদের সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করিয়া এইসব কাপড়-জামা-পরা ঘর-বাঁধিয়া-বাস-করা লোকগুলিকে পানু অবিশ্বাসও করে, হিংসাও করে। এইসব গাঁইয়ারা ভয়ানক আদমী। বুধন বলিত—বহুৎ হুঁশিয়ারি এদের সঙ্গে। জঙ্গলে গাছের উপর চুপ করে বসে থাকে পাজীর সর্দার চিতাবাঘ, সাড়া না, শব্দ না, তোমাকে যেই কায়দায় পাবে, অমনি ঝপ করে লাফ দিয়ে পড়বে তোমার ঘাড়ে। ঘাড়টা ভেঙে প্রথমেই খাবে তোমার বুকটা ফেড়ে তোমার কলিজা।

ভয়টা পানুর মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া এই সব সভ্য মানুষগুলির মধ্যে সে তাহার বন্য বর্বর স্বভাব ও অভ্যাস লইয়া ঘোরাফেরা করিতে কেমন সঙ্কোচ, কেমন অস্বস্তিও অনুভব করে। লোকগুলি ইহারই মধ্যে জানিয়া ফেলিয়াছে যে, সে হা-ঘরের দলের লোক। দীনু তাহাকে বশ মানাইয়া নিজের ঘরে রাখিয়াছে, পেট-ভাতায় একটা অসুর পাইয়াছে, অসুরের শক্তি লইয়া দীনুর সংসারে কাজকর্ম করে। তাহাকে আঙুল দিয়া দেখায়। তাহাকে ডাকে। বলে—আমাদের ঘরে কাজ কর না কেন! পানুর ইচ্ছা হয়, দাঁত বাহির করিয়া গোঙাইয়া থাবা মারিয়া উহাদের নাকটা ছিঁড়িয়া আনে। বলে—আমি হা-ঘরে নেহি, দিদির ভাই আছে। নোকর নেহি। কিন্তু সে উপায় নেই। চারু বলিয়া দিয়াছে—খবরদার! ভাই-টাই এ সব বলিস না পানু। খবরদার, হাজার ফ্যাসাদ হবে!

তা ছাড়া ঘুরপথও পানু পছন্দ করে না। সোজা পথ যখন আছে তখন ঘুরপথে ঘুরিবে কেন? ঘুরুক উহারা, ওই সব গেঁইয়া ডরফোক্‌নারা ঘুরুক। বুধন বলিত—রামজী বলিয়াছেন, ঘুরপথে ঘুরিবে না। সোজা পথে চলিতে দেও আসে, দানো আসে, রাক্‌সস্ আসে, তুমি লড়াই

করিয়া অহাকে নিধন করকে' চলিয়া যাও। এতনা বড়া দুনিয়া, বাপ রে বাপ, কত যে বড় তাহার হিসাবনিকাশ নাই, তুমি যত যত চলিবে, শেষ মিলিবে না; চলো না, দেখো, ওই যে দূরে মনে হইতেছে, 'আকাশ আওর দুনিয়া' মিলিয়া গিয়াছে, সব শেষ হইয়া গিয়াছে, পৌঁছো না হুঁয়া! মনে তো তোমার হইতেছে, এই তো! কিন্তু চল তো এইটুকু পথ, চল, দৌড়! তুমিও চলিবে, ও-ও চলিবে। তুমি ধীরসে যাইবে তো ও চলিবে ধীরে। তুমি দৌড়াইবে, ও দৌড়াইবে। তুমি দাঁড়াইবে, ও দাঁড়াইবে। দুনিয়ার শেষ্ নাই। এই দুনিয়ায় আবার তুমি যদি ঘুরপাকে হাঁটো, তবে কতটুকু হাঁটিবে তুমি? ভগোয়ান দুনিয়াতে মানুষকে জনম দিলে, পাঠাইলে,—ঘুরে এস, দেখে এস তামাম দুনিয়া। জনম-জনম তাই ঘুরছি আর ঘুরছি আর ঘুরছি। এই ঘুরে ঘুরে যে জনমে তানাম দুনিয়া হাঁটা শেষ হবে—সেই জনমে খতম। আর তোমাকে জনম নিতে হবে না। ঘুরপথে হেঁটে—জনমের ফের বাড়াবে কেন? চলো, সোজাপথে চলো।

পানু তাই ঘুরপথ পছন্দ করে না। সে সোজাপথে ওই জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে চলিয়াছিল। ঘাস-জঙ্গলটার ভিতর সাপ আছে, বিচ্ছু আছে, শিয়াল আছে, দুই-চারিটা ছোট জানোয়ার আছে, এ সবকে গেঁইয়ারা ভয় করে করুক, সে করিবে কেন? সে দিদির মায়ায় ফিরিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া ওই গেঁইয়াদের মত ভয়ে ঘুরপথে ঘুরিবে নাকি? তাহা সে ঘুরিবে না। ভয়ও কিছুকে করিবে না। সীয়ারাম—হরিবোল বলিয়া সে নির্ভয়ে হাঁটিবে। গুরু আজ তাহাকে বলিয়াছে—কিছু না, তুই শুধু হরিবোল বলিবি। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। যখন সুবিধা পাইবি তখনই বলিবি, হরিবোল—হরিবোল! বাস্, তাহাতেই হইবে। পরে আবার আসিয়া যাহা করিবার করিব। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল, সীয়ারাম—সীয়ারাম।

শা—লা! থমকিয়া দাঁড়াইল পানু! কি একটা গোঙাইতেছে! আশেপাশে ভাল করিয়া দেখিয়া পানু হাসিয়া ফেলিল। শা—লা! একটা সজারু। উল্লুক বদমাস বুরবকের যেমন বে-আক্কেল তেমনিই দশা হইয়াছে! একটা ঘন শরঝোপের মধ্যে বসিয়া বোধ হয় পানুকে দেখিয়াই কাঁটা ফুলাইয়া বিক্রম দেখাইতে গিয়াছিল, এখন শরগাছ ও পাতার ফাঁকে কাঁটাগুলা আটকাইয়া না পারিতেছে পলাইতে, না পারিতেছে কাঁটাগুলা গুটাইতে। একটা কাঁটার গোল তালের মত উল্লুকটার অবস্থা হইয়াছে। সীয়ারাম—হরিবোল! পানু সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়া লইল একটা মোটা দেখিয়া পাথর। ময়ূরাক্ষীর গর্ভে, বিশেষ করিয়া সাঁওতাল পরগণার প্রান্তদেশে পাথরের অভাব নাই। পাথরটা লইয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে সে সজারুটার মাথায় মারিয়া দিল। খুব খানিকটা চীৎকার করিয়া সজারুটা মরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের ওপাশ হইতে একটা কি ছুটিয়া পলাইল। হরি হরি! শেয়াল! না, ওটা বোধ হয় নেকড়ে বাঘ। ওটাই সজারুটাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাই ও কাঁটা ফুলাইয়া বিক্রম-ভরে চীৎকার করিতেছিল। যাকগে, পানু খুশীই হইল। সজারুর মাংস খুব ভাল, চমৎকার। ভালই হইয়াছে। গুরু আসিয়াছেন, চমৎকার মাংস খাইয়া খুশীই হইবেন। হাঁ হাঁ, নিশ্চয় খুশী হইবেন! লোকটি খাইতে খুব ভালবাসে। খুব যত্ন করিয়া তাহার দিদি তাহাকে খাওয়ায়। দুধ, কলা, ডাল, ঘিউ, চমৎকার চালের ভাত, লুচি খাইতে দিয়া হাতজোড় করিয়া বসিয়া থাকে।' পানু সজারুটা তুলিয়া লইল। মাথাটা চুর হইয়া গিয়াছে, টপটপ করিয়া রক্ত ঝরিতেছে। সেটা লইয়া বাড়ি আসিয়া একেবারে গুরুর পায়ের উপর ফেলিয়া দিল। হাসিয়া বলিল—আনলম হামি। মারলম। তুমি খাবে, দিদি খাবে।

কিসে কি হইল পানু বুঝিল না, গুরু চমকাইয়া লাফাইয়া উঠিলেন। গুরুর পায়ে গায়ে সজারুর রক্ত লাগিয়াছে, দিদির গায়েও ছিটকাইয়া লাগিয়াছে; গুরুর পা কোলে করিয়া দিদি তাহাকে যত্ন করিতেছিল। গুরু লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—চণ্ডাল, চণ্ডাল, ব্যাধ—ব্যাটা ব্যাধ! তারপর দুই হাতে পানুকে মারিতে শুরু করিল।

দিদি হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওরে, কি পাপকে ঘরে ঠাঁই দিলাম রে, ওরে বাবা রে! ওরে ধম্ম গেল রে!

হাতে মারিয়াও গুরুর তৃপ্তি হইল না, একগাছা ঝাঁটা পড়িয়া ছিল তাই দিয়া পিটিতে শুরু করিল। এবার প্রচণ্ড ক্রোধে চীৎকার করিয়া উঠিল পানু, তারপর গুরুর ন্যাড়া মাথায় বসাইয়া দিল এক কিল। হয়তো আরও প্রহার সে করিত, কিন্তু পিছন হইতে দীনু হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল।

—হাঁ-হাঁ পানু—হাঁ-হাঁ।

পানু ঘুরিয়া তাকাইল। বলিল—হামাকে মারছে।

—গুরু, গুরু, পানু গুরু।

—হামাকে মারলে। ঝাঁটাসে মারলে।

গুরু চীৎকার করিয়া উঠিল, দীনুকে বলিল—হারামজাদা চণ্ডাল কখনও বৈষ্ণব হয়? আমার ধর্ম গেল—মালাতে লাগল রক্তের ছিটে! আর তোরা? তোরাও তা হলে এমনি ভাবে অখাদ্য কুখাদ্য খাস। রাধাশ্যাম! হরি হরি হরি! ওরে ব্যাটা চণ্ডাল!

গুরু আবার পানুকে প্রহার শুরু করিয়া দিল।

পানু এবার আর মানিল না, গুরুকে প্রচণ্ড ঠেলা দিল, গুরু বেচারা দাওয়া হইতে একেবারে সশব্দে উঠানের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। শুধু পড়িয়াই গেল না, কামানো মাথাটা একটা খোলার কুচিতে কাটিয়া মাথা মুখ রক্তাক্ত করিয়া দিল।

দিদি অকস্মাৎ উনানশালের শিল-নোড়ার নোড়াটা পাগলের মতই পানুর কপাল লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। নোড়াটা ছিল ভারী, চারু মেয়েছেলে—তাই পানুর কপাল মাথা বাঁচিয়া গেল, নোড়াটা আসিয়া পড়িল তাহার পায়ের উপর। একটি আঙুলের মাথা ছেঁচিয়া গেল। পানুর সে আঙুলটার আর নখ গজাইল না কোনদিন। ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল মুহূর্তে। দীনু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

* * *

তারপর—সেই দিনই—পানুর আপনজনের স্বপ্ন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। যে দিদির মমতায়, যাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য বুধন-বাবার, হা-ঘরে মায়ের স্নেহনীড় হইতে পলাইয়া আসিল, সেই দিদিই তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। কুকুরের মত খেদাইয়া দিয়াছিল তাহাকে। ঝগড়াটা তখন থামিয়াছে। গুরু স্নান করিলেন, গঙ্গাজল স্পর্শ করিলেন—তবু তাঁহার রাগ গেল না। তিনি জিনিসপত্র গুছাইতে আরম্ভ করিলেন—আজই চলিয়া যাইবেন গঙ্গাস্নানের জন্য। গঙ্গাস্নান না করিয়া জল পর্যন্ত মুখে দিবেন না!

চারু প্রথমটা বসিয়া বসিয়া কাঁদিল: দীনু চুপ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ছিল। পানুও কেমন হইয়া গিয়াছিল; ভাবিতেছিল, এ কি হইল? এ কি করিল সে? তাহার দিদি—! হঠাৎ চারু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আঙুল দেখাইয়া বলিল—মূর্তিমান পাপ, নরক—নরক! দূর কর—ওকে দূর কর বাড়ি থেকে।

পানু আর থাকিতে পারিল না, হাতজোড় করিয়া বলিতে গেল—আর হামি করবে না দিদি

এমন কাম—

পানুর বিনয় চারুর ক্রোধকে সবিক্রমে উৎসাহিত হইয়া উঠিবার সাহস দিল, সে মুহূর্তে জ্বলিয়া উঠিল। পাশেই পড়িয়া ছিল একগাছা ঝাঁটা, সেই ঝাঁটাগাছটা তুলিয়া লইয়া পানুকে পাগলের মত প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল, মাথায় মুখে বুকে, যেখানে-সেখানে, আর মুখে শুধু বলিল—বেরো বেরো বেরো বেরো!

ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল দীনু। ঝাঁটাগাছটা কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—করছ কি?

চারু চীৎকার করিয়া উঠিল—ওকে নিয়ে কি স্বগ্যে যাব আমি? যে পাপে আমি ডুবেছি, তা থেকে তরব কি করে? তুমি বেটাছেলে, তোমার পাপ নাই—পাপের ভয়ও নাই। আমি? গুরু নইলে তরাবে কে?

সে মাথা খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

চারু মাথা খুঁড়িয়া সে এক কাণ্ড করিয়া তুলিল। এখুনি বার কর। ওকে এখুনি বার কর বাড়ি থেকে। নইলে আমি মরব—মরব, মাথা খুঁড়েই মরব।

দীনু বলিল—পানু ভাই, এ বাড়িতে তোমার আর জায়গা হবে না।

পানু তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার বুকে একটা প্রচণ্ড বিদ্বেষ, ভীষণ আক্রোশ। যেমন আক্রোশ লইয়া সে কয়েক বৎসর পূর্বে বাহির হইয়াছিল অন্ধকার রাত্রে—সাহেবের কাছে নালিশ জানাইতে। শুধু আসিবার সময় তুলিয়া লইল কুড়ুলখানা।

কনকনে শীতের রাত্রি। পানু লোকালয় ছাড়িয়া আসিয়া বসিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর তট-ভূমিতে। ধূ-ধূ করা বালুচর, ওপারে ঘন জঙ্গল, আকাশে ছিল আধখানারও কিছু বেশী আকাশের চাঁদ। খানিকটা রাত্রি হইতেই শীতের ময়ূরাক্ষীর ছিলছিলে জলের ধারা হইতে কুয়াশা উঠিতে আরম্ভ হইল। রাত্রি দুপুরের সময় ভিজা বালির বুক হইতেও কুয়াশা জাগিল। বালুচরের উপর এখানে ওখানে শরের ও কাশের ঝোপ, পাতাগুলা পাকিয়া হলুদ হইয়া আসিয়াছে, মাথায় দুলিতেছে সাদা ফুল। মধ্যে মধ্যে শিয়ালগুলা ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। পানুর এসব দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। জনহীন প্রান্তরে তাহার ভয় নাই, নির্জন সুবিস্তীর্ণ বালুচরের বুকের কুয়াসা ও আকাশের চাঁদের আলোর কোন আবেদন তাহার মনের কাছে নাই। ঘন শীতের তীক্ষ্ণতাও তাহার গায়ে তেমন বিঁধিতেছিল না, দীর্ঘ দিনের যাযাবর-জীবনে এসবকে সে জয় করিয়াছে। সমগ্রভাবে এই পারিপার্শ্বিক কেবল তাহাকে বেদনাতুর করিয়া তুলিয়াছিল সেই যাযাবর সম্প্রদায়ের জন্য। মনে পড়িতেছিল বুধনকে, মনে পড়িতেছিল সেই বুড়ীকে। কেন? কেন সে তাহাদের ত্যাগ করিয়া আসিল? তাহারা তাহাকে এমন করিয়া খেদাইয়া দিতে পারিত না। মনে বার বার ইচ্ছা হইতেছিল, সে এই রাত্রে এখনি আবার তাহাদের সন্ধানে যাত্রা শুরু করে। পথে পথে বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে। কিন্তু প্রতিবারই পরক্ষণেই মন বলিয়াছিল, না—না—না। কোন্ মায়া, কিসের মায়া, সে সেদিনও বুঝে নাই, আজও বুঝে না। শুধু সেদিন মনে হইয়াছিল, গ্রামখানি বড় ভাল। কেমন ঘর দুয়ার, কত আরাম, কত জিনিস এখানে আছে। মানুষদের জামা-কাপড় পরিয়া কত সুন্দর দেখায়! এখানে এমনি ঘর বাঁধিবে, জিনিসপত্রে ঘর ভরিয়া তুলিবে। এমনি ভাল পরিষ্কার কাপড়-পরা টুকটুকে একটি মেয়েকে লইয়া ঘর করিবে। জামা-কাপড় পরিয়া এমনি ভদ্র মানুষ হইবে। আজ মনে হয়, সেদিন যে

সে যায় নাই, ভাল কাজই করিয়াছিল। আজ চারিপাশে সে একটা রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। বাগান, পুকুর, জমি-জমা, দুই-দুইটা স্ত্রী, গরু, বাছুর—কত সম্পদ তাহার! দুনিয়াতে কাহাকেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না। কাহাকেও না।

সমস্তই তাহার উপর গাছের দেবতার দয়া।

সেই রাত্রে কি করিবে মনঃস্থির করিতে না পারিয়া সে গিয়াছিল বৃক্ষদেবতার কাছে। কিছু-দিন আগে জঙ্গলে গিয়া যে দেবতাকে সে আবিষ্কার করিয়াছিল, সেই স্থানের উদ্দেশ্যে। দেবতার কাছে সে বলিতে চাহিয়াছিল, হে বাবা, হে দেবতা, তুমি বলিয়া দাও, আমি কি করিব? যদি বুধনের কাছে যাইতে বল, তবে স্বপ্নে বলিয়া দাও তাহাদের পাত্তা। কোথায় কত দূরে তাহারা এই শীতের রাত্রে তাঁবু ফেলিয়াছে বলিয়া দাও।

কনকনে ঠাণ্ডা ময়ূরাক্ষীর জল। সেই জল পার হইয়া পানু বনের প্রবেশমুখেই শুনিল একটা অদ্ভুত শব্দ। ক্যাঁ-ক্যাঁ করিয়া কোন একটা জানোয়ার চেঁচাইতেছে। শব্দ শুনিবামাত্র সে বুঝিল, কোন শক্তিমান জানোয়ার অপর কোন দুর্বলকে ধরিয়াছে। জানোয়ারের আওয়াজ সে চেনে। শুধু চেনে নয়, হা-ঘরেদের কাছে থাকিয়া সে বহু জানোয়ারের ডাক নকল করিতেও পারে। কিন্তু মরণ যখন চাপিয়া ধরে, তখন সব জানোয়ারের চীৎকারই এক রকম। মানুষ মরণকালে গোঙায়, সে গোঙানি পর্যন্ত ঠিক এই রকম।

পানুর চোখের উপর সব ভাসিতেছে।

ঘন জঙ্গলের ভিতরে জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে—চিতাবাঘের গায়ের গুলের মত যেন একটা প্রকাণ্ড কালো বাঘের গায়ে সাদা দাগের ছাপ। জঙ্গলের ভিতর দিয়া সন্তর্পণে সে আগাইয়া চলিয়াছিল। হাতের কুড়ুলটার মুঠা যেন লোহার মুঠা।

জানোয়ারটার মরণ-চীৎকার ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

হঠাৎ পানু থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখেই সেই বিরিখ-দেওতা বিরাট বনস্পতি। দেওতাকে প্রণাম করিয়া চুপি চুপি সে বলিল—কোথায় বাপা, কোথায় গরীবের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া দাও। দেখাইয়া দাও।

দেওতা মিথ্যা নয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখাইয়া দিলেন। জানোয়ারটা হঠাৎ আবার তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। বোধ করি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া শেষ চেষ্টা, শেষ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিল।

নিকটেই। খুব কাছে।

দ্রুতপদে পানু আগাইয়া গেল।

হাঁ। এই যে। এইখানে। সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মাটির ভিতর হইতে শব্দ উঠিতেছে। তবে? হাঁ, ঠিক বুঝিয়াছে পানু। সাপ! গর্তের মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া জানোয়ারটাকে ধরিয়াছে। বড় সাপ। পাহাড়ে চিতি। অন্যথায় এত বড় জানোয়ারকে ধরিবে কি করিয়া? অন্ধকারের মধ্যে পানুর চোখ জলজল করিয়া জ্বলিতেছিল। শয়তান! ওই গুরুঠাকুর! হাঁ, ওই গুরু-ঠাকুর। শয়তানের মুখ বাহিরে থাকিলে রক্ষা ছিল না। শয়তান পাক মারিয়া তাহাকে বেড়িয়া ধরিয়া পিষিয়া ফেলিত। 'শয়তানের এখন মুখ বাহির করিবার উপায় নাই। আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা হইয়াছে।

পানু বেশ ঠাওর করিয়া দেখিল, কোনখানে অজগরটা মুখ ঢুকাইয়াছে। হাঁ, এই যে। পাশে দাঁড়াইয়া পানু কুঁড়ুলটা দুই হাতে বাগাইয়া ধরিল। তারপর মাথার উপরে তুলিয়া দেহের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া কোপ বসাইয়া দিল। সবল জোয়ান পানু—তাহার উপর অস্ত্রখানা

ধারালো। এক কোপে সাপটা দুইখানা হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় হইতে লেজের দিকটা কিলবিল করিয়া বাঁকিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল। সে আক্ষেপ যেমন-তেমন নয়। যেন একটা ঝড়ের ওলট-পালট। পানু আনন্দে নাচিতে লাগিল। শয়তানকে সে বধ করিয়াছে—শয়তানকে সে বধ করিয়াছে।

ওই শয়তানকে মারার জন্যই বৃক্ষ-দেওতা তাহাকে তাহার মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

সাপটার ছিন্ন দেহখানার আক্ষেপ স্তব্ধ হইবার পর সাপটাকে দেখিতে দেখিতে পানুর খেয়াল হইল, পাহাড়ে চিতিটা খুব বড় না হইলেও ছোট নয়। চর্বি অনেকখানি আছে। হা-ঘরের দলে থাকিতে সাপ মারিয়া চর্বি বাহির করিতে শিখিয়াছিল। ভঁইষার দুধ হইতে ঘিউ তৈয়ারী করিয়া সেই ঘিউয়ের সঙ্গে চর্বি ভেজাল দিতে হা-ঘরেদের ওস্তাদী হাত। পাহাড়ে চিতির— ধামন সাপের মাংস খায় তাহারা। আঃ, আজ যদি তাহার ভঁইষাটা থাকিত, তবে এই চর্বিটা লইয়া বহুত মুনাফা করিতে পারিত। কমসে কম তিন-চার টাকা।

হঠাৎ তাহার মনে হইল, সে যদি একটা ভঁইষা কেনে, তবে কেমন হয়? ময়ূরাক্ষীর ধারে অফুরন্ত ঘাস। ঘাস খাইয়া ভঁইষার বাঁট এই মোটা হইয়া উঠিবে, প্রচুর দুধ দিবে। সে দুধ বেচিবে, ঘিউ করিবে—বেচিবে। মুনাফা হইবে। তাহার উপর এই জঙ্গলে গাছের দেবতা তাহার উপর সদয়, তিনি তাহাকে এমনি করিয়া এই সব চর্বিওয়ালা শয়তানের সন্ধান দিবেন, সে তাহাদের মারিয়া চর্বি বাহির করিয়া লইবে। তারপর ঘিউয়ের সঙ্গে মিশাইয়া বিক্রয় করিবে। দুনা মুনাফা হইবে। ভঁইষাটার বাচ্ছাটা বড় হইবে, সেটাকে বেচিয়া দিবে। তাহাতে মুনাফা হইবে। আবার একটা কি দুইটা ভঁইষা কিনিবে। দুইটা—চারটা—আটটা —দশটা, এক পাল ভঁইষা।

পানু পথ দেখিতে পাইল। দেওতা তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন। আপন গেঁজলেটা সে পরীক্ষা করিয়া দেখিল। টাকাগুলি বাহির করিয়া সাজাইল। গুনিয়া দেখিল। কয়েক মাস দীনুর কাছে থাকিয়া সংখ্যা-বিজ্ঞান আবার তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে। একশো পর্যন্ত সে বেশ্ গুনিতে পারে।

পঞ্চান্ন টাকা। সে ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হইয়াছে, পথ পাইয়াছে সে।

এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে জানোয়ারের হাট। পানু এই পথে যাতায়াত করিবার সময় কয়েকবারই সে হাট দেখিয়াছে। পঞ্চাশ টাকায় বেশ একটা ভঁইষার গাই মিলিবে।

কয়েক দিন পরেই পানু ময়ূরাক্ষীর চরের শরবনের শর কাটিয়া গাছের ডাল কাটিয়া একটা চালা তুলিয়া ফেলিল। তারপর একদিন হাট হইতে মহিষ কিনিয়া ফিরিল। চালাঘরের এক পাশে সবৎসা মহিষটাকে বাঁধিয়া অন্য পাশে সে বাসা গড়িল। তাহার জীবনের সে দিনগুলি মনে আছে। মাথায় দুধের হাঁড়ি লইয়া বাজারে চারুর ঘরের সামনে দিয়া হাঁকিয়া যাইত —দুধ—দুধ লিবে! কয়েক দিন জমাইয়া ঘিয়ের ভাঁড় লইয়া যাইত—ঘিউ—ঘিউ লিবে! ভঁইষা ঘিউ!

তেরো

পানু ভঁইষাটার নাম রাখিয়াছিল লছমী। সত্য সত্যই পানুর ভাগ্যে লক্ষ্মী হইয়া আসিয়াছিল। লছমী বোধ হয় কোন গরীবের ঘরে প্রতিপালিত হইয়াছিল; হাড়-পাঁজরা বাহির করা মহিষটাকে কেহই পছন্দ করে নাই। পছন্দ করিয়াছিল পানু। দামেও কম হইয়াছিল। পানু মহিষ চিনিত, সে দেখিয়াই বুঝিল—বুড়ী দেখাইলেও সে বুড়ী নয়। বয়স কম। কোন বাবুভেইয়ার ঘরের মহিষ, তাহারা দুধ খায়, গরু-মহিষকে খাইতে দেয় না। লছমীর কোলে একটা মাদী বাছুর। লছমীকে কিনিয়া আনিয়া ময়ূরাক্ষীর চরে বাসা বাঁধিল। সকালে উঠিয়াই লছমীকে লইয়া বাহির হইত। ফিরিত সন্ধ্যায়। চরভূমির নরম ঘাস খাইয়া লছমী ইচ্ছামত বিচরণ করিত।

প্রথম লছমী দুধ দিত চার সের। দ্বিতীয় মাসে পাঁচ সের পর্যন্ত উঠিল। ফাল্গুন-চৈত্রে লছমী চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া রোমন্থন করিত। আর পানু তাহার মোটা আঙুল দিয়া নরম বাট টানিয়া দুধ দোহন করিত;—একবারে এক দোহনে সাত সের দুধ লছমী ঢালিয়া দিত। সেই দুধ পানু বাজারে বেচিয়া আসিত। অবিক্রীত দুধ মথিয়া মাখন তুলিয়া ঘি তৈয়ারী করিত, নিজে পান করিত। দ্বিপ্রহরে ময়ূরাক্ষীর জলে লছমীকে বসাইয়া পরম যত্নে তাহার দেহের কাদা ক্লেদ ধুইয়া মুছিয়া স্নান করাইয়া দিত। তারপর মাখাইয়া দিত নারিকেলের তেল। হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ হইতে তেল গড়াইয়া পড়িত, রোদের ছটা লাগিয়া চকমক করিত। বৈকালেও গরু-মহিষ দুহিবার রীতি আছে, সকলেই দোহন করে। কিন্তু পানু কোনদিন লছমীকে বৈকালে দোহন করিত না। ও ভাগটা ছিল মংলীর। মংলী তাহাকে দিবে মঙ্গল।

কল্পনা তাহার মিথ্যা হয় নাই। লছমী বাঁচিয়াছিল দশ-এগারো বছর। মংলীর পরে আরও চারিটা সন্তান সে দিয়া গিয়াছে, দুইটা মরদ বাছুর—দুইটা বেটী। লছমীর দুধে ঘিয়ে সে অনেক পয়সা পাইয়াছে। মংলীও তাহার মঙ্গল করিয়াছে। মংলী যখন তরুণী হইয়া উঠিল, তখন সে তো তাহার প্রেমেই পড়িয়াছিল। মংলীর গলা ধরিয়া বসিয়া থাকিত, চুমা খাইত।

দীনু তাহার কাছে নিত্য আসিত। সে-ই তাহাকে উপদেশ দিয়া পথ ধরাইয়া দিয়াছে। সে-ই বলিয়াছিল—তুমি লক্ষ্মীমান পুরুষ পানু। কিন্তু ঘর নইলে লক্ষ্মী বাস করবেন কোথায়? তুমি ঘর কর। এই শর দিয়ে বাঁধা চালা, বর্ষার সময় এ চালা তো থাকবে না। তা ছাড়া এটা হল ময়ূরাক্ষীর চর, এখানে বান উঠবে যে!

ঘর! ঘর! ঘরেই সে জন্মিয়াছে, ঘরেই সে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাটাইয়াছে। ওই ঘরের টানেই সে হা-ঘরেদের ছাড়িয়া আসিয়াছে।

পানু মহা উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল—হ্যাঁ, ঘর করব। ঘর! ঘর! কয়েক মাসের মধ্যেই পানুর বাংলা বুলি আবার বেশ রপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

চৈত্র মাস। ময়ূরাক্ষীর চরভূমিতে বেশ ঝিরঝিরে হাওয়া বহিতেছিল—সন্ধ্যার পর শুক্লপক্ষের চতুর্থী কি পঞ্চমীর চাঁদ ঠিক সম্মুখে পশ্চিম-আকাশে; জ্যোৎস্নাটা পানুর চালার সামনেই আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই আলোতেই পানু দেখাইল—এইখানে এমনিভাবে সে ঘর করিবে।

দীনু হাসিয়া বলিল—তারপর বর্ষায় যখন বান আসবে?

হাঁ। বর্ষা! বান! কথাটা তাহার মনে হয় নাই! তবে? তবে কোথায় ঘর করিবে সে? সে দীনুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তবে?

দীনু বলিল—উঁচু জায়গা দেখে গাঁয়ের ও-মাথায় ঘর কর।

পরদিনই পানু গ্রামের ও-পাশে জায়গা দেখিয়া পছন্দ করিল। পছন্দ হইল যখন, তখন আর অপেক্ষা কিসের? বাজারের দোকান হইতে কোদাল, টামনা, শাবল কিনিয়া সে কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। লছমী-মংলীকে বলিল—যা, চরিয়া আয়। বেশী দূর যাস না যেন। খবরদার!

লছমী-মংলীকে ছাড়িয়া দিয়া সে মাটি কোপাইয়া ফেলিল। টিন-ভর্তি জল আনিয়া মাটির উপরে ঢালিয়া দিল। কাদা ভিজিয়া নরম হইলে আবার জল দিয়া কাদা করিয়া দেওয়াল দিতে আরম্ভ করিবে। বাস, দুই-কুঠারী ঘর। একটায় সে থাকিবে—অপরটায় থাকিবে লছমী ও মংলী। বাস।

ঠিক এই সময়েই একটা লোক আসিয়া হাজির হইল। জমিদারের পেয়াদা। ইহারই মধ্যে স্থানীয় কাছারিতে সংবাদ চলিয়া গিয়াছে। গম্ভীরভাবে লোকটা এই দিকেই আসিতেছিল। পানু দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারে নাই। লোকটার সঙ্গে তাহার পরিচয়ও আছে। ময়ূরাক্ষীর চরে ওই চালাটার জন্য একবার সে আসিয়া খাজনা দাবী করিয়াছিল। পানু একটা টাকা বিনা আপত্তিতেই তাহাকে দিয়াছিল। আরও দুই চারিবার আসিয়া দুধ লইয়াও গিয়াছে। সেও পানু দিয়াছে। পানু অবশ্য জানিত না যে, ময়ূরাক্ষীর ওই চরটা বেহার ও বাংলা দেশের সীমারেখা, ওটা কোন জমিদারেরই জমিদারি এলাকাভুক্ত নয়। লোকটা পানুর কাছে পড়িয়া-পাওয়া চোদ্দ আনার স্থলে এক টাকাই লইয়া গিয়াছে।

আজ সে খপ করিয়া পানুর হাত চাপিয়া ধরিল—চল কাছারিতে।

পানু প্রথমটা চমকিয়া উঠিল! তারপর বলিল—কাহে?

—কাহে? এখানে মাটি কুপিয়ে ঘর বানাবি, তোর বাবার জায়গা?

পানু বলিল—আমি খাজনা দোব।

—আরে, খাজনা দিব! খাজনার কথা কিসের? বিনা হুকুমে মাটিতে কোপ মারলি কেন তুই?

—কেন, দোষ কি হল? জায়গা তো পড়েই আছে।

—হাঁ, হাঁ, বিলকুল তামাম দুনিয়া পড়ে আছে। পড়ে আছে বলে তু যা খুশি করবি? চল কাছারিতে। লোকটা একটি হেঁচকা টান মারিয়া বসিল। পানু ইহাতেও কিছু বলে নাই। বলিল—চল, চল, তোমার কাছারিতেই চল।

—আগে পেয়াদার রোজ দে, পেয়াদার রোজ!

—সেটা কি?

—আমার পাওনা। তুকে ডাকতে এসেছি—তার মজুরী দে।

—কত?

—আট আনা।

তৎক্ষণাৎ আট আনা পয়সা পানু তাহাকে দিয়া দিল। তাহার সঞ্চয় সম্বল সব তাহার সঙ্গেই কোমরের গেঁজলেতে থাকে। পেয়াদাটা এবার নরম হইয়া বলিল—চল, তুকে সুবিধে করে দোব।

কাছারির নায়েব তাহাকে দেখিবামাত্র বলিল—বস বেটা, ওইখানে বস। কার হুকুমে মাটি কুপিয়েছিস তুই ?

পানু বলিল—খাজনা দোব আমি।

—আগে নিকাল পাঁচ টাকা জরিমানা বিনা হুকুমে মাটি কুপিয়েছিস তার জন্যে।

—পাঁচ টাকা ?

—হাঁ হাঁ।

পানুর কাছে পাঁচটা টাকার অনেক মূল্য। লছমী সাত সের দুধ দেয়, সাত সের দুধের দাম এখানে সাত আনা পয়সা। সাত আনার মধ্যে দুই তিন আনা তাহার নিজের খাইতে খরচ হয়। দৈহিক চার আনা হিসাবে কুড়ি দিনে পাঁচটা টাকা সে পায়। সে নিতান্ত অপরাধীর মতই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গর্জন করিয়া উঠিল পেয়াদাটা—নিকাল, নিকাল রে! বলিয়া সে নায়েবকে বলিল—ভারি হারামী শালা। গেঁজলেতে এক গেঁজলে টাকা হুজুর।

নায়েব বলিল—বাঁধ বেটাকে। ওই খুঁটির সঙ্গে বাঁধ।

'খুঁটির সঙ্গে বাঁধ'! মুহূর্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল থানার থামে আবদ্ধ তাহার বাপের ছবি। থামের সঙ্গে আবদ্ধ তাহার বাপ পশুর মত চীৎকার করিয়া থামের গায়ে মাথা ঠুকিবার চেষ্টা করিতেছে। অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি! চোখ দুইটা যেন দুইটা রক্তের ঢেলার মত ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিবে। জমাদার নীরবে তাহার পিঠে বেতের পর বেত চালাইতেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই দূতটি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—নিকাল—

পরের কথা তাহার মুখেই থাকিয়া গেল। পানু হঠাৎ পাগল হইয়া উঠিল, কালাপাহাড়ের মত ভীষণ হিংস্র উন্মত্ত শক্তি প্রয়োগে সে তাহার গালে কষাইয়া দিল প্রচণ্ড এক চড়। চড় খাইয়া পেয়াদাটা 'বাপ' বলিয়া পানুকে ছাড়িয়া দিয়া টলিতে আরম্ভ করিল। পানু তখন উন্মত্ত। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার বসাইয়া দিল লোকটাকে এক কিল। লোকটা এবার নির্ঘাত মাটির উপর পড়িয়া গেল। নায়েব তখন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। নিজের নিরাপত্তার জন্য বারান্দা হইতে সে ঘরের দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু মুখে চীৎকার করিতে থামে নাই, বলিতেছিল—ধর—ধর—

পানু চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ধরিবার লোক কেহ নাই। লোকের মধ্যে একটা নীচু-জাতীয় নগ্‌দী ছিল—সেও পিছু হঠিতেছে। পানুর সাহস বাড়িয়া গেল। শুধু সাহস নয়, পৈশাচিক উল্লাসও সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিল। সে লাফ দিয়া ধরিল নায়েবকে। লোকটার নধর চেহারার সঙ্গে গুরুঠাকুরের মিল আছে। নায়েব লোকটি কিন্তু চতুর! পানু তাহার হাত ধরিবামাত্র সে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা হইতে এবং সামনের দিকে অর্থাৎ মুখে চোখে বুকে পেটে মার খাওয়ার হাত হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিল। পানুর কিন্তু পিঠ—পিঠই সই। ক্ষাত্র রণনীতি সে জানেও না, মানেও না—বরং পিঠ দেখিয়া কিল মারিবার জন্যই প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। নায়েবের পিঠের উপর চাপিয়া বসিয়া চালাইতে আরম্ভ করিল কিলের পর কিল। লোকটার পিঠও অত্যন্ত নরম। কিল মারিয়া আরাম আছে। কিন্তু সাধ মিটিবার পূর্বেই পানুকে উঠিতে হইল। ওদিকে নগদীটা চীৎকার করিতেছে।

—মেরে ফেলালে গো! মেরে ফেলালে! কিল মেরে ফাটিয়ে দিলে গো!

পানু বুঝিল এইবার লোক জমিবে। সে নায়েবের পিঠ হইতে উঠিয়া গোটাকয়েক লাথি মারিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া সে ময়ূরাক্ষীর তটভূমিতে আসিয়া উঠিল।

তারপর মুখে ডাকিতে আরম্ভ করিল মহিষের ডাক। বুকে মনে সে বলিতেছে—লছমী—মংলী! লছমী—মংলী! মুখে ডাকিতেছে—আঁ—আঁ—আঁ! অবিকল মহিষের আওয়াজ। কয়েক মুহূর্ত পরেই ওদিকের কতকগুলা শরবনের অন্তরাল হইতে সাড়া আসিল—আঁ—আঁ—আঁ। ঠিক পানুর ডাকের প্রতিধ্বনি। পানুর ডাকের মধ্যে যে ব্যগ্র আকুলতা, লছমীর ডাকের মধ্যেও সেই আকুলতা। এ যেন ডাকিতেছে—লছমী—মংলী—ওরে—ওরে ছুটিয়া আয়—ছুটিয়া আয়। লছমী ছুটিয়া আসিতেছে, আর যে ডাকে সাড়া দিতেছে তাহাতে বলিতেছে—যাই—যাই—যাই।

পানু ইতিমধ্যেই কর্তব্য ঠিক করিয়া লইয়াছে। নায়েব এখানকার মালিক, ঠাকুর। ঠাকুরকে সে ঠ্যাঙাইয়াছে—এইবার ঠাকুর ক্ষেপিয়া উঠিবে। আর ঠাকুরের প্রসাদভোজী অনেক। দারোগার সেপাই আছে। নায়েবের আরও অনেক পাইক নগদী আছে। দারোগার উপর সাহেব আছে, নায়েবের উপরে জমিদার ঠাকুর আছে। এখানে আর নয়। সে ময়ূরাক্ষীর চরভূমি ধরিয়া ওই ডাক ডাকিতে ডাকিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। লছমীও ছুটিল, তাহার পিছনে মংলী।

বহুক্ষণ ছুটিয়া সে যখন থামিল, তখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। আকাশের চাঁদ ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

সর্বাঙ্গ দিয়া তাহার ঘাম ঝরিতেছিল। বুকটা উঠিতেছিল পড়িতেছিল কামারের হাপরের মত। সে বালির উপর বসিল। লছমী-মংলীও ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহারাও বসিল। অনেকক্ষণ পর উঠিয়া ময়ূরাক্ষীর জলে স্নান করিয়া চরভূমির উপর লছমীর ঠিক পাশেই শুইয়া পড়িল।

ক্লান্ত শরীর। মন উদ্‌ভ্রান্ত। কোথায় যাইবে? কোনখানে, কোন রাজ্যে গিয়া সে সুখে শান্তিতে থাকিতে পাইবে?

হে দেওতা, দেখাইয়া দাও সেই দেশ। যেখানে এমন করিয়া দারোগা জমাদারে বেত মারিয়া পিঠের চামড়ায় দাগ কাটিয়া দেয় না, যেখানে নায়েবের পেয়াদা আসিয়া কাছারিতে ধরিয়া লইয়া নায়েবের হুকুমে সর্বস্ব কাড়িয়া লইতে চায় না, সেই দেশ দেখাইয়া দাও। সে কোন পাপ, কোন অন্যায় করিবে না। সে কেবল একখানা ঘর গড়িয়া লছমী এবং মংলীকে লইয়া থাকিবে। লছমীর দুধ দুহিয়া, দুধ ঘি তৈয়ারী করিয়া বেচিবে। দুধ ঘি বেচিয়া টাকা হইলে, সে শুধু এক টুকরো জমি কিনিবে। ন্যায্য দাম দিয়া এক টুকরা জমি। জমির টুকরাটা চষিয়া সে ফসল বুনিবে। সে ফসল হইতে তোমার ভোগ দিবে, নিজে খাইবে। যাহার নাই—সে চাহিলে দিবে। এ সব দিয়াও যদি থাকে তবে সেই উদ্‌বৃত্তটা বেচিবে।

হে দেওতা, যদি তুমি দয়া কর, মুখ তুলিয়া চাও, তবে সে সাদীও করিবে। বেশ একটি শক্তসমর্থ মেয়েকে 'বিয়া' করিবে। সে তাহার সঙ্গে খাটিবে। তাহাকে সে শাড়ী কিনিয়া দিবে, শাঁখা, গলায় মালা তাও কিনিয়া দিবে। তাহার কোলে আসিবে বেশ মোটাসোটা ছেলে। 'ওঁয়া—ওঁয়া' শব্দে কাঁদিবে। লছমীর দুধ খাইবে। ততদিনে মংলীরও বাচ্চা হইবে। মংলীর দুধই সে খাইবে। লছমীর দুধ তাহার—শুধু তাহার। লছমীর দুধের ভাগ সে কাহাকেও দিবে না।

হঠাৎ সে উঠিয়া বসিল।

বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। পেট অনেকক্ষণ হইতেই জ্বলিতেছে। লছমীর দুধ তাহার, লছমীর দুধের ভাগ কাহাকেও দিবে না—এই কথা মনে করিতে গিয়া ক্ষুধার কথা মনে পড়িয়াছে। লছমীর দুধ আছে।' ক্ষুধার জন্য ভয় কি? লছমীকে গুঁতা দিয়া উঠাইয়া সে মংলীকে দুধ

খাইতে ঠেলিয়া দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মংলীর মুখের দুই পাশ গড়াইয়া দুধ ঝরিয়া পড়িল। পানু এবার মংলীকে ঠেলিয়া দিয়া নিজেই লছমীর বাঁটে মুখ দিয়া শিশুর মত স্তন্যপান করিতে আরম্ভ করিল। দেহ জুড়াইয়া গেল। তারপর সে কি অগাধ ঘুম ! সকালে যখন ঘুম ভাঙিল, তখন দেখিল এক অপরিচিত আবেষ্টনী, পরিচিত শুধু ময়ূরাক্ষী। কিন্তু এ কি চমৎকার দেশ ! আহা-হা চোখ যেন জুড়াইয়া যায়। ময়ূরাক্ষী এখানে বিপুল বিস্তৃত। সম্মুখেই খানিকটা আগে —এই বিপুল বিস্তৃত ধূসর বালুচরের মধ্যে সবুজ একটা দ্বীপ। ময়ূরাক্ষী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দ্বীপটার দুই দিকে বহিয়া গিয়াছে। পানুর মন বলিয়া উঠিল—পাইয়াছি, এই তো জায়গা। দুই দিকে নদী, মধ্যে দ্বীপ। মানুষ নাই, জন নাই, মানুষ-জন যখন নাই, তখন দারোগা নাই, জমাদার নাই, নায়েব নাই, পেয়াদা নাই—আছে মাটি। সেখানে সে ঘর তুলিয়া বাস করিতে পারিবে ; আছে ঘাস—যে ঘাস খাইয়া তাহার লছমী-মংলী পরিতৃপ্তিভরে রোমন্থন করিবে। হাঁড়ি ভরিয়া দুধ দিবে। আঃ, দেওতা, বাপা তাহার উপর দয়া করিয়াছে। হে বাপা, তোমাকে নমো—গড় করি তোমাকে। হঠাৎ লছমী চঞ্চল হইয়া ডাক দিয়া উঠিল—আঁা-আঁা-আঁা।

কিছু যেন দেখিয়াছে লছমী।

পরক্ষণেই সে-ও চঞ্চল হইয়া উঠিল—এ কি ? মহিষ ডাকিতেছে কোথায় ? দ্বীপটা আলোয় ঝলমল করিতেছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে নজরে পড়িল, দ্বীপটার উপরেই ঘাসবনের ও-পাশে এক পাল মহিষ চরিতেছে। সে লছমীকে লইয়া আগাইয়া চলিল। দ্বীপটার দিকেই চলিল।

দ্বীপে উঠিয়াই দেখিল এক পাল মহিষ। একটা মহিষের পিঠে চাপিয়া বসিয়া আছে একটা মেয়ে। এই লম্বা মেয়েটা ! আর তেমনি কি আঁটসাঁট দেহ ! মেয়েটার বাহন মহিষটা মুখ তুলিয়া উগ্রদৃষ্টিতে লছমীর দিকে চাহিয়া দেখিতেছে আর ডাকিতেছে—আঁা-আঁা-আঁা ! পানু দেখিয়াই বুঝিল, ভঁইষাটা মর্দানা। সে বলিতেছে—কে ? কে ? কে ?

হেলিয়া দুলিয়া সে আগাইয়া আসিতেছে। মাথাটা নীচু করিয়াছে, লড়াই করিতে চায়। পানু কিন্তু ব্যস্ত হইল না। কি হইবে সে জানে ! মহিষটা আসিয়া লছমীকে যেই জেনানা বলিয়া চিনিবে, অমনি অন্য ডাক ডাকিতে শুরু করিবে। শেষ পর্যন্ত আসিয়া লছমীর মুখ শুঁকিবে।

মেয়েটা তাহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া আছে।

চোদ্দ

মেয়েটা কালা এবং বোবা।

বয়স চোদ্দ-পনরো, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট সবল সুস্থ দেহ। নাম যশোদা। নাম সে বলিতে পারে নাই, পানু শুনিয়াছিল মেয়েটির বাপের কাছে। হাঁ, বাপই। গ্রামের বর্ধিষ্ণু গোপেদের বাড়ির পোষ্য যশোদা। লোকে বলে, গোয়ালাটিরই নীচজাতীয়া প্রণয়িনীর গর্ভজাতা কন্যা। মা মরিয়া গিয়াছে, যশোদা খায়দায়—মহিষের সেবা করে। যশোদাই পানুর প্রথমা স্ত্রী।

যশোদা কালা-বোবা, কিন্তু ইঙ্গিতময়ী। ইঙ্গিতে এমন প্রখর মুখরতা পানু দেখে নাই। আজও দেখে নাই।

পানুর লছমী স্বজাতীয়-স্বজাতীয়াদের দেখিয়া মুখ তুলিয়া ডাক দিতেছিল। যশোদার মহিষের পালও ডাক দিতেছিল। সহসা ছুটিয়া আসিল একটা প্রকাণ্ড মহিষ। মুখ তুলিয়া ডাক দিতে দিতে সে আসিয়া লছমীর অদূরে দাঁড়াইল।

পানু লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া প্রস্তুত হইয়াই ছিল। মহিষটা আরও খানিকটা কাছে আসিতেই হাসিয়া লাঠিটা নামাইল। মরদ মহিষ। লছমী তাহার জেনানা। কোনও ভয় নাই। এমনি ভাব হইয়া যাইবে।

ওদিক হইতে যশোদাও ব্যাপারটা দেখিয়াছিল। সেও শঙ্কিত হইয়া তাহার বাহন মহিষটার উপর হইতে লাফ দিয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। হাতের লাঠিটা উদ্যত। সেও ব্যাপারটা দেখিয়া লাঠিটা নামাইয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই গম্ভীর হইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্তিমিত বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চকিতে এমনভাবে জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত ঘাড়টি নাড়িল যে, এক মুহূর্তে তাহার বক্তব্য স্বরে অর্থে স্পষ্ট হইয়া উঠিল—কে তুমি ?

পানু বলিল—আমি পানু।

আবার সে ঘাড় নাড়িল, তেমন চকিত জিজ্ঞাসা-চিহ্নের ভঙ্গিতে ফুটাইয়া তুলিল—কে—কে ? ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

—পানু ; এখানকার আদমী নই আমি।

মেয়েটি এবার কানে হাত দিল—তারপর 'না'র ভঙ্গিতে হাত নাড়িল। পানু মুহূর্তে বুঝিল, মেয়েটি কালা। কিন্তু কথা বলে না কেন ?

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাত দিয়া হাত নাড়িল—না। এবার পানু ঠিক বুঝিল না। মেয়েটি এবার 'আঁউ—আঁউ' করিয়া শুধু রব করিয়া উঠিল। বার বার হাত নাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়াও বুঝাইল—না না। চোখের দৃষ্টি তাহার হইয়া উঠিল সকরুণ। পানুর বুঝিতে আর কষ্ট হইল না, বিলম্বও হইল না। বুঝিল, মেয়েটি বোবা—কালা। তাহারও দৃষ্টি সকরুণ হইয়া উঠিল।

সে চীৎকার করিয়া বলিল—সে পানু। সে বিদেশী।

হাতখানি সুদীর্ঘ প্রসারণে প্রসারিত করিয়া বুঝাইতে চাহিল—বহুদূরে তাহার বাড়ি।

যশোদা একটা গাছতলায় বসিয়া হাসিমুখে হাতের ইসারা করিয়া তাহাকে ডাকিল—এস, এইখানে এস।

পাশের জায়গাটুকু হাত দিয়া পরিষ্কার করিয়া হাতের তালু দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল—বস—এইখানে বস। পানু বসিল।

পানু উচ্চকণ্ঠে বলিল—গাঁও কত দূর ?

যশোদা এমনভাবে চাহিল যে, পানু মুহূর্তে বুঝিল—সে শুনিতে পায় নাই। সে আরও উচ্চকণ্ঠে বলিল—গাঁও ? গাঁও ? তারপর নিজের পেটে হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল—ভুখ ! ক্ষিধে ! ক্ষিধে ! আহার্যের সন্ধানে সে গ্রামে যাইবে।

যশোদা উঠিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

পানু বিস্মিত হইল, শঙ্কিতও হইল।—বোবা কালা মেয়েটা পলাইল কেন ? তাহার কথার কোন কদর্থ করে নাই তো ?

যশোদা অল্পক্ষণ পরেই ফিরিল। হাতে তাহার গামছায় বাঁধা একটা পোঁটলা। পোঁটলাটা খুলিয়া পানুর সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়া বার বার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।—খাও—খাও—তুমি খাও।

যশোদার মরদ মহিষটা তখন পানুর লছমীর গলার নীচেটা চাটিতেছে।

পানু ওই গ্রামেই বাসা বাঁধিল।

গোয়ালা প্রথমটা সন্দিগ্ধ চোখে দেখিয়াছিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার সে ভাব পাল্টাইয়া গেল। আরও কয়েকদিন পর সে পানুকে বলিল—যশোদাকে তুমি বিয়ে করবে?

পানু এতটা প্রত্যাশা করে নাই। সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।—হাঁ। হাঁ। হাঁ।

পানুর জাতি-পরিচয় গোপ মহাশয় আগেই লইয়াছিল। সে যশোদাকে তিলক-কণ্ঠি পরাইয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়া পানুর সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিল।

পানু সেদিন বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু কয়েকদিন পরেই বুঝিয়াছিল—ঘোষ ভয়ঙ্কর ব্যক্তি!

সেদিন কিন্তু পানু ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে প্রায় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। মাস-খানেকের পরিচয়ে ঘোষ যখন তাহার হাতে যশোদাকে তুলিয়া দিল, নিজের গোয়াল-বাড়িতে একখানা ঘর দিল, তখন তাহার মনে হইল—ঘোষ তাহাকে যাহা দিল, ইহাকেই তো অর্ধেক রাজত্ব সমেত রাজকন্যা বলে। পানু বিগলিতচিত্ত হইয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

ভোরে উঠিয়া পানু ঘোষের মহিষের পাল লইয়া চরে চরাইতে যায়, পালের সঙ্গে যায় লছমী। যশোদা গোয়াল সাফ করে; গোয়াল সাফ করিয়া আহার্য লইয়া চরে যায়, সেই সঙ্গে লইয়া যায় বাছুরগুলিকে—লছমীর বেটি মংলীও যায়। ঘোষের লোক যায় বালতি হাতে। দুধ দুহিয়া লইয়া আসে। পানুও লছমীর দুধ দুহিয়া লয়। ঘোষই লছমীর দুধ কিনিয়া লয়—তিন পয়সা সের। পয়সা নগদ দেয় না, দেয় সেই দামের চাল দুই আনা সের। যশোদা বাড়ি আসিয়া রান্না করে, পানু প্রচুর অন্ন পেট ভরিয়া খায়; রাত্রে যশোদাকে লইয়া তাহার প্রমত্ত নিশিযাপন। গ্রীষ্মের রাত্রে ঘর হইতে যশোদাকে লইয়া সে ময়ূরাক্ষীর বালির উপর গিয়া শয্যা রচনা করে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে বালুচরের উপর দুইজনে ছুটিয়া বেড়ায়—হাসে, নাচে, পানু গান গায়—যশোদাও গায়। তাহার গান শুধু ভাষাহীন সুর, শুধু উল্লাসের একটি একটানা প্রকাশ, শুধু চীৎকার! চীৎকার পানুর গানের সঙ্গে গান করিতে চায়; গ্রীষ্মের ময়ূরাক্ষীর এক হাঁটু জলে কখনও লাফাইয়া পড়ে—এ পানুর পক্ষে রাজত্ব নয় তো কি? তাহার কল্পনার ঘর পাইয়াছে, বউ পাইয়াছে—যে বউ রুকণীর মত অনেকটা উচ্ছলা বর্বরা—আবার যে পল্লীর মেয়েগুলির মত বেশ পরিপাটি করিয়া কাপড় পরে, নিত্য স্নানে যে পরিচ্ছন্ন, পায়ে যে আলতা পরে, মাথার চুলগুলি যে তাহার দিদির মত করিয়া বাঁধিতে জানে, চমৎকার সুস্বাদু ব্যঞ্জন রাঁধে, রুকণীর মত উচ্ছলা হইয়াও সে লোকের সম্মুখে লজ্জায় নম্র হইয়া ঘোমটা দেয়, একান্ত-ভাবে আনুগত্য স্বীকার করে। পেট ভরিয়া অন্নের সংস্থান হইয়াছে। ঘোষেদের সংসারের মধ্যে আত্মীয়তার সন্ধান পাইয়াছে। সে আর কি চাহিবে? সত্য, সেদিন তাহার আর কোন কাম্য ছিল না।

বার বার সে বৃক্ষদেবতাকে প্রণাম জানাইয়া বলিত—হে বাপা, হে দেওতা হাজার বার তোমাকে গড় করি। যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহাই তুমি আমাকে দিয়াছ। যদি তাহার সেদিনের সুখের ঘরে আঘাত না পড়িত, তাহার মনের বিশ্বাসে, বুকের ভালবাসায় ঘোষবাবা আগুন না দিত, তবে আর কোন কিছুই সে চাহিত না।

সে কয়টা দিন ছিল সুখের দিন। পুরানো স্মৃতিকে ঝালাইয়া তখন সে পুরানো দেবদেবী-গুলিকে নূতন করিয়া চিনিয়াছে। তাহাদের ভক্তি করিত—প্রণাম করিত। দুর্গা-কালী-শিব-কৃষ্ণ-রাধা-কার্তিক সব আবার মনে পড়িয়াছে তখন।

প্রাণপণে সে চেষ্টা করিত ঘোষেদের সংসারে মানুষগুলির সকল আদেশ পালন করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে, তাহাদের দানের প্রতিদান দিতে, তাহাদিগকে আরও গভীরভাবে আপনার করিয়া পাইতে। ঘোষকে সে বলিত—ঘোষবাবা। তখন মনে হইত, ঘোষবাবার মত ভাল লোক তাহার জীবনে সে দেখে নাই।

হঠাৎ তাহার নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে, গভীর আশ্বাসে আঘাত দিল যশোদা। সে একদিন ঘোষের বাড়ি হইতে চাল আনিয়া অত্যন্ত অসন্তোষ জানাইয়া আঁউ-আঁউ করিতে আরম্ভ করিল। পানু কিছু ঠাওর করিতে পারিল না। সে মুখে বলিল এবং ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিত জানাইল—কি ? কি ?

যশোদা এবার দুধের মাপের সেরটা আনিয়া চালটা মাপিয়া দেখাইয়া দিল—দুই সেরে চাল অনেকটা কম।

পানু সবিস্ময়ে যশোদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যশোদা আবার উঠিয়া একটা হাঁড়ির ভিতর হইতে ছয়টা পয়সা আনিয়া পানুর সম্মুখে রাখিল এবং পয়সাটার পাশেই এক সের চাল মাপিয়া ঢালিয়া দিল। তারপর আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল—গ্রামের ভিতরের দিকে। তারপর সে এক সের দুধ মাপিয়া তাহার পাশে রাখিল পাঁচটা পয়সা। আবার আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল—নদীর ওপারের দিকে।

পানু ব্যাপারটার আভাস পাইল। কিন্তু বিশ্বাস করিল না, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—কে বললে ?

যশোদা আঁউ-আঁউ করিয়া আঙুল দেখাইল—গ্রামের দিকে।

পানু সবই বুঝিয়াছে। গ্রামের কেহ যশোদাকে বলিয়াছে, চালের সের ছয় পয়সা। দুধের সের পাঁচ পয়সা। কিন্তু সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, ইঙ্গিতে বুঝাইল—না না। ঘোষবাবা তেমন লোক নয়। আর সে লোককে আদমী বলে না।

যশোদা এবার তাহার সর্বাঙ্গ দোলাইয়া পানুর মুখের কাছে দুই হাত নাড়িয়া দিল। তাহার সে ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিল অদ্ভুত এক ঝঙ্কারময়ী রূপ। পানু মুগ্ধ হইয়া না হাসিয়া পারিল না। যশোদা এবার তাহার হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। পানুকে উঠিতে হইল।

গাঁয়ের ও-পাড়ায় সদ্‌গোপদের বাড়ি।

সদ্‌গোপ-কর্তা তাহাকে বলিল—চালের সের ছ পয়সা কাঁচি মাপে অবিশ্যি। তা কাঁচি মাপেই তো চাল দেয় ঘোষ।

সদগোপ-কর্তা কাঁচি এবং পাকি—অর্থাৎ ষাট ও আশি তোলার ওজনের মাপের পার্থক্য পানুকে মাপিয়া দেখাইয়া দিল। তারপর বলিল—দুধ ওপারের বাজারে কাঁচি পাঁচ পয়সা, পাকি ছ পয়সা সের। নিজে গিয়ে দেখে এস, বিশ্বাস না হয়।

তারপর সে বলিল—তোমরা যে দুজনায় খাটছ, কি দেয় তোমাদিগে ? দেয় কিছু ? দুটো লোক রাখতে হলে মাইনে কত লাগত জান ? ঘোষবাবা, ঘোষবাবা ! ঘোষবাবা তোমার বেশ !

পানু হাঁ করিয়া সদগোপ-কর্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেহখানা আঁকাইয়া-বাঁকাইয়া যশোদার অঙ্গভঙ্গি করার আর বিরাম ছিল না। চোখের দৃষ্টিতে, ভ্রূর কুঞ্চনে, কপালের রেখায় পানুকে সে অজস্র তিরস্কার করিয়া চলিয়াছিল। অর্থাৎ—দেখ দেখ, কথায়

যে বিশ্বাস করিতেছিলে না! তুমি বোকা। তুমি বোকা। তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি আছে।

পান্নুর ক্রোধ জাগিয়া উঠিল। ঘোষবাবার উপর, না সদ্গোপ-কর্তার উপর, না যশোদার উপর সে ঠাওর করিতে পারিল না। ক্রোধে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর সম্মুখে তাহার সহজলভ্যা ঝঙ্কারময়ী যশোদাকে ধরিয়া দুম-দাম শব্দে প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল। বোবা যশোদার পশুর মত আর্তনাদে স্থানটা বিরক্তিজনকভাবে করুণ হইয়া উঠিল। সদ্গোপ-কর্তা হাঁ হাঁ করিয়া আগাইয়া আসিল। পান্নু হঠাৎ যশোদাকে ছাড়িয়া দিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল। গেল সে নদীর ও-পারের বাজারে। সব সে যাচাই করিয়া লইবে।

বাজারে দুধের দর সত্যই পাঁচ পয়সা। চালের দরও ছয় পয়সা। সদগোপ-কর্তা মিথ্যা বলে নাই।

পান্নু ফিরিবার পথে নদীর ধারে আসিয়া একটা গাছতলায় বসিল। মন কিছুতেই গ্রামে ফিরিতে চাহিতেছিল না। ঘোষবাবা! তাহার ঘোষবাবা তাহাকে এমনিভাবে ঠকাইয়াছে?

সেদিন রাত্রে যশোদার সে কি অভিমান! ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছিল।

পরের দিনই আবার তাহার জীবনের দুর্ভোগ ঘনাইয়া আসিল।

সকালেই সে ঘোষবাবাকে বলিয়া দিল—লছমীর দুধ সে বেচিবে না। চাল সে তাহার কাছে কিনিবে না। বিনা বেতনে মহিষ চরাইবে না, যশোদাও গোয়াল পরিষ্কার করিবে না। সাফ কথা।

বলিয়াই পান্নু চলিয়া আসিতেছিল।

ঘোষবাবা ডাকিল—এই, শোন। অদ্ভুত সে কণ্ঠস্বর!

কণ্ঠস্বর শুনিয়া পান্নু চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে বিস্ময়ের উপর স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘোষবাবার এ কি চেহারা!

বাংলা দেশের গোপ-ঘোষেরা এ দেশের শক্তিমানদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। দুধ-ঘিয়ের প্রাচুর্যে পুষ্ট দেহ, মহিষ লইয়া প্রান্তরে প্রান্তরে ফিরিয়া মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ, তাহার উপর স্মরণাতীত কাল হইতে তাহারা শক্তিচর্চা করিয়া আসিতেছে। ঘোষবাবা তো এককালে এ অঞ্চলে পালোয়ান বলিয়াই খ্যাত ছিল। সেই ঘোষবাবা ক্রোধে ফুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া বলিল—খুন করে ফেলব।

পান্নুও ভয় পাইবার মানুষ নয়; সে বলিল—বেইমান, তু বেইমান!

ঘোষ বলিল—বেটা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।

পান্নু বলিল—আভি যায়েগা হাম। বহুদিন পরে হিন্দী কথা বলিয়া ফেলিল সে।

পান্নু হনহন করিয়া আসিয়া যশোদাকে চীৎকার করিয়া বলিল—চল, এখান থেকে চল। থাকব না এখানে। নিয়ে আয় লছমীকে মংলীকে।

পিছন হইতে খপ করিয়া তাহার ঘাড়ে ধরিল ঘোষ। বলিল—একা রে বেটা, একা। মোষ সমস্ত আমার। তোর মোষ বললে কে? আর যশোদাও যাবে না। ও যাবে কোথা?

বিস্ময়কর কঠিন শক্তিশালী মুষ্টি। পান্নুর মত জোয়ানও সে মুষ্টির কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। ঘোষবাবা তাহাকে অনায়াসে রদ্দা মারিয়া আছাড় দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। তারপর তাহার পিঠের উপর বসিয়া নিষ্ঠুর নির্মম প্রহারে তাহাকে জর্জরিত করিয়া দিল। সে প্রহার বিচিত্র। সাধারণ লোক এমন প্রহার জানে না—পালোয়ানী প্রহার। পান্নু

যে পানু—সেও জর্জর কাতর দেহে পড়িয়া রহিল। আশ্চর্যের কথা, যশোদা একটা কথাও বলিল না।

ঘোষবাবা ইহাতেই নিরস্ত হইল না। প্রকাণ্ড লাঠিখানা ধরিয়া পানুকে বলিল—ওঠ বেটা, ওঠ! ওঠ, নইলে খুন করে ফেলব।

পানুকে উঠিতে হইল।

ঘোষ বলিল—চল।

কথা না শুনিয়া পানুর উপায় ছিল না। পানু চলিল। ময়ূরাক্ষী পার করিয়া ঘোষ লাঠি দিয়া মুক্ত পৃথিবীর দিকে নির্দেশ দিয়া বলিল—চলে যা। যদি গাঁয়ে ঢুকিস, তবে তোকে খুন করে ফেলব। ঘোষের চোখে খুন খেলা করিতেছিল।

পালোয়ানী প্রহারে চোয়াল ছাড়িয়া যায়, হাতের গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়—সেই প্রহার হানিয়াছিল ঘোষ। পানু টলিতে টলিতে খানিকটা গিয়া শুইয়া পড়িল। ঘোষ হাসিতে হাসিতে ফিরিল। দুনিয়ায় পানু এমন পরাজয় কোন লোকের কাছে স্বীকার করে নাই। সে ময়ূরাক্ষীর অপর পারে আসিয়া বালুচরের উপর শুইয়া পড়িল। সে অদ্ভুত অবস্থা!

রাত্রি ঘনাইয়া আসিয়াছে। মনের মধ্যে তাহার গভীর আক্রোশ। মর্মান্তিক দুঃখ। প্রহারের প্রতিশোধ লইবার শক্তি নাই। নাড়িবার শক্তি নাই, তবু চেতনা আছে। তাহার লছমী, তাহার মংলীকে কাড়িয়া লইয়াছে। যশোদা,—সর্বাপেক্ষা আক্রোশ তাহার যশোদার উপর। রুকণী হইলে ঘোষের পিছন হইতে কোন একটা অস্ত্রাঘাতে তাহাকে খুন করিয়া ফেলিত। যশোদা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল শুধু। একটা ক্ষীণতম চীৎকারও করিল না।

সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল আর এক দিনের কথা। যেদিন থানার জমাদার তাহাকে মারিয়াছিল। কিন্তু প্রহার-জর্জরিত দেহেও সে সেদিন বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল মনের আবেগে। আজ কয়েকবার উঠিবার চেষ্টা করিয়াও পারিল না।

রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে। ক্ষুধায় পেট খাক হইয়া গেল, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। আঃ, তাহার লছমী মা যদি এ সময় থাকিত তবে সে শিশুর মত তাহার স্তন্যপান করিত। আশেপাশে সরীসৃপ চলাফেরা করিতেছে গুল্মগুলার মধ্যে। আক্রমণ করিলে আজ পানুর আত্মরক্ষা করিবারও শক্তি নাই। সে আজ মরিবে। আকাশভরা তারার দিকে অর্ধনিমীলিত আচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলিয়া সে পড়িয়া রহিল। ক্রমে মনে হইল, এইবার বুঝি চেতনা তাহার তলাইয়া যাইবে। মনে হইতেছে, সে যেন কিসের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে।

হঠাৎ কিসে তাহাকে যেন নাড়া দিল। শুধু দেহে নয়—মনেও নাড়া অনুভব করিল। দেহের নাড়ার সঙ্গে কানের মধ্যে একটা দূরশ্রুত আঁউ-আঁউ শব্দ আসিয়া প্রবেশ করিল। দূরে কোথাও যশোদা চীৎকার করিতেছে। সে চোখ মেলিয়া চাহিল; দেখিল, তাহার মুখের উপর যশোদার মুখ—আঁউ-আঁউ করিয়া ডাকিতেছে। সে এবার ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দিয়া হাঁ করিল। ইঙ্গিতে যশোদাকে বুঝাইল—জল! জল!

যশোদা তাহার মুখে ঢালিয়া দিল দুধ।

বার দুই ঢোঁকের পরই সে চিনিল—এ তাহার লছমীর দুধ। স্বাদ যে তাহার চেনা।

কিছুক্ষণ পর সে সুস্থ হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। যশোদা তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিল। তারপর পানুর গলা ধরিয়া তাহার সে কি কান্না! পানু তাহার গায়ে বার বার হাত বুলাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পর যশোদা নিজেই চোখ মুছিয়া আঁউ-আঁউ করিয়া দূরে দিগন্তের দিকে আঙুল দেখাইল। উঠিয়া গিয়া তাড়াইয়া আনিল লছমী ও মংলীকে। মংলীর পিঠে বস্তাবন্দী

রাজ্যের জিনিস। পানুকে ধরিয়া সে উঠাইয়া দিল লছমীর পিঠে। পানু বুঝিল, গভীর রাত্রে যশোদা লছমী, মংলী ও ঘরের জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া আসিয়াছে। চলিতে চলিতে হঠাৎ যশোদা খিলখিল করিয়া হাসিয়া সারা হইয়া গেল। গ্রামের দিকে—ঘোষের ঘর লক্ষ্য করিয়া বার বার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইল, একবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া খানিকটা নাচিয়া লইল। পানু চলিতেছিল লছমীর পিঠে চড়িয়া। তাহার দেহ প্রহারজর্জর, শুধু মনের মধ্যে একটা গভীর আক্রোশ। ঘোষবাবার প্রহারের শোধ সে লইতে পারিল না।

•

শোধ সে লইয়াছিল।

মাসখানেক পরে একদা রাত্রে দশ মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়া সে ঘোষবাবার ধানের মরাইয়ে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। সে ও যশোদা দুইজনেই আসিয়াছিল একসঙ্গে।

উঃ, সে কি আগুন! সে কি চীৎকার! ধানগুলা ফুটিয়া খই হইয়া গিয়াছিল। ঘরে আগুন দিয়া আসিয়া নদীর মাঝখানের চরে দাঁড়াইয়া পানু ও যশোদা সে দৃশ্য দেখিয়াছিল। যশোদা নাচিয়াছিল উন্মত্ত আনন্দে। তখন প্রখর গ্রীষ্ম। যশোদাই প্রেরণা যোগাইয়াছিল।

আগুন নিবিয়া আসিতেই যশোদাকে সঙ্গে লইয়া অন্ধকারের মধ্যে সে মিশিয়া গিয়াছিল।

পনেরো

যশোদার সেদিনের নাচন আজও পানুর মনে আছে।

পানুও নাচিয়াছিল। যশোদাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া নাচিয়াছিল। সেদিন তাহার মনে হইয়াছিল, যশোদা তাহাকে যত ভালবাসে এত ভালবাসা কোন মেয়ে কোন মরদকে বাসে নাই, যাহার জন্য তাহার বাপ—ওই ঘোষের ঘরের আগুন দেখিয়া এমন করিয়া নাচিল। এ নাচ রুকণী নাচিতে পারিত! দুনিয়ায় আর কোন মেয়ে এ নাচ নাচিতে পারে বলিয়া পানু আজও বিশ্বাস করে না।

ঘোষ যে যশোদার বাপ—এ কথা ও-অঞ্চলে কাহারও না-জানা ছিল না। ঘোষও কথাটা লুকাইত না; সে নিজেই পানুকে বলিয়াছিল—আমার বেটী ও। ওর মা ছিল আমার আশনাইয়ের মানুষ। তুইও বোষ্টম, ওর মাকেও আমি বোষ্টম করে দিয়েছিলাম। তুই আমার জামাই।

পানু তাহাকে ঘোষবাবা বলিত সেই অধিকারে। ঘোষ কোনদিন আপত্তি করে নাই। যশোদাকেও সে যথেষ্ট স্নেহ করিত। যশোদা বলিয়া কোনদিন ডাকিত না; বলিত—যশো-বেটী। ঘোষবাবা যশো-বেটী বলিয়া হাঁক মারিলে যশোদা ছুটিয়া আসিত অত্যন্ত আদরের পোষা কুকুরের মত। দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া আসিয়া দাঁড়াইত। সেই যশোদা রাত্রে লছমী এবং মংলীকে লইয়া ঘোষবাবার বাড়ি হইতে পলাইয়া আসিল, তাহাতেও পানু তত আশ্চর্য হয় নাই। কিন্তু ঘোষবাবার ঘরে সে যখন প্রতিহিংসায় আগুন লাগাইয়া দিল এবং সেই আগুন দেখিয়া যশোদা যখন উন্মত্ত আনন্দে নাচিল, তখন পানু আশ্চর্য হইয়া গেল।

আজ কিন্তু পানু আর আশ্চর্য হয় না। যশোদা তাহাকে ভালবাসিত, কিন্তু সেদিন যশোদা তাহাকে ভালবাসার জন্য এমন করিয়া নাচে নাই। যশোদা জানিত, পানু তাহার,—পানুর

টাকা-কড়ি, পানুর রোজগার, পানুর লছমী-মংলীও তাহার। তাই পানুকে যখন ঘোষবাবা নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল, তখন যশোদা রাত্রে লছমী মংলীকে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল তাহার কাছে। যশোদা বোবা কালা হইলেও বেশ বুঝিত যে, পানু না থাকিলে লছমী-মংলীর উপরেও তাহার কোন অধিকার থাকিবে না। পানুর ঘরে তাহার যে অধিকার, ঘোষবাবার ঘরে তাহার এক আধলা অধিকারও যশোদার নাই—এ কথা যশোদা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই তাহার আক্রোশ। সেই আক্রোশেই সে সেদিন নাচিয়াছিল। দুনিয়া—তামাম দুনিয়াতেই ওই এক ব্যাপার। নিজের ছাড়া কেহই কাহারও নয়। যশোদাও ঘোষবাবার মত তাহাকে চুষিয়া খাইতে চাহিয়াছিল।

প্রায় বৎসর খানেক পর যশোদা নিজেই তাহাকে কথাটা বুঝাইয়া দিয়াছিল।

সময়টা তখন বর্ষা। পানু তখন যশোদাকে লইয়া ঘোষবাবার গাঁ হইতে একদম বিশ ক্রোশ তফাতে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছিল। একখানা ঘর, এক টুকরা বারান্দা, পাশে একটা গোয়াল। লছমীর তখন নূতন বাচ্চা হইবার সময়। মংলী বেশ বড় হইয়াছে—মাথায় শিঙ দুইটা গোলালো কালো পাথরের নুড়ির মত বাহির হইয়াছে। লছমীর দুধ নাই। উপার্জনের পথ নাই, তাই পানু ভাবিয়া চিন্তিয়া রোজগারের জন্য একটা বেগুনী-ফুলুরি-বাতাসা-মুড়কির দোকান করিল।

দীনু তাহাকে ভিয়ান শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। শিখিয়াছিলও সে সহজে। এদিকে তাহার বাল্যকালের স্মৃতি ও শিক্ষা সাহায্য করিয়াছিল। নাকু দত্তের দোকানের ও-পাশে ছিল মাধব ময়রার বাড়ি। বাল্যকালে সে মাধবের বাড়ি গিয়া বসিয়া থাকিত। ভিয়ান অর্থাৎ মিষ্টান্ন তৈয়ারী দেখিতে বড় ভাল লাগিত তাহার। কড়ায় চিনির পাক টগবগ করিয়া ফুটিত—সেই রস গোল হাতায় তুলিয়া কাঠি দিয়া ফেটাইলে ঘন সাদা হইয়া উঠিত; আর মাধব কাঠির কৌশলে কাটিয়া কাটিয়া খেজুরের চ্যাটাইয়ের উপর বাতাসা ফেলিত—মোমবাতির টোপার মত। সে মাধবকে সাহায্য করিত। হা-ঘরের দল হইতে পলাইয়া আসিয়া, দিদি চারুর বাড়িতে দীনু তাহাকে এই বাতাসা-কদমা তৈয়ারী শিখাইয়াছিল হাতে-কলমে। সে ওই দোকানই পাতিয়া বসিল।

ময়ূরাক্ষীর কূল ছাড়িয়া এবার সে আসিয়াছিল কোপাই নদীর ধারে। পারঘাটার উপরে ঘর বাঁধিয়াছিল। পাশে একটা সাঁওতালের বস্তী। সম্মুখে নদী। নদীর ধারে এক হাঁটু উঁচু সবুজ ঘাস। প্রথম কয়েক দিন একটা গাছতলায় থাকিয়া জায়গাটা ভাল লাগিলে খোঁজ-খবর লইয়া সে এবার সর্বাগ্রে জমিদারকে দশটা টাকা দিয়া ঘর করিবার অনুমতি যোগাড় করিল, তবে আরম্ভ করিল ঘর। বেশ জায়গা, সাঁওতালরাও ভাল লোক। সে মাটি কোপাইল, যশোদা মাথায় হাঁড়ি করিয়া জল আনিল। কাদা হইলে দুইজনে তাহারা কাদার উপর নাচিত। সে দেওয়াল দিত, যশোদা মাটি তুলিয়া দিত। কত কথাই যে মনে পড়িতেছে! কত খুঁটিনাটি! যশোদা কি পরিশ্রমই না করিত! ঘর-দুয়ার হইতে গোয়াল পরিষ্কার, লছমী-মংলীর সেবা, কাঠ-কুটা সংগ্রহ, পানুর ভিয়ানের সময় তাহাকে সাহায্য করিয়া ফিরিত সে চরকির মত। ইহার উপর যশোদার ছিল ছোট একখানি ক্ষেত। সাঁওতালদের বাড়ি হইতে শাক-সব্জীর বীজ সংগ্রহ করিয়া সেই ক্ষেতে ফসল ফলাইত। বাড়ির পাশেই ছোট্ট এক টুকরা জমি। এই কাজটা পানুর প্রথম প্রথম ভাল লাগিত না, কিন্তু যখন ফসলে শীষ দেখা দিল, লতাগুলি ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিল, তখন সে-ও মাতিয়া গেল যশোদার সঙ্গে। ক্রমে পানুর দেহখানা অসুরের মত শক্তিশালী হইয়া উঠিল। এই সময় সে যদি ঘোষবাবার সঙ্গে লড়িত, তবে কে হারিত সে কথা বলা শক্ত।

মধ্যে মধ্যে সে ইচ্ছা তাহার হইত। যাইবে নাকি আর একদিন? কিন্তু কাজের মধ্যে অবসর মিলিত না। কত কাজ!

সামনে বর্ষা পাইয়া পানু মাটি কোপাইয়া গোবর আবর্জনা মিশাইয়া ক্ষেতখানাকে দ্বিগুণ বাড়াইয়া ফেলিল। যশোদা তাহাতে শাকের বীজ ছড়াইল, কুমড়া-লাউয়ের বীজ পুঁতিল। কিন্তু তাহাতেও পানুর তৃপ্তি হইল না। সাঁওতালদের বাড়ীর পাশে বিস্তীর্ণ ডাঙা জমিতে ভুট্টার গাছ বাহির হইয়াছে। তাহার সাধ হইল, এমনি বিস্তীর্ণ জমিতে ফসল লাগাইয়া পৃথিবীর খাঁখাঁ করা বুক সবুজ করিয়া দিবে। তাহাতে ফুটিবে ফুল, তাহাতে ধরিবে ফল। চিন্তা করিয়াও পানুর নাচিতে ইচ্ছা করে। তাহার লাঙ্গল গরু নাই। নিজেই কোদাল কোপাইয়া অনেকটা জমিতে ভুট্টার বীজ ছড়াইয়া দিল। হঠাৎ আসিল সেই দিন, যে দিনের ঘটনা হইতে যশোদার অন্তরের সত্য পানুর চোখে ধরা পড়িল।

সে দিন বর্ষা নামিয়াছিল। বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় জল নামিল। আকাশের বুকের মেঘ যেন মাটির বুকে নামিয়া আসিতে চাহিতেছে। মেঘের রঙ সন্তানসম্ভবা কালো মেয়ের মুখের মত। কালো রঙ ফ্যাকাশে হইলে যেমন হয় তেমনি। চারিপাশ বৃষ্টির ধারায় ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। ক্ষেত ঢাকিয়াছে, গ্রাম ঢাকিয়াছে, নদীর ধারের জঙ্গল ঢাকিয়াছে, নদীর ঢালু পথ, নদীর বুক—সব কে যেন একখানা চাদর আড়াল দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছে। ঝাপসা। সব ঝাপসা।

পানু বাতাসা কাটা শেষ করিয়া বসিয়া সব দেখিতেছিল। যশোদা জলে ভিজিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ আঁউ-আঁউ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল যশোদা। কি হইল? ছুটিয়া গেল পানু। দেখিল, জলের নালা বাহিয়া নদী হইতে একটা মাছ উঠিয়া আসিয়াছে। যশোদা সেটাকে কিছুতেই ধরিতে পারিতেছে না। হা-ঘরের কাছে পানু সাপ ধরা শিখিয়াছিল। খপ করিয়া সে মাছটার মাথা চাপিয়া ধরিল। হাততালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল যশোদা। আবার সে চেঁচাইয়া উঠিল—আঁউ-আঁউ! তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া পানু দেখিল, তাহার পিছনে আরও একটা মাছ। সেটাকে ধরিতে গিয়া সে আবিষ্কার করিল, সারিবন্দী মাছ উঠিয়া আসিতেছে। তাহার একটা নেশা ধরিয়া গেল। যশোদাকে ইসারা করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—ঘর-দুয়ার রহিয়াছে, তুই থাক। আমি মাছ ধরিয়া আনি। লছমী মংলীকে বাঁধিতে হইবে, খড় দিতে হইবে।

যশোদা আঁউ-আঁউ করিয়া উঠিল।

যশোদার ওই এক দোষ। কথা সে সব সময় বুঝিতে পারে না। তাহার মন যে দিকে ছুটিয়া চলে, তাহার উল্টা কথা হইলে সে কথা তাহার মাথায় কিছুতেই ঢুকিবে না। যশোদার হাত ধরিয়া সে তাহাকে দাওয়ার উপর বসাইয়া দিল; ইশারা করিয়া বুঝাইয়া দিল—লছমী মংলীকে ঘরে বাঁধিতে বলিল। তারপর সে বাহির হইল মাছের সন্ধানে। বাপ রে বাপ! কত মাছ! কত! সারি সারি চলিয়াছে উজানে! যেন উহারা ঠিক বুঝিতে পারে, এইবার বর্ষা নামিয়াছে, পুকুর খাল বিল ভরিয়া উঠিয়াছে—নদীর উজানে নালা বাহিয়া তাহারা সেখানে বেড়াইতে চলে। আবার আশ্বিন মাসে বৃষ্টি নামিলেই মাছগুলা স্রোতের টানের মুখে পুকুর খাল বিল হইতে বাহির হইয়া ছুটিবে। ঠিক বুঝিয়াছে, বর্ষা ফুরাইয়া আসিতেছে। ক্রমে এইবার খাল বিল পুকুরের সঙ্গে নদী নালার যোগ কাটিয়া যাইবে, পুকুর খাল বিল মরিয়া আসিবে; তখন স্রোতের টানের মুখ নদীতে পড়িয়া যাইবে; ছোট নদী হইতে বড় নদীতে,

বড় নদী হইতে সমুদ্রে। পানু মাছ ধরিয়া হাতে বালতিটা প্রায় ভরিয়া ফেলিল। ওদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আর কিছু দেখা যায় না। সে বাড়ি ফিরিল। বাড়ি অন্ধকার। আলো জ্বালা হয় নাই।

সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—যশো—যশো!

হঠাৎ নজরে পড়িল—গোয়াল-ঘরে আলোর আভাস। গোয়ালের ঝাঁপ ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, লছমী শাবক প্রসব করিতেছে। আলো হাতে যশোদা দাঁড়াইয়া আছে। অদ্ভুত দৃষ্টি তাহার চোখে। কিন্তু সেদিকে সে খেয়াল করিল না।

লছমীর বাচ্চা হইতেছে—ইহাতেই পানু খুশি হইল। এবার লছমী যে রকম মোটাসোটা হইয়াছে, তাহাতে সে এবার দুধ ঢালিয়া দিবে। ভাবিতে ভাবিতে অন্ধকারেই আসিয়া সে বালতিটা রাখিয়া ঘর খুলিয়া ঢুকিল কাপড় গামছার জন্য। সামনে পড়িয়া আছে বাতাসা-কাটা খেজুরের চ্যাটাইটা। চ্যাটাইটায় পা না দিয়া উপায় নাই। সে চ্যাটাইটার উপর পা দিতে দ্বিধা করিল না। চ্যাটাইয়ে কাদা লাগিবে, সেই কাদা বাতাসায় লাগিবে। তা লাগুক, লোকের পেটে তাহার পায়ের ধুলা যাইবে। চ্যাটাইয়ের উপর পা দিয়া সে দড়ির আলনার দিকে হাত বাড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করিল—একটা ঠাণ্ডা মসৃণ গোল দড়ি এক মুহূর্তে তাহার পায়ে জড়াইয়া গেল। হিমশীতল তাহার স্পর্শ! গাঢ় অন্ধকার। চোখে কিছু দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু বুঝিতে তাহার কষ্ট হইল না যে, সে সাপের মাথায় পা দিয়াছে, সাপটা লেজ দিয়া তাহার পায়ে পাক দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে। সে একবিন্দুও চঞ্চল হইল না। বাঁচিয়া সে গিয়াছে; মাথাটাই পায়ের তলায় চাপা পড়িয়াছে, নহিলে এতক্ষণ কাঁটার মত দাঁত বসিয়া যাইত কখন। কিন্তু সাপের লেজের পাকও বড় কম সাংঘাতিক নয়। মুহূর্তে মুহূর্তে কষিয়া ধরিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অসাড় করিয়া ফেলিবে। সে জানে। হা-ঘরেদের মধ্যে থাকিয়া সাপ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখিয়াছে। সাপ ধরিতেও জানে। কিন্তু অন্ধকারে সাপ ধরা যায় না। পায়ের চাপ শিথিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান মরণ-কামড় বসাইয়া শোধ লইবে। সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—যশো!

আবার ডাকিল—যশো! তাহার ডাক বর্ষারাত্রির নদীকূলে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু যশোদার কোন সাড়া আসিল না। কালা বোবা যশোদা শুনিতে পায় নাই।

এদিকে সাপটা পাক কষিতেছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া সেও দুরন্ত চাপে পা দিয়া দলিতে আরম্ভ করিল পায়ের তলায় চাপা-পড়া খেজুরের চ্যাটাইয়ের অংশটাকে। উহারই নীচে আছে সাপটার মাথা। সেটাকে পিষিয়া ফেলিবে সে।

পায়ের শিরাগুলা টনটন করিতেছে। প্রাণপণে আবারও চীৎকার করিয়া ডাকিল—যশো—যশো! পানু শুনিল, তাহার ডাক ডাকাতের হাঁকের মত বর্ষণসিক্ত নদীর বাঁকে-বাঁকে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছে। কিন্তু তবুও যশোদার কোন সাড়া নাই। বোবা কালা যশোদা বিহ্বল হইয়া দেখিতেছে লছমীর সন্তান-প্রসব।

দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া নিষ্ঠুর আক্রোশে সে পায়ের চাপ মারিল—পিষিল—দলিয়া দিল—কঠিন দলনে দলিয়া দিল। হঠাৎ পাশের দেওয়ালে হাতে ঠেকিল একটা লোহার বড় গজাল। গজালটাকেই টানিয়া তুলিয়া সেটার তীক্ষ্ণ প্রান্তভাগ দিয়া আন্দাজ করিয়া সাপটার বেড়গুলাকে কাটিতে আরম্ভ করিল। কাটিয়াও ফেলিল। পায়ের বেড় কাটিয়া সে লাফ দিয়া সরিয়া আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তারপর সে গেল গোয়াল-ঘরে। আলো হাতে লইয়া যশোদা তখনও দাঁড়াইয়া আছে। লছমী একটা শাবক প্রসব করিয়াছে। পানুকে দেখাইয়া যশোদা

আঁউ-আঁউ করিয়া উঠিল। লছমীর বাচ্চাটাকে দেখাইল—আর সে হাত দিল নিজের গর্ভের উপর। কিন্তু সেদিকে আকৃষ্ট হইবার মত মনের অবস্থা তখন পানুর ছিল না। সে তাহার হাত হইতে আলোটা ছিনাইয়া লইয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, সাপটার মাথার দিকটা তখনও নড়িতেছে। হাত দেড়েক লম্বা একটা গোখুরা। সে শিহরিয়া উঠিল।

যশোদা তখন নিজের আনন্দে মত্ত। গর্ভে তাহার সন্তান।

পানুও নিজের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া চিন্তিত হইল। বার বার তাহার মনে হইল—ওই কালা মেয়েটার কানে না শোনার জন্য আজ যদি সে মরিয়া যাইত! আবার কোনদিন যদি এমন ঘটে!

ভাবিতে ভাবিতে সে স্থির করিল, কানওয়ালা আর একটা মানুষের তাহার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কোথায় পাইবে? হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল একটা মেয়ের কথা। কঙ্কালসার একটা মেয়ে, বয়স বেশী না হইলেও যশোর চেয়ে বেশী। মেয়েটা ভিক্ষা করিয়া খায়; কিন্তু ভিক্ষুকের ঘরের মেয়ে নয়, গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। এই পথে মধ্যে মধ্যে নদী পার হইয়া ভিক্ষায় আসে, এপারের বাবুদের ওই গ্রামে। কঙ্কালসার মেয়েটার চোখ দুইটা বড় বড়, আর চুল আছে এক বোঝা। বেশ লাগে পানুর। কথাবার্তাও মেয়েটার ভাল। মধ্যে মধ্যে জল চাহিয়া খায়। প্রথম দিন পানু তাহাকে রূঢ় ভাষায় বলিয়াছিল—বাতাসা-পাটালি চাইবার ফন্দী বার করেছিস ভাল। জল কি কেউ শুধু দেয়, অ্যাঁ?

মেয়েটা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়াছিল, তারপর বলিয়াছিল—না। শুধু জল।

—শুধু জল? ওই তো সামনেই নদী, ওখানে গিয়ে খা না।

মেয়েটা চলিয়া যাইতেছিল। পানুই কিন্তু আবার ডাকিয়া তাহাকে একখানা বাতাসা সমেত জল দিয়াছিল।—নে খা। নইলে নজরে আমার সব খারাপ হবে। যে ড্যাবড্যাবে চোখ।

ওই মেয়েটাকে সহজে পাওয়া যাইবে। নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। পানুরও মেয়েটাকে ভাল লাগে।

পানুর অবস্থা সচ্ছল, সুতরাং একটার স্থলে দুইটা তিনটা বিবাহে অবশ্যই অধিকার আছে। মেয়েটা কিছুকাল পূর্বে কোন একজনের সঙ্গে দেশান্তরী হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিছুদিন আগে রুগ্ন দেহ লইয়া গ্রামে ফিরিয়াছে। আত্মীয়স্বজনে ঘরে লয় নাই। ভিক্ষা করিয়াই মেয়েটা খায়। কিন্তু পানুর ওসবে কোন আপত্তি নাই। মানুষ—মানুষ। বাস্। পানু তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সরাসরি বলিল—আমাকে বিয়ে করিস তো তোকে খেতে পরতে দোব।

মেয়েটা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল পানুর মুখের দিকে। পাপ প্রস্তাব অনেকে করে, কিন্তু এমন ভাবে 'বিবাহ করবি'? এ প্রশ্ন কেহ করিতে পারে বলিয়া তাহার ধারণা ছিল না। পানু অসহিষ্ণু হইয়া প্রশ্ন করিল—কি বলছিস? করবি আমাকে বিয়ে? আমি বিয়ে করব আবার।

মেয়েটা এবার বলিল—কেন? তোমার সে বউ?

—সেও থাকবে। তুইও থাকবি। দরকার হলে আরও একটা বিয়ে করব। তোকে বিয়ে করব, খেতে দোব, পরতে দোব, শুধু কানে কথা শুনবি, মুখে কথা বলবি, কাজকর্ম করবি

সেই জন্যে। নইলে ভাগ। তুই তো ভাগাড়ের মড়ি!

মেয়েটা খানিকটা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—বেশ। কিন্তু তাড়িয়ে দিলে আমি যাব না। আজন্ম খেতে পরতে দিতে হবে। ভদ্রলোকের কাছে বল তুমি সেই কথা।

পানু বলিল—আলবৎ। চল, কার কাছে যেতে হবে।

ভদ্রলোকের কাছে বলিয়া পানু তাহাকে লইয়া ফিরিবার পথে একটা দেবালয়ে গিয়া মালা বদল করিয়া বিবাহ করিয়া ঘরে আনিল। মেয়েটা সলজ্জভাবে বলিয়াছিল—আজই?

পানু বলিয়াছিল—আজই ছেড়ে এখুনি। চল।

মালা পরিয়া মেয়েটাকে লইয়া ঘরে ফিরিতেই যশোদা আগাইয়া আসিল। আঁউ-আঁউ করিয়া প্রশ্ন করিল—কে? ও কে?

পানু তাহাকে ব্যাপারটা বুঝাইতে চেষ্টা করিল।

যশোদা যেন পাথরের পুতুল হইয়া গেল। সে সমস্ত দিন কিছু খাইল না। পানু তাহাকে কত ডাকিল, সাড়া দিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রে পানুর হঠাৎ শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। ধোঁয়ার গন্ধে ভিতরটা জলিয়া গেল। পাশে নূতন বউটা গোঙাইতেছে। পানু কতকগুলা বনফুল বিছানায় বিছাইয়া ফুলশয্যা করিয়াছিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল সে। ঘরের মধ্যে নিশ্বাস লওয়া যায় না। খানিকটা দূরে শুইয়া আছে যশোদা। তাহার সাড়া নাই। পানু বিছানা খুঁজিয়া, দেখিতে চাহিল যশোদাকে। হাত বাড়াইয়া খুঁজিল, যশোদা নাই। মুহূর্তে সে সব বুঝিয়া লইল। কোনমতে আসিয়া দরজা খুলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিল, এবার দরজার ফাঁক দিয়া চোখে পড়িল উপরে লাল আগুনের ছটা। ঘরে আগুন লাগিয়াছে—লাগিয়াছে নয়, যশোদা আগুন দিয়া পলাইয়াছে। ধোঁয়ায় শ্বাসস্থলী ফাটিয়া যাইবে। প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগে সে দরজাটা টানিল। সে টানে পলকা কাঠের দরজার জোড়াটা ছাড়িয়া গেল। পানু এবার হিড়হিড় করিয়া নূতন বউটাকে টানিয়া আনিয়া বাহিরে ফেলিল। যশোদাকে সে খুঁজিতে চেষ্টা করিল না। সে বেশ বুঝিয়াছে, ঘরের মধ্যে খড়ের ধোঁয়া এবং ধোঁয়ার উপরে লাল আগুনের ছটা দেখিয়াই সে বুঝিয়াছে—ঘোষবাবার ঘরে আগুন দিয়া সে যেমন আক্রোশ মিটাইয়াছিল, যশোদা তেমনি তাহার ঘরে আগুন দিয়া আক্রোশ মিটাইয়া পলাইয়া গিয়াছে। ঘরের বাহির হইতে শিকল দেওয়াটাই তাহার বড় প্রমাণ। তাহার ভাগ্য যে, বারান্দার প্রান্তে আগুন দিয়াছে যশোদা, ঘরের ভিতর আগুন দেয় নাই। বুদ্ধি হয় নাই শয়তানীর। ঘরটা গুমিয়া গুমিয়া পুড়িতেছে। আরও ভাগ্য যে সময়টা বর্ষাকাল, বর্ষণসিক্ত চালের খড় দাউদাউ করিয়া জলে নাই। যশোদা পলাইয়াছে। সে ছুটিয়া গেল গোয়াল-ঘরের দিকে। না, লছমী মংলী আছে। তাহাদের লইয়া যায় নাই। শীতল স্নিগ্ধ বাতাসে বসিয়া সে এতক্ষণে হাঁপাইতে লাগিল। নূতন বউটা এখনও মড়ার মত পড়িয়া আছে। উঃ, সেদিনের কথা আজও পানুর মনে আছে।

সে ডাকিল—আরে, এ! এ রাজিয়া!

বউটা পাশ ফিরিল কোনমতে।

* * *

তিন দিন পরে যশোদার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল।

একটা মেলায়—রথের মেলায়, তাহাকে পাওয়া গিয়াছিল। এক মৃত ভ্রূণ প্রসব করিয়া যশোদা মরিয়া পড়িয়া ছিল রক্তাক্ত কলেবরে।

থানার কন্‌স্টেব্‌ল আসিয়াছিল তাহার কাছে।

তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কন্‌স্টেব্‌ল বলিল—লাসটা তাহার দেখা দরকার।

সে গিয়াছিল।—হ্যাঁ, যশোদা; আমার পরিবারই বটে। তিন দিন আগে আমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছিল। হতভাগী যশোদা! আপনার আক্রোশের বিষে মরিয়া গেল। না, মানুষে তাহাকে মারিয়াছিল। কালা বোবা হাবা মেয়ে একটা। মানুষেরা দয়া করিল না, লালসার অত্যাচারে তাহাকে মারিয়া ফেলিল।

পানু সেই ভ্রূণটাকে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে দুই হাতে তুলিয়া দেখিয়া নামাইয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল।

দুনিয়াভর মানুষের এক ব্যাপার—এক খেলা চলিতেছে। সব নিজে, সব নিজে। নিজের জন্যই মানুষ খেলা খেলিতেছে। যশোদা তাহার সঙ্গে নিজের স্বার্থে শয়তানী-খেলা খেলিল। মানুষ তাহাকে লইয়া নিজেদের শয়তানী-খেলা খেলিল।

ষোল

ফিরিবার সময় সমস্ত পথটা সে ঐ কথাই ভাবিয়াছিল। সেদিনও তাহার জীবনের আগাগোড়া কাহিনী মনে মনে উত্তপ্ত কড়াইয়ের ফুটন্ত গুড়ের মত আলোড়িত হইয়াছিল—নীচের জিনিস উথলিয়া ফুলিয়া উপরে ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

দুনিয়ার সব ফাঁকি, সব মেকী। ঝুট—ঝুট—সব ঝুট। মিথ্যা—বাজে। ভালবাসা মমতা দয়া মায়া বিলকুল ঝুট। ধর্ম পুণ্য—মিথ্যা বাজে। ওগুলা সব আবার ওই ভেল্কির খেলা। ও সবগুলা এক-একটা ভেল্কি। ওই ভেল্কি লাগাইয়া মানুষ আপন আপন কাজ হাঁসিল করিয়া লয়।

যশোদার ভেল্কি আজ সে দেখিল। ওঃ, কি মিঠা মিহি ভেল্কি! কেয়াবাৎ ভেল্কি! যশোদার জীবনের আগাগোড়াই কি এমনি ধারার ভেল্কি? সে যে কোনদিন ভাবিতে পারে নাই পানু। আঃ, যশোদার ভেল্কিটা যদি না ভাঙিয়া যাইত! আহা-হা রে! যশোয়া—যশোদিয়া—যশিয়া—যশোমতিয়া—যশি—যশো—কত নামেই সে যে তাহাকে ডাকিত।

আজও যশোদাকে মনে পড়িলে পানুর চোখে জল আসে।

বাড়ি ফিরিবার পথে ওই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন উদ্‌ভ্রান্ত যে, তাহার পথ পর্যন্ত ভুল হইয়া গিয়াছিল। কোপাই নদীর ঘাটে আসিয়া তাহার সে খেয়াল হইল। নদী কোপাই-ই বটে। কিন্তু এ ঘাটটা তো তাহার বাড়ির পথের ঘাট নয়। কই, ওপারে উঁচু ডাঙার উপর তাহার দোকানখানা কই? দোকানের পিছনে সাঁওতালদের পাড়াটা কই? ওঃ, এ সে চিৎরার ঘাটে আসিয়া পড়িয়াছে। চিৎরার ঘাটেই নদী পার হইয়া অনেকটা ঘুরিয়া তবে সে আপনার বাড়ির এলাকায় আসিয়া পৌছিল। দূর হইতে তাহার বাড়িটা দেখা যাইতেছিল। বাড়ির একটা পাশের দিক—যে দিকটায় যশোদা করিয়াছিল সব্জীক্ষেত। সব্জীক্ষেতের সবুজ গাছগুলি দূর হইতেই নজরে পড়িতেছিল। যশো এই ক্ষেতের পত্তন করিয়াছিল। যশো! না, সে শয়তানী।—শুধু যশো কেন, সব—সব—শয়তান আর শয়তানী।

হনহন করিয়া পান্নু আসিয়া ক্ষেতের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়াইল; তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বাড়ির সামনের দিকে আসিল। আঃ, এই দেখ আর এক শয়তানী!

দোসরা বউটা পিছন ফিরিয়া বসিয়া খাইতেছে। খুব জমাইয়া খাওয়াটা আরম্ভ করিয়াছে। পান্নু আসিয়াছে—সে খেয়াল পর্যন্ত নাই। পান্নু গিয়া পিছনে দাঁড়াইল। ও-হোঃ! এক বাটি দুধ, আট-দশখানা বাতাসা, খানিকটা ময়দা-গোলা—ওরে বাপ রে!

পান্নু দাওয়ার উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

বউটা চমকিয়া উঠিল—মুখখানা কেমন ক্যাকাসে হইয়া গেল। পান্নু বলিল—লে, খেয়ে লে। খেয়ে লে।

বউটার তবু হাত নড়ে না।

পান্নু আবার বলিল—খা খা। লে খা। বলিয়া সে ঘরের ভিতর ঢুকিল। তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে। ঢকঢক করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া সে বাহিরে আসিল, দেখিল, বউটা এখনও তেমনিভাবে বসিয়া আছে।

—আরে—। পান্নু ধমক দিল।—লে—লে—খেয়ে লে। খা বলছি, খা।

বউটা ভয়ে এবার দুধের বাটিটা মুখে তুলিয়া ধরিল। কিন্তু থরথর করিয়া তাহার হাত কাঁপিতেছে। পান্নু হাসিয়া আবার বলিল—খা খা। খাওয়া শেষ করিয়া বাটিটা মাটিতে নামাইবা মাত্র পান্নু উঠিয়া গিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিল।—আয়, এইবার আয়।

মেয়েটা চীৎকার করিয়া উঠিল।

পান্নু অন্য হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল—ক্যাঁক করে টিপে মেরে দেব যদি চিললাবি।

মেয়েটা চুপ হইয়া গেল। আতঙ্কে বিস্ফারিত বড় বড় চোখ দুইটা হইতে জলের ধারা গড়াইয়া পড়া কিন্তু বন্ধ হইল না।

ভেল্কি! এও ভেল্কি!

বহুৎ মিঠা আর মিহি ভেল্কি কিন্তু। মেয়েটা রোগা হইলেও দেখিতে ভাল। এও এক ভেল্কি! পান্নু মেয়েটার চুল ছাড়িয়া দিল।—যাও।

মেয়েটা ভয়ে এমন অভিভূত হইয়া গিয়াছিল যে, পান্নু চুলের মুঠি ছাড়িয়া দেওয়া সত্ত্বেও নড়িতে পারিল না।

পান্নু আবার বলিল—যাও!

মেয়েটা এবার সকাতরে বলিল—আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

পান্নু হাসিতে আরম্ভ করিল।

মেয়েটা তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।—তোমার পায়ে পড়ি।

পান্নু কপালে ঠেলা দিয়া তাহার মুখখানাকে চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল। মেয়েটার চোখ দিয়া জলের ধারার বিরাম নাই। মেয়েটা বলিল—আর আমি চুরি করে খাব না।

পান্নুর রাগ বাড়িয়া গেল। তাহার খেয়াল হইয়া গেল—'চুরনী' মেয়েটা চুরি করিয়া খাইয়াছে। সে এবার দুমদাম শব্দে গোটা কয়েক কিল তাহার পিঠে বসাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিল। বহু কষ্টে মেয়েটা সে আঘাত সামলাইল। মেয়েটা তবু তাহার পা ছাড়িয়া দেয় নাই।.. কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া মেয়েটা বলিল—আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না, না খেয়ে আমি মরে যাব। আর—আর মেরো না এত জোরে। মরে যাব।

ওই এক ভেল্কি! সকলের বড় ভেল্কি! পেট! ওই পেটই সব চেয়ে বড় ভেল্কি!

পানু মেয়েটাকে আর কিছু বলিল না। কথাটা মেয়েটা মিথ্যা বলে নাই। যে রকম হাড়-পাঁজরা বাহির হইয়া আছে, তাহাতে ওর মরিয়া যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। মার খাইলেও মরিয়া যাইবে, তাড়াইয়া দিলেও না খাইয়া মরিয়া যাইবে।

আরও আশ্চর্যের কথা, পানু পরদিন হইতে নিজেই মেয়েটার জন্য দুধের বরাদ্দ করিয়া দিল। মেয়েটার মুখখানা দেখিয়া কেমন মায়া হয়। ডবডবে চোখ দুইটাতে ভেল্কি আছে।

ওঃ, সে যে কি ভেল্কি, রাজিয়ার চোখের যে কী ভিল্কি—সে ভাবিয়া পানুর আজও চমক লাগে। মেয়েটার ডাকনাম রাজি। রাজবালা বা রাজলক্ষ্মী কি রাজরাণী কি রাজুবালা—সে পানু জিজ্ঞাসা করে নাই। প্রথম দিনই তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কি নাম তোর ?

সে বলিয়াছিল—রাজু।

পানু বলিয়াছিল—রাজু ? রাজু ?

—হ্যাঁ।

প্রথম প্রথম সে তাহাকে 'রাজি' বলিয়াই ডাকিত। রাজির দেহ দুর্বল—সে বেশী খাটিতে পারিত না, এবং সেজন্য তাহার ভয় ছিল অত্যন্ত। কিন্তু তবু রাজির একটা বড় গুণ ছিল। রাজি বড় বাহার জানে। ঘর-দুয়ারগুলিকে সে এমনভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া ঝকঝকে করিয়া তুলিল, চারিদিকে এমন একটা বাহার তৈয়ারী করিয়া তুলিল যে, পানুর সেটা ভাল লাগিল। পূজার সময় ঘর নিকাইল রাজি, দেওয়ালের পাশে আলপনা আঁকিল। ঘরের দাওয়ার পাশে কতকগুলা গাঁদা দোপাটির চারা লাগাইল। কার্তিকের প্রথমে তাহাতে ফুল ধরিল।

দাওয়ার উপর এমন বাহার করিয়া দোকানটা সাজাইয়া দিল রাজি! ইটের থাক দিয়া তক্তা পাতিয়া সিঁড়ি বানাইয়া তাহার উপর থাকে থাকে সে বাতাসা-কদমা-মুড়ি-মুড়কির দোকান সাজাইয়া দিল। পানুর সেটা ভারি ভাল লাগিল। সে আদর করিয়া বলিল—বহুৎ আচ্ছা রে রাজি!

রাজি তাহার দিকে ডবডবে চোখ দুইটি তুলিয়া হাসিল।

আশ্চর্যের কথা, পানু আজ রাজির চোখে যে ভেল্কি দেখিল, সে ভেল্কি কখনও দেখে নাই। শুধু রাজির চোখেই নয়, রাজির মুখেও ওই ভেল্কির ছটা খেলিতেছে। মুখখানা বেশ পুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাজির রঙ ফরসা। ফরসা রঙে রাজির গালে লালচে আভা। অনাবৃত হাত দুইখানা দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল—নরম সুডৌল হইয়া উঠিয়াছে হাত দুইখানা। পানু আগাইয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। রাজি তাহার মুখের দিকে চাহিল, চাহিয়াই কিন্তু সে আজ নির্ভয়ে আপনার হাত টানিয়া লইয়া কার্যান্তরে চলিয়া গেল।

পানু সেইদিন ডাকিয়াছিল—রাজিয়া!

রাজিয়া উত্তর দেয় নাই। ভেল্কিদারনীরা ঠিক জানিতে পারে—ভেল্কি লাগিয়াছে কি না! ইহার পর হইতে রাজিয়া দূরে দূরে থাকিতে আরম্ভ করিল। আশ্চর্য ভেল্কি! পানুর জোর-জবরদস্তি কোথায় যেন উড়িয়া গেল! দূর হইতে রাজিয়া ডবডবে চোখের ভেল্কি-মাখা দৃষ্টি তুলিয়া পানুর দিকে চায়। সন্ধ্যা হইতে আলাদা ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া শোয়। পানু ডাকিলে সাড়াও দেয় না। পানু কিন্তু প্রাণপণে ভেল্কি হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু একদিন ভেল্কি পানুর রক্তে আগুন ধরাইয়া দিল।

পানু কোন কাজে গাঁয়ে গিয়াছিল। ফিরিল যখন, তখন অনেক বেলা হইয়াছে। বাহিরে

দাওয়ার উপর রাজি ছিল না। দরজাতেও তালা ঝুলিতেছিল। কোথায় গেল রাজি? দাওয়ার উপর বসিয়া আছে, এমন সময় রাজি স্নান করিয়া ফিরিল। ভিজা কাপড়ের স্বচ্ছতা রাজির নূতন পরিপুষ্ট দেহখানি অকুণ্ঠিতভাবে পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে। ভিজা কাপড়ে রাজিকে পানু এক-দিনও দেখে নাই। পানু জল খাইয়া লছমী মংলী এবং নূতন বাছুরটাকে লইয়া যাইত নদীর ধারে, সেই সময়টি ছিল রাজুর স্নানের নির্দিষ্ট সময়।

পানুর রক্তের আগুন চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে সেই দৃষ্টি লইয়া রাজির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। রাজি সভয়ে শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু আর বিদ্রোহ করিতে সাহস করিল না।

সে আমলে অর্থাৎ পানুকে যখন তাহার ভেল্কিতে সে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল ও পাগল করিয়া রাখিয়াছিল—তখন সে প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু আদায় করিয়া লইত। পানু তাহার কাছে আসিলেই সে হেলিয়া দুলিয়া বলিত—আজ কিন্তু আমার একটি জিনিস চাই।

রাজিয়ার অদ্ভুত যাদু! পানু কিছুতেই তখন সচেতন হইতে পারিত না। রাজিয়াও তাহার দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কখনও ধরা দিত না। তখন এ কথাগুলি মনে হইত না। এখন মনে হয়। আজ বেশী করিয়া মনে হইতেছে। ভেল্কিদারনী রাজিয়ার ক্ষমতাকে সে তারিফ করে। তাহার দাবি পূরণ না করিয়া পানু শক্তিপ্রয়োগে রাজিয়াকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিলে রাজিয়া ধরা দিত মড়ার মত। ওই চোখে সে এমন করিয়া চাহিত যে, পানু তৎ-ক্ষণাৎ হার মানিত। হাসিয়া আদর করিয়া দাবির অধিক দিয়া তবে নিজে সে খুশি হইত। দাবির চেয়ে বেশী দেওয়ার একটা তৃপ্তি আছে।

রাজিয়াব বুদ্ধিরও সে তারিফ করে।

যশোদা তাহাকে ক্ষেতের নেশা ধরাইয়াছিল। রাজিয়া তাহাকে চাষের লাভের পথ বাতলাইয়া দিল।

সে তাহাকে বলিল—ভুট্টা লাগিয়ে কি হবে? ধান চাষ কর।

—ধান চাষ? পানুর মস্তিষ্কে কল্পনা আছে, কিন্তু প্রদীপের সলিতার মত তাহার প্রান্তে অগ্নিশিখা সংযোগে জ্বালাইয়া দিতে হয়। মুহূর্তে পানুর দৃষ্টি গিয়া পড়িল গ্রীষ্মের চষা-খোঁড়া তকতকে ধানক্ষেত্রের উপর। সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র। বর্ষার সময়ের ছবি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল—সবুজ কাঁচা ধানে ভরা ক্ষেত, তারপর বর্ষার শেষে ধানের গাছে শীষ জাগিয়া উঠে। সদ্য বাহির হওয়া শীষের মধুর গন্ধের স্মৃতি তাহার মনে পড়িল। তারপর পাকা ধানের ক্ষেত। সোনার বরণ ধান। ধান মাড়াই হয়। মরাইয়ে উঠে। খামার আলো করিয়া থাকে। ঘোষ-বাবার ক্ষেত-খামারের কথা মনে পড়িল। সেই চাষী যে তাহাকে ঘোষবাবার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়াছিল, তাহার খামারের কথা মনে পড়িল। পানু লাফাইয়া উঠিল—হ্যাঁ, সে ধান চাষই করিবে।

হাসিয়া রাজিয়া বলিল—জমি কেনো, তারপর গরু কেনো—হাল কর। তুমি চাষ করবে, আমি তোমার দোকান করব।

ধানের জমি কিনিবার জন্য পানু ক্ষেপিয়া উঠিল। জমি মিলিল। দুই শো টাকা দিয়া নদীর ধারে পাঁচ বিঘা জমি কিনিল সে এক চাষীর কাছে।

পাঁচ বিঘা জমির জন্য এক জোড়া হেলে বলদ কেনা যায় না। পানুর বুদ্ধিতে কিনিতে কোন বাধা ছিল না। রাজিই ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল—মুখে মুখে হিসাব দেখাইয়া দিল। অগত্যা জমিটা চাষের ব্যবস্থা হইল হাল কিনিয়া। অর্থাৎ ভাড়া লইয়া চাষী তাহার জমি চষিয়া দিয়া

গেল, পানু নিজে এবং সঙ্গে সঙ্গে জনমজুর লইয়া জমিটা আবাদ করিয়া ফেলিল। পানু চাষের পদ্ধতি খুঁটিনাটি ভাল জানিত না। রাজি জানিত, সে-ই সব বলিয়া দিত। তাহার উপর পানু পরিশ্রম করিল অসুরের মত।

রাজিয়া মাঠেই তাহার জন্য খাবার লইয়া আসিত। বসিয়া বসিয়া ভুলচুক দেখাইয়া দিত, মজুরদের ফাঁকি ধরাইয়া দিত। পানু খাইত, সে বলিয়া যাইত।

প্রকাণ্ড বড় বাটিতে রাশীকৃত মুড়ি, লছমীর দুধ, বাতাসার গুঁড়া। পানু পেট ভরিয়া খাইত। আবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ছোট চুপড়ি ভরিয়া মাছ ধরিয়া বাড়ি ফিরিত। রাজিয়া আদর করিয়া তাহার গায়ের কাদা ধুইয়া তেল মাখাইয়া দিত। স্নান করিয়া ফিরিলে থালার উপর ঢালিয়া দিত গরম ভাত মাছ তরকারি ডাল।

চাষ শেষ হইলেও পানুর জমির নেশা গেল না। জমির ধারে গিয়া বসিয়া থাকিত। প্রতিদিন লক্ষ্য করিত, গাছগুলি কেমন বড় হইতেছে। প্রথম প্রথম সে বিঘত মাপিয়া দেখিত। চাষীদের কাছে জানিয়া আসিত চাষের জন্য কখন কি করিতে হইবে। ডাক-সংক্রান্তির অর্থাৎ আশ্বিনের সংক্রান্তির দিন চাষী মাঠের আলে দাঁড়াইয়া ধানকে ডাকে—ধান ফুলাও—ধান ফুলাও। অর্থাৎ শস্যপূর্ণ ধান্যশীর্ষ বাহির হও। পানু সেদিন ডাক দিয়া গলা ফাটাইয়া ফেলিল।

ধানের শীষ বাহির হইল—ধান পাকিল। পানু পাকা ধান কাটিয়া ঘরে আনিল। ধান মাড়িয়া ঘরের দাওয়ায় রাখিয়া তাহার সামনে বসিয়া রহিল—খেলনার রাশির সম্মুখে রুগ্ন শিশুর মত। খেলিবার সাধ্য নাই, কিন্তু প্রাপ্তিতে তাহার প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে। রাজিয়ার হাসিঠাট্টার বিরাম ছিল না। সে কিন্তু তাহার ভালই লাগিল। শুধু ভাল লাগিলই নয়। তাহার নেশা ধরিয়া গেল। হঠাৎ সে রাজিয়াকে দুই হাতে ছোট শিশুর মত তুলিয়া লইয়া উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া অনায়াসে লুফিয়া লইল।

ভয়ে রাজিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—না—না—ওগো, না। কিন্তু বর্বর পানু তখন আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। সে আবার তাহাকে ছুঁড়িয়া দিয়া লুফিয়া লইল। রাজিয়ার চুল খুলিয়া গেল। মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে হাঁপাইতেছিল। কিন্তু তবু পানু থামিল না। সেই শীতের উপভোগ্য দ্বিপ্রহরে জনহীন নদীতীরের বাড়ির অঙ্গনে সে তাহাকে লইয়া লোফালুফি করিয়া সত্য সত্যই খেলা সুরু করিয়া দিল। রাজিয়ার আর প্রতিবাদের কি অনুনয়েরও সাধ্য ছিল না। তাহারও যেন চেতনা হারাইয়া যাইতেছে।

হঠাৎ পানু তাহাকে মাটির উপর বসাইয়া দিল, বলিল—বস। রাজুর বসিবার শক্তি ছিল না। সে মাটির ধূলার উপরেই শুইয়া পড়িল। পানু লাফ দিয়া দাওয়ায় উঠিয়া ঘর হইতে একটা হেঁসো অস্ত্র লইয়া ফিরিয়া বলিল—তুই এতনা মিটা রাজিয়া!—আজ হাম তোকে ফাড়ব; কেটে দেখব—তোর ভিতর কি আছে! কিসে তুই এতনা মিঠা!

রাজুর সমস্ত শরীর যেন বিবশ অসাড় হইয়া গেল। পানুকে তো সে জানে। বন্য বর্বর একটা মানুষ,—দয়া নাই, মায়া নাই, নিষ্ঠুর। তাহার উপর এই দুপুরবেলা জনহীন নদীতীরে ঘর। পানুর বর্বর খেয়ালে, উন্মত্ত ইচ্ছায়, পরিত্রাণের কোন উপায় নাই। সে শুধু বড় বড় চোখ দুইটি মেলিয়া অসহায় সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। পানুর হাতে হেঁসো। চোখে উন্মত্ত দৃষ্টি। হঠাৎ পানু হাতের হেঁসোখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। আবার রাজুকে দুই হাতে উঠাইয়া লইয়া পরম সমাদরে দাওয়ার উপর তক্তাপোশে শোয়াইয়া দিয়া বলিল—তুই বহুৎ বোকা রে রাজিয়া! বহুৎ বোকা!

চতুর রাজিয়া হারিয়া গিয়াছে তাহার কাছে। সত্য সত্যই হারিয়া গিয়াছে। হার মানিয়া

লইয়াই রাজিয়া এতক্ষণে বলিল—একটু জল। পান্নু দোকানের সব চেয়ে বড় মিষ্টিটা তাহার হাতে দিয়া বলিল—খা। তারপর দিল এক ঘটি জল। রাজিয়ার বুদ্ধিতেই তাহার সব।

রাজিয়া সুস্থ হইয়া হাসিয়া বলিল—বাবা! আর তোমাকে আমি বুদ্ধি দেব না। এই আদর? মরে যাব আমি আদরে! নইলে, আরও বুদ্ধি দিতাম।

পান্নু বলিল—বাতাও, কি বুদ্ধি বল?

—না। শেষে আদর করে খুন করবে আমাকে? খুন হতে আমি পারব না।

—না বললেও খুন করব আমি। বাতলাও বুদ্ধি—বাতলাও।

হাসিয়া রাজিয়া বলিল—সে জানি আমি।

—তব্ বাতলাও।

—এবারের সব ধান বেচে টাকা জমা কর। তারপর আরও জমি কেনো। একখানা হালের জমি হলে ঠিক হবে। গরুগাড়ি হাল লাঙল—

—বাস—বাস। ঠিক হ্যায়।

তাহাই করিবে সে।

কিন্তু সব কল্পনা লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। বর্বর পান্নু দুনিয়ার হালচাল জানে না। রাজিয়ার বুদ্ধিও বৈষয়িক বুদ্ধিতে পাকা নয়।

মাস দুয়েক পরে।

পান্নু বাতাসা কাটিতেছিল, রাজিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেছিল। হঠাৎ কাছেই কোথাও ঢোল বাজিয়া উঠিল।

দুইজনেই ফিরিয়া চাহিল।

সামনেই রাস্তার ওপারে নদীর তীরভূমিতে জমির উপর কতকগুলা লোক ঢোল বাজাইতেছে, একটা লাল পতাকা উড়িতেছে।

রাজু বলিল—ওগো!

পান্নু ছুটিয়া গেল।

রাজু হাঁকিয়া বলিল—আদালতের লোককে যেন মেরো না। শুনছ? মাথা খাবে, মরা মুখ দেখবে আমার।

জমি পান্নুরই বটে। লোকগুলির মধ্যে আদালতের লোকও রহিয়াছে।

আদালতের কর্মচারী-পেয়াদা আসিয়া তাহার জমির বুকে একটা লাল পতাকা পুঁতিয়া দিল। পান্নু অবাক হইয়া গেল।

যাহার কাছে সে জমি কিনিয়াছিল, ঋণ করিয়াছিল সেই লোকটা। তাহারই ঋণের দায়ে মহাজন নালিশ করিয়া জমি নীলাম করিয়া লইয়াছে। তকমা-আঁটা লালপাগড়ী পরা সরকারী পেয়াদা। পান্নু তাহাকে কিছু বলিল না।

সে গেল বিক্রেতা চাষীর কাছে।

—আমার টাকা ফিরে দে।

চাষী হাসিল।

পান্নু গর্জন করিয়া উঠিল—আমার টাকা দে!

—আদালত। আদালত আছে, সেখানে যা।

পান্নু লোকটাকে দুই হাতে আলগোছে তুলিয়া মাটির উপর আছাড় মারিয়া ফেলিয়া বলিল

—ফেল টাকা!

লোকটার চীৎকারে পাড়ার লোক আসিয়া জমিল। সকলে মিলিয়া ধরিয়া পান্নুকে বেশ ঘাকতক দিয়া খেদাইয়া দিল। পান্নু বাড়ি ফিরিল শিশুর মত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে। প্রহারের বেদনায় নয়। সে আর কত ঠকিবে? সমস্ত পৃথিবীর উপর তাহার মর্মান্তিক অভিযোগ। দারোগা—জমাদার—কন্‌স্টেব্‌ল—গুরুঠাকুর—চারুদিদি—ঘোষবাবা—যশোদা—এই চাষীটা—সবার বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বমুখে অভিযোগ জানাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া প্রান্তরটা ভরাইয়া দিল।

রাজিয়া তাহাকে বুদ্ধি দিল—মহাজনের কাছে যাও। টাকাটা দিয়ে জমি ফিরে নাও।

—না—না—না। বাঁধ তল্পী-তল্পা, বাঁধ। এ মুলুকেই আমি থাকব না।

রাজি অবাক হইয়া গেল।—তৈরী ঘর দোর?

পান্নু বলিল—ফের ঘর গড়ে লিব, চল। ই বেইমানের মুলুকে থাকব না—আমি থাকব না।

রাজি বলিল—এতগুলো টাকা—

—ভাগ। টাকা আমি করেছিলাম, আমিই ফের করব। চল হিঁয়াসে।

আঃ, দুনিয়া ছাড়িয়া যদি যাইবার জায়গা থাকিত!

সতেরো

কোপাই নদীর পারঘাটা হইতে উঠিয়া সে এখানে আসিয়াছে। অনেক দিন হইয়া গেল। বাড়ির পাশের পুকুর-পাড়ের গাছগুলির দিকে চাহিয়া দেখ—হিসাব কর, কতদিন হইল! এটা একখানি ছোট গ্রাম। পাশেই মাইল দুইয়ের মধ্যে একখানি বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে,—প্রায় ছোট-খাটো শহর। সেটা একটা মস্ত সুবিধা। জেলাটার সদর হইতে একটা পাকা সড়ক ওই বড় গ্রামের ভিতর হইয়া পান্নুর বাড়ির পাশ দিয়া জেলা পার হইয়া আরও কতকগুলা জেলার ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়া মিশিয়াছে বাদশাহী সড়কের সঙ্গে। সেই সড়ক হইতে আরও একটা পাকা রাস্তা বাহির হইয়া ছোট গ্রামখানির ভিতর দিয়া অন্য দিকে গিয়াছে। এই চৌরাস্তাটার পাশে একটা প্রকাণ্ড মজা দীঘি। স্থানটা জনশূন্য, এখানে আশেপাশে কোন বসতি নাই। খানিকটা গিয়া তবে গ্রাম পাওয়া যায়। চৌরাস্তার মোড় হইতে প্রায় সিকি মাইল দূরে। চৌরাস্তার ধারে একটা বট গাছের ছায়ায় অনেকগুলি পথিক এবং মালবাহী গাড়ি বিশ্রাম করিতেছিল। পান্নুও তাহার দলবল লইয়া সেইখানে বিশ্রামের জন্য বসিয়া গেল। জায়গাটা বড় মনে ধরিল। রাজিয়া বলিল—দাঁড়াও না, দেখি পরখ করে।

রাজিয়ার বহুৎ বুদ্ধি। মাথা তাহার ভারি সাফ। বৈকালে পান্নু দেখিল, রাজিয়া সেই গাছতলাতেই ব্যবসা ফাঁদিয়া ফেলিয়াছে। রান্নার জন্য যে উনানটা পান্নু পাতিয়াছিল, সেইটাকেই আকারে বেশ খানিকটা বড় করিয়া লইয়া তাহাতে কাদা লেপিয়া বেগুনী ফুলুরি তৈয়ারী করিয়া ফেলিল। বাঁধা দোকান, পাতা সংসার তুলিয়া লইয়া আসিয়াছে। সবই ছিল তাহাদের সঙ্গে—বেগুন, কুমড়া, তেল, বেসম, লঙ্কা, নুন, পেঁয়াজ, এমন কি হিং পর্যন্ত। সব চেয়ে বাহাদুরি রাজুর এই যে, কিসের মধ্যে কি ছিল সে যেন তাহার মুখস্থ;—একটুখানি খুঁজিয়াই হিংয়ের পুরিয়াটা বাহির করিয়া ফেলিল। কয়েক ঝাঁক বেগুনী কড়া হইতে নামাইতেই দোকান

তাহার জমিয়া উঠিল। সন্ধ্যার দিকে আরও অনেক গাড়ি আসিয়া জমিয়াছিল—তাহারা সব রাজিয়ার দোকান ঘিরিয়া বসিল। সন্ধ্যা নাগাদ টাকা চারেকের বেগুনী ফুলুরি বেচিয়া সেদিনের মত দোকান সামলাইয়া রাজিয়া বলিল—হাঁ, এইখানেই দোকান কর। পরখের ফল ভাল।

পরের দিন রাজিয়াই গ্রামের ভিতর গিয়া একখানা ঘর ভাড়া করিল—সংসার পাতিল। অপরাহ্ণে আবার সাজসরঞ্জাম লইয়া গাছতলায় গিয়া বসিল। সেদিনও সে চার টাকার উপর বেগুনী ফুলুরি বেচিয়া বাড়ি ফিরিল। পরদিন সকাল হইতে বর্ধিষ্ণু গ্রামখানায় গিয়া লছমীর দুধ বেচিয়া আসিল। দুধের নিত্য যোগান দিবার ঘর পর্যন্ত ঠিক করিয়া আসিল। সে-ই খোঁজ করিল, ওই মজা দীঘিটার মালিক কে? এবং পানুকে সে-ই সঙ্গে লইয়া মালিকের কাছে গিয়া দীঘিটার পাড়ে কয়েক বিঘা জায়গা বন্দোবস্ত করিয়া লইল। মালিক এখানকার বড়বাবুরা। মস্ত ধনী। রাজিয়া খোদ বাবুর সঙ্গেই দরদস্তর ঠিক করিল।

তাহার পরদিন হইতে লছমী, মংলী, নূতন বাচ্চাটা মজা দীঘির ঘাস খাইয়া ফিরিত, রাজিয়া গাছতলায় দোকান করিত, পানু মাটি কোপাইয়া কাদা করিয়া ঘর তুলিত। প্রথমে একখানি ছোট ঘর। তারপর বারান্দা। তারপর আবার ঘর। সেই ছোট ঘরখানি হইতে আজ তাহার টিনে-ছাওয়া মাটির কোঠা হইল। ক্রমে গোটা দীঘিটাই সে কিনিল। মজা দীঘি ভাঙিয়া পাঁচ বিঘা উৎকৃষ্ট ধানের জমি হইল, দীঘিটার এক পাড়ে তরকারি বাগান, অন্য তিনটা পাড়ে ফলের বাগান গড়িয়া উঠিল। এমনি সময় আবার পানু ঠকিল। চাৎকার করিয়া সে আকাশ ফাটাইয়া দিয়াছিল সেদিন। হঠাৎ রাজিয়া পলাইয়া গেল। সব হল রাজিয়ার পরামর্শে, অথচ রাজিয়া পলাইল!

তাহাকে ভুলাইয়া, ঘর-দোর সাজাইয়া দিয়া রাজিয়া ভাগিল।

ঘর হইবার পর দোকান পাতিয়াই রাজিয়া বলিল—বাকী জমিটা বেড়া দিয়ে সেখানকার মত তরকারির ক্ষেত কর।

পানু উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সে এই চায়। ভীমের মত শক্তিশালী দেহ তাহার, বসিয়া বসিয়া দোকান করিয়া ভাল থাকে না; সে বেড়া বাঁধিতে আরম্ভ করিল। রাজু অবসর সময়ে দড়ি যোগাইয়া দিল। পানু মাটি কোপাইতে আরম্ভ করিলে সে-ই বারণ করিল। বলিল—জল পড়ুক, তারপর দুখানা লাঙল ভাড়া করে চাষ দিয়ে নাও। তারপর আবার জল হলে তখন বরং কোপাবে।

সে-ই তাহাকে আবর্জনা পচাইয়া সার তৈয়ারী করিতে শিখাইল।

তীরের ক্ষেতে গাছ গজাইয়া উঠিবার পর একদিন সে-ই বলিল—এবারে বরং আর একটা বন্দোবস্ত করে নাও। এখানকার মাটি ভাল।

তারপর একদিন বলিল—গোটা পুকুরটাই বন্দোবস্ত করে নিতে হবে, বুঝলে? মজা পুকুরের তলাতে ধানের জমি হবে খুব ভাল।

একদিন বলিল—পুকুরের ভেতরে জমি, পাড়ের ওপর বাগান, আম-কাঁঠালের গাছ পুঁততে হবে। সে গল্প করিত—ক্ষেতের ধান আসিবে, তখন খামারের প্রয়োজন হইবে। বাড়ির সামনে পাকা সড়কের ওপাশে পতিত ডাঙাটার কতখানি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইবে। ওখানে হইবে খামার। আম-কাঁঠালের বাগানে ফল হইবে। পুকুরটার তলায় ঠিক মাঝখানে খানিকটা জল রাখিবে, ওখানে মাছ পাওয়া যাইবে।

রাজিয়া বলিল—পেটের বাছা, বাড়ির গাছা, পুকুরের মাছা—এই তো ভর্তি সংসার।

পানু মুগ্ধ হইয়া গেল। প্রচণ্ড বিক্রমে সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ আরম্ভ করিল। উদয়াস্ত পরিশ্রম। একটা মানুষ যে এত পরিশ্রম করিতে পারে, সে না দেখিলে বিশ্বাস হইবে না। রাজুরও মনে হইত, মানুষ নয়—একটা দৈত্য, পৃথিবীর বুকে কোদাল চালাইয়া চলিয়াছেই —চলিয়াছেই। কিন্তু রাজিয়ার কাছে সে প্রায় পোষমানা পাখীর মত হইয়া পড়িল। রাজিয়া যাহা বলিল, পানু তাহাই শুনিল। শুধু তো রাজিয়ার বুদ্ধিই ভাল নয়—রাজিয়া যে দেখিতেও ভারি 'খুবসুরত' হইয়া উঠিয়াছে। রুকণীর চেহারায় একটা নেশা ছিল, যশোদার চেহারায় নেশা ছিল না। যশোদা ছিল অদ্ভুত জোয়ানী, কিন্তু রাজিয়ার মধ্যে সে সবই আছে। রুকণীর চোখ দুইটা ছিল ছোট—চাহনি ছিল তীরের ফলার মত সরু ধারালো, দেহখানা ছিল ছিপছিপে। সে খিলখিল করিয়া হাসিত, চলিত যেন নাচিয়া নাচিয়া, দেখিয়া নেশা না ধরিয়া পারিত না। যশোদার দেহখানা ছিল ভরাট। যশোদা চলিতে তাহার সর্বাঙ্গ যেন দোল খাইত। রাজিয়ার চোখ দুইটা বড়, তাহার চাহনি যেন আয়নার মত; সূর্যের ছটা পড়িলে আয়না যেমন ঝকঝক করিয়া উঠে, পানুর চোখ রাজিয়ার বড় বড় চোখ দুইটার উপর পড়িলে সে চোখও তেমনি ঝকঝক করিয়া উঠিত। রাজিয়ার দেহ ভরিয়া উঠিয়াছে যশোদার মতই, কিন্তু রাজিয়া অনেক —অনেক সুন্দর। সে যখন চলে, তখন তাহার সর্বাঙ্গ দোল খায়। সে খিলখিল করিয়া হাসে না, মুখ টিপিয়া হাসে; সে কণ্ঠস্বর দিয়া ডাকে না, ইসারায় ডাকে। রাজিয়াকে বুঝিতে পারে না। বুঝিতে গেলে প্রাণ তাহার হাঁপাইয়া উঠে। কিন্তু বুঝিবার চেষ্টা না করিয়াও থাকা যায় না। রাজিয়া যেন রহস্য, সে বোধ হয় শয়তানী। রাজিয়া যে শয়তানী—সে তথ্যটা হঠাৎ সে অস্বীকার করিয়া ফেলিল।

মজিয়া-যাওয়া পুকুরটার পাড়ে তখন কলা-বাগান জমিয়া উঠিয়াছে। রাজিয়ারই নির্দেশমত পুকুরটার গর্তের চারিদিকে ধানের জমি করিয়া মাঝখানে ছোট একটা পুকুর কাটা হইয়াছিল। সেই পচা মাটি পাড়ের উপর ফেলিয়া তাহাতে কলাগাছ লাগাইয়াছিল পানু। প্রত্যেক কলা-ঝাড়ের মধ্যে লাগাইয়াছিল এক-একটি ফলের গাছ। তিন-চার বৎসরে কলাগাছের গোড়া পচিয়া আসিলে কলাগাছ তুলিয়া দিবে—চারাগাছগুলি শিশুবৃক্ষে পরিণত হইবে। পানু কলা-গাছের গোড়ায় ওই গাছের পরিচর্যা করিতেছিল। রাজিয়া ঘাটে বাসন মাজিতেছিল। পানুর অস্তিত্ব রাজিয়া বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ পানু রাজিয়ার উচ্চকণ্ঠের খিলখিল হাসিতে চমকিয়া উঠিল। তাহার কর্মরত হাত আপনি স্তব্ধ হইয়া গেল। ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিয়া উঠে। কিন্তু কি মনে হইল, চীৎকার না করিয়া কলাগাছের পাতার আড়াল রাখিয়া নীরবে সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দেখিল।

রাগে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

ভাদু বাউড়িনীর সঙ্গে রাজু কথা বলিয়া এমন হাসি হাসিতেছে! ভাদু বাউড়িনী এ গ্রামের প্রসিদ্ধ দূতী। মেয়েটার পেশা বহুবিচিত্র। তরুণীদের কাছে দৌত্য লইয়া আসে। ছাগল পোষে, ছাগল বিক্রী করে; গরু আছে, দুধ বিক্রী করে, বাছুর বিক্রী করে; হাঁস আছে, ডিম বিক্রী করে। হাট হইতে তরি-তরকারি কিনিয়া গ্রামের মধ্যে বিক্রী করিয়া বেড়ায়। সেই ভাদুর সঙ্গে রাজিয়ার এমন সখিত্ব! এমন হাসি!

ভাদু তাহার হাতে কি যেন দিতেছিল। কি? একটা একটা করিয়া দিতেছে যেন।

পয়সা, টাকা?

পানু আর আত্মগোপন করিতে পারিল না। সে চীৎকার দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ভাদু সভয়ে চীৎকার করিয়া ছুটিল। হুঁচোট খাইয়া পড়িয়া গেল, আবার উঠিল—আবার

ছুটিল—ও মা গো—! ও গো—মা—গো !—সে যেন আর্তনাদ, আতঙ্কিত আর্তনাদ !

রাজু বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। হাতে পয়সা লইয়া সে দাঁড়াইয়াই রহিল। পানু আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল—হারামজাদী !

হাত হইতে পয়সাগুলি কাড়িয়া লইয়া পানু বলিল—কিসের পয়সা ? তুম—তুম—

পানু প্রশ্ন করিল—ভাদুর দৌত্য স্বীকার করিয়া দেহবিক্রয়ের মূল্য লইতে এতদিনে আরম্ভ করিয়াছিস ?—হাতখানা ঘুরাইয়া পাক দিয়া বলিল—বল, হারামজাদী বল।

রাজিয়া এতক্ষণে বলিল—ছাড়। হাত ভেঙে যাবে।

—যাক।

—নিজের হাত পুড়িয়ে ভাত রাঁধতে হবে।

—আগে বল। কতদিন এ বজ্জাতি আরম্ভ করেছিস ! দেহ বেচে—

বাধা দিয়া রাজিয়া বলিল—মরণ আমার ! তুমি ভাত দেবে বলে যখন আমাকে ঘরে নিয়েছিলে, তখন আমার মরণ দশা। তাও তুমি মালাচন্দন করেছিলে, তবে এসেছিলাম তোমার ঘরে। এখন—। রাজু হাসিল, হাসিয়া বলিল—আজ আমার এই এমন রূপ—আজ কি এই সাড়ে সাত আনা পয়সা আমার দাম ? ছি ! ছাড়। না হয় মেরেই ফেল আমাকে।

—তবে পয়সা কিসের ? ভাদু তোকে পয়সা কেন দেয়, কিসের দেয় ?

—আমি বাবুদের গাঁয়ে যাই দুধ বেচতে তাই পয়সা দিয়ে গেল কটা জিনিস আনতে।

—না। মিছে কথা।

রাজিয়া তাহার মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

পানু বলিল—বল।

রাজিয়া তবু কোন উত্তর দিল না।

এইবার পানু তাহার চুলের মুঠি ধরিল। রাজু বলিল—কি বলব ? বললাম তো ?

—মিছে কথা !

—তবে কি বলব বল ? তুমি যা বলছ তাই বললেও মারবে। আমি যা বলছি তাও বিশ্বাস করবে না আর সেই জন্যে মারবে। তা হলে তুমি মার। কিন্তু বাড়ির ভেতরে চল। সেখানে যেমন খুশি যন্ত্রণা দিয়ো। বাইরে দশের সামনে নয়।

—তাই আয়। হিড়হিড় করিয়া পানু তাহাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, রাজিয়া মিথ্যা বলিতেছে। নিষ্ঠুর পানু কঠিন আক্রোশে জেদে একটা সাঁড়াশী দিয়া রাজিয়ার দেহের মাংস ধরিয়া পাক দিয়া যন্ত্রণা দিল। কিন্তু অদ্ভুত রাজিয়া চীৎকার করিল না, চোখ দিয়া অনর্গল ধারে জল গড়াইল, আর সে ডবডবে চোখ দুইটা মেলিয়া নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজিয়া শয়তানী তখন পানুর সংসার হইতে চুরি সুরু করিয়াছে। চুরির সঞ্চয় হইতে সে করে সুদে কারবার। ভাদুর মারফত টাকা ধার দেয়। ভাদু সুদ আদায় করিয়া আনিয়া দেয়। পয়সাটা সুদের পয়সা। রাজিয়া শয়তানী।

শয়তানী রাজিয়া।

কিছুদিন পর রাজিয়া একদিন তাহাকে বলিল—একটা কাজ কর তুমি।

—কি ?

—আর একটা বিয়ে কর।

—বিয়ে ? পানু আশ্চর্য হইয়া গেল।

—হ্যাঁ। একা আমি আর পারছি না।

পানু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজিয়া তাহাকে হিসাব দিল—একা কি আমি অত কাজ পারি ? সকাল থেকে ঘরের কাজ, তারপর দুধ যোগান দিতে যেতে হয় শহরে, তারপর রান্নাবান্না ভিয়েন দোকান লছমী-মংলীর সেবা, তোমার সেবা।

রাজিয়া সে একটা ফিরিস্তি দিয়া গেল। বড় কাজ হইতে একেবারে তুচ্ছ খুঁটিনাটির কাজ পর্যন্ত।

পানুর অবশ্য নূতন বিবাহে আপত্তি নাই ; কিন্তু ভয় করে সে রাজিয়াকে যশোর মত সে যদি পালায় ? সে বলিল—একটা ঝি রাখ।

—উঁহু। ঝিয়ে তোমার দুধ দিতে গেলে চুরি করবে।

—হুঁ।

—তারপর ভিয়েন রান্নাবান্না তোমার ঝিয়ে করবে নাকি ?

পানু তবু বলিল—না না। দুধ দিতে আমি যাব।

রাজিয়া তবু মানিল না, পরদিন একটা মেয়েকে আনিয়া দেখাইল। বেশ ডাগর মেয়ে। সদ্য যুবতী। বলিল—শুধু কাজকর্মই নয় গো, এত সব ঘরদোর জমি-জেরাত করলে, ছেলে না হলে ভোগ করবে কে ? আমার তো হল না। হবেও না।

এবার পানুর নেশা ধরিল। মেয়েটার যৌবনের নেশা—সন্তানের নেশা। বলিল—তব ঠিক হ্যায়।

দিন কয়েকের মধ্যেই রাজিয়া উদ্যোগ আয়োজন করিয়া পানুর মালা-চন্দনের ব্যবস্থা করিল। পানু রাজিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া গেল। তাহার বার বার মনে পড়িল—সে যেদিন রাজিয়াকে লইয়া আসে সেদিন যশোদা পলাইয়া গিয়াছিল। আর রাজিয়া নিজে তাহার আবার বিবাহ দিল। সে বার বার রাজিয়াকে বলিল—ও তোর সেবা করবে।

রাজিয়া হাসিল। যত্ন করিয়া বিছানা করিয়া দুইজনকে শুইতে দিল। কিন্তু পরদিন পানু সকালে উঠিয়া দেখিল—রাজিয়া নাই।

সে একেবারে পাগল হইয়া গেল। রাজিয়া পলাইয়াছে ওই নূতন বউটার ভাইয়ের সঙ্গে। নূতন বউটার ভাই যাত্রার দলে নাচ-গানের মাস্টার। লোকটা চমৎকার বাঁশীও বাজায়। ওই গানেই সে রাজিয়ার চোখে রঙ ধরাইয়াছিল। লোকটার সংসারে আছে অন্ধ বাপ, আর এই বোনটি। বাল্যকালে বোনটার একবার বিবাহ হইয়াছিল, বিধবা হইয়া সে বাপ-ভাইয়ের পোষ্য হইয়াই ছিল। রাজিয়ার সঙ্গে বউটার ভাইয়ের প্রীতি গাঢ় হইয়া উঠিলে সে রাজিয়াকে বিবাহের প্রস্তাব জানায়। রাজিয়া বলিয়াছিল—তুমি একবার বিকেলে আমাদের ওদিকে যেয়ো।

সে তাহাকে ভীষণমূর্তি পানুকে দেখাইয়াছিল। পরদিন বলিয়াছিল—দেখছ তো ? তোমাকেও মেরে ফেলবে, আমাকেও মেরে ফেলবে। ফাঁসিকে ও ভয় করে না।

লোকটি তখন দেশত্যাগের প্রস্তাব জানাইয়া ছিল।

রাজিয়া দুই দিন ভাবিয়াছিল—যেতে পারি। তোমার বুনের সঙ্গে যদি ওর পত্র (চলিত বৈষ্ণব প্রথায় হয় বিবাহ) করে দাও। ও আমাকে অসময়ে খেতে দিয়েছে, বাঁচিয়েছে। আমাকে ভালও বাসে। ওর ঘর ভেঙে দিয়ে আমি যেতে পারব না।

যাত্রার দলের ড্যান্সিং মাস্টারের কোন আপত্তি হয় নাই। বোনটার একটা গতিরও প্রয়োজন ছিল। সে নরুনের বদলে পানুর নাক লইয়া ভাগিল। রাজিয়া রাত্রে তাহারই সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় রাজিয়া পানুর একটা সূচ পর্যন্ত লইয়া যায় নাই। নিজের চুরি করা সঞ্চয় যেগুলি ছিল, সেইগুলিই লইয়া গিয়াছে। নিয়মিত সে চুরি করিত, এমন কৌশলে চুরি যে সে ধরিবার শক্তি পানুর ছিল না।

পানু খোঁজ করিয়া সব জানিয়া সমস্ত দিনটা নিষ্ঠুর নির্যাতনে নির্যাতিত করিল নূতন বউ-টাকে। বউটাই সব সংবাদ দিল। বলিল—রাজু বাঁশী শুনিবার জন্য তাহাদের বাড়ির পাশে পাশে ঘুরিত। তারপর আসিল ঘরে, আলাপ করিল। বাঁশী শুনিয়া রাজু কাঁদিত। সেই সুযোগে নতুন বউটার ভাই রাজুকে বশ করিয়াছে। আরও বলিল—রাজুর অনেক টাকা আছে। অনেক টাকা। বউ বলিয়া কহিয়া অনুনয় করিয়া কাঁদিল। কিন্তু পানুর তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। শ্বশুরের বাড়ি গিয়া অন্ধ বৃদ্ধকেও ঘাকতক দিয়া আসিল। অবশেষে রাত্রে নূতন বউটাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া ঘরে খিল দিল। ঘরে খিল দিয়া সে চীৎকার করিল, যে চীৎকার শুনিয়া রুকণী বুধন পর্যন্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিত—এ কি? কি চায় পানু?

সকালে উঠিয়া দেখিল, বউটা দুয়ারের গোড়ায় পড়িয়া আছে পোষা কুকুরের মত। পানু দরজা খুলিতেই সে ঘরে ঢুকিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। পানু বাধা দিল না। থাক, কাজকর্ম করুক। তা ছাড়া প্রহার করিতেও তো একটা লোক চাই।

বউটা আজও আছে। বয়স হইয়াছে প্রায় ত্রিশ। গোটাকয়েক ছেলেমেয়েও হইয়াছে। কাজকর্ম করে, মার খায়। পানু আরও একটা বিবাহ করিয়াছিল, সেই বিবাহের পর বাপের বাড়ি গিয়া আর আসে নাই। রাজিয়াই বরং আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

দীর্ঘ দুই বৎসর পর আবার রাজিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে নিজে অবশ্য ফেরে নাই—পানু গিয়াছিল সদরে একটা ডাকাতির মকদ্দমার সাক্ষী দিতে। ডাকাতির চেষ্টা হইয়াছিল তাহারই ঘরে। সাক্ষী দিতে গিয়া হঠাৎ শহরের পথে রাজিয়ার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। একটা বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাজিয়া পথের উপর ছাই ফেলিতেছিল। পানু থমকিয়া দাঁড়াইল। রাজিয়া ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্তে সে ছুটিয়া বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। পানু কিন্তু পানু—সেও ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। লাফ দিয়া পিছন হইতে রাজিয়ার চুলের মুঠি ধরিয়া মাটিতে পাড়িয়া ফেলিল। রাজিয়া চীৎকার করিল না, শুধু সভয়ে তাহার ডবডবে চোখের সেই দৃষ্টি মেলিয়া পানুর দিকে চাহিয়া রহিল।

পানু হিংস্র গর্জন করিয়া যে প্রশ্ন রাজিয়াকে করিল, তাহাতে রাজিয়া অবাক হইয়া গেল। পানু প্রশ্ন করিল—এ কি? সাদা থানকাপড় কেনে তোর? হাত শুধু কেনে? সিঁথের সিঁদুর কই?

রাজিয়া চুপ করিয়া রহিল।

—সে হারামজাদা মর গেয়া?

রাজিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ।

—সে মরেছে মরেছে, সে তোকে বিয়ে করে নাই। বিধবা সেজেছিস কেনে তুই? আমি বেঁচে রয়েছি—কেন বিধবা সেজেছিস তুই?

বলিয়াই সে তাহাকে দুর্দান্ত প্রহার আরম্ভ করিল। রাজিয়া চীৎকার করে নাই, কিন্তু পানুর

কিল-চড়ের শব্দেই বাড়ির লোক জমিয়া গেল। সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া পান্নুকে ধরিয়া ফেলিল। পান্নু গর্জন করিতেছিল—আমার পরিবার। পালিয়ে এসেছে। হারামজাদী আবার বিধবা সেজেছে! খুন করে ফেলব হারামজাদীকে।

রাজিয়া হাঁপাইতেছে।

বাড়ির লোকেরা বলিল—পুলিসে দাও হারামজাদাকে।

রাজিয়া এবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল।—না। লোকে সবিস্ময়ে বলিল—না?

রাজিয়া বলিল—না, ওই আমার সোয়ামী। ও যা বলছে—সব সত্যি। ছেড়ে দেন আপনারা। চলে যান আপনারা।

পান্নুকে তাহারা ছাড়িয়া দিল। পান্নু কিন্তু রাজিয়াকে ছাড়িল না। বলিল—চল, ঘর চল।

রাজিয়া প্রশ্ন করিল—ঘর? ঘর নিয়ে যাবে আমাকে?

—হাঁ, হাঁ। ঘর চল? আগাড়ি চল বাজারমে।

বাজারে কাপড়ের দোকানে আসিয়া উঠিল। লালপেড়ে শাড়ি এক জোড়া—শহরেই বাহারে লালপাড় শাড়ি কিনিয়া, চুড়ি কিনিয়া, সিঁদুর কিনিয়া রাজিয়াকে বউ সাজাইয়া বাড়ি ফিরাইয়া আনিল। বাড়ি আসিয়া আবার একদফা দিল দুর্দান্ত প্রহার। রাজিয়া এবারও কাঁদিল না, অত্যন্ত কষ্টের মধ্যেও হাসিয়া বলিল—এইবার ছাড়। আর মারলে মরে যাব।

পান্নু ছাড়িয়া দিয়াও মধ্যে মধ্যে প্রহারোদ্যত হইতেছিল। রাজিয়া বলিল—আবার দুদিন পরে মেরো। গায়ের বেদনাটা মরুক।

পরদিন সকাল হইতে পান্নুর ঘরে রাজিয়াই আবার গৃহিণী হইয়া বসিয়াছে। পান্নু কিন্তু তাহাকে রোজ প্রহার দিতে ভুলে না।

পান্নু জীবনে কাহাকেও আর বিশ্বাস করে না। কাহারও এতটুকু ঔদ্ধত্য সহ্য করে না। মায়া নাই, দয়া নাই। মানুষ তাহাকে ঠকাইয়াছে—সে সুযোগ পাইলেই মানুষের উপর অত্যাচার করিয়া শোধ লয়। তাহার বুদ্ধি মোটা—সে লোককে ঠকাইতে পারে না, সে লোককে গায়ের জোরে ঠেকাইয়া রাখে, ঠেঙায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর তাহার প্রচণ্ড রাগ।

সেই তাহার হঠাৎ আজ এ কি হইল? অনেক জীব তো সে হত্যা করিয়াছে। হেঁসোর আঘাতে কুকুরের পা কাটিয়া দিয়াছে, গুলতিতে করিয়া কাক মারিয়াছে অসংখ্য। সেবার তাহার বাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছিল। পান্নু তাহার লম্বা হেঁসোখানা হাতে করিয়া বাহির হইয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া একটা লোককে ঘায়েল করিয়াছিল। ডাকাতেরা সঙ্গীকে ফেলিয়াই পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। পান্নু তখন আহত লোকটার বুকের উপর বসিয়া একটা হাতের আঙুল ওই হেঁসো দিয়া কাটিয়াছিল। কাটিয়াছিল আর হাসিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার এ কি হইল? একটা অস্থিচর্মসার রোঁয়া-ওঠা কদর্য চেহারার বাছুরকে লাঠি মারিয়া তাহার কি হইল?

অস্থিচর্মসার গো-শাবক। বড় লালসাতেই সে পান্নুর গাছটির দিকে মুখ বাড়াইয়াছিল। আঃ, মায়ের দুধ পেট পুরিয়া খাইতে পায় না, হতভাগ্যের হাড়-পাঁজরাগুলি সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে! গায়ের রোঁয়াগুলি পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। ওই বিরল রোমগুলির উপরেই অসহায় মায়ের সস্নেহ লেহন-চিহ্ন চিকন হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। বেচারার মায়ের দুধের শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত গৃহস্থে টানিয়া বাহির করিয়া লয়। ক্ষুধার জ্বালায় বড় লালসায় সে গাছটায় মুখ দিয়াছিল। মুখের পাশ বাহিয়া সবুজ রস-মিশ্রিত লাল গড়াইয়া পড়িতেছে।

সামান্য স্নেহে পান্নু তাহার গায়ে হাত বুলাইয়াছিল। তাহাতেই সে কৃতজ্ঞতাভরে পান্নুর

হাত চাটিতেছে।

পান্থর চোখে বার বার জল আসিতেছে।

বাছুরটাকে যে বঞ্চনা মানুষ করিতেছে তাহাতে সে হয়তো বাঁচিবেই না। সে-ই হয়তো শেষ আঘাত দিল। পান্থ এতকাল ধরিয়া যে বঞ্চনা পাইয়াছে, ওই বাছুরটার বঞ্চনার তুলনায় সব যেন তুচ্ছ হইয়া যাইতেছে।

আঠারো

মনের মধ্যে প্রায় সমস্ত জীবনের স্মৃতির ছবিই অত্যন্ত দ্রুতবেগে ভাসিয়া গেল। সে-সবের সঙ্গে এই বাছুরটাকে মারার সম্বন্ধ বিশেষ নাই। তাহারই হাতে লাঠির ঘা খাইয়াও বাছুরটা যখন তাহারই সামান্য আদরে, ঈষৎ স্নেহের স্পর্শে পরম আনুগত্য প্রকাশ করিয়া পান্থ যে হাতে মারিয়াছিল সেই হাতই চাটিয়াছিল, তখনই মনে পড়িয়াছিল তাহার বাপের কথা। নিষ্ঠুর প্রহার করিয়া জমাদার যখন দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়াছিল তখন তাহার বাপ জমাদারের পা দুইটা চাপিয়া ধরিয়াছিল। রসিকতায় হাসিয়াছিল। জমাদারের এবং বাপের কথা হইতে মনে পড়িয়া গিয়াছিল তাহার নিজের পিঠের দাগের কথা। পিঠে হাত দিয়াই নিজের জীবনের কথা মনে পড়িয়াছিল। হয়তো আগাগোড়া স্মরণ করিয়া দুনিয়ার 'ভেল্কির কথা' সম্বন্ধে তাহার ধারণাটাকেই শক্ত এবং বড় করিয়া দেখিতে চাহিতেছিল। স্বার্থপর দুনিয়ায় সকলেই ব্যস্ত আপন স্বার্থ লইয়া। জোর-জবরদস্তি—চোখের জল—মিষ্ট কথা—হাসি—সেবা—যত্ন—সব ভেল্কি, সব ভেল্কি। জমাদার, দারোগা, রুকণী, চারুদিদি, গুরুঠাকুর, জমিদারের গোমস্তা, চাপরাসী, ঘোষবাবা, জমি-বিক্রেতা চাষী, মহাজন, যশোদিয়া, রাজিয়া, নতুন বউটা—সব ভেল্কিদার-ভেল্কিদারনীর দল। সে নিজেও ভেল্কিদার। তাহার ভেল্কি, গায়ের জোর—লাঠি। ওই ভেল্কির জোরে সে দুনিয়ার ভেল্কি ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। বাছুরটাও আসিয়াছিল আপনার পেট ভরাইতে—চুপি চুপি। সে তাহাকে ঠ্যাঙাইয়াছে—একখানা পা ভাঙিয়া দিয়াছে। বেশ করিয়াছে। এখন বাছুরটার ড্যাবাড্যাবা চোখে জল টলমল করিতেছে—এও ভেল্কি। হাত চাটিতেছে—এও ভেল্কি। হয়তো তার মনের মধ্যে আপন হইতে সমস্ত স্মৃতিটা ভাসিয়া ওঠার মূল কারণ তাহাই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তবুও সে সান্ত্বনা পাইতেছে না। চোখের ভিতর জ্বালা করিতেছে। একটা উত্তপ্ত দাহে যেন ভরিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ মনে হইল, চোখের কোণ দুইটা হইতে দুইটা পোকা নামিয়া আসিতেছে এবং পোকা দুইটার সর্বাঙ্গে চোখের উত্তপ্ত দাহ। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছে। পান্থ চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। কিন্তু আবার জল আসিতেছে।

মনে হইল, এই বাছুরটার জীবনের সঙ্গে তাহার জীবনের মিল আছে। না, বাছুরটা তাহার চেয়েও হতভাগ্য। সে তো তাহার গায়ের জোরে অনেক বঞ্চনা ঠেকাইয়াছে। বাছুরটার গায়ের জোরও নাই। প্রথম যখন সে পলাইয়া গিয়াছিল, তখনও তাহার ভাগ্যগুণে বুধন এবং বুধনের স্ত্রীকে সে পাইয়াছিল। বাছুরটা তাও পায় নাই। সে তো জানে, তাহার নিজের ঘরেই গরু-মহিষ আছে। লছমী-মংলী, তাহাদের সন্তান-সন্ততি আছে; কেমন করিয়া জবরদস্তি ভেল্কিতে মানুষ গরু-মহিষ দোহন করিয়া লয়—সে তো পান্থ জানে। সে চীৎকার করিয়া উঠিল সেই বিচিত্র চীৎকার। যে চীৎকারের অর্থ সে জানে না, চীৎকার আপনি বাহির হয়। ওঃ—ওঃ—ওঃ!

সন্ধ্যা হইতে বাছুরটাকে বাঁধিয়া রাখে, দূরে বাঁধা থাকে তাহার মা। সমস্ত রাত্রি চলিয়া যায়—তৃষ্ণায় বাছুরটার বুক শুকাইয়া যায়, ক্ষুধায় পাকস্থলী মোচড়াইয়া ওঠে, সে চীৎকার করে —হাম্বা-হাম্বা। মা—মা বলিয়া ডাকে। দূরে আবদ্ধ মা প্রাণপণ শক্তিতে টানিয়া ছিঁড়িতে চায় গলার দড়ি; কিন্তু মানুষের ভেল্কির পাক লাগানো দড়ি ছেঁড়ে না—নিরুপায় হতাশায় মা-ও চীৎকার করে। আশ্চর্যের কথা, পানু পূর্ব হইতে জানে যে, যে-বাছুরটা ডাকে ঠিক তাহারই মা উত্তরে সাড়া দেয়। যে মা ডাকে ঠিক তাহারই বাচ্চাটা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিষ্ঠুর ক্লান্তির মধ্যেও ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া জানায়। মায়ের স্তন-ক্ষীরভার স্তন-ভাণ্ডের কানায় কানায় ভরিয়া উঠে, স্নায়ু—শিরা—পেশী, এমন কি কোমল ত্বক পর্যন্ত অসহ্য বেদনায় টনটন করিয়া উঠে; প্রাণের ব্যাকুল অধীরতার সঙ্গে দৈহিক যন্ত্রণাও সমানে বাড়িয়া চলে—সে চীৎকার করে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া। চীৎকারও পানুর মনে পড়িল। সকালে পাত্র হাতে গৃহস্থ আসিয়া বাছুরটাকে ছাড়িয়া দেয়। বাছুরটা আকুল আগ্রহে ছুটিয়া যায়, অধীর আনন্দে তাহার ছোট্ট লেজখানি দোলায় সে, তাহার মা ফোঁস-ফোঁস শব্দ করিয়া তাহার দেহের আঘ্রাণ লয়, জিভ দিয়া সন্তানের অঙ্গ লেহন করে, ঈষৎ কুঁজা হইয়া সন্তানের মুখে তুলিয়া দেয় তাহার স্তনভাণ্ডের বৃন্তদেশ। পানু শুনিয়াছে, তখন মায়ের পাকস্থলীর মধ্যে একটা আলোড়নের শব্দ উঠিতে থাকে—মনে হয়, তাহার দেহের অভ্যন্তরে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হইয়াছে; দেহের রোমকূপে-কূপে শিহরণ জাগে—রোমগুলি খাড়া হইয়া উঠে, ত্বকখানি মাঝে মাঝে কাঁপে। ওদিকে বাছুরটার জিহ্বার স্পর্শে, আকর্ষণের ধারায় নামিয়া আসে দুধের উচ্ছ্বসিত ফেনায়িত ধারা। বাছুরটার মুখের চারিপাশে সমুদ্রের ফেনার মত ফেনা জমিয়া উঠে, বক্ষ বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে দুধ। অমনি গৃহস্থ টানিয়া লয় বাছুরটাকে। তারপর মায়ের স্নেহোচ্ছ্বসিত অবসন্ন মন এবং দেহের এই অবস্থার সুযোগ লইয়া নিঃশেষে দোহন করিয়া লয় হতভাগ্যের জীবনীসুধা।

ওই মায়ের স্তনবৃন্ত টানিলে যেমন ধারায় দুধ গড়াইয়া পড়ে, তেমনি ভাবেই পানুর চোখের জলের ধারাও অকস্মাৎ প্রবল হইয়া উঠিল। আবারও একবার চীৎকার করিয়া উঠিল সে। ঠিক এই মুহূর্তে বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল রাজিয়া। স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে দাঁড়াইয়া গেল।

পানু কাঁদিতেছে! সে কান্না চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাওয়া কান্না! আর তাহার সামনে পড়িয়া আছে একটা কঙ্কালসার বাছুর, মুখে খানিকটা সবুজ লালা, চোখের কোণে জল।

রাজু বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। পানু একবার মুখ তুলিয়া রাজুকে দেখিল, তারপর আবার বাছুরটার দিকে মুখ ফিরাইয়া তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল, চোখের জল মুছিবার চেষ্টা করিল না, কান্নার জন্য কোন লজ্জাও বোধ করিল না।

রাজুর আজ পানুকে দেখিয়া অত্যন্ত ভয় লাগিল। পানু যেমন রাজুকে বুঝিতে গিয়া হাঁপাইয়া উঠে, রাজুও আজ তেমনি হাঁপাইয়া উঠিল। পানুর এমন রূপ সে কখনও দেখে নাই। সভয়ে সসঙ্কোচে পানুর পাশে বসিয়া সে-মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—কি হল?

পানু কোন কথা বলিল না।

রাজু আবার বলিল—হাঁ গো?

পানু এবার রুদ্ধশ্বাস ব্যক্তির মত সমস্ত মুখটা মেলিয়া একটা নিশ্বাস লইল। কিছু একটা বলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কোন কথা বাহির হইল না। বাহির হইল—উচ্ছ্বাস-জড়িত এক টুকরা শব্দ!

রাজু সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে পানুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তবুও পানু কিছু বলিতে পারিল না—শুধু বার বার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না—না—না।

হয়তো এ 'না'-এর অর্থ—আমি বলিতে পারিতেছি না। আমায় জিজ্ঞাসা করিও না রাজু। অথবা—আমার আর কিছু বলিবার নাই; দুনিয়ায় আমার কথা ফুরাইয়া গিয়াছে। হয়তো বা—গোটা দুনিয়াটাই আমার কাছে 'না' হইয়া গিয়াছে। তাহার ভীষণ কঠিন মুখখানার পেশীগুলি আগের আক্ষেপে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

রাজু এবার বাছুরটার দিকে চাহিয়া দেখিল। বাছুরটা পড়িয়া আছে—পানুর হাত চাটিতেছে। মধ্যে মধ্যে ঘাড় তুলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। একটা ফোঁস করিয়া গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া আবার শুইয়া পড়িতেছে। রাজু বাছুরটাকে নাড়িয়া দেখিয়া শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—এঃ, পা-খানা একেবারে ভেঙে গিয়েছে!

পানু এবার বলিয়া উঠিল—আমি ওকে মেরে ফেললাম রে রাজি, আমি বাছুরটাকে মেরে ফেললাম।

পানুর নতুন বউটা ব্যাপারটা জানিত। সে কয়েক বারই ইহার মধ্যে উঁকি মারিয়া ব্যাপারটা দেখিয়া গিয়াছে, কিন্তু কিছু বলিতে ভরসা পায় নাই। সে রাজুবালার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাড়ির ভিতর হইতে আসিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। রাজুকে পানু কিছু বলিল না দেখিয়া সাহস পাইয়া সে এবার বাহির হইয়া আসিল, বলিল—মা গো! গো-হত্যে করলে তুমি!

রাজু আবার বার বার ঘাড় নাড়িল, যাহার অর্থ, না—না—না।

মেয়েটা বলিল—নাও, এখন গরুর দড়ি হাতে করে ব্যা-ব্যা করে দেশে দেশে ভিখ করে বেড়াও।

গো-বধের প্রায়শ্চিত্ত তাই-ই বটে। একটা নির্দিষ্ট কাল গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, মৌনী থাকিতে হয়, একমাত্র শব্দ—গরুর শব্দানুকরণ করিয়া 'ব্যা-ব্যা' বা 'হাম্বা' শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে পায় না। হাতে থাকে একগাছি গরুর দড়ি, সেই দড়ি দেখাইয়া এবং গরুর শব্দ করিয়া দেশে স্বীকার করিয়া ফিরিতে হয়—আমি মহাপাপ করিয়াছি, আমি গো-বধ করিয়াছি।

পানু তাহার কথা শুনিয়া ঘৃণায় ক্রোধে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

রাজু বলিল—তুই থাম বাপু। মরবে কেন? এক কড়া আগুন কর। সেঁক দিতে হবে। হাড়-জোড়ার পাতা নিয়ে আসছি আমি, বেটে গরম করে লাগিয়ে দি। মরবে কেনে?

পানু রাজুর হাত ধরিয়া ব্যগ্রতাভরে বলিল—বাঁচবে? রাজু, বাঁচবে?

রাজু হাসিতে গেল, কিন্তু হাসি আসিল না।

উনিশ

রাজিয়া শয়তানী, সে পানুকে ছাড়িয়া একবার পলাইয়া গিয়াছিল। এখনও এই পরিণত বয়সে সে সাজিয়া-গুজিয়া দুধ বেচিতে যায়, দেরি করিয়া ফেরে। পানু সব বুঝিতে পারে, মধ্যে মধ্যে নির্যাতনও করে; রাজিয়া সে নির্যাতন সহ্য করে। রাজিয়া চোর, চুরি করিয়া সঞ্চয় করে। কিন্তু রাজিয়া তবু অদ্ভুত! বড় ভাল। অনেক গুণ তাহার। বাহবা রাজি, বাহবা! পানুর

মুখে এতক্ষণে অল্প হাসি দেখা দিল।

হাড়-জোড়া গাছের পাতা আনিয়া মোলায়েম করিয়া রাজু পিষিয়া ফেলিল। তারপর গরম করিয়া ভাঙা জায়গায়টায় প্রলেপ দিয়া কাপড়ের ফালি দিয়া বাঁধিয়া দিল। তাহার উপর দুইটা শক্ত বাঁখারি পায়ের মাপ করিয়া কাটিয়া দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া পায়ের সঙ্গে বাঁধিবার উদ্যোগ করিল।

পানু প্রশ্ন করিল—ও কি হবে?

রাজু এতক্ষণে হাসিয়া বলিল—দেখ না।

পানু চটিয়া উঠিল, রাজুর চুলের মুঠা ধরিয়া টান দিয়া বলিল—না। লাগবে ওর। বাঁখারির চাপ পড়বে না?

পানু চুলের মুঠি ধরিয়া আছে, তবু রাজুর মুখে হাসি, বলিল—ছাড় ছাড়। বলছি।

—কি?

—হাত ভেঙে গেলে ডাক্তারখানায় ভাঙা হাতে কাঠের ফালি বেঁধে দেয় না? দেখ নি?

পানু এবার রাজুর চুলের মুঠা ছাড়িয়া দিল।

রাজু বলিল—কাঠ বেঁধে না দিলে ভাঙা হাড় কেবলই নড়বে যে, জোড় লাগবে কেন?

—ঠিক। পানু এবার স্বীকার করিয়া ঘাড় নাড়িল—ঠিক।

রাজু বলিল—আমি ঠিক শক্ত করে বাঁধতে পারছি না, তুমি বাঁধ দেখি।

পানু দড়ি হাতে লইয়া টান দিল—বাছুরটা সঙ্গে সঙ্গে কাতরাইয়া অন্য পা তিনখানা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। রাজু বলিল—হাঁ-হাঁ, এত জোরে নয়। করলে কি? ও কি তোমার রাজিয়া যে সাঁড়াশী দিয়ে চামড়া টানলেও সহ্য করবে? আস্তে আস্তে বাঁধ।

পানুর হাতের টানে ব্যাণ্ডেজের কাপড় কাটিয়া হাড়-জোড়ার রস বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পানু বোকার মতই রাজুর দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজু বলিল—আর একটু আস্তে।

পানু আবার দড়ি ধরিয়া টানিল; কিন্তু এবার দড়িতে আদৌ টান পড়িল না, দড়ির সঙ্গে পানুর হাত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

রাজু তাহার হাত হইতে দড়ি টানিয়া লইল; কিন্তু হাসিল না।

হাসিল অপর বউটা, বলিল—বুড়ো মিনসে!

রাজু তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—যা ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসতে হবে না। আগুনে কাঠ দিয়ে এসেছিস—আগুন হল কিনা দেখ।

—আনছি। আনছি। তোমার ডাক্তারী বিদ্যেটা দেখি।

পানু উঠিয়া দাঁড়াইল। বউটা ভয়ে এবার বিবর্ণ হইয়া গেল। এতক্ষণ ধরিয়া পানুর এই বিহ্বল ভাবটা দেখিয়া তাহার সাহস হইয়াছিল, তাই সে এমনভাবে রসিকতা করিয়া কথা বলিতে পারিয়াছিল। পানু যে এমন অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইবে, সে কল্পনা করিতে পারে নাই। সরিয়া যাইবারও পথ নাই—সামনে পানু, পিছনে দেওয়াল, পাশে বাছুরটা; অন্য পাশে একখানা তক্তাপোশ। সে আতঙ্কে দেওয়ালে লাগিয়া গিয়া সভয়ে দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পানু কিন্তু তাহাকে কিছু বলিল না, সে পাশ কাটাইয়া তক্তাপোশটার উপরে উঠিয়া সেটার উপর দিয়াই বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল।

নতুন বউটা অবাক হইয়া কিছুক্ষণ পানুর গমনপথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—দিদি, মিনসে এইবার মরবে।

রাজু চোখ তুলিয়া একবার তাহার দিকে চাহিল, তারপর বলিল—চুপ কর। ওই সব কি বলে ?

বউটা ফিসফিস করিয়া বলিল—কিন্তু কি হল বল দেখি ?

—মানুষটার মনে বড় লেগেছে রে !

—মনে লেগেছে ! মন !

সে আরও কিছু বলিত, কিন্তু ওদিকে সবল পদক্ষেপ-ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বউটা চুপ করিয়া রাজুর পাশে বসিয়া বাছুরের গায়ে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। একটা প্রকাণ্ড কড়াই পরিপূর্ণ করিয়া আগুন আনিয়া পানু নামাইয়া দিল।

নূতন বউটা এবারও আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল—ও মা গো ! এ যে ভিয়েনের কড়াই। ভিয়েনের কড়াই সত্যই বড় যত্নের জিনিস।

আগুনের আঁচে থাকিয়া পানু উত্তপ্ত হইয়াছিল—সে এবার বউটার ঘাড়ে ধরিয়া টানিয়া বলিল—আরে হারামজাদী ! তোর হাড় ভেঙে দোব আজ।

বাধা দিল রাজু।—ছাড়—ছাড়। একটার হাড় ভেঙেছে, সেইটার ব্যবস্থা আগে হোক। তারপর ওটার হবে। ও তো পালাচ্ছে না।

পানু বউটাকে ছাড়িয়া দিল।

রাজু বলিল—যা লো সেজ, ন্যাকড়া নিয়ে আয় দেখি। ছেঁড়া চট আছে ভিয়েনের, তাই নিয়ে আয় বরং।

পানু হাউ-মাউ করিয়া বলিল—তামাসা ! তামাসা ! সব তাতেই তামাসা !

রাজু কিছু বলিতে গেল ; কিন্তু পানুর মুখের দিকে চাহিয়া পারিল না। সে অবাক হইয়া গেল। পানুর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। হাউমাউ করিয়া বলা নয়—কান্নার আবেগে কথাগুলি এমন শুনাইতেছে। সে আর কিছু বলিল না, সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম সেঁক দিয়া বাছুরটাকে বেশ খানিকটা তাজা করিয়া তুলিল। তখন জানোয়ারটা বার বার উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিল। রাজু বলিল—বাঁধা পা-খানা এইভাবে আগে রেখে বসিয়ে দাও দেখি।

রাজিয়ার নির্দেশমত পানু বাছুরটাকে বসাইয়া দিল। বাছুরটা বেশ বসিল। পানু খুশি হইয়া বলিল—বাহবা রাজিয়া ! বলিয়া সে সস্নেহে বাছুরটার মুখে হাত বুলাইয়া দিল। বাছুরটা এবার ফোঁস করিয়া মাথা নাড়িয়া পানুর হাতে একটা ঢুঁ মারিল। পানু এবার হা-হা শব্দে হাসিয়া উঠিল। বাহবা রাজিয়া ! বাহবা রে !

* * * *

এদিকে পানু কিন্তু বাছুরটার পায়ে লাঠি মারিয়া বাঘকে খোঁচা মারিয়া বসিয়াছে, কারণ বাছুরটা বাঘের পোষা বাছুর। এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী জমিদারের সুরভিনন্দিনী। প্রথম দুই দিন বাছুরটার কোন খোঁজই হয় নাই। পাল হইতে ছটকাইয়া বাছুরটা অন্য একটা পালের সঙ্গে এদিকে আসিয়া পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পানুর লাঠির সীমানায় হাজির হইয়াছিল। সেদিন রাখালটা কোন কথা কাহাকেও বলে নাই। পরের দিন সকালে দুধ দুহিবার সময় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হাজির হইয়া দেখিল, একটা গাই কম দোহন করা হইতেছে। একেই দুগ্ধবতী গাভী এ বাড়িতে আসিলেই দুধ ক্রমশ কমাইতে সুরু করে ; তাহার উপর নিজেকে কিছু লইতে হয়, সেটা জল মিশাইয়া পূরণ করিয়া দেওয়া হয়। গাইগুলির দুধ কমিয়া যায় এবং দুধ জলো হয়—এজন্য মধ্যে মধ্যে তাহাকে প্রভুসকাশে তিরস্কৃত হইতে হয়। তাই একটা গাই কম দোহনের কারণ জানিয়া সে মূর্তিমান কর্তব্যপরায়ণের মত প্রভুর সকাশে উপস্থিত হইয়া

করজোড়ে সমস্ত নিবেদন করিল। প্রভু রাখালের জরিমানা করিলেন এবং কয়েকজন লোককে সন্ধানে পাঠাইতে আদেশ দিলেন। পাগড়ী বাঁধিয়া লোক বাহির হইয়া গেল, সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সন্ধান পাওয়া গেল না। তাহাদের তিনজনই অবশ্য গ্রামান্তরে গিয়াছিল। একজন গিয়াছিল দুই ক্রোশ দূরবর্তী এক গ্রামে প্রণয়িনীর বাড়ি। একজন গিয়াছিল বেহাই-বাড়ি, অপরজন গিয়াছিল—শুঁড়িকালয়। সংবাদ শুনিয়া জমিদার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন—বাছুরটি মরিয়াছে। গরুর জমা-খরচের খাতা আছে সেরেস্তায়, সেখানে খরচও লেখা হইল—লোকসান খাতে খরচ—হারাইয়া মরিয়া যায় বাছুর একটি। পুরোহিত বিধান দিলেন—অপঘাতে গোহত্যা হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। খরচ লাগিবে। ফর্দ অর্ধেক কাটিয়া মঞ্জুর হইল। পুরোহিত বলিলেন—কেশ মুণ্ডন করিতে হইবে। প্রভু একটু ভাবিয়া বলিলেন—অনন্ত ঠাকুরকে ডাক।

অনন্ত ঠাকুর প্রভুর গৃহবিগ্রহের পূজক এবং পাচক—যুগ্মহস্ত।

সে আসিতেই প্রভু বলিলেন—একটা বাছুর মরেছে। প্রায়শ্চিত্তির করতে হবে। তুমিই করবে।

—যে আজ্ঞে।

—পুরুত মশায় বলছেন, মাথা কামাতে হবে।

অনন্তের মাথায় খাসা টেরি, টিকিটি পর্যন্ত দেখা যায় না। সে মাথা চুলকাইয়া বলিল—আজ্ঞে, চুলের মূল্য ধরে দিলেই—

পুরোহিত বলিলেন—পাঁচ সিকে।

প্রভু বলিলেন—মাথা কামিয়ে ফেল! সঙ্গে সঙ্গে একটি চকিত বিচিত্র দৃষ্টি হানিয়া আপন কাজে মন দিলেন।

আর কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। অনন্ত, পুরোহিত দুজনেই চলিয়া আসিল। বাহিরে আসিয়া অনন্ত পুরোহিতের দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি হানিয়া বলিল—পাঁচ সিকে? নয়? পাঁচ পয়সায় হত না? পাঁচটা পয়সাও তো পেতে।

পুরোহিত বলিলেন—বাঁদরামি করিস নে—থাম।

—থামব? আর এটা বুঝি বাঁদরামি হল? তুমিও কিছু পাবে না, আমিও না, বেজা নাপিতও না। মাঝখান থেকে—। সে সস্নেহে আপনার চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া আক্ষেপ-ভরেই বলিল—বাবুর তো টাক, কামাতেও হত না। বললেই তো পারতে—মাথা তো আপনার মুড়নো হয়ে আছে।

তৃতীয় দিনের দিন।

পান্নু দোকান খুলিয়া বসিয়া ছিল। বেলা অপরাহ্ণের দিকে গড়াইয়া আসিতেছে। দাওয়ার উপর বাছুরটা তেমনিভাবে বসিয়া আছে। মুখের কাছে একটা মাটির পাত্রে দুধ, একটা পাত্রে মাড়, সামনে কতকগুলি কচি ঘাস। সেই দিন হইতে পান্নু দিনে ঘুম ছাড়িয়াছে। সে বসিয়া বসিয়া ভাবে। ভাবনার কথা অন্য কিছু নয়, ভাবে আপনার বিগত কাহিনী—আর ভাবে বাছুরটার কথা। বাছুরটার দিকে চাহিয়া দেখে, মধ্যে মধ্যে প্রকট পঞ্জরাস্থিগুলির উপর হাত বুলায়, আঘাত পাওয়া স্থানটির উপর হাত বুলায়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে চোখে জল আসে। মনে হয় কেমন করিয়া মানুষে তাহার মায়ের দুধ নিঃশেষে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া তাহার এই দশা করিয়াছে! অন্য সময়ে সে কাজকর্ম করে, সে সময় আশেপাশে থাকে রাজিয়া আর সেজবউটা। তাহাদের

কাছে পান্নুর এই ভাবটা গোপন নাই। মধ্যে মধ্যে অকারণে চীৎকার করিয়া উঠে। সেই বিচিত্র চীৎকার! আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার, পরের দিন হইতেই পান্নু দুধ খাওয়া ছাড়িয়াছে।

নতুন বউটাই সেদিন দুধ দিতে আসিয়াছিল।

পান্নু বলিয়াছিল—উঁহু! নিয়ে যা।

—অ্যাঁ? বউটি কথা বুঝিতে পারে নাই।

—নিয়ে যা।

—নিয়ে যাব?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। কতবার বলব?

—কেন? দুধ তো বেশ ঘন করে জ্বাল দিয়েছি!

পান্নু হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিয়াছিল। দুধের বাটিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে গিয়া কি ভাবিয়া ফেলে নাই, হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়া ওই বাছুরটার মুখের কাছেই ধরিয়া দিয়াছিল।

রাজু পিছনে পিছনে আসিয়া বাটিটা উঠাইয়া লইয়া বলিয়াছিল—জ্বাল দেওয়া দুধ ওকে দিতে হবে না, ও খাবেও না। ওকে কাঁচা দুধ দোব। এটা তুমি—

—না—না। রাজু! না। আমি আর দুধ খাব না। কখনও না। কখনও না।

তাহার সে দৃঢ় ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়া দেখিয়া রাজু আর কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া আসিতেছিল।

পান্নু আবার ডাকিয়া বলিয়াছিল—রাজিয়া!

রাজু দাঁড়াইতেই বলিয়াছিল—মরবার সময়ও আমার মুখে যেন দুধ দিবি না।

রাজু বিচিত্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

—আর শোন! কাল থেকে মুংলী-টুংলীকে আধা করে দুইবি। খবরদার! পুরা দুইবি না।

রাজু কোন কথা না বলিয়াই চলিয়া আসিয়াছিল। পরের দিন পান্নু ঠিক আসিয়া দুধ দুহিবার সময় হাজির হইয়াছিল। অর্ধেকের বেশী দুহিতে দেয় নাই। বলিয়া দিয়াছে—দুধের রোজ যাহারা লয়, তাহাদের কয়েকজনকে যেন জবাব দেওয়া হয়।

রাজু চুরি করিয়া দুধ খায়। দুধে জল মিশাইয়া দুধ বাড়াইয়া বিক্রয় করিয়া পয়সা করে। কিন্তু পান্নুর এ আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করে নাই।

পান্নুর মনের অবস্থার কথা তাহাদের কাছে গোপন নাই। কিন্তু তাহারাও মুখে কিছু বলিতে সাহস করিতেছে না। প্রথম প্রথম রাজিয়া সাহস করিয়াছিল; কিন্তু তাহারও সাহস ক্রমশ ফুরাইয়া যাইতেছে। পান্নুর ভিতর আর একজন নূতন কেহ উঁকি মারিতেছে। তাহার চেহারা কেমন এখনও তাহারা দেখিতে পায় নাই। তাই তাহাদের সাহসে কুলাইতেছে না। পান্নুরও যেন একটা উদ্বেগ অস্বস্তির সীমা নাই। মধ্যে মধ্যে অস্থির হইয়া উঠে। সব ছাড়িয়া দিয়া অন্ধকার রাত্রে পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে সেই বেদেদের মধ্যে। সব যেন বিষ মনে হইতেছে।

সেদিন পান্নু উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। তাহার ভিতরের নূতন জন অকপট ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিয়াছিল।

ঠিক এমনি সময়ে একটি অভিযানকারী দল—জমিদারের চার-পাঁচজন চাপরাসী সদর্পে আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের পুরোভাগে মুণ্ডিতমস্তক অনন্ত পূজক। তাহার আর

দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান নাই—হারামজাদা, শূয়ারকি বাচ্চা! আর তাহার হিন্দীতে কুলাইল না—মুণ্ডিত মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিল—পাষণ্ড, গো-হত্যাকারী! সে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

—গো-হত্যাকারী!

পানু চমকিয়া উঠিল। সে গো-হত্যাকারী শব্দটা তাহার কানে যেন বাজের মত ডাকিয়া উঠিল। সে প্রশ্ন করিতে গেল—বাছুরটা তোমার ঠাকুর? কিন্তু অনন্ত আবার চীৎকার করিয়া উঠিল।

কুড়ি

অনন্তের আস্ফালনটা মর্মান্তিক দুঃখ-সঞ্জাত। বেচারীর মাথায় একগুচ্ছ টিকি ব্যতীত অতি যত্নের কেশকলাপের সর্বচিহ্ন বিলুপ্তপ্রায়। আয়নায় মুখ দেখিয়া অনন্তের নিজেরই চোখ ফাটিয়া জল আসিয়াছিল। ঠাকুর-বাড়ির দুকড়ি নাম্নী যুবতী ঝি-টি যত রসিকা তত মুখরা,—ওস্তাদ কামারের হাতের পান দেওয়া ইস্পাতের অস্ত্রে গাছের কাণ্ড কাটিয়া যায় অথচ গাছ যেমন দাঁড়াইয়া থাকে তেমনিভাবে সে মানুষের মর্মচ্ছেদ করে, অথচ মানুষের বলিবার কথা থাকে না। দুকড়ি ঝি তাহাকে দশজনের সামনে যে অপ্রস্তুত করিয়াছে—সে কথা তাহার মনের মধ্যে অপারেশনের ক্ষতে টিঞ্চার আয়োডিনযুক্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইয়া কোন রকমে চাপা আছে। সে পানুকে পাইয়া দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্যের মত গালিগালাজ আরম্ভ করিল।

সঙ্গের চাপরাসীরা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহারা পানুকে জানে। তাহার দৈহিক শক্তি, চরিত্রের প্রচণ্ড রূঢ়তা এখানে কাহারও অজানা নয়। সে যদি হুঙ্কার ছাড়িয়া একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়ায়, তবে ভীষণ কাণ্ড হইয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য তাহারা সংখ্যায় অধিক, এক্ষেত্রে পানুর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু পানু মরিলেও ঘটোৎকচের মত মরিবে। একা মরিতে মরিতেও অন্তত দুইজনকে মারিয়া তবে সে মরিবে। সে দুইজন হইবার আশঙ্কা প্রত্যেকেরই আছে। তাহারা অনন্তকে ধমক দিয়া বলিল—এই ঠাকুর! এই!

অনন্ত বলিল—আমি মরব। ওরে ব্যাটারা, আমি মরব। বেটা গো-হত্যে করেছে, ব্রহ্ম-হত্যেও করুক। নে বেটা, আমাকেও খুন কর।

এতক্ষণে প্রশ্ন করিবার সময় ও সুযোগ পাইয়া পানু উঠিয়া ভাঙা গলায় সবিনয়ে বলিল—বাছুরটি তোমার ঠাকুর? সকলে আশ্চর্য লইয়া গেল।

রন্ধনকার্যে পারদর্শীরা রসায়ন-শাস্ত্র জানে না; কিন্তু একটা ভাত টিপিলেই হাঁড়ির খবরটা বুঝিতে পারে। চাপরাসীরা পানুর বিনয় দেখিয়া ঝট করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—চল।

পানুর হাতখানা শক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু শক্তিপ্রয়োগ সে করিল না। বলিল—কোথা?

—কাছারি। বাবুর তলব আছে।

—বাবুর তলব? কাহে? বাবুর কি ধার ধারি আমি? বাবুর নামে পানু জ্বলিয়া উঠিল। সবাই সংসারে ভেল্কিদার, কিন্তু জমিদার বড় ভারি ভেল্কিদার। উহারা সব মাছকেই মাগুর মাছ কোটার পদ্ধতিতে কাটে। উহারা ফলের শাঁস খায় না, নিঙড়াইয়া রস বাহির করিয়া খায়। পায়ে হাঁটে না, লোকের ঘাড়ে চাপিয়া পাল্কি করিয়া যায়। হাতে মারে না, ভাতে মারে। হাতে মারিলে নিজে মারে না, অপরকে দিয়া মারায়। মারিবার আগে বাঁধে। সে টানিয়া হাতটা ছাড়াইয়া লইল।

চাপরাসীটা বলিল—জবরদস্তি করলে ভাল হবে না।

পান্নু হুঙ্কার দিয়া উঠিল।—বাবুর কাছে যাব কেন ? কে ওই ঠাকুর ?

পান্নু ভাবিয়াছিল, ঠাকুর বাবুর দরবারে নালিশ করিয়াছে। কিন্তু চাপরাসী বলিল—তুমি বাবুর বাছুর মেরেছ কেন ?

পান্নু মুহূর্তে যেন নিবিয়া গেল। বলিল—বাবুর বাছুর ?

—হাঁ হাঁ। চলো চলো। পান্নুর নিবিয়া-যাওয়াটা আলো নিবিলে অন্ধকার হইয়া যাওয়ার মতই পরিস্ফুট ; সেই অন্ধকারের সুযোগে বৃক্ষ-আশ্রয়ী ভূতের মতই চাপরাসীর দল নাচিয়া গাছের তলায় পথিকের মত পান্নুকে ধরিয়া বলিল—চল।

পান্নু দ্বিরুক্তি করিল না। বলিল—চল।

অপরাধীর মত সে চাপরাসীদের সঙ্গে কাছারির দিকে অগ্রসর হইল। মাথা নীচু করিয়া চলিল, মুখে কোন কথা বলিল না। তাহার পাশে পাশেই অনন্ত চলিয়াছিল, সমানেই সে গালি-গালাজ করিতেছিল ; পান্নু একবার তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। তাহার মনের অপরাধ-বোধের কাছে এ সব অপমান এত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাতে তাহার কোন ক্ষোভ জাগিতেছে না।

বাবু বসিয়া ছিলেন হাঁটু ভাঙিয়া, কনুইয়ের উপর ভর দিয়া অনেকটা শিকারোদ্যত পশু-রাজের মত। ঐভাবে বসাই তাঁহার অভ্যাস। ঐ বসার ভঙ্গির সঙ্গে যে জানোয়ারের শিকার ধরার ভঙ্গির সাদৃশ্য আছে এটা অবশ্য তিনি কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই। লোকেও ভাবিয়া দেখে না ; ভাবে, ওটা একটা রাজকীয় কায়দা।

বাবু তাহার দিকে চাহিয়া একেবারেই বলিয়া দিলেন—পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। বস ওই-খানে। দিয়ে উঠে যা।

পান্নু কোন প্রকার বিদ্রোহ করিল না। বসিল।

তাহার নীরবতায় বাবু অত্যন্ত চটিয়া গেলেন, তাঁহার আসনের নীচেই পড়িয়া ছিল তাঁহার চটি, সেই চটি তুলিয়া লইয়া তিনি ছুঁড়িয়া মারিলেন পান্নুর মুখে। হারামজাদা, গরু মার তুমি ? গোহত্যাকারী !

কর্মচারীবৃন্দ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। নায়েব আসিয়া বাবুর সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—থাক। মুখে বলিল না, ইঙ্গিতে জানাইল। পান্নুকে পিছনে রাখিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়া ইঙ্গিত করিল—পান্নু দেখিতে পাইল না।

বাবু তাহার ইঙ্গিত বুঝিলেন, ডাকিলেন—চাপরাসী !

চাপরাসী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

বাবু বলিলেন—হিঁয়া খাড়া রহো।

চাপরাসীটা দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যাহার জন্য এত শঙ্কা, এত সাবধানতা—সে যেমন মাথা হেঁট করিয়া আসিয়াছিল, মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল—তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল। জুতা খাইয়াও একবার মাথা তুলিল না।

অনেকক্ষণ পর বাবু আবার বলিলেন—গোহত্যা কর তুমি ?

পান্নু এবার চোখ তুলিয়া চাহিল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল পান্নু কাঁদিতেছে।

পান্নুর ভয় দেখিয়া অনেকে আশ্বস্ত হইল—ওঃ, এইবার গোঁয়ারের শাসনকর্তা মিলিয়াছে।

বাবু নিজের দণ্ডবাক্য আবার উচ্চারণ করিলেন—পঞ্চাশ টাকা জরিমানা।

পান্নু এবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাবু বলিলেন—বস।

—টাকা তো আমার সঙ্গে নাই বাবু। টাকা আনতে হবে তো। পানু সবিনয়েই বলিল।

বাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আধ ঘণ্টা। আধ ঘণ্টার মধ্যে।

—তাই দোব।

পানু আধ ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চাশটি টাকা বাবুর সামনে নামাইয়া দিল। তারপর নীরবেই কাছারি হইতে বাহির হইয়া গেল। বাবু বলিলেন—টাকাটা জমা কর। বাজে খাতে আদায়—

অনন্ত বাহিরে প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। তাহার কেশকলাপের মূল্য হিসাবে বাজে খাতে খরচের কত অঙ্ক নির্ধারিত হয় শুনিবার জন্য। সে শুনিল, জমাই হইল পঞ্চাশ টাকা। খরচের কোন উল্লেখই হইল না। সে আর একদফা অভিসম্পাত দিল পানুকে।—শালার অম্বলশূল হোক, কুষ্ঠ হোক, বজ্রাঘাত হোক মাথায়।

এ পর্যন্ত ভালয়-ভালয় কাটিয়াও কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। আবার একটা হাঙ্গামা বাধিল। বৈকালে বাবুদের গরুর গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল পানুর বাড়ির সম্মুখে। সঙ্গে অনন্ত ঠাকুর ও রাখাল মাহিন্দার। পানু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—আবার কি?

—বাছুরটা নিতে এসেছি। দাও বাছুর। অনন্তের আক্রোশ যেন কিছুতেই মিটিতেছে না।

—বাছুর? পানু সাফ বলিয়া দিল—বাছুর আমি দোব না।

পানুর ও বেলার অপরাধীর মত আচরণ দেখিয়া এবারকার অভিযানটা নিতান্তই নিরীহ-গোছের ছিল। আদালতের পরোয়ানা লইয়া পিওন আসে, সে জানে, ওই শীলমোহরটাই তাহার বল। সেটা যেখানে অমান্য হইবার আশঙ্কা থাকে সেইখানেই আসে পুলিস। পুলিসের পর আসে ফৌজ। ফৌজ রাজ্য দখলের পর পুলিস শাসন করে—তারপর চলে পরোয়ানাতেই কাজ। ও-বেলায় ফৌজ এবং পুলিসের কাজ হইয়া গিয়াছে। তাই এ-বেলায় শুধু রাখালটা এবং একজন মাহিন্দার গাড়ি লইয়া বাছুরটাকে লইতে আসিয়াছিল।

রাখাল ছোঁড়াটা বলিল—ওই! বাছুর যে আমাদের।

পানুর সর্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিল। সে বীভৎস ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়িয়া দাঁত খিঁচাইয়া বলিল—ওরে শালার বেটা শালা, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, বাছুর তোমাদের? তার পর আঙুল দেখাইয়া বলিল—ভাল চাও তো বেরো। বেরো বলছি—বেরো।

রাখাল ও মাহিন্দারটা হতভম্ব হইয়া গেল।

পানু বলিল—খুন করে ফেলব। বেরো বলছি। বেরো।

তাহারা গাড়ি লইয়া পলাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর আবার আসিল অভিযান। অনন্ত ঠাকুর ও সাত-আটজন চাপরাসী—হাতে লাঠি। অনন্ত ঠাকুর চীৎকার করিতে গেল, কিন্তু চীৎকার করা হইল না।

পানু এবার একগাছা লাঠি হাতে দাঁড়াইয়াছে। নীরবে—কোন আস্ফালন সে করিতেছে না। কিন্তু চোখে তাহার এমন দৃষ্টি যে, তাহা দেখিয়া মানুষের মনে হয় অগ্নিগর্ভ একটা ঘরের দুইটা জানালা দিয়া আগুনের শিখা বাহির হইয়া আসিতেছে। অনন্ত বলিল—ওই দেখ! সে পিছাইয়া গেল। আগাইয়া আসিয়া একজন চাপরাসী বলিল—বাছুর দিস নাই কেনে?

পানু বলিল—বাছুর আমি কিনেছি।

—কিনেছিস ?

—হ্যাঁ। সকাল বেলায় করকরে পঞ্চাশ টাকা গুনে দিয়েছি।

—সে তো জরিমানা।

—জরিমানা-টরিমানা আমি বুঝি না। বাছুরটাকে আমি মেরেছি, খোঁড়া করে দিয়েছি, বাবু তার জন্যে পঞ্চাশ টাকা চাইলে, তাই দিলাম। বাছুর কেনে দোব আমি ? তোর কোন জিনিস ভেঙে দিলে—তার দাম দিতে আমি বাধ্য। কিন্তু তা হলে ভাঙা জিনিসটা তো আমার।

পানুর যুক্তির দাম ন্যায়শাস্ত্র দিবে কি না জানি না, কিন্তু চাপরাসীরা দিল। এই শ্রেণীর লোকের কাছে যুক্তিটার মূল্য আছে—তাহারা অন্তত বুঝিল।

পানু বলিল—এর জন্যে খুন হতে হয়, জান দিতে হয়, তাও দোব। আয়, কে আসবি বাছুর নিতে, চলে আয়।

অনন্ত বলিল—আমরাও খুন হব, তবু ফেরেঙ্গা নেহি। লাগাও।

রাজুবালা মুখ বাড়াইয়া বলিল—পুলিসে আমরা খবর দোব। জবরদস্তি করার আইন নাই। রাজুবালার কথাও চাপরাসীরা অবিশ্বাস করিল না। রাজু তাহা পারে। অনন্তের হুকুমে তাহারা খুন হইতেও পারে না, করিতেও পারে না। চাপরাসীরা ফিরিয়া গেল বাবুর নূতন হুকুমের জন্য। প্রয়োজন হইলে তাহারা পানুর মাথা ফাটাইয়া দিতে পারে কি না—পানু তাহাদের মাথা ফাটাইলে বাবু তাহার কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিবেন, বাবুর কাছেই সেটা জানা তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

চাপরাসীরা চলিয়া গেল ; পানু তখনও ফুঁসিতেছিল।

রাজুবালাকে এ অঞ্চলের লোকে পথেঘাটে দেখিলে ডাকিয়া কথা বলে, রসিকতা করে, মিষ্ট কথায় তাহার মনস্তুষ্টি করিতে চায় ; কিন্তু অন্তরালে বলে—সাংঘাতিক মেয়ে, সাততলা বুদ্ধি, না পারে এমন কাজ নাই। রাজুর সংসার-জ্ঞান সত্যই খুব টনটনে। আইন বে-আইনও সে বুঝে। রাজু চাপরাসীদের মুখে শাসাইল—আমরা তা হলে থানায় যাব। কিন্তু চাপরাসীরা চলিয়া গেলে পানুকে বলিল—একটা কথা বলব ?

—কি ? পানু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঁচকাইল। কথার সুরটাই তাহার ভাল লাগিতেছে না।

রাজু বলিল—এইখানে এস, লাঠিটা রেখে বস। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর, তারপর বলব।

পানু অত্যন্ত চটিয়া উঠিল—রাজিয়ার কথাগুলার প্রত্যেকটাতে যেন একটা করিয়া খোঁচা আছে, সে মাথা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—না—না—কোন কথা হাম নেহি শুনেগা।

রাজু চুপ করিয়া গেল। বৈকালবেলা গড়াইয়া চলিয়াছে, সে ঝাঁটাগাছটা তুলিয়া লইয়া বৈকালের কাজ সারিবার দিকে মন দিল। পানু কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া হনহন করিয়া আসিয়া দাওয়ায় উঠিয়া লাঠিগাছটা রাখিল—রাজুর হাতের ঝাঁটাগাছটা টানিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাকে টানিয়া বসাইয়া বলিল—কি বলছিস বল ?

রাজু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, তারপর বলিল—ওই পা-ভাঙা বাছুরটা নিয়ে কি হবে ? ও নিয়ে হাঙ্গামা করছ কেন ? ওদের বাছুর ওদের দিয়ে দেওয়াই তো ভাল।

পানু এ কথায় আবার চটিয়া উঠিল, বলিল—পা ভাঙা সারবে। আর বাছুর ওদের কি

করে হল ? বাছুর আমার।

—তোমার ? তোমার কি করে হল ?

—আমি পঞ্চাশ টাকা দিলাম যে।

—সে তো বাছুরটার পা ভেঙেছ বলে।

পানু বিব্রত হইয়া উঠিল, অনেক ভাবিয়া বলিল—বাছুরটার কত দাম ?

—সে আর কত হবে ? পাঁচ টাকা কি সাত টাকা—বড় জোর দশটা টাকা।

—তবে ? বাছুরটার দাম দশ টাকা, তা ওর একটা ঠ্যাঙের দাম পঞ্চাশ টাকা কি করে হয় ?

এবার রাজুকে নির্বাক হইতে হইল। পানু হঠাৎ তাহার একটা হাত টানিয়া ধরিয়া একটা কাচের চুড়ি দেখাইয়া বলিল—এটার কত দাম ?

—কেন ?

—বল, আগে বল। তারপর বলছি।

—চার আনা।

পানু উঠিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল, ফিরিয়া আসিয়া রাজুর হাতখানা আবার টানিয়া মাটিতে ঠুকিয়া দিল। চুড়িটা ভাঙিয়া গেল। পানু একটা টাকা রাজুকে দিয়া বলিল—এই নে। চার আনার জায়গায় এক টাকা দাম দিলাম। তারপর ভাঙা চুড়ির টুকরা কুড়াইয়া লইয়া বলিল—এগুলো এখন কার ?

রাজু এবার পানুর ন্যায়শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণের মর্ম বুঝিয়া হাসিয়া বলিল—মরণ আমার! গরুটা যে জ্যান্ত জানোয়ার। ওটা কি কাচের চুড়ি ?

পানু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—পাঁঠাও তো জানোয়ার, কিনে যে কাটি! গরু কিনে মুসলমানে যে সে গরু কাটে!

রাজু এবার বলিল—বাবু তো তোমাকে বাছুর বেচে নাই।

—তবে পঞ্চাশ টাকা নিলে যে ?

—সে তো জরিমানা।

—জরিমানা ? জরিমানা কি ? জরিমানা কেনে দিব আমি ? কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বার. বার ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল—জরিমানা আমি কেনে দিব ? উ আমি দিব না। ও-টাকা দিলাম আমি, বাছুর আমি দিব না। দিব না আমি। জান কবুল। উ দিব না আমি।

রাজু শঙ্কিত হইল। পানুর অভিনব ন্যায়ের তর্ক সে বুঝিয়াছে। কিন্তু ও অভিনব ন্যায়ের প্রচলন সংসারে আজও হয় নাই, সুতরাং ও যুক্তি জমিদার মানিবে কেন ? জমিদারেরও যে পানুর মত একটা নিজস্ব ন্যায়শাস্ত্র আছে। সে ন্যায়ের যুক্তি অস্বীকৃত হইলে তাহার মীমাংসার পথও জমিদারের নিজস্ব মীমাংসাশাস্ত্র। তাহার বিধি-বিধানের সঙ্গেও রাজুবালার পরিচয় আছে, কাজেই সে শঙ্কিত না হইয়া পারিল না।

ফিরিয়া আসিয়া পানু কিন্তু নির্বিকার। সে বাছুরটার পাশে বসিল। বাছুরটা এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। পা তাহার জোড়া লাগে নাই, কিন্তু তিন দিন সে পেট পুরিয়া খাইয়া অন্য দিকে সুস্থ হইয়াছে। তা ছাড়া এত সেবা সে কখনও পায় নাই। তাহার রোমবিরল গায়ের চামড়া হইতে 'এঁটুলি' তুলিয়া ফেলা হইয়াছে; গরম জলে সমস্ত দেহের ক্লেদ মুছাইয়া দেওয়া হইয়াছে; বেশ সুস্থভাবে সে রোমন্থন করিতেছিল। পানু তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া

দিল। বাছুরটা ফোঁস-ফোঁস করিয়া পানুকে শুঁকিয়া দেখিতেছিল।

রাজু পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—সব্বনাশী! সব্বনাশী কোথা থেকে এসে এক মুঠো টাকার গায়ে জল দিলে।

পানু বলিল—এইবার ওর গায়ে বেশ রোঁয়া গজাবে রাজি, না?

রাজি বলিল—হ্যাঁ, একেবারে এলোকেশী হবে। এই বড় বড় চুল।

পানু হঠাৎ বাছুরটার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আচ্ছা বলেছিস রাজি; উ আমার সব্বনাশী—এলোকেশী!

রাজি বলিল—একটা গান শুনবে?

—গান? গীত?

—হ্যাঁ গো, এলোকেশী সব্বনাশীর গান? বলিয়াই সে সুর করিয়া মৃদুস্বরে গাহিল—

আমার কাশী যেতে মন কই সরে?

ও সব্বনাশী এলোকেশী আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে!

পানু বলিল—ভাল গান রাজিয়া। ভাল গান।

একুশ

রাজু রোজই আশঙ্কা করে—আজ একটা কিছু ঘটিবে। সব্বনাশী এলোকেশী দায় এমন শীঘ্র শেষ হইয়া যাইবে এ তাহার মনে হয় না। কিন্তু দুই দিন তিন দিন হইয়া গেল—কিছুই ঘটিল না। রাজু একটু বিস্মিত হইল।

পানুর ওদিক দিয়া কোন চিন্তাই নাই। সে শুধু তাহার লাঠিগাছটা একেবারে হাতের পাশেই রাখিয়াছে এবং ধারালো 'হেঁসো' নামক অস্ত্রখানা তাহার বসিবার জায়গার সামনে চালের বাতায় আটকাইয়া রাখিয়াছে; সে শুধু বসিয়া বসিয়া ভাবে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, চীৎকার করে। রাত্রি হইলে পলাইবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাও পারে না।

তাহার 'সব্বনাশী এলোকেশী' এ কয়দিনে অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে। বাঁখারি-বাঁধা পা-খানা খোঁড়াইয়া টানিয়া চলিবার চেষ্টা করে। দুই-চারি পা চলিতেও পারে। বর্ষার ডাঙা জমির বুকের ঘাসের অঙ্কুরের মত তাহার রোঁয়া-উঠা চামড়ায় ছোট ছোট রোঁয়া গজাইতে সুরু করিয়াছে। তাহার গলার ডাকে বেশ জোর ধরিয়াছে, খাওয়ার সময় কোন রকমে পার হইলেই সে তারস্বরে চীৎকার সুরু করে। 'সব্বনাশী' চীৎকার আরম্ভ করিলেই রাজু এবং সেজ-বউ ব্যস্ত হইয়া উঠে, বিশেষ করিয়া সেজবউ। সব্বনাশীর সঙ্গে এখনি পানুও চীৎকার আরম্ভ করিবে ষাঁড়ের মত। রাজুর রক্ষা আছে, তাহার অনেকটা সময় বাহিরে কাটে, সেজবউয়ের যত জ্বালা!

দিন পনেরো পর।

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সেজবউ পুকুরঘাটে আঁচাইতে গিয়া পরম উপাদেয় কলহ-পালার সন্ধান পাইয়া সেইখানেই জমিয়া গেল। পুকুরটার ওই পারেই হাড়ীপাড়া। হাড়ীপাড়ায় ঝগড়া বাধিয়াছে। হাড়ীপাড়ার 'সুকো' হাড়িনী, আসল নাম সুখদা, নাচিয়া নাচিয়া গালিগালাজ করিতেছে। সুকো হাড়িনীর ঝগড়ার ওই বিশেষত্ব, সে সত্য সত্যই নাচে আর গাল দেয়—

'ওলো তুই বাপের মাথা খা লো। ওলো তুই ভাইয়ের মাথা খা লো। ওলো তুই ভাতারের মাথা খা লো। ওলো তুই গতরের মাথা খা লো। চোখের মাথা খাও, তুমি কানা হও, কানা হও; পা দুখানি ভেঙে যাক—খোঁড়া হও খোঁড়া হও, নাকে তোমার পিঙেস হোক, খোনা হও খোনা হও। গতরের মাথা খেয়ে ভিখ করে খা লো, ভুগে ভুগে মর লো! মর লো, মর লো—ওলো তুই মর লো।' বলিয়াই সে ঘুরপাক দিয়া নাচিয়া একটা পর্ব শেষ করে।

ছন্দে গাঁথা গানের মত গালাগালখানি সুখোর মুখস্থ। একটি শব্দের এদিক ওদিক হয় না। নাচের সঙ্গে তালে তালে গানের কলির মত এক-একটি পর্যায় শেষ হয়। অস্থায়ী অন্তরা প্রভৃতি বোধ করি বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায়। সুকো গাল দিতে আরম্ভ করিলে লোকে দাঁড়াইয়া দেখে, মেয়েদের গা কেমন শিরশির করে। গালাগাল শুনিতে শুনিতে সেজবউয়ের গাও কেমন শিরশির করিতেছিল। সে প্রত্যাশা করিয়াছিল—বাপ-ভাই-স্বামী-গতর প্রভৃতির সহিত অভি-সম্পাত শেষ করিয়াই এইবার সুকো অশ্লীল-পর্ব আরম্ভ করিবে। ওদিকের ঘাটে দাঁড়াইয়া ভাদু হাড়িনী মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

ঠিক এই সময়েই বাড়ির ওদিক হইতে 'সব্বনাশী' রব তুলিল। বাড়ির খাওয়া-দাওয়ার পরই তাহাকে অবশিষ্ট ভাত ডাল তরকারি যাহা থাকে সেগুলি বেশ করিয়া চটকাইয়া খাওয়ানো হয়। পনেরো দিনেই সব্বনাশীর সময়গুলি এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, ইহারই মধ্যে আদরিণী আবদেরে খুকীর মত চীৎকার সুরু করিয়া দিয়াছে। পানু বারান্দার তক্তাপোশে শুইয়া ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙিয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে না। ঘুম ভাঙার বিরক্তির ফলে তাহার এলোকেশীর প্রতি অবহেলার অপরাধটা এত বড় হইয়া উঠিবে যে, সেজবউয়ের উপর—ওই বাছুরটার উপর লাঠি চালানোর মত—লাঠি চালানোও আশ্চর্য নয়। সেজবউ বেচারা ছুটিতে আরম্ভ করিল। বাড়ি আসিয়াই হুড়মুড় করিয়া ভাত ডাল মিশাইয়া লইয়া সব্বনাশীর উদ্দেশ্যে চলিল। হতভাগী কিন্তু এতক্ষণে থামিয়াছে। পানুরও তর্জনগর্জন শোনা যায় না। সেজবউ আশ্বস্ত হইল। ভগবান সব্বনাশীকে সুমতি দিয়াছেন। সে চুপ করিয়াছে। পানুও জাগে নাই। কিন্তু বাড়ির বাহিরের দাওয়ার উপর আসিয়াই সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সর্বনাশ হইয়াছে! সব্বনাশী খোঁড়া পা-খানা টানিয়া দাওয়ার ধারেই গাছগুলির কাছে হাজির হইয়াছে। শুধু তাই নয়, সেই হেনার গাছটি এই পনেরো দিনে আবার কতকগুলি পাতা মেলিয়াছিল, সেই-গুলিই সে টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইতে সুরু করিয়াছে। ভাগ্য ভাল যে, পানু এখনও জাগে নাই। সেজবউ ছুটিয়া গিয়া সব্বনাশীকে গলায় জড়াইয়া ধরিল; তাহাকে টানিয়া সরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিল, চাপা গলায় তাড়াও দিল—হেট! হেট! হেট! সব্বনাশী কিন্তু কিছুতেই আসিল না। সেজবউয়ের আকর্ষণের বিরুদ্ধে সে তাহার তিনখানা পায়েরই খুঁট দিয়া গাছটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। সব্বনাশীর এতখানি শক্তি এবং ওজন সেজবউ কল্পনা করিতে পারে নাই। অতর্কিতভাবে সব্বনাশীর ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া—নিজের কাপড় পায়ে বাধাইয়া সে-ই পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ হো-হো হাসির শব্দে স্থানটা সচকিত হইয়া উঠিল। পানু হাসিতেছে। সেজবউ তাড়াতাড়ি উঠিয়া সব্বনাশীকে আবার ধরিল।

পানু বলিল—ছেড়ে দে।

সেজবউ অবাক হইয়া গেল। কিন্তু ছাড়িয়া দিতেও পারিল না।

—ছেড়ে দে।

—আবার যে হেনার গাছটা খেয়ে দিলে!

—দেখেছি। ছেড়ে দে, থাক।

সেজবউ ছাড়িয়া দিল।

পানু উঠিয়া ভাত-ডালের পাত্রটা লইয়া গিয়া এলোকেশীর মুখের কাছে ধরিল। বলিল—এই খা।

এলোকেশী ফোঁস শব্দ করিয়া মাথা নাড়িল অর্থাৎ না। মাছ-ভাতের চেয়ে হেনা গাছের পাতা কয়টা অনেক সুমিষ্ট। পানু এলোকেশীর মুখের দিকে চাহিয়া রসিকতা করিল—হুঁ। পাতাই মিষ্টি! গরু কিনা। তারপর সে নিজেই ডালটার পাতাগুলি নিঃশেষে ছিঁড়িয়া ওই মাছ-ভাতের সঙ্গে মিশাইয়া দিল। বলিল—নে, এইবার খা।

এলোকেশী এবার মাছ-ভাতের পাত্রে মুখ ডুবাইল।

ব্যাপারটা দেখিয়া পানুর তৃতীয় বউ সেজ বিস্ময়ে কেমন হইয়া গেল। ঠিক এই সময়ে ফিরিল রাজু; বাবুদের গ্রামে সে দুধ বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। পানুর পিছনে সেজর সঙ্গে সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া সেও অবাক হইয়া গেল। ব্যাপারটা কি? সেজবউয়ের মুখে এমন অভিব্যক্তি সে কখনও দেখে নাই। চোখে শঙ্কা নাই, ভঙ্গিতে সঙ্কোচ নাই, অথচ চোখ দুইটা ছানাবড়ার মত বড় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজ সেজবউটার ব্যাপারটা কি? পানুর পিছনে দাঁড়াইয়া সে ভুরু কুঁচকাইয়া ঘাড় নড়িয়া ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল—কি? হল কি?

উত্তরে সেজও নিঃশব্দে বিস্ময়ের ইঙ্গিতে ঘাড় নাড়িল, চোখ দুইটা আরও খানিকটা বড় করিয়া গালের উপর হাত রাখিল—অর্থাৎ অবাক!

রাজু এবার ঘটি রাখিবার অছিলায় বাহির বাড়ি হইতে ভিতরের উঠানে গিয়া দাঁড়াইল, চোখের ইসারায় সেজকে ডাকিয়া উঠান হইতে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সেজবউয়ের প্রাণটাও আইঢাই করিতেছিল, পেটটা যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে। রাজুকে ইঙ্গিতে জানাইতে গিয়া আকুলতা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সেও আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং বলিল—অবাক! দিদি অবাক!

—কি? কি অবাক?

—মিন্‌সে আর ছ মাস পেরুবে না দিদি। এ আমি বলে রাখলাম।

—হল কি তাই বল আগে।

—মতিভ্রম, দিদি মতিভ্রম। মরণের ছ মাস আগুতে মানুষের মতিভ্রম হয়। যে গাছের পাতার লেগে বাছুরটার ঠ্যাং ভেঙেছিল, সেই গাছ আবার আজ খেলে ওই সব্বনাশী; তা হা-হা করে হাসি কি! তারপরে দিদি, অবাক কাণ্ড!

আবার সে চোখ বড় করিয়া গালে হাত দিল।

রাজু ভ্রূ কুঞ্চিত করিল—মনে হইল, এই বিড়ালীর মত মেয়েটার গালে ঠাস করিয়া একটা চড় কষাইয়া দেয়। সেজবউ কিন্তু রাজুর বিরক্তি বুঝিল। সে বলিল—তুমি সে দেখ নাই, তুমি বুঝতে নারছ। তারপরে করলে কি জান? সব্বনাশী ওকে গুঁতিয়ে দিলে, ফোঁস করলে, মাছ-ভাত মুখে ধরলে তা খেলে না—ওই গাছের ওপর ঝোঁক। শেষে নিজে হাতে দিদি, নিজের হাতে—

রাজু বলিল—থাম। সে কান খাড়া করিয়া ঘাড় তুলিল।

সেজ বোকার মতই প্রশ্ন করিল—অ্যাঁ?

—থাম। বুঝি—

রাজুর কথা ঢাকিয়া বাহিরে রাস্তার উপর কোথায় চমৎকার শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। এ দেশে পূজার সময় যে ঘণ্টা বাজায় সে ঘণ্টা নয়; এ ঘণ্টার সুর আলাদা—ঢং আলাদা।—টিং

টং, টিং টং, টনো টং, টনো টং ; টং-টং টং-টং !

তাহার সঙ্গে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠিতেছে। রাজু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাবুদের গাড়ি। নিশ্চয় বাবুদের গাড়ি। বাবুদের গ্রামে পশ্চিমা ভুপা মাহাতোর খান দুয়েক ছ্যাকরা গাড়ি আছে, তাহাতে ঘণ্টাও নাই, তাহার ঘোড়া দুইটার আটটা খুরে এমন জোরালো খপ্ খপ্ খপ্ খপ্ শব্দও উঠে না। শব্দ দ্রুত আগাইয়া আসিতেছে। রাজু বাহিরে আসিল। পান্নুও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। পথের দিকে চাহিয়া আছে। হ্যাঁ, বাবুদের গাড়িই বটে।

বাবুদের গাড়িটা এবার স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কালো রঙের গাড়িতে সাদা জুড়ি। কোচম্যানের মাথায় সাদা চাদরের ধবধবে পাগড়ী। তাহার পাশে লাল পাগড়ী মাথায় চাপরাসী।

কিন্তু কি জন্য আসিতেছে বাবুদের জুড়ি ? অনন্ত ঠাকুর ও চাপরাসীরা গরুর গাড়ি লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, এবার তাহারা কি জুড়ি চড়িয়া আসিতেছে। অনন্ত ঠাকুর ও চাপরাসীরা বাবুদের বাড়ির ঠাকুরের পিতলের রথে চড়ে ঠাকুরের সঙ্গে, কিন্তু জুড়িতে চড়িতে তো পায় না ! বাছুরটাকে লইয়া যাইবার জন্য ও-বেলা গরুর গাড়ি আসিয়াছিল, ঘোড়ার গাড়ি নিশ্চয় সেটাকে লইবার জন্যও আসিতেছে না।

ঘোড়ার গাড়িটার পিছন দিক হইতে আরও দুইটা লালপাগড়ী-পরা ভোজপুরী পালোয়ান চাপরাসীর মাথা দেখা যাইতেছে। কোচম্যান রাশ টানিয়া ঘোড়া দুইটার গতি মন্থর করিতেছে। গাড়িটা যে তাহার এখানেই আসিয়াছে এবং বাছুরটার স্বত্বের মামলার চরম মীমাংসার জন্য আসিয়াছে, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। রাজুরও না, পান্নুরও না। রাজু বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, ভিতরের উঠান পার হইয়া খিড়কীর দরজার পথে বাহির হইয়া গাছপালার ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল। পান্নু আপনার দরজার উপর উঠিয়া এক হাতে পরচালার চালের একখানা বাঁখারি ধরিয়া দাঁড়াইল।

ঠিক ওই বাঁখারিখানার উপরেই চালের খড়ের মধ্যে তাহার ধারালো হেঁসো নামক অস্ত্রখানা গোঁজা আছে।

গাড়িটা আসিয়া ঠিক তাহার দাওয়ার সামনেই থামিল। রাশ টানিয়া কোচম্যানটা ঠোঁটে চুক্ চুক্ শব্দে ঘোড়া দুইটাকে বাহবা দিয়া শান্ত হইতে ইসারা করিল। দারোয়ান তিনজন লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল। একজন গাড়িটার পা-দানির দরজাটা খুলিয়া দিল। ভিতরে একজন মানুষের পায়ের দিকটা দেখা যাইতেছে, কিন্তু কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত প্রায় আড়াল পড়ায় ঠিক চেনা যাইতেছে না। ম্যানেজার ? না, সে তো এত লম্বা নয়। বাবু নিজে ?

হাঁ, তাই বটে। দরজাটা খুলিয়া দিতে স্বয়ং বাবুই নামিলেন। তাঁহার হাতে একগাছা লম্বা চাবুক।

বাইশ

স্বয়ং বাবুই আসিয়াছেন। তাঁহার হাতে একগাছা চাবুক। শঙ্কর মাছের লেজের তৈরি চাবুক।

তিনি ঠিক বাছুরটার জন্য আসেন নাই। বাছুরটা গোবৎস না হইয়া ছাগবৎস হইলে এর চেয়ে বেশী দরদ থাকিত তাঁর, বিলাতী কুকুর হইলে কথাই ছিল না ! বাছুরটার জন্য লোভ বা

শখ তাঁহার আদৌ নাই। জরিমানা দিবার পর পান্নু যদি জোড়হাত করিয়া তাঁহাকে বলিত—বাবু, বাছুরটা আমাকে দিতে হবে; এমন কি সকালে চাপরাসীদের সঙ্গে গিয়াও বলিত, তবে তিনি নিশ্চয় ওটাকে দান করিতেন; যে গাড়িটা লইতে আসিয়াছিল সেই গাড়ি করিয়াই পাঠাইয়া দিতেন। এমন কি হাসিয়া বলিতেন—ইচ্ছে হয় তো আরও দুটো নিয়ে যা। কারণ বাড়ির বালিকা গোমাতাগুলি তাঁহাদের মত বাবুদের বাড়িতে কুলীন-কন্যার চেয়েও গলগ্রহ; ওগুলা কোন কাজেই আসে না। শ্রাদ্ধশান্তিতে দান করিতে দুই-চারিটা লাগে, বাকীগুলা শুধু ভাগাড়ে ফেলিতে হয়। কিন্তু হতভাগ্য পান্নু ও-বেলায় তাঁহার চাপরাসীদের অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, অনন্ত ঠাকুর ন্যাড়া মাথার চুল ছিঁড়িতে পায় নাই—তাহার পরিবর্তে বুক চাপড়াইয়া ব্যাপারটাকে এমন ক্ষোভের সহিত নিবেদন করিয়াছে যে, তিনি দুরন্ত ক্রোধে এই গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে নিজেই জুড়ি হাঁকাইয়া আসিয়াছেন। গাড়ির ভিতর বসিয়া আসিবার পথে তাঁহার মনে বিস্ময়েরও উদ্রেক হইয়াছে।

লোকটার সম্পর্কে তাঁহার প্রচণ্ড কৌতূহল জন্মিয়াছে। এই লোকটাই দিন কয়েক আগে তাঁহার কাছারিতে বিনা বাক্যব্যয়ে গিয়া হাজির হইয়াছিল। অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছিল, তিনি নিজেও একটা হাঙ্গামা অনুমান করিয়াছিলেন। যে লোক একটা গাছের কয়টা পাতা খাওয়ার জন্য একটা বাছুরকে মারিয়া ফেলিবার মত আঘাত করিতে পারে, তাহার সম্পর্কে সকল শোনা কথাই তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু সব অনুমান ব্যর্থ করিয়া দিয়া কাছারি-ঘরে লোকটা অপরাধীর মত হাজির হইল। বাবু জুতা মারিলেন—মাথা পাতিয়া তাও সহ্য করিল। পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করিলেন—অবনত মস্তকে জরিমানা আদায় দিল। লোকে বলিল, তিনিও বুঝিলেন, লোকটার রক্ত ঠাণ্ডা হইয়াছে। বয়সের সঙ্গে বুদ্ধি জন্মিয়াছে।

সেই লোকটাই হঠাৎ লাঠি হাতে তাঁহার চাপরাসীদের বিরুদ্ধে নিদারুণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনন্তের কথা তিনি ধরেন না। চাপরাসীগুলিকে তিনি জানেন। তাহারা সহজে ফিরিয়া আসে না। অন্ধকারের মধ্যে পোষা জানোয়ারেরা যেমন বিপদ-আপদকে একটা স্বভাববোধের দ্বারা অনুমান করিতে পারে, ঐ সব ব্যাপারে তাহাদেরও একটা স্বভাববোধ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে অনুমান অভ্রান্ত পরিণতিতে পৌঁছায়। তাহারা বলিতেছে—খুন-খারাবি একটা হইয়া যাইবে।

এমন কি করিয়া হয়? গাড়ীতে তিনি এই কথাই ভাবিতেছিলেন। তিনি অবশ্য সমস্ত কিছুর জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলেই হয়তো কাজ শেষ হইয়া যাইবে। না হইলে চাপরাসী তিনজন আসিয়াছে, তাহারা ভোজপুরের লোক—রীতিমত পালোয়ান। পান্নুর বিক্রম যতই হোক, তিনজনের যৌথ শক্তির কাছে, শহরের মাড়োয়ারীর গদির কাছে গ্রাম্য মহাজনের কারবারের মত নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তিনি নিজে আনিয়াছেন চাবুক, ঘোড়ার চাবুক নয়, শখ করিয়া কেনা শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক—লম্বা, লিক্‌লিকে। আস্ফালন মাত্রেই তীব্র শিষের মত শব্দ করিয়া বেদের ঝাঁপির খোঁচা-খাওয়া তেজালো সাপের মত ফোঁসাইয়া সাড়া দিয়া উঠে। চাবুকটা ছাড়াও আর একটা অস্ত্র তিনি আনিয়াছেন। পকেটে তাঁহার পিস্তল আছে। সিক্স-চেম্বার অটোমেটিক। পকেটে থাকিলে বুঝিবার পর্যন্ত উপায় নাই।

বাবু নামিয়াই ভুরু কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। বৎসর কয়েকই তাহার এদিকে আসিবার কোন কারণ ঘটে নাই। তবে পরিচিত অঞ্চল, যৌবনে এ অঞ্চলে শিকার করিতে আসিতেন, কয়েক বৎসর আগেও একটা গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনিবার জন্য এই পথে কয়েকবারই সেই

গ্রাম দেখিতে গিয়াছেন, এই পথেই ফিরিয়াছেন। বেশ মনে পড়িতেছে, রুক্ষ লাল মাটির প্রান্তরের মধ্যে একটা মজা দীঘি; দীঘিটার কোণে দুইটা রাস্তার সংযোগস্থলে একটা বটগাছ ছাড়া আর কিছু ছিল না। মনে পড়িল, বটগাছটার তলায় দূরের যাত্রী গাড়োয়ানরা এখানে গাড়ী রাখিয়া 'আঁট' দিত। এই বটগাছটা ছিল হরিয়াল পাখীর একটা আস্তানা। তাঁহার অল্প বয়সে যখন মজা দীঘিটায় অল্প-স্বল্প জল থাকিত তখন এখানে মরাল পাখী পাওয়া যাইত। বটগাছটাও আছে। কিন্তু গাছটা ছাড়া সে পুরাতন স্থানটার আর কিছুই নাই। রাস্তাটার দুই পাশে দুইটি সতেজ সবুজ ফলের চারার ভরা বাগান, ইহারই মধ্যে সেকালের রোদে-পোড়া রাস্তার উপর ছায়া ফেলিয়া স্নিগ্ধ আভাস আনিয়াছে। মজা দীঘিটাকে দেখিয়া চেনা যায় না; ঠিক মাঝখানে কালো জলে পরিপূর্ণ পরিষ্কার একটি ছোট পুকুর, চারিপাশে সযত্নকর্ষিত উর্বর মাটির ক্ষেত। বাগান দুইটির মধ্যে কলাগাছগুলি সমারোহের সৃষ্টি করিয়াছে। ফলভারে বড় বড় গাছগুলি হেলিয়া পড়িয়াছে। মধ্যে মধ্যে তরীর লতা। আশ্চর্য হইয়া গেলেন তরমুজের গাছ দেখিয়া। তাঁহার চোখে যেন স্নিগ্ধ সবুজ কাজলের স্পর্শ লাগিয়া গেল।

এককালে বাবুর থিয়েটারের ঝোঁক ছিল। একটা নাটকের গল্পের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। বইখানার নাম বা গ্রন্থকারের নাম মনে নাই। সে এক বাদশার গল্প। বাদশা বন্দিনী করিয়া আনিয়াছিলেন পরমাসুন্দরী এক কুমারীকে। সম্ভবত কোন শাহজাদী। বন্দিনী শাহজাদীকে বাদশা বিবাহ করিতে চাহিলেন। মনে আছে, বাদশা তাঁহার মণিময় তাজ কুমারীর চরণতলে লুটাইয়া দিলেন, কোষাগারের সমস্ত মণিমুক্তা ঢালিয়া দিলেন। বলিলেন—তোমার মুখের এক টুকরা হাসির জন্য দুনিয়া জ্বালিয়ে দিয়ে রোশনাই দেখাতে পারি, এই রাজ্য সম্পদ ফেলে ফকির হতে পারি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, হাসো। কুমারী জলভরা চোখ তুলিয়া বাদশার দিকে চাহিয়া বলিলেন—হাসি আমার আসছে না শাহানশা। আপনার এই বাগিচার গায়েই চেয়ে দেখুন ওই পাহাড়ের দিকে, কালচেনীল মরা পাহাড় ধূধূ করছে—ধূধূ করছে; ওরই ছায়া পড়েছে আমার বুকে, আমার চোখে, আমার ঠোঁটে, আমার মনে। ওই পাহাড়কে সবুজ করে তুলতে পারেন শাহানশা? বানাতে পারেন ওখানে বাগিচা, বইয়ে দিতে পারেন ছোট্ট ঝরণা?

বাদশার ঘোষণায় কোন দেশান্তর থেকে আসিল এক পাগল শিল্পী। তার নাম ফরহাদ। কুমারীটির নাম শিরি। হাঁ, শিরি-ফরহাদের কাহিনী। প্লে-টার নাম শিরি-ফরহাদ। নাট্যাভিনয়কে বাবুরা বলেন প্লে।

ফরহাদ আসিয়া সেই মৃত্যুরহস্যভরা কৃষ্ণাভনীল মরুপাহাড়ের দিকে চাহিয়া দেখিল। কৃষ্ণনীলাভার মধ্যে শুভ্রবর্ণের ওগুলি কি দেখা যায়? কঙ্কাল। জীব-জন্তু-পাখী-মানুষের কঙ্কাল। মৃত্যু ওখানে তৃষ্ণার বিষজিহ্বা বাহির করিয়া বসিয়া আছে। যে যায় সে তৃষ্ণায় বুক ফাটাইয়া ঢলিয়া পড়ে। ওইখানে বহাইতে হইবে শীতল স্নিগ্ধ কালো জলের ঝরণা। নীলাভ পাহাড় কাটিয়া মৃত্যুর বুক চিরিয়া জীবন আবিষ্কার করিতে হইবে। পাথর কাটিয়া সেখানে মাটি বাহির করিয়া রচনা করিতে হইবে সবুজ তৃণক্ষেত্র, রোপণ করিতে হইবে আঙুরের লতা, ডালিমের ঝাঁক, আপেল-নাসপাতির গাছ।

ফরহাদ কুমারী শিরির বিষণ্ণ জলভরা আয়ত চোখের দিকে চাহিল, তাহার অপার মমতা-বিধুর মুখের দিকে চাহিল। ভুলিয়া গেল পৃথিবী, ভুলিয়া গেল মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা। তাহার বুকে এক বিপুল প্রেরণা অনুভব করিল। ফরহাদ মৃত্যুরহস্যভরা মরা পাহাড় কাটিয়া রচনা করিল তেমনি উদ্যান। নন্দন-কানন রচনা করিয়া ফরহাদ মরিল। শিরিও মরিল

ফরহাদের বুকের উপর পড়িয়া। চমৎকার প্লে-টা। বাবুর মনে ঘোর ধরিয়া গিয়াছিল। বাহিরের স্নিগ্ধ শ্যামশ্রী এবং স্মৃতির ওই গল্প দুইয়ে চমৎকার মিশিয়া গিয়াছিল, তাঁহার সন্ধ্যাকালের পরম উপাদেয় হুইস্কি এবং সোডার মত।

এইবার তিনি পানুর দিকে চাহিলেন। পানুকে না-দেখা নন, দেখিয়াছেন; কিন্তু ওই রোমান্সের ঝোঁকে পানুর মধ্যে ফরহাদের মত শিল্পীকে আবিষ্কার করিতে চাহিলেন। কালো রঙ, কুশ্রী মুখ, বিশাল দুইটা কাঁধ, প্রশস্ত মাংসল বুক, হাত দুইটা যেন সতেজ লাল সেগুন-শিরীষের নধর শাখার মত। বাবু তাহাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে চোখের এবং মনের রঙের ঘোর কাটিতেছিল।

পানু ঠিক একভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। ডান হাতে চালের বাঁখারি ধরিয়া আঙুল দিয়া হেঁসোর বাঁটখানা খুঁজিতেছিল। প্রয়োজন হইলেই—

বাবু আগাইয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইলেন। চাবুকটা বাঁ হাতে লইয়া ডান হাতের আঙুল দিয়া পানুর বুকের পেশীতে খুঁচিতে আরম্ভ করিলেন।

পানু হেঁসোর বাঁটখানা একবার চাপিয়া ধরিল। তারপর বিস্মিত হইয়া আবার ছাড়িয়া দিল।

বাবু হঠাৎ তাহার ডান হাতখানাই চাপিয়া ধরিলেন। পানু চমকিয়া ঝটকা মারিয়া হাতখানা ছাড়াইয়া লইল এবং চালের দিকে হাত তুলিল। বাবু হাসিলেন, বলিলেন—হ্যাঁ, তোর গায়ে জোর আছে। শরীরও পাথরের মত। এসব তুই নিজে করেছিস? নিজে হাতে?

পানু বিস্মিত হইল। বাছুরটা ছাড়িয়া, তাহার সঙ্গে বুঝাপড়া ছাড়িয়া বাবু তাহার ক্ষেত-খামার বাগান, তাহার দেহখানাকে যেন চোখ দিয়া চুষিয়া খাইতে চায়। সে সবিস্ময়েই উত্তর দিল—হ্যাঁ। নিজের হাতে করলাম। মজুরও লাগালাম কিছু কিছু।

—হ্যাঁ। কিন্তু কিসের জন্য এত সব করলি?

—কেনে? সবাই যার জন্য করে। নিজের জন্যে। পেটের জন্যে।

বাবু আবার হাসিয়া ফেলিলেন। বুদ্ধিহীনের বিপুল শক্তির মূল্য এইটুকুই বটে। এক কুচি হীরার দামের কাছে টন টন কয়লার দাম চিরকালই তুচ্ছ হইয়া যায়। তাও যদি কয়লাটা ভাল হইত। ওরে হতভাগা, এই প্রান্তরে এই পরিশ্রম না করিয়া উর্বর কোন স্থান লইয়া পরিশ্রমটা করিলে ইহার অপেক্ষা কত ভাল হইত বল দেখি। কিন্তু সে কথা এই বর্বরটাকে বলিয়া লাভ নাই। কর্তব্যটা করিতে হইবে। বর্বর শক্তিকে শাসনে রাখিতে না পারিলে সর্বনাশ হয়। বুনো হাতী আর পোষা হাতী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

বাবু এবার বলিলেন—হুঁ। পেট তোর অনেকটা বড় দেখছি। তা বেশ। কিন্তু—। শঙ্কর মাছের চাবুকটা আবার ডান হাতে লইয়া বলিলেন—আমার চাপরাসীদের কি বলেছিস ও-বেলা?

পানু হেঁসোর বাঁটখানা চাপিয়া ধরিল চালের খড়ের মধ্যে।

—তোকে আমি চাবকে সোজা করে দিতাম। কিন্তু—

সঙ্গে সঙ্গে পানু চালের খড়ের মধ্য হইতে সড়াক করিয়া হেঁসোখানা বাহির করিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। পানু দাওয়াটা চারিদিক লোহার শিক দিয়া ঘেরিয়াছে, শুধু একটা দুয়ার। সুতরাং দুয়ারে হেঁসো লইয়া দাঁড়াইলে, পানু বলে—যমের বাবার সাধ্যি নাই যে ঢোকে। মূর্খ পানু, সে একালের যমকে ঠিক চেনে না, এবং ব্যাকরণ-জ্ঞানও নাই, তাই 'কিন্তু'র পর বাবুর কথাগুলা সে ব্যাকরণ অনুসারে মারিবার অভিপ্রায়ের বিপরীত অর্থ ব্যক্ত করিল তাহা সে

বুঝিতে পারিল না। হেঁসো বাহির করিয়া দাঁড়াইল।

বাবু পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন—হেঁসো ফেল। তিন গুনতে গুনতে ফেলবি। নইলে বুকে গুলি করব তোর। এক—

পান্নু চমকিয়া উঠিল, বিবর্ণ হইয়া গেল সে। মনে ছিল না তার। একালের যমের পরিচয় সঠিক মনে থাকে না তাহার। নহিলে বন্দুক-পিস্তল না-দেখা নয় সে। বাবুদের পাখী মারা দেখিয়াছে বুলেটে—পাগলা কুকুর মারা দেখিয়াছে। দারোগার কোমরে পিস্তল দেখিয়াছে। শুনিয়াছে পিস্তলের গুলি বুকে ঢুকিলে পিট ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া যায়।

কিন্তু হেঁসো ফেলিতেও তাহার অন্তরাত্মা তীব্র আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। ক্রুদ্ধ যন্ত্রণা-কাতর পশুর আর্তনাদের মত সে আর্তনাদ। সে যদি শিকে ঘেরা এই দাওয়ার খাঁচার মধ্যে না ঢুকিত, তবে সে হয়তো ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিত। কিন্তু সে নিজেই বন্ধ করিয়াছে। শিকের ফাঁক দিয়া পিস্তলের গুলি মুহূর্তে তাহার বুকে আসিয়া বিঁধিবে। লড়াই করিয়া মরিতে সে ভয় পায় না, কিন্তু অসহায়ের মত মরিতে তাহার সাধ নাই—অসহায় অবস্থার মধ্যে মৃত্যুভয় আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিতেছে পাহাড়িয়া চিতির মত।

বাবু বলিলেন—দুই—

পান্নু এবার বর্বর চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেঁসোখানা ফেলিয়া দিল।

বাবু পিস্তল হাতে অগ্রসর হইলেন। চাপরাসীদের বলিলেন—পাকড়ো হারামজাদকো।

পালোয়ান দুইজন ভিতরে ঢুকিয়া পান্নুকে ধরিল। টানিয়া বাহিরে আনিয়া ঘাড়ে রদ্দা এবং ধাক্কা মারিয়া মাটির উপর ফেলিয়া দিল। পান্নুর কপালটা কাটিয়া গেল। কপালের রক্ত ফিনকি দিয়া পাথুরে সড়কটার বুকে পড়িল, পান্নু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই রক্তসিক্ত মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ তাহার পিঠের উপর একটা আগুনের দড়ি কে যেন চকিতে টানিয়া দিল। তাহাতে তাহার সবল দেহখানা জৈবিক রীতি অনুযায়ী চমকিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া সে চাহিয়া দেখিল না, কি ঘটিল! লাল রক্ত লালচে কাঁকর মাটির সঙ্গে মিশিতেছে, রক্তবিন্দুগুলি পড়িবা মাত্র বিন্দুর পরিধির পাশে ধুলা ফুটিয়া উঠিতেছে—চারিপাশ হইতে ঢাকিয়া দিতে চাহিতেছে; মাটিও তাহার রক্ত পিষিতেছে, শুষিতেছে!

হঠাৎ কাহার কণ্ঠস্বর তাহাকে চকিতচঞ্চল করিয়া তুলিল?

নারীকণ্ঠের অতি উচ্চ, সে যেন হৃদপিণ্ড ফাটানো চীৎকার! সে চীৎকারে প্রান্তরটা যেন চমকিয়া উঠিল।

পান্নু মুখ না তুলিয়াও বুঝিল, সে কে?

রাজিয়া চীৎকার করিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া পান্নুকে আগলাইয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অমানুষিক চীৎকারে সে বলিয়া উঠিল—না।

বাবু চমকিয়া উঠিলেন, চাপরাসীরা চমকিয়া উঠিল, ঘোড়া দুইটাও চমকিয়া উঠিয়া সশব্দে লাগাম টানিয়া ঘাড় দোলাইয়া ডাকিয়া উঠিল।

বাবু তখন দ্বিতীয় আঘাতের জন্য চাবুকটা তুলিয়াছিলেন। হিসাব করিয়া তিনি পান্নুর প্রাপ্য মিটাইতেছিলেন। প্রথম চাবুকটা বাছুরটা দিতে অস্বীকার করার জন্য। দ্বিতীয়টা তুলিয়াছিলেন অনন্তকে গালিগালাজের জন্য, আরও দুই ঘা দিবার স্থির করিয়াছেন—লাঠি ধরিয়া রুখিয়া দাঁড়ানোর জন্য, তাহার পর তিনি চাবুক কষিবেন হেঁসো তোলার জন্য। অবশেষে পালোয়ান দুই জন তাহার দুই কানে ধরিয়া এই গ্রামখানা ঘুরাইয়া আনিবে। এমন অতর্কিত

সংঘটনের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। মেয়েটা এমন চীৎকার করিয়া, এমনি পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল যে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। চমকিয়া উঠিলেন বলিয়াই বোধ হয় নিজেকে সম্বরণও করিতে পারিলেন না। তাহার দ্বিতীয় চাবুক সাপের ফোঁসানির মত একটা শব্দ করিয়া রাজির মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চিবুক হইতে কপাল পর্যন্ত একটা গাঢ় লাল রক্তাক্ত রেখা ফুটিয়া উঠিল এক মুহূর্তে।

রাজু আবার চিৎকার করিয়া উঠিল—না।

বাবুর হাত হইতে চাবুকটা খসিয়া পড়িয়া গেল।

চাপরাসীরা আপনাদের অজ্ঞাতসারে প্রায় এক সঙ্গে একটি সকাতর আক্ষেপ করিয়া উঠিল—আঃ।

ওদিকে মুহূর্তে উঠিয়া দাঁড়াইল পানু—সরে যা রাজিয়া। সে ফেলিয়া-দেওয়া হেঁসোখানা কুড়াইয়া লইয়াছে। জীবন-মরণ শেষ যুদ্ধ করিয়া দেখিবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা চীৎকারও করিয়া উঠিল। কিন্তু রাজিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হেঁসোখানা হাতে চাপিয়া ধরিল, তেমনি একটা প্রাণ-কাটানো চীৎকার করিয়া উঠিল—না। বর্বর উন্মত্ত পানু কিন্তু তাহার 'না' মানিল না, সজোরে সে হেঁসোখানা টানিয়া লইল। অস্ত্রখানা পিছলাইয়া বাহিরে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজুর হাতখানা রক্তাক্ত হইয়া গেল; অস্ত্রখানার ধারে তাহার হাতের তেলো এপাশ হইতে ওপাশ পর্যন্ত কাটিয়া গিয়াছে।

পানু হতভম্ব হইয়া গেল। সেই মুহূর্তে ছুটিয়া আসিল কয়েকজন লোক। তাহারা সব গ্রামের লোক। তাহাদের আগে একজন সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সর্বপ্রথম চাবুকগাছা তুলিয়া বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—বাড়ি যান বাবা।

বাবু চাবুক হাতে লইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—গোসাঁই, তুমি সরে যাও এখান থেকে। বাবু তখন আবার সামলাইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার প্রতি মুহূর্তে মনে হইতেছে, তিনি যেন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছেন ওই মেয়েটার কাছে।

—তা কি পারি? আমি জোড় হাত করছি।

—তুমি এখানে এলে কেন?

—মেয়েটি কেঁদে গিয়ে পড়ল। না এসে কি পারি?

—তুমি সরে যাও।

—না। আপনি বাড়ি যান। এত রাগ করতে নাই।

—গোসাঁই! বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সন্ন্যাসী এবার বিচিত্র দৃষ্টিতে বাবুর দিকে চাহিলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—বাড়ি যান, আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আপনি বাড়ি যান।

পালোয়ান তিনজন মিনতি করিয়া বলিয়া উঠিল—হুজুর! অর্থাৎ যাহা ঘটিয়া গেল, তাহার পর তাহারাও চাহিতেছে—আর না, বাড়ি চলুন। বাবু থতমত খাইয়া গেলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—রাগ যদি না মিটে থাকে, আমাকে মারুন, আমি ওকে মারতে দেব না।

পালোয়ানেরা বলিল—হুজুর!

বাবু নিঃশব্দে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। সন্ন্যাসী রাজুবালাকে ডাকিলেন—মা!

রাজুর কপালে রক্তরেখার মত চাবুকের দাগটা ক্রমশ ফুটিয়া উঠিতেছে। হাত দিয়া অনর্গল

রক্ত ঝরিতেছে। রাজু একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে সেই রক্তক্ষরণ। পান্নু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

তেইশ

প্রৌঢ় সন্ন্যাসীটি এ অঞ্চলের পরিচিত মানুষ। যে রুক্ষ মরুভূমির মত লাল কাঁকরের উঁচু টিলার মত প্রান্তরটায় প্রাণকৃষ্ণ মরুদ্যান রচনা করিয়াছেন, সেই প্রান্তরটার দক্ষিণ ঢালু হইয়া যে সমতলে মিশিয়াছে, সেই সমতলের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে বক্রেশ্বর নদী। নদী পার হইয়া ওপারে আরও ক্রোশখানেক দক্ষিণে একটি বনজঙ্গলে ঘেরা প্রাচীনকালের কালী-মন্দির আছে। সন্ন্যাসী সেইখানে থাকেন।

বনজঙ্গলে ঘেরা মনুষ্যবসতিহীন আশ্রমটি। দিনের বেলাতেও অন্ধকার। বহুকাল হইতে ওই স্থানটি শ্মশানেশ্বরী আশ্রম নামে এ অঞ্চলে বিখ্যাত। জঙ্গলের মধ্যে আঁকাবাঁকা গ্রাম্য নালা চলিয়া গিয়াছে,—সেগুলি এই নদীটিরই শাখা। কালোজাম ও বন-শিরীষের ঘন জঙ্গলের নীচে প্রচুর কেয়ার ঝাড় ও নানা রকমের লতা ও গুল্ম। লোকে বলে—প্রাচীনকালে এখানে কোতলঘোষের বিখ্যাত তান্ত্রিকেরা শবসাধনা করিতেন। কতজন এখানে সিদ্ধিলাভও করিয়াছেন। ক্রমে দেশ নাকি ধর্মহীন হইল, ম্লেচ্ছাচারের প্রভাবে তান্ত্রিক বংশের মতিগতি অন্য দিকে ফিরিল, শ্মশানেশ্বরী আশ্রম পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া রহিল। পাপী পুণ্যহীনের এখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল, মানুষেরা আশ্রমের বাহিরে সড়কের উপর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত। শ্মশানেশ্বরী আপন মনে খেলা করিতেন, শেয়াল শকুন সাপ তাঁহার চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইত; নানা ধরনের পাখী কলরব করিত; ফুল ফুটিত, ফল ধরিত, বীজ ফাটিত, নূতন চারাগাছ পাতা মেলিত, রাত্রে নাকি মহাকালীর সঙ্গে নাচিত ভূত-প্রেত-প্রেতিনীর দল। একবার এক ডাকাতের দল অন্ধকারে ভুল করিয়া এই আশ্রমে ঢুকিয়াছিল। কাছেই একটি গ্রামে তাহাদের ডাকাতি করার কথা, স্থির ছিল রাত্রির প্রথম প্রহরে শেয়াল ডাকিলেই তাহারা আসিরা গ্রামপ্রান্তরে একটা পুরানো বাগানে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিয়া অপেক্ষা করিবে। দ্বিতীয় প্রহরে শিবারবের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাহির হইয়া গ্রামে গিয়া পড়িবে। প্রথম প্রহরের শিবারব শুনিয়া ব্যস্ততার মধ্যে ভুল করিয়া এই আশ্রমে ঢুকিয়া পড়িল তাহারা। বাস, সেই যে ঢুকিল, আর সমস্ত রাত্রির মধ্যে বাহির হইতে পারিল না। সকালবেলা, গ্রামের লোক আশ্রমের বাহির হইতে দেখিল, একদল লোক মাটির পুতুল-মানুষের মত বসিয়া আছে, হাঁকডাকে নড়ে না। শেষে পুলিস আসিয়া তাহাদের ধরিয়া লইয়া যায়; তাহারা বলিয়াছিল, ওখানে ঢুকিয়া কি যে হইয়াছিল তাহাদের কিছু মনে নাই; চোখের দৃষ্টিশক্তি ছিল না, কানে কোন শব্দ শুনিতে পায় নাই, বসিবার পর আর নড়িতে-চড়িতে পারে নাই, দেহ যেন পাথর হইয়া গিয়াছিল।

কতকাল পর ওখানে আসিলেন এক সন্ন্যাসী। তিনি ইনি নন। তাঁহার একটা পা ছিল না, হাঁটু হইতে নীচের অংশটা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। সন্ন্যাসী আগে ছিলেন পল্টনে, গুলিতে পা জখম হওয়ায় পা কাটিয়া ঠেঙোর উপর ভর করিয়া গেরুয়া পরিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। পথে এই স্থানটি দেখিয়া 'জয় কালী করালী' বলিয়া এখানে ঢুকিয়া বসিয়া পড়িলেন। সাধনার পুণ্য ছিল—মা প্রসন্ন হইলেন, সন্ন্যাসী মায়ের সেবা লইয়া এইখানে

থাকিয়া গেলেন। চালাঘর তুলিয়া মাটিতে গড়িয়া মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন, বনজঙ্গল অনেক পরিমাণে সাফ করিলেন, সাধারণ মানুষের মায়ের দরবারে প্রবেশ করিবার অনুমতি তিনিই আদায় করিলেন মায়ের কাছে। পা-কাটা সন্ন্যাসীকে লোকে বলিত 'ঠেঙো-গোসাঁই'। ঠেঙো-গোসাঁই দেহ রাখিলে আর একজন সন্ন্যাসী এখানে বসিবার চেষ্টা করিয়াছিল—সে ছিল ভৈরব, সঙ্গে ছিল ভৈরবী, কিন্তু আসলে ছিল ভণ্ড; তাই মাসখানেকের মধ্যেই মা তাহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিলেন। মাসখানেক পরেই তাহারা ভয়ে পলাইয়া গেল। তাহার পর আশ্রম আবার বৎসর দুয়েক পূর্বের মত পড়িয়া ছিল। বৎসর দুয়েক পর আসিয়াছেন এই সন্ন্যাসী।

লোকে বলে নমোনারায়ণ-বাবা। তাঁহাকে প্রণাম করিলেই তিনি বলেন—নমো নারায়ণায়।

নমোনারায়ণ-বাবা একটু আলাদা ধরনের গোসাঁই—অর্থাৎ সন্ন্যাসী। এখানকার তত্ত্বজ্ঞ যাঁহারা, তাঁহারা প্রথম প্রথম সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। এখন বলেন—গোসাঁই আসল বৈষ্ণব, এখানে এক বিচিত্র সাধনার জন্য আসিয়াছেন।

গোসাঁইয়ের আরও কতকগুলো বাতিক আছে। এ অঞ্চলের লোকজন লইয়া কারবার করেন বেশী। শ্মশানেশ্বরীতলায় হরিনাম সংকীর্তনের চব্বিশ প্রহর উৎসব, অন্ন মহোৎসব, কালীকীর্তন, দশমহাবিদ্যার মূর্তি গড়িয়া পূজার্চনা একটা-না-একটা লইয়া লাগিয়াই আছেন। প্রতি বৈশাখে পঞ্চতপাও করিয়া থাকেন। চারিদিকে পাঁচটি হোমকুণ্ড জ্বালিয়া নিজে মধ্যস্থলে বসিয়া পাঁচটি হোমযজ্ঞ করেন, চৈত্র-সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ-সংক্রান্তি পর্যন্ত। আরও বাতিক আছে—এ অঞ্চলে পুরানো দেবস্থানের যেগুলি জীর্ণ হইয়াছে, ভিক্ষা করিয়া সেগুলিকে মেরামত করাইয়া থাকেন। সম্প্রতি এক কাজে লাগিয়াছেন, পানুর বাড়ির দক্ষিণে এবং তাঁহার আশ্রমের উত্তরে যে নদীটা আছে ওই নদীর দুই পারে বন্যারোধের জন্য বাঁধ তৈয়ারী করিবেন। নদীটার মোহনা এখান হইতে ক্রোশ-দশেক দূরে, মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি অঞ্চলে ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে মিশিয়া গঙ্গায় গিয়া পড়িয়াছে। মোহনাটায় এখন এমন বালি জমিয়াছে যে, নদীর জল পূর্ণ-বেগে নিকাশ হইতে পারে না, ফলে উপরে বন্যার প্রকোপ বাড়িয়াছে। এ দিকে এ সব অঞ্চলে পূর্বকালে যে সব বন্যারোধী বাঁধ ছিল—তাহার অস্তিত্ব নাই, শুধু চিহ্ন আছে মাত্র। পর পর কয়েক বৎসরই বন্যায় এ অঞ্চলের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। সরকার হইতে কোন প্রতিবিধান হয় নাই। নমোনারায়ণ-গোসাঁই স্বপ্ন দেখিলেন—বন্যা আসিয়া আশ্রম ডুবাইয়া দিয়াছে, মা-কালী বন্যার জলে একটা ভেলা ভাসাইয়া তাহাতে চড়িবার উদ্যোগ করিতেছেন। পরের দিন হইতেই তিনি বাঁধের জন্য লাগিলেন। সেই বাঁধের কাজেই তিনি এ গ্রামে আসিয়াছিলেন।

ইহার আগে আগেও কয়েকবার আসিয়াছেন, গ্রামের লোকদের গ্রামদেবতা বুড়ী কালীর প্রাঙ্গণে ডাকিয়া আলোচনাও করিয়া গিয়াছেন। এ গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকটায় পানুর বসতের টিল।—ওদিকে বন্যা আসে না। কোন কালেও আসিবে না। নদীগর্ভ এবং সমতল ভূমি হইতে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট, কি তাহারও বেশী উঁচু, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব দিকটা বন্যায় ভাসে এবং সমতল পূর্ব মাঠটার মাঝখান দিয়া যে নালাটি গিয়া এখানেই নদীতে পড়িয়াছে—সেই নালা বহিয়া বন্যার জল মাঠে ঢুকিয়া গোটা মাঠটার ফসল পচাইয়া দেয়। পূর্ব মাঠে এ গ্রামের জমি কম, কিন্তু তাহাতে কি? নমোনারায়ণ বাবা ধরিয়াছেন—বন্যায় ক্ষতি হোক বা না হোক, নদী হইতে দেড় ক্রোশের মধ্যে যত গ্রাম পড়িবে, সকল গ্রামকেই এ বাঁধের কাজে হাত লাগাইতে হইবে। শুধু তাই নয়, দশ হাজার লোকের কোদাল ও ঝুড়ি চারদিন না পড়িলে বাঁধ

হইবে না। এ নাকি দেবতার প্রত্যাদেশ। যাহারা খাটিবে তাহারা মজুরী লইলে বাঁধ টিকিবে না, সে বাঁধ ভাঙিয়া যাইবে এবং ওই চারদিন নদীর কূলে রান্না করিয়া সমস্ত লোককে পাতা পাড়িয়া খাইতে হইবে। সে না হইলে নদী শুকাইবে অর্থাৎ অনাবৃষ্টি হইবে। সেই কারণে গ্রামে গ্রামে যেমন ফিরিতেছিলেন, এ গ্রামেও তেমনি ফিরিতেছেন। সক্ষম চাষী হইতে হাড়ী, বাউড়ী, ডোম সকলেই কোদাল ধরিবে, যে সব জাতির মেয়েরা মজুর খাটে তাহারা ঝুড়ি বহিবে, এবং সৎজাতিরা—ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতিরা চাল দিবেন, ক্ষেতের তরকারি দিবেন, সামর্থ্য যাঁহাদের আছে তাঁহারা নগদ টাকাও কিছু দিবেন—এই ব্যবস্থা হইয়াছে। এ গ্রামের মজলিসে পানুকেও ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু পানু যায় নাই। সে বলিয়াছিল, বাণ তো আমার কি? হাম নেহি যায়েগা।

বলিয়া সে একটা ছড়া কাটিয়া দিয়াছিল—

কাদপুর ডুবু-ডুবু দোনাইপুর ভাসে,
(এ) গাঁয়ের লোকের বুক ঢিপ-ঢিপ পরাণকিষণ হাসে।

আমি তো বাবা, ডাঙায় দাঁড়িয়ে বাণ দেখি আর নাচি। আমি কেনে যাব? বলগা তোদের নমোনারায়ণ না ফমোফারানকে। সন্ন্যাসী! গোসাঁই!

বাণেই বা পানুর কি? আগুনেই বা কি? বাণে গাঁয়ের লোকের জমি ডোবে—পানুর ডাঙা জমি ডোবে না, গাঁয়ে লোকের খড়ের ঘরে আগুন লাগে—গ্রামের সঙ্গে সংস্রবহীন, গ্রামপ্রান্তে টিনের ঘর পানুর, পানুর ঘরে আগুন লাগে না। রাত্রে যখন লোকে জল জল করিয়া চেঁচায়, পানু তখন শুইয়া হাসে। সেই পানু যাইবে সন্ন্যাসীঠাকুর স্বপন দেখিয়াছে বলিয়া বাঁধে মাটি কাটিতে!—"আহো! সাধুবাবা! ঠাকুর মহারাজ! সন্ন্যাসী ঠাকুর! আ-হো!"

কথাগুলা বলিয়া পানু সেদিন খানিকটা নাচিয়া লইয়াছিল—আ-হো! নমোনারায়ণ বেটা—শঙ্কর গোসাঁই হইতে চায়, কলেশ্বরের সাধুবাবা হইতে চায়! আ-হো! ভণ্ড কোথাকার!

শঙ্কর গোসাঁই একজন গোসাঁই ছিল বটে। একশো বছরের উপর বাঁচিয়াছিলেন। ছাই মাখিয়া চিমটা হাতে একদিন আসিয়া উত্তর বীরভূমে ময়ূরাক্ষীর ধারে চিমটাটা পুঁতিয়া বসিলেন। ময়ূরাক্ষী সেখানে বিপুল বিস্তার। ময়ূরাক্ষী গঙ্গার চেয়ে অনেক ছোট নদী, কিন্তু এইখানটায় এপার হইতে ওপার পর্যন্ত গঙ্গার বিস্তৃতির প্রায় দ্বিগুণ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। গর্তটা বালুতে পুরিয়া তটভূমির সমান হইয়া উঠিয়াছে। ময়ূরাক্ষী নূতন পথ করিয়া ছুটিবে, পুরানো খাতটায় কানা পড়িবে।

শঙ্কর বাবা সেইখানে চিমটা পুঁতিয়া বসিয়া গাঁয়ের লোককে বলিলেন—একঠো চালা বনা দেও! চালা বনিল। বাবা ধুনি জ্বালিলেন। দেশ ভাঙিয়া লোক আসিয়া পায়ে লুটাইয়া পড়িল। অপুত্রক পুত্র পাইল, অন্ধে চোখ ফিরিয়া পাইল, বধির শ্রবণ-শক্তি পাইল, অম্লশূলের রোগী—বাবার দরবারে তেলেভাজার সঙ্গে খিচুড়ী খাইয়া হজম করিয়া বাড়ী ফিরিল। কত লোকের হারানো সন্তান দেশে ফিরিল, কত কি হইল। বাবা ময়ূরাক্ষাকে বাঁধিয়াছিলেন। লোকে বলে—'বাঁধিয়াছিলেন,' আসল কথাটা তা নয়; জ্ঞানী-গুণীতে বলে—বাঁধ-বাঁধটা লোক দেখানো ব্যাপার, নিজের মহিমা ঢাকিবার জন্য। আসলে তিনি ময়ূরাক্ষীকে হুকুম করিয়াছিলেন—হট্ যাও। ময়ূরাক্ষী হটিয়াছিল।

কলেশ্বরের সাধুবাবা অনাদিলিঙ্গ মহাদেবের নবরত্নের পুরানো মন্দির ভাঙিয়া নূতন করিয়া

গড়িয়াছেন ; কলেশ্বরে ওই শঙ্করবাবার মত একদা আসিয়া তিনি চিমটা গাড়িয়া বসিলেন এক গাছতলায়। দেশে দেশে খবর রটিল। কত রাজা-মহারাজা, জমিদার, তালুকদার, গৃহস্থ, আমীর, ফকির সব আসিয়া জুটিয়া গেল কয়েক মাসের মধ্যে। টাকা আসিল রাশি রাশি—ইট পুড়িল, চুন পুড়িল, বিলাতী মাটি আসিল। মন্দির তৈয়ারী হইল।

এই দুইজন সাধুর গল্প পানু জানে। এই দুইজনকে সে মনে মানিতে রাজীও আছে। কিন্তু সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। আসলে নাই ত্রেতাযুগ। এটা যে কলিকাল, কলিকালে সাধু আসিবে কোথা হইতে ? ভণ্ডামী ফন্দি ছাড়া এ লোকটার আর কিছু নাই বলিয়াই পানুর দৃঢ় বিশ্বাস। বাবুর পর এ লোকটাকে দেখিয়া পানু একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। সে রোষ গিয়া পড়িল রাজুর উপর। রাজুই তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

সে হিংস্র দৃষ্টিতে রাজুর দিকে তাকাইল। রক্তাক্ত হেঁসোখানা তখনও তাহার হাতে।

রাজু তাহার দৃষ্টির অর্থ কিন্তু বুঝিয়াছিল। সে তাহার রক্তাক্ত হাতখানাই তুলিয়া বিচিত্র হাসি হাসিয়া ইঙ্গিতে নিষেধ করিল। রাজুর রক্তাক্ত হাত—তাহারই অস্ত্রে কাটিয়া যাওয়া হাতখানার নিষেধ অমান্য করিবার যেন সাধ্যই ছিল না।

তাহার সে হাতখানি দেখিয়া সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—এ কি মা ? এ কি করে হল ? ওঃ, এ যে বেশ কেটে গিয়েছে।

রাজু চোখ বুজিয়া—বোধ হয় যন্ত্রণার স্বাভাবিক অভিব্যক্তিকে সংযত করিবার জন্যই চোখ বুজিয়াছিল সে ; চোখ খুলিয়া ক্ষীণ হাসি মুখে টানিয়া বলিল—কেটে গেল বাবা। হঠাৎ—। সে নীচের ঠোঁটের উপর দাঁত দিয়া টিপিয়া ধরিল।

সমবেত লোকগুলি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। চাবুকের দাগ আঁকা মুখ লইয়া পানুও কঠিন দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

সন্ন্যাসী পানুকে বলিলেন—জল আন বাবা, আর লম্বা ন্যাকড়ার ফালি। হাতখানা বাঁধা দরকার।

পানু বর্বরের মত গর্জন করিয়া উঠিল—না।

তারপর রাজুর হাত ধরিয়া একরূপ চাপিয়াই ঘরের ভিতর লইয়া গেল। যাইবার সময় রাজু বলিল—আপনি যান বাবা। ও আমার কিছু হয় নি।

পানু বলিল—না, হয় নাই। এখনও অনেক বাকী আছে তোর।

রাজু বলিল—সে পরে হবে। এখন এগুলোর বিহিত করতে হবে। সেজ, ও আবাগী, রেড়ির তেল আর চুনে খয়েরে মিশিয়ে আন ভাই। খানিকটা ন্যাকড়ার ফালিও আনবি। পানুকে বলিল—বস তুমি, হাতটা বেঁধে দেবে।

পানু বলিল—না না। আগে আমার কথার জবাব দে।

—কি ?

—কেন তুই হেঁসো চেপে ধরলি ?

অবাক হইয়া গেল রাজু। বলিল—কেন ধরলাম !

—হাঁ হাঁ, বাবুকে মারতে গেলাম, তু কেনে উকে আগলে দাঁড়াইলি ?

—নইলে খুন হয়ে যেত যে !

—যেত যেত। তাতে তুর কি ? উ তোর কে ?

—আমার কে হবে ?

—তবে ? আমার চাবুকটা খেলি বুঝলাম। কিন্তু উ লোকটাকে হেঁসো দিয়ে মারতে

গেলাম, কেন ধরলি হেঁসো ?

রাজুর বোধ করি যন্ত্রণা বাড়িতেছিল—তাহার উপর পান্নুর এই বর্বর কুৎসিত প্রশ্ন অসহ্য হইয়া উঠিল। সে এবার বলিল—তার সাজা তো দিয়েছ। এই রক্ত তো দেখেছ—দেখেছ—এখনো দেখছ। আর কেন ?

পান্নু এ কথার জবাব দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার চোখ দুইটা হিংস্র পশুর মত জ্বলছিল।

রাজু বলিল—একটু লজ্জা হচ্ছে না তোমার ?

—না। পান্নু জবাব দিয়া উঠিল।—কেনে লজ্জা হবে ?

—কেনে লজ্জা হবে ?

—হ্যাঁ, কেনে লজ্জা হবে আমার ? তোর সোয়ামী তো হামি।

—তা বটে ! রাজু হাসিল।—আমার সোয়ামী যখন, তখন আমার রক্ত দেখে তোমার লজ্জা হবার কথা নয়—এ কথা শাস্তরে আছে।

—হ্যাঁ। তুকে চাবুক মারলে—

—আমাকে মারে নি, তোমাকে মেরেছিল আমি গিয়ে মাঝখানে পড়লাম, চাবুকটা এসে আমার মুখে লাগল।

—বেশ করলি। আমার বহু তুই, আমার চাবুক তু মুখ পেতে, বুক পেতে নিলি—ভাল করলি। কিন্তু ওকে আমি মারতে গেলাম হেঁসো দিয়ে, সে হেঁসো তু কেনে ধরলি ? কতটা রক্ত পড়ল তোর উকে বাঁচাতে গিয়ে ? অঁা ? আমাকে বাঁচাতে চাবুক খেলি, তাতে কতটুকু রক্ত পড়েছে ? অঁা ? বল ? বল ?

অবাক হইয়া গেল রাজু।

ঠিক সেই সময় আসিয়া দাঁড়াইল সেজবউ। রেড়ির তেল, ন্যাকড়া, চুন-খয়ের লইয়া আসিয়াছে সে। সেও আজ পান্নুর প্রহারের ভয় না করিয়াই বলিল—বলবে, আগে মানুষটাকে সুস্থ হতে দাও।

—হ্যাঁ! আচ্ছা। বাঁধ—বাঁধ। তারপর হামি দেখব। সে চলিয়া গেল।

রাজু ডাকিল—শোন, কপালে তেল লাগিয়ে যাও—

বানরের মত পান্নু চীৎকার করিল—না না।

বাহিরে আপনার বাগানের মধ্যে সে ঘুরিতেছিল আর মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতেছিল—আ! আ! আ! একটা পাশব চীৎকার! পূর্বের সে চীৎকার নয়। ইহাতে আছে শুধু ক্রোধ উন্মত্ততা, পাশবিক উল্লাসও হয়তো আছে।

কিছুক্ষণ দুমদুম করিয়া বাগানময় ঘুড়িয়া সে বাড়ি ফিরিল। বাড়ি ঢুকিয়া সেজবউটাকে সামনে পাইয়া প্রশ্ন করিল—কোথা গেল ? সে হারামজাদী কোথা গেল ?

সেজবউটা বোকা, কিন্তু 'সে-হারামজাদী' কথাটা বুঝিতে তাহার কষ্ট হইল না ; বাড়িতে মাত্র দুই হারামজাদী আছে,—একজন সে নিজে, অপর জন রাজু। সে-হারামজাদী বলিতেই বুঝিল, পান্নু রাজুকে খুঁজিতেছে। কিন্তু তাহার উপর এমন রাগটা কেন ? রাগ হওয়ার তো কথা নয়। সেজ কোন উত্তর দিবার পূর্বেই রাজু নিজেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল ; ইহার মধ্যে সে নিজের হাতখানা বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, মুখের চাবুকের দাগে তেল লাগাইয়াছে। যন্ত্রণা এখন বেশ হইতেছে। কিন্তু যন্ত্রণার চেয়ে সান্ত্বনা তাহার অনেক বেশী। আজ কি

কাণ্ডটাই না হইতেছে। ঘর হইতে বাহির হইয়া সে বলিল—নাও, কি বলছ বল ?

—কি ? পানু দাঁতে দাঁতে কিস-কিস করিয়া উঠিল।—কি বলছি ?

—হ্যাঁ। কি ?

—কেনে বাঁচাইলি তু বাবুকে ?

রাজুর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, বলিল—তোমাকেও তো বাঁচিয়েছি—

—আমি তোর সোয়ামী, উ তোর কে ?

—ওকে আমি ভালবাসি, হল তো ?

—হাঁ। হল। আর ওকে কেনে ডাকলি তু ? ওই গেরুয়া ঠাকুরকে কেনে ডাকলি ?

রাজু অবাক হইয়া গেল। কি দোষ হইয়াছে তাহা বুঝিল না।

—বল ? কেনে ডাকলি ? সে আসিয়া একেবারে ঘাড়ে ধরিল।

রাজুর চোখের কোণে আবার একটা আগুনের শিখা ঝিলিক হানিয়া গেল।

পানু বলিল—আঁ। আবার তাকানি দেখ। ঘাড়টা সে টিপিয়া ধরিল।

রাজু বলিল—ছাড়। কণ্ঠস্বরেও তার প্রতিবাদ ফুটিয়া উঠিল।—ছাড় বলছি।

—কেনে ডাকলি তু !

—বেশ করেছি।

—না। বেশ করতে পাবি না। কেনে ডাকবি ওকে ?

—বাবুর নামে যে কথা বলেছি, তা ওঁর নামে জিভ থেকে বেরুবে না আমার। উনি আমার বাপ তাই তাকে ডেকেছি।

পানু অবাক হইয়া গেল, সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—তোর বাপ ?

—হাঁ, আমার বাপ। তবে আমি ওঁকে ডাকি নাই।

—ডাকিস নাই ? তবে কেন এল ?

—সে কথা ওঁকে শুধিয়ো। আমি তাকে ডাকি নাই। কোন মুখে, কোন লজ্জায় তাঁকে ডাকব আমি ? তুমি তাকে গাল দাও, তিনি ডাকলে ছুনিয়ার লোক যায়, তুমি যাও না, তাঁকে আমি ডাকব কি বলে ? কাউকেই ডাকবার পথ তুমি রাখ নাই, গাঁয়ের লোকের নামেও তুমি ঝাঁটা মার, তবু তাঁদের কাছেই ছুটে গেলাম। ঠাকুর তখন মজলিস করছিলেন। আমি গাঁয়ের লোকের সামনে গিয়ে বললাম—আপনারা কেউ আসুন, লোকটা বোধ হয় খুন হয়ে যাবে। বাবুর নাম শুনে কেউ নড়ল না, একটা কথা বলল না। আমি চলে আসছি, পিছন থেকে ঠাকুর বললেন—দাঁড়াও। উনি এগিয়ে এলেন, তখন লোকেরা পিছন ধরলে।

—হুঁ। হুঁ। চলে এল ! আপনি চলে এল !

—কিন্তু তোমার ক্ষতিটা কি হল ?

—জানি না। শালা গেরুয়া ঠাকুর, ভণ্ড বদমাস, সাধুবাবা—গুরুঠাকুর—জমিদার ! পানু বর্বর আক্রোশে জানোয়ারের মত দাঁত কটকট করিয়া উঠিল।

রাজু বলিল,—বস, কপালে এইটা লাগিয়ে দি।

—না। বলিয়া আবার সে হনহন করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সেজবউ বলিল—মতিচ্ছন্ন ! মরণ !

রাজু তিক্ত চিত্তে ঠোঁট টানিয়া আক্রোশভরে পানুর ঘর-ছুয়ারের দিকে চাহিয়া রহিল। এ সংসারে তাহার কোন মমতা নাই। কিসের আকর্ষণ ? সেজবউ পড়িয়া আছে, ছেলের মা, উহার না থাকিলে উপায় নাই।

ওই বর্বর লোকটা একদিন তাহাকে রোগজীর্ণ অবস্থায় আশ্রয় দিয়াছিল, বাঁচাইয়াছিল বলিয়া কৃতজ্ঞতায় আর কত সহ্য করিবে সে!

হঠাৎ পানুর বড় ছেলেটা আসিয়া চুপি চুপি বলিল—কি মা!

রাজু কান দিল না, সেজ কৌতূহলভরে প্রশ্ন করিল—কি? ছেলেটার কথা বলিবার ভঙ্গির মধ্যে যেন কৌতুককর—কৌতূহলজনক সংবাদের সন্ধান পাইয়াছে সে।

ছেলেটা বলিল—বাবা কাঁদছে।

—কাঁদছে? সেজ পা টিপিয়া বাহিরে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া গালে হাত দিয়া ফিরিয়া আসিল।—দিদি! বাছুরটার গলা ধরে কাঁদছে। বাছুরটা পা চাটছে।

সন্ধ্যার সময় পানু বলিল—চলো যায়েগা হিঁয়াসে।

রাজু বা সেজ কেউই কোন কথা বলিল না। পানু আবার বলিল—সব বেচে দেব। থাকব না, এ হারামজাদার দেশেই থাকব না।

এ কথাতেও কেহ কোন কথা বলিল না। উত্তরের প্রতীক্ষাও পানু করিল না, লাঠি টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। রাত্রি দুপ্রহর পর্যন্ত ফিরিল না। মধ্যরাত্রে ফিরিল, কিন্তু ঘরে ঢুকিল না। রাজু, সেজবউ—দুইজনে দেখিল, পানু সামনের ডাঙাটার উপর অন্ধকারের মধ্যে প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে বর্বর চীৎকার করিতেছে। ক্রুদ্ধ উল্লসিত চীৎকার।

পরদিন সকালে উঠিয়াই সে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। কোথায় গেল বলিয়া গেল না। বেলা তিন প্রহর পর্যন্ত ফিরিল না।

পানু ফিরিল প্রায় চারিটার সময়। স্নান করিয়া রাক্ষসের মত খাইয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। মুহূর্তে ঘুমাইয়া গেল, নাক ডাকিতে সুরু করিল কয়েক মিনিটের মধ্যে। সে যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।

রাজু বুঝিল, পানু সম্পত্তির খরিদ্দার ঠিক করিয়া আসিয়াছে, অথবা বাস করিবার নূতন কোন স্থান আবিষ্কার করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়াছে। সে একটু হাসিল। বিচিত্র মানুষ। গল্পে আছে, চোরের উপদ্রবে রাগ করিয়া এক গৃহস্থ থালা কাঁসা বিক্রয় করিয়া মাটিতে ভাত খাইত।

ওদিকে গ্রামে জয়ধ্বনি উঠিতেছে। জয় মা শ্মশানেশ্বরীর! জয় কালী! হরি হরি বল ভাই! হরি বল!

সম্ভবত বাঁধে খাটিবার কথা পাকা হইয়া গেল।

পানু অঘোরে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। সব্বনাশ অর্থাৎ ওই বাছুরটা মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছে। পানুকে জাগাইতে চায় সে। বার কয়েক আসিয়া তাহার গা চাটিল, বার দুয়েক ফোঁস ফোঁস করিল, কিন্তু পানু পরম নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে।

সেজবউ সন্ধ্যা জ্বালিয়া পানুর দিকে চাহিয়া বলিল—কাল ঘুম।

চব্বিশ

পরদিন সকালে উঠিয়া পানু গভীর প্রসন্নতার সহিত চা খাইতে বসিল।

সকালে সে এক জামবাটি চা খায়। হঠাৎ পিঠে চাবুকের কাটা ক্ষতে জ্বালা অনুভব করিয়া

সে চমকিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ হইয়া ঘাড় ফিরাইয়া সে দেখিল, বাছুরটা তাহার পিঠ চাটিতেছে। সে যেন ক্ষেপিয়া গেল। প্রচণ্ড একটা চড় উঠাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কি মনে হইল, চড়টা সম্বরণ করিয়া আলাদাভাবে পায়ের ঠেলা দিয়া বাছুরটাকে বাহিরে ফেলিয়া দিল। বাঁখারি দিয়া ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা খোঁড়া পা-খানা তাহার এখনও অপটু, বাছুরটা ঠেলা খাইয়া মাটির উপর কাত হইয়া পড়িয়া গেল। ব্যা-ব্যা শব্দে চীৎকার করিতে শুরু করিল। পানু বিরক্ত হইয়া চায়ের বাটিটা লইয়া রাস্তার ওপাশে তাহার ছোট বাগানটার একটা গাছতলায় গিয়া বসিল।

রাজু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাছুরটা এমনভাবে চীৎকার করে কেন? সে ছুটিয়া আসিয়া বাছুরটাকে তুলিয়া তামাসা করিয়াই বলিল—আহা, তোমার সব্বনাশী এলোকেশী যে মাটিতে পড়ে গিয়েছে। তুমি বসে আছ?

পানু বলিল—ওটাকে বেচে দোব।

—বেচে দেবে?

—হাঁ। কসাই ডেকে বেচব।

রাজুবালা শিহরিয়া উঠিল। সে স্থিরদৃষ্টিতে পানুর দিকে চাহিল। পানুর চোখে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা খেলা করিতেছে। পানু রাজুর দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—এ চীৎকার সেই পুরানো চীৎকার, এই কয়েক দিনের মধ্যে এ চীৎকার সে একবারও করে নাই।—গুণ-ফোঁড়া ছুঁচ দিয়ে তোর ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো আমি কানা করে দোব রাজু।

রাজু বলিল—তোমার সঙ্গে আমার ফারখত। আজই আমি তোমার বাড়ি থেকে চলে যাব। চোখে তাহার আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

পানু ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—আমার বল্লম দিয়ে তোকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দোব আমি।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হনহন করিয়া আসিয়া শুইবার ঘরে মাচায় উঠিয়া সে বল্লমটা টানিয়া লইল। হাত-পাঁচেক লম্বা পাকা বাঁশের লাঠির মাথায় ইঞ্চি দুয়েক মোটা ইঞ্চি আষ্টেক লম্বা লোহার সুচাল ফলা-গাঁথা বল্লম। দূর হইতে সাপ মারিবার জন্য এটা সে বরাদ্দ দিয়া তৈয়ারী করিয়াছে। কামার হাসিয়া বলিয়াছিল—চালাতে পারবে তো? তৈরী তো করালে!

পানু সঙ্গে সঙ্গে চালাইয়া দেখাইয়া দিয়াছিল। হাত দশেক দূরের একটি তালগাছে ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। শালের চেয়েও কঠিন পাকা তালের কাণ্ড। নির্ভুল লক্ষ্যভেদে ঠিক মাঝখানে বল্লমটা গিয়া বিঁধিয়াছিল। প্রায় তিন ইঞ্চির মত লোহার ফলাটা বসিয়া গিয়াছিল। হা-ঘরে জীবনের এই অস্ত্রচালনার অভ্যাসটা সে ভুলিয়া যায় নাই। যন্ত্রটা তৈয়ারী করাইয়া নূতন নূতন কয়েকদিন ব্যবহার করিয়া অভ্যাস ঝালাইয়াও লইয়াছিল। তাহার পর দীর্ঘদিন মাচার উপর তোলাই ছিল। তাহার হেঁসো অস্ত্রখানাই এই জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। রাজুকে সাজা দিতেও ওই হেঁসোখানাই যথেষ্টর চেয়েও বেশী। সেখানা এমনি ধারালো যে, খেজুর গাছের শক্ত কাণ্ডেও কোপ মারিলে হেঁসোটার আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া ফলাটা গোটাটাই বসিয়া যায়। রাজুর গলাখানা খেজুর গাছের কাণ্ডের চেয়ে অনেক কোমল। তবু সে আজ ওই বল্লমটাই পাড়িয়া লইল, ধূলা ও ঝুল ঝাড়িয়া মরচে-ধরা ফলাটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া একটা ঝাঁমা ইটের টুকরা লইয়া ঘষিয়া উজ্জ্বল করিতে বসিল।

রাজু এবার হাসিল। বলিল—সেই ভাল। আমিও যাই, তুমিও চল। আমাকে বিঁধে মেরে তুমি ফাঁসীকাঠে ঝুলো। না হয় তোমাকে—

সে চুপ করিয়া গেল। পানু হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়াছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে পানুর দিকে চাহিল।

পানু চমকিয়া উঠিল। মনে পড়িল নাকু দত্তের ছিন্নকণ্ঠ, মনে পড়িল—

সে বল্লমটা হাতে লইয়া উঠিয়া গেল। নির্জনে তাহার বাগানের মধ্যে পুকুরঘাটে গিয়া সেটাকে ঘষিতে লাগিল।

রাজুবালা ঘরের দাওয়ায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার বড় বড় চোখ দুইটা মধ্যে মধ্যে ঝকমক করিয়া উঠিতেছিল। যেন ওখানে পানুর ঘষিয়া ঘষিয়া উজ্জ্বল করিয়া তোলা বল্লমটার ছটা এখানে তাহার চোখে পড়িয়া প্রতিচ্ছটা তুলিতেছিল। সেজবউ দুইজনের রকম-সকম দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে। সে-ই ভয় পাইয়াছে বেশী।

সে সভয়ে রাজুকে ডাকিল—দিদি!

রাজু অকস্মাৎ নিজেকে একটা ঝাঁকি দিয়াই যেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ওকে শেষ পর্যন্ত আমি বিষ দিয়ে মেরে দোব সেজ। বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল। এই কথাটাই সে তখন পানুকে বলিতে চাহিয়াছিল—না হয় তোমাকে বিষ দিয়ে মেরে আমিই যাব ফাঁসী। সেজ চমকিয়া উঠিল। রাজু কি বিষ আনিতে চলিল নাকি? সে তারস্বরে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল—বলি, চললে কোথা?

—চুলোয়। বলিয়া সে হনহন করিয়া চলিয়া গেল। বাছুরটাকে সে লুকাইয়া রাখিতে গেল। না হইলে কখন বর্বর মানুষটা এই সদ্য-আবিষ্কৃত বল্লমটাই বিঁধিয়া ওটাকে মারিয়া ফেলিবে। সেজকেও সে কথা বলা ঠিক নয়। কখন সে বলিয়া ফেলিবে তাহার স্থিরতা নাই। সেজবউটা দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে আপন মনেই বলিল—কি বিপদে আমি পড়লাম! হে ভগবান! শাঁখের করাতে পড়লাম আমি—আসতে কাটছে, যেতে কাটছে! হে ভগবান! বলিতে বলিতে সে চুপ করিয়া গেল।

পানু ঘরে আসিতেছে। খিড়কির পথে তাহাকে দেখা যাইতেছে। তাহার বল্লমটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। ঝকমক করিতেছে বৈশাখের রৌদ্রচ্ছটায়। ঘরে ঢুকিয়া সে বলিল—তেল দেখি, সরষের নারকেলের কেরোসিনের, তিন রকমই চাই।

সরিষার তৈল সে বাঁশের ডাণ্ডাটায় মাখাইল, নারিকেল ও কেরোসিন মিশাইয়া মাখাইল ফলাটায়। তাহার পর একটা ন্যাকড়া দিয়া ফলাটাকে জড়াইয়া পরম যত্নে ঘরের কোণে রাখিয়া দিল।—তারপর বলিল—আর খানিকটা তেল দে চান করে আসি। ভাত বাড়। খিদে পেয়েছে।

ঠিক এই সময় রাজু ফিরিয়া ঘরে ঢুকিল, এবং আবার মেঝের উপর শুইয়া পড়িল।

—শুলি যে?

রাজু উত্তর দিল না। সেজবউ তেলের বাটি নামাইয়া দিল।

খাওয়া শেষ করিয়া পানু বলিল—ডাক সে হারামজাদীকে।

সেজ বলিল—তুমি ডাক, আমি পারব না। আমারে রা কাড়বে না।

পানু বলিল—কাড়বে কেনে? জীবজন্তু সবাই হতচ্ছেদা বোঝে যে। তারপর সে ডাক দিল—আয়—আয়—আয়।

সেজ আপন মনেই সবিস্ময়ে বলিল—অ—মা—গো।

পানু বাছুরটাকে ডাকিতেছে। রাজুকে নয়।

সংসারে আর এক হারামজাদী জুটিল—দুই হারামজাদীর সঙ্গে।

বাছুরটাকে রাজু এক প্রতিবেশীর বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে। সাড়া না পাইয়া পানু সবিস্ময়ে বলিল—গেল কোথা ? এলোকেশী ! এলোকেশী ! আয়—আয়। আঃ—আঃ !

এঁটো হাতে, ভাত-ডাল মাখা থালাখানা লইয়া সে বাহির হইয়া গেল। বৈশাখের রৌদ্রে লাল কাকরের সব চেয়ে উঁচু টিলায় দাঁড়াইয়া সে চারিদিকে দৃষ্টি হানিয়া ডাকিতে লাগিল—আঃ—আঃ—আঃ ! এলোকেশী ! এলোকেশী। আঃ—

বড় ছেলেটা পানুর পিছনে পিছনে থাকে—বাঘের পিছনে ফেউয়ের মত। কিছু তফাত আছে, ফেউয়ের মত ডাকিয়া ব্যাঘ্রসদৃশ পানুকে বিরক্ত করে না ; তাহার পরিবর্তে ছুটিয়া আসিয়া ছুই মাকে সংবাদটা দিয়া যায়। ছেলেটা ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল—মা !

সেজবউ বিরক্তিভরেই বলিল—কি ?

তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। ছেলেগুলা আগেই খাইয়াছে, পানুও খাইয়া লইল। সুতরাং অন্যদিন অপেক্ষা সকাল সকাল হইলেও ক্ষুধা তাহার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু রাজু যে শুইয়াছে, সে আর নড়িতেছে না। ডাকিলেও সাড়া দেয় না। জীবনটা তাহার জ্বলিয়া গেল। ইহার উপর কাহারও ঢং আর সে সহ্য করিতে পারিবে না। ছেলেটাকে মুখনাড়া দিয়া সে বলিল—কি ? এমন করে চেল্লাও কেনে ?

ছেলেটা সবিস্তারে বাপের কথা বর্ণনা করিয়া বলিল—বাছুরটা কোথা গেল মা ?

সেজবউ রাজুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—জানি না।

রাজু পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল—তুই খা সেজ। আমি খাব না।

—খাবে না ?

—না। তুই খেয়ে নে। এ পাপ অন্ন আমি আর খাব না।

—পাপ অন্ন খাবে না ?

—না—না—না। সে হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। উঠিয়া বাহিরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। চারিদিক চাহিয়া দেখিল। টিলা হইতে নামিয়া পানু ওই চলিয়াছে নদীর দিকে। নদীর ধারে সবুজ মাঠের মধ্যে গ্রামের লোকের গরু চরিতেছে। সম্ভবতঃ বাছুরটাকেই খুঁজিতে চলিয়াছে। সে গিয়া গোয়ালঘরে ঢুকিল। গোয়াল খালি। মংলী এবং তাহার ছুই কন্যা সন্তানসন্ততি লইয়া মহিষের স্বভাবমত বৈশাখের দ্বিপ্রহরে পুকুরের জলে পড়িয়া আছে। এই গোয়ালের মধ্যেই তাহার গুপ্ত-সঞ্চয় লুকানো আছে। এক কোণে একটা ভাঁড় পুঁতিয়াছে, উপরে একটা ছিদ্র রহিয়াছে, অবসরমত সেই ছিদ্র দিয়া টাকা হইলে ফেলিয়া যায়। সঞ্চয়টা তুলিয়া এই অবসরে সে চলিয়া যাইবে। সে সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। এই বর্বরটার কাছে আর সে থাকিবে না। আর সে সহ্য করিবে না। যাইবার জায়গার জন্য সে ভাবে না। আশ্রয়ের জন্য না, অবলম্বনের জন্যও না। নিজের মূল্য সে জানে ; সংসারের এ দিকটা সে ছুই ছুই বার দেখিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে। তাহার বয়স তিরিশ পার হইলেও বন্ধ্যাত্বের জন্য যৌবন এখনও পরিপূর্ণ। যৌবন এবং রূপকে সে কোনদিন অবহেলা করে নাই ; তাহার পরিচর্যা করিয়াছে, মার্জনা করিয়াছে বলিয়া মালিন্য এখনও ছায়া ফেলিতে পারে নাই। সুতরাং চিন্তা করিবার তাহার কিছুই নাই। পানু ফিরিয়া অবশ্য তাহাকে না দেখিয়া বল্লম লইয়া একবার ছুটিবে। তাহার জন্যও সে ভয় করে না। সে গিয়া থানায় উঠিবে, আত্মরক্ষার জন্য সাহায্য চাহিবে। কিংবা তাঁহাদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিবে। কিংবা সে উঠিবে গিয়া নমো-নারায়ণবাবার আশ্রমে, বলিবে ঠাকুর, কোথাও যাইবার পথ বলিয়া দিতে পার ? সে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘদিন অন্ন বস্ত্র এবং চুরি-করিয়া-সঞ্চয়ের সুযোগের জন্য যেমন নিরাসক্ত

ভাবে পানুর সকল বর্বর আদর নির্যাতন সহ্য করিয়া ব্যবসায়িনীর মত পড়িয়া আছে, তেমন ভাবে পড়িয়া থাকাটা আজ তাহার পক্ষে একান্ত ভাবে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন অন্ন বস্ত্র সঞ্চয় আবর্জনা-স্তূপে ফেলিয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়াও সুখ আছে, শান্তি আছে।

পানু ফিরিল অপরাহ্ণে। প্রায় সারা মুল্লুকটাই সে ঘুরিয়া আসিয়াছে। এই দ্বিপ্রহরে বাছুরটার সেদিনের বড় কালো চোখের অসহায় ভয়ার্ত কম্পিত দৃষ্টি—দীর্ঘ চক্ষুপল্লবের প্রান্তে শিশিরবিন্দুর মত টলটলে অশ্রুবিন্দু—যেন প্রান্তরের বুকের রৌদ্র-ঝিলিমিলির মধ্যে চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সকালবেলা বাছুরটাকে সে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর কোথায় গেল বাছুরটা, কোথায় কোন খানায় বা ডোবায় বা গড়ানে পাথুরে মাঠে গিয়া পড়িয়াছে, খোঁড়া পা লইয়া অসহায় ভাবে পড়িয়া আছে, উঠিতে পারিতেছে না, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে, চীৎকারের ক্ষমতা নাই, শুধু চোখ দুইটা সেদিনের মত কাঁপিতেছে, চোখের রোঁয়ায় জলবিন্দু জমিয়াছে—সূর্যের ছটায় চিকচিক করিতেছে। হয়তো সন্ধ্যার আগেই মরিয়া যাইবে। না মরিলে রাত্রে জীবন্তেই শেয়ালে ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিবে।

মানুষের চেয়ে জন্তু জানোয়ার—কুকুর বিড়াল গরু মহিষকে সে চিরদিন বেশী ভালবাসিয়াছে। গরু মহিষকে সব চেয়ে বেশী! কিন্তু এই বাছুরটার মত কোনটাকে ভালবাসে নাই। বাছুরটার কাছে তাহার দেনা যেন অনেক। তাহার পা-খানা সে নির্মম আঘাতে ভাঙিয়া দিল, বাছুরটা তাহার হাত চাটিল। পৃথিবীতে এমন প্রতিদান সে কখনও পায় নাই। হা-ঘরেদের দলে থাকিবার সময় সে কুকুর পুষিত। কুকুরগুলার মত অনুগত জীব আর হয় না! কিন্তু মারিলে সেগুলা এক বেলাও অন্তত দূরে দূরে থাকিত, হয় ভয়ে পলাইত অথবা গোঙাইত। দুনিয়াতে অনেক জনের কাছেই নির্মম প্রহার পাইয়াছে, সে তাহাদের কাহাকেও ক্ষমা করে নাই, অনেক জীবকে সে প্রহার করিয়াছে, হত্যা করিয়াছে—সেগুলার অধিকাংশই বন্য বা অপরের গৃহপালিত, তাহাদেরও কোনটা এমন ভাবে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করে নাই, তাহাকেই পরম আশ্রয় বলিয়া জড়াইয়া ধরে নাই। বাছুরটার আনুগত্য তাহার কাছে অভিনব,—এমন অনুভূতির আস্বাদন সে জীবনে কখনও পায় নাই। তাই গোটা মুল্লুকটাই প্রায় সে ঘুরিয়া আসিল। থালাটা হাতে লইয়াই গিয়াছিল। ভাতগুলা ফেলিয়া দিয়াছে, ভাত ডালের দাগ শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। থালাখানা নামাইয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বলিল—পেলাম না।

সেজবউ চুপ করিয়া রহিল। উত্তর দিতে সাহস হইল না। বাছুর বাছুর করিয়া ফিরিতেছে, আর ঘরে যে কাণ্ড—

—রাজিয়া কই? রাজু!

সেজবউ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল—যা করতে হয় কর। আমি জানি না, আমি পারব না।

—কি?

—সারাটা দিন কাঠের মত শুকিয়ে পড়ে আছে মানুষ, কথাও নাই, বার্তাও নাই, ওই দেখ। একটা লোক না খেয়ে থাকলে আমি খাই কি করে? বলি, মানুষের চামড়া তো গায়ে আছে!

রাজু খায় নাই। কি যে তাহার হইয়াছে, সে নিজেও তাহা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু

সঞ্চয়ের ভাঁড়টি তুলিয়া আঁচলে ঢালিয়া বাঁধিয়াও সে যাইতে পারে নাই। সেগুলিকে আবার যথাস্থানে রাখিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়াছে। জলবিন্দু মুখে না দিয়া পড়িয়া আছে।

পানুর সঙ্গে একবার লড়িয়া দেখিতে ইহা হইয়াছে। না হয় ওই বর্বরটার হাতেই মরিবে তবু উহার নিষ্ঠুরতার শেষ সে দেখিবে। সঙ্গে সঙ্গে তিক্ততা এবং ক্রোধের উন্মত্ততার মধ্যে যে জীবনের কথা তাহার মনে হইয়াছিল, সে জীবনের স্মৃতিও ভাল লাগে নাই। আশ্চর্য, চোখে জল আসিল সঙ্গে সঙ্গে। ঘরে আসিয়া শুইয়াও সে অনেকক্ষণ কাঁদিল। সেজ ডাকিলে সাড়া দিল না, নড়িল না।

পানু একটা চীৎকার দিয়া উঠিল, ক্রোধে ক্ষোভে বিরক্তিতে—আঃ—

তারপর ঘরে আসিয়া রাজুর সামনে দাঁড়াইল।—এই হারামজাদী!

রাজু উত্তর দিল না। নড়িল না।

—শুনেছিস? খাস নাই কেনে? এই হারামজাদী! এই রাজিয়া! রাজু নির্বাক নিস্পন্দ।

পানু তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া বসাইয়া দিল। রাজু বসিয়া আপন দেহের কাপড় সংবৃত করিয়া লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

—খাস নাই কেনে? এ—ই? এই হারামজাদী! শূয়া-রের বা—চ্ছি!

রাজু বলিল—আমার ইচ্ছে।

—তোর ইচ্ছে? পানু খপ করিয়া তাহার সুডৌল বাহুমূলের খানিকটা অংশ দুই আঙুলে টিপিয়া ধরিয়া পাক দিতে শুরু করিল, এবং থামিয়া থামিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল—তোর ইচ্ছে? বল? তোর ইচ্ছে? তোর ইচ্ছে?

রাজু চোখ বন্ধ করিল, যন্ত্রণায় তাহার কপাল ভুরু নাক মুখ—সব আপনি কুঁচকাইয়া জড়ো হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু তবু সে একটি শব্দ উচ্চারণ করিল না। পানু বিস্মিত হইয়া নিজেই ছাড়িয়া দিল; কয়েক মুহূর্ত সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—হেঁসো? হেঁসোটা কই? হেঁসোটা?

রাজু হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। গতকাল হেঁসোখানা কুড়াইয়া রাখিয়াছিল। সে নিজেই সেখানা বাহির করিয়া আনিয়া পানুর হাতে দিয়া বলিল—লাও। মার। মার। কোপাও।—তাহার হাতটার কাটা স্থানটা হইতে রক্ত টপটপ করিয়া ঝরিতেছে। ব্যাণ্ডেজ ভিজিয়া গিয়াছে। পানু এই হাতখানা ধরিয়াই টিপিয়াছিল। তবু রাজু চীৎকার করে নাই। সে যেন পাগল হইয়া গিয়াছে। তাহার ভয় নাই। চোখ তাহার জ্বলিতেছে, অথচ সেই জ্বলন্ত চোখ হইতে জল গড়াইয়া এক অদ্ভুত মূর্তি হইয়াছে তাহার। আগুন জল হইয়া গিয়াছে, জল আগুন হইয়া উঠিয়াছে।

পানু আজ সভয়ে পিছাইয়া গেল।

অকস্মাৎ বনে আগুন জ্বলিয়া উঠিলে রাত্রির অরণ্যচারী পশুর পূর্ণ বর্বর হিংসাও যেমন-ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পিছাইয়া পিছাইয়া গহ্বরে গর্তে গিয়া লুকায়, রাজুর চোখের দৃষ্টির সম্মুখে পানুর সকল সাহস, সকল ক্রোধ, সকল নিষ্ঠুরতা তেমনিভাবেই সঙ্কুচিত হইয়া যেন লুকাইতে চাহিতেছে।

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াও সে বাড়ির ভিতরে থাকিতে পারিল না। বাড়ির বাহিরে—দোকানের দাওয়ার সামনে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জীবনে কখনও সে এমন অসহায় বোধ করে নাই। এমন জটিল নাগপাশের মত বন্ধনে সে কখনও জড়াইয়া পড়ে নাই। গোটা জীবনটাই সে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে—থানার জমাদার হইতে শুরু, বেদের দলের

প্রতিদ্বন্দ্বী, দিদির গুরুঠাকুর, জমিদারের গোমস্তা, যশোদিয়ার বাবা, জমিবিক্রেতা সদগোপ চাষী, এই গাঁয়ের লোক, এমন কি এই যে সদ্য এলোকেশীর মালিক খোদ জমিদারের সঙ্গে বিবাদ শুরু হইয়াছে—এ পর্যন্ত কোথাও সে হারে নাই। কোথাও হাতে মারিয়াছে, কোথাও ঘরে আগুন দিয়াছে, প্রতিশোধ সে লইয়াছে, তাহার উপর প্রতিটি ক্ষেত্রে তাচ্ছিল্যের লাথি মারিয়া মনে সুগভীর তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। জমিদারের সঙ্গে লড়াই তাহার শুরু হইয়াছে শেষ হয় নাই। শোধ সে লইবেই। হার সে মানিবে না। সেই লইয়াই সে এ কয়দিন ভাবিতেছে, উল্লসিত উন্মত্ত চাৎকার করিতেছে। মনে মনে সেই হা-ঘরেত্ব ফিরিয়া পাইয়া যেন বাঁচিয়া গিয়াছে। প্রতিশোধ লইবার ব্যবস্থা করিতেই সে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার জন্যই সে গতকাল পাঁচ ক্রোশ পাঁচ ক্রোশ দশ ক্রোশ হাঁটিয়াছে। তাহারই জন্য আজ সকালে সে তাহার পাচ হাত লম্বা বল্লমটা পাড়িয়া মাজিয়া ঘষিয়া শানাইয়া সেটাকে কালদণ্ডের মত ভয়ঙ্কর এবং তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। রাজুকে উপলক্ষ পাইয়া তাহার নাম করিয়া বল্লমটা পাড়িলেও আসল লক্ষ্য হইল, বাবুর উপর প্রতিশোধ। কাল গিয়াছিল উত্তরে একটা বড় নদী পার হইয়া নদীপারের একটা গ্রামে; বনজঙ্গলের মধ্যে দুর্ধর্ষ ভল্লা বাগ্দীর বাস সেখানে। পুরুষানুক্রমে তাহারা ডাকাতি করিয়া খাইয়া আসিতেছে। মদ খায়, গাঁজা খায়, সমস্ত দিনটা ঘুমায়, রাত্রে জাগে বন্য বাঘের মত, সারারাত তাণ্ডব-নৃত্য করে। সুযোগ সুবিধা পাইলে ডাকাতি করে। ধরা পড়ে, জেল খাটে, আন্দামানে যায়, কেহ ফেরে, কেহ ফেরে না—সেইখানেই মরে। দল অনেকই আছে, কিন্তু এ দলের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা ভীষণ মানুষ, তাহারা শুধু এই বাংলা দেশেই ডাকাতি করে নাই বা করে না, এ-দেশ ও-দেশ পর্যন্ত মারিয়া আসিয়াছে; পাঞ্জাবী, ভোজপুরী, পেশোয়ারীদের সঙ্গে মিশিয়াও কাজ করিয়াছে। কয়লার কুটি লুঠিয়াছে, নদীতে নৌকা মারিয়াছে, ট্রেনে উঠিয়া লুট করিয়া শিকল টানিয়া নামিয়া পলাইয়াছে। লোকটার দুইটা বন্দুকও আছে,—লুঠ করা মাল। পানু অনেক সন্ধান করিয়া লোকটার কাছে গিয়াছিল। কিছুদিন আগে আন্দামান হইতে ফিরিয়াছে। নদীর ধারে একটা ভাঙা পরিত্যক্ত মসজিদের চত্বরের উপর ঘর তুলিয়া বাস করে। বিড়বিড় করিয়া বকে, মালা জপে। কথা কয় না সহজে। পানু তাহার সহিত প্রাথমিক কথাবার্তা বলিয়া আসিয়াছে। সে বলিয়াছে—আমি ভেবে দেখি, তুইও ভেবে দেখ। কিন্তু মালের ভাগ তুই পাবি না। তোর ভাগে সে শালার মাথাটা রইল। তুই তো তার মাথাটা চাস? পানু উল্লসিত হইয়া ফিরিয়াছে। তাহার সে উল্লাস, তাহার সে ভয়ঙ্কর কল্পনা আজ একটা মেয়ে যেন এক মুহূর্তে বিপর্যস্ত করিয়া দিতেছে। বাহিরে যুদ্ধযাত্রার মুহূর্তে হারামজাদী রাজিয়া অকস্মাৎ ঘরেই তাহার মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল, এ যুদ্ধে মুহূর্তে তাহার অবস্থা অজগরের পাকে জড়ানো ক্ষিপ্ত বাঘের অবস্থার মত সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে। নিষ্ঠুর আক্রোশ তাহার দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। আক্রোশের এক চরম উন্মাদনাপূর্ণ কল্পনার মুহূর্তটিতেই এক অকল্পিত দিক হইতে ততোধিক অকল্পিত এক আঘাত খাইয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দেহ-মন যেন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। মনে মনে বলিল—থাক্, সবুর কর, কয়টা দিন সবুর কর! তারপর সে দেখিবে। ওই বাবুর বাড়িতে যে রাত্রে তাণ্ডব-নৃত্য করিবে, বাবুর বুকে ওই বল্লমটা বিঁধিয়া দিবে, সেই রাত্রেই ইহার প্রতিকার সে করিবে। দেশ তাহাকে ছাড়িতেই হইবে। এবং এবার দেশ ছাড়িতে হইবে একা। কাচ্চা-বাচ্চা আর দুইটা বউ লইয়া পালানো অসম্ভব। একমাত্র রাজুকে লইয়াই পালানো চলিত। মুংলী ও তাহার কন্যার পিঠে

দুইজনে চড়িয়া নদীর ধারের জঙ্গল ধরিয়া চলিতে পারিত। কিন্তু না, থাক সে কল্পনা। বাবুর বাড়িতে তাণ্ডব সারিয়া বাড়ি ফিরিবে, বাড়িতে ওই রাজুটাকে কাটিবে। হঠাৎ আরও একজনের কথা মনে হইল; হাঁ, রাজুকে কাটিয়া নদী পার হইয়া শ্মশানেশ্বরীর আশ্রমে ঢুকিয়া ওই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কাটিবে। তাহার পর সে রওনা হইবে। আশ্রয়ও সে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। সেই অরণ্য আশ্রয়। খুন করিয়া ধরিবে সে নদীগর্ভের বালুপথ। নদী বড় ভাল। পাহাড় হইতে বাহির হইয়া বনে বনে প্রান্তরে প্রান্তরে সে চলে। দুই পাশে শরবন কাশবনের আড়াল কাটাইয়া তাহার পথ। তাহার মনে পড়িল, বেদে-জীবনের 'দেওতাদের কথা। বনে পাহাড়ে থাকেন দেওতারা, নদীতে থাকেন 'দেওমায়ীরা'। নদীপথ ধরিয়া সে গিয়া উঠিবে সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলভরা পাহাড়ে। কাপড় ছাড়িয়া লেংটি পরিবে। সেই পুরানো বুলিতে কথা বলিবে, দাড়ি-গোঁফ কামাইবে না, আবার গজাইবে। গায়ে সেই গন্ধ উঠিতে আরম্ভ করিবে। একদিন হয়তো সেই বেদিয়ার দলটার সঙ্গে দেখাও হইয়া যাইবে। বাস, খতম। ফিরিয়া যাইবে সে সেই অরণ্যের অন্ধকার বর্বরতম জীবনে। প্রয়োজন নাই তাহার এ জীবনে, এ গ্রামে নগরে সমাজে মানুষে কোন প্রয়োজন নাই তাহার।

হাঁ। আর কয়েকটা দিন সবুর কর। এক রাত্রে তিনটা মাথা লইবে সে—বাবু, রাজিয়া, সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীটাও তাহার দুশমন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কাল সন্ধ্যার সময় ফের লোকটার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, আজও সকালে দেখা হইয়াছে। পানু লোকটার সামনে মাথা তুলিতে পারে নাই। মিষ্টি মিষ্টি কথা কয়, মিষ্টি মিষ্টি হাসে। রাজিয়া কি—? হাঁ, হাঁ, তিন মাথা সে লইবে।

ঘরে ঢুকিয়া বল্লমটা লইয়া সে রওনা হইয়া গেল। বড় নদীর ধারে জঙ্গলে ঘেরা ভাঙা মসজিদের উপর কাঠের ধুনিতে আগুন জ্বলিতেছে, কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছে, বুড়া গাঁজা খাইতেছে, মদের বোতল গড়াগড়ি যাইতেছে; তাহার পায়ে পাতার মর্মর শব্দ উঠিবামাত্র আলোটা নিবিয়া যাইবে, আগুনটার উপর একটা গরুর জাব-খাওয়া ডাবা ঢাকা পড়িয়া আর দেখা যাইবে না। বুড়া অন্ধকারের মধ্যে নির্নিমেষ নেত্রে পিঙ্গল চক্ষুতারকা মেলিয়া চাহিয়া দেখিবে। বুড়ার পিঙ্গল চক্ষুতারকা অন্ধকারে শ্বাপদের চোখের তারার মত বড় হইয়া উঠিয়া জ্বলে।

চলিতে চলিতে পথে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। বাছুর ডাকিতেছে। গ্রামের উত্তর প্রান্তের ঘন বন-জঙ্গলের মধ্যে কোথায় একটা বাছুর ডাকিতেছে। কোন বাছুর? কাহার বাছুর?

পঁচিশ

বাছুরটা সেই সব্বনাশী এলোকেশীই বটে। রাজুবালা বাছুরটাকে ফিরাইয়া আনিতেছিল। অনাহারে পড়িয়া থাকার মত ক্ষোভের মধ্যেও সন্ধ্যা হইতেই তাহার বাছুরটার কথা মনে হইয়াছে। না মনে করিয়া উপায় ছিল না। খিড়কির দরজার মুখে অপরাহ্ণ হইতে এ পর্যন্ত ভাদু বাউরিনী তিনবার উঁকি মারিয়া গিয়াছে। রাজু উত্তরপাড়ার ভাদুর বাড়িতেই এলোকেশীকে তখন রাখিয়া গিয়াছিল। এ সেই ভাদু বাউরিনী, যাহার সঙ্গে রাজু গোপনে কারবার করে, যে একদিন পানুকে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। ভাদু দূতীগিরি করে, দুধ বেচিয়া থাকে, হাঁস আছে ডিম বিক্রী করে, আর করে দালালি—নিজের পাড়ার মেয়েদের থালা,

কাঁসার বাসন, রূপার দুই-এক পদ গহনা লইয়া মহাজন দেখিয়া বাঁধা দিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াও দেয়। রাজু ভাদুর মারফৎ গোপনে মহাজনী করে, ভাদুর বাড়িতে কয়েকটা হাঁসও কিনিয়া রাখিয়াছে, ডিম ও বাচ্চার আধা ভাগ ভাদুকে দেয়, তাহার বাধ্য লোক, তাঁবের মানুষও বটে। ঝোঁকের মাথায় ও-বেলায় যখন সে বাছুরটাকে ভাদুর বাড়িতে রাখে তখনই ভাদু বলিয়াছিল—আমাকে তুমি মেরে ফেলবা রাজুদিদি। খুনে মানুষের জ্যান্ত গরুর বাছুর কি করে ছাপিয়ে রাখব বল দেখি? জানতে পারলে মেরে হাড় ভেঙে দেবে, হয়তো ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।

রাজু চমকিয়া উঠিয়াছিল, কথাটা সে বুঝিয়াছিল। কথাটা নির্ভুল সত্য বলিয়াছে ভাদু। তা ছাড়া কয়দিন এমন ভাবে রক্ষা করিতে পারিবে সে? ভাদু বলিয়াছিল—তা তুমি এনেছ দিদি, রেখে যাও এ-বেলা। ও-বেলায় কিন্তু নিয়ে যেয়ো তুমি। আমার ভাই ঠাঁই-ঠুনো নাই। বোঝার ওপরে শাকের-আঁটি—পাতার কুটো রাখবার জায়গা নাই আমার।

রাজু তবুও তখন রাখিয়া গিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, থাক এ বেলাটা। ইতিমধ্যে সে চলিয়া যাইবে, যাইবার পথে বাবুদের অথবা সন্ন্যাসীকে বলিয়া যাইবে—গোহত্যা হবে, বাছুরটাকে বাঁচান।

কিন্তু তাহার পর অকস্মাৎ সব পাল্‌টাইয়া গেল। কি যে হইল, কেন যে এমন হইল সে কথা সে বুঝিল না, বুঝিতেও চাহিল না; একটা দুর্দম হৃদয়াবেগ তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। তাহার বাস্তব-বোধ, সকল বুদ্ধি—এমন কি সকল ভাল-মন্দ বিচারের প্রবৃত্তিও আবেগে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কঠিন সঙ্কল্প লইয়া সে পানুর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার সম্মুখে ভয়লেশশূন্য সহশক্তি লইয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। ক্রমে ক্রমে সে শক্তি কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া এমনই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাকে আঘাতে আঘাতে গুঁড়া করিয়া দেওয়া হয়তো চলিবে, কিন্তু তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়া, কি অবহেলায় ছুঁড়িয়া ফেলা চলিবে না। সে আজ যেন পানুকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেও পারিয়াছে। কেমন করিয়া জানি না, পানুর অভিপ্রায় আজ সে পাখী-মায়ের ডিমের খোলার ভিতরের ছানার নড়াচড়া ও ঠোঁটের ঠোকর বুঝিতে পারার মত অনুভব করিতে পারিতেছে। পানুর বুকের স্পন্দনের স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতা নদীর ঘাটে স্রোত এবং ঢেউয়ের মত রাজুর মনে স্পর্শ দিয়া চলিয়াছে, আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। সে বেশ বুঝিতেছে, ভীষণতম একটা কল্পনা পানুর বুকের স্পন্দনকে দ্রুততর করিতেছে; চোখকে, সঙ্কুচিত দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ-ভয়াল করিয়া তুলিতেছে, মুখের রেখাগুলিকে করিয়া তুলিয়াছে কুটিল, ক্রুর। আবার এলোকেশীর জন্য ব্যর্থ অনুসন্ধানে সারা দুপহরটা ফিরিয়া সন্ধ্যার আগে যখন পানু ফিরিল, তখন রাজু দেখিল, গভীর বেদনায় পানুর অন্তরটা সম্মুখের ওই রুক্ষ রসহীন টিলাটার বর্ষা-ঋতুর রূপের মত শ্যামল-কোমল হইয়া উঠিয়াছে, সে সবুজ শোভা ডাকিতেছে এলোকেশীকে। তখন তাহার চোখে জল আসিয়াছিল। তখন ইচ্ছাও হইয়াছিল, হাসিয়া আশ্বাস দিয়া তাহাকে বলে—আছে গো আছে। তোমার সব্বনাশী এলোকেশী আছে। কিন্তু মুহূর্তের জন্য তাহার অভিমানও হইয়াছিল। পর-মুহূর্তেই সেজ তাহার বিরুদ্ধে পানুর কাছে অভিযোগ করিল। পানু রক্তচক্ষু লইয়া তাহাকে শাসন করিতে আগাইয়া আসিল। রাজুও আবার কঠিন হইয়া সব সহিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

পানু ভয় পাইয়া প্রথম হার মানিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। রাজুর আবার হইল অভিমান। ঠিক এই সময়েই ভাদু আর একবার উঁকি মারিয়া দেখা দিয়া তাগিদ জানাইয়া গেল। ভাদুর উপরে খানিকটা রাগ করিয়াই রাজু উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ভাদু বলিল—নিয়ে যাও ভাই রাজুদিদি। যে চেঁচানো সারাটা দিন! আমি তো ভয়ে

সারা, কখন শুনতে পেয়ে থেঁটে নিয়ে আসবে তোমার আয়ান ঘোষ!

রাজু কোন কথা না বলিয়া বাছুরটার গলায় আঁচল বাঁধিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল!

ভাদু তাহাকে পিছন হইতে ডাকিল—রাজুদিদি!

ভুরু কুঁচকাইয়া রাজু বলিল—কি?

ভাদু কাছে আসিয়া কেরোসিনের ডিবেটা তুলিয়া তাহার মুখের সামনে ধরিল, সবিস্ময়ে বলিল—রাজুদিদি!

—কেন? বল না কি বলছিস?

—কি হয়েছে ভাই তোমার?

—কি হবে?

—কি হবে? কপালে চাবুকের দাগ, চোখের চারপাশে কালি পড়েছে। তবু চোখ দুটো ডবডব করছে ভরা পুকুরের মত। খুব কেঁদেছ? সারাদিন কেঁদেছ, নয়?

রাজু বলিল—আমার শরীরটা ভাল নয় ভাদু। তোর সঙ্গে রসের কথা কইবার আমার সাধ্যি নাই আজ।

ভাদু তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।—কি হয়েছে ভাই? তিনবার গেলাম—তিনবারই দেখলাম শুয়ে রয়েছ। মেরেছে?

রাজু হাসিয়া বাঁহাত দিয়া ডান বাহুর উপরের কাপড় সরাইয়া দেখাইয়া বলিল—এই দেখ।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা কাটা ডান হাতখানা দেখাইল।

গৌরবর্ণ বাহুটার উপর ঘননীল কালসিটে পড়িয়াছে, ফুলিয়া উঠিয়াছে। রাজু ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিল, বলিল—আবার বলে, খুন করব। আমি হেঁসোটো দিলাম হাতে। বললাম—কর খুন। তখন পিছিয়ে গেল। আমি দেখব ভাদু, ওকে আমি দেখব—

শিহরিয়া ভাদু বলিল—না না দিদি, ওকে বিশ্বাস নাই।

উপেক্ষা করিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে ঠোঁট দুইটা উল্টাইয়া দিয়া রাজু চলিয়া গেল। বাছুরটা এতক্ষণ বেশ ছিল, রাজুর হাত চাটিতেছিল, কিন্তু গলায় টান পড়িতেই খোঁড়া পা লইয়া দ্রুত চলিবার শক্তির অভাবে চীৎকার শুরু করিয়া দিল।

ও-বেলায় রাজু সব্বনাশীকে কোলে তুলিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু সারাদিন অনাহারে থাকিয়া এবং নির্যাতন সহ্য করিয়া শরীরটা এ-বেলায় ভাল নাই। নহিলে কোলেই তুলিয়া লইত। কিন্তু ওটাও যাইবে না, যাইতে পারিবে না। বেচারী। অগত্যা রাজু বাছুরটাকে কোলে তুলিয়া লইল। ঠিক সেই মুহূর্তেই পান্নু সেই পাঁচ হাত লম্বা বল্লমটা হাতে অন্ধকারের মধ্যে প্রেতের মত তাহার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—হুঁ। এই যে! সঙ্গে সঙ্গে 'আ' বলিয়া একটা পাশবিক চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজুও তাহাকে মুহূর্তের মধ্যেই চিনিয়াছিল। কিন্তু সে বিন্দুমাত্রও চঞ্চল হইল না। স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কোথা যাচ্ছ তুমি?

সে কথার জবাব না দিয়া পান্নু বলিল—তুই সারাদিন উপোস করে আছিস, নয়? হুঁ। উপোস করে বাছুর ঘাড়ে করতে ক্ষ্যামতা থাকে? শালী!

রাজু যেমন ভাদুর কথায় হাসিয়াছিল, ঠোঁট উল্টাইয়া তেমনি বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসিল।

পান্নু বলিল—আ। নোড়া দিয়ে দাঁত ভেঙে ঠোঁট ছেঁচে এই হাসি তোমার বার করব। হারামজাদী! শয়তানী!

—তা ক'রো। রাজু আবার হাসিল। কিন্তু তুমি যাবে কোথা? এই সন্ধ্যের সময়?

গলায় চেপে কথা বলছ তুমি ?

পান্নু কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া গেল। তার পর উত্তরে প্রশ্ন করিল—বাছুর পেলি কোথা ? কোথা ছিল ?

রাজু বিন্দুমাত্র ভয় না করিয়া বলিল—গোহত্যের ভয়ে ওকে আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম।

পান্নু সবিস্ময়ে বলিল—গোহত্যে ? ওকে আমি মারতাম ?

—না হয় কসাইকে বেচতে। আজ তোমাকে বিশ্বাস ছিল না। কথা শেষ করিয়া বাছুরটাকে কোল হইতে নামাইল ; বাঁ হাতে পান্নুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—কোথা যাবে তুমি ?

গম্ভীর স্বরে পান্নু বলিল—হাত ছাড়।

—না, কোথা যাবে তুমি ?

—যাব সে এক জায়গা।

—জায়গা ছাড়া মানুষ যায় না। কোন জায়গা ? বল। তোমার গতিক আমার ভাল লাগছে না। বল তুমি।

পান্নু বলিল—তোর মরণ-পাখা উঠেছে রাজু—তোর মরণ-পাখা উঠেছে।

—উঠেছে। পাখায় আগুন ধরিয়ে তোমাকে পুড়িয়ে ছারখার করব আমি। বল তুমি কোথা যাবে ? কাকে খুন করতে যাবে ?

পান্নু চমকিয়া উঠিল।

রাজু বলিল—বল ?

পান্নু এবার বলিল—হাঁ হাঁ। খুন—খুন। তিন খুন করব আমি। তিন খুন।

রাজু শিহরিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া উঠিল—না। যেতে পাবে না তুমি। আমাকে খুন না করে, কই, যাও তো তুমি দেখি !

—হাঁ—হাঁ। তুকেও বাদ দিব না। তুইও বাদ যাবি না। হাঁ হাঁ, আগে লিব ওই বাবুর মাথা। অন্ধকারের মধ্যে পান্নুর চোখ জ্বলিয়া উঠিল।

—না।

—হাঁ হাঁ। তারপর লিব তোর মাথা। অন্ধকারের মধ্যে পান্নুর সাদা দাঁত ঝকমক করিয়া উঠিল।

রাজু বলিল—সব আগে আমাকে খুন করতে হবে তোমাকে। নইলে—

বাধা দিয়া পান্নু বলিল—তারপরেতে লিব ওই সন্ন্যাসী ঠাকুরের মাথা।

রাজু ঘাড় নাড়িল—না। সে হবে না। আমাকে খুন না করে—

পান্নু হাসিয়া উঠিল। বলিল—তবে বাবুর বাদে লিব ওই সন্ন্যাসীর মাথা। তারপর তু। ছুটা মাথা তোর সামনে রাখব, তু দেখবি। তারপর তুকে কাটব। সে ঝাঁকি দিয়া রাজুর হাত ছাড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

রাজু বলিল—শোন। ফের। না ফিরলে সারা জীবন আফসোস করবে তুমি। শোন।

পান্নু ফিরিয়া আসিল। নিষ্ঠুর ভাবে কৌতুক করিবার জন্যই বোধ হয় ফিরিয়া আসিল।

রাজু তাহার হাত ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পান্নু অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—হাত ছাড়। তুকে কাটব না। ছাড়।

—না। তুমি আমাকে কাট। কিন্তু এ পাপ তুমি করতে পাবে না।

—পাপ? দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া পানু বলিল—পাপ? বাবু আমাকে চাবুক মেরে, আমাকে জুতো মেলে, আমার জরিমানা করলে, তাতে পাপ হল না? আমার পাপ হবে? পাপ! তার পাপ নাই, আমার পাপ!

—সে পাপের সাজা ভগবান দেবেন—

—নেহি নেহি। আমি দিব। আমার নিজের হাতে আমি দিব। কোন হ্যায় ভগবান? নেহি মানতা হ্যায়!

—না—না—না। চীৎকার করিয়া উঠিল রাজিয়া। সেই প্রাণ-ফাটানো 'না' বলিয়া চীৎকার।

পানু পশুর মত একটা ক্রুদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল। বোধ করি রাজুর চীৎকারকে নিজের চীৎকার দিয়া চাপিয়া দিতে চাহিল।

রাজু হঠাৎ পাগলের মত সেই মাঠের মধ্যেই তাহার পায়ে মাথা কুটিতে লাগিল। বর্বর পানুও এবার ক্ষেপিয়া গেল। সে রাজুর মাথার উপরে লাথির উপর লাথি মারিতে শুরু করিল। গোটা কয়েক লাথি মারিয়া সে হনহন করিয়া চলিয়া গেল। পিছন ফিরিয়া একবার চাহিল না পর্যন্ত।

কিছুক্ষণ পর ভাদু আসিয়া রাজুকে তুলিল। কপাল কাটিয়া গিয়াছে, নাক দিয়াও রক্ত গড়াইতেছে, রাজুর কালো চুলের রাশি খুলিয়া ধূলায় বিপর্যস্ত হইয়া ধূসর হইয়া উঠিয়াছে। চীৎকার শুনিয়া ভাদু আসিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া সব দেখিয়াছে।

অন্য দিন হইলে রাজু বোধ হয় লজ্জায় মরিয়া যাইত। কিন্তু আজ যেন রাজু সৃষ্টিছাড়া মানুষে পরিণত হইয়াছে। সে একদৃষ্টে পানুর গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভাদু বলিল—রাজুদিদি!

রাজু উত্তর দিল না।

ভাদু বলিল—রাজুদিদি, তুমি চলে যাও; তুমি চলে যাও। ছি-ছি-ছি, কপালের নেকন তোমার! কতজন সাধছে—ওই গাঁয়ের ময়রা জমাদার কতদিন আমাকে বলে, রাজু আসে তো পাল্‌কি পাঠিয়ে নিয়ে যাব।

রাজু এ কথারও জবাব দিল না, নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে সাদা কাপড় পরা রাজু কাপড় ঝাড়িল বার দুই; কাপড়ের ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া অন্ধকারকে গভীর করিয়া তুলিল। পিছনে যেন একটা আবরণ তুলিয়া দিয়াই সে চলিয়া গেল। ভাদু তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া জিভ কাটিয়া বলিল—মরণ! এই বয়সে মজলে তুমি! হায় হায় হায়!

সেও চলিয়া গেল আপনার বাড়ির দিকে।

এলোদেশী দূরে উত্তর মাঠে ডাকিতেছিল। খোঁড়াইয়া পা টানিতে টানিতে সে চলিয়াছে। রাজু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াই চলিয়া গিয়াছে। মনের বিভ্রান্ত অবস্থায় তাহার কথা বোধ করি মনে উঠে নাই। বাছুরটা মাঠেই ঘুরিতেছে।

পানু দাঁড়াইল। কি বিপদ! রাজু ছাড়িল তো এটা সঙ্গ ধরিয়াছে।' তাহাকে ডাকিতে ডাকিতে আসিতেছে। সামান্য ক্ষণ দাঁড়াইয়া সে আবার চলিতে শুরু করিল। থাক, পিছনে পড়িয়া থাক। এই নির্জন মাঠে এই রাত্রিকালে উহার নিয়তি ঘনাইয়াছে। তাহার উপর পানুর কি হাত আছে! শেয়ালের পালের নজরে পড়ার অপেক্ষা। নজরে পড়ারও প্রয়োজন নাই, যে মরণ-ডাক ও নিজেই ডাকিতেছে, সেই ডাক শুনিয়া এতক্ষণ মাঠের মধ্যে এখানে

ওখানে শেয়ালগুলো কান খাড়া করিয়া দিক লক্ষ্য করিতে শুরু করিয়া দিয়াছে। সে চলিতে শুরু করিল। মরুক, ওটা মরুক।

পানুর অনুমান মিথ্যা নয়। একটা চতুষ্পদ তাহার পাশ দিয়াই ছুটিয়া গেল। বাছুরটার ডাকেরও বিরাম নাই। রাত্রেই ফিরিবার পথে পানু একটু খুঁজিলেই কঙ্কালটা দেখিতে পাইবে। আঃ—ছি! ছি! ছি! সে আবার দাঁড়াইল। এবার ফিরিল।

তাহার চোখের উপর ভাসিতেছে বাছুরটার চোখের সেই দৃষ্টি। আঃ—ছি-ছি-ছি! আজ রাজুর হাতে যখন চিমটি কাটিয়া ধরিয়াছিল, তখন ঠিক এমনি চাহনি চাহিয়াছিল সে। তারপর চোখ মুদিয়াছিল। তাহার চোখে তখন আগুন জ্বলিতেছিল। এই অন্ধকারের মাঠের মধ্যে আবার সেই চাহনি চাহিয়াছে রাজু। আঃ—ছি-ছি-ছি!

দূরে কয়েকটা শেয়াল ছুটিতেছে। বাছুরটা চীৎকার করিতেছে। পানু ছুটিল। একবার বল্লমটা উঠাইল পাশেই একটা ছুটন্ত শেয়ালের দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই নামাইয়া লইল। খাদ্য আর খাদক। বনের পশু। পাইলেই খাইবে। না খাইলে পাইবে কোথায়? এই তো বিধান। উহারা বাবু নয়, ঠাকুর নয়। শেয়ালে শেয়াল ধরিয়া খায় না। মানুষে মানুষের রক্ত চোষে।

এলোকেশী মাঠের উঁচু আল-পথ হইতে পড়িয়া গিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দূরে দূরে অন্ধকারের মধ্যে ছায়ার মত কয়েকটা ক্ষিপ্রগতি চতুষ্পদ ঘুরিতেছে। বোধ হয় আগাইয়াই আসিতেছিল। পানুকে দেখিয়া থামিয়া গেল। এলোকেশীও ভয় পাইয়াছিল। সে তারস্বরে ডাকিয়া উঠিল। পানু লেজে ধরিয়া ওটাকে খাড়া করিল। বাছুরটা এবার ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিল। প্রচণ্ড বিরক্তির সহিত সে নির্বোধের মতই চারিদিকে তাকাইল। বাছুরটাকে কোথায় পৌঁছাইয়া দিয়া সে রওনা হইতে পারে। পশ্চিমে পূর্বে উত্তরে অন্ধকারের মধ্যে সব একাকার হইয়া যেন মিশিয়া মিলাইয়া গিয়াছে। কতদূরে যে গ্রামবনরেখা তাহা বুঝাই যায় না। দক্ষিণে অদূরে তাহার গ্রাম। পশ্চিম-দক্ষিণ গ্রামপ্রান্তে ওই তাহার বাগানটি দেখা যাইতেছে। ওই তাহার পাশে টিলাটা। সে বাছুরটার পাশে বসিল। বাছুরটার মত আর কোন জীব সে পৃথিবীতে দেখে নাই। যে নিষ্ঠুর প্রহার সে তাহাকে করিয়াছিল, তাহার পরই এমনভাবে হাত চাটিয়া ভালবাসা জানাইতে কেহ পারে বলিয়া পানুর ধারণা নাই। কিন্তু আজ সে ভালবাসাই বিপদে ফেলিয়াছে তাহাকে।

এই অবসরটুকু পাইয়াই বাছুরটা তাহার পিঠ চাটিতে শুরু করিয়াছে। পানু গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। চল হারামজাদী, চল।

বাছুরটাকে ঘাড়ে তুলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।—চল।

খানিকটা দূর আসিয়াই সে আতঙ্কে বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

আগুন! লকলক করিয়া আগুন জ্বলিতেছে—নাচিতেছে! এ কি কোন শুকনা শরবনে আগুন লাগিয়াছে? ওঃ, দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে! দক্ষিণ পশ্চিম কোণে টিলাটার ধারে। তাহার মধ্যে তাহার ঘর। লকলক করিয়া শিখা উঠিয়া নাচিতেছে। বৈশাখ মাস, বৈশাখের আগুন শিবের কপালের আগুন। অন্ধকার লাল হইয়াছে। বাতাসে এখান পর্যন্ত উত্তাপ আসিতেছে। কিন্তু এ কি হইল! তাহার ঘরে—তাহার টিনের ঘরে—আগুন! খড়ের গোয়াল আছে। আঁটি-বাঁধা শর আছে। সেইখানে আগুন লাগিয়াছে নিশ্চয়। আগুন লাগাইয়া

দিয়াছে। কে ? কে ? কে ? রাজু ? রাজু ? রাজু ? শয়তানী রাজু আগুন লাগাইয়া দিয়া শোধ লইয়াছে ? ওঃ! গ্রামপ্রান্তে বাছুরটাকে ফেলিয়া দিয়া উন্মত্তের মত বল্লম হাতে সে ছুটিল। উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজুকে সে হাতে পায়ে বাঁধিয়া ওই আগুনে পুড়াইয়া মারিবে। সে ছুটিল। ছুটিল। ছুটিল।

উঃ, কি আগুন! উঃ, বৈশাখের আগুন! দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

—আমি জানতাম। আমি জানতাম। আমি জানতাম। আঃ—আঃ—আঃ, সর্বনাশী বুকের আগুন গায়ে লাগাল ? ভাদু বাউরিনী ছুটিতেছে তাহার সামনে, আগে আগে ছুটিয়া চলিয়াছে ভাদু।

আগুনটা আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। এ কি হইল ?

ভাদুকে অতিক্রম করিয়া পানু ঘরে আসিয়া পৌছিল। দুই-চারিজন লোক জমিয়াছে। আরও লোক আসিতেছে, সেজবউ বুক চাপড়াইতেছে—ওগো দিদি, কি করলি গো ? ওগো দিদি গো।

বড় ছেলেটা চেঁচাইতেছে—ওগো মেজমা গো, ওগো মেজমা, কেনে পুড়লি গো ?

পানু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাজু ? রাজু পুড়িয়াছে ? পুড়িতেছে ? রাজু রাজু ? বিলাসিনী রাজু ? চুরণী রাজু ? ভেস্কিদারণী রাজু ? রাজু! রাজু! ঘরে আগুন লাগে নাই, শরের আঁটিতেও নয়! রাজু আগুন লাগাইয়াছে নিজের গায়ের কাপড়ে। কেরোসিন ঢালিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পুড়িতেছে। চীৎকার করে নাই। নিঃশব্দে পুড়িতেছে।

ভাদু এবং কয়েকজনে রাজুর জ্বলন্ত কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিতেছিল। সেজবউ হঠাৎ সেই জ্বলন্ত কাপড়ের টুকরা কুড়াইয়া লইয়া পাগলের মতই পানুর গায়ে ছুঁড়িয়া দিল—পোড় পোড়, তুইও পুড়ে মর।

•

পানু পুড়িল না, কিন্তু উত্তাপে পাথরের মত সশব্দে ফাটিয়া মাটির উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। একটা মর্মান্তিক চীৎকার করিয়া উঠিল পানু।

সেই বিচিত্র চীৎকার। যাহার অর্থ বুধন বুঝে নাই, পানু নিজে বুঝে না, যে চীৎকারে উল্লাস নাই, ক্রোধ নাই। যে চীৎকারে রাজু বিস্মিত হইত, সেই চীৎকার।

ভাদু আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—রাক্ষসকে ভালবেসে পুড়ে মলি শেষে ? রাজু—রাজু—রাজুদিদি!

গাঁয়ের লোক ভাঙিয়া আসিল। পানুর উপর অজস্র কঠিন নিষ্ঠুর অভিসম্পাত বর্ষণ করিল। তাহাকে কেহ আজ ভয় করিল না, পানুর ঘরের কথা বলিতে অনধিকার চর্চা মনে করিল না। সুদীর্ঘ দিন এই কথাটারই গণ্ডী টানিয়া আপনার ঘরে পানু রাজুকে, সেজবউকে, ছেলেকে, মহিষকে, কুকুরকে—ইচ্ছামত ঠেঙাইয়াছে, নির্যাতন করিয়াছে, কেহ কিছু বলিতে সাহস করে নাই। যদি কেহ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তবে তাহাকেও দু-চার ঘা দিয়াছে—অন্তত ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া তো দিয়াছেই।

কয়েকজন বলিল—ধর হারামজাদা রাক্ষসকে, হাতে পায়ে বেঁধে যে কেরোসিনটা আছে এখনও, গায়ে ঢেলে দাও—ওই আগুন ধরিয়ে দাও।

ভাদু সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। বলিয়াছে—লাথির উপরে লাথি মাথার ওপরে। দোষ কি ? না, ও বলে বাবু আমাকে চাবুক মেরেছে, জরিমানা করেছে আমি তাকে খুন

করব, নমোনারায়ণ-বাবাকে খুন করব। রাজুদিদি বলেছে, না, তা পাবে না, দেব না আমি তোমাকে সে পাপ করতে। এই বলে—তবে তোকেও খুন করব। তিন খুন করেঙ্গা—বলে রাক্ষসের মত দাঁত কটমট করে উঠল।

সমবেত জনতা প্রতিবাদে ক্রোধে ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিতেছিল। একজন বলিল—থানায় খবর দাও। ভাদু, তোকে বলতে হবে সব কথা। তুই নিজে কানে শুনেছিস।

পান্নু কোন কথা যেন শুনিতেই পাইতেছে না। একবার সে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিল—তাহার পর উঠিয়া রাজুর পোড়া দেহখানার কাছে বসিয়া এক বিচিত্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে শুধু চিবুকটা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বুকের মধ্যে একটা কিসের পাথার যেন উতল-পাতল করিতেছে। গলার কাছে একটা ডাক যেন পথ না পাইয়া সেইখানেই মাথা কুটিয়া মরিতেছে। রাজু, রাজিয়া, রাজু, রাজু রে!

ভাদু-আক্ষেপ করিতেছিল—আমি জানতাম, এমুনি একটা কিছু হবে—তা জানতাম আমি। রাজুদিদির ভাবগতিক দেখে বুঝেছিলাম আমি। বছরখানেক থেকেই অসম্ভব মতিগতি হয়েছিল। ওই রূপের মেয়ে, ওর ঘরে সাজে, না, থাকে? রোগের সময় দুঃসময়ে ঠাঁই দিয়েছিল—তাই থাকা। বলত আমাকে। কিন্তু বছরখানেক কি যে হল? নেকন। নেকন ছাড়া কি? নইলে রাজুকে নাকি ওই রাক্ষসের টানে পড়তে হয়, ওই পিশাচে নাকি মজে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—জিনিস যে বড় খারাপ। ও ছুঁলে আর রক্ষে নাই। দেখলাম অনেক। চোখের নেশা, নতুনের নেশা, দু দিনের নেশা, দশ দিনের নেশা, কত দেখলাম। কিন্তু এই নেশা—রাজুকে যা পেলে শেষকালে—

কে একজন তাহাকে ধমক দিল—কি আবোল-তাবোল বকছিস?

সে হাসিয়া বলিল—ভালবাসা গো, ভালবাসা। আঃ, ভালবেসে পুড়ে মরল ছুঁড়ী!

ভাদুর কথাই হয়তো সত্য। ইহার মধ্যে আর হয়তো নাই, ওই কথাই সত্য। ভালবাসা গো, ভালবাসিয়া পুড়িয়া মরিল রাই। নহিলে কি কেহ এমন অবহেলাভরে আগুনের জ্বালা দেহে ধরাইয়া নিজেকে পুড়াইয়া দিতে পারে? ভাল না বাসিলে রাজু কি এমন নির্বোধ হয় যে, নিজে মরিয়া পান্নুর মত পাষণ্ডকে দুঃখ দিবার, কাঁদাইবার, কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার কল্পনা করে? নিজেকে দুঃখ দিলে ভালবাসার জন দুঃখ পাইবে—এ বিচিত্র আবিষ্কার, ওই বিচিত্র বস্তুতে যাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, পৃথিবীতে একমাত্র সে-ই পারে এমন অবহেলাভরে নিজেকে ছাই করিয়া ফেলিতে। এই দুর্লভ সামগ্রী পাওয়ার এমন নিঃসংশয় প্রমাণ দিয়া যে এমনি করিয়া মরে, আশ্চর্যের কথা—তাহার জন্য গোটা বাস্তব সংসারের হিসাব-নিকাশ-সর্বস্ব মানুষ কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হয়; ধন-সম্পদ, রাজ্য-পাট পর্যন্ত তুচ্ছ হইয়া যায়। বাস্তব সংসারের মানুষের অন্তরে এই তৃষ্ণা হাহাকার করিতেছে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত!

গোটা গাঁয়ের লোক উত্তেজনা ভুলিয়া, পান্নুর উপর ক্রোধ ভুলিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। কত ফোঁটা অশ্রুজল যে পৃথিবীর বুকে সেদিন পড়িল তাহার হিসাব নাই।

পান্নু ঠিক তেমনিভাবে বসিয়া আছে। রাজুর পাশে—রাজুর দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে।

পুলিস আসিয়া গেল।

পান্নু দারোগার মুখের দিকে চাহিল। আজ আর তাহার এক বিন্দু ভয় নাই, ক্রোধ নাই। শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বোধ হয় এই প্রথম দীর্ঘনিশ্বাস।

তিমিরময়ী রাত্রি, দীর্ঘ—সুদীর্ঘ। যেন একটা যুগ, একটা শতাব্দী, না, তাহারও চেয়ে দীর্ঘ—

সহস্রাব্দ—বহু সহস্রাব্দের মত দীর্ঘ। পানুর তাই মনে হইল। উপরে কৃষ্ণপক্ষের আকাশে কত তারা; কয়টা তারা খসিয়া গেল; পানু রাত্রির আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

দারোগা সুরতহাল রিপোর্ট লিখিতেছেন।

নমোনারায়ণ-বাবা লিখাইতেছেন।—খবর পাইয়া তিনিও আসিয়াছিলেন। পানু একবার নড়িল না পর্যন্ত।

আকাশের দিকে চাহিয়া সে ক্ষণ গনিতেছে; চোখ দিয়া অনর্গল জল পড়িতেছে। এই অসহনীয় দীর্ঘ রাত্রির কখন শেষ হইবে, তাহারই জন্ত 'সে প্রতীক্ষা করিতেছে; সর্বশক্তি-নিঃশেষিত অসহায় দুর্বলের মতই সে প্রতীক্ষা করিতেছে।

ছাব্বিশ

পানুর কাছে রাত্রিটা সত্য সত্যই দীর্ঘ, সুদীর্ঘ রাত্রি। শুধুই কি তাই? সে কী রাত্রি—সে শুধু পানুই জানে। জন্ম হইতে জন্মান্তরের অন্তর্বর্তীকালের মত দীর্ঘ উদ্বেগময়; অমোঘ দণ্ডপাতের যাতনায় দুঃখে জর্জর, বিমূঢ়; কালান্তরের বিপ্লব রাত্রির মত জটিল, বিশৃঙ্খল। সুদীর্ঘ রাত্রির শেষ হইল। পানু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

রাজুর মৃতদেহের উপর তাহারই সবচেয়ে প্রিয় শাড়ীখানা ঢাকা দেওয়া হইয়াছিল। সূর্যালোক আসিয়া আবৃত দেহের উপর পড়িতেই, পানু ঢাকা খুলিয়া রাজুর মুখটা ভাল করিয়া দেখিল। ম্লান হাসিয়া রাজুকেই প্রশ্ন করিল—হাসছিস? আমার দুঃখ দেখে? আবরণটা আবার টানিয়া ঢাকা দিল রাজুর মুখের উপর।

ছেলেটা সবিস্ময়ে পানুর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, সেজবউও অবাক হইয়া গিয়াছে। পানুকে চেনা যাইতেছে না। কত—কত বয়স যে হইয়াছে অনুমান করা যায় না, পানুর বয়সের যেন গাছ-পাথর নাই।

সন্ন্যাসী সমস্ত রাত্রিই ছিলেন। তিনিই সুরতহাল তদন্ত শেষ করাইয়া দারোগার কাছে শবের শেষকৃত্যের অনুমতি লইয়াছেন। পানু বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী,—সেই অনুযায়ী সমাধি দিবার ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। সকাল হইতেই তিনি বলিলেন—আমি চলি বাবা।

পানু শুধু সজল চক্ষে তাঁহার দিকে তাকাইল। কোন কথা বলিতে পারিল না। বাবাজী চলিয়া গেলেন।

গ্রামে ঘর-তিনেক বৈষ্ণব আছে; বাবাজীর ব্যবস্থায় তাহারা সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। খোল বাজাইয়া নামসংকীর্তন শুরু হইল। সামনের টিলাটায় রাত্রেই সমাধি খোঁড়া হইয়াছে। ওইখানেই রাজুর সমাধি হইবে। শবদেহ পানু একাই বহিল, আর কাহাকেও প্রয়োজন হইল না, পানু রাজুকে তাহার দুই বাহুর উপর শোয়াইয়া বুকের কাছে ধরিয়া বলিল—চল।

সমাধি দিয়া স্নান করিয়া সে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। রাত্রি প্রহর-খানেকের পর সে ঘর হইতে বাহিরে আসিল। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গিয়া রাজুর সমাধির পাশে বসিল। সকালে আসিয়া আবার ঘরে ঢুকিল।

তাহার পর কত দিন চলিয়া গিয়াছে। অনেক দিন, বৎসর দুয়েকেরও বেশী।

শ্মশানেশ্বরী মায়ের আশ্রমে নমোনারায়ণ-বাবার সম্মুখে পানু সেদিন আসিয়া বসিল।

বাবাজী স্মিতহাসি হাসিয়া বলিলেন—এস।

পানু তাঁহাকে প্রণাম করিল, হাত জোড় করিয়া বলিল—তোমার অনুমতি নিতে এলাম।

আশ্চর্য—পরমাশ্চর্য! এ কণ্ঠস্বর পানুর সে কণ্ঠস্বর নয়। এ ভাষা সে ভাষা নয়। স্বরের মধ্যে সঙ্গীতের সুর—ভাষায় ভালবাসার লালিত্য। শুধু স্বর নয়—তাহার সর্বাঙ্গটাই যেন আগেকার পানুর নয়। এমন পরিবর্তন কেমন করিয়া ঘটিল, কি করিয়া ঘটিল—কেহ বুঝিতে পারে না, শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হয় লোকে। তাহার দেহবর্ণে রূপান্তর ঘটিয়াছে—কালো রঙ গৌরবর্ণ হয় নাই, কিন্তু একটি পাণ্ডুর-শ্রী দেখা দিয়াছে। তাহার চামড়া শিথিল হয় নাই, কিন্তু সে কর্কশতা নাই—নরম হইয়াছে। সারা অবয়বটাই যেন ভাঙা-চোরা হইয়া গিয়াছে। চোয়ালের সে উদ্ধত কঠোর হাড় দুইটা ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বিশীর্ণ মুখে মোটা নাকটা পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। পানুর চোখে শান্ত দৃষ্টি, একটি বিচিত্র আভাস তাহাতে দেখা যায়—মনে হয় সজল একটি স্তর অহরহ টলমল করিতেছে। পানুর গলায় তুলসীকাঠের মালা, নাকে কপালে তিলক ;—সে পানু যেন এই জন্মেই এক অভিনব গর্ভবাস অতিক্রম করিয়া জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

এই কিছুদিন পূর্বে। একটি বিশাল প্রৌঢ় আসিয়া তাহার দোকানের সামনে দাঁড়াইল। স্থির দৃষ্টিতে সে পানুর দোকান ও পানুর দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। পানু তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিল। তাহার বাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছিল, পানু এই শিক-ঘেরা বারান্দার পরিসরের সংকীর্ণতার সুবিধায় একা তাহার হেঁসোটা লইয়া লড়িয়া তাহাদের হঠাইয়া দিয়াছিল। সামনে ছিল যে লোকটা, অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া সে হেঁসোর কোপ হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্ম হাত তুলিয়াছিল, হেঁসোখানা ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। হেঁসোর কোপে তাহার তিনটি আঙুল বিসর্জন দিয়া সে প্রাণে বাঁচিয়াছিল বটে, কিন্তু ওই আঙুল-কাটার জন্ম ধরা-পড়া এড়াইতে পারে নাই। লোকটার পাঁচ বৎসর জেল হইয়াছিল। এ সেই লোক।

পানু রামায়ণ পড়িতেছিল। লোকটিকে সে ডাকিল। লোকটি তাহার কাছে আসিয়া বলিল—তুমি কি তার ভাই? সে কোথা?

পানু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিয়া বলিয়াছিল—সে নাই।

—মরেছে? আঃ! লোকটি মা-কালীর জয় ঘোষণা করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

পানু নিজেও জানে এ তার জন্মান্তর। লোকেও তাই বলে। নমোনারায়ণ-বাবাও তাই বলেন। বলেন—পুরাণের গল্প জান বাবা? সমুদ্র মন্থন হল, তাতে শেষে উঠল হলাহল—বিষ। শিব সেই বিষ অমৃতের মত পান করলেন; পান করেই ঢলে পড়লেন। তখন শিবানী এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে স্ত্রী হয়েও নিজের স্তন পান করালেন। স্তনে ছিল অমৃত। শিব চেতনা ফিরে পেলেন। সেও তো এক জন্মান্তর বাবা। প্রাণকৃষ্ণের আমার জন্মান্তর তেমনি রাজু বেটীর মধ্যে। ওরা তো সামান্য নয় বাবা। শিবাণী-ব্রহ্মাণী-বৈষ্ণবী-রাধা-কালী-জগদ্ধাত্রী—সবারই একটু একটু ওদের মধ্যে আছে যে।

নমোনারায়ণ-বাবার কাছে পানু দীক্ষা লইয়াছে। তাঁহার এত সব তত্ত্বকথা সে বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চায়ও না। তবে রাজুর জীবনের মধ্যেই যে তাহার পুনর্জন্ম হইয়াছে, এ কথার মত সত্য আর কি আছে? তাহার চেয়ে এ কথা বেশী কে জানে, কে বুঝে? সে আপন মনেই কথাটা ভাবে, অনুভব করিয়া ঘাড় নাড়ে। চোখ দিয়া জলও গড়াইয়া পড়ে। মনে পড়ে, সে কি কষ্ট, সে কি যন্ত্রণা!

দিনের পর দিন অন্ধকার ঘরে সে কাটাইয়াছে; রাত্রির অন্ধকারে বসিয়া থাকিত রাজুর

সমাধির পাশে। রাজুর মৃত্যু-রাত্রির তিমিরময়ী স্মৃতিকে দীর্ঘ হইতে সুদীর্ঘ করিয়া চলিয়াছিল। সেজবউ বলিত—ক্ষেপিয়া গিয়াছে। সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিল, পানুর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ একদিন।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, আলো ফুটিতেছে, রাজুর সমাধি হইতে পানু ফিরিতেছে ঘরে, তাহার চোখে পড়িল সামনের সড়ক দিয়া সারি সারি লোক চলিতেছে। মেয়ে-পুরুষ-বালক দলে দলে চলিতেছে; কাঁধে কোদাল মাথায় ঝুড়ি। কলরব করিতে করিতে চলিয়াছে। নমোনারায়ণ-বাবার সেই নদীর বাঁধ বাঁধার কাজ শুরু হইবে আজ। অন্তত দশ হাজার লোকের কোদাল ঝুড়ি চারিদিন পাড়িতে হইবে, তবে সে বাঁধ হইবে। সেই বাঁধ। মানুষের সারি চলিয়াছে, তাহার যেন আর শেষ নাই। দীর্ঘদিন পরে আজ সে কোদাল লইয়া বাহিরে আসিয়া সেজবউ এবং বড় ছেলেকে বলিল—চল, ঝুড়ি নিয়ে চল। দীর্ঘকাল পরে সূর্যালোকিত নদীর ধারে মানুষের কর্মসমারোহের মধ্যে মিশিয়া যেন ঐ নদীর তটপ্রান্তে নূতন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইল।

পানু কাজ করিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহার পিঠের উপর হাত রাখিলেন। পানু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সন্ন্যাসী তাহার পিঠের সেই বেতের দাগের উপর হাত বুলাইয়া বলিলেন—গর্ভবাস শেষ হল বাবা?

পানু কথাটা বুঝিল না। শুধু কাঁদিল। সন্ন্যাসী বলিলেন—কাজ কর বাবা। নূতন জন্ম হয়েছে—কাজ কর।

সন্ধ্যায় পানু শ্মশানেশ্বরী আশ্রমে গিয়া উঠিল। বলিল—রাজুকে ফিরে দিতে পার বাবা?

সন্ন্যাসী তাহার সারা অঙ্গে শুধু স্নেহের স্পর্শ বুলাইয়া দিলেন। কথা বলিলেন না।

পানু তাহার দুইটি হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—বাবা!

সন্ন্যাসী বলিলেন—না বাবা। কেউ পারে কি-না জানি না, তবে আমি পারি না।

পানু কিন্তু ছাড়িল না। দিনের পর দিন নমোনারায়ণ-বাবার কাছে যাওয়া-আসা শুরু করিল। নমোনারায়ণ-বাবা তাহাকে গান শুনাইতেন। পানুর মনে পড়িত, রাজু গোয়ালঘরে ভাঁড়ার-ঘরে আপন মনে গুন গুন করিয়া গান করিত। গান শুনিয়া সে কাঁদিত। সেই তাহার দীক্ষা।

পানু নিজেও আজকাল মোটা গলায় গান গায়। কণ্ঠস্বর তো আর সে কণ্ঠস্বর নাই তাহার। বাবাজী তাহার বিস্মৃতপ্রায় বর্ণ-পরিচয়ে নূতন করিয়া পরিচয় করাইয়া তাহার হাতে পয়ারের রামায়ণ তুলিয়া দিলেন। নূতন জীবনে পানু বড় হইয়া উঠিয়াছে।

বিচিত্র পানু। সমাজের একরঙা পটভূমিতে সেকালের বুকে লাল, অথবা লালের বুকে কালো বিন্দুর মত বিষমধর্মী বৈচিত্র্যের বিন্দু। সে সাধারণ নয়, তবুও সে বাস্তব, সে আছে। বিচিত্র তাহার জীবন। সংসার ঘটনার কঠিন আঘাত অতি সাধারণ একটি ময়রার ছেলেকে একটা অরণ্যবাসে পাঠাইয়াছিল। সহস্র বৎসরের অতীত সেখানকার অন্ধকারের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া লুকাইয়া আছে। সে সেই অতীত লোকের অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। না হইলে, সাধারণ ময়রার ছেলে—নিতান্ত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীর মত দোকান লইয়া কাল কাটাইয়া দিত। অতীত-লোকের অন্ধকার অন্তর-বাহির ভরিয়া মাখিয়া শৈশবের আলোক-স্মৃতির আকর্ষণে আবার সে ফিরিয়াছিল। আবার সংসার বিচিত্র আঘাতে তাহার বুকের

অন্ধকার মোচন করিয়া আলোকের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। আজ সে বর্তমানের মানুষ হইয়া বহু সহস্র বৎসরের আলোক-আভাস-প্রাপ্ত মানুষের সমাজে বহুর মধ্যে অতি সাধারণ নগণ্য একজন হইয়া মিশাইয়া হারাইয়া গেল—রঙের বাটিতে এক ফোঁটা রঙের মত।

কিন্তু সে রঙের বাটির রঙে নিত্য নবীন সূর্যোদয়ে সপ্তরশ্মির স্পর্শে পরিবর্তনের পর পরিবর্তন ঘটিতেছে। ক্রমে ক্রমে সে শুভ্রতার উজ্জ্বলতম মহিমায় পরিণতি লাভ করিতে চলিয়াছে। মানুষ প্রতি প্রভাতে বিন্দু বিন্দু করিয়া আলোক-সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে অন্তর-লোকে। তাহাদের সঙ্গে পানুও চলিয়াছে।

আজ পানু অনুমতি চাহিতে আসিয়াছে—তাহার একান্ত সাধ, সে রাজুর সমাধির উপর একটি ছোট মন্দির রচনা করিবে।

বিচারক

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু
শ্রদ্ধাভাজনেষু

এক

(ক)

আদালতে দায়রা মামলা চলছিল। মামলার সবে প্রারম্ভ।

মফস্বলের দায়রা আদালত। পশ্চিম বাঙলার পশ্চিমদিকের ছোট একটি জেলা। জেলাটি সাধারণত শান্ত! খুনখারাবি দাঙ্গা-হাঙ্গামা সচরাচর বড় একটা হয় না। মধ্যে মধ্যে যে দু-চারটে দাঙ্গা বা মাথা-ফাটাফাটি হয় সে এই কৃষিপ্রধান অঞ্চলটিতে চাষবাস নিয়ে গণ্ডগোল থেকে পাকিয়ে ওঠে। কখনও কখনও দু-একটি দাঙ্গা বা মারামারি নারীঘটিত আইনের ব্যাপার নিয়েও ঘটে থাকে। অধিকাংশই নিম্ন আদালতের এলাকাতেই শেষ হয়ে যায়, ক্বচিৎ দুটি চারটি আইনের জটিলতার টানে নিম্ন আদালতের বেড়া ডিঙিয়ে দায়রা আদালতের এলাকায় এসে পড়ে। যেমন সাধারণ চুরি কিন্তু চোর পাঁচজন—সুতরাং ডাকাতির পর্যায়ে পড়ে জজ-আদালতের পরিবেশটিকে ঘোরালো করে তোলে। চাষের ব্যাপার সেচের জল নিয়ে মারামারি, আঘাত বড় জোর মাথা-ফাটাফাটি, কিন্তু দু-পক্ষের লোকের সংখ্যাধিক্যের জন্য রায়টিং-এর চার্জে দায়রা আদালতে এসে পৌছয়। এই কারণে জেলাটি সরকারী দপ্তরে বিশ্রামের জেলা বলে গণ্য করা হয় এবং কর্মভারপীড়িত কর্মচারীদের অনেক সময় বিশ্রামের সুযোগ দেওয়ার জন্য এই জেলাতে পাঠানো হয়। কিন্তু বর্তমান মামলাটি একটি জটিল দায়রা মামলা।

খুনের মকর্দ্দমা। আদালতে লোকের ভিড় জমেছে। মামলাটি শুধু খুনের নয়, বিচিত্র খুনের মামলা।

অশোক-স্তম্ভখচিত প্রতীকের নীচেই বিচারকের আসনে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। অচঞ্চল, স্থির, নিরাসক্ত মুখ, অপলক চোখের দৃষ্টি। সে-দৃষ্টি সম্মুখের দিকে প্রসারিত কিন্তু কোনো কিছুর উপর নিবদ্ধ নয়। সামনেই কোর্টরুমের ডান দিকের প্রশস্ত দরজাটির ওপাশে বারান্দায় মানুষের আনাগোনা। বারান্দার নীচে কোর্টকম্পাউণ্ডের মধ্যে শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের রিমিঝিমি বর্ষণ বা দেবদারু গাছটির পত্রপল্লবে বর্ষণসিক্ত বাতাসের আলোড়ন, সব কিছু ঘষা কাচের ওপারের ছবির মতো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। একটা আকার আছে, জীবন-স্পন্দনের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তার আবেদন নেই; বন্ধ জানলার ঘষা কাচের ঠেকায় ওপারেই হারিয়ে গেছে। সরকারী উকিল প্রারম্ভিক বক্তৃতায় ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে মামলাটির আনুপূর্বিক বিবরণ বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি মনের পটভূমিতে সেই ঘটনাগুলিকে পরের পর তুলি দিয়ে এঁকে এঁকে চলেছিল। ক্বচিৎ কখনও সামনের টেবিলের উপর প্রসারিত তাঁর ডান-হাতখানিতে ধরা পেন্সিলটি ঘুরে-ঘুরে উঠছিল অথবা অত্যন্ত মৃদু আঘাতে অঘাত করছিল। তাও খুব জোর মিনিটখানেকের জন্য।

প্রবীণ গম্ভীর মানুষ। বয়স ষাটের নীচেই। গৌরবর্ণ সুপুরুষ, সরল কর্মঠ দেহ, কিন্তু মাথার চুলগুলি সব সাদা হয়ে গেছে। পরিচ্ছন্নভাবে কামানো গৌরবর্ণ মুখে নাকের দু-পাশে দুটি এবং চওড়া কপালে সারি সারি কয়েকটি রেখা তাঁর সারা অবয়বে যেন একটি ক্লান্ত বিষণ্নতার ছায়া ফেলেছে। লোক, বিশেষ করে উকিলেরা—যাঁরা তাঁর চাকরি জীবনের ইতিহাসের কথা জানেন—বলেন, অতিমাত্রায় চিন্তার ফল এ-দুটি। মুনসেফ থেকে জ্ঞানেন্দ্রবাবু আজ জজ হয়েছেন, সে অনেকেই হয়, কিন্তু তাঁর জীবনে লেখা যত রায় আপীলের অগ্নি-পরীক্ষা উত্তীর্ণ

হয়েছে এত আর কারুর হয়েছে বলে তাঁরা জানেন না। রায় লিখতে এত চিন্তা করার কথা তাঁরা একালে বিশেষ শোনেন নি। শুধু তাই নয়, তাঁর চিন্তাশক্তির গভীরতা নাকি বিস্ময়কর। প্রমাণ-প্রয়োগ সাক্ষ্যসাবুদের গভীরে ডুব দিয়ে তার এমন তত্ত্বকে আবিষ্কার করেন যে, সমস্ত কিছুর সাধারণ অর্থ ও তথ্যের সত্য আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়—অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারে তিনি ক্ষমাহীন। একটি নিজস্ব তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে তিনি ক্ষুরের ধারের উপর পদক্ষেপ করে শেষ প্রান্তে এসে তুলাদণ্ডের আধারে যে আধেয়টি জমে ওঠে তাই অকম্পিত হাতে তুলে দেন, সে বিষই হোক আর অমৃতই হোক।

(খ)

কর্মক্লান্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্রাম নেবার জন্যই এই ছোট এবং শান্ত জেলাটিতে মাস-কয়েক আগে এসেছেন। ইতিমধ্যেই উকিল এবং আমলা মহলে নানা গুজবের রটনা হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথের আর্দালীটি হাল-আমলের বাঙালীর ছেলে। এদিকে ম্যাট্রিক ফেল। কৌতূহলী উকিল এবং আমলারা তাকে নানান প্রশ্ন করে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাধারণত আদালত এবং নিজের কুঠীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন। ক্লাবের সভ্য পর্যন্ত হন নি। এ নিয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারীমহলেও গবেষণার অন্ত নেই।

এ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন—জ্ঞানেন্দ্রনাথ নাকি বলেন যে, তাঁর স্ত্রী আর বই এই দুটিই হল তাঁর সর্বোত্তম বন্ধু। আর বন্ধু তিনি কামনা করেন না।

প্রবাদ অনেক রকম তাঁর সম্বন্ধে। কেউ বলে তিনি শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্রাহ্ম। কেউ বলে তিনি পুরো নাস্তিক। কেউ বলে লোকটি জীবনে বোঝে শুধু চাকরি। কেউ বলে ঠিক চাকরি নয়, বোঝে শুধু আইন। পাপ-পুণ্য, সৎ-অসৎ, ধর্ম-অধর্ম, এ-সব তাঁর কাছে কিছু নেই, আছে শুধু আইনানুমোদিত আর বেআইনী। ইংরিজীতে যাকে বলে—লিগাল আর ইল্‌লিগাল।

তাঁর স্ত্রী সুরমা দেবীও জজের মেয়ে। জাস্টিস চ্যাটার্জী নামকরা বিচারক। এখনও লোকে তাঁর নাম করে। ব্যারিস্টার থেকে জজ হয়েছিলেন। সুরমা দেবী শিক্ষিতা মহিলা। অপরূপ সুন্দরী ছিলেন সুরমা দেবী এক সময়। আজও সে-সৌন্দর্য ম্লান হয় নি। নিঃসন্তান সুরমা দেবীকে এখনও পরিণত বয়সের যুবতী বলে ভ্রম হয়। এই সুরমা দেবীও যেন তাঁর স্বামীর ঠিক নাগাল পান না।

জজসাহেবের আর্দালীটি সাহেবের গল্পে পঞ্চমুখ। সে-সব গল্পের অধিকাংশই তার শুনে সংগ্রহ করা। কিছু কিছু নিজের দেখা। সে বলে—মেমসাহেবও হাঁপিয়ে ওঠেন এক-এক সময়।

ঘাড় নেড়ে সে হেসে বলে—রাত্রি বারোটা তো সাহেবের রাত নটা। বারোটা পর্যন্ত রোজ কাজ করেন। নটায় আর্দালীর ছুটি হয়। মেমসাহেব টেবিলের সামনে বসে থাকেন; সাহেব নথি ওলটান, ভাবেন, আর লেখেন। আশ্চর্য মানুষ, সিগারেট না, মদ না, কফি না; চা দু-কাপ দু-বেলা—বড় জোর আর এক-আধ বার। চুপচাপ লিখে যান। মধ্যে মধ্যে কাগজ ওল্টানোর খসখস শব্দ ওঠে। কখনও হঠাৎ কথা—একটা কি দুটো কথা, 'বইখানা দাও তো!'

বলেন মেমসাহেবকে। আউট হাউস থেকে আর্দালী বয়েরা—দেখতে পায় শুনতে পায়।

এখানকার দু-চারজন উকিল, উকিলবাবুদের মুহুরী এবং জজ-আদালতের আমলারা এসব গল্প সংগ্রহ করে আর্দালীটির কাছে।

আর্দালী বলে—তবে মাসে পাঁচ-সাত দিন আবার রাত দুটো পর্যন্ত। ঘরে ঘুমিয়ে পড়ি। দেড়টা দুটোর সময় আমার রোজই একবার ঘুম ভাঙে। তেষ্টা পায় আমার। ছেলেবেলা থেকে ওটা আমার অভ্যেস। উঠে দেখতে পাই সাহেব তখনও জেগে। ঘরে আলো জ্বলছে। প্রথম প্রথম আশ্চর্য হতাম, এখন আর হই না। প্রথম প্রথম সাহেবের ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়াতাম, সাহেব না ডাকলে যাই কি করে? দুই-একদিন চুপিচুপি ঘরের পিছনে জানালার পাশে দাঁড়াতাম। দেখতাম টেবিলের উপর ঝুঁকে সাহেব তখনও লিখছেন। এক-একদিন শুনতাম শুধু চটির সাড়া উঠছে। বুঝতে পারতাম সাহেব ঘরময় পায়চারি করছেন। এখনও শুনতে পাই। কোনো কোনো দিন বাথরুমের ভেতর আলো জ্বলে, জল পড়ার শব্দ ওঠে, বুঝতে পারি মাথা ধুচ্ছেন সাহেব। ওদিকে সোফার উপর মেমসাহেব ঘুমিয়ে থাকেন। খুটখাট শব্দ উঠলেই জেগে ওঠেন।

বলেন—হল? এক-একদিন মেমসাহেব ঝগড়া করেন। এই তো আমার চাকরির প্রথম বছরেই; বুঝেছেন, আমি ওই উঠে সবে বাইরে এসেছি; দেখি মেমসাহেব দরজা খুলে বাইরে এলেন। খানসামাকে ডাকলেন—শিউনন্দন! ওরে!—

ভিতর থেকে সাহেব বললেন—না না। ও কি করছ? ডাকছ কেন ওদের?

মেমসাহেব বললেন—ইজিচেয়ারখানা বের করে দিক।

—আমি নিজেই নিচ্ছি—ওরা সারাদিন খেটে ঘুমোচ্ছে। ডেকো না। সারাদিন খেটে রাত্রে না-ঘুমোলে ওরা পারবে কেন। মানুষ তো!

আর্দালী বিস্ময় প্রকাশের অভিনয় করে বলে—দেখি সাহেব নিজেই ইজিচেয়ারখানা টেনে বাইরে নিয়ে আসছেন। আমি যাচ্ছিলাম ছুটে। কিন্তু মেমসাহেব ঝগড়া শুরু করে দিলেন। আর কি করে যাই? চুপ করে দাঁড়িয়ে শুধু শুনলাম। মেমসাহেব নাকি বলেন—আর্দালী এবার বলে যায় তার শোনা গল্প, পুরানো আর্দালীর কাছে শুনেছে সে, সুরমা নাকি আগে প্রায়ই ক্ষুব্ধভাবে বলতেন—দুনিয়ার সবাই মানুষ। রাত্রে ঘুম না-হলে কারুরই চলে না। চলে শুনেছি এক ভগবানের। তা জানতাম না যে, জজিয়তি আর ভগবানগিরিতে তফাত নেই। তারপর বলেন, তাই বা কেন? আমার বাবাও জজ ছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ হাসতেন। হেসে আর-একখানা চেয়ার এনে পেতে দিয়ে বলতেন—বোসো।

রায় লেখা তখন শেষ হয়ে যেত। সুরমাও বুঝতে পারতেন। স্বামীর মুখ দেখলেই তিনি তা বুঝতে পারেন। রায় লেখা শেষ না-হলে সুরমা কোন কথা বলেন না। ওই দুটো চারটে কথা—চা খাবে? টেবিল-ফ্যানটা আনতে বলব? এই। বেশী কথা বলবার তখন উপায় থাকে না। বললে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেন, প্লীজ, এখন না, পরে বোলো যা বলবে।

রায় লেখা হয়ে গেলে তখন তিনি কিন্তু আর এক মানুষ। সুরমা বলতেন—মুন্সেফ থেকে তো জজ হয়েছ। ছেলে নেই, পুলে নেই। আর কেন? আর কী হবে? হাইকোর্টের জজ, না সুপ্রীম কোর্টের জজ? ওঃ! এখনও আকাঙ্ক্ষা গেল না?

জ্ঞানেন্দ্রনাথের একটি অভ্যেস-করা হাসি আছে। সেই হাসি হেসে বলতেন বা বলেন—নাঃ। আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। ঠিক সময়ে রিটায়ার করব এবং তারপর সেই ফার্স্ট বুকের নির্দেশ মেনে চলব। গেট আপ অ্যাট ফাইভ, গো টু বেড অ্যাট নাইন। তা-ই বা কেন—

এইট। সকালে উঠে মর্নিং-ওয়াক করব ; তারপর থলে নিয়ে বাজার যাব। বিকেলে মার্কেটে গিয়ে তোমার বরাতমত উলসুতো কিনে আনব। এবং বাড়িতে তুমি ক্রমাগত বকবে, আমি শুনব। কিন্তু যতদিন চাকরিতে আছি, ততদিন এ থেকে পরিত্রাণ আমার নেই।

আর একদিন, বুঝেছেন ;—আর্দালী বলে আর-একদিনের গল্প।

সুরমা বলেছিলেন—আচ্ছা বলতে পার, সংসারে এমন মানুষ কেউ আছে যার ভুল হয় না?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—না নেই।

সুরমা বলেছিলেন—তবে ?

—কি তবে ?

—এই যে তুমি ভাব তোমার রায় এমন হবে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেউ পালটাতে পারবে না। হাইকোর্ট না, সুপ্রীমকোর্ট না—এ দম্ভ তোমার কেন ?

দম্ভ ? জ্ঞানেন্দ্রনাথ হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন। আর্দালী বলে—সে কী হাসি! বুঝেছেন না। যেন মেমসাহেব নেহাত ছেলেমানুষের মতো কথা বলেছেন। মেমসাহেব রেগে গেলেন, বললেন—হাসছ কেন ? এত হাসির কি আছে ?

সাহেব বললেন—তুমি দম্ভ, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট, কথাগুলো বললে না, তাই।

মেমসাহেব বললেন—ভুল হয়েছে। ভগবানও পালটাতে পারবেন না বলা উচিত ছিল আমার।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন—উঁহু, ওসব কিছুর জন্যেই নয় সুরমা। হাসলাম মেয়েরা চিরকালই মেয়ে থেকে যায় এই ভেবে।

—তার মানে ?

—মানে ? তুমি তো সে ভাল করে জান সুরমা। এবং সে কথাটা তো আমার নয়, আমার গুরুর, তোমার বাবার। দম্ভ নয়, হাইকোর্টে রায় টিকবে কি না-টিকবে সেও নয়, সে কখনও ভাবি নে। ভাবি আজ নিজে যে রায় দিলাম, সে রায় দু-মাস কি ছ-মাস কি ছ-বছর পরে ভুল হয়েছে বলে নিজেই নিজের উপর যেন না স্ট্রিক্‌চার দিই। শেষটায় খুব রাগ করে তুমি ভগবানের কথা তুললে—। মধ্যে মধ্যে জজগিরি আর ভগবানগিরির সঙ্গে তুলনাও কর—

সুরমা সেদিন স্বামীর কথার উপরেই কথা কয়ে উঠেছিলেন, বেশ খোঁচা দিয়ে বলেছিলেন —না, তা বলি না কখনও। বলি, আমার বাবাও জজ ছিলেন ; তাঁর তো এমন দেখি নি। আরও অনেক জজ আছেন, তাঁদেরও তো এমন শুনি নে। বলি, তোমার জজিয়তি আর ভগবানগিরিতে তফাত নেই। হ্যাঁ, তা বলিই তো। তোমাকে দেখে অন্তত আমার তাই মনে হয়।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চোখ দুটি বন্ধ করে প্রশান্ত ভাবে মিষ্টি হেসে বলেছিলেন—তাই। আমার জজিয়তি আর ভগবানগিরির কথাই হল। আমি অবিশ্যি ভগবানে বিশ্বাস ঠিক করিনে, সে তুমি জান, তবু তুলনা যখন করলে তখন ভগবানগিরির যে-সব বর্ণনা তোমরা কর—ভাল ভাল কেতাবে আছে—সেইটেকেই সত্য বলে মেনে নিয়ে বলি, আমার জজিয়তি ভগবানগিরির চেয়েও কঠিন। কারণ ভগবান সর্বশক্তিমান, তাঁর উপরে মালিক কেউ নেই, সূক্ষ্ম বিচারক নিশ্চয়ই, কিন্তু তবুও অটোক্র্যাট। অন্তত করুণা করতে তাঁর বাধা নেই। ইচ্ছে করলেই আসামীকে দোষী জেনেও বেকসুর মাফ করে খালাস দিতে পারেন। পাপপুণ্যের ব্যালান্সশীট তৈরী করে পুণ্য বেশী হলে পাপগুলোর চার্জশীট ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ করতে পারেন।

মানুষ জজ তা পারে না। আমি তো পারিই না।

বার লাইব্রেরী থেকে আদালতের সামনের বটতলা পর্যন্ত এমনি ধরনের আলাপ-আলোচনার মধ্যে এই মানুষটির সমালোচনা দিনে এক-আধ বার না-হয়ে যায় না। এ-সব কথা অবশ্য পুরনো কথা। জেলা থেকে জেলায় তাঁর বদলীর সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলিও প্রচারিত হয়েছে। এখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ আরও স্বতন্ত্র এবং বিচিত্র। অহরহ চিন্তাশীল—প্রায় এক মৌনী মানুষ। মেমসাহেবও তাই। দুজনেই যেন পরস্পরের কাছে ক্রমে মৌন মূক হয়ে যাচ্ছেন। এই দুকূল-পাথার নদীর বুকে দুখানি নৌকা দুদিকে ভেসে চলেছে।

(গ)

সরকারী উকিল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মামলার ঘটনাগুলির বর্ণনা করে চলেছিলেন। অবিনাশবাবু প্রবীণ এবং বিচক্ষণ উকিল। বক্তা হিসাবে সুনিপুন এবং আইনজ্ঞ হিসাবে অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী। এই বিচারকটিকে তিনি খুব ভাল করে চেনেন। আর্দালীর কথা থেকে নয়, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। এবং এই জেলায় আসার পর থেকে নয়, তার অনেক দিন আগে থেকে। এ জেলায় তখন সরকারী উকিল হন নি তিনি ; তাঁর পসারের তখন প্রথম আমল। আশেপাশের জেলা থেকে তাঁর তখন ডাক পড়তে শুরু হয়েছে। জীবনে প্রতিষ্ঠা যখন প্রথম আসে তখন সে একা আসে না, জলস্রোতের বেগের সঙ্গে কল্লোল-ধ্বনির মতো অহঙ্কারও নিয়ে আসে। তখন সে-অহঙ্কারও তাঁর ছিল। একটি দায়রা মামলার আসামীর পক্ষ সমর্থন করতে গিয়েছিলেন। সে মামলায় উনি তাঁকে যে তিরস্কার করেছিলেন তা তিনি আজও ভুলতে পারেন নি। আজও মধ্যে মধ্যে হঠাৎ মনে পড়ে যায় !

সেও বিচিত্র ঘটনা। বাপকে খুন করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিল ছেলে। ষাট বছর বয়সের বৃদ্ধ বাপ, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের জোয়ান ছেলে, সেও দুই ছেলের বাপ। মামলায় প্রধান সাক্ষী ছিল মা। ছেলেটি কৃতকর্মা পুরুষ। যেমন বলশালী দেহ তেমনি অদম্য সাহস, তেমনি নিপুণ বিষয়বুদ্ধি। প্রথম যৌবন থেকেই বাপের সঙ্গে পৃথক।

বাপ ছিল বৈষ্ণব, ধর্মভীরু মানুষ। বিঘা সাতেক জমি, ছোট একটি আখড়া ছিল সম্পত্তি। তার সঙ্গে ছিল গ্রামের কয়েকটি বৃত্তি। কার্তিক মাসে টহল, বারোমাসে পার্বণে—ঝুলন, রাস, দোল, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসবে নাম-কীর্তন এবং শবযাত্রায় সংকীর্তন গাইত, তার জন্য গ্রাম্য বৃত্তি ছিল। এতেই তার চলে যেত। ছেলে অন্য প্রকৃতির, গোড়া থেকেই সে এ-পথ ছেড়ে বিষয়ের পথ ধরেছিল। চাষের মজুর খাটা থেকে শুরু, ক্রমে কৃষানী, তারপর গরু কিনে ভাগচাষ, তারপর জমি কিনে চাষী গৃহস্থ হয়েছিল। তাতে বাপ আপত্তি করে নি ; প্রশংসাই করত। কিন্তু তারপর ছেলের বুদ্ধি যেন অসাধারণ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। নিজের জমির পাশের জমির সীমানা কেটে নিতে শুরু করল এবং এমন চাতুর্যের সঙ্গে কেটে নিতে লাগল যে অঙ্গচ্ছেদের বেদনা যখন অনুভূত হল তখন দেখা গেল যে, কখন কতদিন আগে যে অঙ্গটি ছিন্ন হয়ে গেছে, তা যার জমির অঙ্গ ছিন্ন হয়েছে, সেও বলতে পারে না। হঠাৎ প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ চাষের সময় দেখা যেত বলাই দাসের ছোট জমি বেড়ে গেছে এবং অন্যের বড় জমি ছোট হয়ে গেছে। এবং তখন ছিন্নাঙ্গ জমির মালিক সীমানা মাপতে এলে বলাই তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিত, জোর করলে লাঠি ধরত ; সালিশী মান্য করলে আদালতের খোলা দরজার দিকে পথ-নির্দেশ করে সালিশী অমান্য

করে আসত। বাপ অনেক হিতোপদেশ দিলে, কিন্তু ছেলে শুনলে না; ধর্মের ভয় দেখালে, ছেলে নির্ভয়ে উচ্চ-হেসে উঠে গেল। ওদিকে বাড়ির ভিতরেও তখন শাশুড়ী-পুত্রবধূতে বিরোধ বেধেছে। বৈষ্ণবের সংসারে বধূটি পেঁয়াজ ঢুকিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, মাছ ঢুকিয়েছে এবং ছেলে তাকে সমর্থন করেছে। একদিন মা এবং বউয়ের ঝগড়ার মধ্যে বলাই দাস মাকে গালাগাল দিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, এক অন্নে এক ঘরে সে আর থাকবে না, পোষাবে না। বাড়ির পাশেই সে তখন নূতন ঘর তৈরী করেছে। বাপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছিল—জয় মহাপ্রভু, তুমি আমাকে বাঁচালে!

আর বলাই দাসের অবাধ কর্মোদ্যম। তাতে বাপ মাথা হেঁট করে নিজের মৃত্যু কামনা করেছিল। হঠাৎ পুত্রবধূ দুটি ছেলে রেখে মারা গেল। বলাই দাস স্ত্রীর শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব ভোজন অন্তে বন্ধুবান্ধব ভোজন করালে মদ্য-মাংস-সহযোগে এবং গোপন করার চেষ্টা করলে না, নিজেই মত্ত অবস্থায় পথে পথে স্ত্রীর জন্য কেঁদে বলে বেড়ালে—তার জীবনে কাজ নেই, কোনো কিছুতে সুখ নেই, সংসার ত্যাগ করে সে চলে যাবে। সন্ন্যাসী হবে।

বাপ মহাপ্রভুর দরজায় মাথা কুটলে। এবং ছেলের বাড়িতে গিয়ে তাকে তিরস্কার করে এল। বলাই দাস কোনো উত্তর-প্রত্যুত্তর করলে না, কিন্তু গ্রাহ্য করলে বলেও মনে হল না, উঠে চলে গেল।

দিন-তিনেক পর ভোরবেলা উঠে বাপ পথে বেরিয়েই দেখলে বলাই দাসের বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে আতর বলে একটি স্বৈরিণী, গ্রামেরই অবনত সম্প্রদায়ের মেয়ে। বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে চলেই গিয়েছে; ঝুমুর দলে নেচে গেয়ে এবং তার সঙ্গে দেহ ব্যবসায় করে বেড়ায়; মধ্যে মাঝে দু-দশ দিনের জন্য গ্রামে আসে। আতর কয়েকদিন তখন গ্রামেই ছিল।

বাপ ছেলেকে ডেকে তুলে তার পায়ে মাথা কুটেছিল। এ অধর্ম করিস নে। সইবে না। ব্যভিচার সবচেয়ে বড় পাপ।

হাত ধরে বলেছিল—তুই আবার বিয়ে কর।

বলাই দাস তখন অন্ধ। হয়তো-বা উন্মত্ত। শুধু আতরই নয়, গ্রামের আরও যে-কটি স্বৈরিণী ছিল তাদের সকলকে নিয়ে সে জীবনে সমারোহ জুড়ে দিলে। অনুরোধ ব্যর্থ হল, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে হল বিরোধ। বিরোধ শেষে চিরদিনের মতো বিচ্ছেদের পরিণতির মুখে এসে দাঁড়াল।

বাপ সংকল্প করলে ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করবে। করলেও। নিজের সামান্য সাত বিঘা জমি দেবতার নামে অর্পণ করে ভবিষ্যৎ সেবাইত মহান্ত নিযুক্ত করলে নাতিদের। শর্ত করল যে, মতিভ্রষ্ট ব্যভিচারী বলাই দাস তাদের অভিভাবক হতে পারে না। তার অন্তে সেবাইত এবং নাতিদের অভিভাবক হবে তার স্ত্রী। তার স্ত্রীর মৃত্যুকালে যদি নাতিরা নাবালক থাকে, তো, কোনো বৈষ্ণবকে অভিভাবক নিযুক্ত করে দেবেন গ্রামের পঞ্চজন। ছেলে খবর শুনে এসে দাঁড়াল। বাপ পিছন ফিরে বসে বললে—এ-বাড়ি থেকে তুই বেরিয়ে যা। বেরিয়ে যা! বেরিয়ে যা! এ-বাড়ি আমার, কখনও যেন ঢুকিস নি, আমার ধর্ম চঞ্চল হবেন। মৃত্যুর সময়েও আমার মুখে জল তুই দিসনে, মুখাগ্নিও করতে পাবিনে, শ্রাদ্ধও না। ভগবান যদি আজ আমার চোখ দুটি নেন, তবে আমি বাঁচি। তোর মুখ আমাকে আর দেখতে হয় না।

পরের দিন রাত্রে বাপ খুন হলো। গরমের সময়, দাওয়ার উপর একদিকে শুয়ে ছিল বৃদ্ধ, অন্যদিকে নাতি দুটিকে নিয়ে শুয়ে ছিল বৃদ্ধা। গভীর রাত্রে কুড়ুল দিয়ে কেউ বৃদ্ধের মাথাটা দু ফাঁক করে দিয়ে গেল। একটা চীৎকার শুনে ধড়মড় করে বৃদ্ধা উঠে বসে হত্যাকারীকে

ছুটে উঠোন পার হয়ে যেতে দেখে চিনেছিল যে সে তার ছেলে। মাথায় কোপ একটা নয়, দুটো। একটা কোপ বোধ করি প্রথমটা, পড়েছিল এক পাশে; দ্বিতীয়টা ঠিক মাঝখানে। মা সাক্ষী দিলে, আব্ছা অন্ধকার তখন, চাঁদ সদ্য ডুবেছে, তার মধ্যে পালিয়ে গেল লোকটি, তাকে সে স্পষ্ট দেখেছে। সে তার ছেলে বলাই। বলাই দাস অবিনাশবাবুকে উকিল দিয়েছিল। কতকটা জমি হাজার টাকায় বিক্রির ব্যবস্থা করে, ফৌজদারী মামলায় তাঁর নামডাক শুনে, লোক পাঠিয়ে তাঁকে নিযুক্ত করেছিল। অবিনাশবাবু জেরা করতে বাকি রাখেন নি। মায়ের শুধু এক কথা।—'বাবা—'

সুযোগ পেয়ে অবিনাশবাবু ধমক দিয়ে উঠেছিলেন—না। বাবা নয়! বাবা-টাবা নয়। বলো, হুজুর।

মা বলেছিল—হুজুর, মায়ের কি ছেলে চিনতে ভুল হয়? আমি যে চল্লিশ বছর ওর মা। দুপুর বেলা মাঠ থেকে ফিরে এলে ওর পিঠে আমি রোজ তেল মাখিয়ে দিয়েছি।

অবিনাশবাবু বলেছিলেন—ছেলের সঙ্গে তোমার অনেক দিনের ঝগড়া। আজ বিশ বছর ঝগড়া। ছেলের বিয়ে হওয়া থেকেই ছেলের সঙ্গে তোমার মনোমালিন্য। তোমাদের ঝগড়া হত। বলো সত্যি কি না?

মা বলেছিল—তা খানিক সত্যি বটে। কিন্তু সে মনোমালিন্য নয় হুজুর। বড় পরিবার-পরিবার বাই ছিল,—পরিবারের জন্যেই ও পেঁয়াজ-মাছ খেতে ধরেছিল, তার জন্যেই পেথকান্ন হয়েছিল, তাই নিয়ে বকাবকি হত। সে বকাবকিই, আর কিছু নয়।

অবিনাশবাবু বলেছিলেন—না। আমি বলছি সেই আক্রোশে তুমি বলছ তুমি চিনতে পেরেছ। নইলে আসলে তুমি চিনতে পার নি।

মা বলেছিল—চিনতে আমি পেরেছি হুজুর। আক্রোশও আমার নাই। ও আমার নিজের ছেলে। ধর্মের মুখ তাকিয়ে—মা থেমেছিল এইখানে, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল তার। অবিনাশবাবু তাকে কাঁদতে সুযোগ দেন নি, সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন—ধর্মের মুখ তাকিয়ে? আবোল-তাবোল বোকো না। জোর করে কাঁদতে চেষ্টা করো না। বলো কি বলছ?

মা-মেয়েটি কঠিন মেয়ে, সে আত্মসংবরণ করে নিয়ে বলেছিল—নাঃ, কাঁদব না হুজুর। ধর্মের মুখ তাকিয়ে সত্যি কথাই আমাকে বলতে হবে হুজুর। আমি মিছে কথা বললে ও হয়তো এখানে খালাস পাবে। কিন্তু পরকালে কী হবে ওর? মরতে একদিন হবেই। আমিই বা কী বলব ওর বাপের কাছে? আমি সত্যিই বলছি। হুজুর বিচার করে খালাস দিলে ভগবান ওকে খালাস দেবেন, সাজা দিলে সেই সাজাতেই ওর পাপের দণ্ড হয়ে যাবে; নরকে ওকে যেতে হবে না।

অবিনাশবাবু এইবার মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, জেরা করেছিলেন—পাপপুণ্য তুমি মান?

মা বলেছিল—মানি বইকি হুজুর। কে না মানে বলুন? নইলে দিনরাত হয় কি করে?

ধমক দিয়েছিলেন অবিনাশবাবু—থামো, বাজে বোকো না। সাঁইত্রিশ বছর আগে, বর্ধমান জেলায়, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তুমি একবার এজাহার করেছিলে?

বৃদ্ধা ঈষৎ চকিত হয়ে মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে অবিনাশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

কঠোর স্বরে অবিনাশবাবু বলেছিলেন—বল? উত্তর দাও।

বৃদ্ধা বলেছিল—দিয়েছিলাম।

—কিসের মামলা সেটা?

—আমি বাপের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আমার এই স্বামীর সঙ্গে। আমার বাবা তাই মামলা করেছিল আমার স্বামীর নামে। সেই মামলায় আমি সাক্ষী দিয়েছিলাম।

—তোমার বাবার নাম ছিল রাখহার ভটচাজ? তুমি বামুনের মেয়ে ছিলে?

—হ্যাঁ।

—যার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলে সে কোন্ জাত ছিল?

—সদ্‌গোপ। আমাদের বাড়ির পাশেই ওদের বাড়ি ছিল। ছেলেবেলা থেকে ওর বোনের সঙ্গে খেলা করতাম, ওদের বাড়ি যেতাম। তারপর ভালবাসা হয়। আমি যখন বুঝলাম, ওকে নইলে আমি বাঁচব না, তখন আমি ওর সঙ্গে বেরিয়ে আসি। দুজনে বোষ্টুম হয়ে বিয়ে করি। মামলা তখনই হয়েছিল।

—কি বলেছিলে তখনা এজাহারে?

—বলেছিলাম—আমি বাপ চাই না, মা চাই না, ধম্ম চাই না, আমি ওকে নইলে বাঁচব না, ওই আমার সব—পাপপুণ্য সব। ওর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে যদি আমাকে নরকে যেতে হয় তো যাব।

মামলার সওয়াল-জবাবের সময় অবিনাশবাবু মায়ের চরিত্রের এই দিকটির উপরেই বেশী জোর দিয়েছিলেন, নারীচরিত্রের বিচিত্র এক বৈশিষ্ট্যের কথা বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন—এ মেয়েটির অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ সেই বিচিত্র নারী-প্রকৃতি, যে নারী জীবনের সনাতন পুরুষের জন্য বাপ, মা, জাতি কুল, ধর্ম অধর্ম সব কিছুকে অনায়াসে অবলীলাক্রমে ত্যাগ করতে পারে। এরা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বোধ করি এই লজ্জাকর মোহে মগ্ন এবং অন্ধ হয়ে থাকে। এরা অনায়াসে সন্তান ত্যাগ করেও চলে যায় অবৈধ প্রণয়ের প্রচণ্ড আকর্ষণে, দেহ-বাদের এক রাক্ষসী ক্ষুধার তাড়নায়। এই মেয়েটি যখন আজ ধর্মের কথা বলে তখন বিশ্বসংসার হাসে কিন্তু সে তা বুঝতে পারে না। প্রতিহিংসার তাড়নায় যে ধর্মকে সে মানে না আজ সেই ধর্মের দোহাই দিচ্ছে। আসলে সে হত্যাকারী কে তা চিনতে পারে নি। সেই অতি অল্পক্ষণ সময়, যে সময়ে সে স্বামীর চীৎকারে ঘুম ভেঙে উঠে মশারি ঠেলে বাইরে এসেছিল, যখন হত্যা-কারী ঘরের দরজা পার হয়ে পালাচ্ছিল, তার মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে কারুর কাউকে চিনতে পারা অসম্ভব। চিনতে সে পারে নি। হয়তো-বা কাউকে দেখেই নি, সে জেগে উঠতে উঠতে হত্যাকারী পালিয়ে গিয়েছিল। সেই উত্তেজিত অবস্থায় সে যা দেখেছিল তা তার চিত্তের কল্পনার অলীক প্রতিফলন। ছেলেকে সে গোড়া থেকেই দেখতে পারত না। তার উপর ছেলের সঙ্গে স্বামীর বিরোধ হয়েছিল, সুতরাং তার মনে হয়েছিল পুত্রই হত্যাকারী এবং তাকেই সে কল্পনা-নেত্রে দেখেছিল। এ নারী মা নয়, মাতৃত্বহীনা বিচিত্রা, পাপিষ্ঠা। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, মা হয়ে পুত্রকে হত্যাকারী বলে ঘোষণা করবার সময় একটি ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত তার চোখ থেকে নির্গত হয় নি।

জোরালো বক্তৃতা অবিনাশবাবু চিরকালই করেন। ওই কেসে তিনি এই তথ্যটির উপর ভিত্তি করে প্রাণ ঢেলে বক্তৃতা করেছিলেন। এ ছাড়া আর অন্য কোনো পথই ছিল না। এবং জুরীদের অভিভূত করতে সমর্থও হয়েছিলেন। তাঁরা ওই কথাই বিশ্বাস করেছিলেন—স্বামীর প্রতি অত্যধিক আসক্তির বশে এবং পুত্রের বিবাহের পর থেকে পুত্রবধূর প্রতি পুত্রের আকর্ষণের জন্য পুত্রের সঙ্গে তার সনাতন বিদ্বেষের প্রেরণাতেই আপন অজ্ঞাতসারে সে পুত্রকেই হত্যাকারী কল্পনা করেছে; এমন ক্ষেত্রে সদ্য ঘুমভাঙার মুহূর্তে অজ্ঞাত হত্যাকারীকে পুত্র বলে ধারণা করাই সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক। সুতরাং তাঁরা সন্দেহের সুয়োগে অর্থাৎ বেনিফিট অফ ডাউটের

অধিকারে আসামীকে নির্দোষ বলেছিলেন। কিন্তু এই কঠিন ব্যক্তিটি জুরীদের সঙ্গে ভিন্নমত হয়ে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। এবং তাঁর রায়ে অবিনাশবাবুর মন্তব্যগুলির তীব্র সমালোচনা করে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন।

রায়ে তিনি লিখেছিলেন—এই মায়ের সাক্ষ্য আমি অকৃত্রিম সত্য বলে বিশ্বাস করি। আসামীপক্ষের লার্নেড অ্যাডভোকেট তার চরিত্র যেভাবে মসীময় করে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন তা শুধু বিচার-ভ্রান্তিই নয়—অভিপ্রায়মূলক বলে আমার মনে হয়েছে। সাক্ষী এই মা-টি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক চরিত্রের নারী। প্রবল দৈহিক আসক্তি, যা ব্যাধির সামিল, তার কোন অভিব্যক্তিই নাই তার জীবনে। বরং একটি সূক্ষ্ম সুস্থ বিচারবোধ তার জীবনে আমি লক্ষ্য করেছি। সে প্রথম যৌবনে কুমারী জীবনে একজন অসবর্ণের যুবককে ভালবেসেছিল। সে-ভালবাসার ভিত্তিতে দেহলালসাকে কোনো দিনই প্রধান বলে স্বীকার করে নি। প্রতিবেশীর পুত্র, বাল্যসখীর ভাই, সুদীর্ঘ পরিচয় এ ভালবাসাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিল; মনের সঙ্গে মনের অন্তরঙ্গতা ঘটেছিল। আকস্মিকভাবে কোনো সুস্থ সবল ও রূপবান যুবককে দেখে যুবতী মনে যে বিকার জন্মায়, তাকে উন্মত্ত করে তোলে—তা এ নয়। এ উপলব্ধি সম্পূর্ণরূপে মনের উপলব্ধি। সেই উপলব্ধিবশে যে হৃদয়াবেগের নির্দেশে সে গৃহ কুল জাতি ত্যাগ করেছিল তা সমাজবোধের বিচারে পাপ হতে পারে কিন্তু মানবিক বিচারে অন্যায় নয়, অধর্ম নয়, অস্বাস্থ্যকর নয়। সামাজিক ও মানবিক বিচার সর্বত্র একমত হতে পারে না বলেই আইন মানবিক বিচারের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে একালে। যা সমাজের বিচারে পাপ সেই সূত্র অনুযায়ীই তা সর্বক্ষেত্রে আইনের বিচারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে স্বীকৃত নয়। যাকে তিনি বলেছেন দেহলালসা—আইনের বিচারে আমার দৃষ্টিতে তা সর্বজয়ী ভালবাসা—প্যাশন অব লাইফ; তার জন্ম মর্মান্তিক মূল্য দিয়েও সে অনুতপ্ত নয়, লজ্জিত নয়। এবং পরবর্তী জীবনের আচরণে সে একটি বিবাহিতা সাধ্বী স্ত্রীর সকল কর্তব্য অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে করে এসেছে। এই মা যে বেদনার সঙ্গে ধর্মের মুখ তাকিয়ে পুত্রের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে তাকে আমি বলি ডিভাইন; স্বর্গীয় রূপে পবিত্র। আশ্চর্যের কথা, সুবিজ্ঞ অ্যাডভোকেট-মহাশয় এই হতভাগিনী মায়ের সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ের বেদনার্ততা ও ধর্মজ্ঞানের বা সনাতন নীতিজ্ঞানের মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব যেন ইচ্ছাপূর্বকই লক্ষ্য করেন নি। বলেছেন—সাক্ষ্য দেওয়ার সময় পুত্রের ফাঁসি হতে পারে জেনেও তার চোখে জল পড়ল না।

হাইকোর্ট জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিচারকেই মেনে নিয়েছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ আসামী অর্থাৎ ওই ছেলেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। এই দণ্ডাদেশ ঘোষণার ইতিহাসও ঠিক সাধারণ পর্যায়ে পড়ে না। অসাধারণই বলতে হবে। অবিনাশবাবু আর একটা কেসে ওখানে গিয়ে সে ইতিহাস শুনেছিলেন। তিনদিন নাকি সে তাঁর অদ্ভুত স্তব্ধ অবস্থা; তিনটি রাত্রি তিনি ঘুমোন নি, সবটাই প্রায় লিখে ফেলে ওই দণ্ডাদেশের কয়েক লাইন অসমাপ্ত রেখে অবিশ্রান্ত পদচারণা করেছিলেন। এদিকে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীমহলে একটা উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল। জ্ঞানবাবুর এই বিনিদ্র রাত্রিযাপনের কথা তাঁদের কানে পৌঁছুতে বাকি থাকে নি। সিভিল সার্জেন এসেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন এস-পি। এস-ডি-ও যিনি, তিনিও এসেছিলেন। নতুন জজসাহেব শেষে কি ফাঁসির হুকুম দেবেন? এঁদের যে উপস্থিত থেকে দণ্ডাদেশকে কাজে পরিণত করতে হবে!

ভোরবেলা, আবছা অন্ধকারের মধ্যে ফাঁসির মঞ্চটাকে দেখে অদ্ভুত মনে হবে। মৃত্যুপুরীর হঠাৎ-খুলে-যাওয়া দরজার মতো মনে হবে। মনে হবে, দরজাটার চারপাশের কাঠগুলো থেকে

কপাট-জোড়াটা অদৃশ্য হয়ে গেছে, খোলা দরজাটা হাঁ-হাঁ করছে মৃত্যুর গ্রাসের মতো। তারপর দূর থেকে হয়তো হতভাগ্যের কাতর আর্তনাদ উঠবে। হয়তো ঝুলিয়ে তুলে নিয়ে আসবে একটা হাড় আর মাংসের বিহ্বল বোঝাকে। ওঃ! তারপর দণ্ডাদেশ পড়তে হবে। দণ্ডিত হতভাগ্যের মাথায় কালো টুপি পরিয়ে দেবে। ওঃ।

সিভিল সার্জেন বলেছিলে—এ জেলে আজ তিরিশ বছর ফাঁসি হয়নি। গ্যালোজ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। শুধু আছে একটা ঢিবি। সব নতুন করে তৈরি করতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবও বিচলিত হয়েছিলেন।

পরামর্শ করে ওঁরা এসেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবুর কুঠীতে। ইঙ্গিতে অনুরোধও জানিয়েছিলেন।

জ্ঞানবাবু বলেছিলেন—তিনদিন আমি ঘুমুইনি। শুধু ভেবেছি।

ম্যাজিস্ট্রেট বলেছিলেন—আমি শুনেছি। মানুষকে ডেথ সেণ্টেন্স দেওয়ার চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক কর্তব্য কিছু হয় না।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলেছিলেন, আমার স্ত্রীও খুব বিচলিত হয়েছেন। তিনি যেন আমার মুখের দিকে চাইতে পারছেন না! কিন্তু কী করব আমি!

সত্যই সুরমা দেবী অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন, সভয়ে বলেছিলেন—তুমি কি ফাঁসির হুকুম দেবে?

প্রথমটা উত্তর দিতে পারেন নি জ্ঞানেন্দ্রবাবু। অনেকক্ষণ পর বলেছিলেন—ওর মা তার সাক্ষ্যে যে কথা বলে গেছে তারপর ওই দণ্ড দেওয়া ছাড়া আমি কি করতে পারি বল?

সুরমা দেবী এর পর আর কোন কথা বলবেন? তবু বলেছিলেন—ওই মায়ের কথাই ভেবে দেখ। সে হতভাগিনীর আর কি থাকবে বল?

—ধর্ম! জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলেছিলেন—হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম কি ক্রশ্চান ধর্ম নয় সুরমা—সত্যধর্ম।

কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে এক বিচিত্র হাসি হেসে বলেছিলেন—ওই মেয়েটি আমাকে শিক্ষা দিয়ে গেল। ইতিহাসের বড় মানুষ মহৎ ব্যক্তি এই সত্যকে পালন করে আসেন পড়েছি; একালে মহাত্মা গান্ধীকে দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু ভেবেছি—ও পারেন শুধু মহৎ যাঁরা তাঁরাই। কিন্তু ওই মেয়েটি বুঝিয়ে দিলে—না, পারে, তার মতো মানুষেও পারে। মস্ত বড় আশ্বাস পেলাম আজ।

বলেই সঙ্গে সঙ্গে বসে গিয়েছিলেন লিখতে। এক নিঃশ্বাসেই প্রায় লাইন কটি লিখে শেষ করে দিয়েছিলেন। বিচার নিষ্ঠুর নয়, সে সাংসারিক সুখদুঃখের গণ্ডীর ঊর্ধ্বে। জাস্টিস ইজ ডিভাইন।

সেদিন ম্যাজিস্ট্রেট, এস-পি, সিভিল সার্জেন এঁদেরও সেই কথাই তিনি বলেছিলেন। আর কোনো দণ্ড এ ক্ষেত্রে নাই। আমি পারি না! আই কাণ্ট।

(ঘ)

অবিনাশবাবু মামলাটি সযত্নে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। সাজাবার অবশ্য বিশেষ কিছু ছিল না, তবু একটি স্থান ছিল যেটির জন্য গোটা মামলাটি সম্পর্কে প্রথমেই বিরূপ ধারণা হয়ে যেতে পারে। তার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েই রয়েছেন। তিনি স্থির জানেন যে, বিচারকের আসনে

উপবিষ্ট ওই যে লোকটির স্থির দৃষ্টি সামনের খোলা দরজার পথে বাইরের উন্মুক্ত প্রসারিত প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে লক্ষ্যহীনের মতো, যা দেখে মনে হচ্ছে এই আদালত-কক্ষের কোনো কিছুর সঙ্গেই তাঁর ক্ষীণতম যোগসূত্রও নেই, দৃষ্টির সঙ্গে কোন দূরে চলে গিয়েছে তাঁর মন উদাসী বৈরাগীর মতো, ঘটনার বর্ণনায় কোনো অসঙ্গতি ঘটলে অথবা ঘটনার ঠিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিতে মানুষটি সজাগ হয়ে উঠে বলবেন—ইয়েস। অথবা চকিত হয়ে ঘুরে তাকাবেন, ভুরুত্বটি প্রশ্নের ব্যঞ্জনায় কুঞ্চিত হয়ে উঠবে, এবং জিজ্ঞাসা করবেন—হোয়াট ? কি বললেন মিস্টার মিত্রা ? ডিড ইউ সে—?

অবিনাশবাবুর অনুমান মিথ্যা হল না ; আজও জজসাহেব চকিতভাবে ঘুরে অবিনাশবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, হোয়াট ? কি বলছেন মিঃ মিত্রা ? আপনি বলছেন ছোটভাই খগেন্দ্র ঘোষ, যে খুন হয়েছে, সে-ই আসামী বড়ভাই নগেনকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ? নগেন, এই আসামী, ডেকে নিয়ে যায় নি ?

অবিনাশবাবু খুশী হলেন মনে-মনে, এই প্রশ্নই তিনি চেয়েছিলেন ; তিনি সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নেড়ে বললেন—ইয়েস, ইয়োর অনার। তাই প্রকৃত ঘটনা। তাই বলেছি আমি।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন—হ্যাট্‌স্ অলরাইট। গো-অন প্লীজ।

অবিনাশবাবু বলে গেলেন—ইয়েস, ইয়োর অনার, ঘটনার যা পরিণতি তাতে সাধারণ নিয়মে আসামী নগেন এসে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল এই হলেই ঘটনাটি সোজা হত। এবং পূর্বের কথা অনুযায়ী নগেনেরই ডাকতে আসবার কথাও ছিল। কিন্তু সে আসে নি।

অবিনাশবাবু ধীর কণ্ঠে একটি একটি করে তাঁর বক্তব্যগুলি বলতে শুরু করলেন। কোনো আবেগ নাই, কোনো উত্তাপ নাই, শুধু যুক্তি-সম্মত বিশ্লেষণ।—নগেন আসে নি। তারই ডাকবার কথা ছিল, কিন্তু সে এল না, ডাকলে না। ইয়োর অনার, এইটিই হল আসামীর সুচিন্তিত পরিকল্পনার অতি সূক্ষ্ম চাতুর্যময় অংশ। অন্যদিকে এই অতিচতুরতাই তার উদ্দেশ্যকে ধরিয়ে দিচ্ছে, অত্যন্ত সহজে ধরিয়ে দিচ্ছে। সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা অত্যন্ত সহজেই এ-তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। অবশ্য আর-একটি ব্যাখ্যাও হতে পারে, কিন্তু তাতেও এই একই সত্যে উপনীত হই আমরা। ইয়োর অনার, সমস্ত বিষয়টি যথার্থ পটভূমির উপর উপস্থাপিত করে চিন্তা করে দেখতে হবে। পটভূমিকা কী ? পটভূমি হল—বাঙলা দেশের পল্লীগ্রামের একটি স্বল্পবিত্ত চাষীর সংসার। সুবল ঘোষ একজন চাষী। আমাদের দেশের পঞ্চাশ বছর আগের চাষীদের একজন। তখনকার দিনের ধর্মবিশ্বাসে সামাজিক বিশ্বাসে দৃঢ় বিশ্বাসী। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটি বাল্যকাল থেকেই বিচিত্র প্রকৃতির। সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, প্রথমটায় এই বালক ছিল অত্যন্ত দুর্দান্ত। বাপ একমাত্র ছেলেকে অনেক আশা পোষণ করে ইস্কুলে পড়তে দিয়েছিল। সাধ্যের অতিরিক্ত হলেও ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ, ভদ্র শিক্ষিত মানুষ তৈরী করবার সাধকে সে খর্ব করে নি। কয়েক মাইল দূরে বর্ধিষ্ণু গ্রামের ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে বোর্ডিংয়ে রেখেছিল। ইস্কুলের রেকর্ডে আমরা পাই, ছেলেটি আরও কতকগুলি দুর্দান্ত প্রকৃতির ছেলের সঙ্গে মিশে ইস্কুলে প্রায় নিত্যশাসনের পাত্র হয়ে ওঠে এবং দু-বছর পরেই ইস্কুল থেকে বিতাড়িত হয়। তার কারণ কী জানেন ? তার কারণ চৌর্যাপরাধ এবং হত্যা ; মানুষ নয়—জন্তু। বোর্ডিংয়ের কাছেই ছিল একজন ছাগল-ভেড়া ব্যবসায়ীর খামার এবং গোয়াল। এই গোয়াল থেকে নিয়মিতভাবে—দু-চার দিন পর পর—ছাগল-ভেড়া অদৃশ্য হত। কোনো চিহ্ন পাওয়া যেত না। রক্তের দাগ না, কোনো রকমের চীৎকার শোনা যেত না, কোনো হিংস্র জানোয়ারেরও কোনো প্রমাণ পাওয়া যেত না। শেষ পর্যন্ত অনেক সতর্ক চেষ্টার পর ধরা পড়ল

এই দলের একটি ছোট ছেলে। সে স্বীকার করলে, এ কাজ তাদের। তারা এই ছাগল-ভেড়া চুরি করে গভীর রাত্রে রান্না করে ফীস্ট করত। বিচিত্রভাবে অপহরণ করতে পটু এবং সক্ষম ছিল একটি বালক! এই আসামী নগেন ঘোষ। কয়েকটি গোপন প্রবেশ-পথ তারা করে রেখেছিল। একটি জানলাকে এমনভাবে খুলে রেখেছিল যে, কেউ দেখে ধরতে পারত না যে, জানলাটি টানলেই খুলে আসে। সেই পথে রাত্রে প্রবেশ করত এই নগেন এবং ঘরের মধ্যে ঢুকেই যেটিকে সে সামনে পেত, সেইটিকেই মুহূর্তে গলা টিপে ধরত, এবং সঙ্গে সঙ্গে মুচড়ে ঘুরিয়ে দিত। এতে সে প্রায় সিদ্ধহস্ত হয়েছিল। এমনটি আর অন্য কেউই পারত না। এই কারণের জন্যই হেড-মাস্টার তাকে ইস্কুল থেকে বিতাড়িত করেন। বাপ এর জন্য অত্যন্ত মর্মাহত। এবং ছেলেকে কঠিন তিরস্কার করে। তারা বৈষ্ণব, এই অপরাধ তাদের পক্ষে মহাপাপ। এই অপরাধ বাপকে এমনই পীড়া দিয়েছিল যে সে এই পাপের জন্য ছেলেকে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়ে পারে নি ; মাথা কামিয়ে শাস্ত্র-বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত! ছেলে সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করে। এবং বারো বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পর ফিরে আসে। তখন তার বয়স প্রায় আটাশ-উনত্রিশ। ইয়োর অনার, সন্ন্যাসীর বেশে ফিরে আসে। তখন এই যে ক্ষুদ্র শান্ত চাষীর সংসারটি, সে-সংসারে পরিবর্তনশীল কালের স্রোতে অনেক ভাঙন ভেঙেছে এবং অনেক নূতন গঠনও গড়ে উঠেছে। নগেনের মায়ের মৃত্যু হয়েছে, তার ভগ্নী বিধবা হয়েছে, বাপ সুবল ঘোষ বংশলোপের ভয়ে আবার বিবাহ করেছে, এবং একটি শিশুপুত্র রেখে সে-পত্নীটিও পরলোকগমন করেছে। সুবল ঘোষ তখন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। শিশুপুত্রটিকে মানুষ করছে সুবলের বিধবা কন্যা, আসামী নগেনের সহোদরা।

সুবল হারানো ছেলেকে পেয়ে আনন্দে অধীর হল এবং তার অঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশ দেখে কেঁদে আকুল হয়ে উঠল। বললে—তুই এ-বেশ ছাড়।

নগেন বললে—না।

বাপ বললে—ওরে তুই হবি সন্ন্যাসী, হয়তো নিজে পাবি পরমার্থ, মোক্ষ। কিন্তু এই আমাদের পিতৃপুরুষের ভিটে, এই ঘোষ বংশ? ভেসে যাবে?

নগেন বললে—ওই তো খগেন রয়েছে।

সুবল বললে—ছ বছরের ছেলে, ও বড় হবে, মানুষ হবে, ততদিনে মানুষ-অভাবে ঘর পড়বে, দোর ছাড়বে ; জমিজেরাত ক্ষুদকুঁড়ো দশজনে আত্মসাৎ করে পথের ভিখারী করে দেবে। ওই বিধবা ঘোষ বংশের যুবতী মেয়ে, তোর মায়ের পেটের বোন, ওর অবস্থা কী হবে ভাব? মন্দটাই ভাব!

নগেন বললে, বেশ, খগেনকে বড় করে ওর বিয়ে দিয়ে ঘরসংসার পাতিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমি রইলাম। কিন্তু আর কিছু আমাকে বোলো না।

পাবলিক প্রসিকিউটার অবিনাশবাবু তাঁর হাতের কাগজগুলি টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে কোর্টের দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকালেন। পাঁচটার দিকে চলেছে ঘড়ির কাঁটা। টেবিলের উপর কাগজ-ঢাকা কাচের গ্লাসটি তুলে খানিকটা জল খেয়ে আবার আরম্ভ করলেন, ইয়োর অনার, মানুষের মধ্যেই জীবনশক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। জড়ের মধ্যে যে-শক্তি অন্ধ দুর্বার, জন্তুর মধ্যে যে-শক্তি প্রবৃত্তির আবেগেই পরিচালিত, মানুষের মধ্যে সেই শক্তি মন বুদ্ধি ও হৃদয়ের অধিকারী হয়েছে। জন্তুর প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না ; সার্কাসের জানোয়ারকে অনেক শাসন করে অনেক মাদক খাইয়েও তার সামনে চাবুক এবং বন্দুক উদ্যত রাখতে হয়। একমাত্র মানুষেরই পরিবর্তন আছে, তার প্রকৃতি পাল্টায়। ঘাত-প্রতিঘাতে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, নানা

কার্যকারণে তার প্রকৃতির শুধু পরিবর্তনই হয় না, সেই পরিবর্তনের মধ্যে সে মহত্তর প্রকাশে প্রকাশিত করতে চায় নিজেকে, এইটেই অধিকাংশ ক্ষেত্রের নিয়ম। অবশ্য বিপরীত দিকের গতিও দেখা যায়, কিন্তু সে দেখা যায় স্বল্পক্ষেত্রে।

জ্ঞানবাবুর গম্ভীর মুখে একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল। অবিনাশবাবু চতুর ব্যক্তি। অসাধারণ কৌশলী। এইমাত্র যে-কথাগুলি তিনি বললেন, সেগুলি তাঁর অর্থাৎ জ্ঞানবাবুর কথা। কিছুদিন আগে এখানকার লাইব্রেরিতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এই কথাগুলিই বলেছিলেন।

অবিনাশবাবু বললেন—তৎকালীন আচার-আচরণ কাজকর্ম সম্পর্কে যে প্রমাণ আমরা পাই, তাতে আমি স্বীকার করি যে, আসামী নগেনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছিল এবং সে-পরিবর্তন সৎ ও শুদ্ধ পরিবর্তন। তার বারো বৎসরকাল অজ্ঞাতবাসের ইতিবৃত্ত আমরা জানি না কিন্তু পরবর্তীকালের নগেনকে দেখে বলতে হবে, এই অজ্ঞাতকালের সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শ এবং তীর্থ ইত্যাদি ভ্রমণের ফল নিঃসন্দেহে একটি পবিত্র প্রভাব বিস্তার করেছিল তার উপর। না-হলে, অর্থাৎ সেই বর্বর পাষণ্ডতা তার মধ্যে সক্রিয় থাকলে, সে অনায়াসেই তার বাপের মৃত্যুর পর ছ-বছরের বালক খগেনকে সরিয়ে দিয়ে নিষ্কণ্টক হতে পারত। তার পরিবর্তে সে এই সৎভাইকে ভালবেসে বুকে তুলে নিলে। শুধু তাই নয়, বাপের মৃত্যুর কিছুদিন পর বিধবা বোন মারা যায়। তারপর এই নগেনই একাধারে মা এবং বাপ দুইয়ের স্নেহ দিয়ে তাকে মানুষ করে। ছেলেটি দেখতে ছিল অত্যন্ত সুন্দর। নগেন খগেনকে খগেন বলে ডাকত না, ডাকত গোপাল বলে। টোপরের মত কোঁকড়া একমাথা চুল, কাঁচা রঙ, বড় বড় চোখ। ছেলেটি সত্যিই দেখতে গোপালের মত ছিল।

একটু থেমে হেসে অবিনাশবাবু বললেন—এক্সকিউজ মি ইয়োর অনার, আমি এ-ক্ষেত্রে একটু কাব্য করে ফেলেছি। বাট আই অ্যাম নট আউট অব মাই বাউণ্ডস, ইয়োর অনার। কারণ—

জ্ঞানবাবু বললেন—একটু সংক্ষেপ করুন।

অবিনাশবাবু বললেন—এই মামলাটি অতি বিচিত্র ধরনের, ইয়োর অনার, আমার মনে হয়, বর্তমান ক্ষেত্রে এমনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং তার বিশ্লেষণ ভিন্ন আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হতে পারব না। আসামী নিজে স্বীকার করেছে যে, নৌকো উল্টে নদীর মধ্যে দুজনে জলে ডুবে গিয়েছিল। ছোট ভাই সাঁতার ভাল জানত না, সে বড়ভাইকে জড়িয়ে ধরে, বড় ভাই আসামী নগেন সেই অবস্থায় নিজেকে তার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য আত্মরক্ষার জান্তব প্রবৃত্তির তাড়নায় তার গলার নলি টিপে ধরে। এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছোট ভাইয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভেসে উঠে কোনো রকমে এসে নদীর বাঁকের মুখে চড়ায় ওঠে। পরদিন সকালে ছোট ভাইয়ের দেহ পাওয়া যায় ওই চড়ায় আরও খানিকটা নীচে। মৃত খগেনের শবব্যবচ্ছেদের যে রিপোর্ট আমরা পেয়েছি, তাতেও দেখেছি খগেনের গলায় কণ্ঠনালীর দুইপাশে কয়েকটি ক্ষতচিহ্ন ছিল। ডাক্তার বলেন, নখের দ্বারাই এ ক্ষতচিহ্ন হয়েছে। এবং শবের পাকস্থলীতে জল পাওয়া গেছে অতি অল্প; জলে ডুবে মৃত্যু হলে আরও অনেক বেশী পরিমাণে জল পাওয়া যেত। ডাক্তার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এ মৃত্যু ঘটেছে শ্বাসরোধের ফলে এবং কণ্ঠনালী প্রচণ্ড শক্তিতে টিপে ধরার জন্য মৃতের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছিল। এখন এক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য, আসামী নগেন মানসিক কোন্ অবস্থায় খগেনের গলা টিপে ধরেছিল। সেই মানসিক অবস্থার অভ্রান্ত স্বরূপ নির্ণয়ের উপরই অভ্রান্ত বিচার নির্ভর করছে। সামান্যমাত্র ভ্রান্তিতে বিচারের পবিত্রতা, মহিমা কলঙ্কিত হতে পারে, নষ্ট হতে

পারে। আমরা নির্দোষ একটি অতি সাধারণ মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হয়ে মানবিক জ্ঞান হারিয়ে আত্মরক্ষার জান্তব প্রবৃত্তির অধীন হওয়ার জন্য তাকে ভুল করে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করার ভ্রম করতে পারি। অবার বিপরীত ভুলের বশে অতি-সুচতুর অতিকুটিল ষড়যন্ত্র ভেদ করতে না-পেরে নিষ্ঠুরতম পাপের পাপীকে মুক্তি দিয়ে মানব-সমাজের চরমতম অকল্যাণ করতে পারি। ইয়োর অনার, সিংহচর্মাবৃত গর্দভ সংসারে অনেক আছে, কিন্তু মনুষ্যচর্মাবৃত নরঘাতী পশু বা বিষধরের সংখ্যা আরও অনেক বেশী। সিংহচর্মাবৃত গর্দভের সিংহচর্মের আবরণ টেনে খুলে দিলেই সমাজ নিরাপদ হয়, সমাজে কৌতুকের সৃষ্টি হয়; মনুষ্যচর্মাবৃত পশু বা সরীসৃপের মনুষ্যচর্মের আবরণ মুক্ত করলে মানুষের সমাজ আতঙ্কিত হয়; তখন সমাজকে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে সমাজেরই উপরে। এই কারণেই আমাকে অতীতকাল থেকে এ-পর্যন্ত এই আসামীর জীবন ও কৃতকর্মগুলি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে। ধর্মাধিকরণে বিচারক মানুষ হয়েও মানুষের উর্দ্ধে অবস্থান করেন, স্থূল প্রমাণ-প্রয়োগসম্মত বিচার করার চেয়েও তাঁর বড় দায়িত্ব আছে; স্থূল প্রমাণ-প্রয়োগের আবরণ ছিঁড়ে মর্ম-সত্যকে আবিষ্কার করে তেমনি বিচার করতে হবে, যাকে বলতে পারি ডিভাইন জাস্টিস।

কোর্টের বাইরে কম্পাউণ্ডের ওদিক থেকে পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজতে লাগল ঢং ঢং। কোর্টরুমের ঘড়িতে তখনও পাঁচটা বাজতে দু-মিনিট বাকী।

নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জ্ঞানবাবু বললেন—কাল পর্যন্ত মামলা মুলতুবী রইল।

একবার তাকিয়ে দেখলেন আসামীর দিকে। সরল সুস্থদেহ নগেন ঘোষ, স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। আশ্চর্য স্থির দৃষ্টি, লোকটার মুখ যেন পাথরে গড়া। কোনো অভিব্যক্তি নাই।

লোকটি থানা থেকে এস-ডি-ও কোর্ট এবং এখান পর্যন্ত স্বীকার করে একই কথা বলে আসছে। নৌকাতে নদী পার হবার সময় বাতাস একটু জোর ছিল; মাঝ নদী পার হয়েই বাতাস আরও জোর হয়ে উঠেছিল, খগেন সাঁতার প্রায় জানত না, সে ভয় পেয়ে চীৎকার করে ওঠে, নগেন হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরে তাকে বলে, ভয় কী? খগেন মুহূর্তে নৌকোর ওপাশ থেকে এপাশে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে ছোট নৌকাখানা যায় উল্টে। জলের মধ্যে খগেন তাকে সজোরে আঁকড়ে ধরে। দুজনে ডুবতে থাকে। প্রথমটা নগেন তার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যত চেষ্টা করেছে, ততই সে নগেনকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছে। নগেনের বুকটা ফেটে যাচ্ছিল, জল খাচ্ছিল সে, হঠাৎ খগেনের গলায় তার হাত পড়ে। সে ওর গলাটা টিপে ধরে। খগেন তাকে ছেড়ে দেয়। সে জানে না, খগেন তাতেই মরেছে কিনা। কিনারায় এসে উঠে কিছুক্ষণ সে শুয়ে ছিল সেখানে। তারপর কোনোরকমে উঠে বাড়ি আসে। মাঝ রাত্রে তার শরীর সুস্থ হলে মনে হয়, খগেন হয়তো মরে গিয়েছে। হয়তো গলা টিপে ধরাতেই সে মরে গিয়েছে। সকালে উঠে সে থানায় যায়। এজাহার করে। এর সাজা কী সে তা জানে না। ভগবান জানেন। যা সাজা হয় জজসাহেব দিন, সে তাই নেবে।

ভগবান জানেন। হায় হতভাগা! নিজে কী করেছে তা নিজে জানে না। ভগবানকে সাক্ষী মানে। কিন্তু ভগবান তো সাক্ষী দেন না। অথচ ডিভাইন জাস্টিস করতে হবে বিচারককে।

দুই

(ক)

ডিভাইন জাস্টিস!

অবিনাশবাবু কথাটা যেন অভিপ্রায়মূলকভাবেই ব্যবহার করেছেন।

কথাটা জ্ঞানবাবু নিজেই বোধ করি অন্যের অপেক্ষা বেশী ব্যবহার করেন। স্থূল প্রমাণ-প্রয়োগ যেখানে একমাত্র অবলম্বন, মানুষ যতক্ষণ স্বার্থান্ধতায় মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না, ততক্ষণ ডিভাইন জাস্টিস বোধ হয় অসম্ভব। সরল সহজ সভ্যতাবঞ্চিত মানুষ মিথ্যা বললে সে-মিথ্যাকে চেনা যায়, কিন্তু সভ্য-শিক্ষিত মানুষ যখন মিথ্যা বলে তখন সে-মিথ্যা সত্যের চেয়ে প্রখর হয়ে উঠে। পারার প্রলেপ লাগানো কাচ যখন দর্পণ হয়ে ওঠে যখন তাতে প্রতিবিম্বিত সূর্যচ্ছটা চোখের দৃষ্টিকে সূর্যের মতই বর্ণান্ধ করে দেয়। জজ, জুরী, সকলকেই প্রতারিত হতে হয়। অসহায়ের মতো।

জাস্টিস চ্যাটার্জী বলতেন—He is God, God alone, He can do it.—আমরা পারি না। অমোঘ ন্যায়-বিধানের কর্তব্যবোধ এবং ন্যায়ের মহিমাকে স্মরণে রেখে প্রমাণ-প্রয়োগগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে, বিন্দুমাত্র ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে, আমরা শুধু বিধান অনুযায়ী বিচার করতে পারি।

একটি নারী অপরাধিনীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার সময় বলেছিলেন তিনি। সুরমা তাঁরই মেয়ে; সুরমা কেঁদে ফেলেছিল—একটা মেয়েকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে বাবা?

চ্যাটার্জী সাহেব বলেছিলেন—অপরাধের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের কৃতকর্মের গুরুত্ব এক তিল কমবেশী হয় না মা। দণ্ডের ক্ষেত্রেও নারী বা পুরুষ বলে কোনো ভেদ নাই। ঈশ্বরকে স্মরণ করে এক্ষেত্রে আমার এই দণ্ড না দিয়ে উপায় নেই।

তাঁরই কাছে জ্ঞানেন্দ্রনাথ শিখেছিলেন বিচারের ধারাপদ্ধতি। তিনিই ওঁর গুরু। জ্ঞানেন্দ্রবাবু ঈশ্বর মানেন না। ঈশ্বরকে স্মরণ তিনি করেন না। ঈশ্বর, ভগবান নামটি বড় ভাল। কিন্তু শুধুই নাম। তিনি সাক্ষীও দেন না, বিচারও করেন না, কিন্তু ওই নামের মধ্যে একটা আশ্চর্য পবিত্রতা আছে, বিচারের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ আছে; সেটিকেই তিনি স্মরণ করেন। তাই ডিভাইন জাস্টিস। ফিরবার পথে গাড়ির মধ্যে বসে বার বার তিনি আপনার মনে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করে চলেছিলেন—ডিভাইন জাস্টিস! ডিভাইন জাস্টিস!

'স্থূল প্রমাণ-প্রয়োগের আবরণ ছিঁড়ে মর্ম-সত্যকে আবিষ্কার করে তেমনি বিচার করতে হবে যা অভ্রান্ত, যাকে বলতে পারি ডিভাইন জাস্টিস!'

অবিনাশবাবুর কথাগুলি কানের পাশে বাজছে।

ডিভাইন জাস্টিস! ডিভাইন জাস্টিস!

স্ত্রী সুরমা দেবী কুঠীর হাতার বাগানের মধ্যে বেতের চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে বসে বই পড়ছিলেন। সারা দিনের বাদলার পর ঘণ্টাখানেক আগে মেঘ কেটে আকাশ নির্মল হয়েছে, রোদ উঠেছে। সে-রৌদ্রের শোভার তুলনা নেই। ঝলমল করছে সুস্নাত সুশ্যামল পৃথিবী। সম্মুখে পশ্চিম দিগন্ত অবারিত। কুঠীটা শহরের পশ্চিম প্রান্তে একটা টিলার উপর। এর ওপাশে পশ্চিমদিকে বসতি নেই, মাইল দুয়েক পর্যন্ত অন্য কোনো গ্রাম বা জঙ্গল কিছুই নেই, লাল কাঁকুরে প্রান্তরের মধ্যে তিন-চারটে অশ্বত্থগাছ আর একটা তালগাছ বিক্ষিপ্তভাবে এখানে

ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আর প্রান্তরটার মাঝখান চিরে চলে গেছে একটা পাহাড়িয়া নদী। ভরা বর্ষায় নদীটা এখন কানায় কানায় ভরে উঠে বয়ে যাচ্ছে। তারই ওপাশ অবধি প্রান্তরের দিগন্তের মাথায় সিঁদুরের মতো টকটকে রাঙা অস্তগামী সূর্য। রৌদ্রের লালচে আভা ক্রমশ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। গাড়িটা এসে দাঁড়াল। আর্দালী নেমে দরজা খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। জ্ঞানেন্দ্রবাবু এরই মধ্যে গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন। স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন গাড়ির মধ্যে। আর্দালী মৃদুস্বরে ডাকলে—হুজুর!

চমক ভাঙল জ্ঞানেন্দ্রবাবুর। ও! বলে তিনি গাড়ি থেকে নামলেন।

সুরমা দেবী স্বামীকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। বইখানা চায়ের টেবিলের উপর রেখে দিয়ে এগিয়ে এলেন। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে গাঢ় কণ্ঠেই বললেন—কতদিন চলবে সেসন্‌স্?

একটু হেসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন—বেশীদিন না। কেসটা জটিল কিন্তু সাক্ষীর সংখ্যা কম। দিনে বেশী দিন লাগবে না।

বাগানের মধ্যে চায়ের টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বললেন—বাগানে চায়ের টেবিল পেতেছ?

সুরমা বললেন—বৃষ্টি আসবে না। দেখছ কেমন রক্তসন্ধ্যা করেছে!

—হ্যাঁ। অপরূপ শোভা হয়েছে। আকাশের দিকে এতক্ষণে তিনি চেয়ে দেখলেন,—সুরমা কথাটা বলে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিতে তবে ফিরল সে দিকে। রক্তসন্ধ্যা! রক্তসন্ধ্যার মধ্যে জীবনের একটি স্মৃতি জড়ানো আছে। সুরমার সঙ্গে যে দিন প্রথম দেখা হয়েছিল,—সেদিনও রক্তসন্ধ্যা হয়েছিল আকাশে।

সুরমা বললেন—তাড়াতাড়ি এস একটু।

—Yes, time and tide wait for none;—হাসলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু।

—শুধু তার জন্যেই নয়। কবিতা শোনাব।

—এক্ষুনি আসছি।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু হাসলেন। গম্ভীর ক্লান্ত মুখখানি ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি খুশী হয়ে উঠেছেন। দীর্ঘদিন পর সুরমা কবিতা লিখে তাঁকে শোনাতে চেয়েছে। সুরমা কবিতা লেখে, তার ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লেখে। তখন লিখত হাসির কবিতা। সে-কালে নাম করেছিল। সুরমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর তিনিও কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। কবিতায় সুরমার কবিতার উত্তর দিতেন তিনি। এবং আবিষ্কার করেছিলেন যে তিনিও কবিতা লিখতে পারেন। অন্তত পারতেন। জজিয়তির দপ্তরে তাঁর সে-কবিত্ব পাথর-চাপা ঘাসের মতই মরে গেছে। কিন্তু সুরমার জীবনে বারোমাসে ফুল-ফোটানো গাছের মতো কাব্যরুচি এবং কবিকর্ম নিরন্তর ফুটেই চলেছে, ফুটেই চলেছে।

হয়তো অজস্র ফুল ফোটায় সুরমা, কিন্তু সে ফোটে তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে তাঁর নিশ্বাসের গণ্ডির বাইরে। কবে থেকে যে এমনটা ঘটেছে তার হিসেব তাঁর মনে নেই, কিন্তু ঘটে গেছে। হঠাৎ একদা আবিষ্কার করেছিলেন যে, সুরমা তাঁকে আর কবিতা শোনায় না। কিন্তু সে লেখে। প্রশ্ন করেছিলেন সুরমাকে; সুরমা উত্তর দিয়েছিলেন—হাসির কবিতা লিখতাম, হাসি ঠাট্টা করেই শোনাতাম। ওসব আর লিখি না। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—যা লেখ তাই শোনাও।

সুরমা বলেছিলেন—শোনাবার মত যেদিন হবে সেদিন শোনাব। জ্ঞানেন্দ্রনাথ একটু জোর করেছিলেন, কিন্তু সুরমা বলেছিলেন—ও নিয়ে জোর কোরো না। প্লিজ!

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ পরই ভুলে গিয়েছিলেন কথাটা। বারোমাসে ফুল-ফোটানো সেই গাছের মতোই সুরমার জীবন—যাতে শুধু ফুলই ফোটে, ফল ধরে না! সুরমা নিঃসন্তান।

আজ সুরমা কবিতা শোনাতে চেয়েছে। চিন্তা-ভারাক্রান্ত মন খানিকটা হালকা হয়ে উঠল। গুরুভারবাহীর ঘর্মাক্ত শ্রান্ত দেহে ঠাণ্ডা হাওয়ার খানিকটা স্পর্শ লাগল যেন।

একবার ভাল করে সুরমার দিকে তাকালেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। পরিণত-যৌবনা এ সুরমার মধ্যে সেই প্রথম দিনের তরুণী সুরমাকে দেখতে পাচ্ছেন যেন। ঘোষাল সাহেব বাঙলোর মধ্যে চলে গেলেন,—একটু ত্বরিত পদেই। সুরমা দেবী দাঁড়িয়েই রইলেন পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে।

সুরমার মনেও সেই স্মৃতি গুঞ্জন করে উঠেছে আজ। অনেকক্ষণ থেকে। সাড়ে চারটের সময় বাইরে বারান্দায় এসে দূরের ওই ভরা নদীটার দিকে চেয়ে বসে ছিলেন তিনি। ধীরে ধীরে নিঃশব্দ আয়োজনের মধ্যে আকাশে রক্তসন্ধ্যা জেগে উঠেছিল। তাঁর দৃষ্টি সেদিকে তখন আকৃষ্ট হয় নি। হঠাৎ রেডিয়োতে একটি গান বেজে উঠল। সেই গানের প্রথম কলি কানে যেতেই আকাশের রক্তসন্ধ্যা যেন মনের দোরে ডাক দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা।

শুধু রক্তসন্ধ্যার বর্ণচ্ছটাই নয়, তার সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার স্মৃতিটুকুও বর্ণাঢ্য হয়ে দেখা দিল।

সে কত কালের কথা! বর্ধমানে জজসাহেবের কুঠীতে ছিল তখন তারা। তার বাবা তখন বর্ধমানে সেসন্‌স্‌ জজ। উনিশ শো একত্রিশ সাল। আগস্ট মাস। এমনি বর্ষা ছিল সারাদিন। সন্ধ্যার মুখে ক্ষান্তবর্ষণ মেঘে এমনি রক্তসন্ধ্যা জেগে উঠেছিল। বাবা-মা বাড়িতে ছিলেন না, তাঁরা গিয়েছিলেন ইংরেজ পুলিশ সাহেবের কুঠীতে চায়ের নিমন্ত্রণে। নিজে সে তখন কলকাতায় থেকে পড়ত। সেইদিনই সে বাবা-মায়ের কাছে এসেছিল। সেই কারণেই তার নিমন্ত্রণ ছিল না, পুলিশ সাহেব জানতেন না যে সে আসবে। একা বাংলোর মধ্যে বসে ছিল, হঠাৎ পশ্চিমের জানালার পথে রক্তসন্ধ্যার বর্ণচ্ছটার একটা ঝলক ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল একখানা রঙীন উত্তরীয়ের মতো। এবং গোটা ঘরখানাকেই যেন রঙীন করে দিয়েছিল। একলা বাঙলোর মধ্যে তার যেন একটা নেশা ধরেছিল মনে প্রাণে। সে মুক্তকণ্ঠে ওই গানখানি গেয়ে উঠেছিল—

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা।

*　　*　　*　　*

মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া
অয়ি সন্ধ্যাস্বপনবিহারী

মনের উল্লাসে গাইতে গাইতে সে জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েই অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। সামনেই বাঙলোর হাতার মধ্যে সিঁড়ির নিচে বাইসিকল ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। সুন্দর, সুপুরুষ, দীর্ঘ-দেহ, গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যবান জ্ঞানেন্দ্রনাথও তখন পূর্ণ যুবক। বেশভূষায় যাকে স্মার্ট বলে তার চেয়েও কিছু বেশী। গলার টাইটি ছিল গাঢ় লাল রঙের, মনে আছে সুরমার। অপ্রতিভ হয়ে গান থামিয়ে সরে গিয়েছিল সে জানালার ধার থেকে। এবং আর্দালীকে ডেকে প্রশ্ন করেছিল—কে ও? 'কি চায়?

আর্দালী বলেছিল—এখানকার থার্ড মন্সব সাহেব। নতুন এসেছে। সাবকে সেলাম দেনে লিয়ে আয়ে থে।

—কতক্ষণ এসেছে? সাহেব নেই বল নি কেন?

—দো মিনিট সে জেয়াদা নেহি। বোলা সাহেব নেহি, চলা যাতে থে, লেকিন বাইসিকল পাংচার হো গয়া। ওহি লিয়ে দেরি হুয়া।

বাইসিক্ল পাংচার হয়েছে? হাসি পেয়েছিল সুরমার। বেচারী মুন্সব সাব, এমন সুন্দর স্যুটটি পরে এখন বাইসিক্ল ঠেলতে ঠেলতে চলবেন। বর্ধমানের রাস্তার লাল ধুলো জলে জলে গলে কাদায় পরিণত হয়েছে। মধ্যে মধ্যে খানাখন্দকের ভিতর লাল মিকশ্চার! সুরকি মিকশ্চার! একান্ত কৌতুকভরে সে আবার একবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিল।

আজ রেডিওতে ওই গানখানা শুনে রক্তসন্ধ্যার রূপ অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে সুরমা দেবীর মনে।

(খ)

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাঙলোয় ঢুকেই সামনের দেওয়ালের দিকে তাকালেন। ওখানে টাঙানো রয়েছে তরুণী সুরমার ব্রোমাইড এনলার্জ করা ছবি।

লাবণ্য-ঢলঢল মুখ, মদিরদৃষ্টি দুটি আয়ত চোখ, গলায় মুক্তোর কলারটি সুরমাকে অপরূপ করে তুলেছে। সে-আমলে এত বহুবিচিত্র রঙিন শাড়ির রেওয়াজ ছিল না, পাওয়াও যেত না, সুরমার পরনে সাদা জমিতে অল্প-কাজ-করা একখানি ঢাকাই শাড়ি। আর অন্য কোনো রকম শাড়িতে সুরমাকে বোধ করি বেশী সুন্দর দেখাত না। সেদিন জজসাহেবের কুঠীতে দেখেছিলেন শুধু সুরমার মুখ। সিঁড়ির নিচে থেকে তার বেশী দেখতে পান নি। দেখতে চানও নি। রক্তসন্ধ্যার রঙে ঝলমল-করা সে মুখখানার থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরে নি। দেখবার অবকাশও ছিল না। সুরমা জজসাহেবের মেয়ে; কলেজে পড়েন; প্রগতিশীল সমাজের লোক। জ্ঞানেন্দ্রনাথ তখন মাত্র থার্ড মুন্সেফ। গ্রাম্য হিন্দু মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মাত্র। তার সমাজের লোকে মুন্সেফি পাওয়ার জন্য 'রত্ন' বলে, ভাগ্যবান বলে। কিন্তু সুরমাদের সমাজের কাছে নিতান্তই ঝুটো পাথর এবং মুন্সেফিকেও নিতান্তই সৌভাগ্যের সান্ত্বনা বলে মনে করেন তাঁরা। সুরমাকে ঠিক এই বেশে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তাঁর নিজের বাসায়, কিছুদিন পরে। বোধ হয় মাস দেড়েক কি দু-মাস পর। তাঁর বাসা ছিল শহরের উকিল-মোক্তার পল্লীর প্রান্তে। বেশ একটি পরিচ্ছন্ন খড়ো বাঙলো দেখে বাসাটি নিয়েছিলেন। তখনও ইলেকট্রিক লাইট হয় নি। বাসের জন্য গরমের দেশে খড়ো বাংলোর চেয়ে আরামপ্রদ আর কোনো ঘর হয় না। সামনে একটুকরো বাগানও ছিল। সেদিন কোর্ট শেষ করে বাইসিক্লে চেপে বাড়ির একটু আগে একটা মোড় ফিরে, বাইসিক্লে-চাপা অবস্থাতেই তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর বাসার দরজায় মোটর দাঁড়িয়ে! কার মোটর? পরমুহূর্তে মোটরখানা চিনে তাঁর বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। এ যে সেসন্স্ জজের 'কার'! ওই তো পাশে দাঁড়িয়ে জজসাহেবের আর্দালী ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে। বাইসিক্ল থেকে বিস্মিত এবং ব্যস্ত হয়ে নেমে আর্দালীকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কে এসেছেন?

আর্দালী মুন্সেফ সাহেবকে সসম্ভ্রমে সেলাম করে বলেছিল—মিস্ সাহেব আয়ি হ্যায় হুজুর।

মিস্ সাহেব ? জজসাহেবের সেই কন্যাটি ? সেদিন বাঙলোয় তার গানই শুধু শোনেন নি জ্ঞানেন্দ্রনাথ, তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আহ্বানও শুনেছিলেন—আর্দালী !

শুধু তাই নয়। এই কলেজে-পড়া, অতি-আধুনিকা, বাপের আদরিণী কন্যাটি সম্পর্কে ইতিমধ্যে আরও অনেক কথা তিনি শুনেছেন। ব্যঙ্গ-কবিতা লেখে। বাক্যবাণে পারদর্শিনী। এখানকার নিলাম-ইস্তাহার-সর্বস্ব সাপ্তাহিকে জজসাহেবের মেয়ের ব্যঙ্গ-কবিতা প্রকাশিতও হয়েছে। তাও পড়েছেন। আরও একদিন এই মেয়েটিকে দেখেছেন ইতিমধ্যে। সেদিন বাঙলোয় শুধু মুখ দেখেছিলেন ; মধ্যে একদিন সব-জজসাহেবের বাড়িতে তাঁর ছোট ছেলের বিয়ে উপলক্ষে প্রীতি-সম্মেলনে মেয়েটিকে জজসাহেবের পাশে বসে থাকতেও দেখেছেন। দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটিকে ভাল লেগেছিল, তেমনি সম্ভ্রমও জেগেছিল তার সংযত গাম্ভীর্য দেখে। সেই মেয়ে এসেছেন তাঁর বাড়িতে ? কেন ? হয়তো প্রগতিশীল রাজকন্যা কোনো সমিতিটমিতির চাঁদার জন্য বা সুমতিকে তার সভ্য করবার জন্য এসে থাকবেন। সুমতি কি—?

আজ সুমতির নাম স্মৃতিপথে উদয় হতেই প্রৌঢ় জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুরমার ছবি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাঁ দিকের দেওয়ালের দিকে তাকালেন। দেওয়ালটার মাঝখানে কাপড়ের পরদা-ঢাকা একখানা ছবি ঝুলছে।

সুমতির ছবি। সুমতি তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। হতভাগিনী সুমতি ! জ্ঞানেন্দ্রবাবুর মুখ দিয়ে দুটি আক্ষেপভরা সকাতর ওঃ-ওঃ শব্দ যেন আপনি বেরিয়ে এল। তিনি দ্রুতপদে এ-ঘর অতিক্রম করে পোশাকের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সুমতির স্মৃতি মর্মান্তিক।

'আঃ' বলে একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। মর্মান্তিক মৃত্যু সুমতির। শার্টটা খুলছিলেন তিনি, আঙুলের ডগাটা নিজের পিঠের উপর পড়ল। গেঞ্জিটাও খুলে ফেললেন। পিঠের উপরটার চামড়া অসমতল, বন্ধুর। ঘাড় হেঁট করে বুকের দিকে তাকালেন। বুকের উপরেও একটা ক্ষতচিহ্ন। হাত বুলিয়ে দেখলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বুকের ক্ষত চিহ্নটার প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। বাঁ হাত দিয়ে পিঠের ক্ষতটা অনুভব করছিলেন। গোড়া পিঠটা জুড়ে রয়েছে। ওঃ ! এখনও স্পর্শকাতর হয়ে রয়েছে। বিশ বৎসর হয়ে গেল, তবু সারল না। কোট শার্ট গেঞ্জির নিচে ঢাকা থাকে। অতর্কিতে কোনো রকমে চাপ পড়লেই তিনি চমকে ওঠেন। কন-কন করে ওঠে। সুমতিকে শেষটায় চিনবার উপায় ছিল না। তিনি শুনেছেন, তবে কল্পনা করতে পারেন। তিনি তখন অজ্ঞান ; বোধ করি একবার যেন দেখে-ছিলেন। বারেকের জন্য জ্ঞান হয়েছিল তাঁর।

পোশাকের ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুমের ভিতর গিয়ে ঢুকলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। চৌকির উপর বসে হাতে মুখে জল দিলেন। সাবানদানি থেকে সাবানটা তুলে নিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই সারা বাথরুমটা একটা লালচে আলোর আভায় লাল হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; যেন দপ করে জ্বলে উঠেছে কোথাও প্রদীপ্ত আগুনের ছটা ! চমকে উঠলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু, হাত থেকে সাবানখানা পড়ে গেল, মুহূর্তের মধ্যে ফিরে তাকালেন পাশের জানালাটার দিকে। ছটাটা ওই দিক থেকেই এসেছে। জানালাটার ঘষা কাচগুলি আগুনের রক্তচ্ছটায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। একটা নিদারুণ আতঙ্কে তাঁর চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল, চীৎকার করে উঠলেন তিনি। একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ। ভাষা নেই ; শুধু রব।

* * * *

দপ করে আগুন জ্বলে উঠেছে বটে কিন্তু অগ্নিকাণ্ড যাকে বলে তা নয়।

জানালাটার ঠিক ওধারেই খানিকটা, বোধ করি আট-দশ ফুট খোলা জায়গার পরই কুঠীর বাবুর্চিখানায় বাবুর্চি ওমলেট ভাজছিল। ওমলেট ভাজবার পাত্রটা সম্ভবত মাত্রাতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। তার উপর ঘি ঢালতেই সেটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে, এবং বিভ্রান্ত পাচকের হাত থেকে ঘিয়ের পাত্রটাও পড়ে গেছে। আগুন একটু বেশীই হয়েছিল। তারই ছটা গিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে ঘষা কাচের জানালায়।

তাই দেখেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন।

ভয়ার্ত চীৎকার করতে করতে খালি গায়ে, খালি পায়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন। সে কী চীৎকার! শুধু ভয়ার্ত একটা ও-ও-ও-শব্দ শুধু। সুরমা দেবী ছুটে এসে তাঁকে ধরে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—কী হল? কী হল! ওগো! ওগো!

থরথর করে কাঁপছিলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। কিন্তু ধীমান পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি, দুরন্ত ভয়ের মধ্যেও তাঁর ধীমত্তা প্রাণপণে ঝড়ের সঙ্গে বনস্পতি-শীর্ষের মতো, লড়াই করে অবনমিত অবস্থা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াল। পিছন ফিরে বাঙলোর দিকে তাকালেন তিনি। চোখের ভয়ার্ত দৃষ্টির চেহারা বদলাল, প্রশ্নাতুর হয়ে উঠল। বললেন—আগুন। কিন্তু—

অর্থাৎ তিনি খুঁজছিলেন, যে-আগুনকে দাউ দাউ শিখায় জ্বলে উঠতে দেখলেন তিনি এক মিনিট আগে—সে আগুন কই? কী হল!

সুরমা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—আগুন? কোথায়?

আত্মগতভাবেই জ্ঞানেন্দ্রবাবু প্রশ্ন করলেন—কী হল? অগ্নির সে লেলিহান ছটা যে তিনি দেখেছেন, চোখ যে তাঁর ধেঁধে গিয়েছে। পরক্ষণেই ডাকলেন—বয়!

বয় এসে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করে বললে—একটু ক্ষণ জ্বলেছিল, তারপরই নিভে গিয়েছে।

জ্ঞানবাবু বললেন—এমন অসাবধান কেন? ঘরে আগুন লাগতে পারত!

বয় সবিনয়ে বললে—টিনের চাল—!

—লোকটার নিজের কাপড়-চোপড়ে লাগতে পারত। স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন—ওকে জবাব দিয়ে দাও! বলেই হন হন করে বাঙলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। সুরমা দেবী কোনো উত্তর দিলেন না। স্বামীর পিঠজোড়া ক্ষতচিহ্নের দিকে চেয়ে রইলেন। দীর্ঘ দিন পূর্বের কথা তাঁর মনে পড়ল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং সুমতি ঘরে আগুন লেগে জ্বলন্ত চাল চাপা পড়েছিলেন। খবর পেয়ে জজসাহেব এবং সুরমা ছুটে গিয়েছিলেন। ঘরে আগুন লেগেছিল রাত্রে। মফঃস্বল শহরের খড়ো বাঙলো-বাড়ি, শীতকাল, দরজা-জানালা শক্ত করে বন্ধ ছিল। খড়ের চালের আগুন প্রথম খানিকটা বোধ হয় বেশ উত্তাপের আরাম দিয়েছিল। যখন ঘুম ভেঙেছিল সুমতি ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের, তখন চারিদিক ধরে উঠেছে। দরজা খুলে বের হতে হতে সামনের চালটা খসে নীচে পড়ে যায়। সুমতি, জ্ঞানেন্দ্রবাবু জ্বলন্ত চাল চাপা পড়েন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু তার হাত ধরে বের করে আনছিলেন; মাঝখানে সুমতি কাচে পা কেটে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথও ছিটকে সামনে পড়ে বুকে পিঠে জ্বলন্ত খড় চাপা পড়েন। সুমতির সর্বাঙ্গ পুড়ে ঝলসে গিয়েছিল। ওঃ, সে কী মর্মান্তিক দৃশ্য! জ্ঞানেন্দ্রনাথ তখন হাসপাতালের ভিতরে বেডের উপর অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে। সুমতির দেহটা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। তুলে দেখিয়েছিল ডাক্তার।

ওঃ! ওঃ! ওঃ! সুরমা দেবীও চোখ বুজে শিউরে উঠলেন।

কী মিষ্টি চেহারা কী বীভৎস হয়ে গিয়েছিল। উঃ! সুমতিকে মনে পড়ছে। শ্যাম বর্ণ, এক-পিঠ কালো চুল, বড় বড় দুটি চোখ, একটু মোটাসোটা নরম-নরম গড়ন; মুক্তোর পাঁতির মতো সুন্দর দাঁতগুলি, হাসলে সুমতির গালে টোল পড়ত। এবং দুজনের মধ্যে অনির্বচনীয় ভালবাসা ছিল। অফিসার মহলে এ নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। হওয়ারই কথা। ব্রাহ্ম বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার জজসাহেবের কলেজে-পড়া মেয়ের সামান্য মুনসেফের স্ত্রী গ্রাম্য জমিদার-কন্যা অর্ধশিক্ষিতা সুমতির সঙ্গে এত নিবিড় অন্তরঙ্গতা কিসের? কেউ বলেছিল—কোথায় কোন জেলা ইস্কুলে সুরমা ও সুমতি একসঙ্গে পড়ত। কেউ বলেছিল সুরমা ও সুমতির পিতৃপক্ষ কোনকালে দার্জিলিং গিয়ে পাশাপাশি ছিলেন, তখন থেকে সখী দুজনে। হঠাৎ এখানে সব-জজের বাড়িতে দুজনে দুজনকে চিনে ফেলে, পুরানো সখিত্ব নতুন করে গড়ে তুলছে। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই একটা-না-একটা অসঙ্গতি বেরিয়েছেই বেরিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সত্য কথাটা প্রকাশ পেল।

সুমতি ছিল তার নিজের পিসতুতো বোন; জজসাহেব অরবিন্দ চ্যাটার্জি সুমতির মামা। সুমতির মায়ের সহোদর ভাই। কলেজে পড়বার সময় ব্রাহ্ম হয়ে সুরমার মাকে বিবাহ করেছিলেন। বাপ ত্যাজ্যপুত্র করেন। ছেলের নাম মুখে আনতে বাড়িতে বারণ ছিল। কোনো সম্পর্কও ছিল না দুই পক্ষের মধ্যে। অরবিন্দবাবু বিলেত গেলেন, ব্যারিস্টার হয়ে এসে বিচার বিভাগে চাকরি নিয়ে সম্পূর্ণরূপে আলাদা মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে খবর না রাখাই স্বাভাবিক। পিতৃপক্ষও রাখতেন না। রাখেন নি। বরং এই ছেলের নাম তাঁরা সযত্নে মুছে দিয়েছিলেন সে-কালের সামাজিক কলঙ্ক ও লজ্জার বিচিত্র কারণে। এ-পরিচয় প্রকাশ হলে সে-কালে সামাজিক আদান-প্রদান কঠিন হয়ে পড়ত। সুমতি তার মায়ের কাছে মামার নাম শুনেছিল। শুনেছিল, তিনি ব্রাহ্ম হয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছেন, এই পর্যন্ত। তার মা বিয়ের সময় বার বার করে বলে দিয়েছিলেন, মামার কথা যেন গল্প করিস নে। কী জানি কে কী ভাবে নেমে! সুরমা অবশ্য গল্প শুনেছিল, তার বাবার কাছে। ইদানীং জজসাহেব অরবিন্দ চ্যাটার্জি একটু ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে রাত্রি-কালে ব্র্যাণ্ডি পান করে মায়ের জন্য কাঁদতেন। বলতেন, মাই মাদার ওয়াজ এ গডেস! আর কি সুন্দর তিনি ছিলেন! সাক্ষাৎ মাতৃদেবতা! যেন সাক্ষাৎ আমার বাঙলাদেশ! শ্যাম বর্ণ, একপিঠ ঘন কালো চুল, বড় বড় চোখ, মুখে মিষ্টি হাসি, নরম-নরম গড়ন—আহা-হা!

সুমতির চেহারা ছিল ঠিক তাঁর মতো, নিজের মায়ের মতো। সেই দেখেই প্রকাশ পেল সেই পরিচয়। চিনলেন চ্যাটার্জি সাহেব নিজেই। বর্ধমানে সুমতিরা মাস দুয়েক এসেছে তখন। সবজজের বাড়িতে ছোট-ছেলের বিবাহে সামাজিক অনুষ্ঠান—বউভাতের প্রীতিভোজন। সুরমা, সুরমার মা এবং বাবা বাইরের আসরে বসে ছিলেন, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, পুলিস সাহেব, ডাক্তার সাহেবরাও সস্ত্রীক বসে ছিলেন, পাশে একটু তফাত রেখে বসেছিলেন ডেপুটি, সবডেপুটি, মুনসেফের দল। তাঁদের গৃহিণীদের আসর হয়েছিল ভিতরে; এই আসরের মাঝখানের পথ দিয়েই তাঁরা ভিতরে যাচ্ছিলেন। সুমতিও চলে গিয়েছিল। সুরমার বাবা কথা বলছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। তিনি অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন, দৃষ্টিতে ফুটে উঠল অপরিসীম বিস্ময়। পরক্ষণেই অবশ্য তিনি আত্মসম্বরণ করে আবার কথা বলতে

শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেই ক্ষণিকের বিস্ময়-বিমূঢ়তা লক্ষ্য করেছিলেন অনেকেই। সুরমার মারও চোখ এড়ায় নি। কিছুক্ষণ পর যে কথা তিনি বলছিলেন সেই কথাটা শেষ হতেই আবার যেন গভীর অন্যমনস্কতায় ডুবে গেলেন। সুরমার মা আর আত্মসম্বরণ করতে পারেন নি, মৃদুস্বরে প্রশ্ন করেছিলেন—কী ব্যাপার বলো তো ?

—অ্যাঁ—? চমকে উঠেছিলেন সুরমার বাবা।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হঠাৎ কী হল তোমার ? তখন এমন ভাবে চমকে উঠলে ? আবারও যেন কেমন তন্ময় হয়ে ভাবছ !

—কতকাল পর হঠাৎ যেন মাকে দেখলাম। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চ্যাটার্জি সাহেব কথাটা বলেছিলেন।—অবিকল আমার মা। অবিকল! তফাত, এ মেয়েটি একটু মডার্ন।

—কে ? কী বলছ তুমি ?

—লালপেড়ে গড়দের শাড়ি পরে একটি মেয়ে তখন বাড়ির ভিতর গেল, দেখেছ ? শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ, কপালে সিঁদুরের টিপটা একটু বড়, গোঁড়া হিন্দুর ঘরে যেমন পরে। অবিকল আমার মা ! ছেলেবেলায় যেমন দেখতাম !

এর উত্তরে সুরমার মা কী বলবেন, চুপ করেই ছিলেন। চ্যাটার্জি সাহেবও কয়েক মিনিটের জন্য চুপ করে গিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ একটু সামনে ঝুঁকে মৃদুস্বরে বলেছিলেন—একটু খোঁজ নিতে পার ? কে, কে এ মেয়েটি ? সহজেই বের করতে পারবে, লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরে এসেছে, ভারি নরম চেহারা, কচি পাতার মতো শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ, কপালে সিঁদুরের টিপটা বড়। সহজেই চেনা যাবে। দেখ না ? দেখবে ?

অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন নি সুরমার মা। এবং সহজেই সুমতিকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। ফিরে এসে বলেছিলেন—এখানে নতুন মুনসেফ এসেছেন, মিস্টার ঘোষাল, তাঁর স্ত্রী।

—থার্ড মুনসেফের স্ত্রী ?—একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, অবিকল আমার মা। মেয়েটির সিঁথির ঠিক মুখে, এই আমার এই কপালে যেমন একটা চুলের ঘূর্ণি আছে, তেমনি একটা ঘূর্ণি আছে। আমার মায়ের ছিল।

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে চ্যাটার্জি সাহেব মদ্যপান করে মায়ের জন্য হাউ-হাউ করে কেঁদেছিলেন। নিশ্চয় আমার মা! এ জন্মে—

সুরমার মা বলেছিলেন—পুনর্জন্ম ? বোলো না, লোকে শুনলে হাসবে।

হঠাৎ চ্যাটার্জি সাহেব বলেছিলেন—তা না হলে এমন মিল কী করে হল ? ইয়েস। হতে পারে। সুরো, মামি, তুমি একবার কাল যাবে এই মেয়ের কাছে ? তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পার। জেনে এসো, ওর বাপের নাম কী, ঠাকুরদাদার নাম কী, কোথায় বাড়ি ?

সুরমার মার খুব মত ছিল না, কিন্তু প্রৌঢ় বাপের এই ছেলেমানুষের মতো মা-মা করা দেখে সুরমা বেদনা অনুভব করেছিল, না-গিয়ে পারে নি।

সুমতি অবাক এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল প্রথমটা। খোদ জজসাহেবের মেয়ে এসেছেন, কলেজ-পড়া আধুনিকা মেয়ে ! যে-মেয়ে সমাজে সভায় তাদের থেকে অনেক তফাতে এবং উঁচুতে বসে, সে নিজে এসেছে তাদের বাড়ি !

সুরমা গোপন করে নি। সে হেসে বলেছিল—আপনি নাকি অবিকল আমার ঠাকুরমার মতো দেখতে। এমন কি আপনার সিঁথির সামনের চুলের এই ঘূর্ণিটা পর্যন্ত। আমার

বাবার মধ্যে আবার একটি ইটারন্তাল চাইল্ড, মানে চিরন্তন খোকা আছে। মায়ের নাম করে প্রায় কাঁদেন। কাল সে কী হাউ-হাউ করে কান্না! তাই এসেছি, আপনার সঙ্গে ঠাকুমা পাতাতে।

সুমতি স্থির দৃষ্টিতে সুরমার দিকে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ।

সুরমা হেসে বলেছিল—অবাক হচ্ছেন? অবাক হবার কথাই বটে? কিন্তু আপনার বাপের বাড়ি কোথায়, বলুন তো? আপনি কি অবিকল আপনার ঠাকুরমার মতো দেখতে?

সুমতি বলেছিল—না। তবে আমার দিদিমার সঙ্গে আমার চেহারার খুব মিল। মা বলেন—অবিকল।

এর উত্তরে আসল সম্পর্ক আবিষ্কৃত হতে বিলম্ব হয় নি। সুমতি ছিল অবিকল তার দিদিমার মতো দেখতে। দিদিমা তার জন্মের পরও কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন, নইলে এই ঘটনার পর অন্তত লোকে বলত, তিনিই ফিরে এসে সুমতি হয়ে জন্মেছেন, এবং ধর্মান্তর-গ্রহণ-করা অরবিন্দ চ্যাটার্জি জজসাহেবের সঙ্গে এই দেখা হওয়াটি একটি বিচিত্র ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হত; লোকে বলত জজসাহেব-ছেলের সমাদর পাবার জন্তই ফিরে এসেছেন তিনি। এ-সব কথা সুমতি বলে নি, বলেছিল সুরমা। সুমতি খুব হেসেছিল, খুব হাসতে পারত সে। ঠিক এই সময়েই বাসার বাইরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। দরজায় জজসাহেবের আর্দালী এবং গাড়ি দেখে কী করা উচিত ভেবে না পেয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন নিজ বাসভূমে পরবাসীর মতো। সারাটা দিন মুনসেফী কোর্টে রেণ্ট-সুট আর মনি-সুটের জট ছাড়িয়ে, কলম পিষে, শ্রান্ত দেহে ও ক্লান্ত মস্তিষ্ক নিয়ে মাইল তিনেক বাইসিক্ল ঠেঙিয়ে বাড়ি ফিরে দেখেছিলেন গৃহদ্বার একরকম রুদ্ধ, খোলা থাকলেও প্রবেশাধিকার নেই। বাইরের ঘরে সুমতির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সুরমাই জ্ঞানেন্দ্রনাথের এই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা দেখতে পেয়েছিল এবং প্রচুর কৌতুকে বয়স- ও স্বভাব-ধর্মে কৌতুকময়ী হয়ে উঠেছিল।

(ঘ)

বয়!

সুরমা চমকে উঠলেন। স্বামী বাঙলোর মধ্যে ফিরে যাওয়ার পর থেকেই সুরমা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই ছিলেন। স্বামীর ভয়ার্ত অবস্থা এবং পিঠের বুকের ক্ষতচিহ্ন দেখে অতীত কথাগুলি মনে পড়ে গিয়েছিল। সুমতির ওই মর্মান্তিক মৃত্যুস্মৃতির বেদনার মধ্যে তাঁর নিজের তরুণ জীবনের পূর্বরাগের রঙিন দিনগুলির প্রতিচ্ছবি ফুটে রয়েছে। একরাশি কালো কয়লার উপর কয়েকটি মরা প্রজাপতির মতো।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন তিনি। পায়জামা, পাঞ্জাবি পরে রবারের স্লিপার পায়ে কখন যে উনি এসেছেন তা তিনি জানতে পারেন নি। বাঙলোর দিকে পিছন ফিরে রক্তসন্ধ্যার দিকেই তিনি তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চেয়ার টেনে বসে পড়লেন, তাঁর চোখ-মুখ এখনও যেন কেমন থমথম করছে। তাঁকে দেখে সুরমা শঙ্কিত হলেন, মনে হল ক্লান্ত বড় তিনি। সুরমা এগিয়ে এসে মিঃ ঘোষালের পিছনদিকে দাঁড়িয়ে তাঁর কাঁধের উপর নিজের হাত দুখানি গাঢ় স্নেহের সঙ্গে রেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—ডাক্তারকে একবার খবর দেব?

—ডাক্তার? একটু চকিত হয়ে উঠলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ—কেন?

—তুমি অত্যন্ত আপসেট হয়ে গেছ। নিজে বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছ না। এখনও পর্যন্ত—

পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর হাতখানি ধরে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন—নাঃ। ঠিক আছি আমি।

—না। তুমি তোমার আজকের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারছ না। আগুন নিয়ে তোমার ভয় আছে। একটুতেই চমকে ওঠ, কিন্তু এমন তো হয় না। তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আর এ-ভাবে পরিশ্রম—

বাধা দিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ হেসে বললেন—নাঃ, আমি ঠিক আছি। আজকের ঘটনাটা একটু অস্বাভাবিক!

—আগুনটা কি খুব বেশী জ্বলে উঠেছিল?

—উঃ, সে তুমি কল্পনা করতে পারবে না। বাথরুমের জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে রিফ্লেকশ্যনে ঘরটা একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছিল! অবশ্য আমিও একটু—একটু, কী বলব, dreamy, স্বপ্নাতুর ছিলাম। ঠিক শক্তমাটির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম না। চমকে একটু বেশী উঠেছি।

—মানে?

—বলছি। সামনে এসো, পিছনে থাকলে কি কথা বলা হয়?

সুরমা সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। ওঁদের দুজনের পিছনে বাবুর্চি চায়ের ট্রে এবং খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছিল, সাহেব এবং মেমসাহেবের এই হাত-ধরাধরি অবস্থার মধ্যে সামনে আসতে পারছিল না, সে এইবার সুযোগ পেয়ে এগিয়ে এসে টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জামগুলি নামিয়ে দিল।

সুরমা বললেন—যাও তুমি, আমি ঠিক করে নিচ্ছি সব।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন—ইয়ে দফে তুমহারা কসুর মাফ কিয়া গয়া, লেকিন দুসরা দফে নেহি হোগা। হুঁশিয়ার হোনা চাহিয়ে। তুমহারা লুগামে আগ লাগা যাতা তো কেয়া হোতা? আঁঃ?

সেলাম করে বাবুর্চি চলে গেল।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন—আজকের ঘটনাগুলো আগাগোড়াই আমাকে একটু—কী বলব—একটু—ভাবপ্রবণ করে তুলেছিল। এখানে এসেই তোমাকে দেখলাম, রক্তসন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছ। সেই পুরনো কবি-কবি ভাব! দীর্ঘদিন পর বললে কবিতা শোনাব। পুরনো শুকনো মাটিতে নতুন বর্ষার জল পড়লে সেও খানিকটা সরস হয়ে ওঠে। আমার মনটাও ঠিক তা-ই হয়ে উঠেছিল। মনে পড়ে গেল একসঙ্গে অনেক কথা। রক্তসন্ধ্যার দিন বর্ধমান জজকুঠিতে তোমাকে দেখার কথা। ঘরে ঢুকেই ওদিকের দরজার মাথায় তোমার সেই ছবিটা—হ্যাট রিমাইণ্ডেড মি—সেই প্রথম দিনের পরিচয় হওয়ার কথা মনে পড়িয়ে দিলে। স্বাভাবিকভাবে মনে পড়ল সুমতিকে। সেই হতভাগিনীর কথা ভাবতে ভাবতেই বাথরুমে ঢুকেছিলাম। গেঞ্জি খুলতে গিয়ে রোজই পিঠের পোড়া চামড়ায় হাত পড়ে। আজও পড়েছিল। কিন্তু আজ মনে পড়ছিল সেই আগুনের কথা। ঠিক মনের এই ভাববিহ্বল অবস্থার মধ্যে হঠাৎ বাইরে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আমার মনে হল আমাকে ঘিরে আগুনটা জ্বলে উঠল।

চায়ের কাপ এবং খাবারের প্লেট এগিয়ে দিলেন সুরমা। মৃদুস্বরে বললেন—তবু বলব আজ ব্যাপারটা যেন কেমন। আগুনকে ভয় তোমার স্বাভাবিক। কিন্তু—।

আগুনকে ভয় তাঁর স্বাভাবিক, অতর্কিত আগুন দেখলে চকিত হয়ে ওঠেন, খড়ের ঘরে শুতে পারেন না, রাত্রে বালিশের তলায় দেশলাই পর্যন্ত রাখেন না। সিগারেট পর্যন্ত খান না তিনি। বাড়ির মধ্যে পেট্রোল-কেরোসিনের টিন রাখেন না। কখনও খোলা জায়গায় ফায়ার-ওয়ার্কস্ দেখতে যান না। কিন্তু আজ যেন ভয়ে কেমন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে হেসে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বোধ করি সমস্ত ঘটনাকে হালকা করে দেবার অভিপ্রায়েই হেসে সুরমার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে দেখিয়ে বললেন—ওসব কিছু না। তুমি! সমস্তটার জন্য রেসপন্সিবি্ল তুমি।

—আমি [illegible]

—হ্যাঁ, তুমি। [illegible] কবি হলে বলতাম, 'এলোচুলে বহে এনেছ কি মোহে সেদিনের পরিমল!' বললাম তো—আজকের তোমাকে দেখে প্রথম দিনের দেখা তোমাকে মনে পড়ে গেল। এবং সব গোলমাল করে দিলে! জজসাহেবের কলেজে-পড়া তরুণী মেয়েটি সেদিন যেমন মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল, আজও মাথাটা সেই রকম ঘুরে গেল!

হেসে ফেললেন সুরমা দেবী।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন—ওঃ সেদিন যা সম্বোধনটা করেছিলে। ভ্যাবাকান্ত!

এবার সশব্দে হেসে উঠলেন সুরমা। বললেন—বলবে না? নিজের বাড়ির দোরে এসে বাড়িতে জজসাহেবের কলেজে-পড়া মেয়ে এসেছে শুনে একজন মডার্ন তরুণ যুবক পেট-জ্বালা-করা খিদে নিয়ে মুখ চুন করে ফিরে যাচ্ছেন। কী বলতে হয় এতে তুমি বল না? গাঁইয়া কোথাকার!

সেদিন বাড়ির দোর থেকে মুখ চুন করে সত্যিই ফিরে যাচ্ছিলেন থার্ড মুনসেফ জ্ঞানেন্দ্রনাথ। কী করবেন? জজসাহেবের কলেজে-পড়া মেয়ে, কোথায় কী খুঁত ধরে মেজাজ খারাপ করবে, কে জানে। তার চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল। ঠিক এই সময়েই সামনের ঘরের পর্দা সরিয়ে সুরমাই আবির্ভূত হয়েছিল; জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিব্রত অবস্থা দেখে অন্তরে অন্তরে কৌতুক তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেদিন তখন সে জজসাহেবের মেয়ে এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুনসেফ নয়; আত্মীয়তার মাধুর্য, পদমর্যাদার পার্থক্যের রূঢ়তা ভুলিয়ে দিয়েছে, বরং খানিকটা মোহের সৃষ্টি করেছিল এমন বিচিত্র ক্ষেত্রে। তাই সুমতির আগে সে-ই পর্দা সরিয়ে মৃদু হেসে বলেছিল—আসুন মিস্টার ঘোষাল; বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে! আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি। আলাপ করতে এসেছি।

সুমতি সুরমার পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেসে বলেছিল—এসো। সুরমা আমার মামাতো বোন! ওর বাবা আমার সেই মামা, যিনি বাড়ি থেকে চলে গিয়ে—।

বাকিটা উহ্যই রেখেছিল সুমতি।

—কী আশ্চর্য!

একমাত্র ওই কথাটিই সেদিন খুঁজে পেয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

সুরমা বলেছিল—ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কিন্তু তখনও বসেন নি। বসতে সাহসই বোধ করি হয় নি অথবা অবস্থাটা ঠিক স্বাভাবিক বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। সুরমাই বলেছিল—কিন্তু আপনি বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন যে? আমি তো আপনাদের আত্মীয়। আপনজন!

বেশ ভঙ্গী করে একটু ঘাড় দুলিয়ে চোখ দুটি বড় করে বক্র হেসে সুমতি বলেছিল—অতি-মিষ্টি আপনজন, শালী।

সুরমাতে গ্রাম্যতার ছোঁয়াচ লেগে গিয়েছিল মুহূর্তে। সভ্যতাকে বজায় রেখে জ্ঞানেন্দ্র-নাথের মতো সুপুরুষ অপ্রতিভ বিব্রত তরুণটিকে বিদ্রূপ না করে তৃপ্তি হচ্ছিল না। এই গ্রাম্য ছোঁয়াচের সুযোগ নিয়ে উচ্ছল হয়ে সে বলে উঠেছিল—হলে কী হবে, ভগ্নীপতিটি আমার একে-বারে ভ্যাবাকান্ত।

সুমতি হেসে উঠেছিল।

পরক্ষণেই নিজেকে সংশোধন করবার অভিপ্রায়েই সুরমা বলেছিল—মাফ করবেন। রাগ করবেন না যেন।

সুমতি আবারও তেমনি ধারায় ঘাড় দুলিয়ে বলেছিল—শালীতে ও[illegible] খারাপ ঠাট্টা করে। এ আবার লেখাপড়া-জানা আধুনিকা শালী ; এ ঠাট্টা ভোঁতা নয়, চোঁখা।

এতক্ষণে জ্ঞানেন্দ্রনাথ একটা ভাল কথা খুঁজে পেয়েছিলেন, বলেছিলেন—শ্যালিকার ঠাট্টা খারাপ হলেও খারাপ লাগে না, চোখা হলেও গায়ে বেঁধে না। মহাভারতে অর্জুনের প্রণাম-বাণ চুম্বন-বাণের কথা পড়েছ তো? বাণ—একেবারে শানানো ঝকঝকে লোহার ফলা-বসানো তীর—সে-তীর এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ত, কিম্বা কপালে এসে মিষ্টি ছোঁয়া দিয়ে পড়ে যেত। শ্যালিকার ঠাট্টা তাই। ওদের কথাগুলো অন্যের কাছে শানানো বিষানো মনে হলেও ভগ্নীপতি-দের কানের কাছে পুষ্পবাণ হয়ে ওঠে। তার উপর ওঁর মতো শ্যালিকা।

সুমতি চা করতে করতে মুহূর্তে মাথা তুলে তাদের দিকে তাকিয়েছিল। কুঞ্চিত দুটি ভ্রূর নীচে সে-দৃষ্টি ছিল তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। বলেছিল—কী কথার শ্রী তোমার! ও তোমাকে পুষ্পবাণ মারতে যাবে কেন? পুষ্পবাণ কাকে বলে? কী মনে করবে সুরমা?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিলেন, ঘরের পরিমণ্ডল অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল।

(৬)

কথাটা দুজনেরই মনে পড়ে গেল। অতীত কথার সরস স্মৃতি স্মরণ করে যে-আনন্দমুখরতা সন্ধ্যার আকাশে তারা ফোটার মতো ফুটে ফুটে উঠছিল, তার উপর একখানা মেঘ নেমে এল। দুজনেই প্রায় একসঙ্গে চুপ করে গেলেন। একটু পর সুরমা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন—আর একটু চা নেবে না?

—না।

স্থিরদৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চেয়ে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'না' বলেই তিনি উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। পিছনের দিকে হাত দুটি মুড়ে পায়চারি করতে লাগলেন। হাতার ওপাশে একটা রাখাল একটা গোরুকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওঃ! সুমতি তাঁকে ওর চেয়েও নিষ্ঠুর তাড়নায় তাড়িত করেছে। ওঃ! গোরু-মহিষের দালালরা ডগায় ছুঁচ বা আলপিন-গোঁজা লাঠির খোঁচায় যেমন করে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় তেমনিভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে! সে কী নিষ্ঠুর যন্ত্রণা! যে-যন্ত্রণায় জীবনের সমস্ত বিশ্বাস তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন—ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাস, সব বিশ্বাস। ঈশ্বরের নামে শপথ করেছেন তিনি সুমতির কাছে, ধর্মের নামে শপথ করেছেন। সুমতি মানে নি। দিনের

মাথায় দু'তিন বার বলত—বলো, ভগবানের দিব্যি করে বলো! বলো, ধর্মের মুখ চেয়ে বলো!

তিনি বলেছেন। তার শপথ নিয়ে বললে বলেছে—আমি মরলে তোমার কী আসে যায়? সে তো ভালই হবে!

ওই প্রথম দিন থেকেই সন্দেহ করেছিল সুমতি। সে বার বার বলেছে—ওই—ওই এক কথাতেই আমি বুঝেছিলাম। সে-ই প্রথম দিন। তার চোখ দুটো জলন্ত। প্রথম দিন রহস্যের আবরণ দিয়ে যে কথাগুলি বলেছিল তার প্রতিটির মধ্যে এ সন্দেহের আভাস ছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুরমা দুজনের একজনও সেটা ধরতে পারেন নি সেদিন।

অরবিন্দ চ্যাটার্জির মতো উদার লোককেও সে কটু কথা বলত। নিজের মায়ের সঙ্গে নিবিড় সাদৃশ্যের জন্য চ্যাটার্জি সাহেবের স্নেহের আর পরিসীমা ছিল না। সুমতিকে দিয়েথুয়ে তাঁর আর আশ মিটত না। সুমতির স্বামী বলে জ্ঞানেন্দ্রনাথের উপরেও ছিল তাঁর গভীর স্নেহ। সে-স্নেহ তাঁর গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথের বুদ্ধিদীপ্ত অন্তরের স্পর্শে, জ্ঞানেন্দ্রনাথের উদার মন এবং প্রসন্ন মুখশ্রীর আকর্ষণে। তিনি ওঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। সুমতি তাঁর কাছে ঘেঁষতে চাইত না; অরবিন্দবাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথকে কাছে টেনে ওঁরই হাত দিয়ে সুমতিকে স্নেহের অজস্র সম্ভার পাঠাতে চাইতেন। ওঁর জীবনের উন্নতির পথ তিনিই করে দিয়েছিলেন। রায় লেখার পদ্ধতি, বিচারের সিদ্ধান্তে উপনীত হবার কৌশল—তিনিই ওঁকে শিখিয়েছিলেন। এসব কিছুই কিন্তু সহ্য হত না সুমতির। তাঁর পাঠানো কোনো জিনিস জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিয়ে এলে তা ফেরত অবশ্য পাঠাত না সুমতি, কিন্তু তা নিজে হাতে গ্রহণ করত না। বলত—ওইখানে রেখে দাও। কী বলব দেওয়াকে। আর কী বলব দিদিমার চেহারার সঙ্গে আমার আদলকে। কী বলব জজসাহেবের বুড়ো বয়সে উথলে-ওঠা ভক্তিকে। গোরু মেরে জুতো দান! সেই দান আমার নিতে হচ্ছে!

রায় লেখা বা বিচার-পদ্ধতি শেখানো নিয়ে বলত—মুখে ছাই বিচার-শেখানোর মুখে। যে একটা মেয়ের জন্যে ধর্ম ছাড়তে পারে, সে তো অধার্মিক। যে অধার্মিক, সে বিচার করবে কী? ধর্ম নইলে বিচার হয়? আর সেই লোকের কাছে বিচার শেখা!

থাক। সুমতির কথা থাক! সুমতির ছবি দেওয়ালে টাঙানো থেকেও পর্দাঢাকা থাকে। অরবিন্দবাবু বলতেন, সুমতির কথা নিয়ে বলতেন—কী করবে? সহ্য করো। ভালবাসো ওকে। Love is God, God is Love.

চ্যাটার্জি সাহেব বলতেন—ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি নে। ব্রহ্ম-ট্রহ্ম ও-সবও না। আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম; সে ব্রাহ্ম-ঘরের মেয়ে, সেইজন্য আমি ব্রাহ্ম হয়েছি। তবে ঈশ্বরত্বের কল্পনাতে আমি বিশ্বাস করি, সেখানে পৌঁছুতে চেষ্টা করি। জ্ঞানেন্দ্র, সব মানুষ করে, সব মানুষ। ওই ঈশ্বরত্ব। একটি পবিত্র একটি মহিমময় মানুষের মানসিক সত্তায় তার প্রকাশ!

সুমতির ক্ষুদ্রতা, তাঁর ভালবাসার জন্য ধর্মান্তর গ্রহণের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে মানুষটি কখন চলে আসতেন সর্বজনীন জীবনদর্শনের মহিমময় প্রাঙ্গণে, মুখের সকল বিষণ্ণতা মুছে যেত, এই রক্তসন্ধ্যার আভার মতো একটি প্রদীপ্ত প্রসন্ন প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত মুখখানি। দূর-দিগন্তে দৃষ্টি রেখে মানসলোক থেকে তিনি কথা বলতেন—এখন আমার উপলব্ধি হচ্ছে ঈশ্বরত্বই নিজেকে প্রকাশ করছে মানব-চৈতন্যের মধ্য দিয়ে। God নন, Godliness, yes Godliness, yes; —বলতে বলতে মুখখানি স্মিত হাস্যরেখায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

তখন ভারতবর্ষে গান্ধীযুগ আরম্ভ হয়েছে। ১৯৩০ সনের অব্যবহিত পূর্বে। বলেছিলেন—

গান্ধীর মধ্যে তার আভাস পাচ্ছি। বুদ্ধের মধ্যে তা প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে তার ছটা আছে। ওখানে বুদ্ধি দিয়ে পৌছুতে পারি ; প্রাণ দিয়ে, নিজের শ্রদ্ধা দিয়ে পারি নে। পারি নে। মদ না খেয়ে যে আমি থাকতে পারি নে। আরও অনেক কিছু দুর্বলতা আমার আছে। কিন্তু অন্যের প্রতি অন্যায় আমি করি নে। করব না। ওইটেই প্রথম শিক্ষা। বিচার-বিভাগে আমি ওটা প্র্যাকটিসের সৌভাগ্য পেয়েছি। বাঙলায় ওটাকে কী বলব ? অনুশীলন ? হ্যাঁ তাই। রায় লিখবার সময় আমি সেইরকম রায় লিখতে চেষ্টা করি, লিখি, যাকে বলা যায় ধর্মের বিচার। ডিভাইন জাস্টিস।

ডিভাইন জাস্টিস কথাটা তাঁরই কথা।

চকিত হয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ফিরে তাকালেন। বেয়ারা ডাকছে।

—এ-দিকে কাল রাত্রে একটা সাপ বেরিয়েছে হুজুর। একটু থেমে আবার বললে, তাঁকে বোধ করি মনে করিয়ে দিলে—অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।

মুখ তুলে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, আবার আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। দূরে দিগ্বলয়ে গ্রামের বনরেখার চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে অন্ধকারে, প্রান্তর ব্যাপ্ত করে ক্রমশ গাঢ় হয়ে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। বাঙলোর দিকে চাইলেন, আলো জ্বলেছে সেখানে। সুরমাও বাগানে নেই, সে কখন উঠে বাঙলোর ভিতরে চলে গিয়েছে। নিঃশব্দেই চলে গিয়েছে।

তিন

(ক)

সুরমা ঘরের জানালার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন অতীত-কথা। সুমতির কথা। আশ্চর্য সুমতি। যত মধু তত কটু। যত কোমল তত উগ্র তীব্র। যত অমৃত তত বিষ। অমৃত তার ভাগ্যে জোটে নি, সে পেয়েছিল বিষ। সে বিষ আগুন হয়ে জ্বলেছিল। সুমতির পুড়ে মরার কথা মনে পড়লেই সুরমার মনে হয়, হতভাগিনীর নিজের হাতে জ্বালানো সন্দেহের আগুনে সে নিজেই পুড়ে মরেছে। ওটা যেন তার জীবনের বিচিত্র অমোঘ পরিণাম। প্রথম দিন থেকেই সুমতি তাকে সন্দেহ করে-ছিল। কৌতুক অনুভব করেছিল সুরমা। ভেবেছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথকে সে ভালবেসেছে বা ভালবাসবেই। ভালবাসা হয়তো অন্ধ। ভালবাসায়, কাকে ভালবাসছি, কেন ভালবাসছি, এ প্রশ্নই জাগে না। তবু ইয়োরোপে-শিক্ষিত জজসাহেব বাপের মেয়ে সে ; আবাল্য সেই শিক্ষায় শিক্ষিত, বি-এ পড়ছে তখন, তার এটুকু বোধ ছিল যে, বিবাহিত, গোঁড়া হিন্দুঘরের ছেলে, পদবীতে মুনসেফের প্রেমে পড়ার চেয়ে হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা অন্তত তার পক্ষে আর কিছু হতে পারে না। মনে মনে আজও রাগ হয়, সুমতির মতো হিন্দুঘরের অর্ধশিক্ষিত মেয়েরা ভাবে যে, তাদের অর্থাৎ বিলেত-ফেরত সমাজের মেয়েদের সতীত্বের বালাই নেই, তারা স্বাধীনভাবে প্রেমের খেলা খেলে বেড়ায় প্রজাপতির মতো। জ্ঞানেন্দ্রনাথ শুধু সুমতির বর বলেই সে তার সঙ্গে হাস্যকৌতুকের সঙ্গে কথা বলেছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুপুরুষ, বিদ্বান, কিন্তু তাঁর দিকে

সপ্রেম দৃষ্টিপাতের কথা তার মনের মধ্যে স্বপ্নেও জাগে নি। সুমতির বর, লোকটি ভাল, বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। সুমতি হতভাগিনীই অপবাদ দিয়ে তার জেদ জাগিয়ে দিলে; সেই জেদের বশে সপ্রেম দৃষ্টির অভিনয় করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ল সে। সুমতি সুরমাকে যেন ঠেলে নিয়ে গিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথের গায়ের উপর ফেলে দিলে!

সুমতির সন্দেহ এবং ঈর্ষা দেখে সে জ্ঞানেন্দ্রনাথকে নিয়ে খেলা খেলতে গিয়েছিল; সুমতিকে দেখিয়ে সে জ্ঞানবাবুর সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশার অভিনয় করতে গিয়েছিল। সুমতি আরও জ্বলেছিল। বেচারা থার্ড মুনসেফ একদিকে হয়েছিল বিহ্বল অন্যদিকে হয়েছিল নিদারুণভাবে বিব্রত। সুরমার কৌতুকোচ্ছলতার আর অবধি ছিল না; তারুণ্যের উল্লাস প্রশ্রয় পেয়ে বন্য হয়ে উঠেছিল। প্রশ্রয়টা এই আত্মীয়তার। ছুটির পর কলকাতায় ফিরে গিয়ে সে কবিতার চিঠি লিখেছিল জ্ঞানবাবুকে। ইচ্ছে করেই লিখেছিল। সুমতিকে জ্বালাবার জন্য। তার বাবাই শুধু সুমতিকে ভালবাসতেন না, সেও তাকে ভালবেসেছিল। অনুগ্রহের সঙ্গে স্নেহ মিশিয়ে যে বস্তু, সে-বস্তুর দাতা হওয়ার মতো তৃপ্তি আর কিছুতে নেই। পরম স্নেহের ছোট শিশুকে রাগিয়ে যেমন ভাল লাগে তেমনি ভাল লাগত সুমতিকে জ্বালাতন করতে। বছর দেড়েকের বড়ই ছিল সুমতি, কিন্তু মনের গঠনে বুদ্ধিতে আচরণে সুরমাই ছিল বড়। তার সঙ্গে এই ভ্যাবাকান্ত হিন্দু জামাইবাবুটিকে বিদ্রূপ করে সে এক অনাস্বাদিত কৌতুকের আনন্দ অনুভব করত। প্রথম কবিতা তার আজও মনে আছে। সুমতির পত্রেই লিখেছিল—'জামাই-বাবুকে বলিস—

সুমতি তোমার পত্নী, দুর্মতি শ্যালিকা
টোবাকো পাইপ আমি, সুমতি কলিকা
পবিত্র হুঁকোর, তাহে নাই নিকোটিন।
সুমতি গরদ ধুতি, আমি টাই-পিন।
পিনের স্বধর্ম খোঁচা, নিকোটিনে কাশি;
ধন্যবাদ, সহিয়াছ মুখে মেখে হাসি'।

উত্তরে সুমতির পত্রের নিচে দু ছত্র কবিতাই এসেছিল।

'ধন্যবাদে কাজ নাই অনুবাদে সাধ
অর্থাৎ মার্জনা দেবী, হলে অপরাধ'।

সুরমা কবিতা দু-লাইন পড়ে ভ্রূকুঞ্চিত করেছিল, ঠোঁটে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল তার। মনে মনে বলেছিল—হুঁ! গবুচন্দ্রটি তো বেশ! ধার আছে! মিছরির তাল নয়, মিছরির ছুরি!

এর পরই হঠাৎ অঘটন ঘটে গিয়েছিল। পর পর দুটি। একখানা বিখ্যাত ইংরেজী কাগজে একটা প্রবন্ধ বের হয়েছিল—"একটি অহিংস সিংহ ও তার শাবকগণ"। গান্ধীজীকে আক্রমণ করে প্রবন্ধ। লেখক বলেছিলেন, একটি সিংহ হয়তো অভ্যাসে ও সাধনায় অহিংস হতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি ধরে নেওয়া যায় যে, তার শাবকেরাও তাদের স্বভাবধর্ম হিংসা না নিয়ে জন্ম-গ্রহণ করবে, বা রক্তের প্রতি তাদের অরুচি জন্মাবে? প্রবন্ধের ভাষা যেমন জোরালো, যুক্তি তেমনি ক্ষুরধার। বুদ্ধের কাল থেকে এ-পর্যন্ত ইতিহাসের নজির তুলে এই কথাই বলেছেন লেখক, অহিংসার সাধনা অন্যান্য ধর্মের সাধনার মতো ব্যক্তিগত জীবনেই সফল হতে পারে। রাষ্ট্রে এই বাদকে প্রয়োগ করার মতো অযৌক্তিক আর কিছু হয় না। এমন কি, সম্প্রদায়গত-ভাবেও এ-বাদ সফল হয় নি, হতে পারে না। প্রবন্ধটি কয়েকদিনের জন্য চারিদিকে, বিশেষ

করে শিক্ষিত সমাজে, বেশ একটা শোরগোল তুলেছিল। সুরমাও পড়েছিল সে প্রবন্ধ। লেখকের বক্তব্য তার খারাপ লাগে নি। সে-কালে সরকারী চাকুরে বিশেষ করে বড় চাকুরে যাঁরা এবং অচাকুরে, অতিমাত্রায় ইউরোপীয় সভ্যতা-ঘেঁষা সমাজে একদল লোক মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, গান্ধীজীর এই অহিংসা নিতান্তই অবাস্তব এবং সেই হেতু ব্যর্থ হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, অত্যাধুনিক ইউরোপীয় মতবাদ ও সভ্যতা-বিরোধী এই গান্ধীবাদী আন্দোলনকে অনেকখানি তাঁদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বলে মনে করতেন। সমাজে আসরে মজলিসে এ-সম্পর্কে অনেক আলোচনা হত। তাঁদের সকলেরই ধারণা ছিল যে, অহিংসার এই মতবাদ—এটা নিতান্তই বাইরের খোলসমাত্র। সিংহচর্মাবৃত গর্দভ নয়, গর্দভচর্মাবৃত সিংহ। সুরমার বাবা অরবিন্দবাবু ভিন্ন মতের মানুষ ছিলেন। গান্ধীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অসাধারণ। কিন্তু তবুও জজসাহেব হিসেবে তিনি এবং তাঁর সঙ্গে স্ত্রীকন্যা বাধ্য হয়েই বিরোধী শিবিরের মানুষ বলে লোকের দ্বারাও গণ্য হতেন এবং নিজেরাও নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বোধ করি তাই বলে গণ্য করতেন। সেই কারণেই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু ভাল লেগেছিল। লেখার ঢঙটিও অতি ধারালো, বাঁকানো। দিনকয়েক পরে তার বাবা তাকে লিখলেন—এ প্রবন্ধ জ্ঞানেন্দ্র লিখেছে। আমাকে অবশ্য দেখিয়েছিল। ভাল লিখেছে, পড়ে দেখিস।

সুরমার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। এ লেখা সুমতির মুখচোরা কার্তিকের কলম থেকে বেরিয়েছে! ঠিক যেন ভাল লাগে নি! মনে হয়েছিল সে যেন ঠকে গেছে, জ্ঞানেন্দ্রনাথই তাকে ভালমানুষ সেজে ঠকিয়েছে।

এর কিছুদিন পরেই আর এক বিস্ময়। হঠাৎ সেদিন কলেজ-হস্টেলে নতুন একখানা টেনিস র‍্যাকেট হাতে দেখা করতে এলেন সুমতির পতি! টেনিস র‍্যাকেট! হাসি পেয়েছিল সুরমার। উচ্চপদের দণ্ড। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, অনেক বিনিদ্র রাত্রি অধ্যয়ন করে পরীক্ষায় ভাল ফল করে একটি বড় চাকরি পেয়েছে, তারই দায়ে অফিসিয়ালদের ক্লাবে চাঁদা তো গুণতেই হচ্ছে, এর ওপর এতগুলি টাকা খরচ করে টেনিস র‍্যাকেট! বেচারাকে একদা হয়তো পা পিছলে পড়ে ঠ্যাঙখানি ভাঙতে হবে! হেসে সে বলেছিল—খেলতে জানেন, না হাতেখড়ি নেবেন ?

জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলেছিলেন—শেখাবেন ?

—শেখালেই কি সব জিনিস সব মানুষের হয় ? নিজের ভরসা আছে ?

—তা আছে। ছেলেবেলায় ভাল গুলি-ডাণ্ডা খেলতাম।

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল সুরমা। তারপর বলেছিল—পারি নে তা নয়। কিন্তু গুরু-দক্ষিণা কী দেবেন ?

—বলুন কী দিতে হবে ? বুঝে দেখি।

—আপনার ঐ কার্তিকী ঢঙের গোঁফজোড়াটি কামিয়ে ফেলতে হবে।

হেসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—বিপদে ফেললেন। কারণ এই গোঁফজোড়াটি সুমতির বড় প্রিয়। ওর একটা পোষা বেড়াল ছিল, সেটা মরে গিয়েছে। তার দুঃখ সুমতি এই গোঁফজোড়াটি দেখেই ভুলেছে।

সুরমা বক্রহেসে বলেছিল—তা হলে ও দুটি কামাতেই হবে। আমি বরং সুমতিকে একটা ভাল কাবলী বেড়াল উপহার দেব।

এরপরই হঠাৎ কথার মোড়টা ঘুরে গিয়েছিল। পাশেই টেবিলের উপর পুরনো খবরের কাগজের মধ্যে লালনীল পেন্সিলে দাগমারা সেই কাগজখানা ছিল, সেটাই নজরে পড়েছিল

জ্ঞানেন্দ্রনাথের। তিনি সকৌতুকে কাগজখানা টেনে নিয়েছিলেন এবং পাশে লেখা নানান ধরনের মন্তব্যের উপর চোখ বুলিয়ে হেসে বলেছিলেন—ওরে বাপ রে। লোকটা নিশ্চয় বাসায় মরেছে! উঃ, কি সব কঠিন মন্তব্য!

সুরমা মুহূর্তে আক্রমণ করেছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথকে। কেন, তা বলতে পারে না। কারণ মন্তব্যগুলির একটিও তার লেখা ছিল না, এবং জজসাহেবের মেয়ে এই মতবাদের ঠিক বিরুদ্ধ মতবাদও পোষণ করত না। তাই আজও সে ভেবে পায় না কেন সে সেদিন এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল তাঁকে। বলেছিল—বাসায় তিনি মরেন নি, আমার সামনে তিনি বসে আছেন সে আমি জানি। ছদ্মনামের আড়ালে বসে আছেন। এই বলেই শুরু করেছিল আক্রমণ। তার পর সে অবিশ্রান্ত শরবর্ষণ। জ্ঞানেন্দ্রনাথ শুধু মুচকে হেসেছিলেন। শরগুলি যেন কোনো অদৃশ্য বর্মে আহত হয়ে ধার হারিয়ে নিরীহ শরের কাঠির মতোই ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল। সুরমা ক্লান্ত হলে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—মিষ্টিমুখের গাল খেয়ে ভারি ভাল লাগল।

সুরমা দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল, বলেছিল—ডাকব অন্য মিষ্টিমুখীদের? বলব ডেকে যে, এই দেখ সেই কুখ্যাত প্রবন্ধের লেখক কে? দেখবেন?

জ্ঞানেন্দ্রনাথের চোখ দুটোও দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল। সুরমার চোখ এড়ায় নি। সে বিস্মিত হয়েছিল। গোবরগণেশ হলেও তার হাতে কলম দেখলে বিস্ময় জাগে না, শখের বাবু কার্তিকের হাতে খেলার তীর-ধনুকও বেখাপ্পা লাগে না, কিন্তু ললাটবহ্নি চোখের কোণে আগুন হয়ে জ্বলল কী করে? কিন্তু পরমুহূর্তেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেই নিরীহ গোপাল-জ্ঞানেন্দ্রনাথ হয়ে গিয়েছিলেন।

পরমুহূর্তেই হেসে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—দেখতে রাজী আছি। কিন্তু আজ নয়, কাল। সুমতিকে তা হলে টেলিগ্রাম করে আনাই। আমার পক্ষে উকিল হয়ে সেই লড়বে। কারণ মেয়েদের গালিগালাজের জবাব এবং অযৌক্তিক যুক্তির উত্তরে এই ধরনের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে তো সম্ভবপর নয়।

কতকগুলি মেয়ে এসে পড়ায় আলোচনাটা বন্ধ হয়েছিল।

তারপরই দ্বিতীয় ঘটনা। টেনিস র‍্যাকেট নিয়েই ঘটল ঘটনাটা।

(ঘ)

পুজো ছিল সেবার কার্তিক মাসে। পুজোর ছুটিতে বাবা সেবার দিন-পনেরো দার্জিলিংয়ে কাটিয়েই কর্মস্থলে ফিরে এলেন। সাঁওতাল পরগণার কাছাকাছি কর্মস্থলের সেই শহরটি শরৎকাল থেকে কয়েকমাস মনোরম হয়ে ওঠে। ফিরেই সুরমা শুনেছিল, সুমতিরা পুজোর ছুটিতে সেবার দেশে যায় নি, এখানেই আছে, সুমতিরই অসুখ করেছিল। সুমতি তখন পথ্য পেয়েছে, কিন্তু দুর্বল। চ্যাটার্জি সাহের পুজোর তত্ত্ব, কাপড়-চোপড়, মিষ্টি নিয়ে নিজে গিয়েছিলেন ওদের বাড়ি, সঙ্গে সুরমাও গিয়েছিল। আসবার সময় সুরমা জ্ঞানেন্দ্রনাথকে বলে এসেছিল,—বিকেলে যাবেন। আজ টেনিসে হাতেখড়ি দিয়ে দেব।

চ্যাটার্জি সাহেব নিজে ভাল খেলতেন। এককালে স্ত্রীকেও শিখিয়েছিলেন। সুরমা ছেলেবেলা থেকে খেলে খেলায় নাম করেছিল। সেদিন চ্যাটার্জি সাহেব খেলতে আসেন নি। সুরমা জ্ঞানেন্দ্রনাথকে নিয়ে একা একা খেলতে নেমে নিজে প্রথম সার্ভ করে, করে বলটার

ফেরত-মার দেখে চমকে উঠেছিল। সে-বল সে আর ফিরিয়ে মারতে পারে নি। জ্ঞানেন্দ্রের মার যে পাকা খেলোয়াড়ের মার। সুরমা হেরে গিয়েছিল।

খেলার শেষে সে বলেছিল—আপনি অত্যন্ত শ্রুড লোক। তার চেয়ে বেশী কপট লোক আপনি। ডেঞ্জারাস ম্যান!

—কেন? কী করলাম?

—থাকেন যেন কত নিরীহ লোক, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না, অথচ—।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন—তাহলে গোঁফ জোড়াটা থাকল আমার?

ওই খেলার ফাঁকেই কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হল সে। সুমতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তার উপর। গ্রাহ্য করে নি সুরমা। বরং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল ওর উপর। চরম হয়ে গেল ওখানকার টেনিস কম্পিটিশ্যনের সময়। বড়দিনের সময় সুরমা গিয়ে কম্পিটিশ্যনে যোগ দিলে, পার্টনার নিলে জ্ঞানেন্দ্রকে। ফাইন্যালের দিন খেলা জিতে দুজনে ফটো তুলতে গিয়েছিল। ফটো তুলবার আগে জ্ঞানেন্দ্র বলেছিলেন,—তোমার সঙ্গে ফটো তুলব, গোঁফটা কামাব না!

ওই খেলার অবসরেই 'আপনি' ঘুচে পরস্পরের কাছে তারা তখন 'তুমি' হয়ে গেছে।

সুরমা হেসে উঠেছিল। এবং সে-দিন জ্ঞানেন্দ্র যখন তাদের কুঠী থেকে বিদায় নেন তখন নিজের একগোছা চুল কেটে একটি খামে পুরে তাঁর হাতে দিয়ে বলেছিল—আমি দিলাম, আমার দক্ষিণা! কিন্তু আর না। আর আমিও তোমার সঙ্গে দেখা করব না, তুমিও কোরো না। সুমতি সহ্য করতে পারছে না। আজ আমাকে সে স্পষ্ট বলেছে, তুই আমার সর্বনাশ করলি!

অনেককাল পর আজ সুরমা উঠে এসে দাঁড়ালেন সেই টেনিস ফাইন্যালের পর তোলানো সেই ফটোখানার সামনে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। ফোকাসের সময় তারা ক্যামেরার দিকেই তাকিয়ে ছিল, কিন্তু ঠিক ছবি নেবার সময়টিতেই নিজেদের অজ্ঞাতসারে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের কপিখানা নেই, সেখানা সুমতি—। এই ঘটনার স্মৃতি মাথার মধ্যে আগুন জ্বেলে দেয়।

ঈর্ষাতুরা সুমতি! আশ্চর্য কঠিন ক্রূর ঈর্ষা। পরলোক, প্রেতবাদ, এ-সবে সুরমা বিশ্বাস করে না, কিন্তু এ-বিশ্বাস তার হয়েছে, মানুষের প্রকৃতির বিষই হোক আর অমৃতই হোক, যেটাই তার স্বভাব-ধর্ম—সেটা তার দেহের মৃত্যুতেও মরে না, যায় না; সেটা থাকে, ক্রিয়া করে যায়। সুমতির ঈর্ষা আজও ক্রিয়া করে চলেছে; জীবনের আনন্দের মুহূর্তে অকস্মাৎ ব্যাধির আক্রমণের মতো আক্রমণ করে, মধ্যে মধ্যে সেই আক্রমণের থেকে নিষ্কৃতি বোধ করি এ-জন্মে আর হল না। কিন্তু আজ যেন এ-আক্রমণ অতি তীব্র, হঠাৎ ওই আগুনটা জ্বলে ওঠার মতই জ্বলে উঠেছে। খড়ের আগুনটা নিভেছে, এটা নিভল না।

(গ)

তাঁর কাঁধের উপর একখানা ভারী হাত এসে স্থাপিত হল। গাঢ় স্নেহের আভাস তার মধ্যে, কিন্তু হাতখানা অত্যন্ত ঠাণ্ডা। স্বামী রবারের চটি পরে শতরঞ্চির উপর দিয়ে এসেছেন; চিন্তা-মগ্নতার মধ্যে মৃদু শব্দ যেটুকু উঠেছে তা সুরমার কানে যায় নি।

—অকারণ নিজেকে পীড়িত কোরো না। ধীর মৃদু স্বরে বললেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ—পরের দুঃখের জন্মে যে কাঁদতে পারে, সে মহৎ; কিন্তু অকারণ অপরাধের দায়ে নিজেকে দায়ী করে পীড়ন করার নাম দুর্বলতা। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। এসো।

ঘুরে তাকালেন সুরমা, স্বামীর মুখের দিকে তাকাবামাত্র চোখ দুটি ফেটে মুহূর্তে জলে ভরে টলমল করে উঠল।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁকে মৃদু আকর্ষণে কাছে টেনে এনে কাঁধের উপর হাতখানি রেখে অনুচ্চ গাঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন—আমি বলছি, তোমার কোনো অপরাধ নেই, আমারও নেই। না। অপরাধ সমস্ত তার! হ্যাঁ তার! উই ডিড নাথিং ইমমরাল, নাথিং ইললিগ্যাল। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের অধিকার আমার ছিল। সেই অধিকারের সীমানা কোনোদিন অন্যায়ভাবে অতিক্রম আমরা করি নি। বিবাহের দায়ে অপর কোনো নারীর সঙ্গে পুরুষের বা কোনো পুরুষের সঙ্গে বিবাহিতা নারীর বন্ধুত্বের বা প্রীতিভাজনতার অধিকার খর্ব হয় না।—আমারও হয় নি, তোমারও হয় নি।

সুরমার চোখ থেকে জলের ফোঁটা কটি ঝরে পড়ল; পড়ল জ্ঞানেন্দ্রনাথের বাঁ হাতের উপর। বাঁ হাত দিয়ে তিনি সুরমার একখানি হাত ধরেছিলেন সেই মুহূর্তটিতে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন—তুমি কাঁদছ? না, কেঁদো না। আমাকে তুমি বিশ্বাস করো। আমি অনেক ভেবেছি। সমস্ত ন্যায় এবং নীতিশাস্ত্রকে আমি চিরে চিরে দেখে বিচার করেছি। আমি বলছি অন্যায় নয়। অন্যায় হয় নি। শুধু বন্ধুত্ব কেন সুরমা, প্রেম, সেও বিবাহের কাটা খালের মধ্যে বয় না। বিবাহ হলেই প্রেম হয় না সুরমা। বিবাহের দায়িত্ব শুধু কর্তব্যের, শপথ পালনের। সুমতিকে বিবাহ করেও তোমাকে আমি যে-নিয়মে ভালবেসেছিলাম সে নিয়ম অমোঘ, সে-নিয়ম প্রকৃতির অতি বিচিত্র নিয়ম, তার উপর কোনো ন্যায় বা নীতিশাস্ত্রের অধিকার নেই। যে অধিকার আছে সে-অধিকার আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে এসেছিল ভালবাসা, তাকে আমি সংযমের বাঁধে বেঁধেছিলাম। প্রকাশ করি নি। তোমার কাছে না, সুমতির কাছে না, কারও কাছে না। আর তোমার কথা? তোমার বিচার আরও অনেক সোজা। তুমি ছিলে কুমারী। অন্যের কাছে তোমার দেহমনের বিন্দুমাত্র বাঁধা ছিল না। শুধু সুমতির স্বামী বলে আমাকে তোমার ছিনিয়ে নেবারই অধিকার ছিল না, কিন্তু ভালবাসার অবাধ অধিকার লক্ষ বার ছিল তোমার। সুরমা, আজও স্থির বিশ্বাসে ভগবান মানি নে, নইলে বলতাম ভগবানেরও ছিল না। কোনো অপরাধ নেই আমাদের। বিচারালয়েই বল বা যে-কোনো দেশের মানুষের বিচারালয়েই বল, সেখানে সিদ্ধান্ত—নির্দোষ। জড়িমাশূন্য পরিষ্কার কণ্ঠের দৃঢ় উচ্চারিত সিদ্ধান্ত! দুর্বলতাই একমাত্র অপরাধ, যার জন্য প্রাণ অভিশাপ দেয় আত্মাকে।

স্থির দৃষ্টিতে অভিভূতের মতো সুরমা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলি শুনছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের দৃষ্টি স্থির। তিনি তাকিয়ে ছিলেন একটু মুখ তুলে ঘরখানার কোণের ছাদের অংশের দিকে, ওইখানে ওই আবছায়ার মধ্যে দেওয়ালের গায়ে কোন মহাশাস্ত্রের একটি পাতা ফুটে উঠেছে, এবং তিনি তাই পড়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে, দৃঢ়কণ্ঠে।

—চলো, বাইরে চলো, বেড়াতে যাব।

সুরমা এটা জানতেন। এইবার তিনি বাইরে যেতে বলবেন। যাবেন। অনেকটা দূরে ঘুরে আসবেন। আগে সারা রাত ঘুরেছেন, ক্লাবে গিয়েছেন, মদ্যপান করেছেন। রাত্রে আলো জেলে টেনিস খেলেছেন দুজনে। এখন এমনভাবে সুমতিকে মনে পড়ে কম। এবার

বোধ হয় দুবছর পরে এমনভাবে মনে পড়ল। সোজা পথে তো সুমতিকে তাঁরা আসতে দেন না। কথার পথ ধরে সুমতি তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেই কথার পথের মোড় ঘুড়িয়ে দেন তাঁরা। অন্য কথায় গিয়ে পড়েন। আর সুমতি দীর্ঘদিন পরে ঘুরপথ ধরে সামনে এসেছে। বাথরুমের জানালা দিয়ে ওই আগুনের ছটার সঙ্গে মিশে অশরীরিণী সে ঈর্ষাতুরা এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে।

(ঘ)

গাড়ি চলল। শ্রাবণ-রাত্রিতে আবার মেঘ ঘন হয়ে উঠেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নতুন অ্যাসফল্টের সমতল সরল পথ। শহর পার হয়ে, নদীটার উপর নতুন ব্যারেজের সঙ্গে তৈরী ব্রিজ পার হয়ে শাল-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গেছে নতুন-তৈরী পথ। দুপাশে শালবনে বর্ষার বাতাসে মাতামাতি চলেছে। নতুন পাতায় পাতায় বৃষ্টিধারার আঘাতে ঝরঝর একটানা শব্দ চলেছে। মধ্যেমাঝে এক-এক জায়গায় পথের পাশে পাশে কেয়ার ঝাড়। সেখানে কেয়া ফুল ফুটেছে, গন্ধ আসছে। ভিজে অ্যাসফল্টের রাস্তার বুকে হেডলাইটের তীব্র আলোর প্রতিচ্ছটা পড়েছে; পথের বাঁকে হেডলাইটের আলো জঙ্গলের শালগাছের গায়ে গিয়ে পড়েছে; অদ্ভুত লাগছে।

গাড়ি চলেছে। এক সময় যেন প্রকৃতির রূপ বদলাল অন্ধকার যেন গাঢ়তর হয়ে উঠল। চারিপাশে আকাশ থেকে ঘন কালো মেঘ পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে মাটিতে নেমেছে মনে হচ্ছে। মেঘ নয়, ওগুলি পাহাড়, আরণ্যভূম এবং পার্বত্যভূম এক হয়ে গেল এখান থেকে। অ্যাসফল্টের রাস্তা এইবার সর্পিল গতি নিচ্ছে, সত্যই সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলেছে। দূরে কোথাও প্রবল একটা ঝরঝর শব্দ উঠেছে, একটানা শব্দ; দিঙমণ্ডল-ব্যাপ্ত-করা প্রচণ্ড উল্লাসের একটা বাজনা যেন কোথাও বেজে চলেছে; বাজনা নয়,—পাহাড় থেকে ঝরনা ঝরেছে। গাড়ির মধ্যে স্বামী স্ত্রী দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন, ঘোষাল সাহেব তাঁর হাতের মধ্যে সুরমার একখানি হাত নিয়ে বসে আছেন। মধ্যে মধ্যে দু'চারটি কথা। কাটা-কাটা, পারম্পর্যহীন।

—এটা সেই বনটা নয়? যেখানে গলগলে ফুলের গাছ দেখেছিলাম?

—এই তো বাঁ পাশে; পেরিয়ে এলাম।

তারপর আবার দুজনে স্তব্ধ। গলগলে ফুলের সোনার মতো রঙ। ফুল তুলে সুরমাকে দিয়েছিলেন; সুরমা একটি ফুল খোঁপায় পরেছিল। ঘোষাল সাহেবের হাতের মুঠো ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠেছিল; অন্তরে আবেগ গাঢ় হয়ে উঠেছে। সুরমা একটি অস্ফুট কাতর শব্দ করে উঠলেন। উঃ!

—কী হল? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন স্বামী।

মৃদুস্বরে সুরমা শুধু বললেন—আংটি।

—লেগেছে? বলেই হেসে ঘোষাল সাহেব হাত ছেড়ে দিলেন। আঙুলের আংটির জন্যে হাতের চাপ বড্ড লাগে।

—না। অন্ধকারের মধ্যেই অল্প একটু মুখ ফিরিয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে স্বামীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। না, ছেড়ে দিতে তিনি চান না।

আবার স্তব্ধ দুজনে। মনের যে গুমোট অন্ধকার কেটে যাচ্ছে তাই যেন বাইরে ছড়িয়ে

পড়ছে মুহূর্তে মুহূর্তে ; তাঁরা প্রশান্ত ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে তাই চেয়ে চেয়ে দেখছেন। অকস্মাৎ দূরের একটানা বাজনার মতো ঝরনার সেই ঝরঝর শব্দটা প্রবল উল্লাসে বেজে উঠল। যেন একটা পাঁচিল সরে গেল, একটা বদ্ধ সিংহদ্বার খুলে গেল। একটা চড়াই অতিক্রম করে ঢালের মুখে বাঁক ফিরতেই শব্দটা শতধারায় বেজে উঠেছে। চমকে উঠলেন সুরমা।

—কিসের শব্দ ?

—ঝরনার। বর্ষার জলের ঢল নেমেছে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। স্বপ্নাতুর হাসি ফুটে উঠল ঘোষাল সাহেবের মুখে। সুরমা উৎসুক হয়ে জানালার কাচে মুখ রাখলেন, যদি দেখা যায় !

ঘোষাল সাহেব চোখ বুজে মৃদুস্বরে আবৃত্তি করলেন,

"শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খলখল, গেয়ে কলকল, তালে তালে দিব তালি।"

কয়েক সেকেণ্ড স্তব্ধ থেকে আবার বললেন—"এত কথা আছে এত গান আছে এত প্রাণ আছে মোর।" তারপর বললেন—প্রাণ গান গাইছে। লাইফ ফোর্স। যেখানে জীবন যত দুর্বার, সেখানে তার গান তত উচ্চ। কিন্তু সব প্রাণেরই কামনা বিশ্বগ্রাসী, তাই তার দাবি —"নাল্পে সুখমস্তি—ভূমৈব সুখম্।" বিপুল বিশাল প্রাণেরও যত দাবি এক কণা প্রাণেরও তাই দাবি। বড় অনবুঝ। বড় অনবুঝ।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—কিন্তু যার যতখানি শক্তি তার একটি কণা বেশী পাবার অধিকার তার নাই। নেচারস্ জাজমেণ্ট ! কোথাও নদী পাহাড় কেটে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আপন পথ করে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোথাও স্তব্ধ হয়ে খানিকটা জলার সৃষ্টি করে পাহাড়ের পায়ের তলায় পড়ে আছে, শুকিয়ে যাচ্ছে। বড় জোর মানস সরোবর। কিন্তু মাথা কোটার বিরাম নাই।

অকস্মাৎ সুরমা দেবী সচেতন হয়ে উঠলেন, বললেন—কটা বাজল ?

শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন তিনি। দর্শনতত্ত্বের মধ্যে ঘোষাল সাহেব ঢুকলে আর ওঁর নাগাল পাবেন না তিনি। মনে হবে, এই ঝরনাটার ঠিক উলটো গতিতে তিনি পাহাড়ের উচ্চ থেকে উচ্চতর শিখরে উঠে চলেছেন, আর তিনি সমতলে অসহায়ের মতো ওঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। ক্রমশ যেন চেনা মানুষটা অচেনা হয়ে যাচ্ছে। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। একথা বললে আগে বিচিত্র ভ্রূভঙ্গি করে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলতেন—তাহলে ইন্সিওরেন্স পলিসি, গভর্নমেণ্ট পেপার আর শেয়ার স্ক্রিপ্টগুলো নিয়ে এসো। তাই নিয়ে কথা বলি। অথবা আল-মারি খুলে হুইস্কির বোতল বের করে দাও। গিভ মি ড্রিঙ্ক। হেঁটে নামতে দেরি লাগবে অনেক। তার চেয়ে স্খলিত চরণে গড় গড় করে গড়িয়ে এসে পড়ব তোমার কাছে। তোমার অঙ্গে ঠেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকব। বলে হা-হা করে হাসতেন। যে-হাসি সুরমা সহ্য করতে পারতেন না।

আগে ঘোষাল সাহেব সত্য সত্যই এ-কথার পর মদ খেতেন, পরিমাণ পরিমাপ কিছু মানতেন না। এখন মদ আর খান না। সুদীর্ঘ কালের অভ্যাস একদিনে মহাত্মার মৃত্যুদিনের সন্ধ্যায় ছেড়ে দিয়েছেন। মদ ধরেছেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুরমাদের সংস্পর্শে এসে। শুরু তার টেনিস খেলার পর ক্লাবে। সেটা বেড়েছিল সুমতির সঙ্গে অশান্তির মধ্যে। সুমতির মৃত্যুর পর সুরমাকে বিয়ে করেও মধ্যে মধ্যে এমনই কোনো অস্বস্তিকর অবস্থা ঘনিয়ে উঠলেই সেদিন মদ বেশী খেতেন।

ীর মৃত্যুর পর গোটা রাত্রিদিনটা তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন একখানা ঘরের মধ্যে।

উপবাস করে ছিলেন। জীবনে গান্ধীজী সম্পর্কে তিনি যত কিছু মন্তব্য করেছিলেন ডায়রী উলটে উলটে সমস্ত দেখে তার পাশে লাল কালির দাগ দিয়ে লিখেছিলেন—ভুল, ভুল। সুরমা তাঁর সামনে কতবার গিয়েও কথা বলতে না পেরে ফিরে এসেছিলেন। তারপর, তখন বোধ হয় রাত্রি নটা, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বেয়ারাকে ডেকে বলেছিলেন—সেলারে যতগুলি বোতল আছে নিয়ে এসো।

বোতলগুলি খুলে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন মাটিতে। তারপর বলেছিলেন—আমার খাবারের মধ্যে মাছ মাংস আজ' থেকে যেন না থাকে সুরমা।

সুরমা বিস্মিত হন নি। এই বিচিত্র মানুষটির কোনো ব্যবহারে বিস্ময় তাঁর আর তখন হত না।

সেই অবধি মানুষটাই যেন পাল্‌টে গেলেন। এ আর-এক মানুষ। মানুষ অবশ্যই পাল্‌টায়, প্রতিটি দিন, প্রতিটি ক্ষণে পাল্‌টায়, প্রকৃতির নিয়ম, পরিবর্তন অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু এ-পরিবর্তন যেন দিক পরিবর্তন। একবার নয়, দুবার। প্রথম পরিবর্তন সুমতির মৃত্যুর পর। শান্ত মৃদু মিষ্টভাষী কৌতুকপরায়ণ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুমতির মৃত্যুর পর হয়ে উঠেছিলেন অগ্নিশিখার মতো দীপ্ত এবং প্রখর, কথায়-বার্তায় শাণিত এবং বক্র; দুনিয়ার সমস্ত কিছুকে হা-হা করে হেসে উড়িয়ে দিতেন।

একবার, তখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ বর্ধমানে ডিস্ট্রিক্ট জজ, তাঁদের বাড়িতে সমবেত হয়েছিলেন রাজ-কর্মচারীদের নবগ্রহমণ্ডলী, তার চেয়েও বেশী কারণ, এঁরা ছিলেন সপরিবারে উপস্থিত। তর্ক জমে উঠেছিল ঈশ্বর নিয়ে। তর্কের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ কথা বলেন নি বেশী কিন্তু যে কম কথা কটি বলেছিলেন তা যত মারাত্মক এবং তত ধারালো ও বক্র ব্যঙ্গাত্মক। লঙ্কা ফোড়নের মতো ঝাঁঝালো এবং সশব্দ। হঠাৎ এরই মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বারো বছরের ছেলেটি বলে উঠেছিল—গড ইজ নাথিং বাট বদারেশন।

কথাটা ছেলেমানুষী। শুনে সবাই হেসেছিল; কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথের সে কী অট্টহাসি! তিন দিন ধরে হেসেছিলেন।

ধীরে ধীরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হাসির উচ্ছলতা তাঁর কমে এসেছিল, কিন্তু প্রকৃতিতে তিনি পালটান নি। প্রথম যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন যুদ্ধের সময়। তারপর গান্ধীজীর মৃত্যুর দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। এখন দর্শনতত্ত্বের গহনে প্রবেশপথে তাঁকে পিছন ডাকলে তিনি আগের মতো অট্টহাস্য করেন না মদ খান না, চোখ বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকেন এবং তারই মধ্যেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন। এমন ক্ষেত্রে তাঁকে সহজ জীবনের সমতলে নামাতে একটি কৌশল আবিষ্কার করেছেন সুরমা। তাঁকে কোনো গুরু দায়িত্ব বা কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাতেই কাজ হয়।

(৬)

আজ ওই নদীর জলের বেগ এবং ওই পাহাড়ের বাঁধের দৃঢ়তার কথা ধরে জীবনতত্ত্বের জটিল গহনে তিনি ক্রমে ক্রমে সুরমার নাগালের বাইরে চলে যাবার উপক্রম করতেই শঙ্কিত হয়ে সুরমা নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকালেন। বোধ করি বিদ্যুতের চমক দেখে আপনা-আপনি চোখ বুজে ফেলার মতো সে তাকানো, বললেন—কটা বাজছে? আমার ঘড়িটায় কিছু ঠাওর করতে

পারছি না। চোখের পাওয়ার খুব বেড়ে গেছে। দেখো তো?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চোখ বন্ধ করে গাড়ির ঠেসান দেওয়ার গদীতে মাথাটি হেলিয়ে দিয়ে মৃদু স্বরে বললেন—গাড়ির ড্যাসবোর্ডের ঘড়িটা দেখো।

ড্যাসবোর্ডের ঘড়িটা বেশ বড় একটা টাইম-পিস। তার উপর রেডিয়ম দেওয়া আছে। জ্বলজ্বল করছে। সুরমা চমকে উঠে বললেন—ও মা। এ যে বারোটা!

—বারোটা? ক্লান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। কিন্তু তার বেশী চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। চোখ বুজে ভাবছিলেন, চোখ খুললেন না।

—গাড়ি ঘোরাও। বললেন সুরমা।

—ঘোরাবো?

—ঘোরাবে না? ফিরে তো আবার সেই নথি নিয়ে বসবে। ওদিকে সেসন্স্ চলছে, সেই দশটার সময়—

তবুও তেমনিভাবে বসে রইলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

গোটা কেসটা মাথার মধ্যে উদ্ঘাটিত-যবনিকা রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটের মতো ভেসে উঠল।

জটিল বিচার্য ঘটনা। নৌকো উল্‌টে গিয়েছিল। নৌকো ডুবেছিল ছোট ভাইয়ের দোষে। তারা জলমগ্ন হয়েছিল। ছোট ভাই আঁকড়ে ধরেছিল বড় ভাইকে। বড় ভাই ছাড়াতে চেষ্টা করেও পারে নি! শেষে ছোট ভাইয়ের গলায় তার হাত পড়েছিল। এবং—। সে-স্বীকার সে করেছে। কিন্তু—।

আসামীকে মনে পড়ল তাঁর!

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি।

সুরমাও স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়েই আছেন, কিন্তু তখন ডুবে গেছেন মামলার ভাবনার মধ্যে। সে সুরমা বুঝতে পারছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। এ তবু সহ্য হয়। সহ্য না করে উপায় নাই! এ কর্তব্য। কিন্তু এ কী হল তাঁর জীবনে? তিনি পেলেন না। তাঁর সঙ্গে চলতে পারলেন না? না—! হারিয়ে গেলেন? টপটপ করে চোখ থেকে তাঁর জল পড়তে লাগল। কিন্তু সে-কথা জ্ঞানেন্দ্রনাথ জানতে পারলেন না; অন্ধকার গাড়ির মধ্যে তিনি চোখ বন্ধ করেই বসে আছেন। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে আদালত, জুরি, পাবলিক প্রসিকিউটার, আসামী।

চার

(ক)

পরের দিন। ডকের মধ্যে আসামী দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেই এক ভঙ্গিতে। বয়স অনুমান করা যায় না, তবে পরিণত যৌবনের সবল স্বাস্থ্যের চিহ্ন সর্বদেহে। শুধু আহারের পুষ্টিতে নধর কোমল দেহ নয়, উপযুক্ত আহার এবং পরিশ্রমে প্রতিটি পেশীর সুদৃঢ় ছন্দে ছন্দে গড়ে উঠেছে দেহখানি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে মনে হয়, জন্মকাল থেকেই দেহের উপাদানের সচ্ছলতা এবং দৃঢ়সংকল্পে পরিশ্রমের অভ্যাস নিয়ে জন্মেছে। মাথায় একটু খাটো। তাম্রাভ রঙ। মুখখানা দেখে মুখের ঠিক আসল গড়ন বোঝা যায় না, দীর্ঘদিন বিচারাধীন থাকার জন্য মাথার চুল বড় হয়েছে, মুখে দাড়ি-গোঁফ জন্মেছে। অবশ্য আগের কালের মতো রুক্ষতা নেই চুলে, আজকাল

তেল পায় জেলখানার অধিবাসীরা। তবুও দাড়ি-গোঁফ-চুল বিশৃঙ্খল ; হতভাগ্যের বিভ্রান্ত মনের আভাস যেন ফুটে রয়েছে ওর মধ্যে ; অঙ্গারগর্ভ মাটির উপরের রুক্ষতার মতো। নাকটা স্থূল ; চোখ দুটি বড়, দৃষ্টি যেন উগ্র। উদ্ধত, কি নিষ্ঠুর ঠিক বুঝতে পারছেন না জ্ঞানেন্দ্রনাথ। পরনে সাদা মোটা কাপড়ের বহির্বাস, গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক।

(খ)

—ইয়োর অনার, এই আসামী নগেনের বাল্যজীবনের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির কথা আমি বর্ণনা করেছি। উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা সত্যের উপর তা সুপ্রতিষ্ঠিত। তারপর এই নগেন গৃহত্যাগ করে চলে যায়। অনুতাপ-বশেই হোক আর ক্ষোভে অভিমানেই হোক নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যায়। এবং দীর্ঘকাল পর সন্ন্যাসী বৈরাগী বেশে ফিরে আসে।

পাবলিক প্রসিকিউটার অবিনাশবাবু তাঁর গতকালকার বক্তব্যের মূল সূত্রটি ধরে অগ্রসর হলেন। হাতের চশমাটি চোখে লাগিয়ে কাগজপত্র দেখে একখানি কাগজ বেছে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন—

ইয়োর অনার, আমার বক্তব্যে অগ্রসর হবার পূর্বে আপনাকে আর একবার পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করব।

অবিনাশবাবু জুরীদের দিকে তাকিয়ে বললেন—রিপোর্টে আছে জলমগ্ন হয়ে মৃত্যু হলে মানুষের পাকস্থলীতে যে-পরিমাণ জল পাওয়া যায়, এই মৃতের পাকস্থলীতে জল পাওয়া গেলেও তার পরিমাণ তার চেয়ে আশ্চর্য রকমের কম। অর্থাৎ জলমগ্ন হওয়ার কারণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু এ-ক্ষেত্রে হয় নি। অথচ মৃত্যু ঘটেছে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে। এবং শবদেহেও সেই লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট। তা হলে হতভাগ্য মরল কী করে? তার প্রমাণ রয়েছে মৃতের কণ্ঠনালীতে সুস্পষ্ট পাঁচটি নখক্ষতের চিহ্নের মধ্যে লুকানো। বাঁদিকে একটি, ডানদিকে চারটি। মানুষের হাতের লক্ষণ। আসামী নগেন থানায় এবং নিম্ন আদালতে স্বীকার করেছে, খগেন জলমগ্ন অবস্থায় তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল যে সেও ডুবে যাচ্ছিল, তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছিল। সে তার থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল। সেই অবস্থায় কোনো-ক্রমে তার ডান হাতটা সে ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং সেই হাত পড়ে খগেনের কণ্ঠনালীতে। সে কণ্ঠনালী টিপে ধরে। খগেন ছেড়ে দেয় বা সর্বদেহের সঙ্গে তার হাত শিথিল হয়ে এলিয়ে যায়। তখন সে ভেসে ওঠে। সে এ-কথা অস্বীকার করে না। এখন দুটি সিদ্ধান্ত হতে পারে। এক, কণ্ঠনালী টিপে ধরার ফলে খগেনের মৃত্যু হওয়ায় সে ছেড়ে দেয় বা এলিয়ে পড়ে, বা মৃত্যুর কিছু পূর্বে মৃতকল্প অচেতন অবস্থায় সে এলিয়ে পড়ে। সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, মৃত্যু এই কারণে আসামীর দ্বারাই ঘটেছে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েও দুটি বিষয়ের বিচার আছে। জটিল, অত্যন্ত জটিল। দুটি বিষয়ের একটি হল, আসামী আত্মরক্ষার জন্য অর্থাৎ মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে মানবিক সকল চৈতন্য এবং চেতনা হারিয়ে, এমন ক্ষেত্রে অবশিষ্ট জান্তব চেতনার পক্ষে অতি স্বাভাবিক প্রেরণায় মৃত খগেনের গলা টিপে ধরেছিল, অথবা তার পূর্বেই তার মানসিক কূটবুদ্ধি, লোভ-হিংসাসঞ্জাত ক্রূরতা ও জীবনের অভ্যস্ত পাপপরায়ণতা এই সুযোগে চকিতে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। যেমন জাগ্রত হয়ে ওঠে নির্জনে অসহায় অবস্থায় নারী দেখলে ব্যভিচারীর পাশব প্রবৃত্তি, আবার

জাগ্রত হয় লুঠেরার লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি, তেমনি ভাবে কাল ও পাত্রের সমাবেশে সৃষ্ট সুবর্ণ-সুযোগের মতো পরিবেশের সুযোগ দেখে জেগে উঠেছিল। ইয়োর অনার, সৎ এবং অসতের দ্বন্দ্বের মধ্যে এই সংসারে কতক্ষেত্রে যে বিশ্বাসপরায়ণ অসহায় বন্ধুকে বন্ধু হত্যা করে তার সংখ্যা অনেক! গোপন প্রবৃত্তি সুযোগ দেখে অকস্মাৎ জেগে ওঠে দানবের মতো। চিরন্তন পশু জাগে; অসহায় মানুষ দেখে বাঘ যেমন গোপন স্থান থেকে লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তেমনি ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গোপন মনের পাশব প্রবৃত্তির অস্তিত্বই মানুষের সভ্যতার শৃঙ্খলার ভয়ঙ্করতম শত্রু। নানা ছদ্মবেশ পরে নানা ছলনায় মানুষের সর্বনাশ করে সে। আমি সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছি বলেই বিশ্বাস করি যে, সেই প্রবৃত্তিই সজাগ ছিল আসামীর মনের মধ্যে। এখন বিচার্য বিষয় সেইটুকু; ওই জলমগ্ন অবস্থায় আসামীর মনের স্বরূপ নির্ণয়! এ নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন; অতি জটিল; এর কোন সাক্ষী নাই। আসামী বলে, সে জানে না। এবং এও বলে যে, সে যদি হত্যা করে থাকে তবে সে মৃত্যু-শাস্তিই চায়। আসামী বৈষ্ণব, এই বিচারাধীন অবস্থাতেও সে তিলক-ফোঁটা কাটে দেখতে পাচ্ছি। সে এক সময় গৃহত্যাগ করেছিল বৈরাগ্যবশে, জীবহত্যা করে কুলধর্ম লঙ্ঘনের জন্য অনুতাপবশে। বারো বৎসর পর ফিরে এসে এই সৎভাইকে বুকে তুলে নিয়েছিল সুগভীর স্নেহের বশে। সেই ভাইকে সে-ই কুড়ি বৎসরের যুবাতে পরিণত করে তুলেছিল। এই দিক দিয়ে দেখলে অবশ্যই মনে হবে এবং এই সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হব যে, আসামী যখন ভাইয়ের গলা টিপে ধরেছিল, তখন তার মধ্যে জীবনের মৌলিক আত্মরক্ষার জান্তব চেতনা ছাড়া মানবিক জ্ঞান বা চৈতন্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে যে অপরাধ সে করেছে, সে-অপরাধ অনেক লঘু, এমন কি তাকে নিরপরাধও বলা যায়।

বিচারক জ্ঞানেন্দ্রনাথ আবার তাকালেন আসামীর দিকে। মাটির পুতুলের মতো সে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তাঁর নিজের মতোই ভাবলেশহীন মুখ। তিনি জানেন, এ-সময় তাঁর মুখের একটি রেখাও পরিবর্তন হয় না; নিরাসক্তের মতো শুনে যান। একটু তফাত রয়েছে। আসামীর দৃষ্টিতে বিস্ময়ের আভাস রয়েছে। বিশ্লেষণের ধারা তাকে বিস্মিত করে তুলেছে। বিহ্বলতার মধ্যেও ওই বিস্ময় তাকে সচেতন করে রেখেছে।

অবিনাশবাবু বলছিলেন—কিন্তু যদি এই ব্যক্তি আকস্মিক সুযোগ, লোভ এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে নিজের হাতে মানুষ-করা ভাইকে হত্যা করে থাকে তবে সে নৃশংসতম ব্যক্তি এবং চতুরতম নৃশংস ব্যক্তি। এবং সে তাই বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপাতদৃষ্টিতে একথা অসম্ভব বলে মনে হবে। মনে হবে, এবং হওয়াই উচিত, যে লোক ছাগল মারার অনুতাপে লজ্জায় সন্ন্যাসী হয়েছিল, যে ভাইকে বুকে করে মানুষ করেছে, যার কপালে তিলক-ফোঁটা, গলায় কণ্ঠী, যে ব্যক্তি ও-অঞ্চলে খ্যাতনামা বৈষ্ণব, সে কি এ-কাজ করতে পারে? কিন্তু পারে। আমি বলি পারে। এক্ষেত্রে আমার দুই কথা। প্রথম কথা, মানুষের শৈশব-বাল্যের অভ্যাস, তার জন্মগত প্রকৃতি অবচেতনের মধ্যে স্থায়ী অধিকারে অবস্থান করে। সে মরে না, চাপা থাকে। এবং মানব-জীবন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অহরহ পরিবর্তনশীল। নিত্য অহরহ পরিবর্তনের মধ্যেই তার জীবনের প্রকাশ এবং সেই প্রকাশের মধ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনও অনেকবার হতে পারে। যে-পথে সে চলে হঠাৎ তার বিপরীত ধরে চলতে শুরু করে। ইয়োর অনার, গৃহধর্ম মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। হঠাৎ দেখা যায় মানুষ সন্ন্যাসী হয়ে গেল, আবার দেখা যায় সেই সন্ন্যাসীই গৈরিক ছেড়ে গৃহধর্ম করছে, মামলা মোকদ্দমা বিষয় নিয়ে বিবাদ সাধারণ সংসারীর চেয়ে শতগুণ আসক্তি এবং কুটিলতার সঙ্গে করছে। যে-মানুষ পত্নীবিয়োগে বিরহের মহাকাব্য লেখে, সেই

মানুষ কয়েক বৎসর পর বিবাহ করে নূতন প্রেমের কবিতা লেখে

(গ)

জ্ঞানেন্দ্রবাবু বললেন—সংক্ষেপ করুন অবিনাশবাবু। বি ব্রীফ প্লীজ!

—ইয়েস ইয়োর অনার, আমার আর সামান্য বক্তব্যই আছে। সেটুকু হল এই। এই আসামী নগেনের আবার একটি পরিবর্তন হয়েছিল। আমরা তার পরিচয় বা প্রমাণ পাই। সে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পৃথক হবার ব্যবস্থা করছিল এই ঘটনার সময়। কিন্তু এটা বাহ্য। অভ্যন্তরে ছিল দি ইটারন্যাল ট্রায়ঙ্গল্—

—হোয়াট? ভ্রূ কুঞ্চিত করে সজাগ হয়ে ফিরে তাকালেন বিচারক।

—সেই সনাতন ত্রয়ীর বিরোধ, ইয়োর অনার—

—দুটি নারী একটি পুরুষ—?

—এ ক্ষেত্রে দুটি পুরুষ একটি নারী, ইয়োর অনার।

—ইয়েস।

অবিনাশবাবু বললেন—নারীটি একটি লীলাময়ী।

—লীলাময়ী? ইউ মিন এ মডার্ন গার্ল?

—না, ইয়োর অনার, মেয়েটি লাস্যময়ী। তারও চেয়ে বেশী, স্বৈরিণী। এ হার্লট। ওই গ্রামেরই একটি দরিদ্র শ্রমজীবীর কন্যা। নগেন এবং খগেনের বাপের আমল থেকে ঐ মেয়েটির বাপমায়ের সঙ্গে নানা কর্মসূত্রে হৃদ্যতা ছিল। চাষের সময় মেয়েটির মা-বাপ ওদের চাষে খাটত। শেষের দিকে কয়েক বৎসর যখন নগেন-খগেনের বাপ শেষ শয্যায় দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিল, তখন স্থায়ীভাবে কৃষানের কাজও করেছিল। ওদের বাড়িতে মেয়েটির মায়ের নিত্য যাওয়া-আসা ছিল; বাড়ি ঝাঁট দেওয়ার কাজ করত, ওদের বাড়ির ধান সেদ্ধ ও ধান ভানার কাজ করত নিয়মিত ভাবে, মাইনে-করা ঝিয়ের কাজ করত। তখন থেকেই ওই মেয়েটিও, চাঁপা, মায়ের সঙ্গে নিত্য দুবেলাই এদের বাড়ি আসত। এবং বয়সে সে ছিল খগেনেরই সমবয়সী, দু'এক বছরের বড়; খগেনের সঙ্গে সে খেলা করত, পরে চাঁপার বিবাহ হয়, সে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। তখন সে বালিকা। আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাত-আট বছর বয়সে বিবাহের কথা সর্বজনবিদিত। তারপর এই ঘটনার দু বছর আগে বিধবা হয়ে সে যখন ফিরে আসে তখন সে যুবতী এবং স্বভাবে পূর্ণমাত্রায় স্বৈরিণী। সে তার স্বামীর বাড়িতেই এই স্বৈরিণী-স্বভাব অর্জন করেছিল, এবং যতদূর মনে হয়, জন্মগতভাবেই সে ওই প্রকৃতির ছিল। কারণ ওই শ্বশুরবাড়িতে থাকতেই এই স্বভাবহেতু বহু অপবাদ তার হয়েছিল। দুটি একটি ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এই চাঁপা ফিরে এসে স্বাভাবিক ভাবেই এবং অতি সহজেই ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী এই প্রিয়দর্শন তরুণ খগেন ছেলেটিকে আকর্ষণ করেছিল। তারপর আকৃষ্ট হল বড় ভাই। এই চাঁপা মেয়েটিই মামলায় প্রধান সাক্ষী। আসামী নগেন প্রথমটা এই তরুণ-তরুণীর মধ্যে সংস্কারকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়। ভাইকে সে চাঁপার মোহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্যই চেষ্টা করেছিল। মেয়েটিকেও অনুরোধ করেছিল প্রতিনিবৃত্ত হতে।

হেসে অবিনাশবাবু বললেন—সাধুজনোচিত অনেক অনেক ধর্মোপদেশ সে দিত তখন। তার পর—।

আবার হাসলেন অবিনাশবাবু। বললেন—সাধুর খোলস তার জীবন থেকে খসে পড়ে গেল। সে তার দিকে আকৃষ্ট হল এবং উন্মত্ত হয়ে উঠল। চাঁপার কাছে সে বিবাহ-প্রস্তাব পর্যন্ত করেছিল। সাময়িকভাবে চাঁপাও তার দিকে আকৃষ্ট হয়। ছোট ভাই মৃত খগেন তখন বড় ভাইকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে। কারণ সন্ন্যাসী হয়ে বড় ভাই যখন গৃহত্যাগ করেছিল, এবং বাপের মৃত্যুশয্যায় স্বমুখে বলেছিল যে, গৃহধর্ম সে করবে না, ছোট ভাইকে মানুষ করে দিয়েই সে আবার চলে যাবে, তখন পৈতৃক বিষয়-আশয়ের উপর তার কোনো অধিকার নাই। সমস্তর মালিক সে একা। কিন্তু আসামী নগেন তখন সে-কথা অস্বীকার করলে। বললে, সে মুখের কথার মূল্য কী? প্রকাশ্যেই সে বলেছিল তার সে-মন আর নাই। বলেছিল, তোর জন্যেই আমাকে থাকতে হয়েছে সংসারে; সেই সংসার আজ আমাকে আঁকড়ে ধরেছে। তোর জন্যেই আমাকে চাঁপার সংস্রবে আসতে হয়েছে। তুইই আমাকে চাঁপার মোহে ঠেলে ফেলে দিয়েছিস। আজ আমি চাঁপাকে বষ্টোম করে নিয়ে মালাচন্দন করে আখড়া করব। সম্পত্তির ভাগ আজ আমাকে পেতে হবে, আমি নেব।

বিরোধের একটি জটের সঙ্গে আর-একটি জট মুক্ত হয়ে রূঢ়তর এবং কঠিনতর হয়ে উঠল। তার পরিণতিতে এই ঘটনা। বিষয় নিয়ে বিরোধের শেষ পর্যন্ত গ্রামের পঞ্চজনের মীমাংসায় স্থির হয় যে, নগেন বাপের কাছেই যা-ই মুখে বলে থাক, তার যখন কোনো লিখিত-পঠিত কিছু নাই এবং বাপ যখন নিজে একথা বলে নি বা উইল করে যায় নি যে, তার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র খগেন হবে, তখন নগেন অবশ্যই সম্পত্তির অংশ পাবে। প্রায় সকল জমিই ভাগ হয়ে বাকি ছিল শুধু একখানি জমি। পঞ্চজনে বলেছিল দুজনে মাপ করে জমিটার মাঝখানে আল দিয়ে নিতে। সেই জমিখানি মাপ করে ভাগ করবার জন্যই দুই ভাই ঘটনার দিন নদীর অপর পারে গিয়েছিল। এখানে একটা কথা বলার প্রয়োজন আছে। একটি বন্ধুর সঙ্গে মিলে ভাগে খগেনের একটি পান-বিড়ির দোকান ছিল। সে সেই দোকানেই থাকত। সে-দিন কথা ছিল নগেন এসে খগেনকে ডাকবে এবং দুই ভাই ওপারে যাবে। কিন্তু নগেন আসে না, দেরি হয়। তখন খগেনই এসে নগেনকে ডাকে। নগেনের মনের মধ্যে তখন এই প্রবৃত্তি উঁকি মেরেছে বলেই আমার বিশ্বাস। একটা দ্বন্দ্ব তখন শুরু হয়েছে। এই সুযোগে যদি কাঁটা সরাতে পারি তবে মন্দ কী? আবার ভয়-মায়া-মমতা, তারাও স্বাভাবিক ভাবে বাধা দিয়ে চলেছিল প্রাণপণ শক্তিতে। স্নেহ, দয়া প্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তিগুলি তখন শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ওই নদীতে ভাইকে একলা পাওয়ার সুযোগ এলেই অন্তরের গুহায় প্রতীক্ষমান হিংসা যে হুঙ্কার দিয়ে লাফ দিয়ে পড়বে সে তা বুঝতে পারছিল। সেই কারণেই নগেন বাড়ি থেকে বের হয় নি। তারই ডাকবার কথা ছিল খগেনকে। এর প্রমাণ পাই আমরা খগেনের দোকানের অংশীদার বন্ধুর কাছ থেকে। খগেনের সেই অংশীদার বন্ধু বলে, চাঁপা এবং নগেনের ব্যবহারে খগেন তখন ক্ষোভে অভিমানে প্রায় পাগল। অভিমানে রাগে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এ-গ্রামেই সে আর থাকবে না। বিষয় ভাগ করে নিয়ে, সব বেচে দিয়ে, সে যত শীগগির হয় চলে যাবে অন্যত্র। দোকানের অংশ খগেন সেই দিন সকালে বন্ধুকে বিক্রি করেছিল এবং বলেছিল নদীর ওপারের এই জমিটা ভাগ হলেই সে এ-গ্রাম ছেড়ে প্রথম যাবে নদীর ওপারের গ্রামে। সেখান থেকে জমিজমা নগেনের, কোনো শত্রুকে বিক্রি করে চলে যাবে দেশ ছেড়ে। সেই কারণেই সে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল নগেনের। কিন্তু নগেন এল না দেখে বিরক্ত হয়ে বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে নগেনকে ডেকে আনে। নদীর ঘাটের পথেই এই দোকানখানি। খগেনের এই বন্ধু বলে—ওপারে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে দোকান পর্যন্ত এসেও নগেন বলেছিল, খগেন, আজ থাক।

আমার শরীরটা আজ ভাল নাই। এবং এও বলেছিল, বিকেলটা আজ ভাল নয়, বৃহস্পতির বারবেলা; তার উপর কেমন গুমোট রয়েছে। চৈত্রের শেষ। বাতাস-টাতাস উঠলে তোকে নিয়ে মুশকিল হবে।

খগেন ভালো সাঁতার জানত না। জলকে সে ভয় করত। কিন্তু সে-দিন সে বলেছিল, না। আর তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আমি রাখব না। ওই জমিটায় আল দিতে পারলেই সাত-খানা দড়ির শেষখানা কেটে যাবে। আজ শেষ করতেই হবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নগেন বলেছিল, তবে চল।

এর মধ্যে ইঙ্গিতটি যেন স্পষ্ট। তার বর্বর-প্রকৃতির কাছে সে তখন অসহায়। দীর্ঘনিশ্বাসটি তারই চিহ্ন! এবং পরবর্তী ঘটনা, যা এর পূর্বে আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, তাই ঘটেছে। জলমগ্ন অবস্থার সুযোগে বর্বর-প্রবৃত্তির তাড়নায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমাধা করেছে সে।

অবিনাশবাবু থামলেন। ওদিকে বাইরে পেটা ঘড়িতে একটা বাজল। কোর্টের ঘড়িটা ও থেকে দু মিনিট স্লো।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু উঠে পড়লেন।

পাঁচ

(ক)

খাস-কামরায় এসে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু।

শরীর আজ অত্যন্ত অবসন্ন। কালকের রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির ফলে সারা দেহখানা ভারী হয়ে রয়েছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। নিজের কপালে হাত বুলিয়ে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন তিনি।

আর্দালী টেবিল পেতে দিয়ে গেল। মৃদু শব্দে চোখ বুজেই অনুমান করলেন তিনি। চোখ বুজেই বললেন—শুধু টোস্ট আর কফি। আর কিছু না।

সকাল বেলা উঠে থেকেই এটা অনুভব করেছেন। সুরমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; তিনিও লক্ষ্য করেছেন। বলেছিলেন, শরীরটা যে তোমার খারাপ হল!

তিনি স্বীকার করেন নি। বলেছিলেন—নাঃ। শরীর ঠিক আছে। তবে রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি কোথা যাবে? তার একটা ছাপ তো পড়বেই। সে তো তোমার মুখের ওপরেও পড়েছে। হেসেছিলেন তিনি।

—তা ছাড়া কালকের বিকেলের ওই আগুনটা—!

—ওঃ! এ স্নান করলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বলেই তিনি ফাইল টেনে নিয়েছিলেন। এবং যা প্রত্যাশা করেছিলেন তাই ঘটেছিল; সুরমা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে গিয়েছিলেন। ফাইল খুলে বসার অর্থ-ই হল তাই।

—প্লিজ সুরমা, এখন আমাকে কাজ করতে দাও।

সুমতি যেত না। কিন্তু সুরমা যান। এ-কর্তব্যের গুরুত্ব সুরমার চেয়ে কে বেশী বুঝবে? সুরমা বিচারকের কন্যা; বিচারকের স্ত্রী। এবং নিজেও শিক্ষিতা মেয়ে। সুমতিকে শেষ অবধি বলতে হত—আমাকে কাজ করতে দাও! শেষ পর্যন্ত আমার চাকরি যাবে এমন করলে। সুমতি রাগ করে চলে যেত।

সুমতির প্রকৃতির কথা ভাববার জন্যেই তিনি ফাইল টেনে নিয়েছিলেন। নইলে ফাইল দেখবার জরুরী তাগিদ কিছু ছিল না। আসলে গতরাত্রির সেই চিন্তার স্রোত তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে অবরুদ্ধ জলস্রোতের মতো আবর্তিত হচ্ছিল। সত্যের পর সত্যের নব নব প্রকাশ নূতন জলস্রোতের মতো এসে গতিবেগ সঞ্চারিত করছিল; কিন্তু সময়ের অভাবে সম্মুখপথে অগ্রসর হতে পারে নি। ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে তিনি শুয়ে পড়েছিলেন। ঘুমও হয় নি। স্বপ্ন-বিহ্বল একটা তন্দ্রার মধ্যে শুধু পড়ে ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, স্বপ্নের মধ্যে সুমতি একবারও এসে সামনে দাঁড়ায় নি। সকাল বেলায় কিন্তু ঘুম ভাঙতেই সর্বাগ্রে মনে ভেসে উঠেছে সুমতির মুখ। আশ্চর্য! অবচেতনে নয়, সচেতন মনের দুয়ার খুলে চৈতন্যের মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে সে। সুমতিকে অবলম্বন করেই গতকালে অসমাপ্ত চিন্তাটা মনে জাগল। মনে পড়ে গিয়েছিল, লাইফ ফোর্সের, প্রাণশক্তির জীবন-সঙ্গীত শুনেছিলেন কাল ওই ঝরনার কলরোলের মধ্যে। সে ঝরঝর শব্দ এখনও তাঁর কানে বাজছে। সে এক বিন্দুই হোক আর বিপুল বিশালই হোক, আকাঙ্ক্ষা তার বিশ্বগ্রাসী। কিন্তু শক্তির পরিমাণ যেখানে যতটুকু, পাওনার পরিমাণ তার ততটুকুতেই নির্দিষ্ট, তার একটি কণা বেশী নয়। ব্রহ্মা-কমণ্ডলুর স্বল্প পরিমাণ, হয়তো একসের বা পাঁচপো জল, গোমুখী থেকে সমগ্র আর্যাবর্ত ভাসিয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে মিশেছে তার বিষ্ণুচরণ থেকে উদ্ভব-মহিমার গুণেতে ও ভাগ্যে, সুমতির মুখে এই কথা শুনে তিনি হাসতেন। বলতেন, তা হয় না সুমতি, এক কমণ্ডলু জল ঢেলে দেখ না কতটা গড়ায়! সুমতি রাগ করত, তাঁকে বলত অধার্মিক, অবিশ্বাসী।

কথাটা প্রথম হয়েছিল দার্জিলিং-এ বসে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুমতিকে হিমালয়ের মাথার তুষার-প্রাচীর দেখিয়েও কথাটা বোঝাতে পারেন নি। অবুঝ শক্তির দাবি ঠিক সুমতির মতোই বিশ্বগ্রাসী। সে দাবি পূর্ণ হয় না। বেদনার মধ্যেই তার বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী, প্রকৃতির অমোঘ নির্দেশ জল আগুন বাতাস—এরা লড়াই করে নিজেকে শেষ করে স্থির হয়;—কিন্তু জীবন চিৎকার করে কেঁদে মরে, জানোয়ার চিৎকার করে জানিয়ে যায়; মানুষ ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে, অভিশাপ দেয়। অবশ্য প্রকৃতির মৌলিক ধর্মকে পিছনে ফেলে মানুষ একটা নিজের ধর্ম আবিষ্কার করেছে। বিচিত্র তার ধর্ম, বিস্ময়কর। মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যেও তৃষ্ণার্ত মানুষ নিজের মুখের সামনে তুলে-ধরা জলের পাত্র অন্য তৃষ্ণার্তের মুখে তুলে দিয়ে বলে, দাই নীড ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন। লক্ষ লক্ষ এমনি ঘটনা ঘটেছে। নিত্য ঘটছে, অহরহ ঘটছে। কিন্তু এ-মহাসত্যকে কে অস্বীকার করবে যে, যে-মরণোন্মুখ তৃষ্ণার্ত নিজের মুখের জল অন্যকে দিয়েছিল, তার তৃষ্ণার যন্ত্রণার আর অবধি ছিল না। ওখানে প্রকৃতির ধর্ম অমোঘ। লঙ্ঘন করা যায় না। মানুষের জীবনেও ওই তো দ্বন্দ্ব, ওই তো সংগ্রাম; ওইখানেই তো তার নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। প্রকৃতি-ধর্মের দেওয়া শাস্তি! হঠাৎ জ্ঞানেন্দ্রবাবু চোখ খুলে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সামনের দিকে চাইলেন। তাকিয়েই রইলেন।

না। শুধু তো এইটুকুই নয়। আরও তো আছে। ওই তৃষ্ণার্ত মৃত্যুযন্ত্রণার সঙ্গে আরও তো কিছু আছে। যে মরণোন্মুখ তৃষ্ণার্ত তার মুখের জল অন্যকে দিয়ে মরে তার মুখের ক্ষীণ একটি প্রসন্ন হাস্যরেখা তিনি যেন ওই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন।

গতরাত্রে সদ্য-দেখা নদীর ব্যারাজটার কথা মনে পড়ে গেল। ব্যারাজটার ও-পাশে বিরাট রিজারভয়েরে জল জমে থৈ-থৈ করছে। দেখে মনে হয় স্থির। কিন্তু কী প্রচণ্ড নিম্নাভিমুখী গতির বেগেই না সে ওই গাঁথুনিটাকে ঠেলছে। ব্যারাজটার জমাট অণু-অণুতে তার চাপ গিয়ে পৌঁচেছে। সর্বাঙ্গে চাড় ধরেছে।

জীবন বাঙ্ময়। তবু জীবনকে এ-চাড় এ-চাপ নিঃশব্দে সহ্য করতে হয়। চৌচির হয়ে ফাটতে চায়। তবু সে সহ্য করে।

(খ)

আর্দালী ট্রে এনে নামিয়ে দিলে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন—কফি বানাও। ছুরি-কাঁটা সরিয়ে রেখে হাত দিয়েই টোস্ট তুলে নিলেন। আজ সকাল থেকেই প্রায় অনাহারে আছেন। ক্ষিদে ছিল না। রাত্রে ফিরে এসে খেতে সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছিল। তারপরও ঘণ্টাখানেক জেগে বসেই ছিলেন। এই চিন্তার মধ্যেই মগ্ন ছিলেন। চিন্তা একবার জাগলে তার থেকে মুক্তি নেই। এ দেশের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, চিন্তা অনির্বাণ চিতার মতো। সে দহন করে। উপমাটি চমৎকার। তবু তাঁর খুব ভালো লাগে না। চিতা তিনি বলেন না। প্রাণই বহ্নি, বস্তুজগতের ঘটনাগুলি তার সমিধ, চিন্তা তার শিখা। চিন্তাই তো চৈতন্যকে প্রকাশ করে, চৈতন্য ওই শিখার দীপ্তিজ্যোতি। আপনাকে স্বপ্রকাশ করে, আপন প্রভায় বিশ্বরহস্যকে প্রকাশিত করে। যাঁরা গুহায় বসে তপস্যা করেন, তাঁদের আহার সম্পর্কে উদাসীনতার মর্মটা উপলব্ধি করেন তিনি। রাত্রি-জাগরণের ফলে শরীর কি খুব অসুস্থ হয়েছিল তাঁর? না, তা হয় নি। অবশ্য খানিকটা অনুভব করেছিলেন, সমস্ত রাত্রি পাতলা ঘুমের মধ্যেও এই চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে ঘুরছে বিচিত্র দুর্বোধ্য স্বপ্নের আকারে। সকাল বেলাতেই সে-চিন্তা ধূমায়িত অবস্থা থেকে আবার জ্বলে উঠেছে। তারই মধ্যে এত মগ্ন ছিলেন যে, খেতে ইচ্ছে হয় নি। টোস্ট খেতে ভালো লাগছে। টোস্ট তাঁর প্রিয় খাদ্য। আজ বলে নয়, সেই কলেজজীবন থেকে। প্রথম মুনসেফী জীবনে সকাল-বিকেল বাড়িতে টোস্টের ব্যবস্থা অনেক কষ্ট করেও করতে পারেন নি তিনি। সুমতি কিছুতেই পছন্দ করতে পারত না। সে চাইত লুচি-তরকারি; তরকারির মধ্যে আলুর দম। তা-ই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সুরমা সুমতির এই রুচিবাতিকের নাম দিয়েছিল টোস্টোফোবিয়া। এই উপলক্ষ করেও সে সুমতিকে অনেক ক্ষেপিয়েছে। তাঁদের দুজনকে চায়ের নেমন্তন্ন করে তাঁকে দিত টোস্ট, ডিম. কেক, চা; সুমতিকে দিত নিমকি, কচুরি মিষ্টি। সুমতি মনে মনে ক্রুদ্ধ হত কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারত না। অনেক সংস্কার ছিল সুমতির। জাতিধর্মে তার ছিল প্রচণ্ড বিশ্বাস। এবং সেই সূত্রেই তার ধারণা ছিল যে, খাদ্যে যার বিধর্মীয় রুচি, মনেপ্রাণেও সে বিধর্মের অনুরাগী। কতদিন সে বলেছে খেয়েই মানুষ বাঁচে, জন্মেই সবচেয়ে আগে খেতে চায়। সেই খাদ্য যদি এ-দেশের পছন্দ না হয়ে অন্য দেশের পছন্দ হয় তবে সে এ-দেশ ছেড়ে সে-দেশে যাবেই যাবে। এ ধর্মের খাদ্য পছন্দ না হয়ে অন্য ধর্মের খাদ্য যার পছন্দ সে ধর্ম ছাড়বেই। আমি জানি নিজেদের কিছু তোমার পছন্দ নয়। ধর্ম না, খাদ্য না, আমি না। তাই আমি তোমার চোখের বিষ।

সুরমা এতটা অপমান করতে পারে নি। তিনিও তাকে বলেন নি। সুমতিকে নিয়ে এই জ্বালাতনের খেলা খেলবার জন্য মাঝে মাঝে স্যাণ্ডউইচ, কাকলেট, কেক, পুডিং তৈরী করে আর্দালীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিত। লিখত, নিজে হাতে করেছি, জামাইবাবু ভালবাসেন তাই পাঠালাম। স্যাণ্ডউইচে চিকেন আছে, কাটলেটের সরু হাড়ের টুকরো ভুল হবে না, কেক পুডিংয়ে মুরগীর ডিম আছে। তোর আবার ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক আছে, ঘরে এক গোয়ালা

ঠাকুরের ছবি আছে, তাই জানালাম।

আর্দালী চলে গেলে সুমতির ক্রোধ ফেটে পড়ত।

ফেলে দিত। শুচিতার দোহাই দিয়ে স্নান করত।

সুরমা সব খবর সংগ্রহ করত। এবং দেখা হলেই খিলখিল করে হাসত, বলত, কেমন ?

তিনি বাধ্য হয়ে হাসতেন। হাসতে হত। নইলে জীবন তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

(গ)

বেচারী সুরমা। এই সব নিয়ে তাঁর মনে একটা গোপন গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। মধ্যে মধ্যে অশরীরিণী সুমতি যখন তাঁদের দুজনের মধ্যে এসে দাঁড়ায় তখন ওঁর বিবর্ণ মুখ দেখে তিনি তা বুঝতে পারেন। সুমতির মৃত্যুর জন্য দায়ী কেউ নয়, সুরমার সঙ্গে স্পষ্ট কথা তাঁর হয় না, কিন্তু ইঙ্গিতে হয়; বরাবর তিনি বলেছেন—কালও বলেছেন—নিজেকে মিথ্যে পীড়ন কোরো না। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে দেখেছি। তবু তার মনের গ্লানি মুছে যায় না, জ্ঞানেন্দ্রনাথ জানেন অন্তরে অন্তরে সুরমা নিজেকেই প্রশ্ন করে, কেন সে এগুলি করেছিল ? কেন তাকে কষ্ট দিয়ে খেলতে গিয়েছিল ? হয়তো সুমতি এবং তাঁর মধ্যে সে এসে এ কৌতুক খেলা না খেলতে গেলে সুমতির এই শোচনীয় পরিণাম হত না। আংশিকভাবে কথাটা সত্য। না। দায়িত্ব প্রথম সুমতির নিজের। সে নিজেই আগুন জ্বালিয়েছিল, সুরমা তাতে ফুঁ দিয়েছিল, ইন্ধন যুগিয়েছিল। ঈর্ষার আগুন। সেই আগুনই বাইরে জ্বলে উঠল। সত্যই, তার মনের আগুন ওই টেনিস ফাইন্যালের দিন তোলা ফটোগ্রাফখানায় ধরে বাইরে বাস্তবে জ্বলে উঠেছিল। টেনিস ফাইন্যাল জেতার পর তোলানো দুজনের ছবিখানা। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে অজ্ঞাতে হেসে ফেলেছিলেন। সুরমার কপিখানা সুরমার ঘরে টাঙানো আছে। ওই টেনিস ফাইন্যালের কদিন পর। দোকানী ফটোগ্রাফখানা যথারীতি মাউন্ট করে প্যাকেট বেঁধে তিনখানা তাঁর বাড়িতে আর তিনখানা জজ সাহেবের কুঠীতে সুরমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তিনি নিজে তখন কোর্টে। তিনি এবং সুরমা দুজনের কেউই জানতেন না যে, ছবিতে তাঁরা পরস্পরের দিকে হাসিমুখে চেয়ে ফেলেছেন। চোখের দৃষ্টিতে গাঢ় অনুরাগের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। জানলে নিশ্চয় সাবধান হতেন। ফটোগ্রাফারকে বাড়িতে ফটো পাঠাতে বারণ করতেন; হয়তো ও ছবি বাড়িতে ঢোকাতেন না কোনো দিন। জীবনের ভালোবাসার দুর্দম বেগকে তিনি ওই নদীটার ব্যারাজের মতো শক্ত বাঁধে বেঁধেছিলেন। যেদিকে তাঁর প্রকৃতির নির্দেশে গতিপথ, সুরমার দুই বাহুর দুই তটের মধ্যবর্তিনী পথ, প্রশস্ত এবং নিম্ন সমতলভূমির প্রসন্নতায় যে-পথ প্রসন্ন, সে পথে ছুটতে তাকে দেন নি। জীবনের সর্বাঙ্গে চাড় ধরেছিল, চৌচির হয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তবু সে-বন্ধনকে এতটুকু শিথিল তিনি করেন নি। নাথিং ইম্‌মরাল নাথিং ইল্‌লিগাল! নীতির বিচারে, দেশাচার আইন সব কিছুর বিচারে তিনি নিরপরাধ নির্দোষ ছিলেন। কিন্তু সে কথা সুমতি বিশ্বাস করে নি। করতে সে চায় নি। তিনি বাড়ি ফিরতেই, সুমতি ছবি ক-খানা তাঁর প্রায় মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে অগ্ন্যুদগারের পূর্বমুহূর্তের আগ্নেয়গিরির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ছবি ক-খানা সামনে ছড়িয়ে পড়ে ছিল। একখানা টেবিলের উপর, একখানা মেঝের উপর তাঁর পায়ের কাছে, আর একখানাও মেঝের উপরই পড়ে ছিল—তবে যেন মুখ থুবড়ে,

উল্টে।

ছবি ক-খানা দেখে তিনি চমকে উঠেছিলেন।

সুমতি নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলে উঠেছিল, লজ্জা লাগছে তোমার? লজ্জা তোমার আছে? নির্লজ্জ, চরিত্রহীন—

মুহূর্তে আত্মসম্বরণ করে তিনি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, সুমতি! তার মধ্যে তাকে সাবধান করে দেওয়ার ব্যঞ্জনা ছিল।

সুমতি তা গ্রাহ্য করে নি। সে সমান চিৎকারে বলে উঠেছিল, ছবিখানার দিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখো, দেখো কোন পরিচয় তার মধ্যে লেখা আছে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বন্ধুত্বের। আর ম্যাচ জেতার আনন্দের।

—কিসের?

—বন্ধুত্বের।

—বন্ধুত্বের? মেয়ের ছেলের বন্ধুত্ব? তার কী নাম?

—বন্ধুত্ব।

—না। ভালোবাসা।

—বন্ধুত্বও ভালোবাসা। সে বুঝবার সামর্থ্য তোমার নাই। তুমি সন্দেহে অন্ধ হয়ে গেছ। ইতরতার শেষ ধাপে তুমি নেমে গেছ।

—তুমি শেষ ধাপের পর যে পাপের পাঁক, সেই পাঁকে গলা পর্যন্ত ডুবে গেছ। তুমি চরিত্রহীন, তুমি ইতরের চেয়েও ইতর, অনন্ত নরকে তোমার স্থান হবে না।

বলেই সে ঘর থেকে চলে গিয়েছিল। কর্মক্লান্ত ক্ষুধার্ত তখন তিনি; কিন্তু বিশ্রাম আহার মুহূর্তে বিষ হয়ে উঠল—তিনিও বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। ভয়ও পেয়েছিলেন; সুমতিকে নয়, নিজের ক্রোধকে। উদ্যত ক্রোধ এবং ক্ষোভকে সম্বরণ করবার সুযোগ পেয়ে তিনি যেন বেঁচে গিয়েছিলেন। উন্মত্তের মতো মৃত্যু কামনা করেছিলেন নিজের। বৈধব্য-শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন সুমতিকে। বাইসিক্লে চেপে তিনি শহরের এক দূর-প্রান্তে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে পাথর-হয়ে-যাওয়া মানুষের মতো বসে ছিলেন। প্রথম সে শুধু উন্মত্ত চিন্তা; না, চিন্তা নয় কামনা, মৃত্যুকামনা, সংসারত্যাগের কামনা, সুমতির হাত থেকে অব্যাহতির কামনা। তারপর ধীরে ধীরে সে-চিন্তা স্থির হয়ে এসেছিল—দাউদাউ-করে-জ্বালা গ্রহের জ্যোতিষ্মান হয়ে ওঠার মতো। সেই জ্যোতিতে আলোকিত করে অন্তর তন্ন তন্ন করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁজে দেখেছিলেন। বিশ্লেষণ করেছিলেন, বিচার করে দেখেছিলেন। পান নি কিছু। নাথিং ইম্‌মর‍্যাল, নাথিং ইল্‌লিগাল। কোনো দুর্নীতি না, কোনো পাপ না। বন্ধুত্ব। গাঢ়তম বন্ধুত্ব। সুরমা তাঁর অন্তরঙ্গতম বন্ধু, সে-কথা তিনি স্বীকার করেন। আরও ভালো করে দেখেছিলেন। না, তার থেকেও কিছু বেশী। সুরমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও আছে! আছে! পরমুহূর্তে আরও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছিলেন। না! পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নয়। পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নাই,—না পাওয়ার জন্য অন্তরে ফল্গুর মতো বেদনার একটি ধারা বয়ে যাচ্ছে শুধু। এবং সে-ধারা বন্যার প্রবাহে দুই কূল ভেঙেচুরে দেবার জন্য উদ্যত নয়; নিঃশব্দে জীবনের গভীরে অশ্রুর উৎস হয়ে শুধু আবর্তিতই হচ্ছে। আজীবন হবে।

চিন্তার দীপ্তিকে প্রসারিত করছিলেন ন্যায় এবং নীতির বিধান-লেখা অক্ষয় শিলালিপির উপর। অবিচলিত ধৈর্যের সঙ্গে জীবনের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রায় ধ্যানযোগের মধ্যে সে-লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। কোনো সমাজ, কোনো রাষ্ট্র, কোনো ধর্মের ব্যাখ্যা গ্রহণ

করেন নি ; কোনো ব্যাকরণের কোনো বিশেষ পদার্থ গ্রহণ করেন নি ; এবং পাঠ শেষ করে নিঃসংশয় হয়ে তবে তিনি সেদিন সেখান থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেছে। দেশলাই জেলে ঘড়ি দেখে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। এতটা রাত্রি! জানুয়ারীর প্রথম সময়টা, রাত্রি পৌনে দশটা! আপিস থেকে বেরিয়েছিলেন পাঁচটায়। বাড়ি থেকে বোধ হয় ছটায় বেরিয়ে এসেছেন। পৌনে দশটা। প্রায় চার ঘণ্টা শুধু ভেবেছেন। সিগারেট পর্যন্ত খান নি। তখন তিনি প্রচুর সিগারেট খেতেন। সুমতির তাতেও আপত্তি ছিল।

(ঘ)

শান্ত চিত্তে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন; ক্রোধ অসহিষ্ণুতা সমস্ত কিছুকেই কঠিন সংযমে সংযত করে-ছিলেন। সুমতি উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল। বাইসিক্ল তুলে রাখবার জন্য আর্দালীকে ডেকে পান নি। চাকরটাও ছিল না। ঠাকুর! ঠাকুরেরও সাড়া পান নি। ভেবেছিলেন, সকলেই বোধ হয় তাঁর সন্ধানে বেরিয়েছে। মনটা ছি ছি করে উঠেছিল। কাল লোকে বলবে কী। সন্ধান যেখানে করতে যাবে সেখানে সকলেই চকিত হয়ে উঠবে। তবুও কোনো কথা বলেন নি। নিঃশব্দে পোশাক ছেড়ে, মুখহাত ধুয়ে, ফিরে এসে শোবার ঘরে একখানা চেয়ারে বসেছিলেন। প্রয়োজন হলে ওই চেয়ারেই সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে দেবেন। সুমতি ঠিক একভাবেই শুয়ে ছিল, অনড় হয়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন, আমাকে খুঁজতে তো এদের সকলকে পাঠাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এবার সুমতি উত্তর দিয়েছিলেন, খুঁজতে কেউ যায় নি। কারণ তুমি কোথায় গেছ, সে-কথা অনুমান করতে কারুর তো কষ্ট হয় না। ওদের আজ আমি ছুটি দিয়েছি! বাজারে যাত্রা হচ্ছে, ওরা যাত্রা শুনতে গেছে। তারপরই উঠে সে বসেছিল। বলেছিল—আমি ইচ্ছে করেই ছুটি দিয়েছি, তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

চোখ দুটো সুমতির লাল হয়ে উঠেছে। দীর্ঘক্ষণ অবিশ্রান্ত কেঁদেছিল। মমতায় তাঁর অন্তরটা টনটন করে উঠেছিল। তিনি অকৃত্রিম গাঢ় স্নেহের আবেগেই বলেছিলেন, তুমি অত্যন্ত ছেলেমানুষ সুমতি। একটা কথা তুমি কেন বুঝছ না—

—আমি সব বুঝি। তোমার মতো পণ্ডিত আমি নই। সেই অধার্মিক বাপমায়ের আদুরে মেয়ের মতো লেখাপড়ার ঢঙও আমি জানি না, কিন্তু সব আমি বুঝি।

ধীর কণ্ঠেই জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলেছিলেন, না। বোঝ না।

—বুঝি না? তুমি সুরমাকে ভালোবাস না?

—বাসি। বন্ধু বন্ধুকে যেমন ভালোবাসে তেমনি ভালোবাসি।

—বন্ধু, বন্ধু, বন্ধু! মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে! বলো, ঈশ্বরের শপথ করে বলো, ওর সঙ্গ তোমার যত ভালো লাগে, আমার সঙ্গ তোমার তেমনি ভালো লাগে?

—এর উত্তরে একটা কথাই বলি, একটু ধীরভাবে বুঝে দেখ—তোমার আমার সঙ্গ জীবনে জীবনে, অঙ্গে অঙ্গে, শত বন্ধনে জড়িয়ে আছে। তোমার বা আমার একজনের মৃত্যুতেও সে-বন্ধনের গ্রন্থি খুলবে না। আমি কাছে থাকি দূরে থাকি একান্ত ভাবে তোমার—

সুমতি চিৎকার করে উঠেছিল—না, মিথ্যা কথা।

—না মিথ্যা নয়। মনকে প্রসন্ন করো সুমতি, ওই প্রসন্নতাই জীবনের শ্রেষ্ঠ মিষ্টতা। ওর অভাবে অন্ন যে অন্ন তাও তিক্ত হয়ে যায়। তুমি যদি সত্যই আমাকে ভালোবাস তবে কেন তোমার এমন হবে? তোমার সঙ্গেই তো আমার এক ঘরে বাস, এক আশা, এক সঞ্চয়! সুরমা তো অতিথি। সে আসে, দু দণ্ড থাকে, চলে যায়। তার সঙ্গে মেলামেশা তো অবসরসাপেক্ষ! খেলার মাঠে, আলোচনার আসরে তার সঙ্গে আমার সঙ্গ।

মিনতি করে বলেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ, কিন্তু সুমতি তীব্র কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল—হাঁ, তাই তো বলছি। আমার সঙ্গে, আমার বন্ধনে তুমি কাঁটার শয্যায় শুয়ে থাক, সাপের পাকে জড়িয়ে থাক অহরহ! অল্পক্ষণের জন্য ওর সঙ্গেই তোমার যত আনন্দ, যত অমৃত-স্পর্শ।

একটি ক্ষীণ করুণ হাস্যরেখা প্রৌঢ় জ্ঞানেন্দ্রনাথের মুখে ফুটে উঠল। আনন্দ এবং অমৃতস্পর্শ শব্দ দুটি তাঁর নিজের, সুমতি দুটি গ্রাম্য অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছিল। তিনি তখন ক্ষুধার্ত, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের ক্রিয়া তাঁর চৈতন্যকে জেলখানার বেত্রদণ্ড-পাওয়া আসামীর মতো নিষ্করুণ আঘাত হেনে চলেছে। বেত্রাঘাত-জর্জর কয়েদীরা কয়েক ঘা বেত খাওয়ার পরই ভেঙে পড়ে। তাঁর চৈতন্যও তাই পড়েছিল; প্রাণপণে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করেও তিনি পারেন নি। অথবা কাচের ফানুষ ফাটিয়ে দপ-করে-জ্বলে-ওঠা লণ্ঠনের শিখার মতো অগ্নিকাণ্ডে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নিজেকে। আর সংযমের কাচের আবরণে অন্তরকে ঢেকে নিজেকে আর স্নিগ্ধ এবং নিরাপদ করে প্রকাশ করতে পারেন নি। ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ অন্তর আগুনের লকলকে বিশ্বগ্রাসী শিখার মতো আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি বলেছিলেন,—তুমি যে কথা দুটো বললে, ও উচ্চারণ করতে আমার জিভে বাধে। ওর বদলে আমি বলছি—আনন্দ আর অমৃতস্পর্শ। হ্যাঁ, সুরমার সংস্পর্শে তা আমি পাই। সত্যকে অস্বীকার আমি করব না। কিন্তু কেন পাই, তুমি বলতে পার? আর তুমি কেন তা দিতে পার না?

—তুমি ভ্রষ্টচরিত্র বলে পারি না। আর ভ্রষ্টচরিত্র বলেই তুমি ওর কাছে আনন্দ পাও! মাতালরা যেমন মদকে সুধা বলে।

—আমি যদি মাতালই হই সুমতি, মদকেই যদি আমার সুধা বলে মনে হয়, তবে আমাকে ঘৃণা করো, আমাকে মুক্তি দাও।

নিষ্ঠুর শ্লেষের সঙ্গে সুমতি মুহূর্তে জবাব দিয়েছিল সাপের ছোবলের মতো—ভারি মজা হয় তা হলে, না?

বিচলিত হয়েছিলেন তিনি সে-দংশনের জ্বালায়, কিন্তু বিষে তিনি ঢলে পড়েন নি। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আবার তিনি ধীর-কণ্ঠে বলেছিলেন—শোনো সুমতি। আমার ধৈর্যের বাঁধ তুমি ভেঙে দিচ্ছ। তার উপর আমি ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত। তোমাকে আমার শেষ কথা বলে দি। তোমার সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে গেছে সামাজিক বিধানে। সে-বিধান অনুসারে তুমি আমি এ-বন্ধন ছিন্ন করতে পারি না। তুমি স্ত্রী, আমি স্বামী। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তোমার ভরণপোষণ করব, তোমাকে রক্ষা করব, আমার উপার্জন আমার সম্পদ তোমাকে দোব। আমার গৃহে তুমি হবে গৃহিণী। আমার দেহ তোমার। সংসারে যা বস্তু, যা বাস্তব, যা হাতে তুলে দেওয়া যায়, তা আমি তোমাকেই দিতে প্রতিশ্রুত, আমি তোমাকে তা দিয়েছি, তা আমি চিরকালই দোব। একবিন্দু প্রতারণা করিনি। কোনো অনাচার করি নি।

—কর নি?

—না।

—ভালোবাস না তুমি সুরমাকে? এতবড় মিথ্যা তুমি শপথ করে বলতে পার?

—তোমার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে কাউকে ভালোবাসা অনাচার নয়।

—নয়?

—না-না-না। তার আগে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব, তুমি বলতে পার, ভালোবাসার আকার কেমন? তাকে হাতে ছোঁয়া যায়? তাকে কি হাতে তুলে দেওয়া যায়? দিতে পার? তোমার অকপট ভালোবাসা আমার হাতে তুলে দিতে পার?

এবার বিস্মিত হয়েছিল সুমতি। একমুহূর্তে উত্তর দিতে পারে নি। মুহূর্ত কয়েক স্তব্ধ থেকে বলেছিল—হেঁয়ালি করে আসল কথাটাকে চাপা দিতে চাও। কিন্তু তা দিতে দেব না।

—হেঁয়ালি নয়। হেঁয়ালি আমি করছি না। সুমতি, ভালোবাসা দেওয়ার নয়, নেওয়ার বস্তু। কেউ কাউকে ভালোবেসে পাগল হওয়ার কথা শোনা যায়, দেখা যায়, সেখানে আসল মহিমা যে ভালোবাসে তার নয়; যাকে ভালোবাসে মহিমা তার। মানুষ আগে ভালোবাসে মহিমাকে তারপর সেই মানুষকে। কোথাও মহিমা রূপের, কোথাও কোনো গুণের। সুরমার মহিমা আছে, সে হয়তো তুমি দেখতে পাও না, আমি পাই, তাই আমি তাকে প্রকৃতির নিয়মে ভালোবেসেছি।

—লজ্জা করছে না তোমার? মুখে বাধছে না? চিৎকার করে উঠেছিল সুমতি।

—না। সবল দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন তিনি, কাঁপে নি সে কণ্ঠস্বর। চোখ তার সুমতির চোখ থেকে একেবারে সরে যায় নি। মাটির দিকে নিবদ্ধ হয় নি। সুমতিই যেন বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে বিভ্রান্তি কাটাতে পেরেছিল। বিভ্রান্তি কাটিয়ে হঠাৎ সে চিৎকার করে বলে উঠেছিল—মুখ তোমার খসে যাবে। ও-কথা বোলো না।

—লক্ষবার বলব সুমতি। চিৎকার করে সর্বসমক্ষে বলব। মুখ আমার খসে যাবে না! আমি নির্দোষ, আমি নিষ্পাপ।

—নিষ্পাপ? নিষ্ঠুর ভাবে হেসে উঠেছিল সুমতি। তারপর বলেছিল—ধর্ম দেবে তার সাক্ষী!

—ধর্ম? হেসে উঠেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ—ধর্মকে তুমি জান না, ধর্মের দোহাই তুমি দিয়ো না। তোমার অবিশ্বাসের ধর্ম শুধু তোমার। আমার ধর্ম মানুষের ধর্ম, জীবনের ধর্ম। সে তুমি বুঝবে না। না বোঝ, শুধু এইটুকু জেনে রাখো—তোমাকে বিবাহের সময় যে যে শপথ করে আমি গ্রহণ করেছি তার সবগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে আমি পালন করেছি। করছি! যতদিন বাঁচব করবই।

—কর্তব্য। কিন্তু মন?

—সে তো বলেছি, সে কাউকে দিলাম বলে নিজে দেওয়া যায় না। যার নেবার শক্তি আছে, সে নেয়। ওখানে মানুষের বিধান খাটে না। ও প্রকৃতির বিধান। যতটুকু তোমার ও-বস্তু নেবার শক্তি, তার এককণা বেশী পাবে না। তবে হ্যাঁ, এটুকু মানুষ পারে, মনের ঘরের হাহাকারকে লোহার দরজা এঁটে বন্ধ রাখতে পারে। তা রেখেও সে হাসতে পারে, কর্তব্য করতে পারে, বাঁচতে পারে। তাই করব আমি। আমাকে তুমি খোঁচা মেরে মেরে ক্ষতবিক্ষত কোরো না।

সুমতি একথার আর উত্তর খুঁজে পায় নি। অকস্মাৎ পাগলের মতো উঠে টেবিলের উপর রাখা ফাইলগুলি ঠেলে সরিয়ে, কতক নিচে ফেলে তছনছ করে দিয়েছিল। তিনি তার হাত চেপে ধরে বলেছিলেন—কী হচ্ছে?

—কোথায় ফটো?

—ফটো কী হবে ?

—পোড়াব আমি।

—না।

—না নয়। নিশ্চয় পোড়াব আমি।

—না।

—দেবে না ?

—না। ও ফটো আমি ঘরে রাখব না, কিন্তু পোড়াতে আমি দেব না।

সুমতি মাথা কুটতে শুরু করেছিল—দেবে না ? দেবে না ?

জ্ঞানেন্দ্রবাবু ড্রয়ার থেকে ফটো ক-খানা বের করে ফেলে দিয়েছিলেন। শুধু ফটো ক-খানাই নয়, চুলের-গুচ্ছ-পোরা খামটাও। রাগে আত্মহারা সুমতি সেটা খুলে দেখে নি। গোছা সমেত নিয়ে গিয়ে উনোনে পুরে দিয়েছিল।

তাঁরও আর সহ্যের শক্তি ছিল না। আহারে প্রবৃত্তি ছিল না। শুধু চেয়েছিলেন সবকিছু ভুলে যেতে। তিনি আলমারি খুলে বের করেছিলেন ব্রাণ্ডির বোতল। তখন তিনি খেতে ধরেছেন। নিয়মিত, খানিকটা পরিশ্রম লাঘবের জন্য। সে-দিন অনিয়মিত পান করে বিছানায় গড়িয়ে পড়েছিলেন।

সুমতির অন্তরের আগুন তখন বাইরে জ্বলেছে। সে তখন উন্মত্ত। শুধু ওই ক-খানা ফটো উনোনে গুঁজেই সে ক্ষান্ত হয় নি, আরও কয়েকখানা বাঁধানো ছবি ছিল সুরমার, তার একখানা সুরমার কাছে সুমতি নিজেই চেয়ে নিয়েছিল আর ক-খানা সুরমা আত্মীয়তা করে দিয়েছিল, সে-ক'খানাকেও পেড়ে আছড়ে কাচ ভেঙে ছবিগুলোকে আগুনে গুঁজে দিয়েছিল আর তার সঙ্গে গুঁজে দিয়েছিল সুরমার চিঠিগুলো। ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বেলে তবে এসে সে শুয়েছিল। ঘণ্টা দুয়েক পর ওই আগুনই লেগেছিল চালে। সুমতির অন্তরের আগুন। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। বনস্পতির শাখায় শাখায় পত্রে পল্লবে ফুলে ফলে যে তেজশক্তি করে সৃষ্টিসমারোহ, সেই তেজই পরস্পরের সংঘর্ষের পথ দিয়ে আগুন হয়ে বের হয়ে প্রথম লাগে শুকনো পাতায়, তারপর জ্বালায় বনস্পতিকে ; তার সঙ্গে সারা বনকে ধ্বংস করে। অঙ্গার আর ভস্মে হয় তার শেষ পরিণতি।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। পুড়ে ছাই হয়েও সুমতি নিষ্কৃতি দেয় নি।

বাইরে ঢং ঢং শব্দে দুটোর ঘণ্টা বাজল। কফির কাপটা তাঁর হাতেই ছিল। নামিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। নামিয়ে রাখলেন এতক্ষণে।

আর্দালী এসে এজলাসে যাবার দরজার পরদা তুলে ধরে দাঁড়াল। জুরী উকিল আগেই এসে বসেছেন আপন আপন আসনে। আদালতের বাইরে তখন সাক্ষীর ডাক শুরু হয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ এসে নিজের আসন গ্রহণ করলেন। হাতে পেনসিলটি তুলে নিলেন। দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন খোলা দরজা দিয়ে সামনের কম্পাউণ্ডের মধ্যে। মন ডুবে গেল গভীর থেকে গভীরে। সেখানে সুমতি নেই, সুরমা নেই, বিশ্বসংসারই বোধ করি নেই—আছে শুধু একটা প্রশ্ন, ওই আসামী যে প্রশ্ন করেছে। সাধারণ দায়রা বিচারে এ-প্রশ্ন এমন ভাবে এসে দাঁড়ায় না। সেখানে প্রশ্ন থাকে আসামী সম্পর্কে। আসামীর দিকে তাকালেন তিনি। চমকে উঠলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। আসামীর পিছনে কী ওটা ? কে ?—না—! কেউ নয়, ওটা ছায়া, স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে ঈষৎ তির্যকভাবে আকাশের আলো এসে পড়েছে

আসামীর উপর। একটা ছায়া পড়েছে ওর পিছনের দিকে। ঠিক যেন কে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম সাক্ষী এসে দাঁড়াল কাঠগড়ার মধ্যে। তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারী। হলপ নিয়ে সে বলে গেল—খগেনের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম পাওয়ার কথা, থানার পাতায় লিপিবদ্ধ করার কথা। আসামী নগেনই সংবাদ এনেছিল। জ্ঞানেন্দ্রবাবু আবার তাকালেন আসামীর দিকে। আসামীর পিছনের ছায়াটা দীর্ঘতর হয়ে পূর্বদিকের দেওয়ালের গায়ে গিয়ে পড়েছে। বর্ষা-দিনের অপরাহ্ণের আলো এবার পশ্চিম দিকের জানালাটা দিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছে। দারোগার সাক্ষী শেষ হল।

ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে চারটে বাজল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন—কাল জেরা হবে। উঠলেন তিনি। আঃ! তবু যেন আচ্ছন্নতা কাটছে না!

ছয়

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্নের মতো অবস্থায়। দুদিন পর। মামলার শেষ দিন। সব শেষ করে বাড়ি ফিরলেন। পৃথিবীর সব কিছু তাঁর দৃষ্টি-মন-চৈতন্যের গোচর থেকে সরে গেছে। কোনো কিছু নেই। চোখের সম্মুখে ভাসছে আসামীর মূর্তি। কানের মধ্যে বাজছে দুই পক্ষের উকিলের যুক্তি। মনের মধ্যে রয়েছে সমস্ত ঘটনাগুলির বিবরণ থেকে রচনা-করা পট। আর চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে আসামীর কথাগুলি।

থানা থেকে শুরু করে দায়রা আদালতে এই বিচার পর্যন্ত সর্বত্র সে একই কথা বলে আসছে। "হুজুর, আমি জানি না আমি দোষী কি নির্দোষ। ভগবান জানেন, আর হুজুর বিচার করে বলবেন।" এবং এই কথাগুলি যেন শুধু কথা নয়। তার যেন বেশী কিছু। জবাবের মধ্যে অতি কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত করেছে সে। কণ্ঠস্বরের সকরুণ অসহায় অভিব্যক্তি, চোখের দৃষ্টির সেই অসহায় বিহ্বলতা, তার হাত জোড় করে নিবেদনের সেই অকপট ভঙ্গি, সব মিলিয়ে সে একটা আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছে তাঁর চৈতন্যের উপর। 'অপরাধ করি নি' জবাব দিয়েই শেষ করে নি, প্রশ্ন করেছে—বিচারক তুমি বলো সে-কথা! ঈশ্বরকে যেমন ভাবে যুগে যুগে মানুষ প্রশ্ন করেছে ঠিক তেমনি ভাবে।

এ-প্রশ্ন তাঁর সমস্ত চৈতন্যকে যেন সচকিত করে দিচ্ছে; ঘুমন্ত অবস্থায় চোখের উপর তীব্র আলোর ছটা এবং উত্তাপের স্পর্শে জেগে উঠে মানুষ যেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে, তেমনি বিহ্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। ওই লোকটির সেই চরম সঙ্কটমুহূর্তের অবস্থার কথা কল্পনা করতে হবে। স্থলচারী মুক্তবায়ুস্তরবাসী জীব নিশ্ছিদ্র শ্বাসরোধী জলের মধ্যে ডুবে গিয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে কোন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল, কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, অনুমান করতে হবে। মৃত্যুর সম্মুখে সীমাহীন ঘন কালো একটা আবেষ্টনী মুহূর্তে মুহূর্তে তাকে ঘিরে ধরছিল। নিদারুণ ভয়, নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণার মধ্যে আজকের মানুষকে, হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের সভ্য মানুষকে প্রাগৈতিহাসিক আরণ্যযুগের আদিমতম মানুষের জান্তব চেতনার যুগে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে দয়া নাই, মায়া নাই, স্নেহ নাই, মমতা নাই, কর্তব্য নাই, আছে শুধু আদিমতম প্রেরণা নিয়ে প্রাণ, জীবন।

কল্পনা করতে তিনি পেরেছিলেন। কল্পনা নয়, ঠিক এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। তিনি অনুভব করতে পারছিলেন।

(খ)

অকস্মাৎ মর্মান্তিক শ্বাসরোধী সে এক নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। কে যেন হৃদপিণ্ডটা কঠিন কঠোর হাতের মুঠোয় চেপে ধরেছিল। তার সঙ্গে মস্তিষ্কে একটা জ্বালা। কাশতে কাশতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। যন্ত্রণায় আতঙ্ক-বিস্মারিত দৃষ্টি মেলেও কিছু বুঝতে পারেন নি। এক ঘন সাদা পুঞ্জ পুঞ্জ কিছুতে তাঁকে যেন ছেয়ে ফেলেছে। আর একটা গন্ধ! আর চোখে পড়েছিল ওই পুঞ্জ পুঞ্জ আবরণকে প্রদীপ্ত-করা একটা ছটা।

ধোঁয়া! মুহূর্তে উপলব্ধি হয়েছিল আগুন। ঘরে আগুন লেগেছে।

মাথার উপর গোটা ঘরের চালটা আগুন ধরে জ্বলছে। জানুয়ারীশেষের শীতে ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ। ধোঁয়ায় ঘরখানা বিষবাষ্পাচ্ছন্ন আদিম পৃথিবীর মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ঘরের আলো নিভে গেছে। আগুনের ছটায় রাঙা ধোঁয়া শুধু। তার সঙ্গে সে কী উত্তাপ! তাঁর নিজের মাথার মধ্যে তখন মদের নেশার ঘোর এক যন্ত্রণা। মৃত্যু যেন অগ্নিমুখী হয়ে গিলতে আসছে তাঁকে এবং সুমতিকে। সুমতি শুয়ে ছিল মেঝের উপর। সে তখন জেগেছে, কিন্তু ভয়ার্তবিহ্বল চোখের কোটর থেকে চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। বিহ্বলের মতো শুধু একটা চীৎকার।

তিনি তার মধ্যেও নিজেকে সংযত করে সাহস এনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ধোঁয়ার মধ্যে সব ঢেকে আসছিল, চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, তারই মধ্যে তিনি গিয়ে সুমতির হাত ধরে বলেছিলেন—এসো, শিগগির এসো।

সুমতি আঁকড়ে ধরেছিল তাঁর হাত।

কোথায় দরজা? কোন দিকে?

সুমতি সেদিন দরজায় খিল, উপরে নীচে দুটো ছিটকিনি লাগিয়ে তবে শুয়েছিল। এতগুলি খুলতে খুলতে তার শব্দে নিশ্চয় ওর ঘুম ভাঙবে। তিনি জানেন, ওর ভয় ছিল, যদি রাত্রে সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে যান!

তবুও ধৈর্য হারান নি। প্রাণপণে নিজের শিক্ষা ও সংযমে স্থির রেখেছিলেন নিজেকে। একে একে ছিটকিনি খিল খুলে বেরিয়ে এসেছিলেন বারান্দায়। সেখানে নিশ্বাস সহজ হয়েছিল, কিন্তু গোটা বারান্দার চালটা তখন পুড়ে খসে পড়ছে। একটা দিক পড়েছে, মাঝখানটা পড়ছে। মাথার উপরে নেমে আসছে জ্বলন্ত আগুনের একটা স্তর। ঠিক এই মুহূর্তেই হঠাৎ সুমতি চিৎকার করে উঠল, এবং ভারী একটা বোঝার মতো মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। তার আকর্ষণে সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পড়লেন। তাঁদের উপরে খসে পড়ল চালকাঠামোর সঙ্গে বাঁধা একটি স্তরবন্দী রাশি রাশি জ্বলন্ত খড়। সে কী যন্ত্রণা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলুপ্ত হয়ে গেল এক মহা অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। তবু তিনি ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাধা পড়ল! হাতটা কোথা আটকেছে! ওঃ, সুমতি ধরে আছে! মুহূর্তে তিনি হাত ছাড়িয়ে উঠে কোনো রকমে দাওয়ার উপর থেকে নীচে লাফিয়ে নেমে এসে খোলা উঠানে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। এ-অবস্থা কল্পনা ঠিক করা যায় না। তিনি

পেরেছেন, ভুক্তভোগী বলেই তিনি বুঝতে পেরেছেন।

"ঈশ্বর জানেন। আর হুজুর বিচার করে বলবেন।" আসামীর কথা কটি তাঁর চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে এখনও ধ্বনিত হচ্ছে।

ডিফেন্সের উকিলও আত্মরক্ষার অধিকারের মৌলিক প্রশ্নটিকেই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। জীবনের জন্মগত প্রথম অধিকার, নিজের বাঁচবার অধিকার তার সর্বাগ্রে। এই স্বত্বের অধিকারী হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। দণ্ডবিধির সেকশ্চন এইট্টি-ওয়ানের নজির তুলেছেন। একটি ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি।' হতভাগ্য আসামী। সেকশন এইট্টি-ওয়ান ওকে জলমগ্ন অবস্থাতেও গলা টিপে ধরবার অধিকার দেয় নি। আসামীর উকিল অবশ্য সুকৌশলে ও প্রয়োজনীয় অংশটুকু তুলে ধরেছেন জুরিদিগের সামনে।

"A and B, swimming in the sea after a shipwreck, get hold of a plank not large enough to support both, A pushes B, who is drowned. This, in the opinion of Sir James Stephen, is not a crime…"

কিন্তু এর পরও একটু যে আছে। স্যার জেমস স্টীফেন আরও বলেছেন,

"….. as thereby A does B no direct bodily harm but leaves him to his chance of another plank."

এ-সেকশন যে তাঁর মনের মধ্যে উজ্জ্বল অক্ষরে খোদাই করা আছে।

এই বিধানটি নিয়ে যে তিনি বার বার যাচাই করে নিয়ে নিজেকে মুক্তি দিয়েছেন।

সুমতির হাতখানাই শুধু তিনি ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন, কোনো আঘাত তিনি করেন নি। আঘাত করে তার হাত ছাড়ালে অপরাধ হত তাঁর। অবশ্য সুমতির দেহে একটা ক্ষতচিহ্ন ছিল; সেটা কারুর দেওয়া নয়, সেটা সুমতিকে তার নিয়তির পরিহাস, সেটা তার স্বকর্মের ফল, সুমতির পায়ের তলায় একটা দীর্ঘ কাচের ফলা আমূল ঢুকে বিঁধে ছিল। বাঁধানো যে ফটো ক-খানা আছড়ে সে নিজেই ভেঙেছিল সেই ফটো-ভাঙা কাচের একটা লম্বা সরু টুকরো! সেইটে বিঁধে যাওয়াতেই অমন ভাবে সে হঠাৎ সেই চরম সংকটের মুহূর্তটিতেই থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল।

বিধিলিপি! বিধিলিপির মতোই বিচিত্ররূপ এক অনিবার্য পরিণাম সুমতি নিজের হাতে তৈরি করেছিল। নিষ্কৃতির একটি পথও খোলা রাখে নি। নিজের হাতে নীরন্ধ্র করে রুদ্ধ করে দিয়েছিল। জীবন-প্রকৃতি আর জন্মপ্রকৃতি একসঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্ষুব্ধ হলে আর রক্ষা থাকে না। সেদিন তাঁদের জীবনে এমনি একটা পরিণাম অনিবার্যই ছিল। সুমতির হাতের জ্বালানো আগুন ওইভাবে ঘরে না লাগলে অন্যভাবে এমনি পরিণাম আসত। তিনি নিজে আত্মহত্যা করতেন। সুমতির ঘুম গাঢ় হলেই তিনি আত্মঘাতী হবেন স্থির করেই শুয়েছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত মদের ঘোরে তাঁর চৈতন্যের সঙ্গে সংকল্পও অসাড় হয়ে পড়েছিল। তিনি আত্মহত্যা করলে সুমতিও আত্মঘাতিনী হত তাতে তাঁর সন্দেহ নেই। কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো সে তাঁর জীবনকে আঁকড়ে ধরে ছিল।

(গ)

কুঠীর কম্পাউণ্ডে গাড়ি থামাতেই তাঁর মন বাস্তবে ফিরে এল। জজ সাহেবের কুঠী। বর্ষার

ম্লান অপরাহ্ন। আকাশে মেঘের আস্তরণ দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। বাড়িটা নিস্তব্ধ। কই সুরমা কই? বাইরে কোথাও নেই সে!

নেই ভালোই হয়েছে।

কিন্তু বাইরের এই প্রকৃতির রূপ তার উপর যেন একটা ছায়া ফেলেছে। ম্লান বিষণ্ণ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে সুরমা সেই বাবুর্চিখানায় আগুন-লাগার দিন থেকে।

গাড়ি থেকে নেমে জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালেন।

একটা ছায়া। তাঁর নিজেরই ছায়া। পাশের সবুজ লনের উপর নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে। আসামী নগেনের চেয়ে অনেক দীর্ঘ তাঁর ছায়া। নগেনের চেয়ে অনেকটা লম্বা তিনি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন বাংলোর দিকে। সরাসরি আপিস-ঘরের দিকে।

. বেয়ারা এসে দাঁড়াল—জুতো খুলবে—

—না। হাত ইশারা করে বললেন—যাও। যাও।

ঘরে ঢুকে গেলেন তিনি। আপিস-ঘর পার হয়ে এসে ঢুকলেন মাঝখানকার বড়-ঘরখানায়। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। ঘরখানা প্রায় প্রদোষান্ধকারের মতো ছায়াচ্ছন্ন; তাঁর ছায়াটা পর্যন্ত মিলিয়ে গেছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে সামনের দেয়ালে টাঙানো পরদাঢাকা ছবিটার উপর থেকে পরদাটা টেনে খুলে দিলেন।

সুমতির অয়েলপেন্টিং আবছায়ার মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, শুধু সাদা বড় চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে।

ছবিখানার দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

সে কি অভিযোগ করছে?

তিনি কি দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন?

—তুমি এ-ঘরে? বাইরে থেকে বলতে বলতেই ঘরে ঢুকে সুরমা স্বামীকে সুমতির ছবির দিকে চেয়ে থাকতে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

—ওদিকের জানলাটা খুলে দাও তো!

—খুলে দেব?

—হ্যাঁ।

সে কথা লঙ্ঘন করতে পারলেন না সুরমা। জানলাটা খুলে দিতেই আলোর ঝলক গিয়ে পড়ল ছবিখানার উপর।

সুরমা শিউরে উঠলেন। পরমুহূর্তেই অগ্রসর হলেন—ছবির উপর পরদাখানা টেনে দেবেন তিনি।

—না, ঢেকো না।

—কেন? হঠাৎ তোমার হল কী?

সুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বললেন—সেই দিন থেকে ওকে মধ্যে মধ্যে মনে পড়ছে। মাঝে মাঝে এসে যেন সামনে দাঁড়াচ্ছে। আজ বহুবার দাঁড়িয়েছে। তাই ওর সামনে এসে আমিই দাঁড়িয়েছি। থাক—ওটা খোলা থাক।

—বেশ থাক। কিন্তু পোশাক ছাড়বে চলো। চা খাবে।

—চা এখানে পাঠিয়ে দাও। পোশাক এখন ছাড়ব না।

এ-কণ্ঠস্বর অলঙ্ঘনীয়। নিজের ঘুমকে মনে মনে অভিসম্পাত দিলেন সুরমা। তিনি ঘুমিয়ে

পড়েছিলেন। নইলে হয়তো গাড়ির মুখ থেকে জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ফেরাতে পারতেন। এ ঘরে ঢুকতে দিতেন না।

কয়েক দিন থেকেই স্বামীর জন্য তাঁর আর দুশ্চিন্তার শেষ নাই।

দিন দিন তিনি যেন দূর থেকে দূরান্তরে চলে যাচ্ছেন ;—এক নির্জন গহনের মৌন একাকিত্বে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন। বর্ষার এই দিগন্তজোড়া বর্ষণোন্মুখ মেঘমণ্ডলের মতোই গম্ভীর ম্লান এবং ভারী হয়ে উঠছেন। জীবনের জ্যোতি যেন কোনো বিরাট গম্ভীর প্রশ্নের অনিবার্য আবির্ভাবে ঢাকা পড়ে গেছে। অবশ্য জ্ঞানেন্দ্রনাথের জীবনে এ নূতন নয়। ঋতুপর্যায়ের মতো এ তাঁর জীবনে এসেছে বার বার। বার বার কত পরিবর্তন হল মানুষটির জীবনে। উঃ!

কিন্তু এমন আচ্ছন্নতা, এমন মৌন মগ্নতা কখনও দেখেন নি! সবচেয়ে তাঁর ভয় হচ্ছে সুমতির ছবিকে! সে কোন প্রশ্ন নিয়ে এল? কী প্রশ্ন? সে প্রশ্ন যাই হোক তার সঙ্গে তিনি যে জড়িয়ে আছেন তাতে তো সন্দেহ নেই। তাঁর অন্তর যে তার আভাস পাচ্ছে। আকুল হয়ে উঠেছে। তাঁর মা তাঁকে বারণ করেছিলেন। কানে বাজছে। মনে পড়েছে। নিজেও তিনি দূরে চলে যেতে চেয়েছিলেন। টেনিস ফাইন্যালে জেতার পর তোলানো ফটোগ্রাফ ক-খানা পেয়েই সংকল্প করেছিলেন সুমতি—জ্ঞানেন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে যাবেন। অনেক দূরে। পরদিন সকালেই কলকাতা চলে যাবেন, সেখান থেকে বাবাকে লিখবেন অন্যত্র ট্রান্‌স্‌ফারের জন্য; অথবা জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ট্রান্‌স্‌ফার করাতে। বাবাকে জানাতে তাঁর সংকোচ ছিল না। কিন্তু বিচিত্র ঘটনাচক্র।

পরদিন ভোর বেলাতেই শুনেছিলেন মুন্সেফবাবুর বাসা পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। মুন্সেফ-বাবুর স্ত্রী পুড়ে মারা গেছেন, মুন্সেফবাবু হাসপাতালে, অজ্ঞান, বুকটা পিঠটা অনেকটা পুড়ে গেছে, বাঁচবেন কিনা সন্দেহ!

সব বাঁধ তাঁর ভেঙে গিয়েছিল।

যে-প্রেমকে কখনও জীবনে প্রকাশ করবেন না সংকল্প করেছিলেন সে-প্রেম সেই সংকটময় মুহূর্তে তারস্বরে কেঁদে উঠে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি জ্ঞানেন্দ্রনাথের শিয়রে গিয়ে বসে-ছিলেন। উঠবেন না, তিনি উঠবেন না। মাকে বলেছিলেন—আমাকে উঠতে বোলো না, আমি যাব না, যেতে পারব না।

কাতর দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছিলেন বাবার দিকে।

বাবা বলেছিলেন—বেশ, থাকো তুমি।

মা বলেছিলেন—এ তুই কী করছিস ভেবে দেখ। যে-লোক স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে এমনভাবে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তার মনে অন্যের ঠাঁই কোথায়?

লোকে যে দেখেছিল, চকিতের মত দেখেছিল সুমতির হাত ধরে জ্ঞানেন্দ্রনাথকে বেরিয়ে আসতে। চাল চাপা পড়ার মুহূর্তে সুমতির নাম ধরে তাঁর আর্ত চিৎকার শুনেছিল—'সুমতি!' বলে, সে নাকি এক প্রাণফাটানো আর্তনাদ!

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভালো হয়ে উঠবার পর একদা এক নিভৃত অবসরে সুরমা বলেছিলেন—তোমার জীবন আমি সর্বস্বান্ত করে দিয়েছি। আমার জন্যই তোমার এ সর্বনাশ হয়ে গেল। আমাকে তুমি নাও! সুমতির অভাব—

জ্ঞানেন্দ্রনাথ আশ্চর্য। সুরমার কথায় বাধা দিয়ে বলেছিলেন—অভাব-বোধের সব জায়গা-টাই যে অগ্নিজিহ্বা লেহন করে তার রূপ রস স্বাদ গন্ধ সব নিঃশেষে নিয়ে গেছে সুরমা।

আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন নিজের পুড়ে-যাওয়া বুক এবং পিঠটাকে।

—আমার চা-টা—শুধু চা, এখানে পাঠিয়ে দাও! প্লীজ!

জ্ঞানেন্দ্রনাথের মৃদু গম্ভীর কণ্ঠস্বর ; চমকে উঠলেন সুরমা। ফিরে এলেন নিষ্ঠুরতম বাস্তব অবস্থায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন সুমতির অয়েল-পেন্টিংয়ের সামনে।

—না। আর্ত মিনতিতে সুরমা তাঁর হাত ধরতে গেলেন।

—প্লীজ!

সুরমার উদ্যত হাতখানি আপনি দুর্বল হয়ে নেমে এল। আদেশ নয়, আকুতিভরা কণ্ঠস্বর বিদ্রোহ করার পথ নেই। লঙ্ঘন করাও যায় না।

নিঃশব্দেই বেরিয়ে গেলেন সুরমা।

সাত

(ক)

স্থির দৃষ্টিতে ছবিখানির দিকে তাকিয়ে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। ক্ষীণতম ভাষার স্পন্দন তাতে থাকলে তাকে শুনবার চেষ্টা করছিলেন, ইঙ্গিত থাকলে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। সুমতির মিষ্ট কোমল প্রতিমূর্তির মধ্যে কোথাও ফুটে রয়েছে অসন্তোষ অভিযোগের ছায়া?

—তুমি আজ কোর্টের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ফিরে তাকালেন।

চা নিয়ে সুরমা এসে দাঁড়িয়েছেন। নিজেই নিয়ে এসেছেন—বেয়ারাকে আনেন নি সঙ্গে।

—অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে? মাথা ঘুরে গিয়েছিল?

—কে বললে?

—আর্দালী বললে। পাবলিক প্রসিকিউটারের সওয়ালের সময় তোমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল ; তুমি উঠে খাস কামরায় গিয়ে মাথা ধুয়েছ—?

—হ্যাঁ। একটু হাসলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। বিচিত্র সে হাসি। বিষণ্ণতার মধ্যে যে এমন প্রসন্নতা থাকতে পারে, এ সুরমা কখনও দেখেন নি।

অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

পাবলিক প্রসিকিউটার আসামীর উকিলের সওয়ালের পর তার জবাব দিচ্ছিলেন। তিনি গভীর আত্মমগ্নতার মধ্যে ডুবে ছিলেন। নিস্পন্দ পাথরের মূর্তির মতো বসে ছিলেন তিনি, চোখের তারা দুটি পর্যন্ত স্থির ; কাচের চোখের মতো মনে হচ্ছিল। ইলেকট্রিক ফ্যানের বাতাসে শুধু তাঁর গাউনের প্রান্তগুলি কাঁপছিল, দুলছিল। তিনি মনে মনে অনুভব করছিলেন ওই শ্বাসরোধী অবস্থার স্বরূপ। আঙ্কিক নিয়মে অন্ধ বস্তুশক্তির নিপীড়ন। অঙ্কের নিয়মে একদিকে তাঁর শক্তি ঘনীভূত হয়, অন্যদিকে জীবনের সংগ্রাম-শক্তি সহশক্তি ক্ষীণ ক্ষীণতর হয়ে আসে। তার শেষ মুহূর্তের অব্যবহিত পূর্বে—সে চরম মুহূর্ত—শেষ চেষ্টা তখন তার, পুঞ্জ পুঞ্জ শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া, নির্মল প্রাণদায়িনী বায়ুর অভাবে হৃৎপিণ্ড ফেটে যায়। সকল স্মৃতি, ধারণা, বিচারবুদ্ধি অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে আসে। অকস্মাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে যেমন আলোর শিখা বেড়ে উঠে লণ্ঠনের ফানুশে কালির প্রলেপ লেপে দেয়, তার জ্যোতির চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে

দিয়ে নিজেও নিভে যায়—ঠিক তেমনি। ঠিক সেই মুহূর্তে খসে পড়ে জ্বলন্ত খড়ের রাশি, একসঙ্গে শত বন্ধনে বাঁধা একটা নিরেট অগ্নিপ্রাচীরের মতো। আসামী ঠিক বলেছে, সে-সময়ের মনের কথা স্মরণ করা যায় না। প্রকৃতির নিয়ম। হতভাগ্য আসামী জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল, নিষ্ঠুর বন্ধনে বেঁধেছিল তার ভাই। ঘন জলের মধ্যে গভীরে নেমে যাচ্ছিল, শ্বাসবায়ু রুদ্ধ হয়ে ফেটে যাচ্ছিল বুক, সে সেই যন্ত্রণার মধ্যে চলছিল পিছনের দিকে—আদিমতম জীবন-চেতনার দিকে—।

অকস্মাৎ তাঁর কানে এল অবিনাশবাবুর কথা।

(খ)

পাবলিক প্রসিকিউটার বলছিলেন সেকশন এইট্টি-ওয়ানের অনুল্লিখিত অংশটির কথা। আসামী খগেনের গলা টিপে ধরে তাকে আঘাত করেছে, শ্বাস রোধ করে মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছে, খগেনকে মেরে নিজেই বেঁচেছে, খগেনকে বাঁচবার অবকাশ দেয় নি।

"ইয়োর অনার, তা ছাড়া আরও একটি কথা আছে। আমার পণ্ডিত বন্ধু সেকশন এইট্টি-ওয়ানের একটি নজিরের অর্ধাংশের উল্লেখ করেছেন মাত্র। সে অর্ধাংশের কথা আমি বলেছি। এই সেকশন এইট্টি-ওয়ানেই আর-একটি নজিরের উল্লেখ আমি করব। ভগ্নপোত তিনজন নাবিক, অকূল সমুদ্রে ভেলায় ভাসছিল। দুজন প্রৌঢ়, একজন কিশোর। অকূল দিগন্তহীন সমুদ্র, তার উপর ক্ষুধা। ক্ষুধা সেই নিষ্করুণ নিষ্ঠুরতম রূপ নিয়ে দেখা দিল, যে-রূপকে আমরা সেই আদিম উন্মাদিনী শক্তি মনে করি। 'যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা' যার কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবন মাথা নত করে। সেই অবস্থায় তারা লটারি করে এই কিশোরটিকে হত্যা করে তার মাংস খেয়ে বাঁচে। তারা উদ্ধার পায়।' পরে বিচার হয়। সে-বিচারে আসামীদের উকিল জীবনের এই আদীম আইনের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, বিচারককে মনে রাখতে হবে, তারা তখন মানুষের সভ্যতার আইনের চেয়েও প্রবলতর আইনের দ্বারা পরিচালিত!"

"কিন্তু সেখানে বিচারক বলছেন, আত্মরক্ষা যেমন সহজ প্রবৃত্তি, সাধারণ ধর্ম—তেমনি আত্মত্যাগ, পরার্থে আত্মবিসর্জন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, মহত্তর ধর্ম। ইয়োর অনার, যে-প্রকৃতি বস্তু-জগতে অন্ধ নিয়মে পরিচালিত, জন্তু-জীবনে বর্বর, হিংস্র, কুটিল, আত্মপরতন্ত্রতায় যার প্রকাশ, মানুষের জীবনে তারই প্রকাশ দয়াধর্মে, প্রেমধর্মে, আত্মবলিদানের মহৎ এবং বিচিত্র প্রেরণায়। জন্তুর মা সন্তানকে ভক্ষণ করে। মানুষের মা আক্রমণোদ্যত সাপের মুখ থেকে সন্তানকে বাঁচাতে সে-দংশন নিজে বুক পেতে নেয়। কোথায় থাকে তার আত্মরক্ষার ওই জান্তব দীনতা হীনতা? মা যদি সন্তানকে হত্যা করে নিজের প্রাণের জন্য, পিতা যদি পুত্রকে হত্যা করে নিজের প্রাণের জন্য, বড় ভাই যদি অসহায় দুর্বল ছোট ভাইকে হত্যা করে নিজের প্রাণরক্ষা করে মহত্তর মানবধর্ম বিসর্জন দেয়, সবল যদি দুর্বলকে রক্ষা না করে, তবে এই মানুষের সমাজে আর পশুর সমাজে প্রভেদ কোথায়? মানুষের সমাজ আদি যুগ থেকে এই ঘটনার দিন পর্যন্ত অনেক অনেক কাল ধরে অনেক অনেক দীর্ঘ পথ চলে এসেছে অন্ধতমসাচ্ছন্নতা থেকে আলোকিত জীবনের পথে; এই ধর্ম এই প্রবৃত্তি আজ আর সাধনাসাপেক্ষ নয়, এ ধর্ম এই প্রবৃত্তি আজ রক্তের ধারার সঙ্গে মিশে রয়েছে; তার প্রকৃতির স্বভাবধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। আমাদের পুরাণে আছে, মহর্ষি মাণ্ডব্য বাল্যকালে একটি ফড়িংকে তৃণাঙ্কুর ফুটিয়ে

খেলা করেছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁকে বিনা অপরাধে রাজকর্মচারীদের ভ্রমে শূলে বিদ্ধ হতে হয়েছিল। তিনি ধর্মকে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কোন অপরাধে এই দণ্ড তাঁকে নিতে হল। তখন ধর্ম এই বাল্যবয়সের ঘটনার কথাটি উল্লেখ করে বলেছিলেন, আঘাতের প্রতিঘাতের ধারাতেই চলে ধর্মের বিচার, ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার মতো অমোঘ অনিবার্য! এ থেকে কারও পরিত্রাণ নাই। ইয়োর অনার, এই মানুষের ধর্ম সম্পর্কে কল্পনা এদেশে—"

ঠিক এই মুহূর্তে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

সমস্ত কোর্ট-রুমটা যেন পাক খেতে শুরু করেছিল। তার মধ্যে মনে পড়েছিল—দীর্ঘদিন আগেকার কথা। তিনি হাসপাতালে পড়ে আছেন, বুকে পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; নিদারুণ যন্ত্রণা দেহে মনে! সুরমার বাবা তাঁকে বলেছিলেন—কী করতে তুমি? কী করতে পারতে? হয়তো সুমতির সঙ্গে একসঙ্গে পুড়ে মরতে পারতে? কী হত তাতে?

আজ আসামীকে লক্ষ্য করে অবিনাশবাবু যখন এই কথাগুলি বলে গেলেন, তখন তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরে শিরায় শিরায় স্নায়ুতে স্নায়ুতে তীক্ষ্ণ সূচীমুখ হিমানী-স্পর্শের প্রতিক্রিয়ায় যেন একটা অদ্ভুত কম্পন বয়ে গেল সর্বাঙ্গে। আজ আকাশে মেঘ নাই; রোদ উঠেছে; স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে সেই আলোর প্রতিফলনে আসামীর পায়ের কাছে একটা ঘন কালো ছায়া পুঞ্জীভূত হয়ে যেন বসে রয়েছে। তিনি টেবিলের উপর মাথা রেখে যেন নুয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সে এক মিনিটের জন্য, বোধ করি তারও চেয়ে কম সময়ের জন্য। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাথা তুলে বলেছিলেন—মিঃ মিত্রা, একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি। ফাইভ মিনিট্স প্লীজ।

তিনি খাস কামরায় চলে গিয়ে বাথরুমে কলের নিচে মাথা পেতে দিয়ে কল খুলে দিয়েছিলেন। চার মিনিট পরেই আবার এসে আসন গ্রহণ করে বলেছিলেন,—ইয়েস, গো অন প্লীজ!—

"ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের কল্পনার কাহিনীগুলি যতই অবাস্তব হোক তার অন্তর্নিহিত উপলব্ধি, তার ভিত্তিগত সত্য অভ্রান্ত, অমোঘ। রাষ্ট্র সমাজ সেই নিয়ম ও নীতিকেই জয়যুক্ত করে। বর্তমান ক্ষেত্রে—।"

অবিনাশবাবু আশ্চর্য ধীমত্তার সঙ্গে তাঁর সওয়াল করেছেন। সমস্ত আদালত অভিভূত হয়ে ছিল। সওয়াল শেষের পরও মিনিটখানেক কোর্টরুমে সূচীপতন-শব্দ শোনা যাবার মতো স্তব্ধতা থমথম করছিল।

আসামী চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

সেই স্তব্ধতার মধ্যেও সকলের মনে ধ্বনিত হচ্ছিল,—'বর্তমান ক্ষেত্রে আসামী যদি একটি নারীর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে স্নেহ-মমতা, তার সুদীর্ঘ দিনের সন্ন্যাসধর্ম বিসর্জন দিতে উদ্যত না হত, তবে আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে, আত্মরক্ষার আকুলতায় ওই ছোট ভাইয়ের গলা টিপে ধরেও সে ছেড়ে দিত, তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করত। সে ক্ষেত্রে যদি এমন কাণ্ডও ঘটত তবে আমি বলতাম যে—জলের মধ্যে সে যখন ছোট ভাইয়ের গলা টিপে ধরেছিল, তখন শুধু মাত্র জান্তব আত্মরক্ষার প্রেরণাতেই সে এ-কাজ করেছিল। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আসামী এবং হত ব্যক্তি তাই হয়েও প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী, যে-দ্বন্দ্বের তীব্রতায় বিষয়ভাগে উদ্যত হয়েছিল। এ-ক্ষেত্রে আক্রোশ অহরহই বর্তমান ছিল তার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর এবং যথাসময়ে সুযোগের মধ্যে সে-আক্রোশ যথারীতি কাজ করে গেছে। বাল্যজীবনে চতুষ্পদ হত্যা করার চাতুর্য তার সবলতর হাতে মুহূর্তে

কার্য সমাধা করেছে—ইয়োর অনার—

অবিনাশবাবুর কথাগুলি এখনও ধ্বনিত হচ্ছে—আইনই শেষ কথা নয়। পৃথিবীতে প্রকৃতির নিয়ম যেমন অমোঘ, মানুষের চৈতন্যের মহৎ প্রেরণাও তেমনই অমোঘ। তার চেয়েও সে বলবতী, তেজশক্তিতে প্রদীপ্ত, জান্তব প্রকৃতির তমসাকে নাশ করতেই তার সৃষ্টি! ভাই ভাইকে, বড়ভাই ছোটভাইকে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করে নি, নিজের প্রাণরক্ষার জন্য তাকে হত্যা করেছে। এ-হত্যা কলঙ্কজনক; নিষ্ঠুরতম পাপ মানুষের সমাজে।

(গ)

জুরীরা একবাক্যে আসামীকে দোষী ঘোষণা করেছেন।

আসামীও বোধ হয় অবিনাশবাবুর বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল, নতুবা বিচিত্র তার মন। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ কাঠগড়ার রেলিংয়ের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল।

তার দিকে তাকাবার তখন তাঁর অবকাশ ছিল না। তিনি তখন সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রায় ঘোষণা করেছিলেন—জুরীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং আসামীর অপরাধ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে—

আবার তিনি মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়েছিলেন। হঠাৎ চোখ পড়েছিল সামনের দেওয়ালে—আসামীর সেই ছায়াটা আধখানা মেঝে আধখানা দেওয়ালে এঁকেবেঁকে মসীময় একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মুহূর্তেই আত্মসংবরণ করেছেন তিনি।

রায় দিয়েছেন, যাবজ্জীবন নির্বাসন। ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ধারা অনুযায়ী এই অস্বাভাবিক আসামীর প্রাণান্তকর অবস্থার মধ্যে সংঘটনের উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতির করুণা পাবার বিবেচনার জন্য সুপারিশ করেছেন।

কোর্ট থেকে এসে সরাসরি ঘরে ঢুকে আপিসে বসে ছিলেন। দেওয়ালে-পড়া সেই প্রশ্নচিহ্নটা কাল ছিল আবছা, আজ স্পষ্ট ঘন কালো কালিতে লেখা প্রশ্নের মতো দাঁড়িয়েছে।

সুমতির কাছে তাঁর অপরাধ আছে? আছে? আছে? না থাকলে ছবিখানা ঢাকা থাকে কেন? কেন? কেন?

আজ দীর্ঘকাল পর অকস্মাৎ তিনি পলাতক আত্মগোপনকারীর দুর্বিষহ অবস্থা অনুভব করেছেন।

তাই বাড়ি ফিরে সরাসরি এসে সুমতির ছবির কাছে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। বলো তোমার অভিযোগ! কোথায় তোমার ভয়? বলো! বলো! বলো!

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ, তারই মধ্যে মিলিয়ে গেল তাঁর মুখের সেই বিচিত্র, একাধারে বিষণ্ণ এবং প্রসন্ন হাসিটুকু। সুরমা তাঁর বুকের উপর হাতখানি রেখে গাঢ় স্বরে বললেন—ডাক্তারকে ডাকি?

—না।

—মাথা ঘুরে গিয়েছিল স্বীকার করছ, তবু ডাক্তার ডাকবার কথায় না বলছ?

—বলছি। শরীর আমার খারাপ হয় নি। তুমি জান, আমি মিথ্যা কথা বলি না। ওই

সুমতি ; সুমতি হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল আমার। মাথাটা ঘুরে গেল।

চায়ের কাপটা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে মাথা হেঁট করে ঘুরতে লাগলেন। সুরমা মাটির পুতুলের মতোই টেবিলের কোণটির উপর হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ একসময় জ্ঞানেন্দ্রনাথের বোধ করি খেয়াল হল—ঘরে সুরমা এখনও রয়েছে। বললেন—এখনও দাঁড়িয়ে আছ ? না। থেকো না দাঁড়িয়ে। যাও ; বাইরে যাও ; খোলা হাওয়ায় ; আমাকে আজকের মতো ছুটি দাও। আজকের মতো।

সুরমা সাধারণ মেয়ে হলে কান্না চাপতে চাপতে ছুটে বেরিয়ে যেতেন। কিন্তু সুরমা অরবিন্দ চ্যাটার্জীর মেয়ে, জ্ঞানেন্দ্রনাথের স্ত্রী। নীরবে ধীর পদক্ষেপেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। লনে এসে কম্পাউণ্ডের ছোট পাঁচিলের উপর ভর দিয়ে পশ্চিম দিকে অস্তমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ; দুটি নিঃশব্দ অশ্রুধারা গড়িয়ে যেতে শুরু হল সূর্যকে সাক্ষী রেখে। তাঁরও জীবনের আলো কি ওই সূর্যাস্তের সঙ্গেই অস্ত যাবে ? চিরদিনের মতো অস্ত যাবে ?

—বয় ! জ্ঞানেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

(ঘ)

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘুরছিলেন অবিশ্রান্তভাবে। মনের মধ্যে বিচিত্রভাবে কয়েকটা কথা ঘুরছে।

মাণ্ডব্য ধর্মের বিধানের পরিবর্তন করে এসেছিলেন।

পশু পশুকে হত্যা করে খায়। শুধু হিংসার জন্যও অকারণে হত্যা করে। সে তার স্ব-ধর্ম। তামসী তার ধর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মানুষ যে ধর্মকে আবিষ্কার করেছে—সে সেখানে ভবিষ্যতের গর্ভে—সেখানে সে জন্মায় নি, সেখামে কোনো দেবতার শাস্তিবিধানের অধিকার নাই। এমন কি, অনুতাপের সূচীমুখেও এতটুকু অনুশোচনা জাগবার অবকাশ নাই সেখানে। মানুষের জীবনেই এই তমসার মধ্যে প্রথম চৈতন্যের আলো জ্বলেছে। শৈশব বাল্য অতিক্রম করে সেই চৈতন্যে উপনীত হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে সকল নিয়মের অতীত। মাণ্ডব্য বলেছিলেন—যম, সেই অমোঘ সত্য অনুযায়ী আমি তোমার বিধান সংশোধন করছি। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত মানুষ অপরাধ ও শাস্তির অতীত।

সে-বিধান ধর্ম নাকি মেনে নিয়েছিলেন।

আধুনিক যুগে সে বিধান আবার সংশোধন করেছে মানুষ।

রাষ্ট্রীয় দণ্ডবিধির নির্দেশ, সাত বৎসর পর্যন্ত মানুষের অপরাধবোধ জাগ্রত হয় না ; সুতরাং ততদিন সে দণ্ডবিধির বাইরে। রাষ্ট্রবিধাতাদের বিবেচনায় পাঁচ বৎসর বেড়ে সাত বৎসর হয়েছে। মানুষ মহাতমসার শক্তির প্রচণ্ডতা নির্ণয় করে শিউরে উঠে তাকে সসম্ভ্রমে স্বীকার করেছে। তাতে ভুল করে নি মানুষ। কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো তার অস্তিত্ব। তাকে কি লঙ্ঘন করা যায় ? কিন্তু এখনও কি—?

এখনও মানুষের চৈতন্য কি সাত বছর বয়সের গণ্ডি অতিক্রম করে নি ?

এখনও কি আদিম প্রকৃতির অন্ধ নিয়মের প্রভাবের কাছে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণের দুর্বলতা কাটাবার মতো বল সঞ্চয় করে নি ? প্রাগৈতিহাসিক মস্তিষ্কের গঠনের সঙ্গে আজকের মানুষের কত প্রভেদ !

গুলিবিদ্ধ হয়ে মরণোন্মুখ মানুষ আজ অক্রোধের মধ্যে রাম নাম উচ্চারণ করতে পেরেছে। যুদ্ধে আহত মরণোন্মুখ মানুষ নিজের মুখের জল অপরের মুখে তুলে দিয়েছে—'তোমার প্রয়োজন বেশী।' Thy necessity is greater than mine.

নিষ্ঠুরতম অত্যাচারেও মানুষ অন্যায়ের কাছে নত হয় নি; ন্যায়ের জন্য হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করেছে। দুর্বল বিপন্নকে রক্ষা করতে সবল ঝাঁপ দিয়েছে বিপদের মুখে, নিজে মৃত্যু বরণ করে দুর্বলকে রক্ষা করেছে। বিবেচনা করতে সময়ের প্রয়োজন হয় নি। চৈতন্যের নির্দেশ প্রস্তুত ছিল। চৈতন্য জীবপ্রকৃতির অন্ধ নিয়মকে অবশ্যই অতিক্রম করেছে।

তিনি নিজেও তো করেছেন—। ক্ষেত্রটা একটু স্বতন্ত্র।

তিনি সুরমাকে ভালোবেসেছিলেন, কিন্তু সুমতির প্রতি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। সুমতি বেঁচে থাকতে বারেকের জন্য সুরমাকে মুখে বলেন নি, তোমাকে আমি ভালোবাসি। মনে না-পাওয়ার বেদনা ছিল, সে বেদনাও তিনি বুকের মধ্যে নিরুদ্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে গোপনতম অন্তরেও আত্মপ্রকাশ করতে দেন নি। কোনোদিন বারেকের জন্য থামেন নি। জীবনে তমসার সীমারেখা অনেক পিছনে ফেলে এসেছেন।

চোখ দুটির দৃষ্টি তাঁর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

আবার এসে দাঁড়ালেন সুমতির ছবির সামনে। ভালো আলো এসে পড়ছে না, দেখা যাচ্ছে না ভালো, তিনি ডাকলেন—বয়।

—নামা ছবিখানাকে। রাখ ওই চেয়ারের উপর।

সুমতির ছবির চোখেও যেন অভিযোগ ফুটে রয়েছে, যার জন্য ছবিখানাকে ঢেকে রাখার আদেশ দিয়েছেন। আজ ছবিখানাকে অত্যন্ত কাছে এনে, সত্যকারের সুমতির মতো সামনে এনে, তার সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করবেন।

পরিপূর্ণ আলোর সামনে রেখে ছবির চোখে চোখ রেখেই স্থিরভাবে দাঁড়ালেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ।

ক্লান্ত চিন্তাপ্রখর মস্তিষ্কের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে যেন। অন্যদিকে হৃদয়ের মধ্যে একটা কম্পন অনুভব করছেন। প্রাণপণে নিজেকে সংযত স্থির করে রাখতে চাইলেন তিনি। সমুদ্রে ঝড়ে বিপন্ন জাহাজের হালের নাবিকের মতো। সব বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আছেন শুধু তিনি আর সুমতির ছবি। ছবি নয়—ওই ছবিখানা আজ আর ছবি নয় তাঁর কাছে, সে যেন জীবনময়ী হয়ে উঠেছে। স্থির নীল আকাশ অকস্মাৎ যেমন মেঘপুঞ্জের আবর্তনে, বায়ুবেগে প্রশান্ত বিদ্যুতে, গর্জনে বাঙ্ময় মুখর হয়ে ওঠে তেমনি ভাবে মুখর হয়ে উঠেছে। এ-সবই তাঁর চিত্তলোকের প্রতিফলন তিনি জানেন। আকাশ মেঘ নয়, আকাশে মেঘ এসে জমে, তেমনি ভাবে ছবিখানায় নিষ্ঠুর অভিযোগের প্রখর মুখরতা এসে জমা হয়েছে।

বার বার ছবিখানার সামনে এসে দাঁড়ালেন, আবার ঘরখানার মধ্যে ঘুরলেন। দেওয়ালের ক্লকটায় পেণ্ডুলামের অবিরাম টক-টক টক-টক শব্দ ছাড়া আর শব্দ নাই। সময় চলেছে—রাত্রি অগ্রসর হয়ে চলেছে তারই মধ্যে।

উত্তর তাঁকে দিতে হবে এই অভিযোগের। এই নিষ্ঠুর অভিযোগ-মুখরতাকে স্তব্ধ করতে হবে তাঁর উত্তরে। তাঁর নিজেরই অন্তরলোকে যেন লক্ষ লক্ষ লোক উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে তাঁর উত্তর শুনবার জন্য। তাঁদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি নিজে।

—বলো, বলো, সুমতি, বলো তোমার অভিযোগ!

ছবির সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন। বলো!

ওঃ, কী গভীর বেদনা সুমতির মুখে চোখে!—এত দুঃখ পেয়েছ? কিন্তু কী করব? দুঃখ তো আমি দিই নি সুমতি; নিজের দুঃখকে তুমি নিজে তৈরী করেছ। গুটিপোকার মতো নিজে দুঃখের জাল বুনে নিজেকে তারই মধ্যে আবদ্ধ করলে!

—কী বলছ? আমি তোমায় ভালোবাসলে তোমার অমন হত না? আমার মন, আমার হৃদয়, আমার ভালোবাসা পেলে তুমি প্রজাপতির মতো অপরূপা হয়ে সর্ব বন্ধন কেটে বের হতে? মন হৃদয় ভালোবাসা না দেওয়ার অপরাধে আমি অপরাধী?

—না। স্বীকার করি না! মন হৃদয় ভালোবাসা দিতে আমি চেয়েছিলাম—তুমি নিতে পার নি, তোমার হাতে ধরে নি। এ সংসারে যার যতটুকু শক্তি তার এক তিল বেশী কেউ পায় না।

সে তার প্রাপ্য নয়। ঈশ্বরের দোহাই দিলেও হয় না। ধর্ম মন্ত্র শপথ কোনো কিছুর বলেই তা হয় না। হাতে তুলে দিলে হাত দিয়ে গলে পড়ে যায়, আঁচলে বেঁধে দিলে নিজেই সে আঁচলের গিঁট খুলে হারায়, আঁচল ছিঁড়ে ফেলে। হ্যাঁ, পারে, একটা জিনিস প্রাপ্য না হলেও মানুষে দিতে পারে, দান—দয়া। তাও দিয়েছিলাম। তাও তুমি নাও নি!

ছবির সামনে দাঁড়িয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ সত্যই কথা বলেছিলেন। চোখের দৃষ্টি তাঁর স্বাভাবিক, উজ্জ্বল। ছবি যেন তাঁর সামনে কথা বলছে। অশরীরী আবির্ভাব তিনি যেন প্রত্যক্ষ করছেন। শব্দহীন কথা যেন শুনতে পাচ্ছেন। তিনি যেন বিশ্বজগতের সকল মানুষের জনতার মধ্যে সুমতির সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন।

—কি বললে? সুরমাকে তো ভালোবাসতে পেরেছিলাম?

—না পেরে তো আমার উপায় ছিল না সুমতি। তার নেবার শক্তি ছিল, সে নিতে পেরেছিল, নিয়েছিল। তাই বা কেন? তুমি নিজে না নিয়ে ছুঁড়ে তার হাতে ফেলে দিয়েছিলে, তুলে দিয়েছিলে। তুমিই অকারণ সন্দেহে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতিকে অভিশাপ দিতে গিয়ে বিচিত্র নিয়মে আশীর্বাদে সার্থক প্রেমে পরিণত করেছিলে। প্রীতিকে তুমি বিষ দিয়ে মারতে গেলে, প্রীতি সে বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠের মতো অমর প্রেম হয়ে উঠল।

—কী বলছ? বিবাহের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমি—?

—দিয়েছিলাম। সে-প্রতিশ্রুতি আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি! সুরমাকে ভালোবেসেও তুমি জীবিত থাকতে কোনোদিন তা বাক্যে প্রকাশ করি নি, অন্তরে প্রশ্রয় দিই নি, মনে কল্পনা করি নি। তুমি আমার ধৈর্যকে আঘাত করে ভাঙতে চেয়েছ। আমি বুক দিয়ে সয়েছি, ভাঙতে দিই নি। শেষে তুমি আগুন ধরিয়ে দিলে। সে-আগুন ঘরে লাগল। সেই আগুনে তুমি নিজে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে! আমি পুড়লাম। কোনো রকমে বেঁচেছি, কিন্তু আমি নির্দোষ।

—কী?

অকস্মাৎ চোখ দুটি তাঁর বিস্ফারিত হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বিস্ফারিত চোখের নিষ্পলক দৃষ্টিতে ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন—

—কী?

—কী বলছ?

—সেই চরম মুহূর্তটিতে আমি তোমার হাত থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম? আমি যে তোমাকে বিপদে-আপদে আঘাতে-অকল্যাণে রক্ষা করতে ঈশ্বর সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সে প্রতিজ্ঞা—।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। ছিলাম। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি নি। স্বীকার করছি। স্বীকার করছি। কিন্তু কী করব? নিজের জীবন তো আমি বিপন্ন করেছিলাম, তবু পারি নি। কী করব? তোমার নিজের হাতে ভাঙা কাচের টুকরো—।

—কী? কী? সেটা বের করে তোমাকে বুকে তুলে নিয়ে বের হবার শেষ চেষ্টা করি নি? না, না, করি নি! তোমার জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারতাম,—দেওয়া উচিত ছিল, তা আমি পারি নি। আমি দিই নি! আমি স্বীকার করছি!

—কী? পৃথিবীতে মানুষের চৈতন্য অনেকদিন সাত বছর পার হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে। হয়েছে! নিশ্চয় হয়েছে! অপরাধ আমি স্বীকার করছি!

অবসন্নভাবে তিনি যেন ভেঙে পড়লেন, দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি আর ছিল না। একখানা চেয়ারে বসে মাথাটি নুইয়ে টেবিলের উপর রাখলেন। অদৃশ্য পৃথিবীর জনতার সামনে তিনি যেন নতজানু হয়ে বসতে চাইলেন। আবার মাথা তুললেন; সুমতি যেন এখনও কী বলছে।

—কী? কী বলছ?

—আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে বলছ?

—বলছ, নিয়তি আগুনের বেড়াকে ছিদ্রহীন করে তোমাকে ঘিরে ধরেছিল, শুধু একটি ছিদ্রপথ ছিল আমার হাতখানির আশ্রয়? আকুল আগ্রহে, পরম বিশ্বাসে সেই পথে হাত বাড়িয়ে ধরেছিলে, আমি হাত ছাড়িয়ে সেই পথটুকুও বন্ধ করে দিয়েছি?

—দিয়েছি! দিয়েছি! দিয়েছি! আমি অপরাধী। হ্যাঁ, আমি অপরাধী।

চেতনা যেন তাঁর বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে নিজেকে সচেতন রাখতে চেষ্টা করলেন। নিজের চৈতন্যকে তিনি অভিভূত হতে দেবেন না। সকল আবেগ সকল গ্লানির পীড়নকে সহ্য করে তিনি স্থির থাকবেন।

কতক্ষণ সময় পার হয়ে গেছে, তার হিসাব তাঁর ছিল না। ঘড়িটা টক-টক শব্দে চলেছেই —চলেছেই; সেদিকেও তিনি তাকালেন না। শুধু এইটুকু মনে আছে—সুরমা এসে ফিরে গেছে; বয়ও কয়েকবার দরজার ওপাশ থেকে বোধ করি শব্দ করে. তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছে। কিন্তু তিনি মাথা তোলেন নি। শুধু নিজেকে স্থির চৈতন্যে অধিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। তপস্যা করেছেন।

মাথা তুললেন তিনি। মুখে চোখে প্রশান্ত স্থিরতা, বিচারবুদ্ধি অবিচলিত, মস্তিষ্ক স্থির, চৈতন্য তাঁর অবিচল স্থৈর্যে অকম্পিত শিখার মতো দীর্ঘ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে জ্বলছে। আদিঅন্তহীন মনের আকাশ শরতের পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তির মতো দীপ্তিতে প্রসন্ন উজ্জ্বল। চারিপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য আলোকবিন্দুর মতো যেন কাদের মুখ ভেসে উঠেছে। কাদের?

যাদের বিচার করেছেন—তারা?

বিচার দেখতে এসেছে তারা! ডিভাইন জাস্টিস! ডিভাইন জাজমেণ্ট!

কোনো সমাজের কোনো রাষ্ট্রের দণ্ডবিধি অনুসারে নয়, এ-দণ্ডবিধি সকল দেশের সকল সমাজের অতীত দণ্ডবিধি। সূক্ষ্মতম, পবিত্রতম, ডিভাইন!

আত্মসমর্পণ করবেন তিনি। কাল তিনি সব প্রকাশ করে আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। অবশ্য তার কোনো মূল্যই নেই; কারণ তিনি জানেন—কোনো দেশের প্রচলিত দণ্ডবিধিতেই এ-অপরাধ অপরাধ বলে গণ্য নয়, কোনো মানুষ-বিচারক এর বিচারও জানে না। তিনি নিজেও বিচারক, তিনি জানেন না—কী এর বিচার-বিধি, কী এর শাস্তি!

বিচার করতে পারেন ঈশ্বর। ঈশ্বর ছাড়া এর বিচারক নাই। ঈশ্বরকে আজ স্বীকার

করেছেন তিনি। তবুও প্রকাশ্যে আত্মসমর্পণ করবেন। তার আগে—।

স্থরমা!

কই স্থরমা? হয়তো পাথর হয়ে গেছে স্থরমা। দীর্ঘনিশ্বাস একটি আপনি বেরিয়ে এল বুক চিরে। ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন তিনি। স্থরমার সন্ধানেই চলেছিলেন। কিন্তু বারান্দায় এসে থমকে দাঁড়ালেন। মনে হল বিচারসভা যেন বসে গেছে।

মধ্যরাত্রির পৃথিবী ধ্যানমগ্নার মতো স্থির স্তব্ধ। আকাশে চাঁদ মধ্যগগনে, মহাবিরাটের ললাট-জ্যোতির মতো দীপ্যমান। কাটা কাটা মেঘের মধ্যে বর্ষণধৌত গাঢ়নীল আকাশখণ্ড নিরপেক্ষ মহাবিচারকের ললাটের মতো প্রসন্ন। বিচারক যেন আসন গ্রহণ করে অপেক্ষা করছেন।

ধীরে ধীরে অভিভূতের মতো নেমে প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে দাঁড়ালেন তিনি। সূক্ষ্মতম বিচারে নিজের অপরাধ-স্বীকৃতির মধ্য থেকে এক বৈরাগ্যময় আত্মসমর্পণের প্রসন্নতা তাঁর অন্তরের মধ্যে মেঘমুক্ত আকাশের মতো প্রকাশিত হচ্ছে। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত অমলিন জ্যোৎস্নার জ্যোতিষ্মানতা ও মহামৌনতার মধ্যে তিনি যেন এক চিত্ত-অভিভূত-করা মহাসত্তাকে অনুভব করলেন। অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি। অথচ কয়েকটা দিন বর্ষণে বাতাসে কী দুর্যোগই না চলেছে!

সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে চলেছে এই তপস্যা। মহা-উত্তাপে ফুটন্ত, দাবদাহে দগ্ধ, প্রলয়-ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত, মহাবর্ষণে প্লাবিত বিধ্বস্ত পৃথিবী এই তপস্যার আশীর্বাদে আজ শস্য-শ্যামলতায় প্রসন্না, প্রাণস্পন্দিতা, চৈতন্যময়ী। সেই তপস্যারত মহাসত্তা এই মুহূর্তে যেন প্রত্যক্ষ হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথের অভিভূত সত্তার সম্মুখে। ধ্যাননিমীলিত নেত্র উন্মীলিত করে যেন তাঁর বক্তব্যের প্রতীক্ষা করছেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

—বিচার করো আমার, শাস্তি দাও। তমসার সকল গ্লানির ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ করো আমাকে। মুক্তি দাও আমাকে!

পিছনে ভিজে ঘাসের উপর পায়ের শব্দ উঠছে। ক্লান্তিতে মন্থর। অন্তরের বেদনার বিষণ্ণতায় মৃদু। স্থরমা আসছে। অশ্রুমুখী স্থরমা।

তবুও তিনি মুখ ফেরালেন না।

আদিঅন্তহীন ব্যাপ্তির মধ্যে তপস্যারত জ্যোতিষ্মান এই বিরাট সত্তার পাদমূলে প্রণতি রেখে তাঁর অন্তরাত্মা তখন স্থির শান্ত স্তব্ধ হয়ে আসছে। স্থমতির ভ্রূকুটি বিগলিত হয়ে মিশে যাচ্ছে প্রসন্ন মহাসত্তার মধ্যে।

আজ যদি কোনোক্রমে স্থরমা মরণ-আক্রমণে আক্রান্ত হয়—স্থরমা কেন—যে-কেউ হয়, তবে নিজের জীবন দিয়ে তিনি তাকে রক্ষা করতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। মৃত্যুর মধ্যে অমৃত অসীম শূন্য আকাশের পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রত্যক্ষ। তাঁর অন্তরলোকে চৈতন্য শতদলের মতো শেষ পাপড়িগুলি মেলেছে।

স্থরমা এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে; শান্ত ক্লান্ত মুখখানির চারিপাশে চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে, দুচোখের কোণ থেকে নেমে এসেছে দুটি বিশীর্ণ জলধারা, নিরাভরণা-বেদনার্তা—পরনে একখানি সাদা শাড়ি; তপস্বিনীর মতো।

গন্না বেগম

শ্রীমান্ মধুসূদন মজুমদার

স্নেহাস্পদেষু

কয়েকটি কথা

গন্না বেগম—আমার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রথম যৌবনে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ নিয়ে নাটক লিখেছিলাম। সে সময়ে এই সময়ের ইতিহাস Grant Duff-এর বই থেকে পড়েছিলাম এবং এই সময়ের বিচিত্র উত্থান-পতনের কাহিনী আমাকে আকর্ষণ করেছিল। পরে এই নাটক আবার নতুন করে লিখেছিলাম—'বালাজীরাও' নামে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। এই নাটক লেখার সময় আচার্য স্যার যদুনাথের Fall of the Mughal Empire পড়ে অনেক তথ্য পাই। এবং তার মধ্যেই পাই গন্না বেগমের এই বিচিত্র করুণ কাহিনীটি। তারপর এই সময়ের আরও অনেক ইতিহাস পড়েছি। Sir William Jones-এর বক্তৃতামালার মধ্য থেকে গন্না বেগমের রচিত একখানি গজলও পাই। গজলখানি আমার কাছে বড় ভাল লেগেছে। তারপর নব-কল্লোলে পূজার সময় গন্না বেগমের উপন্যাস লিখি। কিন্তু পূজা-সংখ্যায় স্থানাভাবের জন্য একরকম মধ্যপথে একটি নাটকীয় ঘটনায় ছেদ টেনে দিই। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তাকে সাধ্যমত সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছি। এই সময়ের ঘটনা এবং গন্নার জীবনের দুষ্টগ্রহ ইমাদ-উল-মুল্ক ভারতবর্ষের ইতিহাসে উত্থান-পতনের সন্ধিক্ষণে এমন ভূমিকা গ্রহণ করেছে যে তারই জন্য গন্নার জীবনও ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

ইতিহাসকে আমি অবিকৃতই রেখেছি। লঙ্ঘন করি নি। কেবল যে সব অংশ গন্নার জীবনের খুব কাছে আসে নি—সে অংশ বাইরে রেখেছি।

এর পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে পিয়ারা বাবা, শুকদেব আচার্য, বাঁদী আমিনা এবং চাঁদ খাঁ ছাড়া প্রত্যেক চরিত্রটিই ঐতিহাসিক চরিত্র।

আকবর আলি আদিল শা-ও ঐতিহাসিক চরিত্র। তার চরিত্র সম্পর্কে বিশেষ কিছু ইতিহাসে নেই। তাকে আমি আমার কল্পনায় গড়ে নিয়েছি। গড়ে নিয়েছি—ইতিহাসে তার ভূমিকা অনুযায়ী।

গন্নার চরিত্র গঠনে আমার কল্পনায় আশ্রয় নিয়েছি গন্না বেগমেরই ওই গজলটির। বারোয় অধ্যায়ে গজলটি দফায় দফায় দুছত্র করে দিয়ে সম্পূর্ণ করেছি। যে সব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তার মধ্যে মূল হল—আচার্য যদুনাথের Fall of the Mughal Empire—VIII vol. 1. এবং vol. 2., অনুসন্ধিৎসু পাঠক প্রশ্নের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ থেকেই সমস্ত সন্দেহের নিরসন করতে পারবেন। এ ছাড়া গান্ধা সিংয়ের Ahmad Shah Abdali, Indantiq. 1907, Sir William Jones' Works vol. 1 থেকে অন্যান্য উপকরণ সংগৃহীত।

ইতি—

এক

১১৭৫ হিজরী—ইংরেজদের ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ এখন থেকে দুশো বছরেরও আগে। আগ্রা শহর তখন তামাম দুনিয়ায় অন্যতম সেরা শ্রেষ্ঠ শহর।

শাহজাহান বাদশাহ দিল্লীতে লাল-কিল্লা বানিয়ে তার ভিতর যে দেওয়ানী খাস তৈয়ার করিয়েছিলেন বিশেষ দরবারের জন্য—যার চাঁদোয়া ছিল রূপোর—যার মার্বেল পাথরের থামের গায়ে বানানো নকশার মধ্যে হীরা মোতি পান্না নীলার বাহার ছিল, সেখানে তিনি খোদাই করে লিখে দিয়েছিলেন ফারসী বয়েৎ—

"অগর্ ফীরদুস্ বার্ রু-ই জমীনস্ত
হামেনস্ত—উ হামেনস্ত—উ হামেনস্ত।"

যার অর্থ হল—এই মাটির দুনিয়ায় যদি স্বর্গ কোথাও থাকে তবে এইখানে—তা এইখানে—তা এইখানে। দিল্লীতে রাজধানী নিয়ে যাবার জন্যে নতুন শাহ্‌জাহানাবাদ শহর তৈরি করে বাদশা তাকে ভূস্বর্গ বানাতে কসুর কিছু করেন নি। লাল-কিল্লা, জামা মসজেদ, দিল্লী লাহোর কাশ্মীর আজমীঢ় ফটক, চাঁদনী চৌক, চাঁদনী চৌকের রাস্তার মাঝবরাবর যমুনার জল বইয়ে দিয়ে নহর—অনেক বানিয়েছিলেন; হয়তো অসুস্থ পঙ্গু হয়ে ছেলে ঔরংজীবের হাতে বন্দী না হলে সত্যই ওই বয়েৎকে তিনি সত্য করে তুলতে পারতেন। কিন্তু তিনি নসীবের হাতে মার খেয়ে ছেলের বন্দী হয়ে থাকলেন—হেরে গেলেন; তাঁর সেই হারের সঙ্গে দিল্লীর শাহ্‌জাহানাবাদ আকবরাবাদ আগ্রার কাছে হেরে রইল।

আকবর শাহ যে আগ্রা কিল্লা বানিয়েছিলেন তা লাল-কিল্লার তুলনায় ছিল মর্দানা কিল্লা। লাল-কিল্লা দেখে যারা বলত—বাঃ বাহা বাহা! তারাই আগ্রা কিল্লা দেখে বলত—আয় বাপরে বাপ!

যেন মর্দানা আর ঔরৎ। বলতে পার বাঘ আর বাঘিনী।

তাছাড়া জাহাঁপনা শাহ্‌জাহান নিজে শাহীবেগম হজরত মমতাজ বেগমের মৃত্যুর পর যে তাজমহল বানিয়েছিলেন তার কাছে দিল্লীর সব যেন ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

আগ্রার চাঁদনী চৌকের জলুস দিল্লীর চাঁদনী থেকে কম ছিল না। ১১৭৫ হিজরী নাগাদ আগ্রা আরও জমে উঠেছিল। বহু বড় বড় আমীর-ওমরাহ ধনী শেঠ দিল্লী থেকে সরে এসে আগ্রায় আস্তানা গেড়েছিলেন। এটার শুরু তের বছর আগে—বাদশাহ মহম্মদ শাহের আমলে ইরানের বাদশাহ, মানুষের মধ্যে রুস্তম, রাজা-বাদশাহদের মধ্যে শের, বলতে গেলে দুনিয়ায় মানুষের কাছে বিভীষিকা, শাহ নাদিরের অভিযানের পর থেকেই। সে বিভীষিকা আজও ভুলতে পারে নি মানুষ! বাপরে! যার ধমক খেয়ে নবাব সাদত আলি খাঁর মত এত বড় একটা আদমী—ঔধিয়ার নবাব—সে বিষ খেয়ে মরেছিল!

ওই শাহ নাদিরই দিল্লীর স্বর্গগৌরব লুঠে নিয়ে গেছেন—তক্তেতাউস ময়ূর সিংহাসন এবং বাদশাহী তাজের কহিনূর হীরা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে।

তারপর নাদির আর আসেন নি। তাঁর ইন্তেকালও হয়েছে। কিন্তু মানুষের ডর ঘোচে নি। ঘুচবে কি করে?

শুকদেব আচার্য বলে—দিল্লীর ইমারত, বাদশাহী, বিলকুল 'পড়ম্ পড়ম্' বলে চিল্লাচ্ছে। শুকদেব আচার্যের গণনা নির্ভুল। গণনায় জ্যোতিষে তখন হিন্দোস্তানে বিশ্বাস, সে বাদশাহী

দরবার থেকে সামান্য গৃহস্থী পর্যন্ত, কুতুবমিনারের বনিয়াদের চেয়েও শক্ত—তার চেয়েও মাথায় উঁচু হয়ে উঠেছে। দৈবজ্ঞ, ফকীর, সাধুদের প্রতাপ উত্তর ভারতের জাড়া আর গরম কালের চেয়েও প্রবল। বেশী দিন নয়—মহম্মদ শাহ বাদশাহের আমলেই—তখন সৈয়দ ভাইয়েরা খুন হয়েছে—উজীর তখন মহম্মদ আমীর খান। একদিন রাত্রে চবুতরার জাফরীর গায়ে কে এক ঝাণ্ডা গেড়ে দিয়ে গেল, সকালে লোকে উঠে দেখলে তাতে লেখা আছে 'বাদশা তু হুঁশিয়ার হো—মসনদ ছোড়কে হট যা।' লোক জমায়েত হয়ে গেল। চবুতরা থেকে কোতোয়ালীর নাসাকচী গিয়ে খবর দিলে উজীরকে।

উজীর আমীর খান জবরদস্ত লোক—যে করেছে তাকে খুঁজে বের করতে দেরি হল না তাঁর। নাসাকচী ধরে নিয়ে এল এক আজাদ সম্প্রদায়ের ফকীরকে, নাম তার নয়ঞ্জন। কৌপীনপরা ফকীর নাঙ্গা মাথা। সে ফকীর উজীরকে হেসে বললে—হ্যাঁ, ও তো আমি গেড়ে দিয়েছি!

—কেন?

—আমার খুশ্।

উজীর তাকে কোড়া লাগাতে হুকুম দিলেন কিন্তু কেউ সাহস করলে না—উজীর রাগ করে নিজেই লাগালেন কোড়া! কেটে বসে গেল কোড়া—ফকীর কাঁদল না, হাসল। খবর পেয়ে কোকী জিউ বাদশাকে বললে—তুমি জলদি ফকীরকে ডেকে খুশী কর।

কোকী জিউ রহিমন্নেসা বিবি বাদশাহের দুধ বহেন। কোকী জিউর বাবা মহম্মদ জান ছিল সিদ্ধ গণৎকার—কোকী জিউ নিজেও গনতে জানে। বাদশা কোকী জিউ রহিমন্নেসার কথা অগ্রাহ্য করেন নি—লোক পাঠিয়ে নয়ঞ্জন ফকীরকে ডেকে দরবারে এনে চার মোহর দিয়ে খুশী করলেন। ফকীর খুশী হয়ে বলে গেল—হাঁ তু রহ যা শাহনশা। রহ যা। লেকিন উ উজীর—। ঘাড় নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

শুনে উজীর আমীর খাঁ হেসেছিলেন। কিন্তু কোকী জিউ বাদশাকে বলেছিলেন—নতুন কে উজীর হবে ঠিক করে রাখ!

ঠিক তিন দিন পর আমীর খাঁর হল বুখার—পাঁচ দিনের দিন আমীর খাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল।

নয়ঞ্জনকে পাওয়া গেল না দিল্লীতে, কিন্তু কোকী জিউ বললে—আমি জানতাম।

কোকী জিউ রহিমন্নেসার বাবা মহম্মদ জান দিল্লীতে ঘরামির কাজ করত। এক ফকীরের কাছে পেয়েছিল এই গণনার বিদ্যা। মহম্মদ জান মহম্মদ শাহের,—মহম্মদ শাহ তখন বাদশা নয় রৌশন আখতার নামে শাহজাদা, থাকে দেউড়িয়াসালাতিনে, তনখা পায় মাত্র,—কোষ্ঠী গণনা করে বলেছিল বাদশাহের মাকে, "রৌশন আখতার বসবে মসনদে।" সে কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। কোকী জিউ বলেছিল সৈয়দ ভাইদের খুন হবার কথা। তাও ফলেছে। এখন কোকী জিউ রহিমন্নেসা বাদশাহ হারেমে বলতে গেলে মালিক। বাদশাহের মোহর থাকে তার হাতে।

আগ্রার লোকে কিন্তু শুকদেবকে কোকী জিউ-এর চেয়েও বড় গণৎকার মনে করে।

তার গণনা নিয়েও নানান গল্প লোকে সবিস্ময়ে বলে থাকে; তার মধ্যে দুটোর কথা তামাম হিন্দোস্তানের লোকে জানে। শুকদেব আচার্য তখন আগ্রার পথে পাথরের উপর খড়ি দিয়ে ছক এঁকে মাথায় ছেঁড়া পাগড়ি চড়িয়ে কপালে তিলক এঁকে বসে থাকে; বয়সে কাঁচা, বড়জোর আঠারো বিশের বেশী নয়। পথের লোকের হাত দেখে; তারা দু চার ঢেবুয়া

কি দামড়ী দিয়ে চলে যায়। সে দিন আচার্য বসে ছিল ; পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন ডুলিতে চড়ে আগ্রার মস্ত বড় শেঠ ; শেঠজীর কারবার খুব ফলাও কারবার, তিনি এই সব মানতেন টানতেন না। ওই একটি তরুণবয়সী ছোকরাকে গণৎকার সেজে বসে থাকতে দেখে ডুলির কাহারদের ডুলি রাখতে বলেছিলেন, মতলব ওই ভণ্ড ছোকরাকে একটা শিক্ষা দিয়ে যাবেন। নেমে, শুকদেবের সামনে এসে বলেছিলেন—এ ভণ্ডামি করিস কেন রে লৌণ্ডা! খেটে খাস না কেন ?

শুকদেব তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, সে বলেছিল—আপ্‌কা ললাট তো খুব ভাল। লছমীর কৃপা তো আপনার উপর অসীম।

হা হা শব্দে হেসে উঠে শেঠ বলেছিলেন—এ কথা তো তামাম আগ্রা শহরের লোকে জানে। নাম বললে হিন্দুস্থানের লোকেও সে কথা বলবে। আর কিছু বলবার থাকে তো বল্।

শুকদেব বলেছিল—ললাটের রেখা থেকে আর একটা কথা মালুম হচ্ছে কিন্তু হাতের রেখা না দেখে ঠিক বলতে পারব না শেঠ।

—দেখ্ তবে, হাতের রেখা দেখ্। বলে হাতখানা মেলে ধরেছিলেন।

হাতখানা নিবিষ্টদৃষ্টিতে দেখে শেঠের মুখের দিকে তাকিয়ে শুকদেব আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে নির্বাক হয়ে বোধ হয় কিছু ভাবছিল। শেঠ বলেছিলেন—ক্যা রে লৌণ্ডা, দিনের আসমান তো নীল হ্যায়। ওখানে একটা রাতের তারাও নাই। ওখানে কিছু লেখা নেই।

হাতখানা ঠেলে দিয়ে শুকদেব বলেছিল—আমি কিছু বলতে পারব না শেঠ। তুমি যাও। তবে সামনে যেয়ো না, ফিরে বাড়ি যাও!

—বাড়ি যাব ? ভাগ্ বদমাশ মুরুখ্ কাঁহাকা! যদি জানতিস কোথায় যাচ্ছি—

—সো হামি জানে শেঠ।

—জানিস তো বাতিয়ে দে।

—সে শুনতে হবে না তোমাকে। তুমি বাড়ি যাও।

ছোকরার গালে একটা চড় মেরে শেঠ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—ভাগ্ হিঁয়াসে। যদি তোকে এখানে কি কোথাও এই মিথ্যে ভণ্ডামি করতে দেখি তবে কোতোয়ালকে বলে তোকে ফাটকে ভেজোয়ায় দেব।

লোক জমে গিয়েছিল। তারা শুকদেবের এই নির্যাতন দেখে হো হো করে হেসে উঠেছিল। শুকদেব আর আত্মসংবরণ করতে পারে নি। সে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল—শুনে যাও শেঠ তুমি কোথায় যাচ্ছ!

শেঠ তখন ফের ডুলিতে উঠেছেন—ডুলি তুলছে বেহারারা। শেঠ ডুলি থেকেই বলেছিলেন—বল্—এখান থেকেই শুনব আমি।

শুকদেব বলেছিল—তুমি মরনেকো লিয়ে যাতে হো। এই থোড়া দূর—একরশ্মি সামনে উ খাড়া হ্যায়।

হা হা করে হেসে উঠে বলেছিলেন—আরে বেতরিবৎ ফাজিল, আসবার সময় এর জবাব আমি দিয়ে যাব। আমি যাচ্ছি আগ্রা কিল্লার নবাবের কাছ থেকে খেতাব আর খেলাৎ আনতে। ফিরবার সময় চাবুক দিয়ে তোর পিঠের চামড়া উখাড় দুংগা। আব চলো, এই কাহারলোগ।

হাঁক তুলে কাহারেরা এগিয়ে চলেছিল। রশিখানেকের তিন ভাগ যেতে যেতে সামনে থেকে কোথায় উঠেছিল একটা হৈ হৈ শব্দ। শেঠের সঙ্গে সওয়ার ছিল ক'জন—তারা তলোয়ার

খুলে সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। সেটা সড়কের একটা বাঁকের ওপারে। সওয়ারেরা কদম কয়েক গিয়েই রাশ টেনে ঘোড়াকে থামিয়ে শিউরে উঠেছিল। ওদিক থেকে ছুটে আসছে মদমত্ত একটা পাগলা হাতী। শুঁড় দিয়ে দু'পাশের দোকানপাট ভেঙে দিয়ে ছুটে আসছে। পালা পালা—ভাগো—হট যাও—হুঁশিয়ার—রব উঠছে, রবটা এগিয়ে আসছে। রাজপথের লোক ভয়ার্ত হয়ে এদিকে ছুটে আসছে। এদিকে ক্রমে ক্রমে পিছন দিকে দোকান বন্ধ হয়ে চলেছে।

সওয়ারেরা ঘোড়া ফিরিয়ে ডুলির কাছে এসে বলেছিল—হাতী! হাতী বিগড় গিয়ে ক্ষেপে ছুটে আসছে, ঘুমাও ডুলি—জলদি ঘুমাও!

আর জলদি! ততক্ষণে হাতীটাই বাঁকের মাথায় দেখা দিয়েছে। কাহারেরা হাতীটাকে দেখেই ডুলিটা কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে ছুটে পালাল। সওয়ারদের চেষ্টা সত্ত্বেও ঘোড়া থামল না—তারাও সওয়ারদের পিঠে নিয়েই ছুটল। লোকজনেরা ছুটল নিজেদের পায়ের উপর ভরসা রেখে। পালাতে অবসর পেলেন না শুধু শেঠ। তিনি ছিলেন ডুলিতে। ডুলি থেকে উঁকি মেরে হাতীটাকে দেখেই তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। জন্তুর মত আর্তনাদ। আর হাতীটা ছুটে এসে শুঁড় দিয়ে ওই ডুলিটাকে ধরে তার উপর তার সামনের পা তুলে দিয়ে মড়মড় শব্দে ভেঙে দিলে। তারপর পেলে সে শেঠকে। তাঁকে শুঁড়ে ধরে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলেও হাতীটার তৃপ্তি হল না। পা দিয়ে দলে পিষে আগ্রার পাথরে বাঁধানো সড়কটা রক্তাক্ত করে সামনে ছুটতে লাগল।

তখনও শুকদেবের চারিদিকে পরিহাসপ্রমত্ত দর্শকের দল জমে রয়েছে—তারা তখনও তাকে নানান পরিহাস করছে। শুকদেব নিজে পাঁজিপুঁথি নিয়ে উঠে পাশের একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। লোকে হাততালি দিয়ে হল্লা তুললে—আব ভাগ্‌তা হায়, ভাগ্‌তা হায়। তাদের মুখের কথা প্রায় মুখে থাকল, পিছন থেকে ভাগ যাও ভাগ যাও শব্দ উঠল। তারা চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে হাতী!

হাতীটা চলে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার লোক জমল সেখানে। তখনও দর্শকদের ক'জন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং আড়ম্বর করে হাত দেখার গল্প করছে। আর বলছে—আয় বাপরে বাপ! (সাখ্‌সাত) সাক্ষাৎ দেওতা হায় উ! আয় বাপরে!

এরপর শুকদেবের নাম একদিনে রটে গিয়েছিল আগ্রা শহরে।

আর একটা ঘটনা ঘটেছিল এর কিছুদিন পরই।

আগ্রার বেগম সুরাইয়া বাঈয়ের তখন খুব নাম। এমন গজল-গাইয়ে বাঈ আগ্রায় কেউ ছিল না। সুরাইয়া বাঈয়ের বয়স তখন পঁচিশের কাছে। বাঈসাহেবের গানের খ্যাতি যেমন আছে তেমনি আছে তার আর এক খ্যাতি—বাঈ নিজে গজল রচনা করে। তার সঙ্গে আর একটা সুনাম দুর্নাম যাই হোক আছে যে—বাঈ 'পাথলে'র চেয়েও শক্ত। কেউ তাকে কটাক্ষ করলে উত্তরে সে যে কটাক্ষ করে তা বাঁকা এবং বিষাক্ত। মহব্বতি নিয়ে দিলের দুখ নিয়ে সে গজল তৈরি ক'রে যে সব কথা বলে, সেগুলো বিলকুল ঝুট্‌ বাত।

লোকে বলে দরিয়ার পানির উপর হাওয়ায় যে ঝিলিমিলি ওঠে—দিনের আলোয় যে ঝিকিমিকি ওঠে ঠিক তাই। কেন না ওই ঝিলিমিলি ঝিকিমিকি বিলকুল ঝুট্‌। আসলে দরিয়ার পানির কোন রঙও নাই কোনও তরঙ্গও নাই। রাত্রে তাকাও দরিয়ার পানির দিকে—কি দেখবে—একদম কালা। আর হাওয়া যখন থাকে না তখন দেখো—দেখবে দরিয়ার পানি স্রিফ একখানা চাদর।

এই সুরাইয়া বাঈয়ের ডাক পড়েছে দিল্লীতে। সেখানে ঔধিয়ার নবাব মালেক-এ-মুল্ক

আমীর-উল-উমরা নবাব সাদত আলি খাঁ এক জলসা করবেন; সেখানে দিল্লীর রোশনি হিন্দোস্তানের বুলবুল কোয়েলা নূর বাঈ গাইবে। স্বয়ং বাদশাহ্ দিন দুনিয়ার মালেক মহম্মদ শা আসবেন—তাঁর সঙ্গে গোটা দিল্লী শহরের রইস আমীর উজীর বক্সী বড় বড় বাদশাহী কর্মচারীরা থাকবে। নবাব সাদত আলি সুরাইয়াকে নিয়ে যাচ্ছেন তার কারণ আসলে সে লক্ষ্ণৌ শহরের বেটী। সুরাইয়া বাঈ ডুলিতে চড়ে অতি সাধারণ বেশে বোরকা ঢাকা দিয়ে সন্ধ্যায় এসে উঠেছিল শুকদেবের বাড়িতে। হাত দেখাবে। সে জানতে চায় দিল্লীর আসরে তার মান ইজ্জৎ বজায় থাকবে, না, নূর বাঈয়ের কাছে হেরে মুখ কালো করে ফিরে আসবে।

সুরাইয়া বোরকার ঢাকা খোলে নি, পরিচয়ও দেয় নি, বলেছিল—শুনেছি পণ্ডিতজীর নজর নাকি দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত দেখতে পায়। আমি কেবল একটি কথা জানতে এসেছি। স্রিফ এক বাত।

—ফরমাইয়ে।

—আসছে তিন মাহিনার মধ্যে আমার কি কোন রকম বেইজ্জতির ভয় আছে?

প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল শুকদেব। সে প্রশ্নটিকে প্রশ্নের ভঙ্গিতেই পুনরাবৃত্তি করেছিল—বেইজ্জতি?

—হাঁ, আমার একটা ইজ্জৎ আছে খাতের আছে, নাম আছে। সেই খাতের কি বেখাতের হবে? বদনামি হবে?

—দেখি আপনার হাত।

হাতখানি প্রসারিত করে ধরেছিল সুরাইয়া।

—আঁ! একটি বিস্ময়সূচক শব্দ করে শুকদেব প্রদীপটি বাঁ হাতে নিয়ে হাতের কাছে এনে দেখে বলেছিল—ই তো আচ্ছা হাত! মুঝে মালুম হোতা—

থেমে গিয়েছিল শুকদেব। সুরাইয়া বলেছিল—বাতাইয়ে—!

—বলব?

—হাঁ বলুন।

—কসুর মাফি হয় বেগমসাহেবা। আমার তো মনে হচ্ছে আপনি এমন কিছু করেন—এমন কিছু আপনার ভিতর আছে যাতে আমাদের যাকে বলে সরস্বতী তার পূজা হয় তা দিয়ে।

—হাঁ তা করি। আমি পেশায় বাঈজী।

—তা ছাড়াও, উসসে জেয়াদা গুণ আপনার আছে। কসুর মাফ হয়—আপনি কি সুরাইয়া বাঈ? যিনি শুধু গানেই পারঙ্গম নন—যিনি গজল বানান নিজে! "ঔরতের যে দিল সে হল গুল্-এ-কমলের (পদ্মের) মত—সে নিজেকে মেলে ধরে যাকে ডাকে সে হল আসমানের সূর্য—হায়রে ঔরতের নসীব—সূর্যের জন্যে মেলে ধরা দলের উপর এসে বসে যত মধুলোভী ভ্রমর আর মক্ষি (মক্ষি)। সূর্য অস্ত যায়, পদ্মের মেলে ধরা পাপড়িগুলি খসে পড়ে একটির পর একটি করে জলের উপর।"

বলেই বলে উঠল শুকদেব—বাহা বাহা বাহা! আপনার হাতের রেখায় যে এ আক্ষেপের জবাব লেখা রয়েছে বাঈসাহেবা!

—তার মানে?

এবার বোরকার মুখের ঢাকাটা তুলে ফেলেছিল সুরাইয়া।

শুকদেব বলেছিল—বলছি, একবার কপালটা একটু কোঁচকান তো—দেখি কপালের রেখা!

কুঁচকেছিল কপাল সুরাইয়া বেগম।

—হাঁ। ঠিক আছে। হাত কপাল এক কথা বলছে।

—কি বলছে?

—বলছে—! একটু হেসে শুকদেব বলেছিল—বলছে এত আপসোস এত দুখ্ তুমি করো না সুরাইয়া। মেয়েদের ভাগ্যের সঙ্গে গুল্-এ-কমলের ভাগ্যের মিল আছে বটে কিন্তু তবুও দিন দুনিয়া আর জিন্দগীর যিনি মালিক তাঁর দয়ায় কিছু কিছু মেয়েদের জীবনে সূর্যের মত মানুষ এসে যায়, তার দলমেলা দলের উপর পড়া টলটলে চোখের জলের ফোঁটার মধ্যে দিয়ে সুরয ধরা দেয়।

একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল সুরাইয়া তার দিকে।

—তা হলে কি বাদশা আমাকে দিল্লীতে আটকে দেবে? নূর বাঈয়ের মত—

—নেহি নেহি নেহি! বাঈসাহেবা তোমার জিন্দগী বিলকুল বদলে যাবে। তোমার জিন্দগীর লহর আজ যে মুখে ছুটেছে সে লহর একেবারে পাল্টে যাবে। উল্টো মুখে চলবে। আর সারা জিন্দগীতে যে সুখ যে আনন্দ তোমার মেলে নি তা মিলবে। তোমার খুব ভাল সময়, বাঈসাহেবা, এই তিনি মাহিনার মধ্যে এসে যাবে।

—আরও সাফা সিধা করে বল পণ্ডিত।

—তোমাকে সাদী করতে হবে।

—সাদী?

—হাঁ। এমন সুখের সাদী আর হয় না!

সুরাইয়া একটি মোহর দিয়ে উঠে চলে গিয়েছিল। বলে গিয়েছিল—পণ্ডিত, তোমার কথা আমার বিশ্বাস হল না। কেঁও কি—

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—লোকে আমাকে কি বলে জান? বলে 'পাথল'। বলে উত্তরের জন্য আর দাঁড়ায় নি, চলে গিয়েছিল।

এই কথাটাও আশ্চর্যভাবে সত্য হয়েছিল। ওই জলসাতে দেখা হয়েছিল একটি আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে। বসরাই গোলাপফুলের মত রঙ, টানা চোখ পাতলা ঠোঁট লম্বা নাক পাতলা দীর্ঘ দেহ, দেখলেই বোঝা যায় এ মানুষ হিন্দোস্তানের নয়। বাদশাহের উপস্থিতিতে যে-আসর সে আসরে নূর বাঈ নাচে গানে আসর মাত করেছিল। কাশ্মীরী মেয়ে নূর বাঈ তরুণী আর তেমনি রূপসী, তার উপর তার কণ্ঠ বাঁশীকে হার মানায়। সুরাইয়ার বয়স তার থেকে বেশী, রূপের জলুস কম, কণ্ঠস্বর এত মধুর এবং উচ্চও নয়। নাচেও তার গতি কিছু মন্থর। তবুও তার মান বেঁচেছিল তার নিজের রচনা করা গজল গেয়ে এবং বৈঠকী আসরে ঠুংরি গেয়ে। লক্ষ্ণৌ ঘরানার ঠুংরি গেয়ে সে অনেক বাহবা এবং ইনাম কুড়িয়েছিল। দিল্লীর বড় খেয়ালের ওস্তাদ মৌলাব খাঁ পর্যন্ত বহুৎ তারিফ করে কেরামৎ জানিয়েছিল তাকে।

আসরের শেষে সাদত খান নবাব তাকে বিস্তর প্রশংসা করে বলেছিলেন—বহুত-খুব। তুমি আমার লক্ষ্ণৌ শহরের ইজ্জৎ রেখেছ। বলে পানবরদারকে নিজের বাটা থেকে পান দিতে বলেছিলেন—দাও, পান দাও বাঈকে। আর দিয়েছিলেন একছড়া মুক্তার মালা।

কুর্নিশ করে মালা নিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার পর নবাব সাহেব অকস্মাৎ হেসে উঠেছিলেন।

ফিরে তাকিয়েছিল সুরাইয়া।

নবাব সাদত খাঁ বলেছিলেন—সুরাইয়া বাঈ, ইনি হলেন আমীর খান-ই-জমান আলি কুইলি

খান জাফরজঙ্গ। খাস ইরান মুলুকের বড়া ভারী ইজ্জতের আমীরজাদা। এঁর বাবা ছিলেন মহম্মদ আলি খান ইরানের শাহের দোস্ত। ইরানের নসীবে আগুন লাগল—সেখানে বসেছে নাদির শাহ। আলি কুইলি খাঁর চাচার মেয়ে খাদিজা সুলতান ছিল আলি কুইলির পিয়ারী, সেই বচপন থেকে দুজনের জানপছান খেলাধুলো একসঙ্গে। যখন ইরানের লোকে আঁধিয়ারার পনের দিনে আসমানে চাঁদ দেখতে পেত না—আঁধেরা হত দুনিয়া—তখন আলি কুইলি দেখত চাঁদ তো তার চাচার ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাদিজা সুলতানকে নিয়ে আলি কুইলি মাদ্রাসায় পড়তে পড়তে বয়েৎ বানাতো গজল বানোতো। এসে শোনাতো খাদিজা সুলতানকে। খাদিজা সুলতান শরমসে একেবারে পাকা আনারের মত লাল হয়ে উঠতো। একদিন সে বলেছিল—দোহাই তোমার আলি কুইলি, তুমি আমার নাম নিয়ে গজল বয়েৎ বানিয়ো না। আমার বহুৎ শরম লাগে। আলি কুইলি সঙ্গে সঙ্গে বয়েৎ বানিয়ে সেই বয়েৎ বলেছিল তাকে, বলেছিল—"শরমে রাঙা হয়ে তুমি পিয়ারী বলছ আমার নাম নিয়ে তুমি বয়েৎ রচনা করো না। কিন্তু বল তো পিয়ারী যে বয়েতে তোমার নাম নেই সে বয়েতের রঙ কি বাহার কি দাম কি? দুনিয়ার যত রূপ যত রাগ যত গন্ধ যত আনন্দ সব যে জড়িয়ে আছে তোমাকে! চাঁদকে বাদ দিয়ে যে রাত সে রাত আঁধার ··আর তোমাকে বাদ দিয়ে যে বয়েৎ সে সুরহীন সংগীতহীন অর্থহীন কয়েকটা আওয়াজ—ধ্বনিমাত্র!" ফারসীতে আলি কুইলির সায়ের হিসেবে নাম ছিল ওয়ালা সুলতান! তুমি শুনেছ কি না জানি না!

কুর্নিশ করে সুরাইয়া বলেছিল—হাঁ হাঁ জনাব, হিন্দোস্তানে আগ্রা লক্ষ্ণৌতে বসে ইরানের বুলবুল সায়ের ওয়ালা সুলতানের নাম শুনেছি। তার গজল শুধু শুনিই নি, গেয়েছি।

—হাঁ। ইনি সেই ওয়ালা সুলতান আলি কুইলি খান। ইরানের নসীব পোড়ালে নাদির শা—আলি কুইলির শুধু নসীব নয় দিলও পুড়ে ছারখার হয়ে গেল—ঘরও পুড়ে গেল। নাদির শা মসনদে বসেই খাদিজা সুলতানকে জবরদস্তি সাদী করে হারেমে নিয়ে গেল। দেওয়ানা ওয়ালা সুলতান আলি কুইলি ইরান ছেড়ে হিন্দোস্তানে এসেছেন। আমার দামাদ সফদরজঙ্গের দোস্ত। আমি ভালবাসি ছেলের মত। কিন্তু কবি হিসেবে কুইলি খাঁ আমারও দোস্ত। আমারও ইয়ার।

আবার কুর্নিশ করে সুরাইয়া বলেছিল—আমার আজ বহুৎ ভাগ্য জনাব আলি—আজ সুবাতে কার মুখ দেখেছিলাম জানি না। খোদ হিন্দোস্তানের বাদশা আমার গান শুনে খুশী হয়েছেন। আর যদি বলি জনাব—সে আপনার সামনে বলেই সাহস করে বলছি—যে ওয়ালা সুলতান গজল বানানেবালা এতবড় সায়ের আমার মুজরার আসরে হাজির ছিলেন! খুশী হয়েছেন কি না জানি না—

বাধা দিয়ে এবার কুইলি খান বলেছিলেন—হাজারোবার! সুরাইয়া বেগম, তোমার কণ্ঠস্বরকে হাজারো কেরামৎ, তোমার খেয়ালের তানগুলিকে হাজারো কেরামৎ, তোমার গজলকে আমার লাখো কেরামৎ রইল!

বার বার কুর্নিশ করেছিল সুরাইয়া।

নবাব সাদত খান বলেছিলেন—কই কুইলি খাঁ, তুমি তোমার আসল কথাটা ভুলে গেলে নাকি সুরাইয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে? বল—ফরমায়েশ করো। আমরাও শুনি!

বিস্মিত হয়ে সুরাইয়া তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়েছিল প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে। নবাব বলেছিলেন—তোমার গজল শুনে কুইলি খাঁর মনের সেতারের তারে প্রতিধ্বনি জেগেছে বাঈ। জবাব বলতে পার—

—কি নসীব আমার, কি নসীব আমার যে, আমার গজল শুনে ওয়ালা সুলতানের মনে তার জবাব জেগেছে!

কুইলি খাঁ বলেছিলেন—জবাব নয় বাঈ। তুমি গজলে গাইলে কি "দুনিয়াতে মহব্বতি কি—এ প্রশ্ন দুনিয়াকে করলাম, কেউ তার জবাব দিতে পারলে না; শেষে জবাব দিলে এক হরিণী। সে মরছিল মরুভূমিতে। সে বললে—দেখ, মহব্বতি আমার এই তিয়াসের মত যে তিয়াসে ছাতি ফেটে আমি মরছি। তিয়াস সবেমাত্র জেগেছে বুকে, দেখলাম সামনে বালুর বুকের উপর বয়ে যাচ্ছে দরিয়া, কাচের মত জলে দু'কূল ছাপিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আমি ছুটলাম। ওই দরিয়ায় ঝাঁপ দেব—শরীর জ্বলছে ঠাণ্ডা হবে—বুক শুকুচ্ছে ঠাণ্ডা হবে। আমি ছুটলাম সামনে দরিয়ার দিকে, দরিয়া পিছু হটে ছুটল পিছনে। থমকে দাঁড়ালাম। দরিয়া দাঁড়াল। আবার ছুটলাম—আবার দরিয়াও পিছু হটল। অবশেষে মুখ থুবড়ে পড়লাম এই বালুর উপর। আমি মরছি। বুক শুকিয়ে গেছে সুরাইয়া। তবুও এখনও মধ্যে মধ্যে দেখছি ওই তো—ওই তো সামনে সে দরিয়া। মরুভূমির ওই যে ধরতে না-পারা দরিয়া যা—জিন্দগীতে মহব্বতিও তাই।"

সুরাইয়া আবার কুর্নিশ করে বললে—হাজারো লাখো তসলীম জনাব আলি। ওয়ালা সুলতান সায়ের, গজলওয়ালাদের আপনি তো ইরানী বুলবুল, হিন্দোস্তানের আপনি কোয়েল—আপনিই বলুন—মহব্বতি তাই নয় কি?

আলি কুইলি খাঁ ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনীর মাথায় মাথায় ঠেকিয়ে বাকী তিনটি আঙুল মেলে হাতখানি একটু প্রসারিত করে দিয়ে গুনগুন করে গাইলেন—"মরুভূমির বুকের মধ্যে এই মরা হরিণের কঙ্কালের সারি ধরে আমিও চলেছিলাম। ঠিক এই এমনি ভাবেই দরিয়া পিছনে হটছিল। থমকে আমিও দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু মরা হরিণের কঙ্কাল আমাকে বললে—থামলে কেন তিয়াসী রাহী, এখন তো তোমার পিছু হটলেও মৃত্যু। তবু বল তো আরও সামনে হরিণের কঙ্কাল কেন পড়ে? আমি এগিয়ে গেলাম। যেতে যেতে দেখলাম সবুজের হাতছানি। টলতে টলতে গিয়ে পেলাম সত্যই সবুজ ঘাসে ভরা একটি খর্জুরকুঞ্জ, তার মধ্যে টলমল করছে জলের কুণ্ড। আর একটি হরিণী আর হরিণকে দেখলাম তারা পরস্পরের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারা আমাকে বললে—এর নাম মহব্বতির উৎস। লোকে বলে 'বিরান' (ওয়েসিস)। আমি বললাম—কেমন করে এলে এতটা পথ ভেঙে? তারা বললে—বিশ্বাস ফুরুলেই মুখ থুবড়ে পড়তে হয়। বিশ্বাস আমাদের ফুরোয় নি হারায় নি।"

সুরাইয়া কুর্নিশ করতে ভুলে গিয়েছিল এবার। নবাব সাদত খান দিল উজাড় করে ওয়া ওয়া করে কেরামৎ দিয়ে মুখর হয়ে উঠেছিলেন, বলেছিলেন—এর জবাব তো তোমাকে দিতে হয় সুরাইয়া বাঈ—লক্ষ্ণৌ এর তুমি রোশনি—থাক আগ্রায়—কাছেই হিন্দুদের বৃন্দাবন, যে যমুনার পানি আগ্রার কোল ধুয়ে যায় তা বৃন্দাবনের বন ধুয়ে আসে। আগ্রা শহরে যমুনার ধারে বাদশা শাহজাহানের গড়া তাজমহল। উত্তর তো দিতে হবে।

সুরাইয়া এতক্ষণে বলেছিল—জনাব আলি, এর জবাব দেওয়ার সাধ্য আমার নাই। উনি মেহেরবান—

—না সুরাইয়া বাঈ, দুনিয়াতে মেহেরবান একজন—বলে কুইলি খান ডান হাতখানি উপরের দিকে তুলে ধরেছিলেন।

সুরাইয়া বলেছিল—বেশক। মেহেরবান একমাত্র খোদা। কিন্তু তিনি তাঁর মেহেরবানি দুনিয়ার সকল লোককে নিজে দেন না। দেন তিনি যাঁদের মেহেরবানি করেন তাঁদের হাত

দিয়ে। আপনি তাঁদের একজন। তাই তো আপনি শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছেন মরুভূমির মধ্যে ওই 'বিরানে'। আর আমি পথের মাঝখানেই যে হরিণীটা মরল তার কথা শুনে তাকে সামনে রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি—না পারছি পিছনে হাঁটতে না পারছি এগিয়ে চলতে।

ওয়াঃ! ওয়াঃ! করে উঠেছিল সাদত খান!

এমন সময়ে বেজে উঠেছিল লাল-কিল্লার নাকাড়াখানায় ভোরের নহবতে ভৈরবী। নবাব সাহেব বলে উঠলেন—ইনশান আল্লা। তামাম রাত গুজর গেল।

এরপর বেশীদিন যায় নি—একদিন আগ্রাতে সুরাইয়া বাঈয়ের বাড়ির দরজায় এসে লাগল জাফরজঙ্গ খান-ই-জমান আলি কুইলির তাঞ্জাম। নিচে দরওয়াজায় বসে ছিল যে খোজা গোলাম তাকে বললেন আলি কুইলি, বেগমসাহেবাকে তসলীম দাও—এত্তেলা দাও কি ওয়ালা সুলতান নামে এক রাহী এসেছে।

রাহী? অবাক হয়ে গিয়েছিল হাবসী বান্দা। তার মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল। কুইলি বলেছিলেন—আরে নফর কি হল তোর? মুখ হাঁ করে বসে রইলি যে।

ততক্ষণে খবর পেয়ে গিয়েছিল সুরাইয়া। তার বাঁদী ঝরোকার ভিতর দিয়ে খান-ই-জমানকে দেখেই চিনেছিল। খান-ই-জমানের যে চেহারা সে চেহারা একবার দেখলে ভোলা অসম্ভব। সে দিল্লীতে খান-ই-জমানকে সে রাত্রে দেখেছিল। সে গিয়ে বলেছিল—বাঈ! সে এসেছে!

—কে? সুরাইয়া সন্ধ্যার মুখে সাজসজ্জা করে জানালার ঝরোকার ভিতর দিয়ে ভাদ্রের আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। উত্তর ভারতের জলে যাওয়া আকাশে বর্ষার মেঘ উঠেছে। মধ্যে মধ্যে গুরুগুরু ধ্বনি উঠছে। আজ বর্ষা নামবে।

সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠে তার গুন্‌গুনানি জেগেছিল। গজলের বীজটি যেন সদ্য ফেটে অঙ্কুরের মত বের হচ্ছে। বাঁদীর কথা শুনে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেছিল—কৌন? কে এসেছে?

বাঁদী একটু হেসে বলেছিল—সে। দিল্লীর সেই খান-ই-জমান। সেই যে টিকলো নাক টানা চোখ গুলাবের মত রঙ ইরানী আমীর—সেই যে গজলবালা ওয়ালা সুলতান—

চমকে উঠেছিল সুরাইয়া। বুকের ভিতরে যেন আকাশের মেঘের মত নাকাড়া বেজে উঠেছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুতপায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল সিঁড়ির মুখে। সেইখান থেকেই কুর্নিশ করে বলেছিল—আমার নসীব জিন্দাবাদ—আমার নসীব জিন্দাবাদ—আজ বাঁদীর এই গরীবখানার আঁধিয়ার ঘুচিয়ে আসমানের চাঁদ নেমে এসেছে!

আলি কুইলি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে বলেছিলেন—না সুরাইয়া বাঈ, চাঁদের মত আসি নি। এলাম আমি আজকের ওই মেঘের মত। জানো, মেঘ উঠলে যার দিল আছে তার দিলে একটা কি জেগে ওঠে। থমথম করে দিল—কাউকে যেন চায়। ভাবছিলাম—সে কে? হঠাৎ দেখলাম, মেঘ দেখে ময়ূরটা আমার নাচতে লাগল পেখম মেলে। আমার মনে পড়ল তোমাকে। চলে এলাম। ভাবলাম তোমাকে আজ নাচাব ময়ূরটার মত।

সারা রাত্রি গানে বাজনায় নাচে কেটে গিয়েছিল। ওদিকে মধ্যরাত্রি থেকে আকাশে নেমেছিল বাদল। সকালবেলাতেও বৃষ্টিতে ছেদ পড়ে নি। খান-ই-জমানও যাবার নাম করেন নি। সকালবেলা থেকে আসরের বদল হয়ে গিয়েছিল। সেটা আর কসবীদের দেওয়ানখানার মুজরার আসর ছিল না, সেটা বদলে হয়ে উঠেছিল দুই সায়েরের অর্থাৎ কবির ঘরোয়া মুশায়ারার আসর। খানাপিনার মধ্যে যা কথাবার্তা চলছিল—সবই বলছিল বয়েৎ বানিয়ে তারই মধ্য দিয়ে। সেখানে তাঁরা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না—না বাঁদী, না সারেঙ্গীদার, না তবলচী, না পানবরদার—কেউ না। যা কাজ করবার সব সুরাইয়া নিজেই করছিল—

আঙুরের আরক ঢেলে দিচ্ছিল গ্লাসে, রূপার রেকাবিতে সাজানো আঙুর—মোরব্বা পেস্তা বাদাম তুলে ধরেছিল সামনে ; নিজেই পান সেজে দিচ্ছিল। খান-ই-জমানও মধ্যে মধ্যে রেকাবি তুলে ধরছিলেন সুরাইয়ার সামনে।

সেদিন খানাও নিজে রসুই করেছিল সুরাইয়া।

খান-ই-জমান ফিরেছিলেন তার পরদিন। আসবার সময় সুরাইয়া বলেছিল—জনাব আলি, ময়ূরের ডাক উঠছে শুনছেন ? কি বলছে বলুন তো ?

—বল তুমি বল !

হেসে সুরাইয়া বলেছিল—বলছে—আকাশের মেঘ, তুমি এলে আমাকে নাচালে। কিন্তু নেচে তো আমার ক্লান্তি এখনো আসে নি অথচ তুমি চলে যাচ্ছ তোমার আপন পথে। এখন আমার এই নাচ কাকে দেখাব বল ? অথবা কেঁদেই কাটাব বাকী দিনগুলো ?

খান-ই-জমান ফিরে তার দুটি হাত ধরে বললেন—ময়ূরী, মেঘ বলছে—পিয়ারী যে নিয়মে আমি আসি আমি যাই তার তো এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। সে পরওয়ানা তো তাঁর—যার পরওয়ানাতে রাতের পর দিন হয়—দিনের পর রাত। তবে উপায় আছে বইকি পিয়ারী—তোমার তো দুখানা পাখা আছে। এই মাটির মায়া কাটিয়ে মেলে দাও তোমার ডানা—আমি তোমাকে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে যাই আমার গরীবখানায়। দেখ মাটির ঐশ্বর্য কাটিয়ে পার তো এস—আমি মানব কি আমার জিন্দগীর জিন্দাবাদ হয়ে গেল।

সুরাইয়া তার বয়েতে তাঁকে আবার আসবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। জবাবে খান-ই-জমান আলি কুইলি কবিওয়ালা সুলতান তাকে তাঁর ঘরে আসবার নিমন্ত্রণ জানালেন। সুরাইয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

আলি কুইলি বললেন—বল পিয়ারী হাঁ ! বল—কবুল !

সুরাইয়া কেঁদে ফেলেছিল।

তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলি কুইলি প্রশ্ন করেছিলেন—সুরাইয়া···

সুরাইয়া বলেছিল—আমি তোমার বাঁদী !

—তুমি আমার পিয়ারী।

—আমার জিন্দগী আমার নসীব জিন্দাবাদ !

এর কয়েক দিন পরই মোল্লা ডেকে আলি কুইলি সুরাইয়া বাঈকে ধর্ম সাক্ষী করে তাঁর হারেমে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন।

সুরাইয়ার মনে পড়েছিল শুকদেব আচার্যকে। সে সব বলেছিল আলি কুইলি খাঁকে। বলেছিল—আপনি একবার গনিয়ে নিন আপনার নসীব ! সে ঠিক বলে দেবে আমাকে সাদী করে আপনার ভাল হবে না মন্দ হবে ! সুখী হবেন না অসুখী হবেন।

শুকদেব আচার্য আলি কুইলির হাত দেখে বলেছিল—খান-ই-জমান, যা হবার তা হবেই এ সাদী আপনার হতেই হবে। আর এ সাদীতে জিন্দগী ভরে উঠবে সুখে আর শান্তিতে। দুনিয়াতে যারা সব থেকে সুখী তাদের একজন হবেন। তবে—

—বল তবে কি ?

—সম্পদ আর প্রতিষ্ঠা, এর পথ আপনার বন্ধ হবে। সুরাইয়া বাঈসাহেবার হাতেও এই ফল সাদীতে। আপনারও তাই। দুই ভাগ্য যখন একজোট হবে তখন তার জোর অনেক বাড়বে। তবে—

—আর কি তবে—

—আর এক পথ আছে জনাব, যদি সাদী না করেন অথচ দুজনে—

—নেহি! নেহি। বুঝেছি তোমার কথা। কিন্তু আলি কুইলি তা করবে না। সে সুরাইয়াকে সাদীই করবে।

সেই শুকদেব বলে—গোটা দিল্লীই—দিল্লীর সব ইমারতই বলছে পড়ম পড়ম পড়ম। অর্থাৎ পড়ি পড়ি পড়ি, বা পড়ব পড়ব পড়ব! সে কি আজ থেকে—সেই কোন্ পুরানো কাল থেকে। বিশ্বাস না হয় তাকিয়ে দেখ রায় পিথৌরার ভাঙা কিল্লার দিকে, তর্কাবাদের কুতুবমিনার আলাই দরওয়াজার দিকে, এবার ওখান থেকে সরে এস—দেখ হৌজখাস—চলে এস পুরবমুখে—দেখ তোগলকাবাদ, ফিরোজশাহী কোটলা দেখ, শেরশাহী কিল্লা দেখ। কত বলব! এখন লাল কিল্লা, দিল্লী ফটক আজমীড় ফটক তুর্কমান ফটক কাশ্মীর ফটক—এ ফটক ও ফটক—চারিদিক ঘেরা পাথরের পাঁচিল বিলকুল পড়ি পড়ি করছে।

হেসে বলে—এর জন্যে দায় ফরুকশেরেরও নয় সৈয়দ ভাইদেরও নয়, মহম্মদ শাহেরও নয়। এমন কি নাদির শাহকে লোকে গালি দেয়—হিন্দু মুসলমান—কি, সে-ই সব দিয়ে গেল তছনছ করে, তারও নয়। এর দায় হল সেই দৈবজ্ঞদের যারা সেই বহুৎ পুরানা আমলে দিল্লীতে যখন শহর পত্তন হয় তখন বলেছিল—এই দেহলীর ঠিক নিচেই বাসুকী নাগ তার ফণা পেতে দিল্লীকে ধরে আছে।

হ্যাঁ—তাই ছিল। কিন্তু বলে কি দরকার ছিল। আর যদি বললিই তবে লম্বা লোহার শিক মাটিতে পুঁতে বাসুকীর মাথা ফুঁড়ে তার রক্ত-মাখা শিকের আগা দেখিয়ে বাহাদুরি করার কি দরকার ছিল। বাসুকী নাগ খোঁচা খেয়ে মাথাটা সরিয়ে নিলে আর শাপ দিলে কি—এখানে যে শহর গড়বে সে কখনও টেঁকবে না। দেখবে শাহ্‌জাহানাবাদের কি হাল হয়!

এ সব শুকদেবের আজকের কথা নয়—পুরানো কথা। এ কথা বলেছিল সে নাদির শাহের চলে যাবার আগে থেকেই।

শাহ নাদির যখন আটক পার হয়ে লাহোরের দিকে আসেন তখন হিন্দোস্তানে সাধারণ লোকেরা আদৌ চিন্তিত হয় নি। শুধু সাধারণ মানুষই বা কেন আমীর-ওমরাহ্ নবাব এবং খোদ বাদশাহও চিন্তিত হয় নি। আসছে—কিছু লুটপাট করে চলে যাবে—এবং সে লাহোরের ওদিক থেকেই যাবে। বাদশাহ আলমগীরের মৃত্যু হয়েছে মাত্র বত্রিশ বছর আগে; আলমগীর-শাহীর প্রবল প্রতাপ এবং সৈন্যবাহিনীর হিম্মতের কথা সুদূর ইরান ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত। কাবুল কান্দাহার মুঘল বাদশাহীর এলাকার সামিল ছিল। বত্রিশ বছরে ঘরাও ঝগড়ায়, মসনদ নিয়ে কাড়াকাড়ির ঝগড়ায় বাদশাহী শক্তি কিছু দুর্বল হয়েছে; দক্ষিণে মারাঠারা উপদ্রব করছে—হায়দ্রাবাদে নিজাম চিনকিলিচ খাঁ একরকম স্বাধীন—মালব গুজরাট গেছে—তা সত্ত্বেও এখনও বাদশাহী ফৌজে সিপাহীর সংখ্যা এক নাকাড়ায় এক লাখ জুটে যায়; সেখানে নাদির শাহ এসে লাহোর পার হয়ে দিল্লী পৌছুতে পারে এ কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। সকলেই নিশ্চিন্ত ছিল। পঙ্গপাল আসে—কিছু ক্ষেতির ক্ষতি করে চলে যায়। সেই যাওয়ার মত চলে যাবে এই ধারণাই ছিল।

তার ফলে দিল্লীতে কোন চিন্তা ছিল না। বাদশাহী দরবারে নিয়মিত নাচ গান হয়েছে মজলিস হয়েছে—বাদশাহ এবং সারা দিল্লীর লোকে নূর বাঈয়ের রূপ তার নাচ তার গানের কথাই চর্চা করেছে। সন্ধ্যায় ভাঙ আর আরক খেয়েছে, হৈহল্লা করেছে। বাদশাহের

পরামর্শদাত্রী তাঁর ধর্মবহিন কোকী জিউও বলেছেন—কুছ ডর নেহি। লোকেরাও নিশ্চিন্ত। কোনক্রমে ইরানী বাদশাহের কথা উঠলে তারা পালোয়ানের মত জাহুতে চাপড় মেরে বলেছে—আনে দো! একা আমি দশ বিশ ইরানীর শির কেটে এনে জমা করে দেব লাল কেল্লার সামনে।

গোঁফ পাকিয়ে দাড়ি চুমড়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলেছে—ডরো মৎ! কাল শুনবে নাদির শাহ পশ্চিম মুখে নামাজে বসে উঠে বলবে খোদাতায়লার হুকুম কি ইরানের দিকে ফেরো।

বলে হা হা শব্দে হেসেছে।

কিন্তু লাহোর জয় করে নাদির শা এগিয়ে আসতে লাগলেন দিল্লীর দিকে। তখন বাদশা আড়ামোড়া ছেড়ে নাচ মজলিসের আসর ছেড়ে উঠলেন। চারিদিকে লোক গেল—হিন্দোস্তানের বিপদ—ইরানী বাদশা আসছে—তোমরা সকলে এস! বাদশা নিজে যাচ্ছেন লড়াই করতে। দক্ষিণ থেকে নিজাম-উল-মুল্ক আসফ্‌জাহ এলেন, বাজীরাও এলেন না। সাদত আলি খানের কাছেও লোক এল—বাদশাহ ফরমান জারি করেছেন—তোমার ফৌজ নিয়ে তুমি এস।

আলি কুইলি খাঁরও যাবার কথা। সাদত খাঁ তাঁর পৃষ্ঠপোষক। দোস্ত। তার উপর নাদির শাহ তাঁর দুশমন। খাদিজা সুলতানকে তিনি কেড়ে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর যাওয়া হয় নি। যাওয়া বন্ধ হয়েছিল সুরাইয়ার মিনতিতে। সুরাইয়াকে বারণ করেছিল শুকদেব। নাদির শাহের বিরুদ্ধে যেতে দিতে সুরাইয়া চায় নি। নাদির শাহ খাদিজা সুলতানকে কেড়ে নিয়েছে আলি কুইলির কাছ থেকে—তার উপর রাগে আলি কুইলি লড়াইয়ের সময় যদি জ্ঞান হারিয়ে কিছু করে বসে তখন সুরাইয়ার দুনিয়া যে আঁধার হয়ে যাবে। সে সওয়ার পাঠিয়েছিল শুকদেবের কাছে। তখন তারা দিল্লীতে থাকে। আলি কুইলি তখন বাদশাহের মীরতলুক। সওয়ার ফিরে এল শুকদেবের চিঠি নিয়ে চার দিনের দিন।

শুকদেব লিখেছে—মঙ্গল সহায় নাদির শাহের। বাদশাহের উপর শনি রাহু কেতুর দৃষ্টি। দিল্লীর আসমানে বাদশাহের ত্রিপালীর ছায়া পড়েছে। এ লড়াইয়ে বাদশাহের হার নিশ্চিত। নবাব সাদত খাঁর ললাট আরও খারাপ। বেগমসাহেবাকে আমার এই শল্লা কি তিনি যেন খান-ই-জমানকে নিয়ে পূর্ব দিকে সরে আসেন দিল্লী ছেড়ে। মঙ্গলের পূর্ণ বিরূপ দৃষ্টি দিল্লী শহরের উপর; মনে হচ্ছে খুনে লালে লাল হয়ে যাবে দিল্লী। তবে খান-ই-জমানের ভাগ্যে কোন বিপদ নেই এই বলতে পারি। মনে হয় তাঁর যাওয়া হবে না লড়াইয়ে।

তাই হয়েছিল। যাবার সময় বাদশাহ আলি কুইলিকে তলব করলেন না। দিল্লীতে রেখে গেলেন। তখন শীতকাল। পৌষের মাঝামাঝি। খবর এল কর্নালের যুদ্ধে দিল্লীর বাদশাহ ইরানের বাদশাহ নাদির শাহের হাতে বন্দী হয়েছেন—তিনি বন্দী বাদশাহকে নিয়ে দিল্লী রওনা হয়েছেন।

খবর এসে দিল্লীতে পৌছুতে পৌছুতে দিল্লীতে লুঠতরাজ শুরু হয়ে গেল। শেঠেরা পালাতে শুরু করলে। গরীব-গুনা যারা তারাও পালাতে লাগল পূর্ব দিকে, দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ দিকের থেকে পূর্ব দিকেই বেশী। কারণ দক্ষিণে বর্গী সিপাহীরা ধীরে ধীরে আগ বাড়ছে, কত দূর এগুবে তারাই জানে—তবে পালিয়ে যারা তাদের হাতে পড়বে তাদের দুঃখদুর্দশা কম হবে না।

সুরাইয়া পাগলের মত কুইলি খাঁকে বললে—এখান থেকে চল। এখানে থাকা হবে না!

কুইলি খাঁ সুরাইয়ার দিকে তাকালেন। সে হাঁপাচ্ছে। দুরন্ত ভয় পেয়েছে সে। তার ভয় শুধু কুইলি খাঁর জন্য নয়, নিজের জন্যও নয়—তার ভয় আর একজনের জন্য। যে তার গর্ভে।

চুপ করে রইলেন কুইলি খাঁ। তিনিও ভাবছিলেন। দিল্লীর লোক নামে জানে নাদির শাহকে—তিনি তাঁকে চোখে দেখেছেন, তাঁকে প্রত্যক্ষ জানেন। আলি কুইলিকে তিনি চেনেন। আলি কুইলি খাঁর লেখা তাঁর 'মসনভি' ইরানে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছেন নাদির শাহ। তিনি শুনেছেন তার মধ্যে খাদিজা সুলতানের নাম আছে। যার কাছে হাতে লেখা 'মসনভি' পেয়েছেন তাঁর সাজা হয়েছে। যে তাঁর গজল গেয়েছে তার গর্দান গেছে। সুতরাং তাঁকে সামনে পেলে নাদির শা—।

চমকে উঠেছিলেন আলি কুইলি—মনে মনে দেখতে পাচ্ছিলেন নাদিরের ক্রুদ্ধ মুখ—হাত তাঁর কোমরবন্ধে গোঁজা ছোরার বাঁটে।

আলি কুইলি আর আপত্তি করেন নি—বজরায় মূল্যবান জিনিসগুলি গুটিয়ে তুলে বোঝাই করে সঙ্গে পাহারা নৌকো দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আগ্রা। তিনি নিজে তখন পাঁচহাজারী মনসবদার। তাঁর তাঁবে পাঁচ হাজার হিন্দুস্থানী জাঠ রাজপুত এবং মুসলমান চাঘতাই ফৌজ; তার মধ্যে বেছে আড়াই হাজার সিপাহী নিয়ে আগ্রা চলে এলেন। আগ্রা থেকে তাঁর জায়গীরের অযোধ্যার নবাবের এলাকায় এবং আগ্রার এলাকার সীমান্তে।

সেখানেই শুনলেন নাদির শাহের হাতে বে-ইজ্জতির ভয়ে অযোধ্যার নবাব কুইলি খাঁর পৃষ্ঠপোষক সাদত খাঁ বিষ খেয়ে মরেছেন। হোলির দিন দিল্লীতে চাঁদনি চৌক ফতেপুরী বাজার দরিয়াগঞ্জ জুম্মা মসজেদ মহল্লা পাহাড়গঞ্জে নাদির শাহের হুকুমে ইরানীরা রক্তের দরিয়া বইয়ে দিয়েছে। হিন্দু মুসলমান বাছে নি। বালক বৃদ্ধ বাছে নি—মেয়েদের মধ্যে বৃদ্ধারা প্রৌঢ়ারা রূপহীনারা বালিকারা রেহাই পায় নি। চাঁদনী চৌকের রাস্তার রক্তে আর মাটিতে কাদা হয়ে হাঁটুভরা লাল গর্দা হয়েছে। দরিবা আর কুচা গলির ভিতর কোতল করা মানুষের লাস পড়ে আছে ডাঁই হয়ে। মুসলমান আমীর ওমরাহ ঘরের বেটী বহুরা ইঁদারাতে ঝাঁপ খেয়েছে। হিন্দুরা নিজেদের স্ত্রী কন্যাকে কেটে নিষ্কৃতি দিয়েছে। তবুও দড়িতে বেঁধে হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান জেনানাকে টেনে নিয়ে গেছে জানবারের মত ইরানী কিজিলবাসেরা নাদির শাহের ফৌজী ছাউনিতে। রাত্রিতে দিনে যেখান থেকে যে চীৎকার উঠেছে মেয়েদের তাতে নীল আসমান কালি মেরে গিয়েছে। কিন্তু মানুষের সে দিকে কান দেবার অবকাশ নেই—তারাও চেঁচাচ্ছে তারস্বরে—আল্লা করিম খোদা রহিম মেহেরবান খোদা—বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও! হিন্দুরা চেঁচাচ্ছে—হে গোবিন্দ, হে ভগবান রক্ষা কর! রক্ষা কর—বাঁচাও!

আলি কুইলি ধন্যবাদ দিলেন খোদাকে, ইনাম দিলেন শুকদেবকে আর সুরাইয়ার হাত ধরে সমাদর করে বললেন—তোমাকে তো আমার দেবার কিছুই নেই—কি দেব?

সুরাইয়া কেঁদেছিল শুধু। স্বামী স্ত্রী দুজনেই কবি। মুখে মুখে কবিতা রচনা করে আলাপ করা তাঁদের বিলাস নয়, জীবনের পরম আনন্দ। রসের হোলিখেলা। কিন্তু সেদিন দুই কবির কণ্ঠ থেকেই যেন সকল কবিতা হারিয়ে গিয়েছিল।

তারপর থেকে কুইলি খাঁ আর দিল্লী বড় যান নি। বাস করেছেন নিজের জায়গীরে। অযোধ্যার নতুন নবাব সফদরজঙ্গ তাঁর দোস্ত। তাঁর সঙ্গে দোস্তির জন্যই সাদত খাঁ পৃষ্ঠ পোষকতা করেছেন। তা ছাড়াও আর একটা বন্ধন আছে। সেটা ধর্ম্মমতের বন্ধন। অযোধ্যার নবাববংশও সিয়া, কুইলি খাঁও সিয়া। দিল্লীতে নাদির শাহের চলে যাওয়ার পর থেকে সুন্নীদের সঙ্গে সিয়াদের ঝগড়া প্রবল হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে চলেছে বাদশাহী নিয়ে উজীরের খেলা।

আর উজীরী নিয়ে ওমরাহদের খেলা।

নবাব সফদরজঙ্গ কিছুদিন সে খেলায় মেতেছিলেন। তাঁর টানে মধ্যে মধ্যে দিল্লী যেতে হয়েছে আলি কুইলি খাঁকে। কিন্তু সুরাইয়া যায় নি। সে নিজের জায়গীরে বসে থেকেছে তার কোলের চাঁদকে নিয়ে।

চাঁদ তার মেয়ে। সোনার পুতুলের মত মেয়ে। নাম 'গন্না'—গন্না বেগম। রূপ তার বাপের মত, কণ্ঠস্বর তার মায়ের মত, তার অঙ্গের ছন্দ, গানের জ্ঞান জন্মগত, মায়ের কাছ থেকে এ সম্পদ নিয়ে জন্মেছে।

১১৭৫ হিজরীতে গন্না বেগম ষোলকলায় পরিপূর্ণ যুবতী। বয়স তার ষোল বছর। আগ্রার বাড়ীতে সুরাইয়া বেগম শুকদেবকে ডেকেছে গন্নার বিবাহের গণনার জন্য। শুকদেব এসেই বললে—বেগমসাহেবা, সাদী তুমি কাকে দেবে উ বাত পরের বাত। প্রথম কথা হল—দিল্লী পাঞ্জাবে না। না। দিল্লীর আওয়াজ আমি কানে শুনছি—পড়ম পড়ম পড়ম। আওয়াজ আরও জোর হয়েছে। বহুৎ জোরদার।

দুই

ষোড়শী গন্নার রূপ এবং গুণের খ্যাতি লক্ষ্ণৌ আগ্রা দিল্লীর সম্ভ্রান্ত মহলে ছড়িয়ে পড়েছে কেয়া ফুলের গন্ধের মত। রূপের থেকে গুণের খ্যাতি বেশী। কবিত্বগুণের খ্যাতি শুধু সম্ভ্রান্ত মহলেই নয় হিন্দোস্তানের রসিক এবং সমঝদার পণ্ডিত এমন কি স্বপ্নবিলাসী তরুণ মহলেও মুখে মুখে ফেরে। শরবতের দোকানে পানওয়ালার দোকানে শরবত আর পান খেতে খেতে অকস্মাৎ কেউ আবেগভরে গেয়ে ওঠে বা আবৃত্তি করে ওঠে—"গুলাবের কুঁড়ি কাঁদে। তোমরা শুনেছ কেউ সে কান্না? সে কাঁদে আর বলে—দুনিয়ার মালেক আমাকে ফুটবার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন! আমি ফুটব আর তিনি দেখবেন। তাঁর নজরের স্নেহ সূরযের রোশনির মধ্যে দিয়ে নেমে আসবে আমার সর্বাঙ্গে। আমি মধুতে গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠব। কিন্তু হায় আমার নসীব —আমি ফুটতে না ফুটতে বিলাসী আমাকে ছিঁড়ে তুলে ধরলে তার নাকের কাছে। তারপর ফেলে দিলে অবহেলায় মাটিতে। আমি মিশে গেলাম মাটিতে। দোহাই তোমাদের আমাকে ফুটতে দাও। গুলাব কাঁদে আর বলে—আমাকে ফুটতে দাও গো ফুটতে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে আর কেউ আবৃত্তি করে ওঠে—"বুলবুলি শিস দিয়ে মেতে উঠেছে। সে বলছে —গুলমোর ফুটে বাগিচা লালে লাল হয়ে উঠেছে; আকাশের সূরযের রোশনি প্রখর হয়ে খুঁজছে গুল-এ-কলম কোথায় ফুটল। বুলবুল তুমি কোথায়? হায় বুলবুলি তুই জানিস নে তোর শিসের গানা শুনে বুলবুল আসার আগেই শিকারী জাল নিয়ে আসছে চুপি-চুপি। তুই উড়ে যা—গানা বন্ধ কর নইলে হলি তুই বন্দিনী হলি।"

এ সব গজল প্রথমে আগ্রা সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ সেখান থেকে দিল্লী পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। ষোল বছরেই গন্না গজল রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছে।

এ গজল ছড়িয়ে পড়ার মূলে আছে সুরাইয়া বেগমের উদ্যম আর কৌশল। গন্নার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুরাইয়া বেগমের চিন্তা এবং কল্পনার শেষ নেই।

নাদির শাহের চলে যাবার পরই হয়েছিল গন্নার জন্ম। তখন সেই সদ্যবিগত বিভীষিকার স্মৃতি মনে রেখে সুরাইয়া বেগম চেয়েছিল ছোট একটি শান্ত সুখের সংসার। স্বামী কন্যা এবং

সে নিজে।

স্বামী কুইলি খাঁকে সে দিল্লী এমন কি লক্ষ্ণৌ যেতেও বাধা দিত। বলত—কি হবে দৌলতে? কি হবে সুবা কি জায়গীরে? সুবাদার জায়গীরদার কি ওয়ালা সুলতান থেকে বড়? না খান-ই-জমান জাফরজঙ্গ আলি কুইলি খাঁ পাঁচহাজারী ওয়ালা সুলতান থেকে সুখী?

কুইলি খাঁ বলতেন—ঠিক বলেছ ঠিক বলেছ!

কয়েকটা বছর বেশ শান্ত পরিবেশের মধ্যেই কেটেছিল। কুইলি খাঁ গন্নাকে কোলের উপর তুলে বুকে চেপে ধরে বলতেন—

হামেনস্ত—উ হামেনস্ত—উ হামেনস্ত!

ছোট গন্না অকারণে হাসত, সুরাইয়া বলত—ওই দেখ খোদার মেহেরবানি ওর ওই ঠোঁটের হাসিতে ঝরে পড়ছে।

কিন্তু এই শান্ত পরিবেশ সেই আমলে বুঝি খোদারই অভিপ্রেত ছিল না। লক্ষ্ণৌ থেকে নবাব সফদরজঙ্গ ডেকে পাঠালেন কুইলি খাঁকে।

* * * *

নাদির শাহের অপমানের ভয়ে নবাব সাদত খাঁ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। দেশে অপবাদও রটেছিল যে সাদত খাঁই নাদির শাহকে কর্নাল থেকে ডেকে এনেছিলেন দিল্লীতে। সাদত খাঁর পুত্র ছিল না, ছিল ভাইপো মির্জা মুকিম খাঁ এবং তিনিই ছিলেন ওর জামাই। বুদ্ধিমান সাহসী দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। আবার বিলাসী মুক্তহস্ত পুরুষ; কাব্যে সংগীতে অনুরাগী। এই অনুরাগেই আলি কুইলির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল, তার উপর ছিলেন দুজনেই সিয়া।

সাদত খাঁর মৃত্যুর পর অযোধ্যার সুবেদারী মসনদে মির্জা মুকিম বসে হলেন আবুল মনসুর সফদরজঙ্গ। কিছুদিন মুহ্যমান হয়ে ছিলেন তিনি, তারপরই ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন। লক্ষ্ণৌতে কর্মতৎপরতায় মেতে উঠলেন। ডেকে পাঠালেন আলি কুইলিকে।

আলি কুইলি লক্ষ্ণৌতে এসেই কর্মতৎপরতা এবং উদ্যম দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। ফৌজের ছাউনি সিপাহীতে ভরে গেছে। তার মধ্যে দেখলেন মস্ত এক কিজিলবাস সিপাহীর দল।

সফদরজঙ্গকে বললেন— এদের কোথায় পেলেন? এরা তো নাদিরশাহী ফৌজী সিপাহী?

সফদরজঙ্গ বললেন—হ্যাঁ। ঠিক চিনেছ দোস্ত। এরা নাদিরশাহী ফৌজের সিপাহীই বটে। এরা নাদির শাহের সঙ্গে এখানে এসে হিন্দোস্তানের 'রোটিগোস্' আর সোনা রূপা জহরতের ছড়াছড়ি দেখে আর ইরানে ফিরে যায় নি। এখানেই থেকে গেছে। আমি এদের এনেছি এখানে। এমন জবরদস্ত সিপাহী ইরান তুরান আফগানিস্তান হিন্দোস্তান কোথাও নাই।

—বেশক। তা ছাড়া ওদের দেশের মায়াও নাই। ওরা আসলে তুরানী—রুজি রোজগারের জন্যে এসেছিল ইরানে। হিন্দোস্তানে এসে ওরা ইরানী তুরানী যারা আসবে তাদের সঙ্গেই লড়বে হিন্দোস্তানীর মত। কিন্তু—

—বল, চুপ করলে কেন?

—এত জমজমা লাগিয়েছেন—

—সেই বলবার জন্যেই তোমাকে ডেকেছি দোস্ত। তুমি ও সুরাইয়া কবুতর কবুতরীর মত তোমাদের ছোট বাসার মধ্যে গজল আর বয়েতের বকবক গুঞ্জনে চড়া ধুপের দু'পহর কাটানোর মত জীবন কাটাচ্ছিলে—তার মধ্যেই ডাক পাঠালাম।

—আমাদের একটি লেড়কী হয়েছে, আপনি খবর পেয়ে হীরার ধুকধুকি পাঠিয়েছিলেন মনে

আছে জরুর।

—হাঁ হাঁ। নিশ্চয় মনে আছে। লেড়কী কেমন হয়েছে বল। তোমার ইরানী সুরৎ—মায়ের গানের নাচের এলেম আর মা বাপ দুজনেরই 'সায়েরী' গুণ এই পেয়েছে নিশ্চয়।

—হাঁ, খোদার মেহেরবানি আর আপনার মত দোস্ত-লোকের আশীর্বাদে তা সে পেয়েছে।

—তাদের নিয়ে এস এখানে।

—জরুর। আনব বইকি। নবাবের লক্ষ্ণৌতে যখন কোন উৎসব হবে—নবাবের হুকুম হবে তখনই আনব।

—না কুইলি খাঁ। তোমাকে এখনি আসতে হবে। কুইলি খাঁ, যারা সাধারণ কবি হয় তাদের কথা আলাদা। তুমি ইরানের সেই আমীর বংশের ছেলে যারা ইরানের মসনদের পাশে বসে ইরানের নসীবের চাকা ঘুরিয়েছে। কুইলি খাঁ—সায়ের তুমি—তুমি তো শুধু গুলাব আর সিরাজী আর বুলবুল আর ঔরতের সুরত নিয়ে কি তার কলিজা দিলের দরদ্ নিয়েই বয়েৎ গজল লেখ না, যে সব শেরের মত মর্দানা বুকে লোহার বর্ম আর শিরপেঁচ পরে দেশকে বাঁচায় কি রাজ্য গড়ে তাদের নিয়েও বয়েৎ তৈরি কর। তুমি তারও চেয়ে বেশী। তোমার জন্যে আমি বর্ম হাতিয়ার তৈয়ার রেখেছি।

চমকে উঠে মুখের দিকে তাকালেন কুইলি খাঁ।

সফদরজঙ্গ বললেন—আমি তৈয়ার হচ্ছি কুইলি খাঁ। মুঘল বাদশাহীর মাথায় ডাণ্ডা মেরে নাদির শাহ তাকে বেহোঁশ করে দিয়েছে। হোঁশ ফিরলেও তার হাত পা নাড়ার শক্তি খতম। পাঞ্জাব তো ভুক্তান হয়ে গেল একরকম ইরানের। রোহিলখণ্ডে যত বেতমিজ আফগান রোহিলা ডাকুরা এসে আমীর-উল-উমরা মালেক-ই-মুল্ক নবাব বনে গেল। দিল্লীতে আজ ইরানী তুরানীর ঝগড়ায় হিন্দুস্তানী মুসলমানদের আর রাজপুতদের সাহায্যে তুরানীরা সিয়াদের বেইজ্জতির শেষ রাখছে না। আমি নিজে তুর্কী হয়েও সিয়া। সুন্নীদের জুলুমে সিয়াদের জান-ইজ্জতের হয়রানির শেষ নেই। তুমি নিজে সিয়া। আমি সিয়া হয়ে সিয়ার দুখ আর বেইজ্জতি দেখতে পারব না। আমি তৈয়ার হচ্ছি। তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে। ওদিকে রোহিলারা তৈয়ার হচ্ছে। দক্ষিণে মারাঠা ডাকু। বল্লভগড়ে জাঠ সুরজমল—বুন্দেলখণ্ডে বুন্দেলা রাজপুত। বাঙ্গাল মুলুকে আলিবর্দী মুরশিদকুলীর নাতি সরফরাজকে হারিয়ে খুন করে সুবেদারী দখল করেছে। বাদশাহের হুকুম নেয় নি—সরফরাজের তোশাখানায় মওজুদের না দিয়েছে হিসাব না দিয়েছে বাদশাহের পাওনা সে দৌলতের হিস্যা। চাঘতাই বাদশা বংশ পচে গিয়েছে তবু ওই বাদশাহী না রাখতে পারলে হিন্দোস্তানে মুসলমান বাদশাহী নবাবী আমীরী বিলকুল চলে যাবে। ওই কাফের হিন্দুদের একজন রাজা হবে—মুসলমানকে মাথা হেঁট করে থাকতে হবে!

কুইলি খাঁ বললেন—নবাবসাহেব, আজ চার সাল আমি এসব ভাবনা ভাবি নি। আমার গরীবখানায় বসে গৃহস্থীর মত ঘরের শান্তির মধ্যে দিন কাটিয়েছি; নাদিরশাহীর জুলুমে খুনখারাবিতে যে মানুষের সর্বনাশ হয়েছে তার কথা ভেবে কেঁদেছি—

—হাঁ তোমার এক গীত আমি শুনেছি। এক ভিখ-মাঙোয়া এক রোজ ওই গীত গাইছিল আর ভিখ মাঙছিল। উ আচ্ছা গীত। আখোঁমে আঁসু এসে যায় আপনা-আপনি। হায় নাদির শাহ—হিন্দোস্তান তোমার দুশমন ইরান তোমার ঘর, ইরানী তোমার আপন হিন্দী তোমার পর। কিন্তু ইরানীর খুন লালী আর হিন্দীর খুন কি কালী? হিন্দোস্তানের পানি কি তিতা—ইরানী পানি কি মিঠা? ইরানী মুসলমান খোদার পয়দা আর হিন্দোস্তানের মুসলমান কি শয়তানের পয়দা? শুনেছি সে গীত ওয়ালা সুলতান! বাত তোমার সাচ্চা। কিন্তু কাঁদলে

তো চলবে না কুইলি খাঁ। দুসরা বার যদি নাদির শাহ আসে তবে তেহরান ছুটতে হবে দরবারের জন্তে। তোমার বেটী হয়েছে বলছ খুব খুবসুরত—হয়তো হুকুম আসবে তাকে ভেজো ইরান। নয়তো কোন ছোট ঘরের ইরানী সওদাগর হিন্দোস্তানে এসে দেখে বলবে—আমি তাকে সাদী করব। নয়তো এই হিন্দু কাফের লোককে সেলাম কুর্নিশ বাজিয়ে এ মুলুকে থাকতে হবে!

কুইলি খাঁ ওমরাহ ঘরের ছেলে—রক্তে তার রাজনীতি আছে। তিনি চঞ্চল হয়ে বললেন—আপনার নজর বহুৎ সাকা—আপনি ঠিকই দেখেছেন। ঠিকই ফরমায়েশ করেছেন। আমি আপনার হুকুম মাথায় করে নিলাম। আসতে তৈয়ার আমি লক্ষৌ। যে কাম আমাকে দেবেন ওই কামই করব জান কবুল করে। জান যাবে আমার, তবু ইমান কখনও বরবাদ করব না।

—সে আমি জানি দোস্ত। তোমার সে বয়েৎ আমি রোজ সকালে উঠে মনে মনে আওড়াই। আর দরবারেও বলি হামেশা। হামেশা। "তুমি যে মুসলমান তার প্রমাণ কি? প্রমাণ আমি বে-ইমান নেহি আমি ইমানদার!"

—আমি আসতে তৈয়ার। কোন্ কাম আমাকে করতে হবে হুকুম করুন। শুধু—।

মুখের দিকে তাকিয়ে সফদরজঙ্গ বললেন—না—ফৌজী কাম লড়াই এ সবে আপনাকে আমি টানব না। আপনি লক্ষৌ দরবারে এসে সেরেস্তাখানার ভার নিয়ে বসুন। আর এক ভার আমি দেব—আলমগীর বাদশার আমল থেকে তামাম হিন্দোস্তানে গান বাজনা তসবীর আঁকা বিলকুল জহন্নমে গেছে। আপনার জানা আছে কি না জানি না—এক রোজ দিল্লীর কলাবিদ ওস্তাদ লোক এক কাফন ঘাড়ে করে বাদশাহী কিল্লার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, বাদশাহ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কার ইন্তেকাল হয়েছে, কাফনে কাকে নিয়ে যাচ্ছ? ওস্তাদ কলাবিদেরা জবাব দিয়েছিল—মালিক শাহানশাহ; ইন্তেকাল হয়েছে বাদশাহী হুকুমতে সংগীতকলার—তাকেই নিয়ে যাচ্ছি কবর দিতে। কড়া সুন্নী আলমগীর বলেছিলেন—কবরের গাঢ়া যেন খুব ভাল করে করো—কুঁইয়ার মত। যেন জিন হয়ে কবর ঠেলে না উঠতে পারে!

—শুনেছি আমি জনাব আলি! জানি!

—বাদশাহদের বিলাসের আর ঔরতের নেশায় দিল্লীতে গানাবাজনা আলমগীরের পর আবার জেগেছে। কিন্তু সে কতটুকু? নুর বাঈ আর মৌলাব খাঁ কতটুকু পারে? বাদশাহী দরবারে সুন্নীদের প্রতাপ। তারা এদিকে কোন নজর দেয় না। দু চার খুবসুরত বাঈ নাচনেওলীকে এনে বাদশাহের সামনে ধরে তাকে ঘুম পাড়াতে পারলেই খুশী। কিন্তু আমি তা চাই না। লক্ষৌতে গানের ছবির উন্নতি চাই আমি!

—এ তো আমার দিলের কাম নবাবসাহেব! আজ থেকেই আমি এ কাম মাথার উপর চাপিয়ে নিলাম!

খুশী হয়েছিলেন সফদরজঙ্গ। এতক্ষণে বলেছিলেন—শোন দোস্ত এইবার তোমাকে বলি। দিল্লীর দরবারে আমাদের একটা সুযোগ এসেছে। ইলাহিবাদের খান-ই-খানান আমীর খাঁর সঙ্গে বাদশাহের চিঠ্‌ঠি চলাচল হচ্ছিল। আমীর খাঁ একবার উজীর কোমরউদ্দীনের কাছে মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছে তুমি জান। এবার তিনি ফিরবেন না। আমীর খাঁ বাদশাকে লিখেছেন—ভার পেলে তিন বরিষের মধ্যে তিনি বাদশাহীর হাল ফিরিয়ে দেবেন। কুইলি খাঁ, কি বলব—বাদশাহের নিজের খরচ চলে না আজ বাদশাহী থেকে। বাদশা রাজী হয়েছেন। আমীর খাঁ যাচ্ছেন দিল্লী। আমাকে তিনি সঙ্গে নিয়েছেন। আমরা হাত মিলিয়েছি। এখন

এক মাহিনার মধ্যে আমি যাচ্ছি সুবা বাংলার দিকে। আলিবর্দীর কাছ থেকে বাংলা ছিনিয়ে নিতে হবে—নয়তো তার সঙ্গে নয়া বন্দোবস্ত করে বকেয়া টাকা আদায় করতে হবে। আমি চাই তুমি তার আগেই এসে বসো লক্ষ্ণৌ সেরেস্তাখানায়। আমি তোমার জন্যে বাড়ি-ঘর সব ঠিক করে রেখেছি।

লক্ষ্ণৌ শহর তখন দিন দিন গড়ছে বাড়ছে। শ্রীতে সমৃদ্ধিতে আগ্রা দিল্লীর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। গোমতীর তীরে কেল্লা গড়ে উঠেছে। ওদিকে নতুন নবাবশাহীর মহলের পর মহল উঠছে। চৌক বাজারে সন্ধ্যা থেকে রোশনি জ্বলে—যেন সর্বাঙ্গে হীরা মোতি ঝলমল করা পরমাসুন্দরী কিশোরীর মত মনে হয়। ইমারতগুলি সব নতুন—ঝকঝক করে নবীনতার শ্রীতে সুরতে—তার উপর পড়ে রোশনির ছটা। চৌকের মাঝখানে বাঈ মহল্লায় সারেঙ্গী এসরাজ সেতারের ঝংকার ওঠে; তার সঙ্গে খেয়াল ঠুংরির আলাপ। কোথাও ওঠে ঘুঙুরের রিনিঝিনি ঝমঝম আওয়াজ। দিনের বেলা কেল্লার মাঠে হয় কুচকাওয়াজ। নবাবী সওয়ার ছোটে রাস্তার ধুলো উড়িয়ে—চলে দিল্লী চলে বল্লভগড় চলে দক্ষিণে। বাদশাহের দরবারে চিঠি যায়—সুরজমলের সঙ্গে চলে আঁতাতের কথা—মারাঠা পেশবা বা তাঁর ভাই রঘুনাথ রাওয়ের সঙ্গে চলে দর-কষাকষি।

এরই মধ্যে আলি কুইলি খাঁ এসে সেরেস্তাখানায় বসলেন। তাঁর মোকাম শহরের এক প্রান্তে—বাগিচাওয়ালা সুন্দর মোকাম। পাশেই মাঠে তাঁর নিজের এক হাজার সিপাহীর ছাউনি। বাকী চার হাজার সিপাহী আছে তাঁর জায়গীরে। সেখানে সব ভার তাঁর দেওয়ানের হাতে।

মধ্যে মধ্যে কুইলি খাঁর বাড়িতে মুশায়রা হয়। লক্ষ্ণৌ শহরের সায়ের অর্থাৎ কবির দল এসে বসেন। একদিকে চিকটাঙানো পর্দার ওপারে বসে সুরাইয়া বেগম। পর্দার ওপার থেকেই সে তার বয়েৎ গজল শোনায়। চিত্রকরেরা ছবি এঁকে নিয়ে আসে হাতীর দাঁতের ফলকের ওপর।

ওদিকে সফদরজঙ্গ দিল্লীতে কায়েম হয়ে গেড়ে বসলেন আমীর-উল-উমরা আমীর খাঁয়ের সঙ্গে। দশ হাজার কিজিলবাস সওয়ার নিয়ে দিল্লী গিয়ে বারুদখানা তোপখানার মালিক 'মীর আতিস' হয়ে বসলেন। সুন্নী হাফিজউদ্দীন বরখাস্ত হল মীর আতিসের নোকরি থেকে।

লক্ষ্ণৌ শহরে রোশনাইয়ের জলুস হয়ে গেল খবর পেয়ে। তারপরই খবর এল—জবর খবর! বাদশাহ মহম্মদ শাহের সব থেকে প্রিয়পাত্র ইশাক খাঁ নজমুদ্দীনের সুন্দরী বহিনের সঙ্গে নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলার সাদী! বাদশাহ নিজে খুশী হয়ে নববধূর নাম দিয়েছেন "বহুবেগম"।

শুকদেব সে সমারোহে লক্ষ্ণৌ এসেছিল, এবং বহুবেগমের জন্মলগ্নের ছক তৈরি করে গনে বলে গিয়েছে—এই বহুবেগমের মত বহু বহুৎ নসীবের জোর নইলে মেলে না। কালে দেখতে পাবে এই বহুবেগম বহুৎ পুণ্যবতী বহুৎ ভাগ্যবতী। লছমী—সাক্‌সাত লছমী!

শুকদেবকে একশো মোহর বকশিশ করেছিলেন সফদরজঙ্গ।

শুকদেব গন্নার ভাগ্য দেখেছিল সেই সময়। অনুরোধ করেছিল সুরাইয়া, বলেছিল—পণ্ডিতজী, আমার এই ছোট মেয়ের ভাগ্যটা কেমন বল তো?

শুকদেব হাতখানি ধরে অনেকক্ষণ দেখেছিল। দেখেছিল আর ভেবেছিল। কিছু বলে নি।

সুরাইয়া প্রশ্ন করেছিল—পণ্ডিত ?

—হাঁ।

—বল ?

—হাঁ। বলে আবার আকাশের দিকে তাকিয়েছিল।

—বল পণ্ডিত। চুপ করে রইলে কেন ?

—বেটী আপনার বেগমসাহেব বহুৎ গুণবতী—বহুৎ। বিদ্যাতে তো তোমার থেকেও গুণবতী হবে!

—সে তো ভাগ্য নয় পণ্ডিত। জীবনে কি আছে বল!

—যার গুণ থাকে বেগমসাহেব তার কি দুখ্ হয় ?

—সাদী কেমন হবে বল ?

—সাদী ? সাদী—। হেসে বলেছিল—তোমার বেটীর জন্যে তো হিন্দোস্তানের আমীর-উমরাহ দেওয়ানা হবে বেগমসাহেব!

খুশী হয়েছিল সুরাইয়া বেগম। তারপর বলেছিল—তা হবে, কিন্তু বিয়ে বর কেমন হবে ?

—বর ? চোখ বন্ধ করে যেন মনশ্চক্ষে ভবিষ্যৎ দেখতে দেখতেই পণ্ডিত শুকদেব বলেছিল—বহুৎ খুবসুরত আর বহুৎ এলেমদার—বড়া ভারী আদমী। হাঁ বলতে পার হিন্দোস্তানের মালিকানিরও মালিক এইসা বড়া ভারী আদমী! লেকেন—।

—সেটা কি পণ্ডিত ? শঙ্কিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল সুরাইয়া।

—সেটা ? সেটা—। আবার চোখ বন্ধ করে কথা বলতে শুরু করেছিল পণ্ডিত।—সেটা ওর থেকেও বড়া বাত বেগমসাহেব—তোমার বেটীর নামভি লোকে বরাব্বর ইয়াদ রাখবে। দুনিয়াতে পিয়ারীকে যেমন ভাবে মনে রাখে তেমনি করে রাখবে। বলবে—গন্না বেগম গন্না বেগম। আর আখোঁসে আঁসু বেরিয়ে আসবে!

—কেন—আঁসু কেন ? কাঁদবে কেন ?

—বেগমসাহেব, গন্না বেগমকে তারা জিন্দগীতে দেখতে পেলে না বলে কাঁদবে। রূপমতীর নাম শুনেছ—তার জন্যে লোকে চোখের জল ফেলে কেন—

—কি বলছ পণ্ডিত ? গন্না কি জহর পিয়েগী—

—নেহি। গন্না হাজারও দুখ পেলেও জহর খেয়ে নিজেকে শেষ করবে না। না উ সো নেহি করেগী।

সেই গন্নার বিয়ের সমস্যা উঠেছে। গন্না ষোড়শী যুবতী এখন। তাই জায়গীর থেকে আগ্রায় লোক পাঠিয়ে সুরাইয়া পণ্ডিতকে ডেকেছে।

আলি কুইলি খাঁ নেই। এই কিছুদিন আগে মারা গেছেন। নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলার সাদীর পর থেকে হিন্দোস্তানে অনেক কিছু ঘটে গেছে। ওঠাপড়ার বিচিত্র সমাবেশ। কত আমীর উঠল কত আমীর পড়ল। আমীর কেন বাদশাহীতেও ওঠাপড়া চলেছে। হিন্দোস্তানের বুকে লড়াই হয়েছে—এখন লেগেই রয়েছে। নবাবজাদার সাদী ১১৬৪ হিজরীতে আর এটা ১১৭৫ হিজরী—এই এগার বছরে যেন একশও ইগার বছরের ওলটপালট হয়ে গেল।

নাদির শাহ খুন হয়েছেন ইরানে। তাঁর নিজেরই উজীর মনসবদার কিজিলবাস আমীরেরা একদিন রাত্রে তাঁর তাঁবুতে ঢুকে তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করেছে। তের-তেরখানা ছোরা একসঙ্গে তাঁর বুকে বসেছিল।

নাদির শাহের পর আফগান সেনাপতি আমেদ শা আবদালী আফগানদের নিয়ে ইরান থেকে কেটে বেরিয়ে এসে আফগানিস্তান দখন করে সেখানকার শাহ হয়েছে।

কাবুলের মসনদ দখল করেই শাহ আবদালী হিন্দোস্তানে ঢুকেছিল তার আফগান ফৌজ নিয়ে। দাবি তার পাঞ্জাব। নাদির শাহ নাকি পাঞ্জাব দখল করে গিয়েছিলেন—নাদির শাহের পর সে হয়েছে তার মালেক। সে এসেছিল পাঞ্জাব ছিনিয়ে নিতে ১১৬৬ হিজরীতে। ঢুকে লাহোর দখল করে এগিয়ে আসছিল দিল্লী। ভেবেছিল দিল্লীতে এসে নাদির শাহের মত ক্রোর ক্রোর টাকা সোনা রূপা ময়ূরতক্ত কোহিনূর তাজ ঔরতের সঙ্গে হিন্দোস্তানের সুরত আর কারিগরির এলেম সেও লুটে নিয়ে যাবে কাবুল। কিন্তু এবার মহম্মদ শাহ সময়ে জেগেছিলেন। ওমরাহ উজীর বক্সী সিয়া সুন্নীরাও সব ঝগড়াবিবাদ মুলতুবী রেখে আপন আপন ফৌজ নিয়ে রওনা হয়েছিল আবদালীকে রুখতে। বাদশা নিজে যেতে পারেন নি, শাহজাদা আহম্মদ শাহকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর প্রতিভূ করে। নবাব সফদরজঙ্গও গিয়েছিলেন।

আবদালী পেশবার থেকে লাহোর পর্যন্ত পথের দু'পাশের গাঁও শহর বিলকুল আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছিল। তার সঙ্গে ছিল জাদুতে ওস্তাদ ফকীর 'বাবা সবির'। লাহোরেরই লোক সে। আস্তানা ছিল তার পেশবারে। সে আবদালীর জন্যে মাটির তৈরী খেলনার কামান ঘোড়াকে সত্যিকারের কামান ঘোড়া করে দিয়েছিল। 'বাবা সবির' একা ঢুকেছিল লাহোরে তাঁর নিজের মায়ের সঙ্গে দেখা করবার নাম করে। আসলে সে এসেছিল সুবাদার হেদায়েৎউল্লার কাছে আবদালীর নিমন্ত্রণ নিয়ে। কিন্তু হেদায়েৎউল্লার লোকে তাকে দেখতে পেয়ে ধরে তাকে কোতল করে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু তখন 'বাবা সবির' তার জাদু যা করবার করে দিয়েছে। হেদায়েৎউল্লা হেরে গেল। 'বাবা সবিরের' জাদুতে তার বুদ্ধি বিলকুল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নইলে সারাদিন লড়াই দিয়ে আফগানদের রীতিমত ঠেকিয়ে শেষে সন্ধ্যার সময় ভুল করে আফগান ভেগেছে বলে ফেরবার হুকুম কেন দেবে? যেই লাহোরের ফৌজ পিছন ফিরেছে অমনি আফগান সওয়ার ছুটেছিল শিভল বন্দুক নিয়ে আর আফগানী তোপ গোলা ছাড়তে শুরু করেছিল দনাদন। তারপর লাহোর দখল করে আবদালী লুঠ আর তরাজে তছনছ করে দিয়েছে দিল্লীর মত। লাহোর থেকে বেরিয়ে বলেছিল—আব চলো দিল্লী। হেদায়েৎউল্লা পালিয়েছিল। লাহোরের বেইমান মীর মুমিন তিরিশ লাখ টাকা দিয়ে আবদালীর কাছ থেকে পাঞ্জাবের সুবাদারি নিয়েছে। আবদালী সরহিন্দ দখল করে এগিয়ে আসতে আসতে মান্নুপুরে থমকে দাঁড়াল।

দিল্লীর ফৌজ মান্নুপুরে ছাউনি করেছে। চমক লেগেছিল আবদালীর। এত ফৌজ হিন্দোস্তানের—এত তোপ! আবদালী ছাউনি গেড়ে ভাবতে বসেছিল। লড়াইয়ের দিন আবদালীর তোপে একবারে সকালবেলা উজীর কোমরউদ্দীন নামাজ সেরে বেরিয়েই জখম হয়ে গেলেন। তবুও হিন্দোস্তানী ফৌজ ঘাবড়ায় নি। নবাব সফদরজঙ্গ, জয়পুরের রাজা ঈশ্বরী সিং, উজীরের ছেলে মুইনউদ্দীন এগিয়ে গেলেন ফৌজ নিয়ে। সফদরজঙ্গ এক পাহাড় দখল করে তার উপর গোলন্দাজ সিপাহী আর শিভল বন্দুকবাজদের উঠিয়ে হাজারে হাজারে আফগান ফৌজ শেষ করেছিলেন।

আবদালী সন্ধ্যা হতে হতে হটে এক মাটির কিল্লার মধ্যে ঢুকে বসেছিল তার বাকি ফৌজ নিয়ে। রাত্রেই যদি হিন্দোস্তানী সিপাহীরা সেই মাটির কিল্লা ঘেরাও করত তবে আবদালী ফিরে যেত না। কিন্তু তা করে নি হিন্দোস্তানী সিপাহীরা।

হিন্দোস্তানের আমীর ওমরাহ শাহজাদা কিছু ঢিলাঢালা। তবে আর এক বাতও হতে

পারে—হিন্দোস্তানে লড়াইয়ের একটা নজির আছে কানুন আছে—সেটা হল রাত্রে দুশমনকে বেকায়দায় পেয়ে আক্রমণ কোরো না। আবদালী এই রাত্রির সুযোগে তার আফগান ফৌজ নিয়ে পিছু ফিরল কাবুলের দিকে। না হলে খতম হয়ে যেতে হবে।

সরাসরি সরহিন্দ থেকে আবদালী কান্দাহারের দিকে রওনা হয়েছিল। হিন্দোস্তানী ফৌজ অনেক দূর পিছনে ধাওয়া করেছিল কিন্তু ঢিলাঢালামির জন্য ধরতে পারে নি। হিন্দোস্তানী আমিরী বড়া ভারী আমিরী। ভাঙ আরক আফিং তামাকু পান জর্দা রাবড়ি শরবত রোটি গোস্ আর নাচগানার আসর বাঈ কসবীর দল—এ নিয়ে বহুৎ জোরে ছোটা যায় না। যারা তা ছোটে বা ছুটতে পারে তারা জংলী—তারা লড়াই করে না, লুঠেরাগিরি করে, ডাকাইতি করে।

নবাব সফদরজঙ্গ লড়াই থেকে ফিরে এসে কথাটা বলেছিলেন। সেই সময় এক জোর জলুস গেছে লক্ষ্ণৌতে। ঠিক নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলার সাদীর সময় যে জলুস হয়েছিল তেমনি কি তার থেকেও বেশী।

বোধ হয় তার থেকেও বেশী।

নবাব সফদরজঙ্গ দিল্লীর উজীর হয়েছেন। ওই আবদালীকে তাড়িয়ে তাঁরা যখন ফিরছিলেন তখন পানিপথে খবর পৌছেছিল বাদশাহ শাহ মহম্মদ নাসিরুদ্দীন গাজী আর নেই। তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে।

সফদরজঙ্গ লড়াইয়ের পর একটু জ্বরে পড়েছিলেন।

আলি কুইলিকে লক্ষ্ণৌতে এসে এই সব কথাই বলছিলেন উজীর-এ-আজম খান-ই-খানান আমীর-উল-উমরা নবাব আবুল মনসুর সফদরজঙ্গ।

বললেন—উজীর কোমরউদ্দীন সেদিন সুবাহ্‌তে লড়াই শুরু হবার আগেই তোপে জখম হলেন—তখনই আমি জানতাম। হাঁ দোস্ত আমি জানতাম। হিন্দোস্তানের ইজ্জত রাখতে পারে এমন কেউ নেই সফদরজঙ্গ ছাড়া। আমিই লড়াই ফতে করেছি বলতে গেলে। আমি জানতাম। তবু বাদশা দিল্লীতে। বাদশার কাছে না ফেরা পর্যন্ত ফয়সালা হয় না। তারপর সেদিন পানিপথে আমার তাঁবুতে আমি নামাজ সেরে উঠেছি আমার তাঁবুর দরওয়াজার নাসাকচী বললে—বাদশা নেই! খবর এসেছে দিল্লী থেকে। আমি তুরন্ত বেরিয়ে গেলাম শাহ্‌জাদার তাঁবুতে। কুর্নিশ করে বললাম—বাদশাহ মহম্মদ বেহেস্ত গিয়েছেন—হিন্দোস্থানের বাদশাহ গাজী আপনি—আমি বাদশাহের নিমকহালাল বান্দা। গোলামের হাজার সালামৎ পৌছে বাদশাহের দরবারে।

শাহজাদা হেসে বললেন—বাদশাহ বহুৎ খুশ হয়েছেন নূতন উজীর-এ-আজম নবাব আবুল মনসুর সফদরজঙ্গের উপর। আমি উজীর-এ-আজম নবাবসাহেবকে আমার খুশ দিলের মোবারক জানাচ্ছি! মোবারক উজীর-এ-হিন্দোস্তান! একটু থেমে বললেন—না হলে—

সফদরজঙ্গ বললেন—না হলে যদি বাদশা আমাকে উজীরী না দিতেন তবে ওখান থেকেই আমি বরাব্বর চলে আসতাম লক্ষ্ণৌ। আর আজাদী নিয়ে সুলতান হয়ে খেল্ শুরু করতাম কুইলি খাঁ।

কুইলি খাঁ বললেন—আপনি আমীরদের মধ্যে শের নবাবসাহেব—বনের মধ্যে সিংহের পরেই শেরের অধিকার। সে অধিকার অস্বীকার কে করবে? তবে হ্যাঁ, নতুন বাদশাহকে বুদ্ধিমান বলেই মনে হচ্ছে।

সফদরজঙ্গ বললেন—না কুইলি খাঁ, তৈমুরশাহী বাদশাহ বংশে বুদ্ধি দূরদৃষ্টি সাহস এ আর

নেই। সব খতম, শেষ হয়ে গিয়েছে। আহমেদ শা-ও তাই। বাইশ বছরের নওজওয়ান—আজ পর্যন্ত, এই লড়াইয়ের আগে মহম্মদ শা বাদশা ওকে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে জানপহ্‌ছান করতে দেয় নি। হারেমে বন্ধ রেখেছিল। বলতে গেলে ভুখায় রেখেছিল। না দিত আচ্ছা তনখা আর না দিত দু-দশটা ভাল বাঁদী। এখন বাদশা হয়েই তার লালস্ জলে উঠেছে একদম আগুনের মত। তার উপর বাদশাহের মা—সে বড় ছোট ঘরের মেয়ে—ছোট জাতের তওয়াইফ ছিল উধম বাঈ। বাদশা মহম্মদ শা লালচে পড়ে নেকা করেছিল। সে এখন সর্বেসর্বা হয়েছে—তার সঙ্গে জুটেছে হারেমের খোজা সর্দার জাভিদ খান! একদম হারামী!

এই সময়েই আওয়াজ দিয়ে জানিয়ে দরজায় তাতারিনী দ্বাররক্ষিণী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল।

সফদরজঙ্গ তার দিকে তাকিয়ে বললেন—কি?

—খান-ই-জমান সাহেবের ছোট লেড়কী এসেছে। খোদাবন্দের দরবারে উ সালামৎ দেবার জন্য এসেছে!

খান-ই-জমান অর্থাৎ আলি কুইলি খান।

সফদরজঙ্গ কৌতুক এবং আনন্দ দুইই অনুভব করলেন, বললেন—হাঁ? আচ্ছা নিয়ে এস তাকে! এর জন্য এত্তেলার কি জরুরৎ!

ন-দশ বছরের বালিকা। মুখখানি অবিকল পারস্যের সুপুরুষ কুইলি খাঁর মত। দেখলেই চেনা যায় এই বাপেরই বেটী। বেশভূষায় একটি অপরূপ, আড়ম্বরহীন পরিচ্ছন্নতা, দেখলেই মনে হয়—ওয়াঃ (বাঃ)!

সফদরজঙ্গও বলে উঠলেন—ওয়াঃ!

সম্ভ্রমভরে কুর্নিশ করে কুইলি খাঁর কন্যা গন্না কাছে এসে দাঁড়াল।

সফদরজঙ্গ বললেন—এ যে তোমার বেহেস্তের হুরীর মত মেয়ে কুইলি খাঁ! অবিকল তোমার মত দেখতে! আর কি সুন্দর রুচি! ওয়াঃ ওয়াঃ ওয়াঃ!

তারপর গন্নাকে বললেন—তুমি আমাকে সালামৎ জানাতে এসেছ? কে পাঠালে? তোমার মা? সুরাইয়া বেগম?

কুর্নিশ করে গন্না বললে—জনাব আলি খোদাবন্দ, তামাম মুল্কের মালেক, আমি নিজেই এসেছি! কাল রাতে লক্ষ্ণৌ শহরের জলুস্ রোশনি দেখে আমার দিল খুশিতে ভরে গেল! মনে হল—

বলে সে আবৃত্তি করলে—"লক্ষ্ণৌ শহরের এই রৌশন আকাশে লাখো নক্ষত্রের মত জলজলা—এ তো সবই পূর্ণিমার চাঁদের মত, খোদাবন্দ সফদরজঙ্গের রৌশনের ছটায় জলে উঠেছে। আকাশের চাঁদকে আঁধিয়ারায় ঢাকে। হে খোদাতায়লা, লক্ষ্ণৌয়ের আকাশে সফদরজঙ্গ যেন অক্ষয় হয়ে থাকেন।"

—ওয়াঃ ওয়াঃ ওয়াঃ! কার বয়েৎ এ বেটী—তোমার বাপজীর না তোমার গুণবতী মায়ের?

—না খোদাবন্দ, আপনার এই ছোট বাঁদী বানিয়েছে এ বয়েৎ!

—হাঁ! ওয়াঃ ওয়াঃ ওয়াঃ! কি তাজ্জবের কথা! তুমি বয়েৎ বানাতে পার?

কুইলি এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন, বললেন—হাঁ জনাব আলি, গন্না আট বছর বয়স থেকেই বয়েৎ বানায়।

—আর কি পারো? গীত?

—তাও পারে। নাচ গান ও জন্ম থেকেই যেন নিয়ে জন্মেছে! মুশায়ারাতেও ও বয়েৎ মসনভি গজল গায়!

হেসে সফদর বললেন—কি নিয়ে গজল বয়েৎ বানাও তুমি? এখনও তো মহব্বতিতে দেওয়ানা হবার সময় হয় নি তোমার!

গন্না বললে—কেন খোদাবন্দ, দুনিয়া ভরে এত রোশনি এত রঙ এত গান এত খুসবু যাঁর জন্যে আমার গজল বয়েৎ মসনভিও তাঁর জন্যে।

—কই শোনাও আমাকে—শুনি—

কুর্নিশ করে গন্না বললে—নীল আসমান দেখে মনে হয় তুমি নীল—চাঁদ আর সুরয দেখে মনে হয় তুমি জ্যোতির্ময় সফেদ—রাত্রি দেখে মনে হয় তুমি কাল কিন্তু রাত্রে রোজ স্বপ্ন দেখি তোমার কোন রূপই নেই—তুমি শুধু অফুরন্ত করুণা!

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সফদরজঙ্গ মেয়েটির মুখের দিকে, তারপর নিজের গলা থেকে বহুমূল্য জহরতের ধুকধুকিওয়ালা একছড়া মুক্তার হার তার গলার পরিয়ে দিয়ে বললেন—সেই করুণাময় মেহেরবান দীন দুনিয়ার মালিকের এক নফর আমি বেটী—তাঁরই হুকুমতে এই হার আমি তোমাকে পরিয়ে দিলাম। তারপর তাতারিনীকে বল্লেন, বেগমসাহেবা আর বহুবেগমের কাছে গন্না বেগমকে নিয়ে যা—বলবি তাকে কিছু খাইয়ে যেন পাঠিয়ে দেয়।

গন্না চলে গেলে বললেন—কুইলি খাঁ!

—জনাব আলি।

—তুমি ভাগ্যবান। এমন বেটী তোমার! তোমার বেগম সুরাইয়াও একসময় তওয়াইফ ছিল। কিন্তু সে আজ সত্যিই পবিত্র। তাই এমন বেটী হয়েছে তোমার। আর ওই দেখ উধম বাঈ—সেও তওয়াইফ—উজীর আমীর খাঁর বেটী খাদিমা খানুম—তাকে এনে সামনে ধরেছিল মহম্মদ শাহের। মহম্মদ শাহের নসীব। হাঁ নসীব বলব বইকি—বাদশাহের প্রথম বেগম মালকা-ই-জমানি বাদশা ফরুকশেরের বেটী—তার ছেলে হল না—দোসরা বেগম সাহেবা-ই-জমানি সে নিজামের বেটী—তার হল একটা মেয়ে; আর লেড়কা পয়দা হল এই ছোটজাতের ছোট মেজাজ-দিলের তওয়াইফ বেগম উধম বাঈএর গর্ভে। এই ঔরতের না আছে সহবৎ না আছে তরিবৎ। না বোঝে ইজ্জত। কি বলব কুইলি খাঁ জরাসে ধরমজ্ঞানও এর নেই। এই বাইশ বছরের ছেলে তার ওপর বাদশা—তার মা আজ বাঈ-জিউ নবাব কুদসিয়া সাহিব-উজ-জামানি সাহিবজিউসাহিবা হজরৎ উধম বাঈ। পঞ্চাশহাজারী মনসবদারের খাতির তার। তার পেয়ারের লোক কে জান? হারামী খোজা জাভিদ খাঁ। উধম বাঈএর ভাই—সেদিন পর্যন্ত লোকটা দিল্লীর কুচা গলিতে ঘুরত আর রাস্তাতে যে-সব ছোটজাতের নাচনেবালী নেচে বেড়ায় তাদের সঙ্গে ঔরৎ সেজে নাচত। তাকে এনে করেছে ছ'হাজারী মনসবদার, তার খেতাব হয়েছে মুৎকাদউদ্দৌলা বাহাদুর! কুইলি খাঁ, ভাবছি কি জান?

—বলুন জনাব আলি।

—ভাবছি এই বেটী যদি ছোট না হত—যদি যুবতী হত তবে এর সঙ্গে আহমেদ শাহের সাদী দিয়ে ওই অকর্মণ্য লোকটাকে পাঁক থেকে তুলতাম টেনে—সঙ্গে সঙ্গে হিন্দোস্তানে তৈমুরশাহী বাদশাহীকে আর একবার পবিত্র করে জবরদস্ত করতে পারতাম। একে তুমি বহুৎ যত্ন করে পড়িয়ো, রাজনীতি শিখিয়ো, শুধু গজল বয়েৎ নয়। এ মেয়ে সুবিধে পেলে নূরজাঁহা বেগমের মত বাদশাহী চালাতে পারবে!

গন্নার সম্পর্কে নবাব সফদরজঙ্গের কথা শুনে সুরাইয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

কুইলি খাঁ বলেছিলেন—আমি তা করব না।

চমকে উঠে সুরাইয়া বলেছিল—কেন?

—গন্নার জিন্দগী তোমার মত সুখের যাতে হয় তাই করব। ওতে অনেক দুঃখ অনেক জ্বালা সুরাইয়া—এ তো তোমাকে বলতে হবে না। আমাকে রাজনীতির খেলায় মাততে তো তুমিই বার-বার বারণ করেছ।

সুরাইয়া বললে—জিন্দগীতে চুক হয়ে গিয়েছে। ওয়াল্লা সুলতান চুক জিন্দগীতে হয়—সে চুকের জন্যে আপসোস করে যে হায় হায় করে সে মুর্দা। আপসোস না করে চুক যে শোধরায় সেই দুনিয়ায় আদমীর মধ্যে জিন্দা। সেই শের!

অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছিলেন কুইলি খাঁ সুরাইয়ার দিকে। অনেকক্ষণ পর বলেছিলেন—সুরাইয়া!

সুরাইয়া বলেছিল—আমার বচপনে উধম বাঈয়ের মা আমার মায়ের কাছে বাঁদীর কাজ করত খান-ই-জমান। উধম বাঈ তখন দশ বারো বছরের—আমার দোলনার কাছে বসে দোলা দিত। আমাকে কোলে নিয়ে বেড়াত। নসীব খান-ই-জমান নসীব! উধম বাঈ আজ নবাবকুদসিয়া সাহেবউজজমানি হজরৎ বেগম, বাদশাহের মা! নসীব!

কুইলি খাঁ বলেছিলেন—নসীবের দৌলত সরাবের দোকান, তৃষ্ণা মেটাতে গাঁয়ের ধারের ঝরনা ছেড়ে ওখানে ছুটো না সুরাইয়া। সরাব বোতলে থাকে—বোতল খালি হয়—নেশা ছেড়ে জান ছাতি ফেটে যায়। ঝরনার জলে নেশা হয় না বটে কিন্তু তার খোঁয়াড়ির ছাতি ফাটা নেই আর ঝরনার জল অফুরন্ত।

সেদিন সুরাইয়া তার মেয়েকে সাজিয়েছিল মোহিনীর মত করে। ন বছরের মেয়ে—তা হোক—সে তাকে মনোহারিণী হতে হলে যেমন ভাবে সাজতে হয় তেমনি করে সাজিয়ে দেখছিল এবং একটা ভবিষ্যৎ কল্পনা করছিল।

মেয়ে তার নূরজাঁহাই বটে। ইচ্ছে করলে তা নিশ্চয় হতে পারবে। মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল তার। কিন্তু গন্না বলেছিল আয়নায় নিজের চেহারা দেখে—এ কি সাজালে আমাকে? এ কি—?

—কেন? দেখ তো কেমন দেখাচ্ছে!

—বহুৎ খারাব লাগছে আমাকে! এ কি? এত ঝলমলে জলুস, চুলের এমন ঢঙ—এ কি করলে আমাকে? এ আমি খুলে দেব। না!

—খবরদার খুলবিনে!

—এ যে আমাকে তওয়াইফ মনে হচ্ছে!

ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিল এবার সুরাইয়া বেগম মেয়ের গালে। গন্না চমকে উঠল অতর্কিত আঘাতে কিন্তু সে কাঁদল না।

—তওয়াইফ! তওয়াইফ! জানিস বাদশাহ আহমেদ শাহের মা উধম বাঈ তওয়াইফ ছিল। তোর মা এই সুরাইয়া বেগম একদিন সুরাইয়া বাঈ তওয়াইফ ছিল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল গন্না বেগম। কয়েক মুহূর্ত সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে—তুমি তওয়াইফ ছিলে!

—হাঁ আমি তওয়াইফ ছিলাম।

—আমাকে তওয়াইফ করবে ? নূর বাঈ ? দিল্লীর নূর বাঈ ?

সুরাইয়া চুপ করে গেল। এ কথার জবাব দিতে পারলে না। কিছুক্ষণ পর বললে—নেহি। নূরজাঁহা বেগমের মত করতে চাই তোকে—সারা হিন্দোস্তান যার পায়ের তলায় গড়িয়ে পড়বে। নূর বাঈ নয় !

নিজের হাতে চুলের বেণী খুলে ফেলে মুখটা মুছে ফেলে গন্না বললে—আমি কিছু হতে চাইনে। হব না। আজ নবাবসাহেবের রঙমহলে বহুবেগমকে আমি দেখে এসেছি। বহুবেগম আমাকে বলেছেন—গন্না, তোমার এই খোদাতায়লার নাম নিয়ে এই গজল আমার খুব ভাল লাগল। কলিজা আমার জুড়িয়ে গেল। এইটেই যেন তোমার ইয়াদ থাকে সারা জিন্দগীভর। তোমার গজলেই তুমি মনে রেখো—"খোদা মালিক, ভুখ লাগল—তোমার কাছে চাইলাম খানা—তুমি খাবার জন্তে দিলে ক্ষেত ভরে গঁহু। তিয়াস লাগল—চাইলাম পানি—দিলে দরিয়া ভরে পানি। কিন্তু তবু ভুখ তিয়াস আমার মিটল না। সুখ চাইলাম—দিলে সুখ দিলে ঘর দিলে ক্ষেতখামার দিলে জায়গীর দিলে বাদশাহী। তবু দুখ গেল না। ঘর ভাঙে—ক্ষেতি কেড়ে নেয়—জায়গীর বাদশাহীর জন্তে লড়াই করে মরি। চাইলাম না শুধু তোমাকে। হায় তোমাকে যদি চাইতাম তবে তোমাকে পেতাম। আর তোমাকে পেলে তো তুমি কখনও হারাও না—তোমার মধ্যেই আমি হারিয়ে যাই।" ইয়াদ রেখো ! জানে আমারও দুখ আছে —তোমার গজল শুনে সে দুখ আমি ভুলে গেলাম !

—কি ? তুই কি ফকিরনী হবি নাকি ? তবে তসবী জপ কর তোর বাপের মত !

চুপ করে রইল গন্না।

কথাটা শুনে খান-ই-জমান সুরাইয়াকে বললেন—এতদিন পর তোমার দিলে আগুন জলল সুরাইয়া ?

সুরাইয়া বললে—হাঁ আমি তো তোমার মত খাদিজা সুলতানের বিরহে মনে মনে ফকীর হয়ে যাই নি। মরে পাথর হয়ে যাই নি। দুনিয়ায় সমুন্দর যে সমুন্দর যাতে পানি পানি আর পানি তার মধ্যেও নাকি আগুন আছে। জলে। আগুন আমার মধ্যে ছিল—আজ যদি তা জলেই থাকে তবে তাতে দোষ কি হল ? এবং এর জন্তে দায়ী তুমি !

বুকে হাত দিয়ে কুইলি খাঁ বলেছিলেন—আমি ?

—হাঁ তুমি। ইয়াদ করো খান-ই-জমান সাহেব—দিল্লী ছাড়িয়ে ছোট জায়গীরে আমিই তোমাকে নিয়ে এসেছিলাম। সেদিন তওয়াইফ সুরাইয়ার বড় সাধ ছিল—ছোট বাড়িঘর তার মধ্যে সুখের সংসার। গন্না হল—কোলে চাঁদ পেলাম। তারপর তুমি এলে লক্ষ্ণৌতে। নবাব বাহাদুরের ডাকে সাড়া দিয়ে এলে লক্ষ্ণৌ। খাতির পেলাম তোমার সঙ্গে, দৌলত পেলাম। চোখের উপর দেখলাম নবাব সফদরজঙ্গ দেখতে দেখতে সারা হিন্দোস্তানের উজীর, বাদশাহ পুতুল নিয়ে পুতুলখেলনেওলা হল। দণ্ডমুণ্ডের মালিক সে। দিল্লীতে উধম বাঈ আজ পঞ্চাশহাজারী আমীরের খাতির এক্তিয়ার নিয়ে বাদশার মা। রোজ সকালে ঝরোকায় সে সালামৎ কুড়োয় হাজার মানুষের ! আগুন আমার জলছে—সে জালিয়েছ তুমি।

একটু চুপ করে থেকে কুইলি খাঁ বললেন—পূর্ব মুখে দাঁড়িয়ে সকালে সূর্যোদয় দেখে তাজা ফুল দেখে নেশা লাগে সুরাইয়া। মনে হয় এ দিনের শেষ নেই। সূর্যের আলোও সেই ছলনা করে তার তেজ বাড়ায় জলুস বাড়ায়। মন ছোটে ক্ষেত খামারে দুনিয়াদারীর কামে ফুলে ফসলে তখন ঘুরে দাঁড়াতে হয় পশ্চিম মুখে যে দিকে ওই সূর্য অস্ত যাবে আর যে দিকে মক্কার কাবা

মসজেদ—যে দিকে মুখ করে মুসলমানকে নামাজ পড়তে হয়। আমি এখানে দৌলতের জন্তে খাতিরের জন্তে আসি নি সুরাইয়া। আমি এসেছি নবাবকে সাহায্য করতে। সিয়াদের অপমান করছে সুন্নীরা—তার জন্তেও বটে আর হিন্দোস্তানে ইসলামী বাদশাহী টলমল করছে—হিন্দুরা মাথা চাড়া দিচ্ছে—সে বাদশাহীকে বাঁচাতেও বটে। দিল্লীর দিকে মুখ ফিরিয়ে দিল্লীর লাল কেল্লাতেই নিজের নজরকে বদ্ধ করো না—আরও ছড়িয়ে দাও পশ্চিম মুখে একেবারে নামাজের সময় যেখানে নজর যায় সেখান পর্যন্ত।

এরপর সুরাইয়া বেগম চুপ করে বসেছিল কিছুক্ষণ। চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়তে শুরু করেছিল।

খান-ই-জমান সমাদর করে বলেছিলেন—কাঁদছ কেন? চুক মানুষের হয় পিয়ারী।

—তুমি উধম বাঈয়ের কথা বললে কেন?

—লাল কুঁয়রের কথা তো মনে কর সুরাইয়া। হিন্দোস্তানের বাদশাহ জাহান্দর্ শাহকে নিয়ে যে মাটির পুতুলের মত খেলত। শেষ কি হল তার—

শিউরে উঠেছিল সুরাইয়া। খান-ই-জমানের মুখ চেপে ধরে বলেছিল—বোলো না বোলো না! আমার ইয়াদ ছিল না!

"পাহাড়ের মাথায় জঙ্গলে আগুন লেগেছে। লাগায় নি কেউ। গাছে গাছে ঘষে আগুন জ্বলেছে। সে আগুন জ্বলছে। দিন ভর জ্বলছে রাত ভর জ্বলছে; আকাশে মেঘ উঠছে; পানি বর্ষাচ্ছে। মনে হচ্ছে নিভে গেল। না। ধোঁয়া উঠছে। আবার জ্বলছে। এ আগুন কিসে নিভবে? হায় খোদা দীন দুনিয়ার মালিক, গরীব এক বিহঙ্গিনী বসেছিল একটি গাছে। সে গাছ পরম আদরে তাকে ডেকেছিল। বন পুড়ল গাছ পুড়ছে—বিহঙ্গিনীর আজ কোথায় আশ্রয়! এ জবাব তুমি না দিলে কে দেবে?"

ষোল বছর বয়সে গন্না এ গজল তৈরি করেছে। আগের ঘটনার সাত বছর পর।

সুরাইয়া মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলে—এর মানে কি? কি বাতাতে চাস তুই?

* * * *

সাত বছরে দুনিয়ার বিশেষ করে হিন্দোস্তানের অনেক কিছুর বদল হয়ে গিয়েছে। কুইলি খাঁ বলেছিলেন সুরাইয়াকে—সুরাইয়া, সুবাতে সূর্য যখন ওঠে তখন পশ্চিম দিকে পিছন ফিরে সকলে পুব দিকেই তাকায়। তখন সকালের সূর্য আর তাজা ফোটা ফুল ক্ষেতের ফসল দেখে মনে হয় এ দিনের শেষ নেই। তিনি সুরাইয়াকে পশ্চিম মুখে ঘুরে নামাজের সময় মুসলমানের মন আর দৃষ্টি যে দিকে নিবদ্ধ হয় সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলেছিলেন। হিন্দোস্তানে সাত বছরে বদল হয়ে গেল তার দিকে দৃষ্টি না রেখে সুরাইয়া স্বামীর কথা মেনেই নিজেদের জায়গীরে সতর্ক হয়ে বাস করছিল, তার উপর তাকে দেওয়ান ইকবাল খাঁও এই উপদেশ দিয়েছিল।

ইকবাল খাঁ বলেছিল—খান-ই-জমান নেই। লক্ষ্মৌর মোকামে থাকবেন কোন্ অধিকারে কোন্ সাহসে? লক্ষ্মৌ শহর; আমীর ওমরাহ নবাব নবাবজাদার আনাগোনা। কার চোখে কখন পড়ে গন্না তার তো ঠিক নেই! নবাবজাদা সুজাউদ্দীনের নারীলোলুপতার কথা সারা দেশ ছড়িয়ে পড়েছে। বহুবেগমের মত গুণবতী রূপবতী বেগমও তার লালসার আগুন নেভাতে পারে নি। কোন্ ভরসায় থাকবেন লক্ষ্মৌতে!

সাত বছর পর সুরাইয়া বেগমের নিশ্চিন্ত জীবনে চিন্তা এল। মেয়ে যে ষোল বছরের হল।

১১৫৯ হিজরীতে এসেছিল নাদির শা। নাদির শা হিন্দোস্তানের ধুপ বৈশাখ মাসে চড়ে উঠবে বলে তার আগেই চলে গিয়েছিল। তার ছ'মাস পরে গন্না এসেছিল কোলে। ষোল বছর হয়ে গেল। সাদীর ভাবনা মায়ের আপনি এসেছে। তার গজল সে খুব মন দিয়ে শোনে। সে তো জানে ওরই মধ্যে দিয়ে সেই মনের কথা বেরিয়ে আসে যা দুনিয়ায় কাউকে বলা যায় না। সে নিজেও করেছে এ কাজ! মুশায়ারার আসরে খ্যাতির জন্তে যশের জন্তে অনেক ভাল কথা সাজিয়ে গজল তৈরী করে গেয়েছে। সে সব হয়তো মনের কথা দিলের খবর নয় কিন্তু আপনমনে বসে থাকতে যে গজল এসেছে তার মধ্যে থাকবেই সে কথা।

বিয়ের কথা সে ভাবছে, তার কারণ হয়েছে। লক্ষ্ণৌ থেকে নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলা বাপকে জানিয়েছে, জেদ ধরেছে, সে গন্নাকে সাদী করবে। নবাব সফদর চিঠি লিখেছেন—"নবাবজাদার সঙ্গে গন্নার সাদী হলে খুব খুশী হবেন তিনি। বহুবেগম তাকে বহিনের মত আদর করবে। আর নবাবজাদা সুজাও সম্ভবত বদখেয়াল থেকে ঘুরে সাচ্চা আদমী হয়ে উঠবে।"

বয়সের ফারাক অনেক। তা ছাড়া আজ নবাব সফদরজঙ্গের নসীব যেন নিচের দিকে যাচ্ছে। এবং নবাবজাদা সুজাউদ্দীনের লাম্পট্যের অখ্যাতিতে লক্ষ্ণৌ শহর আগ্রা শহর মুখর। দিল্লী পর্যন্ত তার ঢেউ পৌছেছে। নিজে তওয়াইফ ছিল সুরাইয়া—সে জানে এ ব্যাধি যার একবার মনের মধ্যে বাসা গাড়ে তার আর মৃত্যু পর্যন্ত রেহাই নাই।

ফরাক্কাবাদের নবাব আহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ রোহিলা আফগান—মতেও সে সুন্নী, তারা সিয়া—তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিরোধিতারই বটে তবু খান-ই-জমান কুইলি খাঁর কবিত্বশক্তিতে এবং চরিত্রমাধুর্যে নবাব বাঙ্গাশ তাঁকে খাতির করতেন। সুরাইয়া বেগমকেও তিনি খাতির করেন। খাতির করেন তার কবিত্বশক্তির জন্ম আর তার চরিত্র পরিবর্তনের জন্ম। দুনিয়ায় তওয়াইফ অনেকে হয়েছে বেগম সাহেবা। কিন্তু ঘর পেয়ে সংসার পেয়েও তওয়াইফ জীবনের নেশা অভ্যাস যায় না। সে দিক থেকে সুরাইয়া বেগমের প্রশংসা করেন তিনি।

নবাব সফদরজঙ্গ যখন দিল্লীতে উজীরী করতেন তখন একবার বাঙ্গাশ নবাবদের সঙ্গে লড়াই হয়েছিল লক্ষ্ণৌর তরাইয়ের শালজঙ্গল নিয়ে। তখন ক'দিনের জন্ম হঠাৎ হানা দিয়ে বাঙ্গাশ নবাবের ফৌজ লক্ষ্ণৌ শহরের অনেকটা দখল করেছিল। লক্ষ্ণৌয়ের ফৌজ অবশ্ম তিন দিনের দিন হটিয়ে দিয়েছিল এবং একটা সন্ধিও হয়েছিল—সে সন্ধির কথাবার্তা সব বলেছিলেন কুইলি খাঁ। দুবার ফরাক্কাবাদ গিয়েছিলেন তিনি। তখনই বন্ধুত্ব হয়েছিল আহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশের সঙ্গে।

খাঁ বলেছিলেন—খান-ই-জমান সাহেব, আপনি ইরানের ওয়ালা সুলতান আমার কাছে। আপনার খাতির আমার কাছে নবাব বাদশার চেয়েও বেশী। বাদশা নবাবরা বোখারা সমরকন্দ নিয়ে রক্তে দুনিয়া ভাসায়, আপনারা পিয়ারীর গালের তিলের জন্তে বোখারা সমরকন্দ দান করে দিতে পারেন।

অগর্ অল্ তুর্কী শীরাজী বদস্ত্ আবদ্ দিলেমারা
বখালে হিন্দুঅশ বখশস সমর্কন্দ বুখারারা।

ওই সীমানা আর শালজঙ্গল আপনি নিজে দাবি করলে সালামৎ জানিয়ে আমি সরে আসতাম।

সেই অবধি বাঙ্গাশদের সঙ্গে একটা অন্তরের দোস্তির সম্পর্ক আছে। বাঙ্গাশ নবাব লোক পাঠিয়েছেন, বলেছেন—সুরাইয়া বেগমসাহেবাকে আমার হাজার সালামৎ জানিয়ো আর বোলো বদখেয়ালী, ব্যভিচারী সুজাউদ্দৌলার হাতে যেন গন্নার মত লেড়কীর সাদী না দেন। গন্নাকে সাদী করতে চেয়েছেন খোদ বাদশাহের উজীর ইমাদ-উল-মুল্ক গাজিউদ্দীন সাহেব।

সুরাইয়া অবাক হয়েছে শুনে।

নবাব বাঙ্গাশ বলেছেন উজীর লাহোরের মুঘলানী বেগমের বেটী উমধা বেগমকে বিয়ে করবে বলেছিল—সে-সম্বন্ধ সে খারিজ করে দিয়েছে। তার উপর দু'দিন আগে এক হিন্দু সাধু এসে বলে গেছে গন্নার ললাটে এখন শনিচরের আমল চলেছে।

সুরাইয়া বেগম ডেকে পাঠালে শুকদেব পণ্ডিতকে।

পণ্ডিতকে খাতির করে বসিয়ে বললে—পণ্ডিত, তুমি বলে দাও গন্নার সাদী আমি কোথায় দেব। বহুৎ গোপন কথা পণ্ডিত, শুধু তোমাকেই বলছি। তুমি আমাকে পথ বাতলে দাও। কি করব আমি। একদিকে নবাবজাদা। নবাব সফদরজঙ্গ আমাদের আশ্রয়দাতা। ওদিকে হিন্দোস্তানের বাদশার উজীর। সেদিন হিন্দু সাধু এসে বলে গেল—গন্নার ললাটে এখন শনিচরের আমল।

প্রথমেই শুকদেব বললে—বেগমসাহেবা, সাদী কাকে দেবে সে পরের কথা। তবে মেয়ের সাদী পশ্চিম তরফে দিয়ো না। তামাম দিল্লী পড়ম পড়ম করছে—আমার কানে তার আওয়াজ আসছে। পশ্চিম তরফ থেকে ঝড় এসে বরাব্বর হিন্দুস্তানকে উলটপালট করেছে। বরাব্বর। যার চোখ আছে বেগমসাহেবা সে দেখতে পাচ্ছে পেশবার শহরের মাথায় মেঘ উঁকি মারছে। বিজলী চমক দিচ্ছে। পশ্চিম তরফ নয় পূব তরফ।

—পূব তরফ পুরা না হলেও লক্ষৌ অনেক পূবে। কিন্তু নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলার কথা তো অজানা নয় তোমার পণ্ডিত!

—সেও আমি জানি বেগমসাহেবা। আমি বিলকুল জানি। এও আমার জানা আছে বেগমসাহেবা—আমি নবাবজাদার ছক তৈয়ার করেছি—তাতে আমি দেখেছি কি এই 'গুনা' এই পাপেই নবাবজাদা একদিন খতম হবে। ঔরতের হাতে নবাবজাদাকে ঘায়েল হতে হবে। সব গুনে দেখেছি। কিন্তু তোমার গন্নার নসীবের এক গুণ আছে কি গন্নাকে যে সাদী করবে তার ওই পাপ থাকবে না।

—বলছ তা হলে গন্নার সঙ্গে সাদী হলে নবাবজাদার এ গুনা আর থাকবে না। শুধরে যাবে সে?

—হাঁ। তা খুব সম্ভব। ওর নসীবে তো তাই লিখছে। ওর যে স্বামী হবে তার এ দোষ থাকবে না।

—হিন্দু সাধু এমনি বাতই বললে—তবে শনিচরের কাল—

—না শনিচরের কালটাল নয়—উ ভুল দেখেছে। নয় তো বুজরুখ।

দশ মোহর দিয়ে পণ্ডিতকে বিদায় করলে সুরাইয়া। বললে—এতেই খুশী হতে হবে পণ্ডিত! খান-ই-জমান নেই। আমরা গরীব হয়ে গিয়েছি!

—বহুৎ খুব। এই আমার হাজার মোহর বেগমসাহেবা। আর পুরা তো আমার নজরে আসছে না ভবিষ্যতের—সব যেন আঁধিতে ঢেকে আঁধিয়ারা হয়ে গিয়েছে। বহুৎ বড় ঝড় আসছে। ওঃ—!

পণ্ডিত শিউরে উঠল। যেন সে চোখে সত্যই ভয়ঙ্কর কিছু দেখছে।

সুরাইয়া ভয় পেয়ে বলে উঠল—পণ্ডিত!

হুঁশ ফিরে এল পণ্ডিতের। সে বললে—এ বিদ্যা যেন জন্মান্তরে আর না শিখি বেগমসাহেবা। এ দেখতে জানলে মানুষ কি দেখে জান?

সুরাইয়া তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পণ্ডিত শুকদেব বললে—দেখে শুধু দুখ। শুধু দুখ। শুধু দুখ! সুখ নেই। হেসে বললে—ভেবে দেখ বেগমসাহেবা দুনিয়ার সব মানুষই তো মরবে। শেষ পর্যন্ত একদিন সূর্যও নিভে যাবে চাঁদও নিভে যাবে—এই মাটির দুনিয়া স্রিফ্ ধুলো হয়ে মিলিয়ে যাবে নীলা আসমানে। আসমানও নীলা থাকবে না। একদম কালা আঁধিয়ারাতে বিলকুল সব ঢেকে যাবে। সেইখানে যার চোখ যায় তার যে প্রতিমুহূর্ত ভয়ঙ্কর মুহূর্ত।

সুরাইয়া বললে—পণ্ডিতজী, এ সব তুমি বলো না। তুমি যাও।

—হাঁ যাই। এ বিদ্যা যেন কেউ না শেখে।

বলে চলে গেল পণ্ডিত শুকদেব।

সুরাইয়া এল ঘরের মধ্যে। গন্না ঘরের মধ্যে নেই। বাঁদীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—সাহেবজাদী কোথায় গেল?

—ছাদের উপর।

—ছাদের উপর?

—হাঁ—গুনগুন করছে—গজল বানাচ্ছে।

সুরাইয়া ছাদে উঠে গেল। ছাদের দরজার মুখে পৌঁছেই শুনতে পেল গন্না তখন গাইতে শুরু করেছে—"পাহাড়ের মাথায় জঙ্গলে আগুন জ্বলছে। লাগায় নি কেউ। জঙ্গলের গাছে গাছে ঘষে আগুন জ্বলেছে। জ্বলছে, দিন ভর জ্বলছে, রাত ভর জ্বলছে। তাপে ধোঁয়ায় আকাশে মেঘ উঠে পানি বর্ষাচ্ছে। মনে হচ্ছে আগুন নিভল। কিন্তু না, আগুন নিভল না। ধোঁয়া উঠছে। ধুপ জোর হলেই আর হাওয়া দিলেই জ্বলবে! এ আগুন নিভবে কিসে? হায় খোদা গরীবা এক বিহঙ্গিনী বসেছিল একটি গাছে—সে গাছ তাকে করেছিল আহ্বান। সে গাছ গেল ছাই হয়ে—আজ বিহঙ্গিনীর কোথায় আশ্রয় কে তাকে বলে দেবে? এর জবাব তুমি দাও খোদা, তুমি দাও!"

সুরাইয়া চমকে উঠল। এ কি গাইছে গন্না—এর অর্থটা কি? একটা অর্থ যেন তার মনের মধ্যে চমকে উঠল বিদ্যুৎরেখার মত। সে এসে মেয়ের সামনে দাঁড়াল। গন্না মুখ ফিরিয়ে দেখলে মা এসে দাঁড়িয়েছে। একটু হাসলে সে।

সুরাইয়া বললে—এর মানে কি গন্না?

গন্না আর একটু হাসলে।

সুরাইয়া বললে—কি বাতাতে চাস তুই?

—কিছু না। মনের মধ্যে এল—

—কেন এল?

—কি করে জানব?

—পাহাড় জঙ্গল কোথায় জ্বলছে? কোথায় দেখলি তুই?

—তামাম হিন্দোস্তান জ্বলছে মা আর বলছ কোথায় জ্বলছে জঙ্গল!

—পাখীর কথা বলছিস—পাখী কে?

—পাখী? হিন্দোস্তানের গরীবান লোকের জান!

—কোন্ গাছে তারা বসেছিল?

—মুঘল বাদশাহীর গাছের ডালে—

—ঝুট বাত বলছিস গন্না। আমি জানি—পাখী।

—আর গাছ তা হলে কে তাও তুমি জান? বল।

—সে সেই পথের ধুলো থেকে নবাব সফদরজঙ্গের কুড়িয়ে আনা দেওয়ানা ছেলেটা—যাকে নবাব বলে বাদশাহী বংশের ছেলে, আলমগীর বাদশার ছেলে কামবক্সের পোতা আদিল শা। সাত মাহিনার ঝুটা বাদশা আকবর আদিল শা!

গন্না একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে—ঝুটমুট তার উপর গোসা করছ মা। সে বাদশা বংশের ছেলে কি না—ঝুট বাদশা কি না সে নিয়ে কোন দিন কোন কথা তো সে বলে নি। বলেছে ফকীর সাহেব। শাহ ফানা। তাকে জোর করে নবাব বলে হাতীর উপর চড়ালে নিজের স্বার্থের জন্যে। সে তো চায় নি মা! সে ফকীর। আর আমার মনের কথা বলছ! না। তাকে বাঁধা যায় না মা! বল তো মা তুমি নিজেই তার সহবৎ আর কথাবার্তা শুনে বল নি যে দুনিয়ায় এ মানুষ দুর্লভ মানুষ! অবাক হয়ে যাও নি?

এ কথার প্রতিবাদ করতে পারলে না সুরাইয়া বেগম। আদিল শা—যত তার রূপ তত তার এ পৃথিবীর উপর ঔদাসীন্য। কথাটা সত্য। মানুষটি যেন চোখের উপর ভাসছে সুরাইয়ার।

একজন বাঁদী এসে দাঁড়াল। সেলাম করে বললে—বন্দেগী হুজুরাইন!

—কি?

—নায়েব এত্তেলা ভেজেছে!

—ইকবাল খাঁ সাহেব?

—হাঁ হুজুরাইন।

অসময়ে ইকবাল খাঁর এত্তেলা? দ্রুতপদে নেমে এল সুরাইয়া ছাদ থেকে।

তিন

নায়েব ইকবাল খাঁ মধ্যবয়সী হিন্দুস্থানী মুসলমান। লোকে ওদের বলে রাজপুত মুসলমান। তার কারণ পূর্বপুরুষেরা রাজপুত ছিল। কোন সময় বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়েছিল কিন্তু রাজপুতের আচার আচরণ এখনও কিছু কিছু মেনে চলে। তবে ইসলাম ধর্ম পালনেও তারা নিষ্ঠাবান।

কুইলি খাঁর জায়গীরে নায়েবী এবং পাচ হাজার ফৌজের তদারক সে-ই করে। হিসাব যেমন বোঝে তেমনি যোদ্ধা হিসাবেও সাহসী। আজ বিশ বছর কুইলি খাঁর জায়গীর ইকবাল খাঁই চালিয়ে আসছে।

কুইলি খাঁ একবার ইকবাল খাঁকে চরম অপমান থেকে রক্ষা করেছিলেন। বিশ বছর আগের কথা! তখনও কুইলি খাঁ সুরাইয়াকে সাদী করেন নি।

ইকবাল খাঁ ছিল ছোট এক তালুকদার। তিনখানা তালুক নিয়ে ছিল তার তালুকদারি। এই তিন তালুকের তামাম লোকই ছিল ইকবালের মত রাজপুত মুসলমান।

পাশেই ছিল এক আফগান তালুকদার। সুন্নী মুসলমান। ইকবাল খাঁর এই তালুক তিনখানা গিলবার জন্যে সে নেকড়ের মত চব্বিশ ঘড়ি হ্যা-হ্যা করে ঘুরত আশেপাশে। জিভ থেকে লালা ঝরত টপটপ করে। মধ্যে মধ্যে আফগানেরা ডাকাইতের মত হানা দিত, এদের সব লুটে নিয়ে যেত। শুধু টাকা পয়সা নয় এদের জেনানা মা বহিন জরু এও লুঠতে আসত। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই পারত না। ইকবাল খাঁয়ের তালুকের রাজপুত মুসলমানেরা

লড়াই হারবার আশঙ্কা করলেই ঘরের জেনানাদের কেটে শেষ করে বেরিয়ে যেত তলোয়ার হাতে। লড়াই করে মরত। কিংবা কেটে বেরিয়ে গিয়ে আবার দল গড়ে এসে আফগানদের ভাগিয়ে নিজেদের জমি দখল করে নিত।

সেবার ডাকাইতি নয়। দস্তুরমত লড়াই বাধালে আফগান তালুকদার ইকবাল খাঁর সঙ্গে। তার দাবী তার এক নতুন কেনা খুব ভাল একটি খোরাসানী মাদী ঘোড়া ইকবাল খাঁ নিজে চুরি করেছে। তার সঙ্গে দাবি সীমানার। দুই জায়গীরের সীমানা বরাবর আছে একটি ছোট নদী। সেই নদী এখন তার সীমানা ভেঙে ঢুকেছে—ফলে ওপারে যে সীমানা উঠেছে তা দখল করেছে ইকবাল খাঁ।

কথা সত্য। ইকবাল খাঁ মাদী ঘোড়াটাকে ঠিক চুরি করে নি। ধরেছে। ঘুড়ীটা কি ভাবে খোলা পেয়ে ছুটে বের হয়। এবং দৌড়তে থাকে বনের দিকে। বনের ভিতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল ইকবাল খাঁ। ইকবাল খাঁ এমন চমৎকার একটি অশ্বিনী দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কৌশলে সে ঘুড়ীটাকে আটকেছিল। তার ঘোড়াটাকে দিয়েই সে ঘুড়ীটাকে ভুলিয়ে দড়ি ছুঁড়ে ফাঁস লাগিয়ে বেঁধে ফেলেছিল।

সীমানার বিবাদের চেয়েও এই বিবাদ বড় হয়ে উঠেছিল। আফগান তালুকদার বলেছিল তার খোরাসানী মাদী ঘোড়া ধরে নিয়ে গিয়েছে ইকবাল—ওই ঘুড়ী তাকে ফিরে দিতে হবে। অপমানের শোধে আরও দিতে হবে ইকবালের তিন বেগমের মধ্যে ছোটি বেগমকে, যার খুবসুরতির খবর এ অঞ্চলে সবাই জানে। না হলে আফগান তালুকদার ইকবালের তালুক বিলকুল জালিয়ে খাক করে দখল করে নেবে। আফগানদের সিপাইরা প্রত্যেকে জবরদস্তি নিয়ে আসবে এক এক মেয়ে—বাঁদী করে রাখবে।

ইকবাল আফগান তালুকদারের লোককে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়ে লড়াইয়ের জন্যে তৈয়ার হয়েছিল। লড়াইয়ে ইকবালের হার হয় নি। সে আশপাশ থেকে রাজপুত সিপাহী সংগ্রহ করেছিল অনেক। এবং রাজপুত মুসলমানেরা এসে তাকে সাহায্য করেছিল। ইকবাল আপনার সীমানাকে পিছনে রেখে আগে থেকেই এগিয়ে গিয়ে আফগানদের তালুকে ঢুকে খুঁটি গেড়ে বসেছিল। লড়াই হয়েছিল ওখানেই। সকাল থেকে পুরা তিন ঘড়ি লড়াইয়ের পর আফগানেরা ভেগেছিল লড়াই ছেড়ে। রাজপুত মুসলমানেরা পিছন পিছন দৌড়েছিল। কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে চীৎকার উঠেছিল—আগুন।

আগুন! হ্যাঁ আগুন জ্বলছে ইকবাল খাঁর কিল্লায়।

চমকে উঠেছিল ইকবাল খাঁ। হায় নসীব! তার পায়রার খাঁচার দোর খুলে গেছে কি করে! এবং সেই পায়রাই উড়ে গেছে যেটা গেলে বুঝতে হবে ইকবাল খাঁর হার হয়েছে।

ইকবাল খাঁ তার দলবল নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে এসেও দুর্ভাগ্যকে রোধ করতে পারে নি। যা হবার তখন হয়ে গেছে। কিল্লায় আগুন জ্বলছে। পায়রাটা আসতেই ইকবালের বেগমেরা এবং বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা সেই আগুনে পুড়ে মরেছে। বারুদখানায় আগুন লেগে কেল্লার একটা পাশ বিলকুল উড়ে গেছে।

এখানেই দুর্ভাগ্যের শেষ নয়। আফগান নবাব সফদরজঙ্গ, মহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ এঁদের কাছে নালিশ জানালে—ইকবাল ইসলাম হয়েও কাফের, সে কাফেরের আচরণ করেছে। তার বাড়ির মেয়েরা রাজপুত মেয়ের মত জহর করে পুড়ে মরেছে।

বিচার হয়েছিল লক্ষ্ণৌতে। সফদরজঙ্গ বলেছিলেন—তুমি মুসলমান হয়েও কাফেরের ধর্ম

পালন করেছ! মেয়েরা জহর করে মরেছে। তুমি মুসলমান হয়েও কাফেরের ধর্ম ভুলতে পার নি। ইসলামে তোমার বিশ্বাস নাই।

ইকবাল কুর্নিশ করে জবাব দিয়েছিল—জনাব আলি, শুনি আমার কোন পূর্বপুরুষ হিন্দু রাজপুত ছিল। কিন্তু আমি মুসলমান বাপের পয়দা—মুসলমানী মায়ের কোলে জন্মে তার বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়েছি। বচপন থেকে মা বাপ শুনিয়েছে খোদা মেহেরবান, দীন দুনিয়া পয়দা হয়েছে তাঁর ইচ্ছায়; দীন দুনিয়া যাঁর ইচ্ছায় পয়দা, তাঁরই সব থেকে প্রিয় ধর্ম ইসলাম! বলেছিলেন তিনি, শুনেছিলেন পয়গম্বর। আমি মুসলমান—দিনে পাঁচ দফা নামাজ পড়ি—লা ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ্‌ মুহম্মদু রসুলু-ল্লাহ বলে পুকারি আজানের বখ্‌ত্‌। রমজানে রোজা রাখি—জাকাত করি। বক্‌রীদে ইদে কোরবানি করি। দুনিয়ায় ইমানকে সব থেকে বড় মনে করি। নিমক খেয়ে নিমকহারামি কখনও করি না। জনাব আলি, দুনিয়ায় মা বহেন জেনানীর ইজ্জৎ ইসলামে পবিত্র জিনিস। সে ইজ্জৎ কাফেরদেরও আছে। জেনানীর ইজ্জৎ মা বহেনের ইজ্জৎ রাখতে তারা পুড়ে মরে, বলে জওহর। এছাড়াও তারা নিজের হাতেও কাটে মা বহেনকে ইজ্জৎ রাখতে। ইসলামেও এমন অনেক হয়। জওহর পিয়েও মরে; কুঁইয়াতেও ঝাঁপ দেয়; আবার আগুনেও পুড়ে মরে। সে জওহরব্রত নয়। তবে হাঁ হুজুর, ওই রোহিলা আফগানদের মত পরের জেনানী কাড়াকে আমি বে-ধরম বে-ইসলাম বলে মনে করি। আমার বহেন জেনানীরা পুড়ে মরেছে এ সত্য। কিন্তু জওহরব্রত তারা করে নি! তাতে তারা কাফেরের ধরম মানে নি—আমিও কাফের হয়ে যাই নি।

এ সব কথা হয়তো অন্যায় নয় তবুও সফদরজঙ্গ তার কথা বলার ধরনে রুষ্ট হয়েছিলেন, বলেছিলেন—ঝুট বাত বলে ঢাকছ তুমি ইকবাল খাঁ।

গোঁড়া আফগান মুসলমান ইরানী তুরানী এরাও নবাব সফদরজঙ্গকে সমর্থন করে কলরব করে উঠেছিল—সাচ্ছা বাত। বে-ধরমী! ইকবাল খান আর তার তালুকের মুসলমানেরা বে-ধরমী!

কুইলি খাঁ তখন তরুণ। তখনও তাঁর জীবনে সুরাইয়া বেগম পর্যন্ত আসে নি। কুইলি খাঁর ভাল লেগেছিল ইকবাল খাঁয়ের নির্ভীকতা এবং ভাল লেগেছিল তার কথাগুলি। কুইলি খাঁ কুর্নিশ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—খোদাবন্দ জনাব-আলি গরীব বান্দার গোস্তাকি মাফ কিয়া যায়; খোদাতায়লার নফর হিসেবে কিছু বলতে আমি চাই!

ইরানের ওয়ালা সুলতান সায়ের তখন মুসলমান সমাজে খুব সমাদরের পাত্র হয়ে উঠেছেন। মাত্র কয়েক বছর এসেছেন হিন্দুস্তানে। পারস্যের ইরানী আমীর রইসের বংশধর পারসীতে পণ্ডিত কবি প্রিয়দর্শন যুবা আলি কুইলির বয়েৎ শুনে গজল শুনে দিল্লী লক্ষ্ণৌ আগ্রার লোক পাগল হয়ে যায়। সমবেত মুসলমানেরা উল্লাস করে তাঁকে সংবর্ধনা করেছিল। নবাব সফদরজঙ্গও তাঁকে ভালবাসতেন, তিনি বলেছিলেন—বল বল সায়ের ওয়ালা সুলতান আমীর আলি কুইলি খাঁ—বল কি বলছ!

আলি কুইলি সেদিন বয়েৎ আওড়ান নি। খাস উর্দুতে সোজা বলেছিলেন—খোদাবন্দ, দুনিয়াতে আল্লাতায়লার খোদা মেহেরবানের একমাত্র সত্য ধর্ম ইসলাম—এতে সন্দেহ যে করে সে কাফের। কিন্তু খোদাবন্দ ইসলামের মধ্যে সিয়া সুন্নী সুফি আজাদী কত যে মত রয়েছে তার হিসাব নবাব সফদরজঙ্গের মত মুসলমানের না-জানা নেই। আজ হিন্দুস্থানেই সিয়া সুন্নীর লড়াই চলছে। কিন্তু জনাব আলি, সিয়া হোক সুন্নী হোক সুফি হোক আজাদী হোক আর কাফেরই হোক—যখন মরে তখন এক রকম ভাবেই মরে। বোখার হয়ে মরে যখন তখন

তামাম মানুষ এক রকম ভাবেই মরে। তলোয়ারের ঘায়ে হিন্দুরও গর্দান দু'ফাঁক হয় মুসলমানেরও হয়। সিয়ারও হয় সুন্নীরও হয়। মানুষকে যখন জান কোরবানি করতে হয়, ইজ্জৎ বাঁচাতে মরতে হয় তখনও তাই। মরার যে কটা পথ সে সবার কাছে খোলা—দরিয়ায় ঝাঁপ দেয় জওহর খায় ছোরা বুকে বসায় কুঁইয়ায় ঝাঁপ দেয়, পাথলে মাথা ভাঙে আগুনে পোড়ে। জনাব আলি, ইকবাল খাঁর কাছে আফগান তালুকদার তার জেনানী তার বহেনকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। বে-ধরম সেইখানে। ইকবালের জেনানী বহেনরা কিল্লায় আগুন দিয়েছিল কিল্লা বাঁচাতে নিজের ইজ্জৎ বাঁচাতে। তাতেই পুড়েছে মরেছে—আপন ইজ্জৎ নিয়ে জরুর গিয়েছে বেহেস্তে। ইকবাল খাঁ শির সিধা করে বলেছে সে মুসলমান। সে নামাজ পড়ে পাঁচ দফে। সে রমজানে রোজা রাখে। দান করে। সে কোরবানি করে। সে ইমানদার। এ সব সে মুসলমান বলেই করে। এতে যদি কিছু ঝুট থাকে তবে তার বিচার করুন। তার জেনানী বহেন পুড়ে মরেছে বলে তার বিচার করলে অবিচার হবে।

জনতার মন বিচিত্র, চরিত্র বিচিত্র। মুহূর্তে তারা আলি কুইলিকে সমর্থন করে বলেছিল—ঠিক বাত। ঠিক বাত। ওয়ালা সুলতান ঠিক বলেছেন।

চুপ করে ছিল শুধু অতিগোঁড়া আফগানেরা।

ইকবাল খাঁ বলেছিল—জনাব আলি খোদাবন্দ, আমি যদি খাঁটি মুসলমান না হতাম তবে আজ রাজপুত রাজা জাঠ সুরজমলের তাঁবেদার হতাম। তার তাঁবে অনেক মুসলমান সিপাহী নোকরি করে। দু'চার আফগানও মিলবে। কিন্তু ইকবাল খাঁ তার তাঁবেদারি করতে যায় নি। তার সাহায্য নেয় নি!

ইকবাল খাঁর ইজ্জৎ সেদিন বেঁচে গিয়েছিল। অপদস্থ হয়েছিল আফগান তালুকদার। তাতে হিন্দুস্থানী মুসলমান এবং সিয়া মুসলমানেরা খুশী হয়েছিল। নবাব সফদরজঙ্গ ইকবাল খাঁকে বলেছিলেন—তুমি মুসলমান! খোদাতায়লা মাফ করুন ওই আফগান খানকে।

ইকবাল খাঁ তার পরের দিন সকালেই আলি কুইলি খানের কাছে এসে তার তলোয়ার পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে বলেছিল—খোদাবন্দ, আজ থেকে ইকবাল খাঁ আপনার নফর!

সেই অবধি ইকবাল খাঁ আলি কুইলির বলতে গেলে সব। জায়গীরে সে সর্বেসর্বা। সে উজীর সে নাজীর সে সিপাহসালার—সে সব কুইলি খানের ছোট জায়গীরে। ইকবালের তালুক আলি কুইলির জায়গীর থেকে বেশী দূরে নয়। তার তালুকের রাজপুত মুসলমানেরাই আলি কুইলির পাঁচ হাজার সিপাহীর মধ্যে তিন হাজারেরও বেশী। আলি কুইলির মৃত্যু হয়েছে দিল্লীতে। নবাব সফদরজঙ্গই তাঁকে বাদশাহের দরবারে গোপন পত্র নিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আলি কুইলির মৃত্যু আকস্মিক মৃত্যু। সঙ্গে ইকবাল খাঁ ছিল। আলি কুইলি মৃত্যুকালে কথা বলতে পারেন নি কিন্তু কথাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলেন ইকবাল খাঁর দিকে। ইকবাল খাঁ তাঁর সে কথা বুঝেছিল, বুঝে কোরান হাতে নিয়ে বলেছিল—এই কোরান হাতে নিয়ে খোদার নামে কসম খেয়ে বলছি খোদাবন্দ, ইকবাল খাঁ বেঁচে থাকতে বেগমসাহেবা আর সাহেবজাদী গন্না বেগমের পায়ে একটি কাঁটা ফুটতে সে দেবে না। ইকবাল খাঁ ইমানকে সব চেয়ে বড় মনে করে। সে বে-ইমান নয়, নিমকহারাম নয়!

ইকবাল খাঁই লক্ষ্ণৌ ফিরে সুরাইয়া বেগম আর গন্না বেগমকে নিয়ে এসেছে জায়গীরে। বলেছে—বেগমসাহেবা, এক্তিয়ার আর বে-এক্তিয়ার হল বেহেস্ত আর জহান্নম। আপনা এক্তিয়ার যেখানে সেখানেই আজাদী, বে-এক্তিয়ার হলেই হল বে-আজাদী—আটক; গাঁও ভাল হয়তো লাগবে না, তবু গন্নার জন্যে গাঁওয়ের কিল্লাই আপনার এক্তিয়ারের বেহেস্ত!

নবাবজাদার—

তারপর আর বলে নি ইকবাল খাঁ। কিন্তু সুরাইয়া সব ঠিক বুঝেছিল। নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলার লালসাবহ্নি তখন গন্নার গজলের বনের আগুনের মতই দাউদাউ করে জ্বলছে। এবং গন্নার নাম তার রূপের খ্যাতি তখন প্রায় তামাম হিন্দোস্তানে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুরাইয়া বেগম ইকবাল খাঁর সামনে পর্দা রাখত না। কুইলি খাঁর আমল থেকেই সে তার সামনে বের হত, কথাবার্তা বলত।

কুইলি খাঁ বলেছিলেন—সুরাইয়া, ইকবাল ধার্মিক লোক। ওকে তুমি ধরমভাই মেনে নিয়ো। নোকর আর ভাইয়ে অনেক ফারক্।

তাই মেনে থাকে সুরাইয়া।

সুরাইয়া এসে ঘরে ঢুকল। ইকবাল খাঁ সেলাম জানিয়ে বললে—অসময়ে তকলিফ বাধ্য হয়ে দিতে হল বেগমসাহেবা। একটা খবর পেলাম।

—খারাপ কুছ?

—হাঁ। ভাল নয় নিশ্চয়।

—কি খবর ইকবাল খাঁ?

—উ রোজ যে হিন্দু ফকীর এসেছিল বেগমসাহেবা সে হিন্দু ফকীর নয়।

চমকে উঠল সুরাইয়া—হিন্দু ফকীর নয়? তবে সে কে?

ইকবাল বললে—হিন্দু ফকীর সেজে খুব লম্বা জটা লাগিয়ে ভসম্ মেখে এসেছিল জাঠ সুরজমলের বেটা জবাহির সিং।

আবারও চমকে উঠল সুরাইয়া।—সে জবাহির সিং?

—হাঁ—খুদ জবাহির সিং!

চুপ করে রইল সুরাইয়া। দু'দিন একদল হিন্দু ফকীর এসেছিল—পঞ্চাশ জন প্রায়; সঙ্গে তাদের কয়েকটা ঘোড়া ছিল একটা হাতী ছিল। একজন খুব জটাওয়ালা সন্ন্যাসী ছিল তাদের দলপতি। সে ছিল হাতীর উপর। বাকী শিষ্য সন্ন্যাসীদের মধ্যে কিছু ছিল ঘোড়ায় বাকী সব পয়দলে। তারা যাবে মথুরা হয়ে বৃন্দাবন। পথে জায়গীরদার কুইলি খাঁ আর সুরাইয়া বেগমের নাম শুনে এসে কিল্লার সামনে ডাণ্ডা গেড়ে বসে চেয়েছিল ঘিউ আর আটা সত্তু আর মিরচাই। খুদাকে নামসে ভগবানকে নামসে। মঙ্গল হোগা, খোদার মেহেরবানি মিলবে! ভগবানের কৃপা মিলবে! সাধুকে ফকীরকে খিলাও, সেবামে লাগাও—ঘিউ আর আটা সত্তু আওর মিরচাই। আল্লা মেহেরবান খোদা কদরদান মালিক ভগবান—হুকুম হো যায় মালিক!

ঝরোকো দিয়ে দেখেছিল সুরাইয়া। দলের গুরু সন্ন্যাসীকে ভারী ভাল লেগেছিল তার। যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি বলিষ্ঠ উন্নত গড়ন। যেন কোন রাজার ছেলে সিংহাসন ছেড়ে সন্ন্যাসী ফকীর হয়েছে। সুরাইয়া তাদের খুব ভাল করে সিধা দেবার হুকুম দিয়েছিল।

সারাটা দিন তারা এখানে ছিল। অনেক লোক এখানে জমেছিল তাদের চারিপাশে। জন চারেক শিষ্য ভজন গানে খুব মাতিয়ে তুলেছিল। আর গুরু সন্ন্যাসী নানান জনকে তাদের মুখ দেখে ভাগ্যের কথা বলেছিল—কাউকে দিয়েছিল তাবিজ, কাউকে দিয়েছিল শিকড়, কাউকে দিয়েছিল লোহার আংটি কাউকে পিতলের। হিন্দুস্তানে মুসলমান বাদশাহরা আমীর ওমরাহরা হিন্দু ধর্মকে কাফেরের ধর্ম বললেও, হিন্দুদের কাফের বললেও—সাধু-সন্ন্যাসীদের

শক্তিকে অবিশ্বাস করতেন না বিশ্বাস করতেন। আকবর শাহ জাহাঙ্গীর বাদশা এই সব সন্ন্যাসীদের অনেক খাতির করেছেন। আলমগীর বাদশার আমলে এটা উঠে গিয়েছিল বটে কিন্তু তারপর আবার সেই ধারা নতুন করে জেগে উঠেছে। এই সন্ন্যাসীরা এখন তো নবাবদের নানারকমে সাহায্য করছেন। এঁরা শুধু জপতপই করেন না লড়াই পর্যন্ত করেন। আর এঁদের লড়াই অদ্ভুত লড়াই। যেন দৈবশক্তিতে লড়াই করেন। নবাব সফদরজঙ্গেরই তো ডান হাত ছিল রাজেন্দর গিরি গোসাঁই। রাজেন্দর গিরি গোসাঁইয়ের নামে দুশমন কাঁপত। যখন গুলি ছুটছে তোপ গোলা ছাড়ছে তীর ছুটছে, তখনই তারই মধ্যে রাজেন্দর গিরি গোসাঁই অকস্মাৎ হাঁক দিয়ে উঠত শেরের মত। সমস্ত চেহারা পালটে যেত। গিরি গোসাঁই নাচতে থাকত, তারপর একহাতে ত্রিশূল অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে হাঁক দিতে দিতে ছুটে এগিয়ে যেত—ঝাঁপিয়ে পড়ত দুশমনের তোপখানার উপর, দখল করে নিত তোপখানা কি দুশমনকে একেবারে ছত্রভঙ্গ করে দিত। তার নিজের সন্ন্যাসীর দল ছিল—তারা ছুটত গুরুজীর পিছনে পিছনে। লোকে বলত গুলি গিরি গোসাঁইয়ের বুকে বেঁধে না।

গিরি গোসাঁইয়ের এত খাতির ছিল লক্ষ্ণৌর দরবারে যে সে নিজের নাকাড়া বাজিয়ে ঘোড়ায় চড়ে দরবারে আসত—দরবারে ঢুকে কখনও সফদরজঙ্গকে সলাম দিত না। হাত তুলে দাঁড়াত আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। সফদরজঙ্গ মসনদ ছেড়ে এগিয়ে এসে সালাম করে তার হাত ধরে নিয়ে যেতেন। গিরি গোসাঁইকে কোন দুশমন মারতে পারে নি। মেরেছে সফদরজঙ্গের মনসবদার ইসমাইল খাঁর এক বন্দুকধারী সিপাহী। গুলি করেছিল পিছন থেকে পিঠে। গোসাঁইয়ের বুকের দিকটা মন্ত্র দিয়ে অঙ্গবন্ধন করা ছিল—পিঠের দিকটা ছিল না। গোসাঁই ইচ্ছে করেই করত না। বলত—যদি কখনও পিছু হঠে পালাই—তেমন মতিভ্রষ্ট হই তবে গুলি বিঁধুক পিঠে, তলোয়ারেয় কোপ পড়ুক, মরণ হোক আমার। এটা জানত ইসমাইল খাঁ। সে তার সিপাহীকে দিয়ে গুলি করিয়েছিল।

রাজেন্দর গিরি গোসাঁই মারা গিয়ে নবাব সফদরজঙ্গের ডান হাত ভেঙে গিয়েছে। গোকুলে নাগা গোসাঁইরা আছে। তারা এমনি সিদ্ধ ফকীর সব। এরা তামাম দুনিয়ায় কাউকে ভয় করে না। দুনিয়ায় মসনদ চায় না জায়গীর চায় না মোকাম চায় না, চায় দু'বেলা রুটি আর ঘিউ সত্তু আর মিরচাই। পড়ে থাকে গাছের নিচে কিংবা ছোট ঝোপড়িতে। এরা তিনকাল দেখতে পায়। গোটা হিন্দুস্তানে এদের খাতির সবাই করে—হিন্দু করে মুসলমানও করে। মুসলমান ফকীরও আছে এমন ধরনের। আজাদী নিরঞ্জন ফকীরের কোপে উজীর আমীর খাঁ মরে গেল ধড়ফড় করে। সুতরাং সুরাইয়া বেগম সমাদর করেছিল। ইকবাল খাঁও অনেক খাতির করেছিল।

যাবার সময় সন্ন্যাসীদের গুরু হেঁকেছিল—বহুৎ খুশ হুয়া। পরমাত্মা তৃপ্ত হুয়া। খোদা ভগবান মঙ্গল করেঙ্গে জরুর। এ দেওয়ান্ হম থোড়া বিভূতি দেনে মাংতা। এতেলা ভেজো মাঈজী হুজরত বেগমকে পাশ—আনে কহো! নেহিতো লে চলো মুঝে।

ইকবাল বিপদে পড়েছিল।

সাধুকে নিয়ে যাবে—সুরাইয়া বেগমকে আসতে বলবে?

—অবহেলা করো না উজীর! আমি যা দেব তাতে পরম কল্যাণ হবে। দেখো উজীর জাদু দেখো! বলে সাধু তার একটা জটা ধরে হাত দিয়ে টিপেছিল। বেরিয়েছিল দুধ!

ইকবাল আর অবহেলা করে নি, গিয়ে খবর দিয়েছিল সুরাইয়াকে। সুরাইয়া সব শুনে

বলেছিল—তাহলে নিয়ে এস সাধুকে! অবহেলা করলে গুনা হয়ে যাবে!

বাইরে বসবার ঘরে সাধু এসে বসেছিল। সুরাইয়া এসে সালাম করে বলেছিল—আপনার পরিতোষ হয়েছে সাধুজী?

—বহুৎ খুব। আমার পরমাত্‌মা বললে তুই বেগম-সাহেবাকে কল্যাণ দিয়ে যা। আর উনকি বেটীকো লিয়ে এক তাবিজ! লেও মাঈ ধরো। বলে একটা লাল দামী পাথর মাথার জটা থেকে বের করে দিয়ে বলেছিল—মাতাজী, তুমি এটা ধারণ করো। আঙটি করে প'রে নিয়ো। মঙ্গলের দশা তোমার, মঙ্গল হবে। আর এহি, বলে আবার বের করেছিল একটি নীলা এবং একটি চৌকা কবচ। বলেছিল এটি তোমার বেটীর জন্যে মাতাজী! আমি দেখতে পাচ্ছি মাতাজী যে তোমার বেটীর ভাগ্যের উপর এখন শনিচরের আমল চলছে। এইটি পরিয়ে দিও—সব অমঙ্গল কেটে যাবে আর শনিচর প্রসন্ন হয়ে তাকে রাজরানী করে দেবে মা। ওর জন্যে তোমার মনে অনেক ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি। সে ভাবনা-চিন্তার কোন কারণ থাকবে না।

সুরাইয়া হাত পেতেছিল। সন্ন্যাসী নীলাটি দিতে গিয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে বলেছিল—না মাতাজী। তুমি তাকে ডাক। আমি তার হাতে মন্ত্র পড়ে দিয়ে যাব এই নীলা আর এই তাবিজ। ডাক তুমি তাকে।

সুরাইয়া বেগম যেন অভিভূত হয়ে পড়ছিল ক্রমশঃ। সে গন্নাকে না ডেকে পারে নি। অবশ্য বোরখা পরিয়েই নিয়ে এসেছিল। সেলাম করে গন্না হাত পেতেছিল। সন্ন্যাসী নীলা এবং কবচ দিতে গিয়ে চমকে উঠে বলেছিল—আরে বাপরে! এ কি রেখা? এ তো 'সাক্‌সাত' রাজরানীর হাত আর—

চুপ করে একটু তাকিয়ে থেকে বলেছিল—তোমার ললাট দেখি কুমারী! দেখি ললাট!

বোরকার মুখের ঢাকা তুলেছিল গন্না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সন্ন্যাসী বলেছিল—এ কন্যা তোমার ব্রজরানীর মত ভাগ্যবতী। পুণ্যবতী। ই জরুর রাজরানী হবে। মহাবীর হবে এর স্বামী। বহুৎ সমঝে সাদী দিয়ো!

বলে সে বিদায় হয়েছিল। এখান থেকে যাবে আগ্রা—সেখান থেকে মথুরা—মথুরা থেকে বৃন্দাবন।

এর পরই সুরাইয়া ডাকতে পাঠিয়েছিল শুকদেব আচার্যকে।

শুকদেব আজই বিদায় নিয়েছে। এই কিছুক্ষণ আগে।

এখন ইকবাল খাঁ এসে বলছে সেদিন যে হিন্দু সাধু এসেছিল সে সাধু-সন্ন্যাসী নয়—সে জটা পরে ভস্ম মেখে ছদ্মবেশী জাঠ রাজার ছেলে দুর্ধর্ষ জবাহির সিং!

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সুরাইয়া বললে—কে বললে ইকবাল খাঁ? কি করে জানলে?

—আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল বেগমসাহেবা! যে নীলাটা সে গন্নাকে দিয়েছে সে অনেক দামী!

—সে চোখ আমারও আছে ইকবাল খাঁ। কিন্তু হিন্দু সাধুরা তো বিচিত্র ইকবাল। শুনেছি এক হিন্দু বৃন্দাবনে এক অমূল্য মানিক পেয়েছিল—সেটা সে যমুনার বালি খুঁড়ে গেড়ে দিয়েছিল। শিখ গুরুর কথা শুনেছি—তাকে জহরতের কাঁকন এনে দিয়েছিল এক শিখ। এক কাঁকন নদীর জলে পড়ে গেল—তখন ব্যাকুল হল ওই শিখ। সে বললে—গুরু, বলে দিন কোনখানে পড়ল আমি এখুনি তুলে আনব। গুরু দোসরা কাঁকনটা নিয়ে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল—ওই হুঁয়া। এদের কাছে তো জহরতের কোন দাম নেই!

—সে তো আমি জানি বেগমসাহেবা। আপনি সিয়া। আমাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিল। সুন্নীরা তুরানীরা আফগানরা আমাদের বলে আধা কাফের।—কিন্তু আরও নজির আমি পেয়েছি।

—কি নজির ?

—আমি যমুনার ঘাটে গিয়েছিলাম শুকদেব পণ্ডিতকে নৌকাতে তুলে দিতে। সেখানে ওই সময়েই এসে লাগল মথুরার এক নৌকা। ওই নৌকার যাত্রী আমাদের জায়গীরের প্রজা এক বানিয়া। মথুরা গিয়েছিল মাল বেচতে। সে বললে—তাজ্জব কি বাত! মথুরায় যমুনার ঘাটে একদল সাধু এসে হল্লা করে জলে পড়ল হাতীর মত। তারপর জল থেকে উঠে সাধু থেকে বনে গেল জাঠ সিপাহী। আর ওদের যে গুরু, সে কিংবাবের চুস্ত পায়জামা চুস্ত পাঞ্জাবি পরে মুরেঠা কোমরবন্ধ লাগিয়ে বনে গেল রাজা। লোকে বললে সে ভরতপুর বল্লভগড়ের যুবরাজ জবাহির সিং!

সুরাইয়া বাঈ স্তম্ভিত হয়ে গেল। বুকের ভিতরটা তার থরথর করে কেঁপে উঠল। আল্লা মেহেরবান বলে আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠল অন্তরটা।

জাঠ রাজা সুরজমল ভরতপুর বল্লভগড়ে আজ প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয় করে বসে আছে। আফগানরা রাজপুতরাও তাকে ভয় করে। মারাঠারা তাকে এড়িয়ে চলে। লক্ষ্ণৌ-এর নবাব সফদরজঙ্গ তার ভরসা করে। রাজপুত রাজারা পর্যন্ত এঁটে উঠতে পারছে না ঠিক।

কি জন্য এসেছিল জবাহির সিং এমন সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সে আর অনুমানের বিষয় নয়। গন্নাকে সে চোখে দেখতে এসেছিল।

বলে গেল—ব্রজরানীর মত ভাগ্যবতী তুমি। তার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। জাঠেরা নিজেদের বলে যাদব রাজপুত। হিন্দুদের কিষণজীর জন্মস্থান বৃন্দাবনের আহীরেরা যাদব রাজপুত—বৃন্দাবন মথুরা অঞ্চলকে ব্রজমণ্ডল বলে এবং সেখানে তারা রাজা হয়ে বসতে চায়। ভরতপুর বল্লভগড় কুমহার ডিগ চার কেল্লা নিয়ে জাঠ সর্দার বদন সিং জয়পুরের মহারাজ সওয়াই জয়সিংহের মেহেরবানি পেয়েছিল। সে নিজেকে কখনও রাজা বলত না, ঠাকুর উপাধি নিয়েছিল। কখনও দিল্লীর বাদশাহের দরবারে যায় নি। বলত—আমি জাঠ সর্দার—ক্ষেতখামার চাষ নিয়ে থাকি। দিল্লীর দরবারে কি আমি যেতে পারি। তার দত্তক ছেলে সুরজমল—সে আজ রাজা সুরজমল। তার এলাকা এখন আগ্রার পশ্চিম-দক্ষিণ থেকে ওদিকে রাজপুতানার ধার পর্যন্ত চলে গেছে। এদিকে মথুরা বৃন্দাবন তার এলাকা না হলেও সত্যকারের দখলদার সেই। দিল্লী থেকে আগ্রা পর্যন্ত বাদশাহী সড়ক তার হাতে।

জবাহির সিং তার ছেলে। অনেক কথাই শুনেছিল সুরাইয়া এই জবাহির সিং সম্পর্কে। সে ধূর্ত। সে বনে জঙ্গলে, বাদশাহী সড়ক বরাবর তার নিজের একদল ইয়ার আর সিপাহী নিয়ে ঘুরে বেড়ায় নেকড়ের দলের মত। গোটা চম্বল তার ভয়ে কাঁপে।

এটা স্পষ্ট, সে গন্নাকে চায়। গন্নার রূপগুণের কথা শুনে নিজের চোখে দেখতে এসেছিল। এবার সে উন্মত্ত হয়ে উঠবে। তাকে ঠেকাবার শক্তি আলি কুইলির পাঁচ হাজার সিপাহীর নাই। শুনেছে সুরাইয়া এখন জাঠ রাজার নাকাড়া বাজলে দিনভরের মধ্যে ত্রিশ চল্লিশ হাজার সিপাহী জমা হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, শিস্তল বন্দুক ভারী কামান সংগ্রহ করেছে তারা। তার মুখে এই ছোট কেল্লা কতক্ষণ টিঁকবে ?

হিন্দু রাজারা গণ্ডায় গণ্ডায় সাদী করে। বিশ পঞ্চাশ একশোতেও বাধা নেই। তার উপর তারা উপপত্নী রাখে। মহলভরতি উপপত্নী। আগের কালে কি হত তা সুরাইয়া জানে না—

এ কালে তারা মুসলমানী উপপত্নীও রাখে। বাজীরাও মারাঠা পেশবা—জাতে সে ব্রাহ্মণ, সারা হিন্দুস্তানে তার খাতির—তার ছিল এক মুসলমানী পিয়ারী—তার নাম ছিল মস্তানী। ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে সে পেশবার সঙ্গে লড়াইয়ের মধ্যেও ঘুরেছে। তবু সে উপপত্নীর বেশী কিছু নয়। তার ছেলে সমশের আজ ভাই বালাজীরাওয়ের তাঁবে সামান্য একজন মনসবদার। কি ইজ্জৎ তার?

অকস্মাৎ সুরাইয়ার রাগ হয়ে উঠল। ভয় তার ঘুচে গেল। সে ছিল তয়ফাওয়ালী। সে খোদার মেহেরবানিতে নসীবের জোরে আজ ইরানী আমীর পার্সী সায়ের আলি কুইলির ধর্মপত্নী। আল্লার দরবারে তার সব পাপ সব গুনা কেটে গিয়েছে। জীবনে সেই ছিল স্বামীর একমাত্র প্রেয়সী। তার মেয়ে গন্না—এমন যার রূপ এমন যার গুণ সে হবে বিধর্মী কাফেরের উপপত্নী? তার জন্মকাল থেকে সে কামনা করে এসেছে গন্না তার চেয়েও ভাগ্যবতী হবে—সেই হবে স্বামীর জীবনের একমাত্র প্রিয়তমা। সে হবে—? না, তা সে হতে দেবে না। কখনও না!

ইকবাল খাঁ চুপ করেই দাঁড়িয়ে ছিল তার মালিক সুরাইয়া বেগমের উত্তরের প্রত্যাশায়। সুরাইয়া এতক্ষণে বললেন—ইকবাল খাঁ!

—হুকুম ফরমায়েশ করুন।

—তুমি কি বল? জবাহির জাঠের মতলব তো স্পষ্ট।

—হ্যাঁ। সে গন্নাকে এইবার চাইবে। না দিলে—

—সে জবরদস্তি ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের কিল্লা কামানের গোলা দিয়ে বিলকুল ধ্বংস করে দেবে। দিল্লীতে বাদশাহের কাছে দরখাস্ত করে চিঠি পাঠাও।

—তাতে কি ফল হবে বেগমসাহেবা? শাহ্‌জাদা মৈজুদ্দীন ষাট বছর উমরে বাদশা হয়ে কি করেছিল তা জানেন। বাদশাহ মহম্মদ শাহের বেটী সাহেবা-ই-জমানির গর্ভের এক বেটী হজরৎ বেগম—বয়স তার ষোল বছর। তার রূপের জলুস নাকি শামাদানের জলন্ত মোমবাতির মত। মৈজুদ্দীন বাদশা হয়েই বললে ওকে সাদী করব আমি। হজরৎ বেগম বলেছিল—জহর পিকে মর যাউঙ্গী। মালকা-ই-জমানি সাহেবা-ই-জমানি তাঁরা বলেছিলেন—নিজে যদি মরতে না পারে হজরৎ বেগম, তবে আমরা দুই মা মিলে ওকে জবেহ করব। জনাব খোদাতায়লার দরবারে কোরবানি করলাম। তবে আলমগীর বাদশা চুপ করে। তার কাছে দরখাস্ত করলে সে-ই চেয়ে বসবে গন্নাকে। বলবে—ফৌজ পাঠাচ্ছি. গন্না বেগমকে বাদশাহী হারেমে ভেজো!

সত্য কথা। কথাটা বলবার সময় সুরাইয়ার মনে হয় নি। হায় দীন দুনিয়ার মালিক মেহেরবান খোদা, তুমি মেয়েদের উপর এমন নিষ্ঠুর কেন? কেন তাদের ভাগ্য এমন? দুনিয়াভর মেয়েরা পুরুষদের টাকাকড়ি দৌলত—তাই বা কেন—খেলার সামগ্রীর মত থেকে গেল। বড়জোর ফুলের মালার মত কি মুক্তার মালার মত। যার জোর বেশী যার জবরদস্তি আছে সেই তাকে একের গলা থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের গলায় পরে। তারপর আবার মেলে নতুন মালা—তখন এ মালাটাকে ফেলে দেয় তার জমানো মণিমুক্তা মতির সিন্দুকের মধ্যে তোশাখানার কোণে, নয়তো কাউকে বকশিশ করে দেয়—যা তু লে যা!

ইকবাল আবার বললে—একটা কিছু ঠিক করে ফেলতে হবে বেগমসাহেবা। কারণ আর সময় নেই। এদিকে গন্নাকে নিয়ে চারিদিকে একটা যেন তুফানের মত কিছু জমে উঠছে। কখন যে বিজলী চমকে তুফান শুরু হবে তার ঠিক কিছু নেই। লক্ষ্ণৌতে শুনেছি নবাবজাদা একরকম পাগল। নবাবসাহেবের কিছু দর্দ আছে গন্নার উপর। কিন্তু নবাবজাদার জেদের কাছে হার

মেনেই আপনাকে চিঠি লিখেছেন। ওদিকে দিল্লীর উজীর ইমাদ উল মুল্ক। তার সাদীর ঠিক হয়ে আছে লাহোরের নবাব-বেগম মুঘলানী বেগমের বেটি উমধা বেগমের সঙ্গে। কিন্তু মুঘলানী বেগম যে কেলেঙ্কারি করছে মনসবদারদের নিয়ে, এমন কি বান্দাদের নিয়ে তাতে সারা হিন্দুস্তানে কিস্তায় আর কান পাতবার জো নেই। ইমাদ উল মুল্ক এই সুবিধে পেয়ে সাদীর সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে গন্নাকে সাদী করতে চায়। ওদিকে রোহিলা নবাব নাজিবউদ্দৌলার বেটা জবিতা খাঁ তার বাপকে ভজাচ্ছে গন্নার সঙ্গে সাদীর সম্বন্ধ করতে। এ ছাড়াও বেগমসাহেবা আমার কানে আসছে ছোট ছোট নবাব জায়গীরদার এরাও চায় গন্নাকে। স্রিফ দুই শের দু'দিকে একদিকে সুজাউদ্দৌলা একদিকে ইমাদ উল মুল্ক বলে শিয়ালেরা আওয়াজ তুলতে পারছে না। তারপর এখন দেখা দিয়েছে নেকড়ে জবাহির। যা করবার হয় জলদি করতে হবে।

—ভেবে দেখি ইকবাল খাঁ! এক রাত আমাকে ভেবে দেখবার সময় দাও!

—যা করবার তা তুরন্ত করতে হবে। পথে আমাকে শুকদেব পণ্ডিত বললে—ইকবাল খাঁ তোমাকে বলে যাই। বেগমসাহেবাকে আমি বলি নি। এখানে আসবার চিঠি যখন তোমরা পাঠালে তখন আমি হিন্দুস্তানের ছক তৈরি করে গুনে দেখছিলাম। দেখছিলাম যেন একটা আঁধি আসছে উত্তর-পশ্চিম থেকে। সেই আঁধিতে সব ঢেকে গেল। আর কিছু দেখতে পেলাম না। আর গন্নার হাত আর ললাট যখন দেখলাম তখন আমার মালুম হল কি ঠিক যেন হিন্দুস্তানের ছকের সঙ্গে গন্নার ললাটের ছক বিলকুল মিলে যাচ্ছে। দেখলাম গন্নার নসীব একটা পানসির মত মাঝ দরিয়ায় ভাসছে আর আসমানে মেঘ জমে উঠছে তুফান। ওই আঁধির মত তুফান। এখন বাঁচতে হলে পানসিকে মাঝ দরিয়া থেকে সরাতে হবে। এক কূলের দিকে আনতে হবে ভিড়াতে হবে। আমি বললাম—সমঝে উঠলাম না পণ্ডিতজী।—খুলে বল। জিন্দগী দরিয়া তা সমঝালাম—নসীব পানসি তাও সমঝেছি কিন্তু দুই কূল কি বলছ। বললে—দুই কূল—আমার বিচারে এক কূল অযোধ্যা দুস্‌রা কূল দিল্লী। সুজাউদ্দৌলা আর ইমাদ উল মুল্ক। আর কি। এক কূলে জলদি ভিড়াতে হবে। গন্নার সাদী দিয়ে দাও।

—কাল সকালে বলব ইকবাল খাঁ!

সকালে উঠে বাঁদী ছাদে গিয়েছিল, সেখান থেকে সে কুড়িয়ে নিয়ে এল এক তীর। তীরের ফলাটা লোহার নয় সোনার। তাতে এক চিঠি জড়ানো। তাতে এক বয়েৎ লেখা—উর্দু বয়েৎ—

বন্‌শী বাজানেওলা রাখাল হলেও রাজার ঝিয়ারি সে সুর শুনে উতলা হয়—
সেখানে বিচার থাকে না জাত-কুল-মানের—
রাজা ওমরাওয়ের ঝিয়ারি বন্‌শীর সুর কি তুমি শোন না?
"তুমকো কব তক পুকারু সাজনা?" কত দিন তোমাকে ডাকব সজনী?

চিঠিখানা পড়ে সুরাইয়া বেগম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গন্না এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে সচেতন হয়ে উঠল সুরাইয়া এবং চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে বললে—পড়!

পড়ে গন্না হাসলে, বললে—ডর পেলে মা?

—ডরের কথা নয়?

—ডর দেখালে ডর পেলেই ডরের কথা মা। ডর না পেলে ডরের কথা কেন হবে?

—তুই ডর পাচ্ছিস নে?

—না মা! সবাই যাকে ডর করে সে হল মরণ। সেই মরণ দিয়েই আদমী আদমীকে ডর দেখায়। মরণকে ডর না করলে ডর আদমীকে কেন করব বল?

—কিন্তু তোকে তো মরতে দিতে আমি পারব না গন্না!

—কি করে বাঁচাবে?

—এখান থেকে পালাব।

—কোথায় পালাবে মা?

—আকবর আদিল কোথায় আছে সেখানে যাব।

হাসলে গন্না। কোন কথা বললে না।

সুরাইয়া বললে—তার হাতেই তোকে দেব গন্না। তোর সুখই আমার কাছে সব চেয়ে বড়। বলে ডাকলে—বাঁদী।

বাঁদী এসে সেলাম করে দাঁড়াল। সুরাইয়া বললে—এত্তেলা দে ইকবাল খাঁকে।

ইকবাল খাঁ এসে দাঁড়াল সেলাম করে।

সুরাইয়া বললে—এই দেখ। ছাদের উপর তীরে বাঁধা এই খত পড়েছিল।

ইকবাল দেখে বললে—এ তো হবেই। জবাহির সিংএর অসাধ্য কিছু নেই। যমুনার ধারের ওই জঙ্গলের গাছে উঠে তীর সহজেই ফেলতে পারে ছাদের উপর। আমি তো কাল বলেছিলাম হুজুরাইনকে। কিন্তু কি ঠিক করলেন? বলেছিলেন আজ সুবাতে ফরমায়েশ করবেন কি করতে হবে!

সুরাইয়া বললে—প্রথম এখান থেকে যাব আগ্রায়। আগ্রায় কিল্লাদার সাহেবের কাছে গিয়ে কিল্লার মধ্যে এক মাহিনার মত থাকবার ব্যবস্থা কর ইকবাল খাঁ। এই মাটির কেল্লা ভরতপুরের তোপে গুঁড়ো হতে পারে কিন্তু শাহানশা আকবার শাহের কেল্লা তোপে উড়বার নয়। তার জন্যে যে টাকা লাগে আমি দেব।

—কিন্তু গন্নাকে নিয়ে সেখানে থাকবেন—আমাদের সিপাহীদের তো থাকতে দেবে না। থেমে গেল ইকবাল খাঁ।

—যদি কিল্লাদারেরই বদ মতলব থাকে ইকবাল খাঁ—যদি দুনিয়ার তামাম লোক জানবর হয়ে গিয়ে থাকে তবে বেঁচে কি হবে—তখন মা বেটী দুজনে মিলে জহর খাব! এক নিশ্চিন্ত হয়ে আশ্রয় নিতে পারতাম রাজপুত রানাদের। কিন্তু সে যেতে হলে ভরতপুর পার হয়ে যেতে হবে।

ইকবাল বললে—গোলামের কসুর মাফ হয়—গন্নার সাদীর একটা ঠিক করলেই তো হয়।

—সাদী ঠিক করেছি ইকবাল। তুমি খোঁজ কর আকবর আদিল কোথায়।

চমকে উঠল ইকবাল।—আকবর আদিল?

—হ্যাঁ ইকবাল—আকবর আদিল!

—আপনি কি ভাবেন সে আবারও কোনদিন বাদশা হবে?

চার

আকবর আদিল শাহ। লোকে বলে গোলাম ছিল। এসেছিল গোলামের হাটে বিক্রী হতে। চৌদ্দ পনের বছর বয়স। আশ্চর্য তার জলুস চেহারার!

সে পাঁচ বছর আগে। নবাব সফদরজঙ্গ তখন দিল্লীর উজীর। নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলা গিয়েছিলেন হাটে গোলাম খুঁজতে।

জীর্ণ পোশাক পরে কোমরে দড়ি বাঁধা অপূর্ব রূপবান গোলাম দাঁড়িয়ে ছিল ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে। সে তাকিয়ে ছিল জামা-মসজেদের মিনারের দিকে।

সুজাউদ্দৌল্লা তার দাম করছিলেন। হঠাৎ দিল্লীর বিখ্যাত ফকীর হজরৎ শাহ্ ফানা এসে তাকে দেখে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর তাকে ডেকেছিলেন—এই বাচ্চা—এই!

ছেলেটা উত্তর দেয় নি। এবার শাহ্ ফানা সুজাউদ্দৌলাকে একরকম ঠেলেই তার সামনে গিয়ে বুকে হাত দিয়ে ডেকেছিলেন—এই বাচ্চা!

এবার ছেলেটা তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেছিল—হাজার সেলাম হজরৎ! কসুর মাফ হয়—ওই মিনার দেখতে দেখতে সব ভুলে গিয়েছিলাম আমি।

ওসব কথার একটাও বোধ হয় কানে যায় নি শাহ্ ফানার। বৃদ্ধ শাহ্ তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলেছিলেন—তু কৌন হো? অ্যাঁ—কে?

ছেলেটি বলেছিল—আমার নাম আকবর।

—আকবর?

—হাঁ হজরৎ আমার মা আমাকে এই বলেই ডাকতেন।

—তোর আব্বার নাম কি?

—হজরৎ আপনি ফকীর—আপনার সামনে ঝুটা বাত বললে গুনা হবে। কিন্তু আমার আম্মা আমাকে মরবার সময় বলেছিলেন—আদিল, তোর বাপ তোকে আমাকে পথের ধুলোয় ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। আমিও তোকে দুনিয়ার পথের ধুলোয় ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। তোর পরিচয়ও তুই ধুলোর মধ্যে হারিয়ে দে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলিস, জানিনে!

—এ চেহারা তুই কোথায় পেলি? আম্মার কাছ থেকে না আব্বার কাছ থেকে?

—আব্বাকে আমার আব্ছা মনে পড়ে, ফকীরসাহেব—তবে আম্মা বলতেন আমি আব্বার মতন। আব্বা বলতেন আম্মাকে—না—আমি তাঁর আব্বার মত, আমার দাদোর মত দেখতে!

—তোর আব্বার নাম আমি বলব? মহম্মদ ফিরুজ—মহম্মদ ফিরুজমন্দ! অঁা? তার আব্বার নাম শাহাজাদা মহম্মদ কামবক্স। হাঁ? তার আব্বা শাহানশাহ আলমগীর—তার আব্বা বাদশাহ শাহজাহান—

—সেই জন্যেই ওই মসজেদের মিনারের দিকে তাকিয়েছিলাম—বড় ভাল লাগছিল দেখতে হজরৎ—আঁখে পানিও আসছিল কি ওই যে খোদাতায়লার আসন—রসুলে আল্লা পয়গম্বর মহম্মদকে ডাকবার জন্য ওই সুন্দর আসন তৈরি করেছিলেন আমারই পূর্বপুরুষ, আর আমি এসেছি এই দিল্লী শাহ্জানাবাদের হাটে গোলাম হয়ে বিক্রী হতে!

শাহ্ ফানা বলেছিলেন—শাহাজাদা কামবক্সের জলুস ছিল সব শাহজাদার থেকে বেশী। আমার সে দোস্ত ছিল। তোকে দেখেই চিনেছি আমি—উ বহুৎ জালিম থা—জুলুম ছিল

বহুৎ। তবু সে মনে মনে ফকীর ছিল। দানিশবন্দ খাঁ লিখেছিল—

"আলমই দিগার আজ ফৎ-এ জাফর বাস্তেন
হম জেব-ই জাহান ফরোদ, ও হম কবাতি দিন
আজ চাহারো তরফ মুবারকবাদী—।
তারিখ কাভাদ বারে ইন কাতি মবিন।"

"উ জালিম যেদিন দুনিয়া থেকে চলে গেল দুনিয়ার চারো তরফসে উঠেছিল মুবারকবাদ!" তুই যেন সেই রে। ফের এসেছিস ফিরে। মনে করতে ভাল লাগে! তোর বাপ ফিরুজমন্দ পালিয়েছিল পুরানি কিল্লা থেকে। তারপর কোথায় গেল জানি না। তুই তার ছেলে!

দেখতে দেখতে লোক জমে গিয়েছিল।

নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলা সওয়ার পাঠিয়েছিলেন বাপের কাছে। এত বড় এমন বিচিত্র খবর রাজ্যের উজীরের জানা অবিলম্বে দরকার।

তখন আকবরের কোমরের দড়ি খুলে গেছে। শাহ্ ফানা বলছেন—হায়রে নসীব! হায় খোদার মর্জি! এ কি তাজ্জবের কথা! আকবর আদিল সব কথা বলেছিল শাহ্ ফানাকে। শাহাজাদা ফিরুজমন্দ পুরানি কেল্লা থেকে পালিয়েছিলেন—যাবেন মক্কা, হজ করবেন। পথে পড়েছিলেন বেমারিতে। গাছের তলায় ছিলেন পড়ে, পানির জন্তে কাতরাচ্ছিলেন। পথের কাছেই ছিল যে গাঁও, সেই গাঁওয়ের এক চাষী মুসলমানের মেয়ে তাঁকে পানি দিয়ে ধরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল গাঁওয়ে—আপন বাড়ি। সেবা করে ভাল করে তুলেছিল তাঁকে। হজ করা আর হয় নি ফিরুজের, ওইখানেই থেকে গিয়েছিলেন চাষীর ঘরের দামাদ হয়ে। কিন্তু নিষ্কর্মা দামাদকে চাষী শ্বশুর বরদাস্ত করে নি। চাষী শ্বশুর চাষ করতে তাঁকে বলত না তাঁর চেহারা দেখে। বলত, জমিদার জায়গীরদারের সিরাস্তায় মুন্সীর কাম করতে। কিন্তু তাও করতেন না ফিরুজমন্দ। শেষে একদিন গঞ্জনা সইতে না পেরে পথেই বেরিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রীও ঘরে থাকে নি—সেও বেরিয়েছিল। বছরখানেকের আকবরকে কোলে করে স্বামীর পিছন পিছন। ফিরুজ হয়েছিলেন এক দরগায় ফকীর। সেইখানেই বাস করেছিলেন চার পাঁচ বছর। তারপর হঠাৎ ঘটল একদিন অঘটন। তখন শাহ নাদির এসেছেন দিল্লীতে। দিল্লী রক্তে ভাসিয়ে দিল্লীকে জহান্নম বানিয়ে শাহ তক্ত-এ তাউস কোহিনুর আর দিল্লীর ইজ্জৎ নিয়ে চলে যাচ্ছেন দেশ। এই খবর পেয়ে ফিরুজ যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সেই দিন রাত্রেই তিনি স্ত্রীকে দিয়েছিলেন তাঁর পরিচয়। বলেছিলেন—জালাউদ্দীন আকবর শাহ, শাহ জাহাঙ্গীর, শাহানশাহ শাজাহানের দিল্লী, তক্ত-এ তাউস, কোহিনুর—এ দিল্লীর ইজ্জৎ, আমারও ইজ্জৎ। আমিনা, আমি বাদশাহ আলমগীরের সব থেকে পেয়ারের বেগম উদিপুরী বেগমের ছেলে শাহজাদা কামবক্সের ছেলে। আমার নাম ফিরুজমন্দ। এই জন্তে কারও নোকরি আমি করি নি করতে পারি নি। ক্ষেতিও আমার কাম নয়। আমার আব্বা কামবক্স শাহজাদা ছিলেন কিন্তু মনে মনে ছিলেন ফকীর। ভাইয়ের সঙ্গে যে যুদ্ধে তিনি মারা যান সে যুদ্ধে সির্ফ এক বাত ছিল তাঁর মুখে—মর্জি খোদাকি। যা হবে সে তাঁর মর্জি। মরবার সময়ও তাই বলেছিলেন—মর্জি খোদাকি। আমি তাই জানি আমিনা, মর্জি খোদাকি। তারই মর্জিতে বেরিয়েছিলাম মক্কার মুখে। তাঁরই মর্জিতে আমার যাওয়া হয় নি। দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে। তাঁর মর্জিতে এই দরগায় তাঁকে ডেকেই পড়ে আছি। তাঁর নামে যে যা দেয় তাতেই তোমাদের রুটি দিই। কিন্তু আজ নাদির শাহ দিল্লীর ইজ্জৎ পায়ে দলে দিয়ে সব কিছু নিয়ে চলে যাবে ইরান, সে আমি মেনে নিতে পারছি না খোদাকি মর্জি বলে। আমি যাব আমিনা। জানি আমি কিছু

করতে পারব না। পৌঁছুতেও পারব না কিজিলবাস সিপাহী ঠেলে শাহের কাছে। তার আগেই যাবে আমার গর্দান। যাক—তাই যাক। এটা মেনে নেব খোদাকি মর্জি বলে। কিন্তু ইজ্জৎ যাবে—তা মানব না খোদার মর্জি বলে।

আমিনা শুনেছিল অবাক হয়ে—তার সঙ্গে শুনেছিল ছ বছরের আকবর।

চলে গিয়েছিলেন ফিরুজমন্দ; মানা শোনেন নি। শুধু আমিনাকে বলেছিলেন—মৎ রোনা। আমিনা মৎ রোনা। আমি যাচ্ছি—মর্জি খোদাকি।

আমিনা একটি কথা জিজ্ঞাসা করেছিল—কিন্তু আমাদের কি হবে?

ফিরুজমন্দ বলেছিলেন—মালুম খোদাকি।

চলে গিয়েছিলেন ফিরুজমন্দ। আর ফেরেন নি। কোন খবরও কোন দিন মেলে নি।

আমিনা এবার ছেলেকে নিয়ে হেঁটেছিল দিল্লীর পথে।

সে দেখবে বাবর শাহের হুমায়ুন বাদশার আকবর শাহের দিল্লী। জাহাঙ্গীর শাহের দিল্লী। শাহজাহান শাহানশার দিল্লী। আলমগীর বাদশাহের দিল্লী। জামা মসজেদে নামাজ পড়ে বলবে—হায় মেরি নসীব! কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নি আমিনার। কম পথ নয়। আসছিল কাথিয়াবাড়ের ধার থেকে। মধ্যে মধ্যে এক এক শহরে কিছু দিন করে থেকে থেকে তারা হাঁটছিল। মাঝপথে গেল আমিনার পা ভেঙে। পা ভেঙে এক গাঁয়ে থাকতে হয়েছিল ছ মাস।

গাঁয়ের পথে খোদার নাম নিয়ে ভিক্ষে করত আর কাতরাত। লোকে তার পায়ের দশা দেখে সহানুভূতি প্রকাশ করলে আমিনা বলত—মর্জি খোদাকি। তারপর এই খোঁড়া পা নিয়ে আজমীর শরীফে এসে পৌঁছেছিল। তিন বছরে। ওখানেই থেমে গিয়েছিল আমিনা, আর হাঁটে নি। বলেছিল—আকবর, খোদার মর্জি এই যে এই চাষীর বেটী চাঘতাই বাদশাহ ঘরের বহু হয়ে তাদের সাধের দিল্লীতে গিয়ে উঠবে তাতে চাঘতাই বংশের উঁচা শির হেঁট হবে—তা হবে না। চাষীর বেটী বহুকে দিল্লী পৌঁছুতেই দিলে না খোদা। তবে খোদা মেহেরবান। তার মেহেরবানিতে হিন্দোস্তানে ইসলামের শ্রেষ্ঠ শরীফ আজমীর শরীফে এসে পৌঁছেছি এই খুব। এই আমার হজ হয়ে গেল। এখানেও তো চাঘতাই বাদশারা সবাই এসেছেন। এখানে আমীর নাই ফকীর নাই বাদশা নাই ভিখমাঙোয়া নাই—সবাই সমান। এখানেও বাদশাহের কত কীর্তি! এইখানেই আমার শেষ হবে—এই খোদার মর্জি। আমার ইন্তেকাল হলে তুই যাবি দিল্লী।

এখানেই ছিল তারা এই ছ মাস আগে পর্যন্ত। আজমীর শরীফে পীর সাহেবদের দয়ায় আকবর মসজেদের কাজ করত। সেখানেই কিছু লেখাপড়া শিখেছিল। তার সম্পর্কে কৌতূহল ছিল অনেকের কিন্তু সে পরিচয় দিতে বারণ করেছিল আমিনা।

বলত, খবরদার বেটা, গর্দান কেটে দিলেও কখনও বলবিনে কি তোর আব্বাজানের নাম শাহজাদা ফিরুজমন্দ, তার আব্বার নাম শাহজাদা কামবক্স, তার আবাজান শাহানশাহ হিন্দোস্তানের রুস্তম বাদশাহ আলমগীর গাজী। খবরদার! এ বেইজ্জতি কালির মত তাদের নাম কালি করে দেবে।

সে কথা দশ এগারো বছরের আকবর বুঝেছিল এবং অক্ষরে অক্ষরে মেনেছিল।

ছ মাস আগে মায়ের মৃত্যু হলে তাকে ওই আজমীর শরীফে কবর দিয়ে সে আজমীর শরীফের পীর আর মোল্লাদের কাছে বিদায় নিয়ে আসছিল দিল্লীর মুখে।

চাঘতাই বংশের দিল্লী। দিল্লী নাকি সোনায় মোড়া। মিনারের মাথায় সোনার তাজের

মত বাহার—গম্বুজের মাথায় সুরয চাঁদের রোশনিতে সোনার ঝকমকানি। লাল কিল্লা জামা মসজেদ—আরও কত কীর্তি! সে সব দেখবে। জামা মসজেদে নামাজ পড়ে বলবে—মর্জি তোমার হে মেহেরবান দীন দুনিয়ার মালিক! আমার নসীব কেন এমন সে তুঝে মালুম!

কিন্তু পথে আসতে আসতে খোদার মর্জি হয়ে গেল অন্যরকম। যে দলের সঙ্গে সে আসছিল দিল্লী সে দলের উপর পড়েছিল ডাকু। ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল দল। আকবর পথ হারিয়ে ধরেছিল আগ্রা গোয়ালিয়রের পথ। মাঝপথে চম্বলে তাকে আবার ধরেছিল ডাকাতে। তারা বিক্রী করেছিল তাকে এই গোলামের কারবারীদের কাছে।

হেসে বলেছিল আকবর—আমাকে কোমরে দড়ি বেঁধে দিল্লীর বান্দা বাজারে বিক্রী হতে আসতে হবে এই খোদার মর্জি—তাই এসেছি!

অবাক হয়ে শুনছিল সকলে। শাহ্ ফানা ঘাড় নাড়ছিলেন আর বলেছিলেন—বেশক! মর্জি খোদার!

এমন সময় এসেছিল উজীর সফদরজঙ্গের পাঠানো একদল নাসাকচী। তারা শাহ্ ফানাকে তসলিমৎ জানিয়ে বলেছিল—তসলিমৎ হজরৎ! উজীর সাহেব আমাদের পাঠিয়েছেন এই এঁকে নিয়ে যাবার জন্যে। হজরতকেও তিনি হাজার সালাম দিয়ে বলেছেন এঁকে উজীরসাহেবের দরবারে পাঠাবার জন্যে।

শাহ্ ফানা বলেছিলেন—কি এনেছিস—এ শাহ্জাদা যাবে কিসে?

নবাবজাদা সুজাউদ্দৌল্লা বলেছিলেন—ঘোড়ে পর হজরৎ।

—আচ্ছা! কিন্তু এর জান যাবে না জামিন কৌন?

—জামিন আমি রইলাম হজরৎ।

কোথা থেকে দুজন রইস মুসলমান এসে হজরৎকে সেলাম করে মোহর নজর দিয়ে সামনে ধরেছিল আফিং-এর ডেলা।

আফিং শাহ্ ফানার কাছে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বস্তু।

আকবরকে নিয়ে চলে গিয়েছিল নাসাকচীরা।

এরপর আর এই শাহজাদা বা শাহজাদার পরিচয়ধারী এই ছোকরাটিকে দিল্লীতে আর কেউ দেখে নি। গুজব দিল্লী শহরে নানারকম উঠেছিল। শুধু দিল্লীতেই বা কেন—বড় বড় শহরেও উঠেছিল। কেউ বলেছিল—উজীর সাহেব খবর পেয়েই ছোঁ মেরে চিল কি বাজ যেমন কবুতর পাকড়ে নিয়ে যায় তেমনি করে নিয়ে গেছে।

কেউ বলেছিল—উজীর না। খুদ্ বাদশাহ আহমদ্ শা আর তার মা উধম বাঈ।

কেউ বলেছিল—কিচ্ছু জান না তোমরা। উজীর বাদশা বাদশার মা কেউ কিছু না। এ সব হয়েছে হারেমের খোজা সর্দার জাভিদ খাঁয়ের হুকুমে।

কেউ বলেছিল—ভাগ ভাগ। উ ছোকরাই বিলকুল ঝুটা বাত বলেছে। ঝুটা আদমী! আসলে উ ছোকরা বান্দা গোলাম। কোন আমীর রইসের বাড়িতে ছিল। সেখানে থাকতে শাহজাদা মহম্মদ ফিরুজমন্দের কথা শুনেছিল। হুঁশিয়ার ছোকরা, কিস্সাটা বানিয়ে নিয়েছিল! তারপর ভেগে পালাচ্ছিল। মনিব পাকড়ে রাগ করে বেচে দিয়েছে গোলাম বান্দার কারবারীদের কাছে। উজীরসাহেব খবর পেয়ে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে তালাসী করতেই সাচ বাত বেরিয়ে পড়েছে। উ বান্দা এক খোজা বান্দা! উজীর দেখেই তাকে একদম—

হাতের ভঙ্গিতে দেখায় যে কেটে ফেলেছে।

কেউ বলে—না—মাথা মুড়িয়ে নাক কান কেটে দিয়ে তাকে দূর করে দিয়েছে।

স্বয়ং আহম্মদ শাহ বাদশাহ উজীরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি খবর উজীরসাহেব? এ সব কি শুনছি? শাহজাদা কামবক্সের পোতা, মহম্মদ ফিরুজমন্দের এক লেড়কা নাকি বান্দা বাজারে—

উজীর কুর্নিশ করে বলেছিলেন—ওসব নিয়ে বাদশাহ এতটুকু চিন্তা করবেন না। সে সব আমি ঠিক করে দিয়েছি। ও কুছ না। বাদশাহের শুনবার মতও নয় চিন্তা করবার মতও নয়।

—শাহ্ কানা যে বলেছে একেবারে সে শাহজাদা কামবক্সের মত দেখতে।

—শাহ্ কানার উমর হয়েছে অনেক—বুড়ো হয়েছে। চোখের নজর খারাব হয়ে গেছে। মগজেরও ঠিক নাই। তার উপর আফিং খায়। কোন দিন খোজা জাভিদ খাঁকে দেখে বলবে এ তো ঠিক বাদশা জাহান্দার শার মত দেখতে কি ফরুকশের বাদশার মত দেখতে।

আহমদ শা বাদশার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছিল কিন্তু তিনি বলতে কিছু পারেন নি। উজীর তাঁকে খোঁচা দিয়েছেন। খোজা জাভিদ খাঁ আর তাঁর মা বেগম উধম বাঈকে নিয়ে দিল্লীতে লোকের কানাকানির কথা তিনি জানেন।

উজীর বলেছিলেন—কোন ভাবনা করবেন না জাঁহাপনা। এই গোলাম যতক্ষণ আছে কোন শাহজাদার ক্ষমতা নাই যে বাদশাহের মসনদ টলায়। ও বিলকুল আমি ঠিক করে দিয়েছি। ওসব ভাবনা ছেড়ে দিন।

কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন উজীর, বলেছিলেন—আর এক কথা জাঁহাপনাকে আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। জাঁহাপনা যে মতলব করেছিলেন কি শাহজাদাকে এই বচপন থেকেই বাদশাহীর কানুন আর সহবৎ তালিম দেবেন উ মতলব আচ্ছা মতলব। শাহজাদার দরবার হবে—তাতে তামাম আমীর ওমরাহদের বাচ্চারা আসবে—শাহজাদাকে কুর্নিশ করবে নজর দেবে এ মতলব বহুৎ উমদা আর আচ্ছা মতলব। আমীর ওমরাহদের বাচ্চারা এখন থেকেই জেনে রাখবে যে ইনিই আমাদের বাদশাহ। আমি তার সব বন্দোবস্ত করেছি। দেওয়ান-ই-খাসে সন্ধ্যের সময় ওই দরবার হবে।

আহমদ শাহ খুশী হয়ে উঠেছিলেন। কল্পনায় তাঁর এক বছরের ছেলে শাহজাদা বাঁকাতানা সৈয়দ শাহকে দেওয়ান-ই-খাসের দরবারে বাদশাহী করতে দেখে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন।

* * * *

দিল্লী শহরে ওই বিচিত্র ছেলেটিকে কেউ দেখে নি—কিন্তু লক্ষ্ণৌ শহরে এক চৌদ্দ পনের বছরের রূপবান কিশোরকে এনে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিল। কিল্লার মধ্যে একপাশে একটা ছোট্ট বাড়িতে সে থাকত। পাহারা থাকত। সিপাহী সাস্ত্রী কি বাইরের কেউ যেতে পারত না। তবে দিল্লীতে যে সব বন্দীরা মাটির তলার ঘরে ছেঁড়া কম্বল আর ফুটা বদনা ও বাটি নিয়ে অন্ধকারে দিন কাটায়, এর অবস্থা তার থেকে অনেক ভাল ছিল। তার জন্যে বান্দা ছিল বাঁদী ছিল। বাবুর্চী ছিল।

বাইরে থেকে আসত কেবল মোল্লারা। তাকে পড়াত। কোরান শরীফের তালিম দিত। বছরখানেক পরে খান-ই-জমান আলি কুইলির হাতে ভার পড়েছিল তাকে পারসী ভাষায় তালিম দেবার। হাফেজ ওমর খৈয়াম পড়াতেন আলি কুইলি।

কিছুদিন পর তাকে লক্ষ্ণৌ শহরের মধ্যে বেড়াতে দেওয়া হয়েছিল। এবং আলি কুইলি খাঁর

সে সময় বাত রোগ হওয়ার জন্য সে আসত আলি কুইলির বাড়ি।

প্রথম দিন যেদিন আসে সেদিন কুইলি খাঁ তাকে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন—এ কি পোশাক পরে তুমি বাইরে বেরিয়েছ আদিল ?

সত্যই তার রূপের সঙ্গে পোশাকটা যেন আদৌ মানাচ্ছিল না। সামান্য মলমলের পায়জামা এবং মলমলেরই আচকান ছিল পরনে, মাথায় ওই সামান্য টুপি। পায়ে মোটা চামড়ার নাগরা যা সাধারণ দেহাতীরা পরে। চোখে সুরমা ছিল না, পোশাকে কোন খুসবয়ের গন্ধ ছিল না; সামান্য অতি সাধারণ মানুষের পোশাক! আদিল—তখন আকবর আদিলের শুধু আদিলটুকুই ছিল নবাব সফদরজঙ্গের হুকুমে—আদিল বলেছিল—কেন জনাব ?

কুইলি খাঁ বলেছিলেন—না না না, এ তো নবাবী মহলের বান্দা নোকরেরা পরে। নবাব সরকার থেকে তোমার পোশাক তো আমি তৈয়ার করিয়ে দিয়েছি আদিল।

আদিল বলেছিল—জনাব, দুনিয়ায় মর্জি খোদাকি খেল, নসীবকে, লেকেন ইজ্জৎ ইনসানকি। খোদার যা মর্জি তাই হয়—তাই হোক, নসীব খেলা করে মানুসের কিসমৎ নিয়ে, হাত নেই মানুষের—না থাক। কিন্তু ইজ্জৎ মানুষের আছে—তা রাখবার দায় মানুষেরই। সেখানে নসীবকে তা নিয়ে খেলতে দিলে ইজ্জৎ থাকে না।

কুইলি খাঁ বলেছিলেন—নসীবের যে খেল তাতে ইজ্জৎ যদি সে বেশী দেয় তাই বা তুমি ফেলে দেবে কি করে? আর বে-ইজ্জৎ করলেই বা রুখবে কিসে? খোদার মর্জিতেই তো নসীবের খেল।

আদিল সসম্ভ্রমে সেলাম করে বলেছিল—গোস্তাকি আমার মাফ করবেন জনাব। আপনি ইরানের ওয়ালা সুলতান—ইরান তুরান আফগানিস্তান হিন্দোস্তান মুলুকের একজন শ্রেষ্ঠ কবি—একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। খোদার মর্জিতেই নসীবের খেল। এর থেকে সত্যি কথা আর হয় না। কিন্তু দুনিয়ার মানুষকে তিনিই ইজ্জৎবোধ দিয়ে পাঠিয়েছেন। খোদার সেখানে পরখ করার মর্জি। গেব্রিয়েল দেখেন। কুস্তির সময় বিচারকের মত দেখেন। নসীব যেখানে মানুষের পাওনার বেশী ইজ্জৎ দেয় সেখানে তা নিয়ে হারে কি না। যে তা নেয় না—ফেলে দেয় পাওয়ার বেশীটুকু সেখানে গেব্রিয়েল খুশী হয়ে ছুটে যায়—বলে—দীন দুনিয়ার মালিক, নসীবের সঙ্গে লড়াইয়ে নসীব হেরেছে মানুষ জিতেছে। খোদাতায়লার মহিমা প্রসন্ন হয়ে ওঠে, গেব্রিয়েল শোনে খোদার মনের কথা—হাঁ আমার মর্জি পুরা হয়ে গেল। আবার নসীব যেখানে পাওনা ন্যায্য ইজ্জৎটুকুও কেড়ে নিতে আসে তখন সেখানে মানুষ বলে—জান কবুল। নেহি দুংগা মেরা ইজ্জৎ। এবং কাড়াকাড়ির লড়াইয়ে সত্যিই জান দেয়। সেখানে খোদার মহিমা তেমনি প্রসন্ন হয়—গেব্রিয়েল বলে ওঠে—"ইয়ে কোরবানি।" এই তো খোদার মর্জি!

সুরাইয়া আর গন্না ছিল পাশের কামরায়—তারা আলি কুইলি খাঁর কাছে সব বৃত্তান্ত আগে শুনেছিল—সেদিন কৌতূহলবশে দেখতে এসেছিল বিচিত্রনসীব এই তরুণটিকে। রূপ দেখে তারা মনে মনে স্বীকার করেছিল—হ্যাঁ, এ চাঘতাই বংশের ছেলে বটে।

এখন কথা শুনে তাদের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়েছিল তারা।

আলি কুইলি খাঁ সাবাস সাবাস করে উঠে আদিলের হাত চেপে ধরে বলেছিলেন—এ সব কথা তোমাকে কে শেখালে আদিল? তোমার বাপ?

—হ্যাঁ জনাব। বাপ বলতেন—মর্জি খোদাকি। তারপর পথে চলতে চলতে মা বলতেন—

খেল নসীবকে। নইলে, জনাব আলি, খুব চুপিচুপি বলতেন আমাকে—নইলে চাঘতাই বংশের বেগম আমি—আমি পা খোঁড়া হয়ে আজ পথে ছেঁচড়ে চলি আর খোদার কাছে চাই শুধু রোটি দো আল্লা! খোদা মেহেরবান স্রিফ দো রোটি! আমি ভাবতে ভাবতে শিখেছি জনাব ইজ্জৎ ইনসানকে। ইজ্জৎ আমার। জনাব আলি, যেদিন জঙ্গলের মধ্যে ডাকুরা আমার কোমরে দড়ি বাঁধে সেই দিন আমার পাথলে মাথা ঠুকে মরা উচিত ছিল। লড়াই করে মরা উচিত ছিল। আমি হেরেছিলাম। তারপর থেকে তো সত্যিই দুনিয়ার কানুনে আমি বান্দা গোলাম। সেদিন শাহ্ কানা যখন আমার আব্বাজান আব্বাজানের আব্বাজান এদের নাম করলে সেদিন শরমসে আমি এতটুকু হয়ে গেলাম। লোকে সেলাম করলে—আমার মনে হল আমার গায়ে থুক্ দিলে। আমি শিখে গেলাম জনাব। শুধু মর্জি খোদাকি আর খেল নসীবকে—এই সব নয়; ইজ্জৎ মানুষের। সে ইজ্জৎ মানুষ রাখতে পারুক এই হল খোদার মর্জি।

আলি কুইলি বলেছিলেন—তুমি মসনভি গজলে এ সব কথা গেঁথে রাখ আদিল।

হেসে আদিল বলেছিল—নসীবের সঙ্গে লড়তে লড়তে আর খোদার কি মর্জি বুঝতে বুঝতে আমি হিমশিম খেয়ে গেলাম জনাব। গজল মসনভি বানাব কখন? তা ছাড়া খোদাবন্দ, ও আমার আসে না। নানান রকম পড়ান আপনারা কিন্তু সত্যি বলব আজ, ঠিক ভাল লাগে ওই কোরান। ওই পড়ি আর নকল করি। ওতেই দিন কেটে যায়। কখনও কখনও হাতির দাঁতের উপর তসবীর আঁকি। কিছু শিখেছিলাম আজমীরে। এখানে আকবর শাহ থেকে আমার দাদা পর্যন্ত বাদশা শাহজাদাদের ছবি আঁকব এই আমার সাধ আছে। আর আমার আব্বার আর আম্মার। ওতেই আমার বাদশাহী জনাব।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—আমার হালৎটা নাগরদোলায় চড়া মানুষের মত। এই উপরে উঠছে এই নীচে নামছে। পাক খাচ্ছি। দু'হাতে চেপে ধরে আছি নাগরদোলার হাতল। আর চোখ বন্ধ করে আছি প্রাণপণে। আমার অবসর কোথায়?

কুইলি খাঁ বলেছিলেন—তুমি মুশায়রার আসরে এস। ক্রমে ক্রমে সব ভাল লাগবে তোমার। নাগরদোলার পাকের মাথার ঘোর ছুটে যাবে।

—আপনার ইচ্ছে হলে নিশ্চয় আসব খোদাবন্দ!

—আনন্দ পাবে। দিল খুশ হয়ে যাবে।

—নিশ্চয়, আপনি যখন বলছেন তখন জরুর হবে। আর খোদার মর্জিও তাই হবে।

যাবার সময় আদিল বলেছিল—আমি আমার হাতের নকল-করা এক কোরান শরীফ এনেছি জনাব। এটি আপনি দেখে দেবেন এই আমার আর্জি!

—নিশ্চয় দেব! রেখে যাও।

সে সুন্দর হাতের লেখা এবং নকলনবীশের অসীম যত্নের পরিচয় দেখে সুরাইয়া বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল—গন্না অবাক হয়ে দেখেছিল এবং সারাটা দিন পাতা উলটে ছিল। তারপর তার বাপকে বলেছিল—আব্বাজান! এ কোরান আমি নিতে চাই আব্বাজান! আপনি বলুন ওই শাহজাদাকে আমি এটি নেব!

শুনে খুব খুশী হয়েছিল আদিল, বলেছিল—এর থেকে বড় সৌভাগ্য আমার কি হবে? লক্ষ্মৌ শহরে হিন্দোস্তানে কুমারী গন্না বেগমের গজলের বয়েতের প্রশংসায় লোকে পঞ্চমুখ। শাহজাদী জাহান-আরা বেগম শাহজাদী জেবউন্নিসা বেগম গজল লিখতেন—তাঁদের সঙ্গে ওঁর নাম করে সায়র হিসেবে। উনি নেবেন ওঁর ভাল লেগেছে—এর থেকে আর কি ভাগ্য হতে

পারে আমার ?

গন্না পাঠিয়ে দিয়েছিল তার হাতের লেখা গজলগুলির মসনভি। আদিল কপালে ঠেকিয়ে বলেছিল—বহুৎ খুব। সারা জীবন এ আমি বহুমূল্য রত্নের মত রেখে দেব।

গন্না উপরেই একটি বয়েৎ লিখে দিয়েছিল :—দুনিয়াতে যত ফুল ফোটে তার যত সুরত আর খুসবু সবই সেই খোদার মহিমা, দুনিয়াতে যত গান যত সুর তার সবেতেও সেই খোদার মহিমা। দুনিয়াতে যত মহব্বতি—মানুষের সঙ্গে মানুষের, মায়ের সঙ্গে বেটার, তার মধ্যেও সেই খোদারই মহিমা। ওই মহিমার সুরে ওঠে আজান—ইলাহা ইলাল্লা— ! গন্না বলে তোমার দিলকে সেই মহিমায় উজ্জ্বল করে নাও তখন গানেই শুনবে আজান।

ওয়া ! ওয়া ! করে বহুৎ তারিফ করে উঠেছিল আদিল শাহ।

এর পর থেকে গন্নার গজলে এসেছিল যেন নতুন সুর। প্রথমে অস্পষ্ট পরে ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এ সুর কানে ধরা পড়েছিল সকলেরই কিন্তু তারা সাবাস দিয়ে বলেছিল—এবার তো গন্না বেগমের দিল পুরা ফোটা গোলাবের মত খুসবু এবং রঙ ছড়াবে।

আদিল বসে বসে শুনত আর তারিফ জানাত। মধ্যে মধ্যে কুইলি খাঁ বলতেন—আসছে মুশায়রাতে তোমার গজল শুনব বলে আশা করে আসব আদিল সাহেব।

আদিলকে তখন তিনি আদিল সাহেব বলতে আরম্ভ করেছেন। আদিলের সর্বাঙ্গে তখন নওজোয়ানীর ছটা ফুটছে। লম্বা হয়ে উঠেছে। অল্প অল্প দাড়ি গোঁফ দেখা দিয়েছে। গলার আওয়াজ ভারী হয়েছে। তার পোশাক পরিচ্ছদ সেই পুরানো কালের মত মলমলের হলেও সে পোশাক এখন ধবধবে সাদা এবং পরিচ্ছন্ন। মাথার টুপিতে সামান্য কিছু কাজ দেখা যায়। সে কাজ তার নিজের হাতের। পায়ের নাগরায় সামান্য একটু জরির কাজ। সে জরি সাধারণ। তাতে সোনা রূপা নেই।

আদিল সাহেব শুনে হাসত। বলত—জনাব, দুনিয়ায় খোদার সৃষ্টিতে শুধু ফুলই নেই। সে ফুলের খুসবু আর মধু ভোগ করতে ওর তারিফ করতে খোদাই তৈরী করেছেন মৌমাছি। ভ্রমর। আমি ফুল নই জনাব। আমি মৌমাছি !

এর পরের মুশায়রাতেই গন্না গজল গাইলে পর্দার ওপাশ থেকে ! গেব্রিয়েল এসে ফকীরকে জিজ্ঞাসা করলে—ফকীর, খোদার মহিমা কি উপলব্ধি করেছ ? ফকীর মধুর পাত্র আর খুসবুর শিশি সামনে ধরে বললে—উপলব্ধি কি বলছ স্বর্গদূত এই দেখ আমি তা সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছি—নিজে আস্বাদন করি সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে আস্বাদন করাই। গেব্রিয়েল প্রশ্ন করলে—ফকীর, তুমি কি—মধুমক্ষিকা যে ফুল থেকে এই খোদার মহিমা সংগ্রহ করেছে—তার দিকে কখনও তাকিয়ে দেখেছ ? নিজে কি তুমি ফুলের মত ফুটতে পেরেছ ? ওই মধু এবং খুসবু কি তোমার মধ্যে বিকশিত হয়েছে ? তুমি ফুল হয়ে ফোটো ফকীর—তোমার মধু আর খুসবুতে খোদা খুশী হয়ে উঠুন !

ওয়া ওয়া শব্দে ভরে উঠেছিল আসর। কুইলি খাঁ বলেছিলেন আদিল সাহেবকে—আদিল সাহেব, এরপর আর তোমার গজল রচনা না করে উপায় নেই !

সেদিন সুরাইয়া মেয়েকে প্রশ্ন করেছিল—এ তুই কি করলি গন্না ?

হেসে গন্না বলেছিল—মৌমাছির চাকে একটা খোঁচা দিলাম মা।

—কি দরকার ছিল ?

—মধু ঝরে তো ঝরুক না খানিকটা।

—উহুঁ !

—কি বলছ তুমি ?

—আমি নওজোয়ানীর সময় তওয়াইফ ছিলাম গন্না। নওজোয়ানীর সময় মন কি খেল্ খেলে তা আমি জানি। এ খেল্ না খেল্‌না বেটী ! বেটী, চন্দনের কাঠ ঘষে তা অঙ্গে মাখলে সর্বাঙ্গ জুড়োয়। কিন্তু হিন্দুরা চন্দন কাঠে মুর্দা পুড়িয়ে ছাই করে। চন্দন কাঠের আঙরা আর সাধারণ আঙরায় তফাত নেই। ও ভস্ম গায়ে মাখলে দুনিয়া কাছ থেকে সরে যায়—সার হয় ফকীরী। সংসারে ফকীরিতে খোদার মেহেরবানি কতখানি তা জানি না, কিন্তু সংসারের মা বেটা স্বামী স্ত্রী ভাই বহেন—এদের নিয়ে আনন্দের মধ্যে যে মেহেরবানি খোদার, যাতে বুক জুড়োয় মন ভরে তা নেই। আদিল সেই হিন্দুদের চিতার জন্যে চন্দনের কাঠ। পুড়ে ওকে ছাই আর আঙরা হতেই হবে ! উজীর-এ-হিন্দোস্তান নবাব সফদরজঙ্গ ওকে ওই পোড়াবার জন্যেই মওজুদ করে রেখেছেন। এ কথা আমার কাছে তুই শুনে রেখে দে। দেখবি কিছুদিন পরেই আহম্মদ শার সঙ্গে উজীরের লাগবে খিটিমিটি। তার দেরি নেই খুব। সেই ঝগড়ায় লড়াইয়ের আগুন জ্বলবে—তাতে চন্দন কাঠ হয়ে পুড়তে হবে আদিলকে।

সুরাইয়া বেগমের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। বছরখানেকের মধ্যেই লেগেছিল উজীর আর বাদশার ঝগড়া।

নবাব সফদরজঙ্গ তখন রোহিলখণ্ডে রোহিলাদের সঙ্গে লড়াই করছেন—দিল্লীতে আহম্মদ শা আর উধম বাঈ খোজা জাভিদ খাঁকে নিয়ে দিল্লী শহর চালাচ্ছে—বাজারে তোলা আদায় হচ্ছে—খরচ চলছে রঙ্গমহলের আর বাদশার ; আর ষড়যন্ত্র হচ্ছে ইন্তিজামউদ্দৌলার মা শোলাপুরী বেগমের সঙ্গে উধম বাঈয়ের সফদরজঙ্গকে তাড়াবার জন্যে। এরই মধ্যে কাবুল থেকে আবার এল আবদালী লাহোর পর্যন্ত। মইন-উল-মুল্ককে বন্দী করে রেখে সুবা লাহোর সুবা মুলতানে আফগানী ঝাণ্ডা গেড়ে দিয়ে পাঠালে তার এক মনসবদারকে দিল্লী।

কালান্দার বেগ আফগানী আবদালীর চিঠি দিয়ে মাথা উঁচু করে বললে—দুরি দুরানী শাহ আহম্মদ শাহ আবদালী কাবুল কান্দাহার আফগানিস্তানের বাদশাহ দুনিয়ার রুস্তম আপনা পাঞ্জা আর তলোয়ারের জোরে দখল করেছেন সুবা লাহোর সুবা মুলতান। আর দিল্লীর বাদশাহের কাছে দাবি করেছেন পঞ্চাশ লাখ সিক্কা। এ দাবি বিলকুল খোদাতায়লার নামে। কেন না এ সবই তাঁর উপর খোদার মেহেরবানি। বাদশা কি বাদশাহের কোন বদমাশ তাঁবেদার যদি এতে নারাজী হয় তবে আবদালীর গোসা পড়বে তার উপর।

গোটা দিল্লী দরবারে এমন কোন আমীর ছিল না যার গলা দিয়ে এক টুকরাভর আওয়াজও বের হয় এর জবাবে। শুধু দেওয়ান-ই-আমের পাথরের থামগুলোয় আর লাল কিল্লার পাঁচিলের গায়ে খিলানে খিলানে আফগানী কালান্দার বেগের কথাগুলো ফিরে ফিরে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। বাদশা আহম্মদ শাহ নাকি ভয়ে কেঁপেছিলেন। তারপর কালান্দার বেগকে বহুৎ খাতির করে পঞ্চাশ লাখ টাকা আর খেলাৎ দিয়ে মেনে নিয়েছিলেন আবদালীর দাবি।

উজীর কুমায়ুন রোহিলখণ্ড থেকে ফিরে কপাল চাপড়ে বলেছিলেন—হা রে হা হিন্দোস্তানের নসীব—হা রে চাঘতাই বাদশাহীর নসীব—একজন মর্দানা কেউ ছিল না এর জবাব দিতে ? তারপরই বলেছিলেন—থাকবে কোথা থেকে ? লাল কিল্লার সুবাদার হয়েছে একজন খোজা।

এই শুরু হয়েছিল ঝগড়া। আহম্মদ শাহ উধম বাঈ শোলাপুরী বেগম ইন্তিজামউদ্দৌলা আর আর সঙ্গে নবাব সফদরজঙ্গের ধরমবেটা সতের আঠার বছরের চতুর ইমাদ রোহিলা আফগানদের ডেকে জোট পাকিয়েছিল ; সুন্নীদের জোট সিয়া উজীর সফদরজঙ্গের বিপক্ষে।

সফদরজঙ্গ বলতে গেলে একলা। কেবল ভরসা সালাবৎ খাঁ। আর লড়াইয়ে ভরসা রাজেন্দার গিরি গোসাঁই। লড়তে গিয়ে সরতে হল দিল্লী থেকে। তখন হাত মেলালেন বল্লভ-গড়ের সুরজমলের সঙ্গে। দিল্লী থেকে বেরিয়ে এলেন ফৌজ নিয়ে। ভেবেছিলেন চলে যাবেন ফিরে লক্ষ্ণৌ। ওদিকে উজীর হল ইস্তিজাম। তার তাঁবু হতে ইমাদ পালিয়ে গিয়ে জুটল বাদশাহের সঙ্গে।

সফদরজঙ্গের এবার মনে পড়ল আকবর আদিলকে। একদিন দিল্লীর বাইরে নবাবসাহেবের ছাউনি থেকে চিঠি নিয়ে সওয়ার এল লক্ষ্ণৌ। কুইলি খাঁর নামে চিঠি। "আকবর আদিল শাহকে বাদশাহের ইজ্জৎ আর খাতির দিয়ে লক্ষ্ণৌর ফৌজ সঙ্গে যত তুরন্ত পার এখানে চলে এস। আহম্মদ শাহের বাদশাহী খতম হবে—শুরু হবে আকবর আদিলের বাদশাহী। শাহ আকবর আদিল শাহ বাদশাহ গাজী! লক্ষ্ণৌ মসজেদে হিন্দোস্থানের বাদশা বলে খত্‌বা পড়াবে। তোপ দাগবে। নাকাড়া বাজিয়ে জানিয়ে দেবে—"নতুন বাদশাহ হলেন আকবর আদিল শাহ বাদশাহ গাজী।"

চিঠিখানা কুইলি খাঁ সুরাইয়াকে গন্নাকে দেখিয়েছিলেন।

সুরাইয়ার চোখ যেন অনেক দূরে গিয়ে কিছু দেখছিল। গন্নার চোখে জলে উঠেছিল রোশনি।

সুরাইয়া দেখছিল। কি দেখছিল সে-ই জানে।

আদিল সাহেব বলেছিল—খান-ই-জমান সাহেব জনাব আলি, এই তো নসীবের খেল! কিন্তু খোদাকি মর্জি কি বলতে পারেন?

মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন কুইলি খাঁ। এই তরুণটির কথার জবাব তিনি হট করে দিতেন না। দেবার আগে ভেবে দেখতেন।

কুইলি খাঁ কুর্নিশ করে বলেছিলেন—জাঁহাপনা, এখন থেকে আপনি হিন্দোস্তানের বাদশা। এই খোদার মর্জি!

—আমার ইনসানির ইজ্জৎ নিমকের দাম কি এতে শোধ হবে জনাব আলি ওয়ালা সুলতান?

কুইলি খাঁ চমকে উঠেছিলেন কথা শুনে, বলেছিলেন—জাঁহাপনা—

বাধা দিয়ে আদিল শাহ বলেছিল—না জনাব—বলুন আদিল সাহেব। কিছু বখ্‌তের জন্যে বাদশাহী সরিয়ে রাখুন। আমি এখনও ওটা নিই নি। আপনি আমার শিক্ষক—আলেম। আমাকে তেমনি চোখে দেখে বাত বলুন।

কুইলি খাঁ বলেছিলেন—আদিল সাহেব, তুমি ভয় পাচ্ছ? সত্য কথা বলো। কিন্তু ভয় পাবার তোমার কিছু নেই এ আমি বলছি। আমি বাদশাহী খেলা খেলি না। কিন্তু বুঝি। সারা হিন্দোস্তানে এখনও নবাব সফদরজঙ্গ বাহাদুরের মত হিম্মৎ আর কলিজাবালা আর কেউ নেই। এত বড় ফৌজও আর কারুর নেই। ভয় তুমি করো না।

আদিল হেসে বলেছিল—জনাব, আমার আব্বাজান বাদশাহী বংশের শাহজাদা। সে-লালসা সে-লোভ ছেড়ে চলেছিলেন হজে। মা আমার চাষীর বেটী। কিন্তু এমন মা আর হয় না। কখনও আল্লা ছাড়া কারও কাছে রোটি চায় নি। আমি জন্মেছিলাম সামান্য ঝোপড়িতে—একদম মাটির উপর। তারপর আব্বা চলে গেলেন, বলে গেলেন—চাঘতাই বাদশাহীর ইজ্জৎ বাঁচাতে যাচ্ছি। জান কবুল। বলতেন মর্জি খোদাকি। আর কি হবে তাও

মালুম খোদাকে। তারপর পয়দলে আধা হিন্দোস্তান হেঁটেছি। গোলাম হয়ে বিক্রী হতে এসেছি দিল্লীতে। ভয় আমার কোথায় ? হবে কেন ? তা নয়। আপনি বহুৎ হিসাব জানেন —হিসাব আমার আসে না। বলুন তো বাদশাহ হয়ে গর্দান যদি যায় তা হলে কি নবাব-সাহেবের নিমক শোধ যাবে ?

কুইলি খাঁ বলেছিলেন—ফকীরী নিয়ে তুমি তুনিয়ার মাটিতে পয়দা হয়েছ আদিল সাহেব—বাদশাহী তাজ পরে তোমার যে যন্ত্রণা হবে তাতে তোমার সারা জিন্দগীর দেনা শোধ হয়ে যাবে। আর তুমি বাদশাহ হলে বাদশাহী হয়ে উঠবে খোদার মসজেদ।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা নিজে এসে হাজির হয়েছিল আদিল শাহ্ খান-ই-জমানের বাড়িতে। পোশাক তার সেই মলমলই ছিল শুধু মাথায় ছিল মূল্যবান শিরপেঁচ আর পায়ে মূল্যবান সোনার জরিদার নাগরা। এসেছিল ঘোড়ায় চড়ে। সঙ্গে ছিল সওয়ার। তখনও নাকাড়া বাজিয়ে ঘোষণা করা হয় নি বাদশাহ আকবর আদিল শাহ গাজীর নাম।

সসম্ভ্রমে তাকে সম্ভাষণ করেছিলেন কুইলি খাঁ। জাঁহাপনা বলে সম্বোধন করেছিলেন; বলেছিলেন—এ কি অঘটন আপনি ঘটাচ্ছেন। কাল আপনার নামে খত্‌বা পড়া হবে। সারা হিন্দোস্তান জানবে আপনি বাদশাহ হলেন—আর আজ সন্ধ্যায় এ কি—? এইভাবে কি একজন সামান্য পাঁচহাজারী মনসবদারের বাড়ি—?

আদিল সাহেব বলেছিল—জনাব আলি, আজ পর্যন্তই আমার আধা স্বাধীন জীবনের পরমায়ু। কাল থেকেই হব আমি বাদশাহীর কানুনের জিঞ্জিরে বন্দী। আজ হঠাৎ কি খেয়াল হল এক গজল বানিয়ে ফেললাম। শোনাতে এলাম আপনাকে বেগমসাহেবাকে আর সাহেব-জাদীকে। আমার প্রথম কবিতা—হয়তো শেষ কবিতা!

কুইলি খাঁ সেদিন ঠিক-বেঠিক বিবেচনা করেন নি—নিজে গিয়ে ডেকে এনেছিলেন সুরাইয়াকে এবং গন্নাকে।

তারা কুর্নিশ করেছিল আদিল শাহকে।

আদিল শাহ বাধা দিয়ে বলেছিলেন—বেগমসাহেবা, তুমি আমারও আম্মাজানের মত। আর আজও আমি বাদশা নই। আজ আমি নতুন সায়ের এসেছি ওয়ালা সুলতান সুরাইয়া বেগম আর গন্না বেগম হিন্দোস্তানের তিন বিখ্যাত কবির কাছে, আমার প্রথম গজল শোনাতে।

"রাত্রির চাঁদকে দেখেছ ? দেখ নি। কারণ তোমরা বল চাঁদ হাসে। কিন্তু আমি দেখেছি চাঁদ হাসে না। চাঁদ কাঁদে! হাসিমুখেই সে কাঁদে। সেদিন দেখলাম শেষ রাত্রির শান্ত পৃথিবী—চাঁদের হাসির রোশনিতে তুনিয়ায় যেন জলুস লেগেছে। কিন্তু দেখলাম ঘাসের ডগায় গোলাপের পাপড়িতে অজস্র অশ্রুবিন্দু টলমল করছে! কে কাঁদল ? চাঁদ বললে—আমি। আমি অবাক হয়ে বললাম—চাঁদ, তুমি কাঁদ ? কেন কাঁদ ? চাঁদ বললে—খোদার মর্জিতে কাঁদাই আমার নসীব। দিন তুনিয়ার মালিক আমাকে তাপ দেন নি। আমি হিম। আমি মনে করি আমার হাসির হিমে গুলাব সে আরও তাজা সুরতে ঝলমল করে উঠবে। কিন্তু নসীব আমার! আমার রোশনির হিমে গুলাবের পাপড়িতে পাপড়িতে মৃত্যুর ছায়া ঘনায়। দলগুলি একটির পর একটি খসে পড়ে। আমি তাই কাঁদি। কাঁদি আর বলি—আমার মধ্যে আছে মরণের স্পর্শ—তুনিয়া, রাত্রে তুমি ঘুমিয়ো—আমার ছোঁয়াচ লাগিয়ো না! গুলাব, রাত্রে তুমি মুখ লুকাও! আমি নিঃশব্দে কান্না শেষ করে চলে যাই পশ্চিমে—অশ্রুর শেষ বিন্দুটি খোদাতায়লার দরবারে নিবেদন করে বলি—ছুটি দাও মেহেরবান আমাকে চির-

কালের মত।"

কবিতার ভাবে আবৃত্তির সুরে এমন একটা কিছু ছিল যাতে তিনজন শ্রোতা এমন কি সারা কামরাখানির বাতাস যেন বেদনায় ভারী হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন তিনজনেই। গন্নার চোখে জল এসেছিল। সে মুখ নামিয়েছিল লজ্জার ভানে কিন্তু সুরাইয়া বুঝেছিল সে কাঁদছিল।

আলি কুইলি বলেছিলেন—এত দুঃখ আপনার কেন হিন্দোস্তানের ভাবী বাদশা?

আদিল বলেছিল—খোদার মর্জিতে এই আমার নসীব জনাব্। এই জন্যেই সমস্ত দুনিয়া থেকে দূরেই আমি থেকেছি—থাকতে চাই। তবুও খোদার মর্জিতে ইজ্জৎ রাখবার জন্যে আজ আমাকে হিন্দোস্তানের আসমানে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ বা দ্বিতীয়ার চাঁদের মত উঠতে হচ্ছে। স্রিফ দু' দণ্ডের জন্যে—তারপরই হবে আমার ছুটি!

—কেন—তুমি পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে পালা শেষ করবে না কে বললে?

—আমার কিসমৎ আমি জানি খান-ই-জমান সাহেব!

এর পরই লক্ষ্ণৌ প্রাসাদে রাত্রি প্রহরের ঘড়ি বেজেছিল—নাকাড়াখানায় বেজে উঠেছিল বেহাগের সুর।—শুনু যা শুনু যা পিয়া শুনু যা—।

সেলাম করে উঠে পড়েছিল আদিল সাহেব। কাল হবেন বাদশাহ আকবর আদিল শাহ গাজী—হিন্দোস্তানের মালিক—হিন্দুরা বলে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। মুসলমানরা বলবে—খোদাতায়লার প্রতিভূ। কাল থেকে আদিল শাহ বাদশাহ সকলের কাছে আপনি—তুমি নয়। সে কাউকে অভিবাদন করবে না, সকলে তাকে অভিবাদন করবে। আদিল সাহেব হেসে বলেছিল—আপনাদের কাছে এই বোধ হয় শেষ বিদায় নিয়ে যাচ্ছি।

আদিল সাহেব চলে গিয়েছিল। সুরাইয়ার চোখ সজল হয়েছিল—গন্না পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল।

রাত্রে সুরাইয়া কুইলি খাঁকে বলেছিল—নবাব সফরদরজঙ্গকে বলে গন্নার সঙ্গে আদিলের সাদী দাও না। সে কিছুদিন আগে নিজেই গন্নাকে বারণ করেছিল—গন্না, ওকে নিয়ে খেলবার সাধ করিস নে। ও চন্দন কাঠ হলেও ওকে ঘষে মেখে শরীর ঠাণ্ডা করা যাবে না। ও চিতায় পুড়ে আঙরা হবে। তবু আজ এই মুহূর্তটিতে এই সংকল্পটি করেছিল সুরাইয়া।

কুইলি খাঁ বলেছিলেন—আমি আদিলকে আগে বলেছিলাম—তখনও বাদশাহীর কোন কথা ওঠে নি। আদিল বলেছিল—না জনাব আলি, আপনার বেটী বেহেস্তের হুরী—হিন্দুরা যাকে বলে দেবী তাই। আমার মত বি-সমৎ যার তার সঙ্গে সাদী তার হয় না। তা ছাড়া আমার জিন্দগী আজ আছে কাল নেই। আজমীরে ইমাম আমাকে বলেছিলেন—দুখ তোকে অনেক পেতে হবে। খোদাকে মনে রেখে সয়ে যাস, আনন্দ পাবি। নইলে তোকে আত্মহত্যা করতে হবে।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—ওই যে এত নরম নওজোয়ানটিকে দেখ ওর সেটা শুধু বাইরের চেহারা। ভিতরে ও লোহার চেয়ে শক্ত।

সুরাইয়া বিষণ্ণ চিত্তেই চুপ করে থেকে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। সকালে উঠে বাঁদীর কাছে শুনেছিল গন্না কাল সারারাত্রি ঘুমোয় নি। উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে।

তার পরের ব্যাপার হিন্দোস্তানের লোক জানে। তিন বছর আগে ১১৭২ হিজরীতে হিন্দোস্তানীদের চৈত্র 'মাহিনায়' একদিন ফৌজ সাজিয়ে—বড় হাতীর উপর নবাব সফদরজঙ্গের

সোনার হাওদা চড়িয়ে—তাতে কিংখাব সাটিনের মুক্তো গাঁথা ঝালর চাঁদোয়া লাগিয়ে আকবর আদিল শাহ গাজীর নাম ঘোষণা করে নাকাড়া বাজিয়ে বাদশাহী জলুস বের হয়েছিল লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লীর মুখে।

নবাব সফদরজঙ্গ দিল্লীতে ঘোষণা করেছেন—বাদশাহ আহম্মদ শাহের বাদশাহী খতম হয়ে গেল। হিন্দোস্তানের নতুন বাদশা, শাহ গাজী আলমগীরের বেটা শাহ কামবক্সের বেটা ফিরুজজঙ্গ বাহাদুরের বেটা আদিল শাহ বাদশা হয়েছেন হিন্দোস্তানের। হিন্দোস্তানের বাদশাহ আকবর আদিল শাহ বাদশাহ গাজী!

আদিল শাহ বলেছিল—নসীবের খেল।

নসীবের খেলাই বটে। নসীব দুনিয়ার সব মানুষকে নিয়েই খেলা করে। কিন্তু এখন তার কি খেয়াল হয়েছে সে-ই জানে; হিন্দোস্তানের বাদশাহদের নিয়েই সে—ছোট্ট লেড়কী যেমন মাটি নিয়ে পুতুল গড়ে আর ভেঙে খেয়ালের খেলা খেলে তেমনি ভাবেই—খেলতে শুরু করেছে আর তাতেই মেতে উঠেছে। এত বড় দেশ হিন্দোস্তান—এত মানুষ এত জন—এদের নসীব তো একরকম ঠিকই হয়ে আছে। ভুখে মরবে এরা, দুখ পাবে এরা, বেমারি লাগবে তাতে মরবে; রাজা নবাব এরা লড়াই করবে।—তাতে এদের ঘর জ্বলবে—এরা পুড়বে, খুন হবে, এদের ঔরৎ কাড়বে, ঝড় উঠবে—দরিয়ায় তুফান হবে তাতে এরা মরবে—এ তো সবই ঠিক আছে। সেই দুনিয়ার প্রথম দিন থেকেই ঠিক আছে। কিন্তু হিন্দোস্তানের বাদশাহীতে বাদশা শাহজাহানকে প্রথম নিজের ছেলের হাতে বন্দী করে এ খেলের পত্তন করেছে নসীব। শাহজাদা দারা শিকো কোতল হয়েছিল। সুজা মরেছিল। মুরাদ মরেছিল। নসীব তাদের খতম করিয়েছিল আলমগীরের হাত দিয়ে। তারপর থেকে হানাহানি কাটাকাটি কত যে হয়ে গেল সে দেখে হিন্দোস্তানের মানুষ অবাক হয়ে গিয়েছে।

শুধু বাদশা নয়, বাদশার সঙ্গে উজীর।

বারা সৈয়দ ভাইয়েরা ফরুকশিয়রকে মসনদে বসিয়ে শেষে তারাই তাকে চোখ গেলে দিয়ে খতম করেছিল। তারপর পর পর দুই বাদশা ক'মাসের জন্যে। কেউ বলে তারা আপনি মরেছে, কেউ বলে বারা সৈয়দরা তাদের জহর খাইয়ে মেরেছে। তারপর মহম্মদ শা। মহম্মদ শাকে বাদশা করলে বারা ভাইয়ারা। মহম্মদ শা মারলেন সৈয়দদের। মহম্মদ শাকে ঘায়েল করে গেল নাদির শা। তারপর আহম্মদ শা। আহম্মদ শার সঙ্গে উজীর সফদরজঙ্গের লড়াই। সফরদরজঙ্গ বাদশা বলে তুলে ধরলেন আদিল শাহকে।

আদিল শাহ আপন কিসমৎ ঠিকই জানত।

লাল কিল্লায় সে ঢুকতে পায় নি। সফদরজঙ্গের ছাউনিতে কিংখাব মখমল সাটিনের পর্দা চাঁদোয়া দিয়ে সাজানো দরবারে কাঠের কুরসিতে বসে বাদশাহী করেছে সাত আট মাস। হিন্দুদের বৈশাখ থেকে আঘন পর্যন্ত। বাস্। হয়ে গেল তার বাদশাহী। সফদরজঙ্গ হেরে গেলেন আহম্মদ শার কাছে। নতুন উজীর ইন্তিজামউদ্দৌলা মীরবক্সী ইমাদউদ্দৌলা গাজিউদ্দীন নিয়ে হারিয়ে দিলেন সফদরজঙ্গকে। নসীব আদিল শাহের আর নসীব সফদরজঙ্গের—রাজেন্দর গিরি গোসাঁইকে সফদরজঙ্গের নিজের সিপাহীই গুলি করে মারলে। ডান হাত ভেঙে গেল সফদরজঙ্গের—সফদরজঙ্গ ফিরে এলেন দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌ।

সুরাইয়াকে কুইলি খাঁ বলেছিলেন—ফেরার সময়েও নবাব সফদরজঙ্গ কিংখাব মখমল সাটিনের বাহার দেওয়া হাওদায় চড়িয়েই এনেছিলেন আদিল শাহকে।

আদিল শাহ সেই পুরানো আদিল শাহ।

মুখের হাসি তার ফুরোয় নি এক দিনের জন্য। সে কাঠের কুরসিতে বসে ক'গাহিনার বাদশাহীর মধ্যেও না; বাদশাহী খেল খতম করে ফেরার পথেও না।

শুধু একদিন। দিল্লী থেকে ফিরে এসে কুইলি খাঁ বলেছিলেন—সুরাইয়া, শ্রিফ একদিন দেখেছিলাম আদিল শাহের বাদশাহী। বাদশাহ আদিল শাহ যেন কিছুক্ষণের জন্যে দেখা দিয়ে বাস লুকিয়ে গেল পুরানো শান্ত বিষণ্ন আদিল সাহেবের মধ্যে। কালীপাহাড়ীতে লড়াইয়ে মনসবদার ইসমাইল খাঁ বেইমানি করে তার এক সিপাহীকে দিয়ে পিছু থেকে গুলি করে মারলে রাজেন্দর গিরি গোসাঁইকে। গিরি গোসাঁই পিঠের দিকে মন্তর বন্ধন কখনও করতেন না। বলতেন—আমার ধরমে দুশমনের দিকে পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে এলে আমার দোজখ হয়ে যাবে। পিঠে মন্তর বন্ধন করলে দুশমন যখন জোর লড়াই দেবে তখন পিছু ফিরে পালাবার মতলব হবে। তাই করি না। পিছু ফিরলেই মরতে হবে। কিন্তু নিজের দল থেকে কেউ মারবে এ গোসাঁই জানত না। ইসমাইল খাঁর বড়া গোসা ছিল গোসাঁই-এর উপর। সে সিপাহীকে দিয়ে মারলে। খবর যখন এল তখন একটা আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম সুরাইয়া। যেন কোন শের গর্জন করে উঠল। মুখ তুলে দেখলাম—বাদশাহ। মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। হাত তাঁর কোমরের তলোয়ারে। চীৎকার করে উঠলেন—মনসবদার ইসমাইল খাঁর শির কেউ এনে দিতে পার? কেউ পার? উজীর চমকে উঠে বললেন—চুপ করে যাও বাদশা। চুপ করে যাও। রাজেন্দর গিরি গোসাঁই নেই—ইসমাইল খাঁ শুনতে পেলে এখুনি তার ফৌজ নিয়ে চলে যাবে আহম্মদ শাহের দিকে। চুপ করে যাও। তারপর হুকুম দিলেন—ওই সিপাহীর শির নিয়ে এস বাদশাহের কাছে। চমকে উঠলেন বাদশাহ আদিল। বললেন—ঠার যাও। তারপর উজীরকে বললেন—বাদশাহ হিসেবে এই হুকুমই আমার শেষ হুকুম উজীরসাহেব—এই হুকুম যাতে থাকে তার ভার উজীর হিসেবে রইল আপনার উপর। ওই সিপাহীর অঙ্গ যেন কেউ না স্পর্শ করে। গিরি গোসাঁই মহারাজের মৃত্যুর সব দায় থেকে আমি ওকে মাফি দিয়ে দিলাম। বলেই ঢুকে গেল ভিতরের তাঁবুতে।

নবাব সফদরজঙ্গ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ওই সিপাহীকে ভেবেছিলেন প্রথমে হাত কেটে পরে গর্দান কেটে সাজা দেবেন। বলবেন—যে সিপাহী এমন নিশানা ভুল করে নিজের লোককে গুলি করে, তার হাত কেটে দেওয়াই হল সাজাই। আর রাজেন্দর গিরি গোসাঁইকে মেরেছে এর জন্যে গোসাঁই ফৌজ অসন্তুষ্ট হয়েছে—তার জন্য যাবে ওর গর্দান। কিন্তু আদিল শাহ বন্ধ করে দিলেন। সফদরজঙ্গ অসন্তুষ্ট হলেও এটা মেনেছিলেন।

ফল তার ভাল হয় নি।

গোসাঁই পলটন আর তেমন করে লড়ে নি। লড়াই করত তারা আলাদা হয়ে। পিছনে কোন নবাবী সিপাহী থাকতে দিত না।

তারপর, সুরাইয়া, সেই পুরানো আদিল সাহেব। সেই পুরানো কথা। সেই পুরানো মিঠা হাসি।

জয়পুরের রাজা মাধো সিং এসে মিটিয়ে ফয়সালা করে দিলেন সফদরজঙ্গের সঙ্গে। সফদরজঙ্গ বলেছিলেন—আদিল শা, তোমার জন্যে একটা জায়গীরের কথা বলেছি আমি।

আদিল শা বলেছিল—আমি আর বাদশা নই নবাবসাহেব—আমি সেই গোলাম হিসেবে বিক্রী হতে আসা আদিল। আপনার মেহেরবানিতে আমি অনেক পেয়েছি। আপনার নিমক শোধ করতে গর্দানের উপর তলোয়ার ঝুলিয়ে মেকী বাদশাহী করেছি। আর আমাকে আপনার ঋণে আবদ্ধ করবেন না নবাবসাহেব। জায়গীর আমার চাই না, তনখা আমার চাই

না। চাই আমি ছুট্টি। আর কিছু না।

সফদরজঙ্গ সাহেবের চোখও ছলছল করেছিল। তবু তিনি ছাড়েন নি আদিলকে। সেই কিংখাব-মখমলে মোড়া হাওদায় চড়িয়ে এনেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। আগ্রায় এসে মনসবদার অমর সিং-এর হাতে তাকে দিয়ে বললেন—এঁকে আগ্রার কিল্লাদারের হাতে দিয়ে এসো জিম্মা।

অর্থাৎ পুরা বন্দী হল আদিল।

আদিলের মুখের দিকে চাইলেন—সে হেসে বললে—মর্জি খোদাকি খেল নসীবকা—সালাম নবাবসাহেব—সালাম ওয়ালা সুলতান সাহেব। এই আমার নসীব! আমি জানতাম।

* * * *

খেল নসীবেরই বটে। নসীব, ওই ছোট মেয়ের মাটির পুতুল গড়ে আর ভেঙে খেলার মত, বাদশা উজীর নিয়ে খেলছে। আদিল শাহই আগ্রার কিল্লায় বন্দী হল না, দু'তিনটে মাস যেতে না যেতে নসীব প্রথম বাদশাহ আহম্মদ শাহের হাত দিয়ে ভাঙলে উজীর পুতুল ইন্তিজামউদ্দৌলাকে। উজীর করলেন ইমাদউদ্দৌলাকে। ছোটখাটো মানুষ, কটা চোখ লালচে চুল তুরানী চেহারা, নিজাম উল মুল্ক ঘরের ছেলে। ইমাদ উল মুল্ক উজীর হল। নসীব ইমাদকে দিয়ে প্রথমেই এবার ভাঙলে বাদশাহ পুতুল আহম্মদ শাহকে। চোখ দুটো কানা করে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে পুরানি কিল্লার সেই ঘরে। সঙ্গে গেল ওই তয়ফাওয়ালী মা উধম বাঈ বেগম।

নসীব তখন পাঠালে ইমাদকে—সে নিয়ে এল নতুন বাদশাহ পুতুল ষাট বছরের বৃদ্ধ শাহজাদা মৈজুদ্দীনকে—বাহাদুর শাহের বেটার বেটাকে। নকীব পুকার দিয়ে উঠল—বাদশাহ আলমগীর গাজী!

আগ্রার কিল্লায় বন্দী অবস্থায় এ সব খবর নিশ্চয় পেয়েছিল আকবর আদিল শাহ। নিশ্চয় বলেছিল—মর্জি খোদাকি খেল নসীবকে! ইজ্জৎ আহম্মদ শাহ বাঁচাতে পারেন নি! আহম্মদ শাহ ইমাদের বাদাকশাহী সিপাহীদের ভয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়েছিলেন। তারা তাঁকে টেনে বের করে এনে নিয়ে গিয়েছিল সেই ঘরে, যে ঘরে ফরুকশের মরেছিলেন—তার আগে জাহান্দার শাহ লালকুঁয়র মরেছিলেন—সেই ঘরে। মুখে শাল চাপা দিয়ে মা উধম বাঈকেও টেনে এনে ফেলে দিয়েছিল ওই ঘরে। হায় নসীবকে খেল—আহম্মদ শাহ মাটির পুতুলের মত নাচলেন সে খেলায়। ইজ্জৎ বাঁচাতে পারেন নি। ভয়ে চীৎকার করেছিলেন—পানি! পানি! পানি!

ইমাদের লোক তাঁর মুখের কাছে তুলে দিয়েছিল নোংরা একটা ভাঙা মাটির ভাঁড়ে খানিকটা ময়লা জল!

নসীব খিলখিল করে হেসেছিল। ইজ্জৎ বাঁচাতে পারেন নি বাদশা আহম্মদ শাহ।

* * * *

এরপর আদিল নসীবের খেল—সেও বিচিত্র।

কুইলি খাঁই একদিন বলেছিলেন—দেখ তো সুরাইয়া খোদার কি মর্জি আর নসীবের কি মর্জি আর নসীবের কি খেল! খবর পেলাম আগ্রা কিল্লার ভিতর আদিল শাহের চিচক (বসন্ত) হয়েছে! এমন চিচক যে ভয় পেয়ে কিল্লার অন্য লোকেরা তাকে কিল্লা থেকে বের করে বাইরে গাছতলায় এক ঝোপড়া বানিয়ে রেখে দিয়েছে। মাথার কাছে মাটির হাঁড়িতে জল দিয়েছে আর ক'খানা রুটি! বাঁচবে না বোধ হয়।

মন খারাপ হয়েছিল সুরাইয়ার। সেদিন মা বাপের সামনেই গম্মার চোখ দিয়ে টপ টপ করে

জল ঝরে পড়েছিল।

সুরাইয়া বলেছিল—ভুলে যা গন্না ভুলে যা! তাকে ভুলে যা। গন্না শুধু কেঁদেছিল।

মাসখানেক পর খবর এনেছিলেন কুইলি খাঁ—বিচিত্র নসীবের খেল আর খোদার মর্জি—ওই ঝোপড়িতে একলা পড়ে থেকে বেঁচেছে আদিল শাহ। মরে নি। কিন্তু কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না।

এতকাল পরে সুরাইয়া ইকবালকে বললেন—ইকবাল, তুমি বলতে পার খোঁজ করতে পার কোথায় আছে আদিল শাহ? এই খোঁজ কর ইকবাল, কি এমন কোন ফকীরকে কেউ দেখেছে কি না যে বলে মর্জি খোদাকি খেল নসীবকে ইজ্জৎ ইনসানকে! মুখে চিচকরে দাগ আছে। নইলে বলতাম এমন সুন্দর দেখতে আমীরও খুব কম আছে। লক্ষ্ণৌর নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলার চেয়েও সে সুন্দর।

পাঁচ

পানিপথে সারিবন্দী চার বিখ্যাত দরগাহ। উত্তর থেকে দক্ষিণে সারিবন্দী। বাবা হাফিজ মহলের দরগাহ সব থেকে উত্তরে। তার খানিকটা পূর্বে বাবর শাহ বাদশাহের তৈরী মসজেদ। লড়াই ফতে করে তিনি এই মসজেদ স্থাপন করেছিলেন। এই মসজেদের ধারে এক অল্পবয়সী ফকীর বসে ছিল। বাদশাহী সড়ক ধরে চলেছিল দিল্লীর বাদাকশাহী ফৌজ। বসে বসে সে দেখছিল। ধুলোয় ছেয়ে গেছে চারিদিক; ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে হাতীর পায়ের চাপে পয়দল পল্টনের নাগরার ঠোক্করে গাড়ির চাকায় ধুলো উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। দিল্লীর উজীর ইমাদ উল মুল্ক গাজিউদ্দীন চলেছেন লাহোর।

ইমাদ উল মুল্ক গাজিউদ্দীন হিন্দোস্তানে বিশ বছর বয়সে উজীর হয়েছেন। তিনি বুদ্ধির খেলায় নসীবকে হার মানিয়ে ইচ্ছেমত খেল খেলিয়ে নিচ্ছেন।

ছ বছর আগে বাপ মারা যাওয়ার পর সে, পনের ষোল বছরের ছেলে, নবাব সফদরজঙ্গের বাড়িতে এসে সারা দিন রাত কেঁদেছিল এবং পরের দিন তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে বলেছিল—আপনি আমার বাপের দোস্ত ভাইয়ের মত—আপনি আমার চাচা—আমার ধরমবাপ। আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই।

উজীর-এ-হিন্দোস্তান নবাব সফদরজঙ্গ তাকে ধরমবেটা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, ছেলের সঙ্গে পাপড়ি বদল করিয়ে খোদ বেগমের কাছে নিয়ে গিয়ে শরবত মিঠাই খাইয়ে ভরসা দিয়েছিলেন। এবং বাদশাহী দপ্তরে অনুগ্রহ করে মীরবক্সী করে দিয়েছিলেন সাহেবউদ্দীনকে। ইমাদ উল মুল্ক গাজিউদ্দীন সে তখনও হয় নি। তখনও তার আসল নাম সাহেবউদ্দীন বলেই ডাকত লোকে।

সেই পনেরো ষোল বছরের ছেলে সাহেবউদ্দীন চার বছরের মধ্যে আজ হিন্দোস্তানের উজীর-এ-আজম, আমীর উল মুল্ক, ফিরোজঙ্গ ইমাদ গাজিউদ্দীন বাহাদুর। বাদশাহেরও হর্তাকর্তা।

দিল্লীর ইরানী তুরানী আফগান আমীরদের মধ্যে মাথায় ছোট। চেহারায় জবরদস্ত মানুষের কোন পরিচয় নেই। শুধু আছে দুটো চোখ। পিঙ্গল। বনবিড়ালের মত।

বুকে কোরান ঝোলানো থাকে। মুখে কোরানের বয়েৎ বলে। সুরা ছোঁয় না—নারীর দিকে তাকায় না। দুনিয়ার কোন কাজ করে আপসোস করে না। এমন কোন কাজ নেই যা সে পারে না। আহম্মদ শাহ সকালে তার হাতে কোরান দিয়ে শপথ করিয়েছিলেন—আল্লার নামে কোরান হাতে নিয়ে বল আমার অনিষ্ট করবে না। তাই করেছিল ইমাদ উল মুল্ক। তারপরই বাদশাহ তাকে দিয়েছিলেন উজীরের সোনার কলমদান। সেই কলমে কয়েকখানা কাগজে সই করেই তিনি তাঁর নিজের মনসবদারকে পাঠিয়েছিলেন—রঙমহলে ঢুকে বাদশা আহম্মদ শাকে বেঁধে নিয়ে যাও সেই হাজতে যেখানে বাদশারা বন্দী হয়ে থাকে। তার চোখ অন্ধ করে দিতে হুকুম দিয়েছিলেন। এতটুকু চাঞ্চল্য তাঁর হয় নি—মুখে কপালে বারেকের জন্য একটি রেখা জাগে নি। এই ইমাদ উল মুল্ক।

ইমাদ উল মুল্ক গোঁড়া সুন্নী। কিন্তু রোহিলা আফগানদের তিনি পরম শত্রু। কারণ তারা হিন্দোস্তানে কাবুল কান্দাহারের দুরানী রাজত্ব দেখতে চায়। কাফেরদের তিনি ঘৃণা করেন কিন্তু মারাঠা পেশোয়ার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তিনি অন্তাজী মানকেস্‌রকে দিল্লীতে আনিয়ে রেখেছেন। মারাঠা ফৌজকে মাইনে দিয়ে পুষছেন—তারা ইমাদ উল মুল্কের পিছনে আছে। আফগানদের ফারাক্কাবাদের আহম্মদ খাঁ তাঁর দোস্ত, কারণ সে ওই আফগানদের দলের নয় যারা হিন্দোস্তানে দুরানী রাজত্ব কায়েম করতে চায়। হিন্দোস্তানকে তিনি আবার টেনে তুলবেন, যে কোন উপায়ে হোক। চাঘতাই বংশের একজন শাহজাদাকে বাদশাহ রেখে তিনিই করবেন বাদশাহের উপর বাদশাহী। পাঞ্জাব দুরানী বাদশাহ আমেদ শাহ আবদালী ছিনিয়ে নিয়েছেন চার বছর আগে। লাহোরের সুবাদার মাইন-উল-মুল্ক মীর মান্নু সাহেবকে হারিয়ে লাহোর দখল করেছিলেন আবদালী। মীর মান্নু দিল্লীতে অনেক কাকুতি করে ফৌজ চেয়ে ফৌজ পান নি—টাকা চেয়ে টাকা পান নি। তিনি হেরেছিলেন। আবদালী তাঁকে বন্দী করে সামনে এনে বলেছিলেন—এবার কি হবে?

মীর মান্নু বলেছিলেন—যদি দুরানী বাদশা মুদী দোকানদার হন, বেচে দেবেন আমাকে কোন গোলাম বান্দা কারবারীকে—যদি কসাই হন কোতল করবেন আমাকে—যদি বাদশা হন তবে আমাকে মাফ করবেন। আমি যার নিমক খাই তার জন্য লড়েছি।

দুরানী বাদশা খুশী হয়েছিলেন—মাফ করেছিলেন তাঁকে। আরও খুশী হয়েছিলেন দুরানী বাদশা মীর মান্নুর বেগম মুঘলানী বেগমের সেবায়। এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে মুঘলানী বেগমকে ধরমবেটী বলে গ্রহণ করে মীর মান্নুকেই লাহোরে তাঁর সুবাদার করে গিয়েছিলেন। মীর মান্নু মইন উল মুল্ক নিমকহালাম ইমানদার মুসলমান। তিনি চাঘতাই বংশের হিন্দোস্তানের বাদশাকে দিতেন তাঁর প্রাপ্য—সুবা লাহোর সুবা মুলতান বাদে বাকী পাঞ্জাবের হিন্দোস্তানী অধিকার রক্ষা করতেন—আবার ওদিকটা লাহোর থেকে আটক পেশওয়ার পর্যন্ত এলাকায় দুরানী অধিকার রক্ষা করতেন। ইমাদ উল মুল্ক অর্থাৎ সাহেবউদ্দীন মীর মান্নুর আপন ভাগ্নে।

উজীর হয়ে ইমাদ উল মুল্ক এই ইমানদার মামাকে আরও গাঢ়তর আত্মীয়তায় আবদ্ধ করে নিজের দিকে আনবার মতলব করে মীর মান্নুর কন্যা উমধা বেগমের পাণিপ্রার্থনা করে লোক পাঠিয়েছিলেন। মীর মান্নু নিজে সুন্নী। তিনি এই তরুণ ভাগ্নেটির বিস্ময়কর অভ্যুত্থান দেখে এবং সুরা স্পর্শ করে না নারীর দিকে চায় না শুনে এ প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন মাস আষ্টেক আগে। কিন্তু তার পরই হঠাৎ মীর মান্নু মইন উল মুল্কের মৃত্যু হওয়ার জন্য সে বিবাহ আজও হয় নি। সম্বন্ধ হয়ে আছে। ইতিমধ্যে গোলমাল বেধেছে পাঞ্জাবে। মীর মান্নুর স্ত্রী মুঘলানী বেগম তার অভিভাবিকা। মুঘলানী বেগমের যোগ্যতা নাকি অনেক। তার উপর

দুরানী বাদশাহ তাঁকে ধরমবেটী বলেন। এদিকে উজীর ইমাদ উল মুল্কের তিনি ভাবী শাশুড়ী।

পাঞ্জাবে গোলমাল লেগেছে মুঘলানী বেগমকে নিয়ে। মুঘলানী বেগম স্বামীর মৃত্যুর পর আর এক চেহারা নিয়ে বের হলেন। একদিকে যত বীভৎস অন্যদিকে তত বিস্ময়কর। সকাল-বেলায় উঠেই তিনি পর্দার ওপাশে বসতেন—এপারে থাকত খোজা আর দেওয়ান বক্সী এবং অন্য অন্য বড় কর্মচারীদের তলব দিতেন—তাঁদের আসতে হত। তাঁদের কথা শুনে বেগম খোজা মারফত হুকুম দিতেন। সুবাদারী মোহর থাকত তাঁর হাতে।

আর একদিকে চালাতেন মাইফেল। নবাব বাদশাহের মত বসতেন—বাঈজী তরফাওয়ালী-দের মুজরা হত। সিরাজী পান করতেন। আর দু'চারজন পিয়ারের আদমীদের আপ্যায়িত করতেন। এই আদমীদের মধ্যে দু'একজন আমীর যেমন ছিলেন তেমনি ছিল কয়েকজন ছোটজাতের লোক, বান্দা গোলাম।

লাহোরের কি মুসলমান কি হিন্দু ওমরাহরা লজ্জায় মাথা হেঁট করে—শেষ পর্যন্ত অসহ্য হওয়ায়—আমীর ভিখারী খাঁ-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে বেগমকে বেগমের আপন বহিনের বাড়িতে নজরবন্দী করে তারাই শাসন করছিল পাঞ্জাব। কিন্তু মুঘলানী বেগম তাতে দমেন নি। তিনি তাঁর মামাকে পাঠিয়েছিলেন কাবুল—ধরমবাপ শাহ আবদালীর কাছে। এদিকে লোক পাঠিয়েছিলেন ভাবী জামাই ইমাদ উল মুল্কের কাছে। ইমাদ উল মুল্ক রোহিলখণ্ড এবং জাঠ রাজা সুরজমলকে নিয়ে ব্যস্ত। তিনি তখন আসতে পারেন নি। কিন্তু শাহ আবদালীর লোক এসে আমীরদের বিদ্রোহ দমন করে মুঘলানী বেগমকে লাহোর কিল্লায় সুবাদারী হারেমে এনে বসিয়ে দিয়েছিল। মুঘলানী বেগম নিষ্ঠুর ক্রোধে ভিখারী খাঁকে বেঁধে আনিয়ে তাঁকে লাঠি দিয়ে পিটতে হুকুম দিয়েছিলেন। এবং লাঠি দিয়ে পিটিয়েই তাঁকে হত্যা করেছেন। তারপর আরও প্রমত্ত হয়ে শুরু করেছিলেন সেই পুরানো কদর্য বিলাস। এবার এত দূর উঠেছিলেন যে এবার তাঁর মামাই তাঁকে বন্দী করেছেন। ইতিমধ্যে মারা গেছে তিনবছরের বাচ্চা সুবাদার। আবার মুঘলানী লোক পাঠিয়েছেন ইমাদের কাছে। তুমি এসে উমধাকে সাদী করে নিয়ে যাও। আমাকে উদ্ধার কর।

ইমাদ এবার চলেছেন লাহোর। বাচ্চা সুবাদার মামাতো ভাই মহম্মদ মরেছে—এবার লাহোর আসবে তাঁর হাতে। উমধা মীর মান্নুর একমাত্র বেটী। কিন্তু তাঁর অন্তরের অন্তরে আর একটি সুর বাজতে শুরু করেছে। গন্না বেগমের মোহ তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করেছে।

ক'মাস আগে রোহিলখণ্ডে যখন ইমাদ পুরানীপন্থী রোহিলা আফগানদের সঙ্গে লড়াই কর-ছিলেন তখন ফরাক্কাবাদের নবাব তাঁর দোস্ত নবাব আহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশের মহলে কয়েক দিন বিশ্রাম করেছিলেন জয়লাভের পর। নবাব আহম্মদ মজলিস বসিয়েছিলেন দোস্তের জন্য আর হিন্দোস্তানের উজীরের খাতিরের জন্য। সেই মজলিসে এক তওয়াইফ ভারী মিঠা গজল গেয়েছিল যা শুনে ইমাদ সাহেবের মনও কেমন আসমানের মত উদাস এবং মনোরম নীলা হয়ে উঠেছিল। তিনি খুব তারিফ করেছিলেন।

বাঙ্গাশ তয়কাওয়ালীকে ফরমায়েশ করেছিলেন—তা হলে গন্না বেগমের আর দো চার গজল তুমি শুনিয়ে দাও তো!

—গন্না বেগম?

বাঙ্গাশ বলেছিলেন—উজীরসাহেব কি দিল্লীতে এ গজল আর গন্না বেগমের নাম শোনেন নি?

তওয়াইফ তখন নতুন গজল ধরেছে—বুলবুলি বাগিচায় শিস দিয়ে মেতে উঠছে। বলছে

বাগিচায় গুলমোর ফুটে দুনিয়া লালে লাল করে দিয়ে দিলএ রঙীন আমেজ ধরিয়ে দিয়েছে। নেশা লাগছে চোখের মধ্য দিয়ে। আকাশে সূর্যের রোশনি প্রখর হয়ে উঠে খুঁজছে কোথায় ফুটল গুল-এ-কমল। বুলবুল, কিন্তু তুমি এ সময় কোথায়? গন্না বলছে—হায় বুলবুলি, তুই শিসে এমন মেতেছিস বুলবুলের জন্য এত উতলা হয়েছিস কিন্তু জানতেও পারছিস নে যে তোর শিস শুনে পিছন দিক থেকে চুপিচুপি আসছে শিকারী তার জাল নিয়ে—এখনই জাল ফেলে তোকে ধরে ফেলবে। তুই উড়ে যা তুই উড়ে যা তুই উড়ে যা!

উজীর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আলি কুইলি খাঁ ওয়ালা সুলতানের বেটী গন্না?

—হাঁ। সুরাইয়া বেগম ওর মা। বাপ মা দুজনেই কবি।

—ওয়ালা সুলতান তো মারা গেছে। ওরা থাকে কোথায়? লক্ষ্ণৌ?

—না। আপনা জায়গীরে চলে গেছে।

—বদমাশ সুজাউদ্দৌলা বোধ হয় শিকারী, না?

—খুব সম্ভব।

—হুঁ।

চুপ করে এর পর গজল শুনেই গিয়েছিলেন উজীর ইমাদ উল মুল্ক। পরদিন সকালে নামাজের পর ওই গজলই গুনগুন করছিলেন আপনমনে। বাঙ্গাশ বলেছিলেন—গন্না বেগমের গজল গাইছেন মনে হচ্ছে?

—হাঁ দোস্ত। আচ্ছা গজল। "বাগিচায় গুলমোর ফুটে দুনিয়া লালে লাল করে দিয়ে দিলএ রঙীন আমেজ ধরিয়ে দিয়েছে।" আমারও দিল রঙ্গিলা হয়ে গিয়েছে। বাঃ!

বাঙ্গাশ বলেছিলেন—ওয়ালা সুলতান এক মসনভি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। তার মধ্যে বাপ মা আর বেটীর কবিতা আছে। খুব আচ্ছা কবিতা। সে বিলকুল গন্না বেগমের হাতের লেখা। দেখাই আপনাকে।

দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ইমাদ উল মুল্ক। বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন—এ তো দেখছি বেশির ভাগ খোদা দরবারে আরজ নবাব-সাহেব!

—হাঁ। ও মেয়েটি খুব ভাল।

—দেখতে কেমন নবাবসাহেব? আপনি নিজের নজরে দেখেছেন?

—দেখেছি। গুলাব বলব না। কেন না গুল-এ-কমল আমার নজরে দুনিয়ার সেরা ফুল।

—লক্ষ্ণৌ-এর নবাব সিয়া। আর এ মুলুকে কিছু দূরে অযোধ্যা—ওদিকে মথুরা বৃন্দাবন। নবাব এই হাওয়াতে শ্বাস নিয়েছেন কিনা, তাই নজর বদলে গেছে।

বাঙ্গাশ হেসে বলেছিলেন—কিন্তু উজীরসাহেব, বাদশা আকবর শাহ থেকে সুন্নী শ্রেষ্ঠ আলমগীর বাদশাহ পর্যন্ত সব বাদশাহের হারেমে ইরানী তুরানী গুলাবের সঙ্গে 'গুল-এ-কমল'-এর ঠাঁই হয়েছিল সমান গৌরবে। নিজামশাহীতেও তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

এর জবাব দেন নি ইমাদ। শুধু বলেছিলেন—নবাবসাহেব, গন্না বেগম গুলাব। ওর মা সুরাইয়া শুনেছি খাঁটি মুঘলাই। আর ওয়ালা সুলতান ইরানী। এ কি ওই মাতাল বেতমিজ সুজাউদ্দৌল্লার হারেমে চলে যাবে?

—যদি হিন্দোস্তানের উজীর ফরমায়েশ করেন তবে আমি সুরাইয়া বেগমকে বলতে পারি।"

—বলো। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তুমি লাহোরে মুঘলানী বেগমের কিস্সার

কথা শুনেছ?

—শুনেছি জনাব কিছু কিছু।

—আমি এখন ওখানে রওনা হচ্ছি। ওখান থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন গন্না বেগম সুজাউদ্দৌলার হারেমে না যায় তা তুমি দেখো।

পরের দিনই তিনি রওনা হয়েছেন লাহোর। পথে পানিপথে পীর বাবা আলি কালান্দর সাহেবের কবর আলি কালান্দর শরীফে তসলীমাৎ সেলামৎ দেবার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। কালান্দর শরীফের একপাশে প্রান্তরে ছাউনি পড়ল ফৌজের; উজীরসাহেবের হাতী এসে দাঁড়াল শরীফ থেকে খানিকটা দূরে বাদশাহী সড়কের উপর—সেখান থেকে হেঁটে যাবেন উজীর ইমাদ উল মুল্ক।

দু'পাশে ভিক্ষুক ফকিরের দল সারিবন্দী দাঁড়িয়ে গেছে। কুর্নিশ করছে। চীৎকার করছে—উজীর-এ-হিন্দোস্তান আমীর উল মুল্ক জিন্দাবাদ! খোদা মেহেরবানি কর উজীরকে। পীরসাহেব মেহেরবানি করো উজীরকে। উজীর-এ-হিন্দোস্তান মেহেরবানি করো গরীবকে—রোটি দো উজীর-এ-হিন্দোস্তান—লুগা মিল যায় মেহেরবান গরীব পরবর!

একজন নাসাকচী হেঁকে বললে—সব বসে যাও সব বসে যাও। পহেলে দরগাহে নামাজ করবেন উজীরসাহেব তারপর সব মিলবে।

সকলে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল—উজীর-এ-হিন্দোস্তান জিন্দাবাদ!

দরগাহে সুগন্ধি ধূপ গুগগুল লবান বাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে নামাজ সেরে বেরিয়ে এসে দরগাহের চত্বরের উপর দাঁড়িয়ে হুকুম জারি করলেন—এদের সব এক এক সিক্কা রূপেয়া দিয়ে দাও। আর এক এক লুগা।

একজন নাসাকচী হেঁকে বললে—এই সব শুনো—উজীরসাহেবের হুকুম হয়ে গেছে এক এক সিক্কা রূপেয়া আর এক এক লুগা মিলবে।

ভিক্ষুকেরা খুব উৎসাহিত হল না। তারা এর আগে আগে হিন্দোস্তানের বাদশাহ কি উজীর কি বড় বড় আমীরদের কাছে এর থেকে অনেক বেশী পেয়েছে। কখনও কখনও সোনার মোহর পর্যন্ত মিলেছে।

তবুও তারা জয়ধ্বনি দিলে উজীরের।

উজীরের একজন বকসী সে টাকার থলি নিয়ে এগিয়ে এল।

উজীর ইমাদ উল মুল্ক সাহেবের হাত খুব কষা। সোনা রূপো হাতের মুঠোয় এলে হাতের মুঠো খুব শক্ত হয়ে যেন আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়!

উজীর ইমাদ উল মুল্ক এতেই খুব খুশী হয়েছিলেন নিজের খয়রাতির বহরে। এক এক সিক্কা রূপেয়া কি কম? রূপেয়াতে তিন চার মণ গেঁহু মেলে—মণ ভর দেড়মণ ভর দাল মেলে—সেক্ষেত্রে সিক্কা রূপেয়াতে হিসাব করে চললে পুরা মাহিনা চলে যাবে। তিনি দেখছিলেন এই হতভাগ্যগুলোর চোখের দৃষ্টি এবং মুখের আনন্দ।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল দূরে গাছতলায় বসে আছে এক ফকির। সে সেইখানেই বসে আছে। যখন দরগাহে তিনি ঢুকছিলেন তখনও দেখেছিলেন এমনিভাবে বসে আছে। একটু বিস্ময় বোধ করলেন তিনি। তাঁর পিঙ্গল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে তিনি দেখলেন ফকিরের বয়স বেশী নয়, গৌরবর্ণ রঙ কিন্তু মলিন হয়ে গেছে। রুক্ষ চুল রুক্ষ দাড়ি গোঁফ। মুখখানা যেন কেমন। লোকটা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি প্রশ্ন করলেন—ও কে? কৌন হ্যায় উ?

দরগাহের একজন মোল্লা বললে—ও এক ফকির। মালুম হয় হয়তো বড়ঘরানা ঘরের ছেলে। খুব কাঁচা উম্র্। দেওয়ানা মালুম হয় খোদাবন্দ। ও ভিখটিখ মাঙে না। যদি কেউ আপনা থেকে দেয় তো নেয়—নেহি তো না। দরগাহ থেকে যে খয়রাতি রোটি মেলে তাই খায়।

উজীর একজন নাসাকচীকে বললেন—ডাক ওকে।

নাসাকচী ছুটে গেল লোকটির কাছে।

দরগাহের মোল্লা বললে—বহুৎ ঘমণ্ডী আদমী লোকটি। ও নামাজের সময় ছাড়া বড় নড়ে না। ডাকলেও আসে না। বলে—আমার তো কোন দরকার নেই! ওর বুলি হল—মর্জি খোদাকি খেল নসীবকে ইজ্জৎ ইনসানকি!

উজীর ইমাদ উল মুল্ক চকিত হয়ে ঘাড় ফেরালেন মোল্লার দিকে, বললেন—কি বলে? বুলিটা কি?

—বলে মর্জি খোদাকি খেল নসীবকে ইজ্জৎ ইনসানকি!

—হাঁ! মুখখানা কঠোর হয়ে উঠেছিল ইমাদ উল মুল্কের। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—মুখে চিচকের দাগ আছে?

—হ্যাঁ জনাব আলি। বসে থাকে ওই বাবরশাহী মসজেদের ধারে। ওইখানেই ওর আস্তানা। আর কোথাও যায় না—কোথাও রুটি মাগে না।

—হুঁ।

নাসাকচী ফিরে এসে বললে—খোদাবন্দ, ও ফকির বলছে—আমার তো কোন কাম নেই কারুর কাছে। আমি কেন যাব? আমি বললাম—তোর ঘাড় যাবে। ও ঘাড় বাড়িয়ে দিয়ে বললে—নিয়ে যাও গর্দান! কি হুকুম বলুন।

—ওকে গিরিপ্তার করে নিয়ে চল তাঁবুতে।

ফকীরকে হাতে দড়ি বেঁধে নিয়ে এল নাসাকচী! উজীর ইমাদ উল মুল্ক বললেন—কি নাম তোমার? ঝুটা বাত বলবে না। তুমি ফকির সেজে আছ।

হেসে সে বললে—ঝুটা বাত আমি বলি না উজীরসাহেব। আমার নাম আকবর আদিল।

—হ্যাঁ। সুজাউদ্দৌলার সেই কেনা গোলাম, যাকে নবাব সফদরজঙ্গ নকল বাদশা বানিয়েছিল!

—আসল নকল আমি জানি না জনাব আলি, আমি কাঠের কুরসিতে বসে তাঁবুর ভিতরে সাত মাহিনা বাদশা নাম নিয়ে দরবার করেছি। কিন্তু কোন হুকুম কোন দিন কাউকে করি নি।

—এখানে কি করে এলি? কি মতলবে ফিরছিলি? হঠাৎ উগ্র হয়ে উজীর অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে রূঢ় ভাষায় বললেন এবার।

ফকির একটু চুপ করে রইল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—উজীরসাহেব, আমাকে তুই বললেও আমার ইজ্জৎ যাবে না। কেঁউ কি আমি ফকিরী নেবার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ফেলে দিয়েছি পথের ধুলোয়। কিন্তু আমি আপনাকে তুই বললে আপনার ইজ্জৎ চলে যাবে—সে আমার গর্দান নিলেও ফিরবে না।

—হুঁশিয়ার বান্দা গোলাম কঁহাকা!

—গোলাম বান্দা আমি বটে। গোলাম কারবারীরা আমাকে বেচতে এনেছিল বান্দা

বাজারে। কিন্তু হুঁশিয়ার আমাকে মিছে করছেন উজীরসাহেব। আপনার নাসাকচীকেই আমার গর্দানটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

ঠিক এই সময় তাঁবুর বাইরে একটা সমবেত কোলাহল উঠল—অনেক লোকের চীৎকার উঠছে।

ইমাদ চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন—কি? কিসের গোলমাল?

একজন মুন্সী এসে বললে—ভিখারীরা চিল্লাচ্ছে। এই ফকিরকে ধরা হয়েছে বলে।

—এর সঙ্গে ওদের সম্বন্ধ কি?

—তা জানি না হুজুর-আলি। ওরা চিল্লাচ্ছে—ছোড় দো—ফকিরকো ছোড় দো!

ফকির আদিল বলল—ওরা আমাকে ভালবাসে উজীরসাহেব!

—ভালবাসে?

—হাঁ। আমি ওদের ভালবাসি বলে ওরাও আমাকে ভালবাসে!

—ভাগিয়ে দাও ওদের। না হলে বল সিপাহী এসে ওদের ভাগিয়ে দেবে। বল ফকির আমার বন্দী। ফকির এক জুয়াচোর! পালিয়ে আসা গোলাম!

ফকির আদিল শাহের বাঁধা হাত দুখানা মুহূর্তে উৎক্ষিপ্ত হল উজীরের দিকে। কিন্তু নাসাকচী তা ধরে ফেললে।

উজীর বললেন—ওকে কোড়া লাগাও!

নাসাকচী বেরিয়ে গিয়ে নিয়ে এল ঘোড়ার চাবুক। উজীর বললেন—পাচ কোড়া!

আদিল শাহের পিঠের আবরণ মুক্ত করে চাবুক লাগালে সে। কেটে কেটে বসে গেল। কিন্তু দাঁতে দাঁত টিপে রইল আদিল শাহ, চার কোড়ার পর টলতে টলতে সে পড়ে গেল মাটিতে উপুড় হয়ে। কিন্তু চিৎকার সে করলে না! উজীর বললে—লাগাও! নাসাকচী ইতস্ততঃ করছিল—সে লাগালে আর এক কোড়া। আদিল শাহ মুহ্যমান হয়ে পড়ে রইল কিছুক্ষণ।

উজীর বললেন—ওর ঝুলিটা ঝাড়। কি আছে দেখি।

ঝুলি ঝাড়লে নাসাকচী। দুখানা পুঁথি, কিছু তামার মুদ্রা, একটা ফকিরী আলখাল্লা, একটা পায়জামা, একটা কলম আর মুখবন্ধ এক দোয়াত। আর কাগজের মোড়কে মোড়া কিছু লবান কিছু ধূপ একটা চকমকি কিছু মসাল্লা—এলাইচি-দারুচিনি এই মাত্র।

উজীর পুঁথিখানা তুলে নিলেন।

পাতা উলটেই সসম্ভ্রমে কপালে ঠেকিয়ে আবার পাতা ওলটাতে লাগলেন। কোরান। সুন্দর হাতের লেখা—অতি যত্ন আর শুদ্ধ করে লেখা। বিস্মিত হলেন উজীর। বললেন—এই আদিল শা!

আদিল শা উঠে বসল এবার।

উজীর বললেন—এ কোরান কে নকল করেছে? তুমি?—তুমি শব্দটা আপনিই বোধ হয় বেরিয়ে এল।

—হাঁ!

—এ হাতের লেখা তোমার? মলাটের নকশা এও তুমি বানিয়েছ?

—হাঁ!

আরও খানিকটা উলটে দেখে কোরানখানি রেখে দিলেন সামনে একখানি পরাতের উপর। তারপর ওলটালেন দ্বিতীয় পুঁথিখানি। সবিস্ময়ে বললেন—মসনভি!

উপরেই লেখা ছিল পড়লেন—দুনিয়াতে যত ফুল ফোটে তার সুরত আর খুসবু সবই সেই খোদারই মহিমা। দুনিয়াতে যত গান যত সুর তারও সবেতেই তাই—সেই খোদারই মহিমা! দুনিয়াতে যত মহব্বতি—মানুষের সঙ্গে মানুষের, মায়ের সঙ্গে বেটার, তার মধ্যেও সেই খোদারই মহিমা। এই মহিমার সুরেই ওঠে আজান—লা ইলাহা ইলাল্লা—। গন্না বেগম বলে—

উজীর আর পড়লেন না। ভুরু কুঁচকে বললেন—এ তুই কোথায় পেলি?

—আমাকে যতক্ষণ তুই বলবেন উজীরসাহেব আমি জবাব দেব না!

চমকে উঠলেন উজীর—রাগে চমকে উঠলেন। চীৎকার করে উঠলেন একটা। বলতে যাচ্ছিলেন তিনি ফের লাগাও দশ কোড়া! হঠাৎ নজরে পড়ল আদিলের কোলের কাছে চমৎকার একখানি রুমালে মোড়া কিছু পড়ে রয়েছে। নাসাকচীকে বললেন উজীর—ওহিঠো উঠাও!

নাসাকচী উঠিয়ে নিল আদিল কিছু বুঝবার আগেই। ওটি আদিলের আলখাল্লার ভিতরে কোন জেবের মধ্যে বোধ হয় লুকিয়ে রাখা ছিল, যখন সে উপুড় হয়ে পড়ে যায় তখনই ওটি বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। অনেকটা গোল পেটীর মত।

উজীর সেটি হাতে করে নিতেই আদিল দেখে বলে উঠল—দোহাই আল্লার ও আমাকে ফিরে দাও! ও সব আমার বাপ দাদা আমার পূর্বপুরুষের তসবীর—আর কিছু নয়। লক্ষ্ণৌতে নবাব সফদরজঙ্গের বাড়িতে ছবি দেখে আমি নিজে হাতে এঁকেছি। দোহাই!

উজীর গ্রাহ্য করলেন না। খুলে ছবি বের করলেন। ছবি দেখে বড় ভাল লাগল। হাতীর দাঁতের ফলকের উপর ছবিগুলি সুন্দর হয়েছে।

আকবর শাহ। জাহাঙ্গীর শাহ। শাহানশাহ শাজাহান। বাদশাহআলমগীর গাজী। চমৎকার হয়েছে। বললেন—তুমি এঁকেছ? আবার তুমি বললেন উজীর।

উত্তর দিতে যাচ্ছিল আদিল। কিন্তু তার পূর্বেই উজীর বললেন—এ কার তসবীর? এ কে? অপরূপ এক সুন্দরীর ছবি! অপরূপ! কার ছবি? এই, এ তসবীর কার?

পাশেই আর একখানা ছবি বেরিয়ে পড়ল।—এ কার ছবি?

—আমার আব্বাজানের।

—শাহজাদা ফিরুজমন্দের? তা হলে এ কে? তোমার আম্মাজান?

—না। ও তসবীর এক কুমারীর ছবি। খানিজমান আলি কুইলি খানের মেয়ে—

—গন্না বেগম? মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে উজীর বললেন—এই গন্না বেগম? ওয়া! ওয়া! বলে তারিফ করে উঠলেন উজীর।—এই গন্না বেগম?

ছবিখানি হাতে করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন উজীর, বাকী ছবিগুলি তার কোলের উপর ফেলে দিয়ে তাঁবুময় ঘুরতে লাগলেন। কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে এসে আদিলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—এ ছোকরীর সঙ্গে কিসের সম্বন্ধ তোর? মহব্বতির?

—না। হেসে ঘাড় নাড়লে আদিল শা।

—তবে? এ তসবীর কেন তোর কাছে?

আদিল চুপ করে রইল।

—এই!

তবু জবাব দিলে না আদিল। বুদ্ধিমান উজীর বুঝলেন, বললেন—বাতাও জী বাতাও। না-জবাব দিলে তুমি রেহাই পাবে না। মহব্বতি?

হেসে আদিল বললে—ডর মিছে দেখাচ্ছেন উজীর। গর্দান আমি পেতেই রেখেছি। তবে

আমার ইজ্জৎ রেখে কথা বললে জবাব নিশ্চয় দেব। শুনুন উজীরসাহেব। মহব্বতি এক জিনিস ভাল লাগা আর এক জিনিস। ওকে দেখে ভাল লেগেছিল উজীরসাহেব—যেমন গুলাব দেখে ভাল লাগে। আর মহব্বতি? আমি জানি মহব্বতিতে আমার অধিকার নেই। দুনিয়ায় আমার দুর্ভাগ্যের ভাগী আমি কাউকে করব না। বলে, বয়েতে বললে—"দুনিয়ায় দুঃখের চেয়ে পবিত্র কিছু নেই আদিল—এর ভাগ কাউকে তুমি দিয়ো না। এ তোমার উপর মেহেরবান আল্লার দয়া। এর ভাগ দিলে তোমার জীবনই নুকসান হয়ে যাবে।"

বাইরে থেকে তাঁবুর দরজার নাসাকচী আবার এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল। ভ্রূকুঞ্চিত করে উজীর বললেন—কি?

—আমীর উল উমরা আদিনা বেগ সাহেবের কাছ থেকে সওয়ার এসেছে খত নিয়ে।

—সওয়ার? আদিনা বেগের কাছ থেকে? যা জলদি নিয়ে আয়।

নাসাকচী চলে গেল। উজীর তাঁবুর ভিতরে নাসাকচীকে বললেন—এক শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে দে। নিয়ে যা। জিম্মা করে দে তাঁবুর হাজতের দারোগাকে।

আদিল শাহের হাতে শিকল বাঁধাই ছিল। নাসাকচী নিয়ে চলে গেল তাকে। ইমাদ একবার ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বসন্ততে ক্ষতবিক্ষত এই লোকটাকে ছেড়ে দেবেন? দুনিয়াতে ওর শাহাজাদা পরিচয় একরকম মাটি চাপা পড়েছে। যেদিন সফদরজঙ্গ হেরে দিল্লী থেকে অযোধ্যা যাবার পথে ওকে ঝুটা রুমালের মত ফেলে দিয়েছেন আগ্রার কিল্লার ফটকে সেই দিন থেকেই লোকে বলতে শুরু করেছে লোকটা কখনও শাহজাদা কামবক্সের পোতা নয়। লোকটা আসলে সত্যই খোজা বান্দা—শুধু বাদশার বিপক্ষে খাড়া করবার জন্যেই লোকটাকে সফদরজঙ্গ খাড়া করেছিল। তার উপর ওর সে সুরতও নেই। ছেড়ে দেবেন ওকে?

কানে এল গভীর কণ্ঠে রাত্রির অন্ধকারকে মথিত করে কে বলছে—মর্জি খোদাকি খেল নসীবকে ইজ্জৎ ইনসানকি!

কথাগুলির মধ্যে এবং তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা ইমাদ উল মুল্ককে বিরক্ত করে তুললে। তিনি নিজের মনেই নিজেকে বললেন—নেহি! ঘাড় নাড়লেন—না, ছাড়া হবে না ওকে!

গন্নার তসবীরখানা আলোর কাছে ধরে আবার দেখলেন।

আদিনা বেগের সওয়ার এসে কুর্নিশ করে পত্রখানি এগিয়ে ধরলে। খত খুলে ফেললেন উজীর।

আদিনা বেগ লিখেছে—"আমি সে দশ হাজার সওয়ার নিয়ে লাহোর রওনা হলাম। আমীর উল উমরা ইমাদ উল মুল্ক উজীরসাহেবের লাহোর আসবার দরকার নেই। সরহিন্দে তিনি ডেরা গেড়ে অপেক্ষা করুন। কিছু তোপ শুধু পাঠিয়ে দিন। লাহোরের কাজ তিন দিনে আমি খতম করে ফিরব।"

ছয়

পনের দিন পর।

সরহিন্দে কিল্লার ভিতরে হারেমের বড় একটা কামরাতে মসনদে (তাকিয়া) হেলান দিয়ে বসে ছিলেন উজীর। তাঁর কপিশ চোখ তীব্র দীপ্তিতে ঝলসাচ্ছিল। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন

মুঘলানী বেগম—তার মামী, পাঞ্জাবের সুবাদার মীর মান্নুর বিধবা। উদ্ধত যৌবনা এক রূপসী নারী। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। চোখের কোলে কালো দাগ পড়েছে। তাঁরও চোখ ঝলসাচ্ছে।

মুঘলানী বেগমের দুইপাশে দুই তাতারনী প্রহরিণী।

উজীর বললেন—তুমি শোন বেগমসাহেবা। তুমি যদি আমার মামী না হতে তা হলে তুমি যা করেছ তাতে এতদিনে ওমরাহ্‌রা তোমাকে খতম করে দিত। সারা ইসলামী ওমরাহীর মুখে তুমি কালি লেপে দিয়েছ। আর তাজ্জব কি বাত এই যে সেটা তুমি এখনও বুঝতে পারছ না।

মুঘলানী বেগমের ঠোঁট দুটি একটু-বাঁকা হয়ে উঠল—মুখের রেখায় ফুটে উঠল ঘৃণা এবং অবজ্ঞা দুইই। বললেন—কালি লেপে দিয়েছি, না?

—দাও নি?

—বিলকুল ঝুট বাত! আজ আমার নবাব মরেছে—আমার বেটা মরেছে—ওমরাহরা আমায় বদনাম দিয়ে সুবাদারী ছিনিয়ে নিতে চায়!

—খোজা শাহাবাজ খাঁ, বান্দা ছোকরা মিস্কিন—এদের উপর তোমার এত পেয়ার কেন?

বেগম বললেন—তারা নিমকহারাম নয় ইমানদার, তারাই আমার ভরসা—এই বলে করি।

—সারা পাঞ্জাব সারা হিন্দোস্তান দুসরা কথা বলে। তুমি সিরাজী পিয়ে—

—সিরাজী কৌন নেহি পিতা? বাদশার বেগমেরা খায় না? হাঁ, সিরাজী আমি খাই।

—মিস্কিন ছোকরাকে আমি বেঁধে আনবার হুকুম দিয়েছিলাম। তাকে তুমি তোমার শোবার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলে—অস্বীকার করতে পার? ভোরবেলা বাঁদীর পোশাক পরিয়ে তুমি বের করে দিয়েছ।

—ঝুট বাত!

উজীর হাতে তালি দিলেন। নাসাকচী এসে দাঁড়াল। উজীর বললেন—ওই বাঁদীকে নিয়ে এস।

বেগম বলে উঠলেন—উ বাঁদী এক বদমাশ ছোকরী—উ হারামজাদী! ওর বাত বিলকুল ঝুট! সেই জন্যেই আমি তার চুল কেটে দিয়েছি নাকও কেটে দিয়েছি।

উজীর আবার ডাকলেন নাসাকচীকে, বললেন—বেগম সাহেবার পুরানো খোজা বান্দা হাবসীকে নিয়ে আয়।

সে চলে গেলে বললেন—বেগমসাহেবা, ওই 'মিস্কিন' ছোকরাকে পেলে আমি তার গায়ের চামড়া উখাড়ে নিতাম। তোমার চোখের সামনে।

দুজন নাসাকচী ওই বাঁদী আর ওই হাবসীকে নিয়ে এল। উজীর বললেন—এই বাঁদী, বল বেগম তোর নাক চুল কেন কেটে দিয়েছে। খোদার নামে কসম খেয়ে সাচ বাত বলবি। ঝুটা হলে তোকে মাটিতে গেড়ে আমি কুত্তা দিয়ে খিলাব।

বাঁদী হাত জোড় করে বললে—জনাব-আলি খোদাবন্দ, আমি ঔরৎ—সে সব বিলকুল শরমকি বাত! এমন শরমের বাত খোদাবন্দের সামনে কি করে বলব?

উজীর বললেন—বিচারের দিন খোদাতায়লার দরবারে যেমন করে সাক্ষী দেবার সময় বলবি তেমনি করে বলবি রে কুত্তি! তুই তো মিস্কিনের সঙ্গে আসনাই করতে গিয়েছিলি। সেই নিয়ে তো ঝগড়া! নে বল!

বলে গেল বাঁদী। বলে গেল এক উদ্ধত প্রতিভাশালিনী নারীর পতনের কাহিনী। মইন উল মুল্কের মৃত্যুর পর থেকে তিন বছরের ছেলে মহম্মদকে সুবাদার করে সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিয়ে একদম বদলে গেল সে নারী। যৌবন তখন তার পরিপূর্ণ এবং জীবনে লালসা অপরিসীম। সিরাজী খেয়ে সকল শরম সকল সংকোচকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে ব্যভিচার শুরু করলে। খোজা শাহাবাজ ছোকরা, বান্দা মিস্কিন, ওমরাহ গাজী বেগ বক্সী এদের ছিল নিত্য যাতায়াত। মিস্কিনকে সে ভালবাসত।

বাঁদী বললে—হাঁ খোদাবন্দ এই বাঁদী—গরীবের বেটী আমি—বান্দা মিস্কিনকে আমার ভাল লেগেছিল—মহব্বতি হয়েছিল তার সঙ্গে। জনাব, তাতে আমার কসুর হবে এ আমি ভাবি নি। এক গরীব আর এক গরীবকে ভালবেসেছিল—

ঠিক সেই মুহূর্তে মুঘলানী বেগম ছুটে এসে লাথি মারলেন হতভাগিনী বাঁদীকে। চীৎকার করে উঠলেন—তোর জিভটা আমার ছিঁড়ে নেওয়া উচিত ছিল। গর্দানটা দু' ফাঁক করে দেওয়া উচিত ছিল।

উজীর চীৎকার করে উঠলেন—মুঘলানী বেগম!

উজীরের চীৎকারের মধ্যে ইঙ্গিত পেয়ে তাতারিনী দুজন এসে মুঘলানী বেগমের দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে এল।

মুঘলানী থামলেন না, চীৎকার করেই চললেন—বেইমান—ইমাদ তু বেইমান! আমি অন্ধা—তোকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। তুই আমাকে বন্দী করে লাহোর কব্জা করবি। তুই বাদশা আহম্মদ শাকে বেইমানি করে মসনদ থেকে নামিয়ে অন্ধা করেছিস। আমার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু শুনুন ইমাদ উল মুল্ক উজীর-ই-আজম বাহাদুর—মুঘলানী আহম্মদ শাহ নয়, উধম বাঈও নয়। আমি মুঘলানী বেগম!

উজীর তাতারিনীদের বললেন—নিয়ে যা। তাঁবুর ভিতর কয়েদ করে রাখবি। বুঝলি!

তাতারিনীরা মুঘলানী বেগমকে নিয়ে চলে গেল। উজীর নাসাকচীদের বললেন—এদের নিয়ে যা!

ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁবুর দরজায় অতি তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের কথা শোনা গেল।—হঠ যা বেতমিজ হারামজাদ! হঠ যা!

বলেই তাঁবুর পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকল একটি যুবতী। ষোল সতের বছরের বলিষ্ঠগড়ন একটি মেয়ে। মুঘলানী বেগমের মেয়ে—উজীর ইমাদ উল মুল্কের বাগদত্তা উমধা বেগম।

বলিষ্ঠ গড়ন, ঈষৎ স্থূলাঙ্গী, গোল মুখ, বড় বড় চোখ—সে চোখের দৃষ্টিতে আশ্চর্য মাদকতা। কিন্তু তার মধ্যে যত ক্ষুধা তত উগ্রতা। মোটা দুটি ঠোঁটের গড়নেও মাদকতা আছে। মাথায় পিঙ্গলাভ দীর্ঘ বেণী। রূপ আছে। একটু দূর থেকে এ রূপের প্রবল আকর্ষণ কিন্তু কাছে এসে পিছিয়ে যেতে হয়।

উজীর চমকে উঠে পিছন ফিরলেন।

উগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে উমধা বেগম। উজীর বললেন—তুমি কেন এখানে?

উমধা বেগম বললে—উজীর-ই-আজমের কাছে ফরিয়াদ করতে নয়। কৈফিয়ত চাইতে এসেছি।

—কৈফিয়ত!

—হাঁ। কৈফিয়ত। আমাদের ডেকে এনে এ অপমান করবার কি এখ্‌তিয়ার তোমার?

—সে জবাবদিহি তোমার কাছে করবার কথা নয় আমার ! তোমার মায়ের বিরুদ্ধে তামাম পাঞ্জাব থেকে হিন্দোস্তানের আমীর উমরা চাষা ভিখমাঙোয়ারা পর্যন্ত যে কিস্‌সা বলছে নালিশ করছে, তার বিচার আমাকে করতেই হবে—

—তা হলে তুমি সেই কথা জানিয়ে মাকে বন্দী করে আনলে না কেন লাহোর থেকে ? আমাকে সাদী করবে বলে আমাদের আসতে বলেছ তুমি। আমার মা সাদীর জন্তে হীরা জহরত আশরফিতে তিন লাখ টাকার যৌতুক সঙ্গে নিয়ে জলুস করে এসেছে আমাকে নিয়ে। সে সব হীরা জহরত আশরফি তুমি নিয়েছ। তারপর তুমি মায়ের এই কিস্‌সা নিয়ে বিচার করবার জন্ত কাজী হয়ে বসেছ। তাকে তুমি কয়েদ করলে। কেন ? কি কৈফিয়ত তোমার ?

উজীর এবার বললেন—তোমার মায়ের মত মায়ের বেটীকে নিজাম উল মুল্কের বংশধর ইমাদ উল মুল্ক গাজিউদ্দীন, যে কোরান বুকে করে রাখে—যে কখনও সিরাজী পর্যন্ত ছোঁয় না সে কখনও সাদী করতে পারে না।

—সে আমি জানি।

—তুমিও সিরাজী খাও।

—খাই। কিন্তু তার জন্তে তুমি এ কথা বলছ কেন ! তুমি ঝুটা আদমী ঝুটা বাত বলছ !

—উমধা বেগম !

—এ কার তসবীর ?

চমকে উঠলেন ইমাদ উল মুল্ক।—ও তসবীর কোথা পেলে তুমি ?

—তোমার মাথার বালিশের নিচে। আমি এসেছিলাম এক খত লিখে তোমার বালিশের তলায় রাখতে। মাফ চেয়েছিলাম আমার মায়ের জন্তে। লিখেছিলাম—আমি খোদার কসম নিয়ে বলছি মায়ের মত আমি নই। লিখেছিলাম—আমি সত্যই তোমাকে ভালবাসি। আমার আব্বাজান যখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ করেছে তখন থেকে ভালবেসে আসছি। লিখেছিলাম—তুমি আমার জন্তে একটু সহ্য কর। সাদী হয়ে যাক—মাকে আমি আমাদের কাছে রেখে শাসনে রাখব। বলব—মহম্মদ মারা গেছে। আমি তোমার একমাত্র বেটী। তুমি আমাকে ছেড়ে লাহোরে এই রকম যা খুশি তা কেন করবে ? তোমার দামাদ উজীর-ই-আজম। হিন্দোস্তানের বাদশারও মালিক। তার মাথা হেঁট করবে কেন ? তাও যদি সে না শোনে তবে নিজে হাতে জহর দিয়ে ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব। কিন্তু উমধার মিনতি—তুমি মায়ের অপমান করো না এই ছাউনিতে—যাতে হাজারো ছোটা আদমীর চোখে মা মাটিতে মিশে যাবে।

একটু থামল উমধা বেগম, তারপর ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললে—চিঠিখানা রাখতে এসে বালিশ তুলে দেখলাম এই তসবীর। মাথায় রেখে শুয়ে থাক না কলিজায় রেখে শুয়ে থাক উজীর-ই-আজম ?

ইমাম বললেন—তসবীর এক বান্দার কাছে পেয়েছি। কার তা জানি না। রেখেছি তার অন্ত কারণ আছে। তার সঙ্গে তোমাকে সাদী-না-করার মতলবের সঙ্গে সম্বন্ধ কিছু নেই। তোমাকে সাদী করব না তুমি ওই মায়ের বেটী বলে।

উমধা এবার একখানা কাগজ বের করে বললে—এ বয়েৎ কে লিখলে উজীর-ই-আজম ? এটাও তো ছিল ও তসবীরের সঙ্গে। "হিন্দোস্তানে এক গুলাব ফুটেছে যে গুলাবের জলুস আর খুসবুর তুলনা নেই। এক বুলবুলি হিন্দোস্তানের বাগিচায় গান গাইছে যে গান কেউ কখনও

শোনে নাই। তার নাম গন্না! গন্না গুলাব গন্না বুলবুলি, তোমার জন্যে আমার কলিজাকে বানিয়েছি সোনে-মতিকা ফুলদান—বানিয়েছি কলিজার পিঁজরা—"

উঠে এলেন ইমাদ উল মুল্ক, এসে দাঁড়িয়ে বললেন—দাও ও দুটো।

—দেব?

—হাঁ! বলে হাত বাড়ালেন—জোর করে নেবেন।

কিন্তু বাঁ হাতে ছবি আর কাগজখানা ধরে ডান হাত দিয়ে সে তুলে নিল দরজার পাশে রাখা একটি তেপায়ার উপর থেকে একটা ধাতুর ফুলদানি। এবং সেটা দিয়ে আঘাত করল সে ইমাদের কপালে। ইমাদ কয়েক পা হটে গেলেন। উমধা বেগম ছবিটা মাটিতে রেখে লাথির পর লাথি মেরে সেটা টুকরো টুকরো করে দিলে। আর কাগজটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললে।

ইমাদ কপালে হাত দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। উমধা বেগম যে দরজা দিয়ে এসেছিল সেই দরজা দিয়েই চলে গেল।

* * * *

উমধা চলে গেলে উজীর প্রথমেই কুড়িয়ে নিলেন ছবির টুকরো কটা। চেষ্টা করলেন জোড়া দিতে। কিন্তু এমনভাবে ভেঙেছে যে জোড়া যায় না। তবুও তিনি চেষ্টা করলেন জোড়া দিতে। হঠাৎ টুকরোগুলোকে ঠেলে দিয়ে হাততালি দিলেন। দরজার নাসাকচী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল। উজীর বললেন—ওই যে পানিপথ দরগাহে যে ফকিরকে গিরিপ্তার করা হয়েছে তাকে নিয়ে আয়। তারপর ডাকলেন তাতারিনীকে। বললেন—উমধা বেগমকে কড়া পাহারায় রেখে দিবি। দরকার হলে জিঞ্জির পরিয়ে দিবি। তালাস করে দেখ্ কোন হাতিয়ার কি কিছু না থাকে। বেগম নজরবন্দী—।

হাঁ হয়ে গেল তাতারিনী। সকলেই জানে উমধা বেগম যৌতুক নিয়ে এসেছে উজীরের তাঁবুতে—তাদের সাদী হবে।

সেই বেগম—নজরবন্দী?

উজীর বললেন—বেওকুফের মত তাকিয়ে রইলি যে? যা—যা বললাম তাই করবি। খেলাপী হলে কোড়া লাগাব না, গর্দান নেব।

তাতারিনী চলে গেল।

নাসাকচী আদিল শাকে নিয়ে এল।

উজীর বললেন—তোমাকে এক কাম করতে হবে আদিল শা।

—ফরমায়েশ করুন—যদি আমার ইজ্জতে না বাধে তবে করব।

—গন্না বেগমের আর এক তসবীর আমাকে এঁকে দিতে হবে।

হাসলে আদিল—তসবীর তো ছিনিয়ে নিয়েছেন আপনি।

—ও ভেঙে গেছে। আমি আর একটা চাই। রঙ হাতীর দাঁতের টুকরা এ সব আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। এঁকে দিলে তোমার বে-কসুর খালাসী মিলবে।

—খালাসী মিলবে! ভাল—সব সরঞ্জাম মিললে এঁকে দেব আমি।

দরওয়াজায় এসে কেউ দাঁড়াল। নাসাকচী এসে বললে—মনসবদার আদিনা বেগ।

আদিলকে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়ে উজীর বললেন—একে তসবীর আঁকবার সরঞ্জাম যা চাইবে এনে দিবি।

আদিনা বেগ কুর্নিশ করে বললেন—লাহোরের আমীরান লোক সব এসে হাজির হয়েছে।

দরবার কবে করবেন? সকলের মত আপনার সাদী হয়ে যাওয়ার পর করাই ভাল। আপনি তখন বলতে পারবেন আপনার 'শাস্' আপনার সঙ্গে যাবেন। বেটীর কাছেই থাকা ভাল। স্বামী পুত্র দুই মরে গিয়ে ওঁর মগজ বিগড়ে গিয়েছে। তাতে যে সব কিস্সা রটেছে মুলুকময়— সে সব ঢাকা পড়ে যাবে। আর কেউ সমঝাবে না কি বেগম কয়েদ হয়ে আছেন।

—সাদী হবে না আদিনা বেগ। এ সাদী হতে পারে না।

—জনাব আলি! সবিস্ময়ে আদিনা বেগ উজীরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—উ বেটীও ওর মায়ের মত হবে আদিনা বেগ। নিজাম উল মুল্ক আসফজা বাহাদুরের বংশের রক্ত বড় পবিত্র। তার মধ্যে বিষ ঢুকে যাবে। এ সাদী হবে না।

—কসুর মাফ হয় জনাব আলি—এ বহুৎ বে-ইজ্জতির বাত হবে। মইন উল মুল্ক আপনার মায়ের সহোদর। তা ছাড়া পাঞ্জাবে মইন উল মুল্কের নাম অনেক। তাঁর দোস্ত অনেক।

উজীর বললেন—আমি আরও ভাবি আদিনা বেগ। তুমি যাও এখন। পাঁচ দিন পর দরবার হবে—হুকুম জারি করো।

পরের দিন ভোরবেলা উজীর দরগাহে আজান শুনে বেরিয়ে এলেন। দরজার নাসাকচী সারারাত্রি জেগে ঢুলছিল। উজীরকে এত ভোরে দেখে সে চমকে উঠল।

কাল সারারাত ইমাদ উল মুল্কের নিদ্ হয় নি। সারারাত জেগে কাটিয়েছেন। সারারাত ধরে শামাদানের সামনে বসে কখনও ওই ভাঙা তসবীর জোড়া দিতে চেষ্টা করেছেন, কখনও পায়চারি করেছেন।

নওজোয়ান ইমাদ উল মুল্ক—বয়স সবে বিশ পার হয়েছে। বাল্যকাল থেকে তাঁর বাপ তাঁকে কঠোর সংযমের মধ্যে মানুষ করেছেন। তিনিও তা পালন করে এসেছেন। ঔরতের মোহ তাঁর ছিল না। তাঁর বাপ তাঁকে বলতেন বারা সৈয়দের উজীরির কথা। তাঁদের বংশও উজীরের বংশ। আসফজা নিজাম উল মুল্কও উজীরী করেছেন। তাঁর বাপ বলতেন— ঔরতের দিকে নজর যদি দাও তা হলে উজীরী করতে যেয়ো না। ঔরৎ দেবে বাদশাহকে। ও আফিংয়ের চেয়ে খারাপ নেশা—সিরাজীর চেয়ে কড়া নেশা। বাদশাহের উপরে যদি বাদশাহী করতে চাও তবে আফিং সিরাজী ঔরৎএর দিকে তাকিয়ো না। বলতেন—হাঁ সাদী করবে। সাদী করবার সময়ও খেয়াল রাখবে। খুবসুরতির খেয়াল নয়। সব থেকে জবরদস্ত যে সুবাদার তার বেটীকে সাদী করবে।

সে কথা ইমাদ উল মুল্ক এতদিন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। সেই কথা মেনেই তিনি যে সুবা পাঞ্জাব একরকম হাতছাড়া হয়েছে, সেই সুবার সুবাদার মইন উল মুল্কের বেটীকে নিজে থেকে সাদী করতে চেয়েছিলেন। সুবিধাও হয়েছিল—মইন উল মুল্ক তাঁর আপন মামা। মুঘলানী বেগমকে দুরানী বাদশা বলেন ধরমবেটী। এদের মারফতে দুরানী বাদশাহের সঙ্গে আপস করে দিল্লীতে তিনি উজীর-ই-আজম হয়ে তামাম হিন্দোস্তানকে হাতের মুঠোয় আনবেন। এ বড় মজাদার মৌজদার খেলা। ঔরৎ আফিং সিরাজী—এ একদম ছোট হয়ে যায়। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর রক্তে নেশা লেগেছে। ফারাক্কাবাদে গজল শুনে একটু আমেজ ধরেছিল; আহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশের কাছে গন্না বেগমের গল্প শুনে সে আমেজ উস্কে দেওয়া প্রদীপের সলতের মত একটু বেশী জোরদার হয়ে জ্বলেছিল। সেদিন ওই আদিল শাহের ফকিরী ঝুলি থেকে গন্নার হাতে লেখা মসনভি পড়ে আর তার তসবীর দেখে সে যেন হাজারো বাতি জ্বালানো রোশনাই হয়ে উঠেছিল। আজ সেই তসবীর পায়ে লাথি মেরে উমধা বেগম

ভেঙে দিয়ে সব কিছুতে যেন আগুন ধরিয়ে দিলে। ওই রোশনাইয়ের আলো নেভাতে গেল উমধা—পায়ের লাথিতে উলটে দিল শামাদানগুলো—জ্বলন্ত বাতি পড়ল গালিচায় তাঁবুর কানাতে—দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। গন্না বেগম! গন্না বেগম! মনে মনে নাম যেন গুঞ্জন করে শুনিয়েছে কোন বুলবুল। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে ফুলে ভরা গুলমোর বাগিচায় গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সেই সুন্দরী মেয়ে।

তবুও মনে হয়েছে মধ্যে মধ্যে চুক হচ্ছে চালে। দুনিয়ায় নসীবের খেল শতরঞ্জ খেলা। চালে চুক হলেই মাৎ হতে হবে তোমাকে। তার শতরঞ্জ খেলায় দুরানী বাদশা হল নসীবের তরফের উজীর—ওকে ঠেকাতে উমধা এক সিপাহী মাত্র। কিন্তু সিপাহীর পিছনে জোর আছে। ওকে সরালে ভুল হবে।

আবার মনে হয়েছে—তাঁর তরুণ রক্ত গরম হয়ে উঠেছে—বলছে এত ভয় কিসের? তুমি ইমাদ উল মুল্ক। তোমাকে যদি জাহান্নমে যেতে হয় হিন্দোস্তানকে নিয়ে যাবে। তাতেও তোমার আপসোস থাকবে না। গন্না থাকবে তোমার পাশে। গন্না বেগম—গন্না বেগম!

আজান শুনে তাঁর এই ঘোর ভেঙেছে। আল্লার নাম নিয়ে রসুল আল্লার নাম নিয়ে উঠে পড়ে নিত্য বলেন—যেন না হেরে যাই! জয় দিয়ো আমাকে। আজ বলেছেন—গন্নাকে যেন পাই আমি!

উমধা বেগম? না। ওকে সহ্য করতে পারবেন না তিনি। গন্নার তসবীর সে লাথি মেরে ভেঙে দিয়েছে।

বাইরে বেরিয়েও তিনি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন একসময়—ভাবছিলেন। হঠাৎ রাস্তার উপর ধুলোর দিকে নজর পড়ল তাঁর। সওয়ার আসছে। দিল্লী থেকে? রোহিলখণ্ড থেকে? ফারাক্কাবাদ থেকে? আর ফারাক্কাবাদ থেকে যেন হয়। তিনি বলে এসেছিলেন নবাব বাঙ্গাশকে—নবাবসাহেব, খবর যেন তুমি জরুর দেবে আমাকে। সুরাইয়া বেগম কি বলে জলদি আমাকে জানাবে!

উজীর-ই-আজম নাসাকচীকে বললেন—তুরন্ত যাও। সওয়ার কোথা থেকে এল দেখ। নবাব বাঙ্গাশের সওয়ার হলে এখনি এখানে নিয়ে আসবে।

নাসাকচী চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইলেন উজীর। তারপর পায়চারি শুরু করলেন। ইচ্ছে হচ্ছিল নিজে এগিয়ে যান। কিন্তু হিন্দোস্তানের উজীর তিনি, নিজেকে দমন করে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা মোহর জেব থেকে বের করে তিনি আঙুলের মাথায় রেখে ছুঁড়লেন আকাশে। কোন্ পিঠ উপরে রেখে পড়ছে? সামনা পিঠ হলে নবাব বাঙ্গাশের সওয়ার। না সামনা পিঠ না! দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। ও কি! সওয়ারকে নাসাকচী নিয়ে আসছে!

আল্লা মেহেরবান! রসুলে আল্লা মহম্মদ মেহেরবান—!

সওয়ার এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই তিনি বললেন—খত কাঁহা?

সওয়ার সসম্ভ্রমে কায়দামত খত ধরলে সামনে। উজীর দ্রুতপদে ঘরে গিয়ে গালা মোহর ভেঙে চিঠি পড়লেন রুদ্ধশ্বাসে।

"গন্না বেগমের সাদী শেষ পর্যন্ত সুজাউদ্দৌলার সঙ্গেই ঠিক হয়েছে। সুরাইয়া বেগম আগ্রায় আশ্রয় নিয়েছিল জাঠ যুবরাজ জবাহির সিং-এর ভয়ে। জবাহির সিং গন্নাকে পেতে মরীয়া হয়ে উঠেছে। সুরাইয়া খোঁজ করছিল সেই মেকী ঝুটা বান্দা বাদশা আদিল শাহের। মনে হয় কিছু মহব্বতি ছিল। কিন্তু নবাব সফদরজঙ্গ ওদিক থেকে চাপ দিয়েছেন। সুরাইয়া বেগম শেষে

মত দিয়েছে সাদীতে। এখন উজীর-ই আজম যা ভাল হয় করবেন।"

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল ইমাদ উল মুল্কের। তারপর দুর্দান্ত ক্ষোভ এবং ক্রোধে অধীর হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ডাকলেন নাসাকচীকে। বললেন—জনাব আদিনা বেগকে সালাম দাও। জলদি!

—আর উজীরী খাস ফৌজের মনসবদার। তুরন্ত।

—আর শুনো! ওই যে ফকিরকে কয়েদে রাখা হয়েছে তার মুণ্ডুটা আমাকে এনে দিবি সবার আগে।

নাসাকচী চলে গিয়েছিল অনেকটা। উজীর বেরিয়ে এসে তাকে চীৎকার করে ডাকলেন—ফিরে শুনে যা!

—নাসাকচী ফিরে এল। উজীর বললেন—কয়েদীকে কোতলের হুকুম বাতিল। খবরদার! কেউ যেন ওর গায়ে হাত না দেয়! যাও।

আবার ভিতরে গিয়ে বসলেন।

প্রথম এসে দাঁড়াল তার বাদাকশাহী ফৌজের মনসবদার।

উজীর বললেন—হুকুমৎ জারি করো আজই ছাউনি উঠবে। একপহর বেলার সময় পহেলা সওয়ারের দল রওনা হবে। বরাব্বর রোহিলখণ্ড হয়ে ফারাক্কাবাদ!

* * *

বেলা দুপহরের ঘড়ি বাজতেই তাঁবু উঠে গেল। রওনা হলেন ইমাদ উল মুল্ক। সব বন্দোবস্ত তিনি করে ফেলেছেন।

লাহোরের সর্বশ্রেষ্ঠ আমীর মীর মুমিন খাঁকে পাঞ্জাবের সুবাদারী ফরমান দিলেন। আর তাঁর সকল কাজের ভার দিলেন সৈয়দ জামিলউদ্দীন খাঁকে। আদিনা বেগ—আদিনা বেগ নিযুক্ত হল জলন্ধর দোয়াবের ফৌজদার।

আর হুকুম দিলেন—মুঘলানী বেগমসাহেবা তাঁর বেটী উমধা বেগমকে নিয়ে থাকবেন লাহোর কিল্লার মধ্যে এক মহলে। কড়া পাহারা থাকবে চারিদিকে। উমধা বেগমকে সাদী তিনি এখন করবেন না। তাঁর ফুরসত নাই এখন। তা ছাড়া তাঁকে ভাবতে হবে। হাঁ, অনেক ভাবতে হবে, মৌলভীদের কাছে জানতে হবে মুঘলানী বেগমের মত মায়ের বেটীকে সাদী করা ঠিক কি না!

ইমাদ উল মুল্ক গুনাহের কাম করতে পারেন না। জান কবুল! তা তিনি পারেন না!

ধুলোয় ভরে গেল সরহিন্দ শহর—ঢেকে গেল। বাদাকশাহী ফৌজ চলতে লাগল।

উজীর ইমাদ হাতীর হাওদার মধ্যে বসে ভাবছিলেন—গন্না বেগম। পিছনে তাকালেন। ওই আসছে কয়েদখানা!

সাত

সত্যিই সুরাইয়া বেগমের আর কোন উপায় ছিল না, নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে গন্নার সাদীতে সম্মতি না দিয়ে। এক মাসের জায়গায় দু মাস কেটে গিয়েছিল আগ্রায়। আগ্রার কিল্লার মধ্যে আশ্রয় পায় নি তারা, কিল্লার কাছাকাছি এক আমীরের বাড়ি ভাড়া করে সেখানে গন্নাকে নিয়ে বাস করছিল। কিল্লা খুব কাছে। উত্তর-পশ্চিম দিকে কিল্লার বড় বুরুজের

কাছে। ওই বাড়ি দুশমনে আক্রমণ করলে সে বুরুজ থেকে কামান দাগা যায়। ইকবাল খাঁ এই বন্দোবস্ত করেছিল কিল্লাদারের সঙ্গে যে, ওই বাড়ির উপর দুশমনের হামলা হলে বুরুজের উপর থেকে কামান দেগে সাহায্য করবে কিল্লাদার। তা ছাড়া খান-ই-জমানের ফৌজ বাড়ির চারিদিক ঘিরে তাঁবু ফেলে বাস করছিল।

ইকবাল খাঁ সুরাইয়া বেগমের কথামত চারিদিকে লোক পাঠিয়েছিল আদিল শার খোঁজে। কিন্তু কোন হদিস কোন পাত্তা তার পাওয়া যায় নি।

এদিকে জবাহির সিংএর উচ্ছসিত কামনা ঢেউএর পর ঢেউএর মত আছড়ে এসে পড়ছিল তাদের বাসস্থানের চারিপাশে।—গন্না তোমাকে চাই, গন্না তোমাকে চাই, গন্না তোমাকে চাই!

তীরের মাথায় জড়ানো বয়েতে লেখা এই কথা গাছের গুঁড়িতে পড়ে থাকে; ছাদে পড়ে থাকে; দেওয়ালে বিঁধে থাকে। আবার কখনও আসে উপঢৌকনের মধ্যে। আগ্রা শহরের মণিকার আসে অলঙ্কার নিয়ে—তার মধ্যে সুকৌশলে লেখা থাকে প্রেম নিবেদন। মণিকারকে ধরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কে পাঠিয়েছে তার সদুত্তর মেলে না। সে বলে, তাকে এক আমীর টাকা দিয়ে বরাত করেছিল এবং পৌঁছে দিতে বলেছে এখানে। দূর জয়পুর থেকে আসে শ্বেত-পাথরের মনোহর জিনিস যার মধ্যে এই ধরনের কথা লেখা থাকে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায়—ইকবাল খাঁ খবর নিয়ে আসে যে জবাহির সিং ডিগ কেল্লায় ফৌজ বাড়াচ্ছে তোপ বাড়াচ্ছে। গুজব শোনা যাচ্ছে সে একদিন ঝড়ের বেগে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে গন্নাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

গন্নার জন্যে সে পাগল।

ক্রমে সুরাইয়া বেগমের নামে চিঠি আসতে লাগল—তাতে থাকত গন্নার জন্য কত সম্পদ কত সুখ ঐশ্বর্য সে দেবে তার কথা।

আবার কুৎসিত কথাও থাকত—তওয়াইফ সুরাইয়ার ইজ্জৎ আর ধরম বাতিক দেখে ব্যঙ্গের কথা!

সুরাইয়া বেগম অস্থির হয়ে উঠল। একদিন সে গন্নাকে ডেকে বললে—গন্না, আর তো সহ্য করতে পারছি না বেটী!

হেসে গন্না বললে—কেন আম্মা, দুনিয়ার পাগল পাগলামি করে, তা দেখে লোকে হাসে। রাগলে তো তুমি হেরে গেলে। আমার তো বেশ লাগে।

সুরাইয়া রাগ করলে, বললে—তোকে আমি বুঝতে পারি না গন্না। কি মতলব তোর? তুই কি ওই কাফেরের লড়কাকে শেষে ভালবাসলি?

গন্না আবার হাসলে—না আম্মা।

—তবে এ কথা বলছিস কি করে? কি করে তুই বললি আমার তো বেশ লাগে!

—আম্মা, একটি নারীর জন্যে কখনও একটি পুরুষ পাগল হয়—কখনও একটি পুরুষের জন্যে একটি নারী পাগল হয়—কিন্তু একজন চায় একজন চায় না। নয়তো মাঝখানে এসে দাঁড়ায় ধরম—নয়তো বংশের ইজ্জৎ—নয়তো দুই বংশের দুশমনি। তাই নিয়েই তো দুনিয়াতে সব থেকে বড় মসনভি লেখা হয়েছে, গজল লেখা হয়েছে! তবে তোমাকে এক বাত বলি মা—তুমি আমাকে যার হাতে দেবে দিয়ো—আমি তার ঘরেই সুখ হোক দুখ হোক মেনে নিয়ে জিন্দগী কাটিয়ে দেব।

সবিস্ময়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সুরাইয়া বলেছিল—তাকে তুই ভুলতে পারবি?

—জনাব আদিলকে ?

—হাঁ।

—ভোলার কথা দুসরা কথা আম্মা। ভোলা দুনিয়াতে অনেক কিছু যায় না। কিন্তু তাঁকে পাবার কথা—তাঁর সঙ্গে জীবন জড়াবার কথা আমি কখনও কল্পনা করি নি মা। সে আদমী বাঁধবার জন্যে নয়। তাঁকে আমি হজরতের মত মনে করি। দুনিয়াতে আগুনের চেয়ে জলুস কার বল—কিন্তু তাকে বুকেই বা জড়িয়ে কে ধরতে চায়, আঁচলেই বা বাঁধতে কে চায় বল ! মনে রাখার শামাদানে শ্রদ্ধার বাতিতে ও সব মানুষকে আলোর শিখার মত জেলে রাখলেই তাকে আঁধিয়ারায় দিশারীর মত আপনার করে পাওয়া যায়।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুরাইয়া মেয়ের মুখের দিকে।

গন্না বলে গেল—আমার খুব সাধ ছিল মা যে সাহিবউজজামানি বেগম জাহানআরার মত, আলমগীর বাদশার বড় বেটী বেগম জেবউন্নিসা সাহেবার মত জিন্দগীটা কাটিয়ে দেব। আমার কবরের উপর লিখবার জন্য বয়েৎ লিখে রেখে যাব—"দুনিয়ায় এসে গন্না ভজনা করেছিল খোদার ; তাই সে পেয়েছিল তামাম দুনিয়ার মহব্বতি। সুখী গন্না এখানে ঘুমিয়ে আছে।"

চোখে জল এল সুরাইয়ার। চোখ মুছে বললে—বেটী, তোর দিল আমি এবার বুঝতে পেরেছি। আমি তওয়াইফ ছিলাম—আমি বুঝি। দুনিয়াতে যাকে চাই তাকে না পেলে মানুষ দেওয়ানা হয়। কখনও দুনিয়ার উপর তার সব ভালবাসা জ্বলে ছাই হয়ে যায়—কখনও সেই ভালবাসা ফুলে ভরা গাছের মত ঝলমলে হয়ে ওঠে। তার ফুল ফোটে আসমানের মুখে খোদার দরবারের মুখে। সে খুব ভাগ্য বেটী। লেকিন—

একটু হাসলে সুরাইয়া। তারপর বললে—লেকিন দুনিয়া বেহেস্ত নয় বেটী। ওই গাছেও মানুষ কোপ মেরে কাটে—বলে তামাম ফুলগুলো নিয়ে গিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরব। আর ফুল ফুটতেও দেব না আর কেউ পরবে বলে। বেটী, বাদশাহ শাহানশাহ শাহজাহান—তাঁর বেটী সাহেবউজজামানি জাহানআরা বেগম ; বাদশাহ গাজী আলমগীর—তাঁর বেটী বেগম-সাহেবা জেবউন্নিসা—বেটী, তাদের জীবনের গাছে কুড়ুল মারবার কারুর সাহস হত না, হয় নি। কিন্তু তোর জীবনে রক্ষক কে ? শুধু তো মানুষ নয় বেটি জানোবর—গরু ভেড়া ছাগল বাঁদর উল্লুক পর্যন্ত হামলা করবে। সে যে কি জাহান্নমী হামলা সে তুই কল্পনাও করতে পারবি নে। আমি জানি, আমি তওয়াইফ ছিলাম। তা ছাড়া গন্না, পণ্ডিত শুকদেব বলে গেল হিন্দোস্তানে আঁধি আসবে। এখন রক্ষক না হলে কি করে চলবে ?

—যদি না-ই চলে বলে মনে কর তবে যা তোমার মনে হয় তাই কর।

—সেই জন্যে তোর মত চাচ্ছি বেটী। সারা হিন্দোস্তানের শহরে তোর নাম তোর গজলের সঙ্গে ছড়িয়েছে। তার উপর তোর নসীব তুই আমার পেটে জন্মেছিস। আমি জানি যে সব নবাবজাদা আমীর রইস তোকে চাচ্ছে তারা ভাবছে তোর মধ্যে শুধু একটি মেয়েকেই পাবে না—পাবে এক তওয়াইফের বেটীকে। এ কথা মনে হলে আমার আত্মহত্যা করতে ঝোঁক চাপে !

—তার জন্যে তোমার আপসোস কেন মা ? লাখো লাখো গরীব ঘরের লেড়কী বাঁদী হয়ে বিক্রী হচ্ছে ; তওয়াইফরা কিনে নিয়ে তাদের মানুষ করে তাদের তওয়াইফ করছে—তারা বাধ্য হয়ে তওয়াইফের জিন্দগীতে হাসে খেলে নাচে গায় আর খোদাকে ডাকে। অনেকে হয়তো ডাকেও না। তুমি তারই মধ্যে গজল তৈয়ার করেছ, মানুষে তোমাকে খাতির করেছে পেয়ার করেছে। খোদাতায়লার হুকুমতে নসীব তোমাকে তরফাবালীর জীবন থেকে ফরমান দিয়ে

খোলসা দিয়েছে—ঘর দিয়েছে—আমার আব্বাজানের মত বেহেস্তের দূতের হাতে তুলে দিয়েছে। তোমার শরম কিসের আম্মাজান? এমন আম্মা কার হয়?

চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল সুরাইয়ার। চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে—তবু তুই বল!

—না আম্মা। তুমি বলবে—আমি তোমার হুকুম মেনে সেই ঘরে চলে যাব।

আবার একটু ভেবে সুরাইয়া বললে—তা হলে নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলাকেই আমি পছন্দ করছি গন্না। শুকদেব বলছে—পচ্চিম তরফ না বেগম পুরব তরফে গন্নাকে সরিয়ে দাও। তা ছাড়া নবাব সফদরজঙ্গ তোর বাপকে দোস্ত বলেছে, আশ্রয় দিয়েছে। আর হারেমে আছে বহুবেগম, সে হল হিন্দুরা যাকে বলে দেওয়া তাই। বহুবেগম তোর চেনা মানুষ; তোকে সে পেয়ার করত। তুই তাকে বড় বহেনের মত মানবি। নবাবজাদার দোষ যাই থাক পণ্ডিত বলেছে তোর নসীবের ফলে সে হয়তো শুধরে যাবে। আর নবাবজাদা সুজাকে দেখেছিস তুই—আমার তো মনে হয় সারা হিন্দোস্তানে এমন মর্দানা সুরতওয়ালা আদমী আর দোসরা কেউ নাই।

—তাই হল মা। তাই!

আরও একটুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবলে সুরাইয়া বেগম, তারপর বললে—হাঁ ওহি ঠিক বাত। বাত—মর্জি খোদাকি খেল নসীবকে ইজ্জৎ ইনসানকি। মেয়ের ইজ্জৎ রাখে তার স্বামী। তোর ইজ্জৎ রাখতে নবাবজাদা সুজাই ভাল।

বলে বেরিয়ে গেল সুরাইয়া। ডাকতে পাঠাবে ইকবাল খাঁকে।

গন্না গুনগুন করতে লাগল আপনমনে।

"চামেলী ভালবেসেছিল চাঁদকে। আসমানে চাঁদ আপন খেয়ালে খোদার দরবারে রৌশন-বরদারিতে মশগুল। তার নেমে আসবারও উপায় নেই চামেলীরও আসমানে উঠবার ক্ষমতা নেই! চামেলী যদি গাছে জড়িয়ে উঠে অনেক উঁচুতে ফুল ফোটায় তবুও তা চাঁদের নাগাল পাবে না এ কথা চামেলী জানে—কিন্তু তার খুসবুটুক? তাও কি পৌঁছুবে না? হায় চামেলী এ জবাব তোকে কে দেবে?"

হঠাৎ সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দে চমকে উঠল গন্না।—কে? চাঁদ!

একটি পনেরো ষোল বছরের ছেলে। ইকবাল খাঁর ছেলে চাঁদ খাঁ। চাঁদ খাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, মুখ থমথমে, হাতে বন্দুক। সে ঘরে ঢুকে বললে—চুপ! চুপ করো সাহেবজাদী!

বলতে বলতে সে ঘরের ঝরোকার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়াল আত্মগোপন করে। তার পর টুপ করে বসে পড়ল—বন্দুকটার নল ঝরোকার উপর রেখে নিশানা করতে লাগল।

—কি চাঁদ? কি?

চাঁদ নিশানা করতে করতেই বললে—বান্দর।

—বান্দর? বান্দর মারবে কেন? চাঁদ—

চাঁদের বন্দুক গর্জে উঠল। চাঁদ বলে উঠল—ওই। ওই পড়ছে। ওই! উঠে দাঁড়াল সে। তার নির্দেশ অনুসরণ করে গন্না দেখলে তাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে যে বড় গাছগুলি তারই একটার ডাল নড়ছে। হঠাৎ দেখলে একটা বাঁদর—না বাঁদর তো নয় একটা মানুষ—মানুষ পড়ছে নিচে। লোকটা ডাল চেপে ধরতে চেষ্টা করছে কিন্তু ধরে থাকতে পারছে না বা ধরতেই পারছে না।

—এ যে মানুষ চাঁদ।

—হাঁ। দেখতে মানুষ কিন্তু মানুষ নয়, বান্দর। জবাহির সিং-এর পাঠানো বান্দর সাহেবজাদী! গাছে উঠে তীর ছুঁড়ে যারা জবাহির সিংএর দিল্লগী পৌছে দেয় তাদেরই একজন। পাতা লাগাতে লাগাতে আজ পাতা পেয়েছি। ওই পড়ছে। বলে সে ছুটে নেমে গেল।

চাঁদ খাঁ—কিশোর চাঁদ খাঁ অদ্ভুত। কিছুদিন হল ইকবাল খাঁ তাকে তার গাঁও থেকে এখানে আনিয়েছে। আনিয়েছে তাকে পাহারা দেবার জন্যে। ইকবাল খাঁ ভয় করে যে জবাহিরের আদমী কোনদিন রাত্রে গুঁড়ি মেরে মেরে যে সব চোরেরা বিল্লীর মত এসে বাড়ির খাঁজে খাঁজে উঠে হীরা জহরত চুরি করে চলে যায় তাদের মতই এসে হয়তো গন্নাকে মুখ বেঁধে ঘাড়ে করে নিয়ে পালাবে। তাই যে ঘরে গন্না আর সুরাইয়া বেগম রাত্রে ঘুমোয় সেই ঘরে পাহারা দিয়ে ফেরে চাঁদ খাঁ। চাঁদ খাঁ ইকবাল খাঁয়ের ছোট ছেলে। তাদের জায়গীরে চাঁদ খাঁ ছেলেবেলা থেকে আসে। ছেলেবেলায় একসঙ্গে তারা খেলেছে। গন্নার থেকে সে ছোট—ছোট ভাইয়ের মতই সে অনুগত। চঞ্চল দুঃসাহসী, শেরের বাচ্চার মত লাফ দেয় ছোটে—ভয় কাকে বলে জানে না।

কিছুক্ষণ পর সুরাইয়া বেগম এসে বললে—জবাহিরের আদমীকে আজ ঘায়েল করেছে চাঁদ। ধরা পড়েছে লোকটা।

—জানি মা। ওই ঝরোকা থেকেই গুলি করলে চাঁদ।

—হাঁ। লোকটা বললে কি জানিস?

—কি?

—জবাহির এবার মরীয়া হয়ে উঠেছে। সে আগ্রা শহরে এই কিল্লার ধারের মোকাম থেকে তোকে লুটে নিয়ে যাবে ঠিক করেছে! এখন চাঁদনী চলছে। আঁধিয়ারা হলেই সে ঝাঁপ দেবে। দক্ষিণে মারাঠী রাজা শিবাজী মহারাজা যেমন বরিয়াতের নাম করে দলবল নিয়ে পুনায় কেল্লা ফতে করেছিল তেমনি এক মতলব করবে!

—তার আগেই চল মা লক্ষ্ণৌ শহরে চলে যাই আমরা!

—হাঁ তাই ঠিক করেই এলাম। সওয়ার আজ রাত্রেই চলে যাচ্ছে লক্ষ্ণৌ।—বলে সুরাইয়া যেমন চঞ্চল পদক্ষেপে এসেছিল তেমনি ভাবেই চলে গেল। একবার ডাকতে হবে শুকদেব পণ্ডিতকে—একটা ভাল দিন দেখে দেবে পণ্ডিত।

গন্না হাসলে। জবাহির সিং! শুনেছি ব্রজমণ্ডলে বৈষ্ণবেরা রাধারাণীকে ভজনা করে। তুমি তাই করলে না কেন জবাহির সিং। ভিন্ন ধরমের এক লেড়কী—! হায় রে হায়!

* * *

আগ্রায় কিল্লার ঘাটেই যমুনা পার হয়ে সড়ক ধরে টুণ্ডলা। টুণ্ডলা থেকে ফিরোজাবাদ হয়ে শেরশাহী সড়ক ধরে কানপুর। সেখানে গঙ্গা পার হয়ে লক্ষ্ণৌএর পাকি সড়ক ধরে লক্ষ্ণৌ।

সাত দিন পর।

এই সাত দিনের মধ্যে আরও জটিল হয়ে উঠেছে অবস্থা। খবর এসেছে ওই অনুচরটির জখম হয়ে ধরা পড়ার পর জবাহির খোঁচা খাওয়া বাঘের মত হিংস্র হয়ে উঠেছে। দুনিয়ায় সে কারুকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। বাপ সুরজমলের সঙ্গে তার ঝগড়া চলছে। বাপকেও সে আমলে আনছে না। তার পিতামহ ঠাকুর বদনসিং মরবার সময় তার মাটির নিচে পোঁতা দৌলতের খবর ঠিকানা ছেলে সুরজমলকে না দিয়ে তাকেই দিয়ে গেছে। সে দৌলত অঢেল।

দৌলত আর বে-পরওয়া হিম্মৎ এক হলে আর রক্ষা থাকে মানুষের! দুনিয়া একখানা মাটির থালা হয়ে যায়। সে ঠিক করেছে আঁধিয়ারার জন্যেই বা সে অপেক্ষা করবে কেন? কার পরওয়া? আগ্রার কিল্লাদারের কাছে তার লোক যাতায়াত করছে। কত টাকা হলে আগ্রার কিল্লাদার উত্তর আর পশ্চিম দিকের কামানগুলোকে বোবা করে দেবে আর বুরুজের উপর থেকে সিপাহীদের স্রিফ এক দিনের জন্যে নামিয়ে নেবে?

সুরাইয়া বেগম আর অপেক্ষা করতে সাহস করে নি। ইকবাল খাঁও ভরসা দিতে পারে নি। লক্ষ্ণৌএর সওয়ার ফিরে এসেছে কাল সন্ধ্যায়। নবাব সফদরজঙ্গ খুব খুশী হয়ে লিখেছেন —উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে গন্নাকে লক্ষ্ণৌ আনবার ব্যবস্থা এক মাসের মধ্যেই তিনি করবেন। এবং আগ্রার ফৌজদার কিল্লাদারকে তিনি লিখছেন—সুরজমলকেও তিনি ভরতপুরে সওয়ার পাঠিয়ে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন। কিন্তু না। আর ভরসা করতে পারবে না।

আল্লার দুনিয়া কোরানের কানুন মানে না, হিন্দুদের ভগবানের জগৎ জগন্নাথের বিধান মানে না—সে চলে সোনার মোহরের চাকায়—দৌলত হয়েছে দুনিয়ার কানুনের কর্তা। জবাহির সিংএর দৌলত অনেক। বাপ সুরজমলও তাকে এই দৌলতের জন্যে তোষামোদ করছে।

* * *

সে দিন সকাল থেকে সাড়া পড়ে গেল—সুরাইয়া বেগম চলল জায়গীরে ফিরে। সেখানে তার মাটির কেল্লার মধ্যে পুরানো কামান বসিয়ে বারুদখানার বারুদ শুকিয়ে নিয়ে লড়াই দেবার জন্যে তৈয়ার হবে। ওদিকে লক্ষ্ণৌ থেকে আসছে নবাবের ফৌজ; এটোয়ার ঘাটে যমুনা পার হয়ে এসে পৌছুবে জায়গীরে। তারপর গন্না বেগম তার যৌতুক নিয়ে সাদীর জন্যে রওনা হবে লক্ষ্ণৌ। সকাল থেকে বয়েল গাড়ি সাজল, সওয়ার সাজল, তাঁবু উঠল; বেলা এক প্রহর হতে না হতে রওনা হয়ে গেল। দল পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছে স্বয়ং ইকবাল খাঁ।

বড় বড় হরিয়ানা জেলার বয়েল—সুন্দর একজোড়া করে শিং। গায়ে কড়ির সাজ, গলায় রূপোর ঘণ্টা—এক ঘড়িতে তারা দু'কোশ পথ চলতে পারে। গাড়ি তেমনি সুন্দর; উপরের ছাউনি রঙীন দামী কাপড় দিয়ে মোড়া। ভিতর আরও সুন্দর। তিনখানা বয়েল গাড়িতে বেগম তাঁর মেয়ে আর বাঁদীরা গেল—চারিপাশে তার ঘোড়সওয়ার।

সঙ্গে মালবোঝাই আরও গাড়ি। বেগমের বেটীর সাদী নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে। বিয়ের জন্যে সওদা নিয়ে যাচ্ছেন বেগম। আগ্রা শহর তোলপাড় হয়ে গেছে। দোকানীরা মাল নিয়ে ক'দিন ধরে এল আর গেল। দু'পহর হতে না হতে খালি হয়ে গেল বাড়ি—এত বড় আমীরী মোকান যেন খাঁ-খাঁ করতে লাগল। শুধু পঞ্চাশজন সওয়ার কিল্লার ঘাটে যমুনা পার হয়ে চলে গেল টুণ্ডলার দিকে—যাবে ফিরোজাবাদ। সঙ্গে তাদের চাঁদ খাঁ, আর ইকবাল খাঁর সঙ্গী দোস্ত এবং বীর যোদ্ধা জামিল খাঁ। ফিরোজাবাদের কাছে এক গাঁওয়ে এক দরগাহে আছেন ফকির—ওয়ালা সুলতান তাঁকে ভক্তি করতেন—যাবে তাঁর কাছে। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে তারা গিয়ে এটোয়ায় মিলবে সাদীর জুলুসের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে সাধারণ একটা বয়েল গাড়িতে চারজন বাঁদী ফকির সাহেবকে দেবার জন্যে চারখানা পরাতে ধূপ লবান ফলমূল মিষ্টান্ন তার সঙ্গে আরও জিনিস সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বাড়ি পাহারা দিয়ে রইল পঞ্চাশজন সিপাহী। বাড়ি ছেড়ে দেয় নি বেগমসাহেব। বাড়িটা রেখেছে। কেন না এই সাদীর পর তাকে এইখানেই বাস করতে হবে। জায়গীরে বাস করা সম্ভবপর হবে না জবাহিরের জুলুমে।

আট

টুণ্ডলা থেকে শেরশাহী সড়ক যেটা বাঙ্গাল মুলুক থেকে বরাবর চলে গেছে দিল্লী হয়ে পাঞ্জাব পার হয়ে পেশবর পর্যন্ত, সেই রাস্তাটা গেছে যমুনার পাশে পাশে এটোয়া পর্যন্ত। তারপর যমুনার ধার ছেড়ে চলে গেছে কানপুর। টুণ্ডলা থেকে ফিরোজাবাদ কোশ কয়েক পথ—এটোয়া তিরিশ কোশ হবে।

চাঁদ খাঁয়ের দল টুণ্ডলা থেকে ফিরোজাবাদ এসে ভেঙে চলে গেল ইসলামপুর গ্রামে বাবা মহম্মদ গোলামের দরগাহে, বৃদ্ধ ফকির পিয়ারা সাহেবের আস্তানায়। পিয়ারা সাহেব নাগা ফকির। নাঙ্গা হয়ে বসে থাকেন তাঁর আস্তানায়, আর গান করেন একতারের যন্ত্র বাজিয়ে। তাঁর গানগুলি বিচিত্র। ওয়ালা সুলতানের মত কবিও বলতেন—আল্লাহতায়লাকে না জানলে এ গীত কেউ তৈয়ার করতে পারে না—এমন করে গাইতে পারে না।

খোদা মেহেরবান দুনিয়াতে পোশাক পরিয়েছে তাদের, "যাদের কলিজায় আছে পাপের আগুন—যাদের চোখের দৃষ্টিতে সেই আগুনের কালি দুনিয়াকে করে কালো। আর যার মনে কলিজায় পাপের স্পর্শ নাই—চোখের দৃষ্টি যাদের সফেদ, তাদের ফরমান দিয়েছ—তুমি থাক নগ্ন।"

বাদশাহ শাহজাহানের সময় ইরান থেকে এসেছিলেন এক ফকির। মহম্মদ সৈয়দ। তাঁর ছিল এই বিচিত্র সাধনা। কত হিন্দু তাঁর শিষ্য হয়েছে। হিন্দু মুসলমান ইহুদী ক্রীশ্চানে তাঁর ভেদ ছিল না। সাধক কবি। ফকির হয়ে নাম হয়েছিল 'সরমদ'। তিনি গাইতেন—

"মন্দিরে আর মসজেদে হায় মৌলভী ইমাম তুমি তাঁকে
রাখ নি—
রেখেছ তাঁর পাথরকে আর কাঠকে।
যে কালো পাথরখানি আছে কাবার মসজেদে
সেই কালো পাথরেই হিন্দু খোদাই করে মূর্তি গড়ে
রেখেছে মন্দিরে।"

দারা শুকো তাঁর ভক্ত ছিলেন। খোদ শাহজাহান বাদশার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন ওই উলঙ্গ অবস্থাতেই।

বাদশা আলমগীর তাঁকে কোতল করবার হুকুম দিয়েছিলেন। সরমদ আলমগীরের তারিফ করে হাসতে হাসতে কোতলের পাথরের উপর মাথা রেখে গান তৈরি করে গেয়েছিলেন—

"আ—আজ এসেছে আমার পরম বন্ধু নাঙ্গা তলোয়ারের
রূপে—
আমি জানি মেহেরবান এ তোমার ছদ্মবেশ।
কত না ছদ্মবেশেই তুমি এসেছো আমার কাছে। এও
তোমার ছদ্মবেশ।
আজ তুমি নেবে আমায় কাছে টেনে। কি আনন্দ
আজ!"

এই সরমদ সাহেবের পথের পথিক তিনি। তাঁর শিষ্য। নিতান্ত বাচ্চা বয়সে দশ বছর বয়সে সরমদ সাহেব তাঁকে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হয়ে ডেকে শিষ্য করেছিলেন। ভিক্ষুকের ছেলে। জন্মান্ধ। সরমদ সাহেব নিজে তাঁর হাত ধরে নিয়ে পথ হাঁটতেন। তিনি নিজে

গাইতেন গান—তার সঙ্গে অন্ধ বাচ্চা শিষ্য কণ্ঠ মেলাতো। তিনি তাঁর নাম দিয়েছিলেন পিয়ারা। সেই থেকে তিনি পিয়ারা সাহেব।

চাঁদ খাঁয়ের দল এসে তাঁর 'ঝোপড়ি' অর্থাৎ কুটীরের সামনে দাঁড়াল। গাড়ি থামল। গাড়ি থেকে বাঁদীরা নামল পরাত নিয়ে।

ঝোপড়ির ভিতর থেকে পিয়ারা সাহেব প্রসন্নকণ্ঠে বললেন—এসেছো তোমরা ? আচ্ছা।

চাঁদ খাঁ কুর্নিশ করে বললে—হাঁ বাবাসাহেব, হজরতের দরবারে এসে গিয়েছি আমরা।

বোরকাপরা বাঁদীরা পরাত নিয়ে তাঁর সামনে রেখে তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুল চুম্বন করে তসলীম জানালে। একজন বললে—হজরৎ! আশীর্বাদ করুন!

হজরৎ বললেন—কই গন্না কই ?

একজন এগিয়ে এসে বললে—হজরৎ, এই আমি। হজরতের বাঁদী।

মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে অন্ধ বৃদ্ধ ফকীর বললেন—বেটী!

—হজরত!

—আমার সারা জিন্দগীভর যে গান একেবারে নিরালায় গেয়েছি সেই গান তোমাকে শুনিয়ে দি। তুমি নিজে সায়ের! তোমার আব্বা আম্মা দুই সায়ের। বল তো এ গীত তোমার কেমন লাগে! আর এ গীতে যে বাত বলেছে আমার অন্তর তা সত্যি কি না!

বলে দুটি আঙুল জুড়ে সামনে হাত বাড়িয়ে গাইলেন—"দিনের আলোর রোশনিতে তোমাকে দেখতে আসমানের দিকে তাকালাম। দেখলাম সূর্য তোমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলছে—আমাকে দেখ। চাঁদনী রাতে তাকালাম—দেখলাম চাঁদকে। সেও ওই কথা বললে। আঁধিয়ারা রাত—গগনে ঘোর ঘটা—সব থমথমা—কোথাও আওয়াজ নাই—তার মধ্যে তাকালাম—কেউ তখন আড়াল করে দাঁড়িয়ে নাই। বললাম—তা হলে তুমি কই ? তুমি বললে—আমিই তো দুখে দুর্যোগে অন্ধকারে তোমাকে জড়িয়ে ঢেকে রয়েছি পিয়ারা। এখন তো শুধু তুমি আর আমি—আমি আর তুমি। দেখছ না আর কেউ নাই, কিছু নাই—বিলকুল হারিয়ে গেছে!"

গন্না অভিভূত হয়ে গেল।

সুরাইয়া শঙ্কিতকণ্ঠে বললে—এ কি শোনালে হজরৎ ?

—কেন বেটী ?

—গন্নার নসীবে—।

—না না না। আমার কথা—আমার কথা সুরাইয়া। অন্ধা পিয়ারা সাহেবের কি সৌভাগ্য বল তো—সারাজীবন অন্ধ বলে সারাজীবনই তার মিলন—কখনও বিচ্ছেদ নাই। তোমার বেটীর গজলে নওজোয়ানির গান। সারা হিন্দুস্তান শুনে দেওয়ানা। তাই বুড়ো পিয়ারা সাহেব নিজের গানটা শুনিয়ে জানতে চায় এ গান তার কেমন লাগে ? আমার এ অনুভব এ কি মিথ্যে ?

—না হজরৎ—এর চেয়ে সত্যি বোধ হয় কিছু নেই।

—আচ্ছা আচ্ছা। এবার কিন্তু তোমরা রওনা হও। ডুলি বেহারা সব ঠিক আছে। বেহারালোক খুব বিশ্বাসী আর মজবুত—তা ছাড়া ওরাও হাতিয়ার ধরলে পাক্কা সিপাহী। রওনা হয়ে যাও! বিপদে ভয় করো না। সাহস করো। দেখবে বিপদের মধ্যেই খোদা আছেন তোমার খুব নগিচে—একদম বুকের কাছে!

* * *

এক মাস পর।

শুকদেব পণ্ডিত পিয়ারা সাহেবের ঝোপড়ির সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল, সঙ্গে তার চাঁদ খাঁ। অভিবাদন করে বললে—তসলীমৎ বাবাসাহেব।

অন্ধ পিয়ারা সাহেব বললেন—পণ্ডিত! এসেছ ভাই! সুবা থেকে যেন মনে হচ্ছে কোন মেহমান আসবে! এস ভাই বস!

—এ কি হল বাবাসাহেব?

—কি হল পণ্ডিত?

—আপনি কেন বারণ করলেন না হজরৎ,—সুরাইয়া বেগম তুমি আজ আর এগিয়ো না। হজরৎ তো সব দেখতে পান!

হেসে উঠলেন পিয়ারা সাহেব, বললেন—তামাশা করছ পণ্ডিত—অন্ধা আমি—আমি কি করে দেখতে পাব? বল!

—আপনি বললে আমি শুনব না হজরৎ—আপনি ললাটের নেত্রমে সব দেখতে পান। আমি খড়িতে দাগ টেনে ছক কেটে গুনে বলতে পারি আর আপনি দেখতে পান না এ আমি বিশ্বাস করব কি করে বলুন!

—না পণ্ডিত আমি দেখতে কিছুই পাই না। কিন্তু কেন পণ্ডিত? তুমি এমন আপসোস করছ কেন?

—করব না? গুল-এ-কমলের মত মেয়ে গন্না—তার ললাটে এ কি হল? গিয়ে সে পড়ল ফারাক্কাবাদে বাঙ্গাশ নবাবের বাড়িতে! এরপর তার তো আর দিল্লী না গিয়ে উপায় নেই হজরৎ। আঃ, সেদিন যদি আপনি তাকে বারণ করতেন যেতে! জাঠ জবাহির সিং কখনও আপনার এই দরগাহ তালাস করতে সাহস পেত না! কখনও না।

গন্না বেগম লক্ষ্ণৌ পৌছুতে পারে নি। তার বদলে গিয়ে পৌছেছে ফারাক্কাবাদে নবাব আহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশের বাড়িতে।

আড়াইশো সওয়ার ঘিরে নিয়ে চলেছিল চারখানা ডুলি। ফিরোজাবাদ থেকে বেরিয়ে চলেছিল এটোয়া। সেখান থেকে যাবে কানপুর। ভেবেছিল যে কৌশলের আবরণ টেনে দিয়ে তারা এই ভাবে চলেছে তাতে জবাহির গিয়ে হামলা করবে জায়গীরে। সেখানে ইকবাল খাঁ লড়াই দেবে জবাহিরের সঙ্গে। এদিকে সেই অবসরে চাঁদ খাঁ আর পঞ্চাশজন সওয়ারের পাহারার মধ্যে গন্নাকে নিয়ে সুরাইয়া বেগম কানপুরে গঙ্গা পার হয়ে পৌছে যাবে লক্ষ্ণৌ। কিন্তু জবাহির সিংএর দৌলত অঢেল। চর ছড়িয়ে রেখেছে সর্বত্র। তখন আগ্রা শহরের তামাম লোক সত্যিই বিশ্বাস করেছিল যে সুরাইয়া বেগম ফিরে চলল তার জায়গীরে। বেটীর বিয়ে হবে। এক মাস আয়োজন করে সমারোহের সঙ্গে যাবে লক্ষ্ণৌ ভার ভারোটা সাজিয়ে হীরা জহরত সোনা রূপা মোহর সিক্কা নিয়ে। তার তাঞ্জামের চারপাশে যাবে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দশ বিশ বাঁদী; তারা পরে থাকবে কিংখার মখমলের সালোয়ার পাঞ্জাবি মাথায় জরিদার টুপি কোমরবন্ধে তলোয়ার হাতে সোনা রূপার ডাণ্ডা। তার আগে পিছে থাকবে ইকবাল খাঁর হিন্দোস্তানী মুসলমান সিপাহীর দল। নাকাড়া নহবত বাজাতে বাজাতে চলবে সাজানো বয়েল গাড়ির উপর। তার সঙ্গে থাকবে দুই চার হাতী।

একথা সবাই বিশ্বাস করলেও জবাহির ঠিক খবর পেয়েছিল এবং উল্লসিত হয়ে একশো সওয়ার নিয়ে রওনা হয়েছিল ডিগ কিল্লা থেকে ওদের পিছন পিছন। গোবর্ধনের ঘাটে যমুনা

পার হয়ে জোর কদমে চলেছিল হাতে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে। হল্লা করতে মানা ছিল কিন্তু ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলো লুকনো যায় নি ; সে ধুলো গোবর্ধনের ঘাট থেকে বরাবর পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে উঠে আসমানে একটি দীর্ঘ ফালির মত লাল মেঘের সৃষ্টি করেছিল। মহাবন থেকে এটোয়ার কাছ পর্যন্ত রাস্তা কম নয়—তিরিশ কোশেরও বেশী।

আশপাশ গাঁওয়ের লোক শঙ্কিত হয়ে তাকিয়েছিল সেই লম্বা লালচে ধুলোর মেঘের দিকে।

তখনকার দিনের হিন্দোস্তানের লোক—তারা এ ধুলোর মেঘের মানে বোঝে। আজ ওঠে জাঠ ঘোড়সওয়ারের ক্ষুরে ধুলোর মেঘ, কাল ওঠে মারাঠা সওয়ারের ক্ষুরে, পরশু ওঠে রোহিলা আফগান সওয়ারের ক্ষুরে ; ওদিক থেকে ধুলোর মেঘ উঠে নিশানা দেয় লক্ষ্ণৌ নবাবের বাদক-শাহী সওয়ার ছুটে আসছে এদের রুখতে। কিন্তু কোন্ ঠিকানা কোন্ গাঁয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুঠতরাজ করে কেটে কুটে ঔরৎ ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে। তারা তাই কোলাহল করে ওঠে। গাঁয়ে গাঁয়ে পালাবার হিড়িক পড়ে। ঘরদোর ছেড়ে পালায়। মাঝে মাঝে দু'চারখানা বড় গ্রামে নাকাড়া পিটে গ্রামের জোয়ানরা হাতিয়ার নিয়ে তৈয়ার হয়ে দাঁড়ায়। তারা রুখবে। অন্ততঃ লড়ে জান দেবে। ইতিমধ্যে মেয়েছেলেরা যা পারে সম্বল সঞ্চয় নিয়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে কোন শহরে কিংবা কোন বড় শক্তিমান জমিদার জায়গীরদারের এলাকায় কিংবা বনে জঙ্গলে।

সুরাইয়া বেগমের দল এটোয়ার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছে সেই সময় পিছন থেকে ভেসে এল গাঁয়ে গাঁয়ে বেজে ওঠা নাকাড়ার শব্দ। এ শব্দের একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে। সে আওয়াজের মধ্যে যেন কেউ হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার বলে সাবধান করে দেয়।

চাঁদ খাঁর সঙ্গে ছিল জালিম খাঁ—ইকবালের দোস্ত বাল্য-সহচর ; বহু যুদ্ধের সঙ্গী। তার কান সতর্ক কান। মুহূর্তে ঘোড়ার লাগাম টেনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিল। তখন অপরাহ্ণবেলা। সূর্য যমুনার ওপারে আকাশের নিচের দিকে লাল হয়ে উঠেছে। সেই লালচে আলোর ছটায় মনে হল পিছনে ক্রোশভর রাস্তার মাথায় কোথাও লেগেছে আগুন—তারই ছটা বেজেছে আকাশে। লালচে হয়ে ধুলোর কণাগুলি আগুনের ছটা বাজা ধোঁয়ার পুঞ্জের মত ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয় এগিয়েও আসছে।

সুরাইয়া শুনতে পেয়েছিল ওই নাকাড়া। ডুলি থেকে নেমে সে আকাশের পানে তাকিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে ডুলিতে উঠে বলেছিল—জলদি—যত জলদি পার। হাঁকাও!

মানুষের স্বভাবধর্ম। পিছনে তাড়া খেয়ে সামনে ছোটে। সামনে তাড়া খেলে পিছন ফিরে ছোটে। পিছনে দুশমন, সামনের দিকে কিছুক্ষণ তারা প্রাণপণে ছুটেছিল। আরও ক্রোশ-খানেক গিয়ে তাদের দাঁড়াতে হয়েছিল। লাল ধুলো পিছনে আধকোশের মাথায় উঠছে। ওদিকে সূর্য ডুবে গেল যমুনার ওপারে বিস্তীর্ণ মাঠের কোলে। আবছা হয়ে এসেছে আলো। অন্ধকার গোল হয়ে যেন চারিপাশ থেকে ঘিরে নিচ্ছে।

জালিম খাঁ হুকুম দিয়েছিল—দাঁড়াও!

ঘোড়ায় চড়ে সে এসে সুরাইয়ার ডুলির পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আর লড়াই না দিয়ে দুসরা উপায় নেই বেগম-সাহেবা! আঁধিয়ারার মধ্যে ওরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়লে তখন আর ফিরে লড়াই দেবারও অবসর পাব না!

সুরাইয়া নেমে দাঁড়িয়ে দেখে বলেছিল—লড়াই দাও জালিম খাঁ! গন্না!

গন্নাও নেমে বলেছিল—মা!

—ভয় পাচ্ছিস ?

—না আম্মা!

—ধরা পড়লে মরিস যেন। বেঁচে থাকিস নে। নে ডুলিতে ওঠ—জালিম খাঁ—

—হুজুরাইন!

—তোমরা লড়াই দাও। আমরা ডুলি তুলে চাঁদ খাঁ আর দশজন সওয়ার নিয়ে সামনের দিকে চলি। কি বল তুমি ?

জালিম খাঁ মুহূর্তে ভেবে নিয়ে বলেছিল—ভাল বলেছেন হুজুরাইন। তবে আর এক বাত বল।

—বল।

—বিশ সওয়ার সঙ্গে নিয়ে যান। সামনে এগিয়ে গিয়ে এটোয়ার আগে দুটো রাস্তা। একটা বাঁয়ে উত্তর-মুখে ফারাক্কাবাদ। এদিকে সিধা কানপুর। দু' কোশ আগে। ওখানে দু'ভাগ হয়ে যান। দুই ডুলি দশ সিপাহী চলুক সামনে কানপুরের পথে। দুই ডুলি দশ সিপাহী চলে যাক ফারাক্কাবাদ। আমাদের মেরে সামনে যখন ছুটবে তখন ওরা কানপুরের পথে ছুটবে। কানপুরের পথে যারা যাবে তারা মশাল জ্বালবে মাঝে মাঝে। ফারাক্কাবাদ অন্ধকারের মধ্যে। খোদার মেহেরবানি আর আপনাদের নসীব, পৌঁছে যেতে পারেন ফারাক্কাবাদ।

—কিন্তু দুই ডুলি যাবে কানপুর—তুমি কি বলছ বাঁদী—

—না হুজুরাইন—খালি যাবে ডুলি।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুরাইয়া বলেছিল—তাই ভাল জালিম খাঁ। তাই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠেছিল ডুলি। জালিম খাঁ বার বার বলেছিল—খোদা হাফিজ! খোদা হাফিজ! তারপর শেষ বলেছিল সিপাহীদের—জিন্দগীর নিমকের দেনা শোধ হয় সব খুন ঢেলে দিয়ে। কেন না খুনের বিন্দুতে নিমক মিশে থাকে। আলাদা করা যায় না। নিমক শোধ করনা। তোমরা মুসলমান! হিন্দুস্তানী!

* * *

সেই উপায়েই পরিত্রাণ পেয়েছে সুরাইয়া আর গন্না বেগম। লক্ষ্ণৌর বদলে এসে উঠেছে ফারাক্কাবাদে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে জবাহির সিং। জালিম খাঁ তার সঙ্গে প্রাণপণে লড়ে নিমক শোধ করেছে। দু'ঘড়ির উপর আটকে রেখেছিল। তার সিপাহী তিরিশজন আর জবাহিরের একশো। কতক্ষণ লড়বে ? জবাহির তারপর দল নিয়ে কানপুরের পথে ছুটে খালি ডুলি লুঠে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে।

পথে গন্না যেন কেমন হয়ে গেছে। শান্ত সে চিরকাল কিন্তু কেমন চিন্তামগ্ন হয়ে গেছে। এমন কি গজলও আর গায় না বানায় না। চুপচাপ বসে থাকে।

নবাব আহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ পরম সমাদরে তাদের স্থান দিয়েছেন। এবং উজীর-এ-আজম সাহেবউদ্দীন ইমাদ উল মুল্ক গাজিউদ্দিনের সঙ্গে গন্নার বিবাহের প্রস্তাব করেছেন।

সুরাইয়া বেগমের মত নাকি টলেছে।

কথাটা বলেছে চাঁদ খাঁ। চাঁদ খাঁকে সুরাইয়া বেগম পাঠিয়েছে পণ্ডিতের কাছে। তার মতটা সে জানতে চায়। তিনি বলেছেন, একবার তবু আবার জানতে চায়। সেই সঙ্গে সে এও জানতে চায় যে পণ্ডিতদের শাস্ত্রমতে কোন ক্রিয়াকর্ম করে গন্নাকে কোন রত্ন ধারণ করিয়ে নিরাপদ করা যায় কি না! পণ্ডিত পশ্চিম তরফ অর্থাৎ দিল্লীতে যেতেই বারণ করেছেন। তার

খণ্ডন কিছু আছে কি না!

পণ্ডিত শুকদেব বার বার হায় হায় করেছে। সেদিন যাবার আগে সুরাইয়া বেগম আর তাকে ডাকে নি। কোন রকম গোলমাল হবে ভয়েই বোধ হয় ডাকে নি, কিন্তু যে দিন তারা বেরিয়েছে সে দিনটা ছিল বড় খারাপ। তার উপর যে প্রহরে বেরিয়েছে সে সময়টায় শনিচর মঙ্গল আর রাহু তিন গ্রহের মন্দ দৃষ্টি পড়েছিল দুনিয়ার উপর। আর উত্তর তরফ আগলে দাঁড়িয়েছিল যোগিনী।

শুকদেব রওনা হয়ে পথে ফিরোজাবাদ পার হয়ে পিয়ারা সাহেবের কাছে এসে তাই অনুযোগ করেছে—হজরৎ, আপনি তাদের যেতে দিলেন কেন? সব জেনে আপনি এ কি করলেন?

পিয়ারা সাহেব বললেন—আমি তো অন্ধা ভাই পণ্ডিত। আমার কোলের কাছে তুমি বসে আছ আমি দেখতে পাই না। মাথার উপরে সূর্য জলছে তা আমি দেখতে পাই না। কি করে দেখব এখান থেকে দশ বিশ কোশ দূরে দু'প্রহর বাদে কি ঘটবে সেই সব কথা?

শুকদেব বলেছিল—হজরৎ, ছলনা যার সঙ্গে করেন করুন শুকদেবের সঙ্গে করে কি কায়দা আপনার। আমার তো সব মালুম আছে!

—বিশ্বাস কর পণ্ডিত আমার মালুমে কিছু নাই। কুছ না পণ্ডিত কুছ না। সিফ এক বাত মালুম আছে কি যে দুনিয়ায় যা ঘটে সব খোদার মর্জি। আর তাতে আখেরে যা হয় তাই ভাল। বীজ ফেটে যখন অঙ্কুর বার হয় পণ্ডিত তখন তো তাতে ফুলও ফোটে না ফলও ধরে না। তখন তার বিচার হয় না ভাই। আমি বলি ভাই সব অঙ্কুরেই জল দাও। কোন ফল না কোন ফুল ধরবেই।

—বিষ ফল যদি হয়—

—যদি হয় ওতেও কিছু কাম হবে ভাই। হেকিম নিয়ে দাওয়াই বানাবে। ভাই, হিন্দোস্তানের কবিরাজরা সাপের জহর থেকে দাওয়াই বানায়।

উত্তপ্ত হয়ে উঠল শুকদেব। বললে—হজরৎ, আপনার মত মানুষের কাছে এ বাত শুনব মনে করি নি। অন্য লোক হলে বলতাম সে উজীরের কাছে ঘুষ খেয়ে এই কথা বলছে। আমি জানি হজরৎ—ইমাদের ছক আমি তৈয়ার করে দেখেছি। গন্নার সাদী ওর সঙ্গে হলে গন্নার দুখ আর লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। বন্ধনযোগ হবে ললাটে!

—তুমি তাহলে বারণ করো পণ্ডিত। আমি ভাই ঝুটা বাত বলি না। আমি ওসব কিছু জানি না!

—বলব বলেই যাচ্ছি হজরৎ।

—পণ্ডিত!

—হজরৎ!

—হাতের রেখা আর ললাটের রেখা থেকে সব জানা যায়, বলা যায়?

—যায়, জরুর যায়! কিন্তু এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

—আমি তো অন্ধা। আমি নিজে তো অন্ধা। জানি না। ঠিক বুঝি না। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।

—তসলীমাৎ হজরৎ—আমি উঠলাম তাহলে!

—উঠলে? চলে যাচ্ছ? গোস্সা করে যাচ্ছ পণ্ডিত?

—না জনাব। আপসোস করছি কি আপনি বারণ করলেন না গন্নাকে! আঃ!—

—আমি বলেছি পণ্ডিত আমি জানি না!

—জানেন!

—না। তুমি আজ থেকে যাও পণ্ডিত—তাহলে তোমার কাছে ব্যাপারটা সমঝে নি। থাক থাক পণ্ডিত। খানাপিনা কর। আমাকে সমঝিয়ে দাও। আমার নসীবটা গুনে বলে যাও!

—আসবার সময়, হজরৎ। আসবার সময় বলে যাব আপনার নসীব।

—তার আগে যদি মরি?

হেসে উঠে শুকদেব বললে—না হজরৎ, আপনি এখনও অনেক দেখবেন! চললাম হজরৎ।

—খোদা হাফিজ পণ্ডিত! খোদা হাফিজ!

চলে গেল শুকদেব পণ্ডিত।

নয়

কাবুল শহরে বাদশাহী-প্রাসাদে শাহ আবদালী অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে পায়চারি করছিলেন। তাঁর হাতে এক চিঠি। সামনে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবের এক আফগান। তিনি যে সব আফগানদের পাঞ্জাবে রেখে এসেছিলেন তাদেরই একজন। সে শাহের মুখ দেখে ভীত হয়েছে।

আবদালী পায়চারি থামিয়ে বললেন—তুই কি জানিস বল্।

সে প্রশ্ন বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল।

—আরে উল্লু, মুঘলানী বেগম বেটী লিখেছে সে কয়েদখানায় আছে। কি রকম কয়েদ রে উল্লু।

—জাঁহাপনা, উজীর ইমাদ উল মুল্কের বাড়ির কাছেই একখানা বাড়িতে কয়েদ করে রেখেছে। ছোট একটা মোকাম। বাড়িতে হরঘড়ি পাহারা। পহেলে উজীর হুকুম দিয়েছিল লাহোরেই তার কিল্লার অন্দরে কয়েদ থাকবে, কিন্তু পাছে কোন রকম গোলমাল করে কি জাঁহাপনার কাছে খবর ভেজতে পারে তাই ফের হুকুম পাঠায়—দিল্লী ভেজো বেগমকে। বেগমকে আর উমধা বেগমকে নিয়ে দিল্লীতে এনে ওই বাড়িতে কয়েদ করে রেখেছে। কোন আদমীর হুকুম নাই অন্দরে যাবার। কারুর সঙ্গে মুলাকাৎ করতে পায় না। কাউকে কোন খত লিখতে পায় না। অন্দরে থাকে। খানাপিনা ভি আচ্ছা মেলে না। নাচা না, গানা না। সিরাজী না। বেগমসাহেবা এক এক ওয়াক্ত নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে কাঁদে। দু'বাঁদী আর এক খোজা বান্দা। উ বান্দা লুকিয়ে ভাঙ এনে দেয়। বেটে তাই খায়। উজীর বলে বেগমের শ্বশুরের, মীর মান্নু সাহেবের বাপের লুকনো দৌলতখানা যা দিল্লী শহরের মোকামে আছে সে খবর দিলে সে বেগমকে আচ্ছা হালে রাখবে আর তবেই উমধা বেগমকে সাদী করবে।

—তুই কি করে ঘুষলি সে বাড়িতে?

—বেগমসাহেবার এক বাঁদী, এক রোজ রাতে আমাকে বাগিচার দরওয়াজা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে দরওয়াজার নাসাকচীকে আরকের জন্য এক মোহর দিয়ে বন্দবস্ত করেছিল।

—হাঁ!

শাহ আবদালী আরও ক'বার ঘুরলেন ঘরের মধ্যে। এমন সময় আফগান সিপাহী ঘরে ঢুকে বললে—আশরফ উন উজরা আমীর ই কবীর-মুখতারও মুশীর শাহ ওয়ালী খান বাহাদুর!

—ওয়ালী খান ওয়ালী খান ভিতরে এস। বলে নিজেই ক'পা এগিয়ে গেলেন শাহ

আবদালী।

ওয়ালী খান ঘরে ঢুকে কুর্নিশ করে দাঁড়াল। শাহ্ অসময়ে তাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। শাহের উত্তেজিত অবস্থা দেখে ওয়ালী খান নিজে কোন প্রশ্ন করলে না। শাহ বললেন—দিল্লী থেকে খত এসেছে। মুঘলানীকে ইমাদ নিয়ে গিয়ে কয়েদ করেছে। বহুৎ চেষ্টা করে সে এই খত পাঠিয়েছে। পড়ো! চিঠিখানা তার হাতে দিলেন। তারপর আফগানটাকে আবার প্রশ্ন করলেন—সে বদমাশ শিয়ার,—হাঁ ইমাদ শিয়ারের মাফিক চালাক আর তেমনি ডরপোক বুশদিল—সে কি সেই নাচনেওয়ালীর বেটী আর উ কুইলি খাঁর বেটীকে সাদী করেছে? হয়ে গেছে সাদী?

—সাদী শিগগির হবে। ও লেড়কী ফারাক্কাবাদে আহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশের বাড়িতে আটক আছে, উজীর ফারাক্কাবাদে রওনা হোনেবালা আমি দেখে এসেছি।

—শয়তান লুচ্চা ইমাদ উল মুল্ক। আপনা মামেরা বহেন যার সঙ্গে সাদীর কথা এতদিনের, তাকে ছেড়ে তয়ফাওয়ালীর বেটীকে সাদী করবে!

চিঠিখানা পড়া শেষ করে ওয়ালী খান কথা বলবার সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সুযোগ পেয়ে বললে—বহুৎ শরমকি বাত জাঁহাপনা!

—বহুৎ শরমকি বাত! মুঘলানীর পক্ষে বহুৎ বেইজ্জতির বাত। চিঠি তুমি পড়লে?

—হাঁ জাঁহাপনা।

—কি শল্লা তোমার?

—জাঁহাপনা, পাঞ্জাব আমাদের বেদখল করেছে। আমাদের তো ফিন্ দখল করতেই হবে!

—জরুর! এবার আমি তামাম পাঞ্জাব ছিনিয়ে নেব। দিল্লীও আমি যেতে চাই।

—মুঘলানী বেগমকে আপনি ধরমবেটী বলেছেন—তাকে উদ্ধার করা আপনার ইমানের কাম জাঁহাপনা। তার উপর মুঘলানী লিখেছে জাঁহাপনা দিল্লী এলে শাহ নাদেরের মত দৌলত পাবেন। আমি জাঁহাপনাকে তামাম খবর দেব কার কার ঘরে দৌলত লুকনো আছে। আমার শ্বশুরের যে দৌলতখানা তার সন্ধান আমি জানি। ঘড়া ঘড়া আশরফি সোনা রুপা জহরত মাটির নিচে গাড়া আছে। ছাদের তলায় খোপরিতে সোনা চাঁদির বাসন আছে। আমি সব বলে দেব।

—হাঁ হাঁ। আমি যাব, জরুর যাব।

—হাঁ জাঁহাপনা—এ সুযোগ গেলে হয়তো ফিরবে না। খোদ বাদশা আলমগীর ইমাদের উপর নারাজ। মীরবক্সী সিপাহশালার নাজিবউদ্দৌলা ইমাদের দোস্ত নয়। সেও নারাজ। ইন্তিজামউদ্দৌলা তার চাচেরা ভাই—সে তার দুশমন। এ সময় গেলে হয়তো ফিরবে না।

—হাঁ হাঁ। ঠিক বলেছ। যেতে হবে। তুমি পরওয়ানা জারি করো। হিন্দোস্তান আমি চষে দিয়ে আসব। যত বেইমান নিমকহারাম আছে হিন্দুস্থানী বাদশাহী দরবারে সব আমি খতম্ করে দেবে। ইমাদকে আমি—

ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল শাহের মুখ। শাহ তাঁর নাকের উপরের রুপোর খোলসটা খুলে ফেললেন। তাঁর নাকের উপরে একটা ক্ষত। সেটা ঢাকা দিয়ে একটা রুপোর ঢাকনা পরে থাকেন শাহ আবদালী। উত্তেজনায় রক্তের চাপে ক্ষতটা টনটন করছে। কিন্তু তাতে খুশী হয়ে উঠলেন শাহ। এ তাঁর ভাল লক্ষণ। এক হিন্দু সাধু ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী স্বামী প্রাণপুরী তাঁকে এ কথা বলে গিয়েছেন। গজনীর কাছে এই সাধুর সন্ধান পেয়ে আবদালী তাঁকে এই নাকের ঘায়ের জন্যেই আনিয়েছিলেন। হিন্দু সন্ন্যাসীদের অনেক শক্তির কথা শুনেছেন তিনি

—তারা জাদু জানে—অনেক দাওয়াই জানে যা কোন হাকিম জানে না, হিন্দু কবিরাজ জানে না, কিরিস্তান মুলুকের 'ডাগডর'-লোকেরা জানে না। এই নাকের ঘায়ের জন্য কষ্ট আর আপসোসের তাঁর সীমা ছিল না। তাঁকে বলেছিলেন—এইটে আমার ভাল করে দাও। অনেক খেলাত নজরানা আমি দেব। না যদি পার তবে গর্দান দিতে হবে। সন্ন্যাসী ঘা দেখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—বাদশাহ, তার আগে একটা কথা আমি জানাতে চাই। ও বাত বিলকুল শুনে যা ফরমায়েশ শাহের তাই আমি করব। বললে জরুর আরাম করে দেব আমি।

শাহ বলেছিলেন—বলো কি বাত তোমার?

—শাহ, আমি দেখছি তোমার ললাট থেকে কি তোমার যে এই নাকের ঘা এটি হল তোমার বাদশাহীর মূল। শাহ, এই ঘা হওয়ার পরই তুমি বাদশাহ হয়েছ। আর এই ঘা যত বাড়ছে তোমার বাদশাহীর সীমানাও তত বাড়ছে। এ কমলে কমে যাবে সীমানা। একদম ভাল হয়ে গেলে—

চুপ করে গিয়েছিলেন প্রাণপুরী। শাহ চমকে উঠেছিলেন। মনে মনে মিলিয়ে খতিয়ে দেখে নিয়েছিলেন হিন্দু সন্ন্যাসীর কথা। ঠিক বলেছে ফকীর! বিলকুল মিলে যাচ্ছে!

শাহ বলেছিলেন—তসলীমাৎ কাফের সন্ন্যাসী তোমাকে। হাঁ বাত তোমার বিলকুল ঠিক। বহুৎ উমদা বাত বলেছ। এ ঘা আমার থাকবে। হাঁ থাকবে। এর জন্যে তোমাকে আমি খেলাত দেব। নজরানা দেব।

তা দিয়েছিলেন তিনি। ঠিক কথা সন্ন্যাসীর—ঘায়ের শুরুতে ইরান থেকে শাহ নাদিরের মৃত্যুর পর কান্দাহারে আবদাল আফগানদের মালিক হয়েছিলেন। ঘা-টাও বাড়ছে তাঁর বাদশাহীর এলাকাও বাড়ছে। কাবুল—সমস্ত আফগানিস্তান—বেলুচদের বেলুচিস্তান, তারপর পেশওয়ার পার হয়ে পাঞ্জাবের লাহোর মুলতান পর্যন্ত। এবার ঘা টনটন করছে—বাড়বে। সীমানা চলবে দিল্লী তক। না—দিল্লী পার হয়ে—।

খুশী হয়ে উঠলেন আবদালী।

* * *

এ দুনিয়া মাটিতে জলে যত বিশাল তত বিরাট। হিন্দুও বলে মুসলমানও বলে, আল্লাহ-তায়লার মর্জিতে ভগবানের ইচ্ছায় ঘটে সমস্ত কিছু। তাঁরই খেয়ালে একই সময়ে হাজার ক্রোশ দূরে থেকে মা যখন ভাবে তার দূর মুল্লুকে যাওয়া ছেলের কথা, ঠিক তখনই ছেলেও ভাবে মায়ের কথা। দুশমন যখন দুশমনকে খুন করার কথা ভাবে কখনও কখনও খোদার মর্জিতে ভগবানের ইচ্ছায় ঘুমন্ত দুশমনও দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে ওঠে। যদি কেউ বলে এ মিথ্যে কথা ঝুটা বাত, তবে কোন তকরার নেই কিন্তু এমন ঘটে—এ কথা দুনিয়াতে সত্যি—এর হাজার প্রমাণ মিলবে। সে দিনও ঠিক তাই হয়েছিল। ফারাক্কাবাদ শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে পড়েছিল উজীর-এ-আজম ইমাদ উল মুল্কের ছাউনি। সেই ছাউনিতে ইমাদ উল মুল্কের খাস তাঁবুতে ঠিক এই কথাই বলছিলেন নবাব আহম্মদ খাঁ বাঙ্গাশ আর ইমাদ উল মুল্ক।

ইমাদ উল মুল্ক দিল্লীতে মুঘলানী বেগম আর উমধা বেগমকে নজরবন্দী করে রেখে এখানে এসেছেন গন্না বেগমের জন্যে। তাকে ওঁর চাই! আজই এসে পৌঁছেছেন।

ইমাদ বলছিলেন—খান-ই-জমানের বেগমকে আমার সালামৎ দিয়ে বল তিনি যেন নারাজ না হন। বল খান-ই-জমান যখন দিল্লীতে মারা যান তখন তাঁর কাছে বলেছিলাম, আমি গন্নাকে সাদী করতে চাই। তিনি নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলার কথা বলেছিলেন—ডরও

করেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম—ডর করবার কিছু নাই। সফদরজঙ্গ নবাবকে কেমন করে আমি দিল্লী থেকে তাড়িয়েছি নিজের চোখে খান-ই-জমান দেখেছেন। দরকার হলে সুবা অযোধ্যা চষে দেব আমি। আর সাদীর পর তাঁরা দিল্লীতে চলে আসবেন। লক্ষ্ণৌর নবাবের পরওয়া করবার জরুরৎ হবে না। খান-ই-জমান আমাকে তাঁর বাত দিয়েছিলেন।

নবাব বাঙ্গাশ বলেছিলেন—বেগমকে এক কাফের পণ্ডিত বলেছে গন্নার বিয়ে পুব তরফে দিতে, পশ্চিমে নাকি হিন্দোস্তানের ললাটে আঁধি উঠছে! আর গন্নার ললাট এমন যে সেই আঁধিতে পড়লে একদম আঁধির মুখে গাছের খসে পড়া পাতার মত কোথায় উড়ে যাবে। ধূলোবালির মধ্যে নাজেহাল হয়ে লেপটে যাবে।

হাসলেন ইমাদ উল মুল্ক।—ওই হিন্দু পণ্ডিতকে ডাকান নবাব-সাহেব, তাকে মুঠো ভর আশরফি দেব আমি—সে এবার দুসরা মত দিয়ে যাবে। আর পচ্চিম তরফের আঁধি তো আবদালীর আঁধি। এবার দুনিয়া দেখবে হিন্দোস্তানী বাদশাহীর হিম্মৎ। তাকে তল্পিতল্পা নিয়ে ফিরিয়ে দেব আমি!

—কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলব?

—নিশ্চয় বলবেন নবাবসাহেব!

—উমধা বেগমকে সাদী করার কথা আপনার বহুৎ দিনের। আপনার মামেরা বহেন। মুঘলানী যাই করুন মীর মান্নু সাহেব হিন্দোস্তানের সব থেকে বড় ঘরানা রইস খানদানী আমীর। তার বেটীকে সাদী না করে গন্নাকে সাদী করবেন এতে আমীর উমরা মুসলমানেরা খুশী হবে না, নারাজ হবে। পহেলে উমধাকে সাদী করুন তারপর—

বাধা দিয়ে ইমাদ বললেন—নবাবসাহেব, মুঘলানী এক শয়তানী। আমার মামাসাহেব থাকতে যখন সাদীর বাত পাক্কা হয় তখন মুঘলানী কোরানের মলাটের উপর আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে—"উমধাকে সাদী করে আর দুসরা সাদী আমি করব না।" নবাব বাঙ্গাশ মুলক্-ই-ইন্তিজামি, রাজনীতি এ এক কথা—এতে আজ যা বলি তা কাল না মানি, কোন গুনা হয় না। লোকে বলে বাদশা আহম্মদ শা আমাকে কোরান হাতে দিয়ে বলিয়েছিল আমি তার কোন ক্ষতি করব না। কিন্তু তারপর আমিই তাকে বাদশাহ থেকে খারিজ করে অন্ধ করেছি—কুয়েদ করে রেখেছি। না নবাবসাহেব, আমি কিছু করি নি। সব পরওয়ানায় সহি করেছেন বাদশাহ আলমগীর। আমি তাঁর হুকুম তামিল করিয়েছি। এখানেও তাই করব নবাবসাহেব। উমধাকে সাদী করে আর সাদী আমি করব না। তার আগে তো সাদীতে দোষ নাই। গন্নাকে সাদী আমাকে পহেলেই না করে উপায় নেই।

বাঙ্গাশ বিস্ময়ে অবাক হয়ে এই তরুণ উজীর-এ-আজমের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বিস্ময় অনুভব করেই হেসে ইমাদ বললেন—নবাব বাঙ্গাশ সাহেব! ইমাদ উল মুল্ক ধরম জরুর মানে। কিন্তু সে বুদ্ধির খেলে ধরমের তলোয়ারের উপর মাথায় হিন্দোস্তানের ভাবনার বোঝা নিয়ে চলে—তার পায়ে একটু রক্ত পড়ে না। ধরমকে অন্ধার মত মানা এক বাত আর বিচার করে মানা আর এক বাত। তবুও আমি মানুষ। দুনিয়াতে আমার এক ঠাঁই চাই যেখানে আমার আনন্দ মিলবে। সে মিলবে গন্নার কাছে।

বাইরের নাসাকচী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল।

উজীর ইমাদ তার মুখের দিকে তাকালেন—কি?

—এক লেড়কা এসেছে বেগম খান-ই-জমানের বাড়ি থেকে।

—বেগম সুরাইয়ার বাড়ি থেকে? চাঁদ খাঁ? বাঙ্গাশ বললেন।

—হাঁ হুজুর, নাম বললে চাঁদ খাঁ। উজীর-ই-আজমকে তসলীমাৎ জানিয়েছে।

উজীর বললেন—নিয়ে এস এখানে।

চাঁদ খাঁ এসে কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে বললে—খোদাবন্দের কাছে এক খত এনেছি।

—কে পাঠিয়েছে? খান-ই-জমান বেগম?

—না জনাব আলি—সাহেবজাদী ভেজিন হ্যায়।

—সাহেবজাদী? গন্না বেগম?

—হাঁ জনাব।

ইমাদ উল মুল্ক চঞ্চল হয়ে উঠলেন মুহূর্তের জন্য—কিন্তু মুহূর্তপরেই আত্মসংবরণ করে হাত বাড়ালেন।

হাঁটু গেড়ে বসে চাঁদ খাঁ রুমালের উপর ধরলে খতখানি।

ইমাদ-উল মুল্ক তুলে নিলেন। সুন্দর কাগজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর। ধীরে ধীরে খুললেন পত্র। পড়লেন। মুহূর্তে মুহূর্তে মুখে কখনও রক্তোচ্ছ্বাস ছুটে এল কখনও সাদা হয়ে গেল। পড়া শেষ করে চিঠি বন্ধ করে বললেন—সাহেবজাদী কি করে দেখলেন এই কয়েদীকে?

চাঁদ খাঁ কুর্নিশ করে বললে—সাহেবজাদী দেখবেন কি করে খোদাবন্দ, আমার কাছে শুনেছেন তিনি। আমি আজ দু'পহর বেলায় খোদাবন্দের এই ছাউনি দেখতে এসেছিলাম। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। খোদাবন্দ সাহেবজাদীকে সাদী করবেন—আমি সাহেবজাদীর তাঁবেদার, তাঁদের দেওয়ানের বেটা, শুনে ফৌজদার আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন। কয়েদখানায় এই কয়েদীকে দেখে আমার তাজ্জব লাগল। আমি তাই বলেছিলাম।

—কি দেখলে তাজ্জবের—কি বললে সাহেবজাদীকে? কয়েদী তোমাকে কি বলেছিল?

—কয়েদী আমাকে কিছু বলে নি খোদাবন্দ। আমিও তাকে কিছু বলি 'নি। অবাক লাগল কি তার এক চোখ কানা হয়ে গেছে—বহুৎ টাটকা কানা হয়েছে। সুই দিয়ে গেলে দিয়েছে। ফুলে আছে চোখটা। সারা মুখে চিচকের দাগ। সামনে তার রুটি আর পানি—কিন্তু তার ওই একটা চোখই আকাশের দিকে। দুটো কাক এসে রুটি ঠুকরে খাচ্ছে—তার হোঁশ নেই। নাসাকচী তাকে বলছে—এই কৌয়াতে রোটি খেয়ে নিচ্ছে—খেয়ে নাও রোটি। সে বললে—ভুখা ওরও লেগেছে ভাইয়া—ওই খাক! নাসাকচী বললে—তোমাকে যে উপোস করতে হবে। তিন চার রোজ থেকে উপোস করছ। সে বললে—মর্জি খোদাকি। নাসাকচী বললে—ও কথা আর কত শুনব। চোখ একটা গেলে দিলে—বললে খেল নসীবকা। কেন—খেলই বা নসীবের কেন খোদারই বা মর্জি কেন? উজীর সাহেব তসবীর এঁকে দিতে বললে—তুমি দিলে না। বললে—ইজ্জৎ আমার। এঁকে দিলে ইজ্জৎ কি যেত তোমার? সে উত্তর দিলে না—হাসলে। নাসাকচী বললে—শেষতক তোমার গর্দান যাবে। সে বললে—আমার ইজ্জৎ সেইখানে বাঁচবে ভাইয়া। নসীব হেরে যাবে। আমার তাজ্জব লাগল—গিয়ে আমি বলেছিলাম সাহেবজাদীকে। সাহেবজাদী আমাকে ভাইয়ের মত পেয়ার করেন। আমার বড় বহেনের মত তিনি। আমিই তাঁর পাহারাদার। সাহেবজাদীকে গিয়ে তাই বললাম। শুনে তিনি এই চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন।

—হুঁ। চুপ করে রইলেন উজীর।

নবাব বাঙ্গাশ প্রশ্ন করলেন—কি লিখেছে গন্না বেগম? কয়েদীর কথা—কোন্ কয়েদী?

চিঠিখানা উজীর তাঁর হাতে দিলেন।

নবাব বাঙ্গাশ দেখলেন গন্না বেগম চিঠিতে লিখেছে—"হিন্দোস্তানের উজীর-ই-আজম দিল্লী থেকে এসেছেন এক সামান্য মেয়ের জন্য। আমার আম্মা কথা দিয়েছেন এবং নিয়ে যাচ্ছিলেন লক্ষ্ণৌ—সেখানে নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলার জন্যে। হুজুর আলি আজ মাকে বলে পাঠিয়েছেন আব্বাজান আপনাকে কথা দিয়েছিলেন আপনার হাতে আমাকে দেবেন। আমি নিজেকে কাউকে দিই নি—মনে মনেও না। হুজুর আলি, আমি নিজের হাত আপনার হাতেই তুলে দেব কিন্তু একটি ভিক্ষা আমার আছে আপনার কাছে। আপনার সঙ্গে আছে এক কয়েদী যার মুখে চিচকের দাগ। যার একটি চোখ গেছে হুজুর আলির হুকুমে। বাঁদী ওই কয়েদীর খালাস চায়। ওকে খালাস দিলে বাঁদী বিক্রী হয়ে যাবে উজীর-ই-আজমের বরাবর সারা জিন্দগীর মত।"

পরের দিন সকালে সুরাইয়া বেগম গন্নাকে বললেন—এ তুই কি করলি গন্না?

—কি করলাম আম্মা? বুরা কাম করেছি—বল?

—কিন্তু পণ্ডিত যে বার বার বলে গেল ইমাদ উল মুল্ক আর দিল্লী এই দুইই হল গন্নার নসীবে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। সে যে বললে—বেগমসাহেব তার থেকে তুমি জহর দিয়ে গন্নাকে খতম করে দিয়ো!

—মর্জি খোদাকি আম্মা—খেল নসীবকা; আমি কি করব বল! এরপর যা হবে হোক! কি ক্ষতি?

চাঁদ খাঁ এসে ঘরে ঢুকল।

অভিবাদন করে বললে—কয়েদখানায় সে কয়েদী নেই সাহেবজাদী। তাকে ছেড়ে দিয়েছে।

—কে? কাকে? সুরাইয়া প্রশ্ন করলে।

গন্না জবাব দিলে না। জবাব দিলে চাঁদ খাঁ—সে এক আজব মানুষ হুজুরাইন। মুখে চিচকের দাগ। একটা চোখ তার কানা করে দিয়েছে—তাতেও সে বলে মর্জি খোদাকি। রুটি দিলে খায় না—কাককে খেতে দেয়—বলে ওরও ভুখ লেগেছে। নাসাকচী বলে—এ তুমি কি করছ? সে বলে—আমি কি করছি? সব করছে নসীব। খেল নসীবকা!

সুরাইয়া সবিস্ময়ে বলে উঠল—আদিল!

চাঁদ খাঁ বললে—সাহেবজাদী তার খালাস চেয়েছিল উজীর-ই-আজমের কাছে। খালাস তাকে দিয়েছে উজীর ই-আজম।

গন্না বললে—উজীর-ই-আজম জিন্দাবাদ! আমি তার বাঁদী। দুনিয়াতে সব থেকে বড় দৌলত তিনি আমাকে দেনমোহর করেছেন।

দশ

তিন মাস পর।

দিল্লীতে উজীর-ই-আজম ইমাদ উল মুল্কের বিশাল প্রাসাদে তাঁর শোবার ঘরে পালঙ্কের উপর উজীর নবপরিণীতা দুলহিন গন্নাকে পাশে নিয়ে বসে ছিলেন।

একখানি বীণা হাতে ঝঙ্কার তুলে গন্না তাঁকে গজল শোনাচ্ছিল। "আমার মুখের দিকে

তাকিয়ে তুমি কাকে দেখ ? তুমি কি তোমাকে দেখতে পাও না সেখানে ? আমিও তো তোমার মুখের মধ্যে আমার মুখের ছবিই খুঁজি। কেন পাই না বল তো ? মানুষ বলে—ওই তো দুনিয়ার দুখ। এ দুখ কিন্তু ঝুটা। দুনিয়াতে তা কখনও হয় না। গন্না বলে—তোমরা জান না! এ ঝুট নয় এই সত্যি। মহব্বতিতে দেওয়ানা হয়ে যাও মানুষ, দেওয়ানা হয়ে যাও। তুমি দেওয়ানা আমি দেওয়ানা। তখন দেখবে আমার মধ্যে তুমি তোমার মধ্যে আমি। হায় গন্না, কেন দেওয়ানা হতে পারছ না ?"

ইমাদ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—এ তুমি সত্যি বলে মানো গন্না ?

—হাঁ খোদাবন্দ !

—আঃ, তুমি আমাকে খোদাবন্দ বল কেন ?

—আমি যে আপনার বাঁদী !

—না ! তুমি আমার দুলহিন, আমার পিয়ারী !

মুখ নত করে হাসিমুখে সে তাকিয়ে রইল পালঙ্কের উপরে বিছানো বহুমূল্য কিংখাবের চাদরের উপর।

ইমাদ তাকে আকর্ষণ করলেন বুকের কাছে—গন্না তার বীণাখানি সন্তর্পণে মখমলের বালিশের উপর নামিয়ে রেখে দিয়ে আত্মসমর্পণ করলে।

—তুমি এমন কেন বল তো ?

—কেমন খোদাবন্দ ?

উষ্ণ হয়ে ইমাদ বললেন—ফের খোদাবন্দ ?

—আমার কসুর মাফি হয়—আর বলব না !

—সে তো সাদী হয়ে অবধি বলছ। তা ছাড়া তুমি এত ঠাণ্ডা কেন ? তোমার কলেজায় কোন উত্তাপের স্পর্শ পাই না কেন ? তুমি কি সেই আদিল—সেই ঝুটা বাদশা—সেই সুজাউদ্দৌলার কেনা গোলাম—

—নেহি জনাব। নেহি ! নেহি ! নেহি ! শিউরে উঠে গন্না কথার মাঝখানেই বলে উঠল। নেহি নেহি নেহি। না না না। জনাব, সে ঝুটা বাদশাও নয় সে সাচ্চা বাদশাও নয় সে ফকীর, জনাব, সে গোলাম কারুর নয়—সে আজাদীর আজাদী। সে কারুর মহব্বতির নয়—সে সালামতের তসলীমাতের। তাকে আমি হজরতের মত ফকীরের মত ভক্তি করি। ও কথা বললে গুনা হয়। আমি খত লিখে খোদার নাম নিয়ে আমার মহব্বতি আমার সমস্ত কিছু আপনাকে বিকিয়ে দিয়েছি। তাই আমি ভুলতে পারি না আমি বাঁদী !

ইমাদ ভুরু কুঞ্চিত করে ভাবছিলেন। এই মেয়ে এক বিচিত্র মেয়ে। সন্দেহ করে বার বার নিজের কাছে যেন শরম পান। তবুও কিন্তু—।

চিন্তায় তাঁর বাধা পড়ল। এই মুহূর্তটিতেই বাইরে তাতারীন সিপাহিনী সাড়া দিয়ে জানাল তার কিছু খবর দেবার আছে।

গন্নাকে ছেড়ে দিয়ে ইমাদ বললেন—এস ভিতরে।

তাতারীন ভিতরে এসে কুর্নিশ জানিয়ে বললে—খোদাবন্দের দপ্তর থেকে সর্দার এসেছে এক সওয়ারকে সঙ্গে করে।

এত রাতে সওয়ারের খবর ! তাঁর কুঞ্চিত ললাট আরও কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সওয়ার আসে —রাত্রেও আসে দিনেও আসে। বাদশাহী মুলুকের দূরদূরান্তর থেকে খবর আসছেই, আসছেই। উজীর-ই-আজমের দপ্তরে হরঘড়ি কেউ না কেউ সর্দার থাকে—তারা সেসব সওয়ারকে থাকবার

জায়গা দেয়। সুবাতে উজীর-ই-আজম আপনার কুঠিতে যখন মজলিসখানায় বসেন তখন সর্দার তাদের এনে হাজির করে। কিন্তু খুব জরুরী খবর যখন আসে তখন রাত্রিই হোক আর দিনই হোক উজীরের কাছে এনে হাজির করে।

কোথায় কি হল? রোহিলখণ্ড? আফগানেরা হানা দিয়েছে বাদশাহী খাসমহলে? ভরতপুরে জাঠেরা?

এর আর শেষ নেই। এই বেইমানেরা বাদশাহী খাসমহল হানা দিয়ে দখল করে করে বাদশাহী খাসমহলকে ছোট একটা পরগণায় পরিণত করেছিল। অথচ এই খাসমহলের টাকাতেই চলে বাদশাহের নিজের খরচ হারেমের খরচ—এ থেকেই দেওয়া হয় তন্‌খা। আর আছে দিল্লীর বাজারের আয়। ইমাদ এই আফগানদের সঙ্গে লড়াই করে অনেক খাসমহল উদ্ধার করেছেন। আবার তারা হানা দিয়েছে।

না, মারাঠারা? মারাঠাদের সঙ্গে ইমাদ বোঝাপড়া করেছেন চুক্তিও করেছেন। তবে এই মারাঠাদের তো বিশ্বাস নেই। চুক্তি ভঙ্গ করতে কতক্ষণ?

আর পশ্চিম তরফে পাঞ্জাব। পাঞ্জাবের ওপারে—। বুকটা ধড়াস করে উঠল ইমাদের। একবার থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবদালী?

ধড়ফড় করে উঠল বুক। কিন্তু এত শিগ্‌গির? এত জলদি কি করে আসবে? তার তো কথা টাকা নিয়ে—টাকা পাঠাবার সময় তো এখন নয়। দেরি আছে।

আত্মসংবরণ করে ইমাদ নামতে লাগলেন। ঘরে এসে বসে বললেন—ডাক সর্দারকে। সওয়ার কে এসেছে তাকেও নিয়ে এস।

দুজনে তারা ঘরে এসে ঢুকে কুর্নিশ করলে। ইমাদ অধীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথাকার সওয়ার?

—লাহোর।

—লাহোর? পাঞ্জাব? কি খবর? শিখলোক লাহোর দখল করতে এসেছে?

—না খোদাবন্দ। আফগানিস্তান থেকে খুদ শাহ আবদালী তুফানের মত বেরিয়ে পড়েছেন। পেশওয়ার তক এসে গিয়েছেন। এই খত পাঠিয়েছেন সুবাদার আমীর উল মুল্ক বাহাদুর।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন ইমাদ। আবদালী! আবদালী!

হঠাৎ তিনি বললেন—পানি। পানি দো।

* * *

শাহ আবদালী আসছেন। কেউ বলে পঞ্চাশ হাজার—কেউ বলে পঁচিশ—কেউ বলে আশি! সারা দিল্লী থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু তবু তাদের আশা—বেদখল পাঞ্জাব দখল করে, লাহোর সরহিন্দ মুলতান জলন্ধর অমৃতসর লুঠে, শিখদের একেবারে ধ্বংস করে ফিরে যাবে আবদালী। দিল্লী পর্যন্ত আসবে না।

মুঘলানী বেগম যে বাড়িতে কয়েদ আছে সে বাড়ির ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের অট্টহাসি শোনা যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে।

—হা—হা—হা—হা!

ইমাদ উল মুল্কের আহার নিদ্রা নাই, তিনি দিবারাত্রি কর্মব্যস্ত। তাঁর নিযুক্ত করা মারাঠা ফৌজ নিয়ে অন্তাজী মানকেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। লোক পাঠাচ্ছেন পেশোয়ার কাছে। সওয়ারের পর সওয়ার। ওদিকে ভরতপুরে জাঠরাজা সুরজমলের কাছে পাঠাচ্ছেন

নাগরমলকে।

নাজিবউদ্দৌলা নবাব মীরবক্সী—তাঁর সঙ্গে প্রতিদিন চলছে তাঁর কথা-কাটাকাটি। নাজিব-উদ্দৌলা বলছেন—বাদাকশানী সিপাহীদের তলব বাকী আজ দু' বছর। আমাকে আজই দু' ক্রোর রূপেয়া দাও। আমি সিপাহীদের নিয়ে লড়াই দিতে রওনা হচ্ছি।

ইমাদ বললেন—এক দামড়ি তোমার বা তোমার সিপাহীদের পাওনা নেই। তোমাকে এই সিপাহী পুষবার জন্য আধা দোওয়াব জায়গীর দেওয়া হয়েছে।

ইন্তিজামউদ্দৌলা শল্লা করছে নাজিবউদ্দৌলার সঙ্গে।

বাদশাহ আলমগীর যাকে ইমাদই বাদশা করছেন সেও নাকি ওদের দিকে!

গন্না একদিন বললে—খোদাবন্দ!

ইমাদ ঝরোকায় দাঁড়িয়ে যমুনার ওপারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ভাবছিলেন শাহ আসবে এই পথে। মুখ ফিরিয়ে বললেন—কে?

গন্না বললে—দূর গাঁওয়ে গিয়ে ছোট ঘর সামান্য ক্ষেতি আর খামার নিয়ে যারা থাকে তারা কি আমাদের চেয়ে সুখী নয়? চলুন জনাব এই দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাগ্যের বোঝা নামিয়ে দিয়ে চলে যাই।

রূঢ় কণ্ঠে ইমাদ উল মুল্ক বললেন—আমি নিজাম উল মুল্ক বংশের ছেলে, নিজের হিম্মতে আর দানিশমন্দির জোরে বিশ বরিষ উমর হতে না হতে হিন্দোস্তানের উজীর বাদশার বাদশা হয়েছি। এ বাত দুসরি কেউ বললে তার জিভটা ছিঁড়ে ফেলতে হুকুম দিতাম।

গন্না বিবর্ণ হয়ে গেল।

ইমাদ উল মুল্ক বললেন—এক চুক হয়ে গেছে আমার। এক চুক! ঔরতের সুরত আর গজল গানার বাহারে এক তয়ফাবালীর বেটীকে সাদী করেছি পাঞ্জাবের সুবাদারীর ওয়ারিস উমধাকে ফেলে দিয়ে। নসীবের শতরঞ্জ খেলায় সব থেকে জোরদার সিপাহীকে হটিয়ে দিয়েছি। বলতে বলতে নেমে চলে গেলেন। বাড়ির সামনে ঘোড়া তৈয়ার ছিল। তিনি লাফ দিয়ে সওয়ার হলেন তাতে। সামনে ছুটে চলল নাসাকচী সওয়ার। এসে উঠলেন লাল কিল্লায় আপনার দপ্তরে।

সেখানে বল্লভগড়ের দূত নাগরমল ফিরে এসেছে রাজা সুরজমলের চিঠির জবাব নিয়ে; মারাঠা সেনাপতি অন্তাজী মানকেশ্বরের লোক এসে বসে আছে।

নাগরমল বললে—জাঠ রাজা সুরজমল তিলপথে এসেছেন উজীরের সঙ্গে দেখা করতে। লেকিন—

উজীর বললেন—কি?

নাগরমল বললে—রাজা সুরজমল বলছে প্রথমে মারাঠাকে হঠান উজীরসাহেব। তারপর আফগান মুঘল জাঠ রাজপুতদের ডেকে বাদশার নামে ফৌজ নিয়ে চলুন পাঞ্জাবের পথে।

মারাঠা সেনাপতির উকীলের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—সালামৎ উজীরসাহেব, আমি চললাম।

ইমাদ উল মুল্ক ব্যস্ত হয়ে উঠে তার হাত ধরে বললেন—গোস্‌সার বক্ত এ নয় পণ্ডিতজী। বসুন।

ঠিক এই সময়ে কিল্লার বাইরে প্রচণ্ড কলরব উঠল। হাজার দু' হাজার মানুষের কলরব।

উজীর চঞ্চল হয়ে উঠলেন—কি হল? জলদি দেখ কি হল!

মুঘল নাসাকচী খবর নিয়ে এসে বললে—নবাব নাজিবউদ্দৌলার সিপাহীরা তলবের জন্যে চীৎকার করছে। কিছু সিপাহী কাটরার দোকান লুট করছে।

উজীর ইমাদ উল মুল্ক অসহায়ভাবে বসে রইলেন। কি করবেন? তাঁর নিজের ফৌজদের তিনি বিদায় করে দিয়েছেন। মাস দুয়েক আগে মাত্র। তিনি এটা ভাবেন নি। উজীর স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন।

অপরাধ তাঁর নিজেরও আছে। সিপাহীদের তলব বাকীর অপরাধ সব নাজিবউদ্দৌলার নয়। তাঁর নিজেরও আছে। তাঁর একটা দেয় ছিল।

আবার একজন নাসাকচী এল।

—সওয়ার এসেছে সরহিন্দ থেকে।

—জলদি আন্ বেওকুফ! এখন এক লহমার দাম এক ঘড়ির চেয়ে বেশী।

সওয়ার এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল।

—কি খবর?

—জনাব আলি, বাদশা আবদালী এসে লাহোর দখল করে বসেছেন। সর্দার জাহান খাঁ জলন্ধর দোয়াবে ঢুকেছেন। আদিনা বেগ পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছেন। লাহোর থেকে সরহিন্দ পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশের গাঁও শহর সব খালি পড়ে খাঁ-খাঁ করছে। দরবস্ত লোক ভিখমাঙোয়া থেকে ফকীর—গিরস্তী থেকে আমীর—হিন্দু মুসলমান সব পালিয়ে গেছে—কেউ উত্তর কেউ দক্ষিণ। পথে দিল্লীর মুখে আসছে হাজার হাজার মানুষ। ওদিকে শাহ আবদালী তুরন্ত রওনা হচ্ছেন দিল্লী। হয়তো এতদিনে জাহান খাঁ এসে পৌছে গেলেন সরহিন্দ।

নাগরমল বললে—যদি রাজা সুরজমলের সঙ্গে দেখা করতে হয় তবে এখুনি চলুন জনাব।

* * * *

গভীর রাত্রে ফিরলেন ইমাদ উল মুল্ক। তিলপথ থেকে দীর্ঘ রাস্তাটা তিনি এসেছেন আর দিল্লীর ভয়ার্ত হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করেছেন। তিলপথ থেকে দিল্লী ফটক পর্যন্ত দু'পাশের বসতিতে মানুষ ব্যস্ত হয়ে সব গোছগাছ করছে। পালাবে। পুরানি কিল্লায় ফিরোজশা কোটলায় গোলমাল সব থেকে বেশী।

চোর ডাকাতেরা গুণ্ডারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। হল্লা করছে তারা। এই গোলমালের মধ্যে তাদের কারবার জোরালো হয়ে ওঠে। তারা বেরিয়ে পড়েছে পথে।

এক জায়গায় কটা গুণ্ডা একটা মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে টেনে। মেয়েটা চীৎকার করছে। উজীরের সঙ্গের একজন সিপাহী 'কৌন হ্যায়' বলে চীৎকার করে উঠল।

উত্তর এল—তোর বাবা!

উজীর বললেন—খামোশ! আগে বাঢ়!

সমস্ত মাথাটা ঝিম ঝিম করছে উজীরের। রাজা সুরজমল যা নাগরমলকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল তাই বলেছে।—আগে বর্গীদের হঠাও। তার পর।

সঙ্গে সঙ্গেই হেসে বলেছে—তারই বা আর সময় কোথায় উজীরসাহেব। আবদালী তো লাহোরে পঁহুচে গেল! এরপর পনের বিশ দিনে এসে তোপ দাগবে যমুনার ওপার থেকে! আমি চললাম। আজই-এখুনি উঠব। আমার নিজের ঘর সামলাতে হবে।

উজীরের ক্ষোভ এবং ক্রোধের সীমা ছিল না। এই জাঠ রাজা—এর বাপ ছিল সামান্য ভুঁইয়া। তারপর বদন সিং ঠাকুর। তার পোষ্যবেটা এই সুরজমল দিল্লীর উজীরের সামনে এই কথা বলতে সাহস করে! কিন্তু উজীরের আজ একটা কথা বলবারও হিম্মৎ নাই!

সুরজমল বললে—উজীরসাহেব, চুক হলে তার মাসুল দিতে হয়! আপনি এতবড় চুক করলেন—তার মাসুল দিতে জরুর হবে। আপনি ওই খান-ই-জমানের বেটীকে সাদী করতে গেলেন কেন? আরে ছি ছি ছি! আজ ওই জন্যেই মুঘলানী বেগমের সঙ্গে ঝগড়া করলেন। ওই জন্যে আজ নবাবজাদা সুজা বেঁকে বসেছে; আপনার খত পেয়ে নবাব সফদরজঙ্গ এ বিপদে আগেকার ঝগড়া ভুলে ফৌজ পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নবাবজাদা 'ম্রিক এহি লিয়ে' বেঁকে বসেছেন। এক সিপাহী পাঠাবেন না। তবে হাঁ। আমার উপকার করেছেন। জরাহির ওই লেড়কীকে ছিনিয়ে নিতে গিয়েছিল—পারে নি। সে লেড়কীর সাদী সুজার সঙ্গে হলে একটা ঝগড়া হত বল্লভগড়ের সঙ্গে লক্ষ্ণৌএর। আপনি সাদী করার জন্যে সেটা হতে পায় নি। এ চুক আপনার সব থেকে বড় চুক! দুসরা চুক—আপনি দোস্তি করলেন বর্গীর সঙ্গে।

—ঠিক আছে রাজা সুরজমল। ঠিক আছে। তবে আপনি একটা চুক করলেন। ভুলে গেলেন কি এস্যা দিন নেহি রহেগা।

—না' উজীরসাহেব, ভুলি নাই। আজকের দিনও কাল থাকবে না। পরশু আসবে আবদালী। আবদালী যাবার পর কোন দিন আসবে—সে দিনের কথা সে দিন হবে, আজ না।

—আচ্ছা উঠলাম।

—খোদা হাফিজ উজীরসাহেব! খোদা আপনাকে রক্ষা করুন!

পথে চুকের হিসাব করতে করতে আসছিলেন ইমাদ উল মুল্ক! চুক আরও একটা হয়ে গেছে। তাঁর খাস ফৌজ 'সিন্‌দাগ রিসালা' বাদাকশানী সিপাহীদের তিনি সব বরখাস্ত করে দিয়েছেন। তলবের জন্যে বহুৎ দিক্ করত তাঁকে। লুটেপুটে খেতো তারা, তবু তলব চাইত। বাদশাহের খাজানাখানা ফাঁক হয়ে গেছে। দরবস্ত বাদশাহী খাসমহল জায়গীরদাররা রোহিলারা জবরদস্তি নিয়ে নিয়েছে। তাঁর জায়গীরের টাকা তিনি দেন নি। সে তিনি দেবেন না। আর এই বাদাকশানীরা এমনই বদমাশ গোঁয়ার যে তাঁকে বাড়ি চড়াও হয়ে অপমান করেছে। তাঁর কুর্তাটুর্তা ছিঁড়ে দিয়েছে। তিনি তাদের জবাব দিয়েছেন। আজ তারা থাকলে তিনি দেখতেন। আপসোস হচ্ছে তাঁর।

দিল্লী ঢুকেই দু'পাশের গোলমালে মন তাঁর সেই দিকে আকৃষ্ট হল। শীতের রাত। প্রহর পার হয়ে গেছে। এ সময়ে সব চুপচাপ হয়ে যায়। দরজা জানলা বিলকুল বন্ধ করে মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমোয়। খাটিয়ার নিচে মাটির বর্তনে আংরা গনগন করে। আজ এদের শীত নাই—এদের ঘুম নাই—চিল্লাচ্ছে। জানের ভয়ে পালাবার জন্যে তৈয়ার হচ্ছে।

দিল্লী ফটকে এসে দাঁড়ালেন উজীর। ফটকে সিপাহীরা এখনও আছে। উজীরের সিপাহীরা গিয়ে তাদের বললে—ফটক খোল। খুদ উজীর-ই-আজম খাড়া রয়েছেন, জলদি করো।

ফটকের মধ্যে ঢুকে সামনে দরিয়াগঞ্জ। নাগরমল বললে—উজীর সাহেব, আমি এখান থেকেই বাড়ি যাব।

—কাল সুবায় জরুর আসবেন নাগরমলজী।

—কাল আসতে পারব না উজীরসাহেব। ছুটি মঞ্জুর করবেন। কাল সুবা থেকে বন্দোবস্ত করতে হবে—জেনানী আর বাচ্চালোকদের দিল্লী থেকে মথুরা পাঠিয়ে দোব। আর এখানে রাখতে ভরসা হয় না জনাব। নাদিরশাহী হামলার কথা আপনি শুনেছেন, আমি চোখে দেখেছি।

উজীর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সামনে দরিয়াগঞ্জেও কোলাহল উঠছে। বাঁয়ে পথ চলে গেছে আজমীঢ়ী ফটক পর্যন্ত—ওদিকেও গোলমাল উঠছে।

আতঙ্কে সমস্ত দিল্লীর চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেছে।

নাগরমল নিজের সিপাহী দুজনকে নিয়ে চলে গেল। উজীর ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে দাঁড়িয়েই রইলেন। একজন নাসাকচী বললে—হুজুর-আলি!

—হাঁ।

—রাত দু' পহর গুজরাতে চলল।

—হাঁ। চলো।

রাশে টান দিয়ে আবার আলগা করে ঘোড়াকে ইঙ্গিত দিলেন উজীর ইমাদ উল মুল্ক, পায়ের গোড়ালির মৃদু ঠোক্কর দিলেন পেটে। ঘোড়া ছুটল।

*　　　*　　　*

শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি। শামাদানে বাতিগুলো অর্ধেকের বেশী পুড়ে গেছে। ঘরের ভিতর মেঝেতে বিছানো বহুমূল্য গালিচার উপর কিংখাবের ফরাশে মখমলের বালিশে ঠেস দিয়ে শীতে আড়ষ্ট হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে গন্না। পাশে পড়ে রয়েছে তার বীন। একখানি হাত বীনের উপর। সামনে পানদান। আতরদান। নিশ্চিন্ত গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন গন্না।

ক্রোধের আর সীমা রইল না ইমাদ উল মুল্কের। কোন চিন্তা মেয়েটাকে উদ্বিগ্ন করে না। ও গজল তৈয়ার করে। বয়েৎ বানায়। গান গায়। কিন্তু মগজে কি ওর কিছুই নেই?

ক্রোধের বশেই তার দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে ডাকলেন—গন্না!

গন্না চমকে জেগে উঠল। তারপর ইমাদ উল মুল্ককে দেখে হেসে অত্যন্ত বিনয় করে বললে গোস্তাকি মাফ হয় জনাব—আমি ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।

উজীর আপনার শিরপেঁচ খুলে হাতে নিয়ে পোশাক বদলের ঘরে যেতে যেতে বললেন—খানা দিতে বলো।

পোশাক বদল করে এসে ওজু করে তিনি নামাজ পড়তে বসলেন। আজ যথাসময়ে নামাজেও তাঁর ভুল হয়েছে। বার বার মনে মনে অনুতাপ করলেন ইমাদ। কিন্তু তার মধ্যেও মনে পড়েছিল আবদালীর মুখ। বার বার মনে হচ্ছিল চুকের কথা। চুক গন্না। চুক মারাঠা। চুক তাঁর নিজের ফৌজ বরখাস্ত করা। মনে পড়েছিল আজকের রাত্রের দিল্লী যা দেখে এলেন এখনি—তার কথা। নাগরমলের কথা। নাগরমল ঔরতলোকদের আর বালবাচ্চাদের মথুরা পাঠাচ্ছে। তাঁর মহলে বসেও তিনি শুনতে পাচ্ছেন দিল্লীর লোকদের উৎকণ্ঠার কোলাহল।

তাঁকেও পাঠাতে হবে। হাঁ পাঠাতে হবে। গন্নাকে আগে পাঠাতে হবে। হাঁ। কিন্তু কোথায় পাঠাবেন?

ছি ছি ছি! মেহেরবান খোদা, মাফ কিয়া যায়, তোমার এই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বান্দার গুনাহ্, কসুর মাফ কিয়া যায় আল্লা। মুহম্মদ্ রসুলাল্লা মেহেরবানি করুন! নামাজ সেরে এ ঘরে এসে দেখলেন খানা তৈয়ার। পরিপাটি করে সাজিয়ে অপেক্ষা করছে গন্না।

অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন ইমাদ, খেতে বসে গেলেন। ক্ষুধা খানিকটা উপশম হলে সুস্থ বোধ করে আবার ভাবতে বসলেন।

কোথায় পাঠাবেন? আগ্রা? না। আগ্রার কাছেই ভরতপুর। তার ওদিকে লক্ষ্ণৌ। একদিকে জবাহির সিং। অন্যদিকে সুজা।

ফরাক্কাবাদ? সেখানে গন্নার মা আছে, নবাব বাঙ্গাশ আছে। না না। সুজা। লক্ষ্ণৌ

থেকে ফারাক্কাবাদ আগ্রার চেয়েও কাছে।

তবে? তবে কোথায় পাঠাবেন? আজমীঢ়! হাঁ। আজমীঢ়! আজমীঢ়ে তাঁর বাপের তৈয়ার করা বাড়ি আছে। সেই সব চেয়ে নিরাপদ!

সব থেকে নিরাপদ হত হায়দ্রাবাদ।

প্রথম নিজাম উল মুল্ক আশফজায়ের পৌত্র তিনি। হায়দ্রাবাদের আশ্রয় সব থেকে নিরাপদ হত। কিন্তু সুদূর দক্ষিণ। দিল্লী আর হায়দ্রাবাদ—মাঝখানে মারাঠা রাজপুত জাঠ মুসলমান, অসংখ্য রাজা নবাব উজীরের উপর আক্রোশ পোষণ করে। তার থেকে নিরাপদ আজমীঢ়। ইসলামের পবিত্র তীর্থ। সেখানে আবদালীর ফৌজ হামলা করতে যাবে না। তা ছাড়া দিল্লী আর আজমীঢ়ের মধ্যে আছে রাজপুত জাঠ রাজারা। তারা নিজের স্বার্থে লড়াই করবে। আজমীঢ় সব থেকে ভাল।

হঠাৎ মুখ তুলে বললেন—গন্না! কাল পুরা রোজ তৈয়ার কর সব। পরশু সুবা উঠে রওনা হতে হবে আজমীঢ়।

—আজমীঢ়!

—হ্যাঁ। আমীর ওমরাহরা সব জেনানাদের দিল্লীর বাইরে পাঠাচ্ছে। আফগানিস্তানের আফগান খোরাসানের খোরাসানী তুরানী পল্টন এসে যদি দিল্লী দখল করে তবে দিল্লী দোজখ হয়ে যাবে। হিন্দু মুসলমান কারও রেহাই থাকবে না। তার উপর আবদালী জিতলে মুঘলানী বেগম সব থেকে প্রথম আমাকে আর তোমাকে নিয়ে পড়বে!

—সেই ভাল জনাব। চলুন আমরা চলে যাই।

—না। তুমি যাবে আর আম্মাজান। আমার যাওয়া হবে না।

—তবে—আমি কেন জনাব?

—আমার হুকুম। তুমি যাবে।

—কিন্তু আপনি থাকবেন কেন?

—গন্না, আমি হিন্দোস্তানের উজীর—আমি যদি আজ পালাই তবে আর দিল্লী আমি কখনও ঢুকতে পারব না। দিল্লীর ভিখমাঙোয়ারা পর্যন্ত আমার মুখে থুক্ দেবে।

গন্না বললে—না হয় আর আমরা দিল্লী ফিরব না জনাব। আজমীঢ়-শরীফে খোদার নাম করব—

—নেহি। তোমাকে একদিন বলেছি গন্না—নেহি নেহি নেহি। আমি হিন্দোস্তানের উজীর—আমার উমর আবদালী থেকে অনেক কম। আবদালী একরোজ মরবে। তারপরও আমি বেঁচে থাকব। আমি তখন দেখব! হয়তো এ তুমি সমঝাতেই পারবে না। আঃ! চুক হয়ে গেছে গন্না। বহুৎ চুক হয়ে গেছে।

—চুক?

—হাঁ হাঁ হাঁ। তোমাকে সাদী করাই আমার চুক হয়ে গেছে।

বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল গন্নার মুখে। সে বললে—তাই হবে জনাব। তাই যাব।

* * *

ইমাদ উল মুল্ক অস্থিরমতি হয়ে পড়েছেন। না আজমীঢ় না। রেওয়ারি। রেওয়ারি রাজপুতানায় জয়পুরের এলাকার মধ্যে—দিল্লীর কাছে। নবাব সফদরজঙ্গএর সঙ্গে লড়াইয়ের সময় রেওয়ারির রাজপুত জমিদারেরা দুই ভাই অজয় সিং আর অমর সিং এসে ইমাদ উল মুল্কের দলে যোগ দিয়ে লড়েছিল। ইমাদ উল মুল্ক খুশী হয়েছিলেন। তাদের আরও কিছু জায়গীর

দিয়েছিলেন।

তিনি সকালে ঠিক করলেন এদের পাঠাবেন রেওয়ারি। অজয় সিং আর অমর সিংয়ের আশ্রয়ে।

আজমীঢ় অনেক দূর। এই দূর পথের মধ্যে ডাকু আছে—গুজর জাঠ ডাকুরা তামাম মুল্লুকেই নেকড়ের মত ফিরছে। বাদশাহীর দুর্দিনে এদের দমন কে করবে? তা ছাড়া যদি প্রয়োজন হয়—অবস্থা তেমনই দাঁড়ায় তখন নিজে সরে গিয়ে ওদের সঙ্গে মিলে দক্ষিণে হায়দ্রাবাদের দিকে চলে যাবেন।

রাজপুতদের আশ্রয় আজমীর শরীফের আশ্রয়ের চেয়ে কম নিরাপদ হবে না। রাজপুতদের একটা গুণ আছে—তারা যাকে আশ্রয় দেয় তাকে জীবন থাকতে কারুর হুমকিতে পরিত্যাগ করে না। অমর সিং দিল্লীতেই থাকে। তাঁরই অনুগত সর্দার।

তাকে ডেকে বললেন—অমর সিং!

—জনাব আলি!

—মুসলমানের সব থেকে বড় হল ইমান। তোমরা রাজপুত—তোমাদের সবচেয়ে বড় হল ধর্ম। নয় অমর সিং?

—হাঁ জনাব। ইমানই ধর্ম, ধর্মই ইমান!

—ঠিক বাত অমর সিং। শুনেছি রাজপুতের ধর্মে কেউ বিপন্ন হয়ে আশ্রয় চাইলে তাকে ফেরায় না।

—ফেরায় না কি জনাব, জান যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কেউ তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না! আমাদের এক রাজা এক পাখীর জান বাঁচাতে তাঁর শরীরের মাংস কেটে দিয়েছিলেন।

—দুনিয়াতে সে ধর্ম সে রাজপুত এখনও আছে?

—নিশ্চয় আছে জনাব। আমি আপনার নোকর কিন্তু রাজপুত। আমি নিজে তা মানি!

—তাহলে অমর সিং, যদি আমার আম্মাজান আমার বেগম আর ঔরতলোকের জন্যে তোমার রেওয়ারিতে আশ্রয় চাই—দেবে?

হাঁটু গেড়ে বসে অমর সিং বলেছিল—আমার মহা সৌভাগ্য জনাব। এত বড় সৌভাগ্য আর কখনও হয় নি। আশ্রয় কি বলছেন জনাব, আমার মা আমার বহেনের মত তাঁরা থাকবেন। আমার মা আমার বহেনকে যেমন জান থাকতে বেইজ্জতি হতে দিই না, রক্ষা করি, তেমনিভাবে রক্ষা করব।

—তাহলে কাল সুবায় তুমি তোমার রাজপুত সিপাহী নিয়ে জেনানীদের নিয়ে চলে যাও। আমি বলব তারা যাচ্ছে আজমীঢ়—ওই পথই আজমীঢ়ের পথ। তুমি ওদের নিয়ে গিয়ে ওঠ তোমাদের জায়গীরের কেল্লায়। আমি দু'লাখ টাকা তোমাদের দেব—তোমরা সিপাহী বাড়িয়ে ফেল। হাঁ?

উজীর বেরিয়ে গেলেন—ঘোড়া তৈয়ার ছিল। লাল কিল্লার খবর নিয়ে যে সব সওয়ার এসেছে তারা অপেক্ষা করছে।

পাহাড়গঞ্জ, দরিয়াগঞ্জ, শিবগঞ্জ, চাঁদনী চক—ওদিকে ফতেপুরী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা লোকে ভরে গেছে। থিকথিক করছে। জামা মসজেদের চারপাশে ভিড়। এক কথা। কি হবে? উজীর কি করছে? বাদশা কি করছে? আমাদের জান কে বাঁচাবে?

মধ্যে মধ্যে চীৎকার উঠছে—খোদা মেহেরবান মেহেরবানি করো! মুহম্মদ রসুলাল্লা

মেহেরবানি করো!

উজীর সন্তর্পণে তাদের এড়িয়ে যমুনার কিনারা ধরে গিয়ে উঠলেন লাল কিল্লায়। খবর পেলেন কিল্লার মধ্যে দোকানদানী ছোটাচৌক আজ একরকম বন্ধ।

একজন খবর দিল—খুশলচাঁদ, লছমীনারায়ণ, নাগরমল তাদের বালবাচ্চা জেনানীদের মথুরা পাঠিয়ে দিচ্ছে। তারা রওনা হয়ে গেছে। দিওয়ালী সিং চলে গেছে বালবাচ্চা নিয়ে।

সেই সঙ্গে পয়দলে বয়েল গাড়িতে ঘোড়ায় খচ্চরে এমন কি গিদ্ধড়ের উপর মাল চাপিয়ে বাচ্চাদের চাপিয়ে পিলপিল করে লোক পালাচ্ছে।

সওয়ার এসে দাঁড়াল। মারাঠা সওয়ার!

—কি খবর? উঠে দাঁড়ালেন ইমাদ।

—জনাব আলি, মারাঠা রিসালাদার অন্তাজী মানকেশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি এসে যমুনার ওপারে ছাউনি ফেলেছেন। তিনি খবর পাঠিয়েছেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন ইমাদ। আঃ!

—এক কাম করনা। অন্তাজী সাহেবকে পরওয়ানা দাও—দিল্লীর সমস্ত পথ রুখে দিন। এই লোকগুলো সব ভেড়ির মত পালাচ্ছে—বন্ধ করে দিন! পথ ছেড়ে দেবে তাদের, যাদের হুকুমনামা থাকবে আমার সহি করা।

আমীর ওমরাহ ব্যবসাদার দোকানদার মজদুর মুটিয়া ঝাড়ুদার জমাদার কসাইওয়ালা এ পালালে শহর চলবে কি করে? দোকানে জিনিস মিলবে না, সব্‌জিমণ্ডীতে সব্‌জি মিলবে না, গোস্ত মিলবে না, চাল দাল আটা নিমক ঘিউ দুধ মিলবে না, কাজ কাম করবার মজুর মিলবে না তো একদিনে সব ভেঙে পড়বে। ঝাড়ুদার জমাদার চলে যাবে তো চার পাঁচ রোজের মধ্যে শহর গর্দায় ভরে যাবে। তওয়াই কসবী পর্যন্ত চাই। না হলে যারা থাকবে তারা পাগল হয়ে যাবে। সিপাহীরা ভদ্র গৃহস্থী ঘরের দরওয়াজা ভাঙবে।

খুব কড়া পাহারা বসেছে চারিদিকে। শাহজাহানাবাদের সমস্ত ফটকে ফটকে কড়া পাহারা বসেছে, সেখানে আছে মুঘলাই সিপাহী সরদার—তারপর মথুরা সড়কে নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগাহের পর সড়কে মারাঠি ফৌজের চৌকী থানা বসেছে। ওদিকে তর্কাবাদ হয়ে যে রাস্তা চলে গেছে দক্ষিণে-পশ্চিমে রাজপুতানার দিকে সেখানে বসেছে চৌকী থানা।

ভিড় মথুরার পথে বেশী; রাজপুতানার পথে কম নয়। যাবে আলোয়ার জয়পুর। দলে দলে যাচ্ছে সব। বয়েল গাড়ি ডুলি পালকি ঘোড়া খচ্চর গাধার পিঠে মাল চাপিয়ে পালাচ্ছে সব।

হুকুমনামা দেখে ছাড় হচ্ছে। বাকী ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে চলছে ঘুষ। টাকা ফেলো—ছাড় হয়ে যাবে। না হলে—হটো। ফিরে যাও।

তাই দিয়ে পালাচ্ছে সব। সাধারণ লোক মাথা পিছু পাঁচ টাকা। যারা অবস্থাপন্ন তাদের দশ বিশ নিয়ে দর হচ্ছে।

এরই মধ্যে অমর সিং তার একশো সিপাহী আর ডুলি পালকি বয়েল গাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়াল। খাস উজীর দপ্তরের একজন সর্দার দশজন মুঘলাই সিপাহী নিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল।

পালকির মধ্যে গন্না বসে আছে বিষণ্ণ হয়ে। সেদিন রাত্রি থেকেই সে এই রকম হয়ে

গেছে। বুক ভেঙে তার কান্না আসছে।

ইমাদ উল মুল্কের কাছে সে খত লিখে নিজেকে বিক্রী করেছে। খোদা জানেন সে কখনও তার কর্তব্যে এতটুকু ত্রুটি করে নি। কিন্তু সে কিছুতেই সুখী হতে পারে নি। তার তরুণ স্বামীটির পরিচয় ক্রমশঃ পেয়ে পেয়ে সে শিউরে উঠেছে। সে তার সত্যিই বাঁদী। তার খেলার পুতুল। উজীরী কাজের অবসরে এসে সে তাকে নিয়ে শুধু খেলা করে। খেলনার চেয়ে তার দাম এক দামড়ি বেশী নয়। তাঁর ক্ষমতার পিপাসা দেখে আতঙ্কিত হয়েছে গন্না। হিন্দোস্তানের উজীর যে—তার আচরণে সে ভেবেই পায় না সে শয়তান না পাপপুণ্যের অতীত কিছু। অনায়াসে মানুষকে বাড়িতে ডেকে খাতির করে বসায়, ঘরের পাশে লুকানো থাকে বাদাকশানী সিপাহী—ইশারা পেলেই এসে তারা খুন করে দেয়। আবার এই লোকই খোদার নাম করে—পাঁচ বক্ত নামাজ পড়ে। ঝুটা বাত বলতে দ্বিধা নেই।

অয় খোদা! এ মানুষকে গরীব গন্না কি করে দেবতা বলে মানবে! ভালবাসবে!—তবু সে কর্তব্যে ত্রুটি করে নি। তার প্রতিটি হুকুম সে তামিল করেছে অক্ষরে অক্ষরে। তাকে সত্যই ভালবাসতে চেয়েছে। কিন্তু হায়! ভালবাসা মহব্বতি—এ ওই মানুষটার অন্তরেই যে নেই। লোকটা যেন মরুভূমির মত। জল যত ঢাল মুহূর্তে শুকিয়ে যায়। তার বুকে মহব্বতির দরিয়া—স্বামীর বুকের দরিয়ার সঙ্গে মিলতে চায় কিন্তু স্বামীর বুক মরুভূমি—সেখানে যে দরিয়া বইছে বলে মনে হয় সে দরিয়া দরিয়া নয়। সে ছলনার দরিয়া—সে মরীচিকা।

তার মায়ের গজল মনে পড়ছে।

'হরিণী মরছিল, পথিককে সে বলেছিল—পথিক, এ মরুভূমি—এর বুকে দরিয়া বইছে দেখে তিয়াসে ছুটে এসেছিলাম দরিয়ার পানির জন্যে। সর্বাঙ্গ উত্তাপে ঝলসে গেছে—দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে সারা শরীর জুড়িয়ে নেব—আকণ্ঠ পান করব ঠাণ্ডা পানি। কিন্তু যত আমি ছুটলাম দরিয়াও তত জোরে পিছু হটল। থমকে দাঁড়ালাম—সে দাঁড়াল। আবার এগুলাম—সে আবার পিছু হটল। এবার আমি পড়েছি মরছি। ছলনা—রাহী, ও পানির দরিয়া নয়। ছলনার দরিয়া!'

পালকি আবার নড়ল। চলছে। বাইরে সিপাহীরা বলছে—হটো হটো! তফাতে যাও। যেতে দাও অমর সিং মনসবদারের দলকে যেতে দাও। হটো হটো।

চলছে পালকি। বাইরে কোলাহলের মধ্যে দু'চারটে আওয়াজ কানে ঢুকছে—উজীরের সর্বনাশ হোক! ইমাদ উল মুল্ক মুর্দাবাদ। জাহান্নমে যাক! শয়তান!

কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল গন্নার। হায় নসীব!

আবার দাঁড়াল পালকি। এটা আর একটা চৌকিথানা। এখানে বাইরে থেকে যারা দিল্লী আসছে তাদের জিজ্ঞাসা করছে—তারা কে? এ সময়ে দিল্লীতে তাদের কোন কাম?

ফিরে যাও। ফিরে যাও। দিল্লী এখন নয়। ফিরে যাও। এখন দিল্লীতে গিয়ে খাওয়ার লোক বাড়িয়ো না।

তোমার পরিচয় বল। প্রমাণ কর তুমি চোর নও তুমি ডাকু নও বদমাশ নও; দিল্লীর এই হালতের মধ্যে তুমি গোলমাল বাধাতে যাচ্ছ না। তুমি রোহিলা আফগান নও।

—আরে অন্ধা! অন্ধা তু—ফকীর তু—তুই এ সময় দিল্লী গিয়ে মরবি যে! ফিরে যা। এই!

—জবাব দেব না। আমার বেইজ্জতি করে বাত বললে জবাব দেব না।

—বে-ইজ্জতি?

—হাঁ জনাব—তু বলবেন না আমাকে।

—কে তুমি ?

—খোদার নফর ফকীর—অন্ধা, চোখেই দেখছেন।

—ফকীরসাহেব, আপনি ফকীর আপনি অন্ধ—এ সময় দিল্লী গিয়ে কি করবেন ? মরবেন যে !

—মরণ—সে তো নসীবের খেল জনাব ! নসীবের খেল তো খোদার মর্জি ভিন্ন হয় না ! খোদার মর্জি যদি হয় আমি মরব—তবে তাই হবে। কিন্তু ইজ্জৎ ! ইজ্জৎ ইনসানকা—উ তো রাখনা হ্যায় !

চমকে উঠল গন্না। কে—কে—কে ? মর্জি খোদাকি—খেল নসীবকা—ইজ্জৎ ইনসানকা। পালকির ভিতরে অস্থির হয়ে উঠল গন্না—হজরত ! হজরত !

ফকীর তখন বলছে—হিন্দোস্তানের ইজ্জৎ যাবে—বাবরশাহী আকবরশাহী আলমগীরশাহী বাদশাহীর ইজ্জৎ যেতে বসেছে আর আমার ইজ্জৎ যাচ্ছে না ? হা রে হা ! এ তো আপন সমঝমে না এলে কেউ সমঝে দিতে পারে না জনাব ! আমি অন্ধা। সাচ বাত আমি লড়াই করতে পারব না কিন্তু লোকদের ডাকতে তো পারব ! মরতে তো পারব ! অন্ধা ! অন্ধা ! হায় নসীব ! একটা চোখ গিয়েছিল—নিয়েছিল তারই স্বামী—আর একটা ছিল সেটাও তুমি নিয়েছ ?

পালকি আবার উঠছে। গন্না কিন্তু আর থাকতে পারলে না। সে পালকির দরজায় করাঘাত করে চীৎকার করে উঠল—রোখো রোখো পালকি রোখো ! রিসালাদার সিং সাহেব !

বেহারারা চকিত হয়ে পালকি নামাল। একজন ছুটে গিয়ে অমর সিংকে বললে—ভিতরে বেগমসাহেব চীৎকার করছেন !

বেগম চীৎকার করছেন ? কি হল ? অমর সিং একজন বাঁদীকে ডুলি থেকে নামিয়ে নিয়ে এল। বাঁদী এসে পালকির দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করতে গেল—কি হল বেগমসাহেবা ?

বোরকা পরে নিজেই পালকি থেকে বেরিয়ে এল গন্না। বললে—অমর সিং সাহেবকে আমার সেলাম দাও !

অমর সিং আসতেই বললে—আমাকে মাফ করবেন সিং সাহেব ! আমি হয়তো বে-শরমীর মত কাম করলাম। কিন্তু সাহেব আপনি হিন্দু, আপনাদের গুরু আছেন—গুরু কি তা জানেন। ওই অন্ধা ফকীর—মুখে চিচকের দাগ—ওই হজরত আমার গুরু ! পালকির ভিতর থেকে ওঁর গলার আওয়াজ শুনে কথা শুনে আমি চিনেছি। ওঁকে তসলীমাৎ না করে তো আমি যেতে পারব না। মেহেরবানি করে যদি ওঁকে আমার তসলীমাৎ জানান—একবার ডেকে আনেন—চিরকাল আমি সিং সাহেবের নাম করব।

—কিন্তু আম্মাসাহেবের হুকুম—

—না, সিং সাহেব, এখানে তো আম্মাসাহেবার হুকুমও চলবে না। আমি মানতে পারব না। ওঁর পালকি এগিয়ে দিন—কিছু সওয়ার নিয়ে আপনি আম্মার সঙ্গে থাকুন। আপনি হজরতসাহেবকে ডেকে আনুন, ওঁকে বলুন তাঁর এক শিষ্যা বাঁদী তাঁকে তসলীমাৎ করবেন। না হলে আমি উঠব না সিং সাহেব।

পথের উপর পালকিতে বিছানো মখমল পথের ধারে পেতে তার উপর বসালে গন্না আদিল শাকে।

আদিল শা পা দিয়ে বললেন—মখমল ? কে তুমি ?

পায়ের বুড়ো আঙুল চুম্বন করে গন্না বললে—আমাকে চিনতে পারছেন না হজরত ?

—গলার আওয়াজ খুব চেনা মনে হচ্ছে ! কিন্তু তা কেমন করে হবে—

—তাই বটে হজরত—আমি গন্না।

—গন্না ! তুমি এখানে কোথায় গন্না ! মাফ করো গন্না—আমি তোমাকে তুমি বলছি। তুমি আমাকে হজরত বলেছ তাই তোমাকে তুমি বলছি। আর ফকীর যদি হজরত হয় তবে আমি হজরত, কেন না সত্যিই আমি আজ ফকীর !

—আপনি চিরকাল ফকীর জনাব !

একটু বিষণ্ণ হেসে ঘাড় নেড়ে আদিল শা বললেন—না। অন্ধা হয়ে তবে ফকীর হতে পারলাম। উজীর আমাকে কয়েদ করেছিল পানিপথে। সেখানে আমাকে তালাস করে পেয়েছিল ক'খানা তসবীর। আমার পূর্বপুরুষদের তসবীর আর—।

উদ্‌গ্রীব হয়ে নীরবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল গন্না।

আদিল শাহ ফকীর বললে—আর একখানা তোমার। তোমাকে দেখেছিলাম লক্ষ্ণৌতে—তোমার ছবিও এঁকে রেখেছিলাম। উজীর সেখানা কেড়ে নিলেন। খোদাকে ধন্যবাদ দিলাম। ওখানা তো আমার রাখা উচিত ছিল না। সেই অশুচিতের কসুর থেকে তিনি আমাকে বাঁচালেন। কিন্তু সারারাত ঘুম হল না। ক'দিনই হল না। মাটিতে আঁকতে চেষ্টা করতাম। মিলিয়ে দিতাম। তারপর একদিন উজীর ফের ডাকলেন, বললেন—তসবীরখানা ভেঙে গিয়েছে আর একখানা এঁকে দাও। তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেব। আমি বললাম—সরঞ্জাম দাও। কিন্তু সরঞ্জাম নিয়ে মন বেঁকে বসল। না দেব না। উজীর পানিপথ থেকে এলেন দিল্লী। দিল্লীতে এসে ডাকলেন। বললেন—কই তসবীর ? বললাম—তসবীর হবে না। আঁকব না। উজীর এক চোখ কানা করে দিলেন। বললেন—আর এক চোখ রাখলাম। এঁকে দাও—এক চোখ থাকবে ! ছেড়ে দেব। তারপর দিল্লী থেকে এলাম ফারাক্কাবাদ। স্রিফ ঐ তসবীরের জন্যে উজীর কয়েদী হিসেবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। শুনলাম তোমাকে সাদী করতে যাচ্ছেন। মন খুব খারাপ হল। তারই মধ্যে আঁকলাম তসবীর কিন্তু দুসরা রকম হয়ে গেল। তোমার হাসিমুখ কিছুতেই ফুটল না। ফুটল যেন তোমার কত দুঃখ। যেন কাঁদছ ! চোখ উদাস ! কিন্তু আমার ভারী ভাল লাগল। হাঁ এই তো কবি গন্না। উদাস হয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে ডাকছে—অয় মেহেরবান খোদা ! তসবীরখানা লুকিয়ে রাখলাম, দিতে ইচ্ছা হল না। উজীর শাসালেন—গর্দান যাবে। বললাম—যাক ! তবু হবে না ! পারব না। ফারাক্কা-বাদে যেদিন পৌঁছুলাম সেদিন সিপাহী বললে—হুকুম এসেছে তসবীর আঁকো। নইলে কাল গর্দান যাবে। বললাম—মর্জি খোদাকি খেল নসীবকা। কিন্তু এ আমার ইজ্জৎ—এ আমি দেব না। পরের দিন উজীরের কি খেয়াল হল ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—তোমার গর্দান আমি নিতাম আদিল শা। তোমার নসীব তোমাকে বাঁচালে। ছেড়ে তোমাকে দিচ্ছি। কিন্তু ওই আর একটা চোখ ওটা আমাকে নিতে হবে। তাহলে তুমি আর তসবীর আঁকতে পারবে না। চোখ আমার নিলে উজীরের সামনেই। লোক সুই নিয়ে হাজির ছিল। আঁধার হয়ে গেল দুনিয়া ! কিছুক্ষণ প'ড়ে ছিলাম তাঁবুর গালিচার উপর। সামলে উঠলাম। উজীর বললেন—যা একে নিয়ে গিয়ে আগ্রার পথে ছেড়ে দে ! এটোয়া তক নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিবি। নাসাকচী আমার হাত ধরলে। তখন আমার মনে হল—হাঁ, এই ঠিক হয়েছে আমার। এখন দুনিয়ার আর কেউ না—আমি আর মেহেরবান দিন দুনিয়ার মালিক। হঠাৎ মনে পড়ল,

তোমার তসবীরটার কথা। লুকিয়ে রেখেছিলাম সেটা। খুব হুঁশিয়ারির সঙ্গে লুকিয়ে রেখেছিলাম কয়েদখানায় মাটি খুঁড়ে। বললাম—উজীরসাহেব, তসবীর আমি এঁকেছি—সেটা কয়েদখানায় লুকিয়ে রেখেছি—নাসাকচাকে আমি দিয়ে দেব। উজীর হেসে বললেন—দিয়ো। তবে দিলেও তোমার চোখ আমি রাখতাম না—তুমি ফের আঁকতে! উজীরের কথা সত্যি গন্না। চোখ থাকলে ফকীর আমি হতে পারতাম না। চোখ গিয়ে অন্ধা হয়ে দেখি কি জান—না তোমাকে দেখি না তোমার মুখ—বিলকুল ভুলে গেছি। দেখি অন্ধকারই দেখি। তবে মনে হয় খোদা আছেন, খুব কাছে আছেন।

গন্নার চোখ থেকে টপটপ করে জল ঝরে পড়ল।

চোখ মুছে গন্না বললে—হজরত!

—বলো গন্না।

—আপনি ফকীর—আপনি বলছেন—আঁধিয়ারার মধ্যে আপনার মনে হয় খোদা আপনার খুব কাছে কাছে আছেন। আমি আপনার শিষ্যা, আপনি গুরু, আপনি কি বলতে পারেন হজরত আমরা কি তেমন অনুভব করতে পারি না? নাহলে, কি ক'রে কি নিয়ে বাঁচব?

—গন্না!

—হজরত!

উপরের দিকে মুখ তুলে কিছুক্ষণ তাঁর অন্ধদৃষ্টি আকাশপানে রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন—তারপর বললেন—তুমি তা পারবে গন্না, খোদাকে মনের মসনদে বসিয়ো। যিনি খোদা যিনি আল্লাহ্‌তায়লা তাঁর মূর্তি নাই—কাফের যে, সেই তার মূর্তি কল্পনা করতে চায়। তবু তাঁকেই রাখবে মনের মসনদে। তাঁকে ডেকো। পাঁচবক্ত নমাজের সময় ডেকো তাঁকে। আর এই নাও এই তাবিজ আমি তোমাকে দিচ্ছি। এ তাবিজ আমাকে দিয়েছিলেন আজমীঢ় শরীফের পীরসাহেব। এ তাবিজ দোয়াগঞ্জল উরশের তাবিজ। এতে তুমি সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। যে আদমী দুনিয়ায় সব থেকে গুনাহগার সেও এর কল্যাণে বিপদ থেকে রক্ষা পায় আবার তাতেই তাঁর মহিমা উপলব্ধি করে সাধু হয়। মদিনার বাদশাহ মদিনার সব থেকে বড় চোট্টা বদমাশকে ধরে এনে তাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। তিন তিন বার জহ্লাদ তাকে কাটবার জন্যে কুলাঢ় মেরেছিল কিন্তু তাতে সে মরে নি। জলে ডুবিয়েছিল—তাতেও সে মরে নি। আগুনে পোড়ে নি। বাদশা আশ্চর্য হয়েছিল। সে বদমাশ চোর নিজেও আশ্চর্য হয়েছিল। তারপর সে চোর নিজেই তার হাতের তাবিজ ছুঁয়ে বলেছিল—বাদশার এই এর জন্য। এ জাদু এই তাবিজের জন্য। আমাকে এক হজরত এই তাবিজ দিয়ে বলেছিলেন—এ তাবিজ দোয়াগঞ্জল উরশের তাবিজ। এই থেকেই তোর সব বিপদ কাটবে, সব গুনাহ মাফ হবে। খোদার দোয়া পয়গম্বর রসুলের মহিমা তুই সমঝাতে পারবি। মদিনার বাদশাহ দোয়াগঞ্জল উরশ লিখে নিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। চোর খালাস পেয়ে আর চুরি করে নি—ফকীর হয়েছিল। আজমীঢ়ে বচপনে মায়ের সঙ্গে কিছুদিন ছিলাম। ভিখ মাঙতাম। পীরসাহেবের সেবা করতাম, পীর সাহেব এক রোজ আমাকে বলেছিলেন—বেটা আদিল বাতাও—দুনিয়ায় কি চাও তুমি? আমি বলেছিলাম—হজরত কি চাই? আমি তো জানি না। কখনও ভিতর থেকে বলছে—আমি চাই আমার তৈমুরশাহী চাঘতাই বংশের মসনদ। আবার তখনই বলছে, না তা নিয়ে কি করব? চাই খোদাতায়লার পরশ। তিনি হেসে এই তাবিজ আমাকে দিয়ে বলেছিলেন—লেও বেটা এহি তাবিজ লেও। হাতে পরে রাখিস। পাবি, তুইই

পাবি! তবে এক্ বাত বেটা, তুনিয়ায় দাম না দিলে কোন চিজ মেলে না। আর গুনাহের মাশুল না দিলে খোদার পরশ মেলে না। এ তোকে দিতে হবে। তবে সে দেবার মত হিম্মৎ, কলেজার জোর, জোষ, তুই পাবি এই তাবিজ থেকে! শুধু মনে রাখিস—খোদা মেহেরবান। দুঃখ হোক সুখ হোক ফকিরী হোক বাদশাহী হোক—সবই তাঁর মেহেরবানি।

অবাক হয়ে শুনছিল গন্না। অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপাচ্ছিলেন ফকীর আদিল শাহ। একটু থেমে বললেন—তা আমি বাদশাও হয়েছি কিছু রোজের জন্যে। বাদশাহী মসনদে বসেছি। দরবার করেছি। হোক না সে তাঁবুর দরবার। সেলামৎ কুড়িয়েছি নজরানা পেয়েছি। খেলাৎ দিয়েছি। বাঁদী নাচনেবালীর নাচাগানার আসরের মাঝখানে বসেছি। শির নিতে হুকুম দিয়েছি। তারপর মনে হল এ বিলকুল ঝুট। মনে মনে বললাম—শোভানাল্লা—করিমেন হাকিমে,—আমাকে খালাস দাও বাদশাহী থেকে। এ কুছ নেহি। ঝুট হ্যায় ইয়ে। আমি শুধু তোমাকে চাই। সফ্‌দরজঙ্গ হেরে গেলেন, আমি খালাস পেলাম বাদশাহী থেকে। কিন্তু আগ্রার কিল্লায় আটক রইলাম। তখনও তুমি আমার মনের মধ্যে। আল্লাকে চাইতে যাই—তোমাকে দেখি। খোদাকে ডাকি। খোদা দিলেন চিচক। বাইরে ফেলে দিলে আমাকে—ভাবি নি আমি বাঁচব। বেঁচে উঠে চলে গেলাম পানিপথ। তোমার তসবীর আঁকলাম। সেই তস্‌বীরের জন্যে উজীর আমার এক চোখ নিলে। এক চোখ পানিপথে আর এক চোখ ফারাক্কাবাদ, সে কথা তো তোমাকে বললাম, মাশুল দেওয়া হয়ে গেল। এবার সত্যি পেলাম খোদাকে। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো-শোভানাল মালেকল কুদ্দুসে"। তাঁর পরশ পেলাম। নাও সেই তাবিজ তোমাকে দিলাম। আমাকে গুরু বলেছ—আমি তোমাকে এই তাবিজ দিচ্ছি। এতেই তোমার বিলকুল দুঃখ সুখ হবে। তাঁর পরশ পাবে। সকল বিপথ থেকে গুজর যাবে!

নিজের হাতের কবচ বাঁ হাত দিয়ে ধরে টেনে ছিঁড়ে গন্নার হাতে দিলেন। তারপর হাতের লাঠি দিয়ে পথ পরখ করে হাঁটতে লাগলেন দিল্লীর মুখে।

* * *

অভিভূত হয়ে বসেছিল গন্না বেগম। ফকীরকে চলে যেতে দেখে অমর সিং এগিয়ে এল। বাঁদীরা তাঞ্জামের ঘেরা-টোপ ফেলে দিলে। অমর সিং এসে হুকুম দিলে—এই কাহার লোগ—উঠাও রে পালকি!

ভিতরে চমকে উঠল গন্না। সে চীৎকার করে বললে—না!

সবিস্ময়ে চমকে অমর সিং বললে—বেগম সাহেবা।

—পালকি ঘুমাও! ফিরিয়ে নিয়ে চল্—ওরে কাহার লোক আমার পালকি ফিরিয়ে নিয়ে চল্!

আরও উচ্চ কণ্ঠে অমর সিং বললে—বেগম সাহেবা!

—আমি যাব না অমর সিংজী। আমি যাব না। আমাকে দিল্লীতে উজীর সাহেবের হাবেলীতে পৌঁছে দেন। আমি যাব না!

—সে কি বেগম সাহেবা—উজীর সাহেব নিজে পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে—

—তা দিন। কিন্তু যাব না। জোর ক'রে নিয়ে যেতে চাইলে,—আমার কাছে জওহর আছে অমর সিংজী—আমি তাই খেয়ে মরব। উজীর সাহেবের হাবেলীতে আমাকে ফিরিয়ে দিন। আর সকলে চলে যান—তাদের নিয়ে যান। ময় নেহি যাউঙ্গী!—

—বেগম সাহেবা!

—অমর সিংজী!

—আম্মা সাহেবাদের পালকি ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি গোস্‌সা করছেন।

—করুন। দুনিয়ার কারু গোস্‌সাকে আমার ডর নেই। ময় জওহর পি-কর মর যানে তৈয়ার। মর যাউঙ্গী ম্যয়!

তার কণ্ঠস্বরে যেন উন্মাদ লক্ষণ ফুটে উঠেছে। অমর সিং মিনতি ক'রে বললেন—বেগম সাহেবা—ফিরে গেলে উজীর সাহেব রাগে ক্ষেপে যাবেন। তাঁকে তো জানেন।

—জানি অমর সিংজী। কিন্তু আফ্‌সোস কি বাত—আমাকে আপনারা জানেন না। দেখুন জানুন আমাকে।

একখানি হাত পালকির ঘেরাটোপ থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল। অমর সিং সেই হাতের লাবণ্য দেখে যত মুগ্ধ হল—তার থেকেও বিস্মিত সে বেশী—হাতের একটা টাটকা ক্ষতচিহ্ন দেখে। একটা গোল ক্ষত—বেশ বোঝা যায় কামড়ে ক্ষতটা সদ্য সদ্য সৃষ্টি করেছেন হাতের অধিকারিণী নিজে। ক্ষতস্থান থেকে টপ টপ করে রক্ত ঝরছে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল অমর সিং।

আবার পালকির ভিতর থেকে গন্না বেগম বললে—অমর সিংজী ফিরে নিয়ে চল আমাকে। খোদাতায়লার দোহাই—আমাকে নিয়ে যেয়ো না। দিল্লী,—দিল্লী ফিরে চল। নেই তো—আমাকে মরতে হবে! খোদা কসম—তোমাকে বলছি আমি—আমি মরব, আমি মরব, আমি মরব।

অমর সিং বিব্রত হয়ে ছুটে গেল আম্মা বেগমের কাছে। আম্মা বেগম ইমাদ উল মুল্কের মাতাজী।

—মাতাজী!

—কি?

—বেগম সাহেবা বলছেন—

—কি? কি বলছে—

অমর সিং বললেন সমস্ত। আম্মা বেগম বললেন—ও কসবীর বেটীকে নিয়ে যাও। ফিরে নিয়ে যাও! উঠাও আমাদের পালকি, উঠাও!

ওদিকে ক্রমশঃ ভিড় বেড়ে উঠেছিল। জনতার ভিড় বন্যার স্রোতের মত বাড়ছে! ষোল বছর আগে এসেছিল ইরান থেকে নাদির শাহ। সে বিভীষিকা তাদের মনে আছে। চাঁদনী চৌকে হাঁটু ভর গর্দা হয়েছিল মানুষের রক্তে। মানুষের মুণ্ডুতে পাহাড় বানিয়েছিল তারা, মানুষের ধড় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে ছিল। শুধু মানুষের জানই যায় নি, ইজ্জৎও গিয়েছিল। ঘর ঘর থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল জেনানী। যারা আজ বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের, তাদের মা গিয়েছে অনেকের। তাদের থেকে বেশী বয়স—চল্লিশ বয়স যাদের, তাদের বহিন গেছে স্ত্রী গেছে। মাও গেছে দু-চারজনের। তাদের চেয়েও যাদের বেশী বয়স, তাদের বেটী গেছে বহিন গেছে—বেটার বহু গেছে। টাকাকড়ি বাসন—যার যা দৌলত ছিল—সব গেছে। সব গেছে।

আগ্রার হিন্দু জ্যোতিষী সেবার বলেছিল এ কথা। কেউ বিশ্বাস করে নি। তখনও বাদশাহ মহম্মদ শাহ বেঁচেছিলেন। দিল্লীর তৈমুর-শাহী বাদশাহী বংশের ইজ্জতের চেরাগ তখনও নেভে নি—হিম্মতের দেমাক তখনও বিলকুল সাফ হয়ে মুছে যায় নি। এবার তৈমুর-শাহী বাদশাহীর ইজ্জতের চেরাগ নিভে গিয়েছে, হিম্মৎ—ভাঙা ভোঁতা তলোয়ারের মত পড়ে আছে মর্চে ধরে। এবারও সেই হিন্দু জ্যোতিষী শুকদেব আচারিয়াজী বলেছেন—আসছে

আসছে, এবার আবার ঠিক তেমনি আঁধি আসছে। আঁধার হয়ে ঢেকে যাবে দিল্লী, শুধু দিল্লী নয়—আধা হিন্দুস্থান। পালাও পালাও পুরব মুখে পালাও। দক্ষিণ মুখে পালাও। পশ্চিম আর উত্তর এ দুই মুখে নয়। আঁধির তাণ্ডব চলবে ওই দুই ধারে।

কলরব উঠছে!…

আম্মা সাহেব চীৎকার করেই বললেন—পালকি উঠাও। কিন্তু কেউ শুনল না। শুনল শুধু অমর সিং।—সে ইশারা দিল বেহারাদের,—উঠাও!

বলেই সে আবার ফিরে এল—গন্না বেগমের পালকির কাছে। পালকি নেই। দাঁড়িয়ে আছে শুধু একজন রাজপুত সওয়ার।

অমর সিং বললে—পালকি?

সওয়ার সেলাম জানিয়ে বললে—চলে গেছে দিল্লী। বেগম সাহেব পালকি থেকে নেমে পায়দল ছুটতে আরম্ভ করেছিলেন। আমরা কি করব?—শেষে বলে কয়ে পালকিতে উঠিয়ে ন জন সওয়ার দিল্লী ফিরল পালকির সঙ্গে। আমি দাঁড়িয়ে আছি আপনাকে খবর দিতে।

অমর সিং বললে—বেশ—তুমি এস আমার সঙ্গে। ফিরে গেলে উজীরের গোস্সায় পড়তে হবে। উজীর যে কি করবে জানি না! সে পাগল হয়ে গেছে। কোন কালেই তার কোন দয়া নেই মায়া নেই বিচার নেই—তার ওপর আজ সে পাগল!—যারা গেল তাদের যে কি হবে—! অমর সিং থ হয়ে গেল।

—তারা পালকি হাবেলীর দরজায় নামিয়ে দিয়েই পালাবে। সেই শল্লা করেই তারা গেছে।

অমর সিং বললে—কিষণজী তাদের রক্ষা করুন।

ঠিক এই সময়েই জনতার চাপ—সামনের মারাঠা সিপাহীদের—আটক এবং তল্লাসের ঘাঁটি—দরিয়ার তুফান যেমন করে মাটির বাঁধ ভেঙে—ছুটে—বেরিয়ে যায়—তেমনি করে গেল।

একটা উল্লাসভরা কোলাহল আকাশ স্পর্শ করলে।—ও—ও—!

এগারো

ওদিকে তখন উজীর দিনের খানা খেয়ে ব্যস্ত হয়ে নিচে নেমে আসছিলেন, খবর এসেছে মথুরা সড়কের উপর ঘাঁটিতে মারাঠা বাদশাহী মুলুকের আমখাজাঞ্চী খান-ই-খানান জিয়াউদ্দৌলার হারেমের জেনানী আর বালবাচ্চাদের আটক করে দিয়েছে। তারা চলে যাচ্ছিল জিয়াউদ্দৌল্লা সাহেবের জায়গীরে। কিন্তু তাদের কাছে টাকা আদায়ের জন্য মারাঠারা জুলুমবাজি আরম্ভ করেছে।

বারান্দার সামনে সিঁড়ির মুখে ঘোড়া তৈয়ার করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সহিস, ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নিজে যাবেন উজীর সেখানে।

ঠিক সেই সময়ে বাড়ির ফটকের সামনে এক হিন্দু এসে দাঁড়াল। মাথায় পাগড়ী ললাটে হলুদরঙের তিলক। একটা ঘোড়ায় চড়ে সে এসেছে। সে উজীরসাহেবের সঙ্গে দেখা করবে।

উজীর এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। লোকটি চীৎকার করে ডাকল—হুজুর-আলি, উজীরসাব, গরীব পরবর—

উজীর ঘোড়ায় সওয়ার হয়েই এসে দাঁড়ালেন ফটকে।—কি? কি চাই তোর? দিল্লী ছেড়ে যাবার হুকুম মিলবে না।

—দিল্লী ছাড়বার হুকুম আমি চাই না—আমি দিল্লীতে আনেওয়ালা। মথুরা থেকে আমি দিল্লী আসছি জনাব-আলি—

—মথুরা থেকে আসছ তুমি?

—হাঁ জনাব আলি—হুজুর আলির বেগম খান-ই-জমানের লেড়কী তার জন্যে এই তাবিজ এনেছি জনাব। অনেক ক্রিয়া করে এই তাবিজ এনেছি। তার ললাটে এখন বড় বিপদ—

—এ তাবিজে তার বিপদ কেটে যাবে?

—যাবে জনাব—বহুৎ ক্রিয়া করে এ তাবিজ আমি বানিয়েছি।

সবিস্ময়ে উজীর বললেন—হাঁ! তার জন্যে তুই দিল্লী এলি? নিজে মরবার ভয় করলি না! সে তোর কে?

—তার বচপন থেকে আমি তার ললাট গুনেছি হুজুর। তারপর হেসে বললে—আর আমি এখন মরব না জনাব-আলি সে আমি জানি। গুনে দেখেছি।

—তাহলে তুই শুকদেব পণ্ডিত?

—হাঁ জনাব!

—তুই আমার সঙ্গে সাদীতে মানা করেছিলি।

—না হুজুর। দিল্লীর এই বিপদ আমি জানতাম তাই দিল্লীতে সাদী দিতে বারণ করেছিলাম। দিল্লীর ললাট আর গন্না বেগমের ললাট এক হলে বহুৎ বিপদের সম্ভাবনা—

—তুই সব দেখতে পাস?

—পাই বইকি হুজুর—

—আমার কি হবে বলতে পারিস?

—মুঘলানী বেগম আপনাকে বাঁচাবে। ফের সাদী হবে আপনার।

—হুঁ। একটু চুপ করে থেকে বললেন—তুই এখন মরবি না—তুই গুনে দেখেছিস?

—আমার পরমায়ু আশি বছর জনাব আলি—এখন আমার পঞ্চাশ। এখনও তিশ বরিষ আমি বাঁচব—

তার কথা মুখে থেকে গেল—একজন নাসাকচী উজীরের ইঙ্গিতে মুহূর্তে তার তলোয়ারটা পিছন থেকে আমূল বিদ্ধ করে দিল। শুকদেব আচার্যের চোখ দুটো চকিতের জন্য বিস্ফারিত হয়ে উঠল, একটা জান্তব চীৎকার বেরিয়ে অর্ধসমাপ্ত থাকল। সে পড়ে গেল ধুলোর উপর।

উজীর বললেন—মুর্দাটা যমুনার পানিতে ফেলে দাও—

তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। 'কাফের সব দেখতে পাস তুই!'

* * *

গন্নার পালকি এসে উজীর ইমাদ-উল-মুল্ক-এর হাবেলীতে ঢুকল। তখনও শুকদেব আচার্যের মৃতদেহটা পড়ে আছে সিঁড়ির সামনে। সারা শাজাহানাবাদ শহরের শড়কের ভিড় ঠেলে আসতে বেশ দেরি হয়ে গেছে। সন্ধ্যে প্রায় হয় হয়। উজীর হাবেলীর পাহারাদার সিপাহী পালকির বাহক এবং সঙ্গের লোককে চিনে সবিস্ময়ে বললে,—পালকি ফিরে এল?

রাজপুত সিপাহী বললে—বেগম সাহেবার মর্জি!

—মর্জি! বাদাকশানি বিস্মিত হল। মর্জি?—এমন মর্জি মানুষের হয়! রসুলেআল্লা! পালকি কে গেল হাবেলীর ভিতরে হারেমের এলাকায়।

উজীর ইমাদ-উল-মুল্ক-হারেমের খোদা খাদিম নসরত খাঁয়ের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। বেগম সাহেবা যেন উদ্‌ভ্রান্ত। মানুষটা যেন নিজের মধ্যে নেই।

সে সালাম করে বললে—মালেকান হুজুরাইন আপনার তবিয়ৎ—

—মুঝে পানি পিলাও, নসরৎ। পানি।

বলে সে আপনার ঘরে গিয়ে পালঙ্কের উপর লুটিয়ে পড়ল—এয় খোদা! এয় মালেক্! হে শেষ বিচারের কর্তা, তুমি এর সূক্ষ্ম বিচার করো। হে আদিল্-এ-অল্, হে মোমিন-এ-অল্—তুমি সব জানলে—তুমি সব দেখলে—তুমি বিচার কর! আমার জিন্দিগীর দাম না দিয়ে যে আদমী আমাকে ঠকালে, তুমি তার বিচার কর!

প্রৌঢ়া বাঁদী সাকিনা শরবতের গ্লাস নিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলে—হুজুরাইন।

মুখ তুলে তাকিয়ে গভীর আগ্রহে গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিয়েই সে ফেলে দিলে। বললে—পানি পানি! বুক কলেজা আমার শুকিয়ে গেছে রে বাঁদী—শরবৎ নয়, বিলকুল দুনিয়া আজ তিতা মালুম হচ্ছে। পানি,—আমাকে ঠাণ্ডি পানি দে! পানি।

সত্যই বুকটা তার শুকিয়ে গিয়েছে। মরুভূমির মত হু-হু করছে।

—বেগম সাহেবা!

—হুঁ!

—হেকিমকে ডাকতে বলব?

—হেকিম? না। হাসলে গন্না। সে হাসি এক আশ্চর্য জাতের হাসি। সে হাসি দেখে বাঁদীর মনে হল—এ হাসি একটু জোরে হাসলে ঘরের ঝাড়-লণ্ঠনের সমস্ত বাতি দপ করে নিভে গিয়ে সব অন্ধকার হয়ে যাবে। বাঁদী সাকিনা প্রৌঢ়া। বয়স তার পঞ্চাশের ওপর। জীবনে কোন কৈশোরে, হাটে এসে বিক্রী হয়ে, উজীর ইমাদ উল মুল্ক গাজি-উদ্দিনের বাপের আমলে এই হারেমে ঢুকেছে! ঝড় তার উপর দিয়ে অনেক গেছে। নাদিরশাহ যখন ষোল সতের বছর আগে দিল্লী এসেছিলেন—তামাম দিল্লীতে রক্তের দরিয়া বইয়ে দিয়েছিলেন—তখন তাকে ইরানী নাসাকচীরা ধরে নিয়ে গিয়ে দুদিন আটকে রেখেছিল।

যখন তার প্রথম জোয়ানী তখন তার প্রথম মহব্বতি হয়েছিল উজীর হাবেলীর একজন দারোগার সঙ্গে। জানতে পেরে—এই উজীর ইমাদের বাপ একদিন বাগিচার একটা কুঞ্জের মধ্য থেকে তাদের ধরে এনে সামনে হাজির করে তার সামনেই তার মাশুককে খুন করিয়েছিল। তার মনে আছে সে কাঁদতে পায় নি—সাহস হয় নি কাঁদতে। যেন কিছুই হয় নি এই রকম ভাব দেখিয়ে থাকতে হয়েছিল। নিজের কাম করতে হয়েছিল। কিন্তু দিল সেদিন হু-হু করেছিল; তিয়াস পেয়েছিল বার বার। সেই এমনি হাসি সে দেখেছিল নিজের মুখে। সে কাজ করছিল, তাকে আর এক বাঁদী জিজ্ঞাসা করেছিল—বহুৎ দুখ হয়েছে—না রে? সে হেসেছিল, সামনে ছিল একখানা আয়না। সেই আয়নায় তার নিজের মুখে এই হাসি সে দেখেছিল। এর জাত আলাদা। এতে ক্ষুরের মত ধার; এতে সন্ধ্যের লাল আমেজের সঙ্গে আঁধারের ছায়া; তার সঙ্গে সন্ধ্যায় যে জোর হাওয়া উঠে—সেই হাওয়া। সন্ধ্যার হাসির হাওয়াই তো ফুঁ দিয়ে দিনের চেরাগ—সুরয আফতাবকে নিভিয়ে দেয়। বেগমের মুখেও আজ সেই হাসি।

শুধু হাসি নয়। আরও কিছু। এক বছরের উপর বেগম এসেছে উজীরের হারেমে। এই এক বছর ধরে সে দেখছে এ বেগমের সুখও নেই দুঃখও নেই। আবদারও কোনদিন করে নি, অভিমানও না।

নিজে শায়ের এই মেয়েটি। এ মেয়ের মাকে সে দেখে এসেছে কারাকাবাদে। সুরাইয়া

বেগমও শায়ের—গজল বানায় ; এক সময় তওয়াইফ ছিল। তার আদবকায়দা, তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তার দুনিয়াদারির খেল্ দেখে সে বিস্মিত হয়েছে। তার এক বিন্দুও নেই এ মেয়ের মধ্যে। ক্রমে ক্রমে সে যেন কিছুর আভাসও পেয়েছিল। এ মেয়ে তার মায়ের মত নয়, এ মেয়ের জাত তার বাপের জাত। সেও বটে—আরও বটে এই যে, উজীর ইমাদ উল মুল্ক গাজিউদ্দিনকে সে ঠিক সাদী করে নি—সে তার কাছে নিজেকে বিক্রী করেছে। কি নিয়ে বিক্রী করেছে তা সে জানত না!

চুপ করে বাঁদী সাকিনা বিবি তাকিয়েছিল বেগমের দিকে। বড় ভালবাসে সে এই লেড়কীকে। ভারী ভাল লাগে। এর যেন একটা রোশনি আছে। তার কাছে এলে সে-রোশনি যেন তার মনের মধ্যেই কিছুটা আলো ছড়িয়ে দেয়।

আজ তার কি হল ? কেন ফিরে এল দিল্লীতে ? দিল্লীতে আসছে শাহ দুরানী। সে দুরানী শাহকে দেখে নি ; কিন্তু নাদির শাহকে দেখেছে ; সে সময়ের দিল্লীর হাল হালত্ দেখেছে। ইরানী সিপাহীদের তাঁবুতে তাকে কয়েকটা রাত কাটাতে হয়েছে। নিজের অবস্থার কথা মনে আছে ; রাত্রে সিপাহীদের তাঁবুতে জেনানীর চীৎকারে আসমান চিরে যেত। সে পড়ে থাকত বেহুঁশ হয়ে। দারু পিয়ে নয়। যন্ত্রণায়! দিল্লীর পথে রক্তের দরিয়া দেখেছে ; মুর্দার পাহাড় দেখেছে। রাত্রে দেখেছে দিল্লীর ঘরবাড়ি পোড়ার আগুনের আলো ; দিনে দেখেছে ধোঁয়া। সফেদ দিনের আলোতে সাদা কালো মেঘের কুণ্ডলীর মত কুণ্ডলী উঠছে। আর শুনত অবিরাম একসঙ্গে মেশানো বহু—হয়তো হাজার—হয়তো লাখ লাখ মানুষের গোঙানির একটা মেশানো আওয়াজ। কেন ফিরে এল সে!

সে জানে—লাহোরের মীর মান্নু সাহেবের বেগম—মুঘলানী—তার বেটি উমধাকে নিয়ে দিল্লীতে আটক রয়েছে। উজীরই তাকে আটকে রেখেছে। এই গন্নার জন্যই উমধাকে উজীর সাদী করে নি।

সে জানে—শাহ দুরানী—ওই মুঘলানীর ধর্ম্ম বাপ। দুরানী তাকে বেটী বলে। শাহ দুরানী এসেছে। হিন্দোস্তানের বাদশাহী এখন বাদশাহী নয়—পুত্‌লীশাহী—তার কোন কিস্মৎ নেই। দুরানী শাহ দিল্লীতে এসেই ওই মুঘলানীর কথায় প্রথমেই এই গন্নার উপর তলোয়ার তুলবে। ওঃ, সে ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়।

গন্না বেগম চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে নিঝুম হয়ে। কিন্তু পানি গড়াচ্ছে চোখ থেকে। হঠাৎ বেগম বললে—সাকিনা, ঘুম আসবার কোন দাওয়াই আছে ?

—ঘুম ?

—হাঁ, ঘুম! যাতে সব ভুলে যাই।

হেসে সাকিনা জিজ্ঞাসা করলে—কি ভুলবে বেগম সাহেবা ? কি হল তোমার ?

—দুনিয়াদারি বিলকুল ঝুট হয়ে গেল সাকিনা! বি-ল-কু-ল!

—শরাব খাবে বেগম সাহেবা ?

—খেলে আর দুনিয়া ঝুট মালুম হবে না ?

—না। হবে না। আমি জানি! আমার দুনিয়া এমনি করেই ঝুট হয়ে গিয়েছিল। আমাকেও এক বাঁদী—তখন তার, আমার-এখনকার-মত-উমর্—সে আমাকে বলেছিল—শরাব পিয়ো, সাকিনা। শরাব পিয়ো। আর দুনিয়া ঝুট থাকবে না। তা আমি পিয়েছিলাম বেগম সাহেবা—আর সত্যিই ঝুট দুনিয়া আবার রংদার—সাচ্চা হয়ে উঠেছিল।

গন্না উঠে বসে বললে—তবে তাই নিয়ে আয়। খুব কড়া শরাব। তেজী। জোরদার।

চন্‌চন্ করে উঠল মাথা থেকে পা পর্যন্ত। সমস্ত অবসন্নতা অবসাদ বিষণ্ণতা কেটে গেল। সত্যই যেন দুনিয়ার চেহারা পাল্‌টাচ্ছে তার চোখের সামনে। ঝাড়ের বাতিগুলো অনেক বেশী জ্বল-জ্বলা মনে হচ্ছে। জীবনে প্রথম শরাব পান তার। খেতে কষ্ট হয়েছে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই মত্ততার আমেজ লেগেছে।

গন্না বললে—তাই তো সাকিনা!

—নিন। আর এক পিয়ালা পিয়ে নিন।

—দে।

আরও এক পিয়ালা পান করে গন্না মুখ ঈষৎ বিকৃত করে বললে—আঃ! জ্বালিয়ে দিচ্ছে রে কলেজা। কিন্তু বহুৎ আরাম লাগছে!

সাকিনা হাসলে। বললে—তাই হয় মনে।

—তোরও হয়েছিল?

—না হলে আপনাকে বলব কেন বলুন!

—কি হয়েছিল তোর?—বলবি আমাকে?

—কি করবেন শুনে?

—মিলিয়ে দেখব—তোর সঙ্গে আমার মেলে কি না?

—জোয়ানী বয়সে আমার আশ্‌ক্ হল। মাশুক এই উজীরের বাপ খান বাহাদুরের হাবেলীর দরোগা।

—আচ্ছা। কোন নবাব কি সুলতান কি আমীরের লেড়কা ছিল না সে?

—না। না। তা না-থাক বেগম সাহেবা, সে কারুর চেয়ে ছোট ছিল না!

—হাঁ। তারপর কি হল?

—এক রোজ মালিক জানতে পেরে আমাদের দুজনকে পাকড়ে ফেললে।

—তারপর কানা করে দিলে তোর মাশুককে?

—না। তাকে একদম খুন করে খতম করে দিলে—তার লাশটা রক্তে ভাসতে লাগল। আমাকে পাকড়ে ধরে রইল দুজন নাসাকচী। আমি দেখলাম!

চুপ করে রইল গন্না বেগম। তার মাথার মধ্যে সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে তার আফসোস নেই, দুঃখও নেই।

বাইরে চারিদিকে গোলমাল উঠছে। কলরব কোলাহল। হাবেলীর চারিদিকের মোটা দেওয়ালের আড়ালও তাকে রুখতে পারছে না। স্তব্ধতার মধ্যে গন্নার কানে আওয়াজ এসে পৌঁছুল। কিন্তু তাও তাকে আকর্ষণ করতে পারলে না। কিন্তু সাকিনা সচকিত হয়ে উঠল।

—এত আওয়াজ! এত—! শাহ আবদালী এসে গেল? সে উঠে দাঁড়াল। আবারও কিছুক্ষণ শুনে সে ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল! কয়েক মুহূর্ত পরে ফিরে এল সে।—বেগম সাহেবা!

গন্না মুখ তুলে তাকালে।

—হল্লার আওয়াজ শুনছেন?

—আওয়াজ? হাঁ—। কিসের?

—মীর বক্সী নবাব নাজীর খাঁর সিপাহীরা চৌকবাজার লুটে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। শুনছি এই দিকে আসছে।

নিচে থেকে দুম্‌দাম শব্দ উঠছে। দরওয়াজাগুলো বন্ধ করছে। সাকিনা বললে—তারা

নাকি আমাদের হাবেলীতে আসছে—হাবেলী ঘেরাও করবে। লুটতরাজ করবে। তারা বলছে তলব পায় নি পুরা এক বছরের। মীর বক্সী উজীর সাহেবের কাছে তলব চেয়ে ছিল। উজীর সাহেব বলেছেন—তলব তুমি দেবে। তোমাকে জায়গীর দেওয়া আছে। নাজির সিপাহীদের বলেছে—উজীর টাকা দিলে না—আমি কোথায় পাব ? তোমরা উজীরকে ধর। তারা দিল্লীর বাজার লুট করে নিয়ে এখানে আসছে। উঠুন আপনি, উঠুন।

—কেন ?

—চোরা কুঠারীতে লুকোবেন চলুন। এখানে থাকলে বেইজ্জতির শেষ রাখবে না। বাদাকশানী সিপাহী ক্ষ্যাপা কুকুরের চেয়ে বদমাশ। ওরা ক্ষেপলে মনিবকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে।

গন্না তবু চুপ করে বসে রইল। সাকিনা বললে উঠুন, দেরি করবেন না। উঠুন উজীর সাহেব বাড়িতে নেই। ওরা তো এই কজন সিপাহীকে মানবেই না। বরং ওদের সে একটা মওকা হবে।—উঠুন !

—উজীর সাহেব কোথায় ?

—ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেছেন—সেই কখন ! মারাঠারা মথুরার পথে—এখানকার আমীর ওমরাহদের ঔরৎ জেনানী বালবাচ্চাদের আটক করেছে, যেতে দিচ্ছে না। সেই খবর পেয়ে ছুটে গেছেন। তারপরই থোড়া ঘড়ি বাদ আপনি ফিরে এলেন। বাড়ির সামনে মুর্দাটা তখনও পড়ে ছিল। লোকটা আপনার জন্য তাবিজ এনেছিল ! মথুরার এক পণ্ডিত !

—মথুরার পণ্ডিত ? আমার জন্যে তাবিজ এনেছিল ?

—হাঁ। উজীর সাহেব ঘোড়ায় চড়বে—ঠিক সেই সময়ে সে ছুটতে ছুটতে এল ! বললে—ঝড় আসছে উজীর সাহেব, ঝড় আসছে। নসীব গুনে দেখেছি গন্না বেগমের বিপদ, তার জন্যে এই তাবিজ এনেছি। পরিয়ে দিয়ো। উজীর বললে—তোর নসীবে কি আছে গুনে দেখেছিস ? বলে ইশারা দিলে, আর নাসাকচী তার তলোয়ার পিঠে বিঁধে দিলে। লোকটি আর বাত বলতে পারলে না।

—শুকদেও পণ্ডিত ! নাসাকচী তার বুকে তলোয়ার বিঁধে দিলে ?

—হাঁ একদম এফোঁড় ওফোঁড় !

আবার সেই হাসি ফুটে উঠল গন্নার ঠোঁটে। একটু চুপ করে থেকে বললে—দে সাকিনা, আবার পিয়ালা ভরপুর করে শরাব দে !

নিচে হল্লা জোর হয়ে উঠল। চমকে উঠল গন্না। সাকিনা বাঁদী ছুটে গেল দেখতে। হায় রসুল-এ-আল্লা ! কি যে হবে ! এই যে বাদাশানির দল—তারা তাকে পেলেও লাঞ্ছনার শেষ রাখবে না। গোটা বাড়িতে সে আছে আর দুজন বাঁদী আছে। তারা একদম বুড়ী ! কি বিপদে যে সে পড়েছে ! আশ্রয় একমাত্র চোরকুঠরীর নিচে—মাটির তলায় !—ওরা কি ভেঙে ফেললে নিচেতলার দরওয়াজা ? বিপদের উপর বিপদ ! বেগম ফিরে এল ! ওই নওজোয়ানী খুবসুরতি মেয়ে ; যে মেয়ে দুর্লভ মেয়ে। সে তো আমীর উমরাহদের বাড়ির বেগমদের দেখেছে। কোথায় কার বাড়িতে এমন মেয়ে আছে ! এ-মেয়েকে পেলে তারা—! এয় খোদা রসুল-এ-আল্লা—তুমি বাঁচাও ! আবার ছুটে গিয়ে একেবারে বাইরের দিকের ঘরের ঝরোকায় সে চোখ পাতলে।

ওঃ—একেবারে ঘেরাও করে ফেলেছে হাবেলীটা ! হল্লা করছে—চিল্লাচ্ছে।—এ উজীর—এ কমবক্ত—চোট্টা—হারামী—এ গাজিউদ্দিন ! তলব দে—আমাদের তলব দে !

—লুট লে। লুট্ লে। ভাঙ দরওয়াজা।

সাকিনা দেখলে হাবেলীর মধ্যেও প্রায় ছশো সিপাহী তৈয়ার রয়েছে। এরা উজীরের খাস সিপাহী। ওরা রুখছে।

সাকিনা ফিরে এল। এখনও নিচে চোরকুঠুরিতে লুকোবার সময় আছে। এখনও ওরা বাইরে। কিন্তু ঘরে ফিরে এসে দেখলে গন্না বেহুঁশ হয়ে শুয়ে পড়েছে।

রাগ হল সাকিনার। এত শরাব খেলে কেন? কি করে সে তাকে নিয়ে যাবে? এই খাড়া সিঁড়ি ভেঙে এই পুরা জোয়ানী মেয়ে—একে সে কি নিয়ে যাবে বয়ে! মরণ,—যেতে যেতে ফিরে এল! কেন?

পরক্ষণেই মায়া হল! মনে পড়ল তার সেই হাসির কথা! সে কোলে করে তুলে নিলে গন্নার দেহ। বড় হাল্কা। ফুলের মত নরম। গন্না চোখ মেললে—বিড় বিড় করে বললে—ছোড় দে—মুঝে ছোড় দে! সাকিনা! ছোড় দে! নেহি যাউঙ্গী, ময় নেই যাউঙ্গী! ছোড় দে!

সাকিনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সে তাকে ফেলে দিয়ে বললে—মর যাও, তব তুম মর যাও! যা আছে তোমার নসীবে তাই ঘটুক!

কোন ক্রমে চোখ দুটো আধখানা করে তাকিয়ে গন্না সেই হাসি হেসে বললে—মর্জি খোদাকি—খেল নসীবকা। ইজ্জৎ ইনসানকি!

—সেই ইজ্জৎও যাবে।

—আমি আর ইনসান নই বাঁদী। মানুষ নই। নিজেকে আমি বিক্রি করেছি। কিন্তু দাম কি পেয়েছি জানিস? ঝুটা মেকি মোহর। সোনা নয়—পিতল! একটা চোখের জন্যে আলো চেয়েছিলাম। বেইমান ইমাদ তার বদলে আঁধার দিয়েছে। কালির মত আঁধার! বস্—শোন্। বলি—তোকে বলি! ইজ্জৎ—ইজ্জৎ আমার অনেক দিন গেছে সাকিনা! নসীব! মা আমার কসবী ছিল—হয়তো সেই জন্যেই সাদী হয়েও আমি তাই হয়ে গেলাম। বস্—শোন্।

সাকিনা বললে—নিচে চোরকুঠুরীতে চল, সেখানে শোনাবে।

পরম স্নেহের সঙ্গে সে তাকে জড়িয়ে ধরলে।

* * * *

উজীর ইমাদ উল মুল্ক মারাঠা ঘাঁটিতে গিয়ে সেখানকার ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে যখন ফিরছিলেন, তখন রাত্রি প্রথম প্রহর পার হয়েছে অনেকক্ষণ। হয়তো বা দু'পহরের কাছাকাছি তখন। প্রায় পুরানি কেল্লার কাছে এসে যখন পৌচেছেন তখন একজন সওয়ার শাহাজাহানাবাদের দিক থেকে সামনে এসে ঘোড়া রুখে দাঁড়িয়ে গেল। ইমাদ উল মুল্কের সিপাহীর দল তাদের বর্শা উদ্যত ক'রে এগিয়ে এল—কোন্ হ্যায়?

ঘোড়সওয়ার বললে—তাঁবেদার। উজীর-ই-হিন্দোস্তান খান-ই-খানানের! কুদরত খাঁ!

উজীর ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে বললেন—কুদরত খাঁ কি খবর? চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। কি অঘটন ঘটল এর মধ্যে?

কুদরত খাঁ ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এসে সালামত জানিয়ে বললে—খবর বহুৎ খারাপ হুজুরালি। বাদশাহী সিপাহীর দল এসে হুজুর আলির হাবেলী একদম—

—লুঠ কর লিয়া—? আর তুমি এখনও বেঁচে আছ কুদরত?—কুদরত খাঁ তাঁর বিশ্বস্ততম সিপাহীদের একজন।

—না হুজুর, ঘেরাও করে রেখেছে, ঢুকতে পারে নি। আমি কোন মতে বেরিয়ে এসেছি হুজুরালিকে খবর দিতে।

—কি চায় তারা ?

—তলব। তারা তলব চাইছে। আর চিল্লাচ্ছে। বহুৎ বদজবান আর গালি-গালাজ করছে। আমরা ভিতরে ছশো সিপাহী নিয়ে ফটক বন্ধ করে কোনক্রমে রুখে রেখেছি।

—হুঁ।

—ওদের যে রকম হাল্‌চাল্‌ আর বুলিবোলার ঢঙ তাতে হুজুরালিকে সামনে পেলে—। সে চুপ করে গেল। 'কি করবে'—সে-কথা বলতে সে চাইলে না। তবে উজীর ইমাদের বুঝতে বাকী রইল না।

তাঁর পুর্বের কথা মনে পড়ল। পানিপথে—ওই সিপাহীরা ;—ওঃ!

উজীর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে বললেন—ফিরোজ কোটলা চল্‌না। যাও দশ সিপাহী, দেখো—কোটলার মধ্যে বদমাশ ডাকু কেউ আছে কিনা!

গিয়ে দাঁড়ালেন ফিরোজশাহী কিল্লার ভাঙা ইমারতের সামনে। সিপাহীরা ভিতরে চলে গেল।

উজীর তাকালেন শাজাহানাবাদের দিকে। রাত্রির অন্ধকারে দেখা কিছু যাচ্ছে না। শাজাহানাবাদের উপরে আকাশ কালো আলকাতরার মত অন্ধকার। বড় বড় গাছগুলো কালো পাহাড়ের মত মনে হচ্ছে। দিল্লী শহরের দোকানদানি সব বন্ধ। লোক পালাচ্ছে। গুণ্ডা লুঠেরারা লুঠ করছে। বাদাকশানি সিংদাগ রিসালারা পিঁজরা-খোলা নেকড়ের পালের মত বেরিয়ে পড়েছে। খুন জখম—ডাকাতি লুঠ চলছে। হল্লা করছে—হা-হা করে হাসছে। কোতোয়ালী দরজা বন্ধ করে বসে আছে। নয় তো কোতোয়ালী ফাঁকা। কেউ নেই। কি করবে তারা এই নেকড়েদের সামনে ? হল্লার আওয়াজ আসছে। চলে যাচ্ছে এখান পার হয়ে চারিদিকে।

দিল্লীর বাদশাহী আজ ছোট লেড়কীদের খেলাঘর হয়েছে। বাদশাহ এক বুড়ো—এক অপদার্থ—অথচ মতলববাজ। তার উপর কি লালচ লোকটার। উনিই তাকে দিল্লীর মসনদে তখ্‌তনশীন করেছেন। নইলে বাদশাহী অনাথশালা দেউড়ি-ই সালাতিনে পচছিল—পচেই তাকে মরতে হত। লোকে বলে—নসীব। ঝুট বাত, নসীব নয়—এই ইমাদ উল মুল্কই তাকে মসনসে বসিয়েছে। মহম্মদ শাহের ছেলে বাদশা আহমেদ শা'কে হঠানোর কোন ক্ষমতা তার ছিল না। নসীব বলতে গেলে ওঁর। নসীব মানেন না ইমাদ উল মুল্ক। অন্ততঃ মানতেন না। কিন্তু আজ যেন না মেনে কোন হদিস মিলছে না।

আঠারো বছর বয়সে তিনি নবাব সফদরজঙ্গের উজীরি খতম করে মীর বক্সী হয়েছিলেন। তারপর ইস্তিজামউদ্দৌলা—এক পঙ্গু অপদার্থ উজীরকে তুড়ি মেরে হঠিয়েছিলেন। সময় লেগেছিল মাত্র পাঁচ মাস। উজীর হয়েই তিনি আহমেদ শা'কে মসনদ থেকে নামিয়ে এই বুড়োকে বসিয়েছিলেন মসনদে। আহমেদ শা'কে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর আগে আঠারো বছর বয়সে কেউ হিন্দোস্তানের উজীর হয় নি। হিন্দোস্তানের উজীর বাদশাহের বাদশাহ ; সে-ই বাদশাহ তৈরী করে। তিনি আঠারো বছর বয়সে এই বুড়োকে নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছিলেন। হিন্দোস্তানের বাদশাহীকে ফের জিন্দাপীর শাহানশাহ আলমগীরশাহীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। মইজুদ্দিনকে আলমগীর নাম তিনিই নিতে বলেছিলেন। রাত্রে তিনি ভাবতেন, লাহোর থেকে পশ্চিমে পেশবর পর্যন্ত মুল্লুকের ওপর থেকে কাবুলের দুরানী এক-

তিয়ার উড়িয়ে দেবেন। দক্ষিণে চুরমার করে দেবেন মারাঠা কাফিরদের। জাঠ সুরজমলকে তিনি দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে মারবেন, ওর বেটা জবাহির লালকে কুত্তা দিয়ে ছিঁড়ে খাওয়াবেন। রোহিলখণ্ডের রোহিলা আফগানদের করে দেবেন নির্মূল। অযোধ্যাতে খতম করবেন সফদরজঙ্গ আর তার বেটা সুজাকে। কাজ বহুৎ কঠিন! কিন্তু ইমাদ উল মুল্কের কাছে কঠিন কিছু মনে হত না। তবে কাজ কঠিন ছিল—তা তিনি জানতেন। দিল্লীর বাদশাহের তখন ফকীরের হাল। খাজাঞ্চীখানায় খাজনা আসে না কোন সুবা থেকে। বাদশাহের খাস ইলাকা দিল্লীর চারিপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা। পাঞ্জাবে উত্তর থেকে দরবস্ত জিলা তালুক বাদশাহের খাস। দক্ষিণে পশ্চিমে পুবে এমনি বড় বড় ইলাকা। এ থেকেই বাদশাহের বাদশাহী—সে লাল-কেল্লার হারেম থেকে বাদশাহী দপ্তরের বাদশাহী খাস ফৌজের খরচা চলত। দান-খয়রাত, মহ্ফিল, নাচগান, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশাহী মৌজ আর ইলাহী কাণ্ডকারখানা চলেও খাজাঞ্চীখানা ভরপুর থাকত।

ইমাদের উজীরীর আগেই সে সব ইলাকা বিলকুল বাদশাহী এখতিয়ারের বাইরে চলে গেছে। সব থেকে আফসোস, ছোটা আদ্মীরা জবরদস্তি দখল করে নিয়েছে। হাফিজ রহমৎ খাঁ রোহিলখণ্ড, নাজির খাঁ সাহারানপুর থেকে মীরাট পর্যন্ত নিয়েছে। সুরজমল নিয়েছে জাঠ মুল্ক্। ব্রিজমণ্ডল! দক্ষিণ মারাঠারা নিয়েছে। এ, সে,—কে না নিয়েছে।

এক-একটা হামলা হয়েছে, বাস—খানিকটা রুটির টুকরো ছিনিয়ে নিয়েছে। বাদশা ফকীর। তার এলাকা বলতে গেলে আজ শুধু দিল্লী শহর! দিল্লী শহরের খাজনা আর সওদাগরির মাশুল—এ থেকেই বাদশাহী চালাতে হয়। তবু ইমাদ উল মুল্ক ভয় পান নি। কোন কিছুতে পিছপাও হন নি।

তাঁর উজীরীর তিন সপ্তাহ পর—আকিবৎ খাঁ, যে আকিবৎ খাঁ সফদরজঙ্গের সঙ্গে লড়াই থেকে এ পর্যন্ত তাঁর ডান হাত ছিল—তার গোলন্দাজ সিপাহীরা ইমাদ উল মুল্ক উজীরের হাবেলী ঘেরাও করেছিল। চীৎকার করেছিল—তলব! তলব! তলব!

ইমাদ উল মুল্ক বুঝেছিলেন আকিবৎ আর তাঁবেদার থাকতে চায় না! সে তাঁকে ঠেলে ফেলবার মতলবে সিপাহীদের লেলিয়ে দিয়েছে। তাঁর হাবেলীতে তিন পুরুষের দৌলত ক্রোড় ক্রোড় টাকার সোনা রূপা আশরফি সিক্কা—হীরা জহরৎ গাড়া আছে। তিনি সে টাকা দেন নি। শেঠদের গদীতে একটা রুকা দিয়ে সিপাহীদের ভাগিয়েছিলেন। তারপর আকিবৎ খাঁকে তাঁর হাবেলীতে ডেকে সিকায়েৎ করেছিলেন।—এ কি কাজ তোমার?

আকিবৎ বলেছিল—খানখানান, ওদের তলব বাকী পুরা এক বছরের। ওরা হামলা করে আমার জামা শাল বিলকুল ছিঁড়ে দিয়েছে। আমার বেইজ্জতি করেছে। বাঘ নেকড়ে পুষতে হলে খানা দিতে হয়। খানা না পেলে তারা জরুর ছিঁড়ে খাবে পোষনেবালাকে। কি করব আমি!

কথাটা সত্য। আকিবতের বেইজ্জতি—নাজেহালির খবর ইমাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু পুরো বিশ্বাস করেন নি। তিনি বলেছিলেন—চাবুক থাকে না পোষনেবালার হাতে? তার চোখে থাকে না সেই জোশ—যাতে ভুখা জানোয়ার কুঁকড়ে যায়?—সে তা হলে মর্দানাই নয়। সে তো তা হলে বিলকুল হিজড়া!

আকিবত খাঁ অপমানে লাল হয়ে বলেছিল—উজীরসাহেব! ইজ্জৎ রেখে বাত বলুন!

—হিজড়ার ইজ্জৎ!

এবার আকিবৎ তার তলোয়ারে হাত দিয়েছিল। মুহূর্তে তাঁর আফগান দেহরক্ষী ছুরি

হাতে লাফিয়ে পড়েছিল পিছন থেকে। এবং ছুরিটা আকিবতের পিঠ থেকে মুহূর্তে বুকের দিকে বেরিয়ে এসেছিল। তার মুখে একটা লাথি মেরে ইমাদ বলেছিলেন—ফেলে দাও মুর্দাটা—বাগানের ওপারে—যমুনার কিনারে!

আজ সেই হিন্দু গণক পণ্ডিতটাকে মেরেছেন তেমনি করেই। তার মুর্দাটাও ঠিক ওইখানেই ফেলে দিতে বলেছেন।

আকিবতের মৃত্যুর তিন মাস পর আবার এই কাণ্ড করেছিল সিপাহীরা। এবার তাঁর উজীরীর খাস সিপাহীরা সুদ্ধ তাতে নেচেছিল। নাচিয়েছিল তাঁরই মনসবদার জাহিদ বেগ। জাহিদ বেগকে উজীরী সিংদাগ সিপাহীদের তলব দেওয়ার জন্য জায়গীর দেওয়া ছিল। ইমাদ কষে ধরেছিলেন, বলেছিলেন—তোমাকে যে জায়গীর দেওয়া আছে তার টাকা আর তোমাদের কত সিপাহী আছে তাদের তলব ধরে হিসাব করো। মুখে বললে হবে না—সিপাহী বিশ হাজার। হাজির করো সামনে।

জাহিদ বেগ একবার থতমত খেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে উজীর জোরে চেঁচিয়ে বলেছিলেন—সিপাহীদের তলব তুমি খেয়ে নিয়েছ। তুম্ নে খা লিয়া, আর ইলোক ভুখে মর রহে হেঁ! অঁা? বাঁধো!

সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল জাহিদ বেগ।—তারপর সে আর বের হয় নি! আবার হাঙ্গামা বাধল কদিন পর। জামা মসজিদ কুদসিয়া মসজিদ দখল করে তারা লুঠতরাজ চালালো সারা দিল্লী বাজারে।

ইমাদ তাতেও দমেন নি। কিল্লার উপর থেকে গুলি চালাবার হুকুম দিয়েছিলেন তাঁর নিজের সিপাহীদের। কতকগুলো কুত্তা মরতেই সেদিন ঠাণ্ডা হয়েছিল অন্তগুলো।

এর পর এক মাস না যেতে আবার। সেদিন সিপাহীদের বদমাইশী শয়তানী উঠেছিল চরমে। ইন্তিজামউদ্দৌলার মা—তাঁর দাদিয়া শোলাপুরী বেগমকে পথে আটক করেছিল সিপাহীরা।

বাদশাহী জঙ্গী বাহিনীর মালিক প্রধান সেনাপতি মীর বক্সী খানখানান সামসামউদ্দৌলা মারা গেলে তাঁর কাফন আটক করেছিল। তুনিয়ার কারুর ইজ্জৎ, এমন কি ইসলামের বিধির পর্যন্ত অপমান না করে ছাড়ে নি। সেদিন সওয়ারদের জনাহি পাঁচ সিক্কা তঙ্কা আর পয়দল সিপাহীদের এক তঙ্কা দিয়ে ঠাণ্ডা করেছিলেন তিনি।

তারপর একদিন ঘেরাও করেছিল লালকিল্লা। বাদশাহ এখানে ছিলেন না। ছিলেন লুনী শহরে। এ হামলায় উজীরী সিপাহীরাও যোগ দিয়েছিল। লালকিল্লা থেকে বড় বড় আমলা—উজীর বক্সী সব আটকে টাকা আদায় করার মতলব তাদের। যে-কোন মুহূর্তে ফটক ভেঙে ঢোকাও আশ্চর্য ছিল না।

বাদশাহের হারেম থেকে বেগমেরা বাঁদীর বুরখা পরে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে ভিস্তিওয়ালাদের গরুর ওপর চেপে দিল্লী থেকে বেরিয়ে বেইজ্জতি থেকে বেঁচেছিলেন।

শেষ বাঙ্গাল মুলুকের জগৎশেঠের দিল্লী গদীর দেওয়ানের ছেলে জগজীওন দাস হয়েছিল জামীন। আর মাঝখানে এসেছিল এই রোহিলা নবাব নাজিবউদ্দৌলা খান-ই-খানান।

সেদিন সে-ই হয়েছিল মীর বক্সী; তাকে বাদশাহী ফৌজের মালিক ইমাদই করে দিয়েছিলেন। তাকে জায়গীর জিম্মা করে দিয়েছিলেন—সিপাহীর তলব, ফৌজী সরঞ্জামের বিলকুল খরচের ভার তার! তিনিই নাজির খাঁকে এনে ঢুকিয়েছিলেন সেদিন।

চুক,—এইখানে তাঁর চুক হয়ে গেল। তিনি স্বীকার করছেন! রোহিলা নাজিবউদ্দৌলাকে

এনে সাংঘাতিক চুক করেছেন তিনি!

জিলা সাহারানপুর থেকে মীরাট পর্যন্ত সমস্তটা জায়গীর তার। তিন-চারটে কিল্লা তৈয়ার করেছে। শয়তান, সে শয়তান!

শয়তান আলমগীর বাদশাও কম নয়! নইলে বাদশাহের বেগমরা বাঁদীর বুরখা পরে পয়দলে কিল্লা থেকে বেরিয়ে ভিস্তীর বয়েলের পিঠে চেপে দিল্লী থেকে চলে এসে, এই ভাবে অপমানের হাত থেকে বেঁচেছে এ কথা বাদশাহ নিজে দিল্লীতে প্রচার করবেন কেন? ইমাদ শুনেছেন বাদশাহ এতে খুশী হয়েছেন। কারণ তাতে তামাম আদমীর কাছে বদনামী হয়েছে উজীরের। ইমাদেরই মাথা হেঁট হয়েছে।

শুধু তাই নয়—ফন্দী করে নাজিব তার নিজের বারো হাজার সিংদাগ ফৌজকে তাড়াতে বাধ্য করেছে। পানিপথে সেই তাদের উস্কে দিয়েছিল তলবের জন্যে। লাগা হামলা। চড়াও হয়ে যা উজীরের উপর।

ইমাদ বুঝতে পারেন নি। হল্লায় বিরক্ত হয়ে পানিপথে মেহমান নবাব লুৎফুল্লাখাঁর হাবেলী থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন রাগের উপরেই, গায়ে জামা পর্যন্ত চড়ান নি—শুধু একটা আংরাখা পরে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন—নিয়ে এস তোমাদের আদমী, আমি গুনে নিয়ে তলব দেব! নেহি তো নেহি দুংগা। নেই মিলেগা! এক আদমী কাজ করে কম্-সে-কম্ তিন আদমীর তলব আদায়ের সিপাহী ফন্দী তিনি জানেন। কিন্তু এই নাজিবউদ্দৌলার উস্কানিতে উদ্ধত তুর্কী সিংদাগ সিপাহীরা সেদিন তাঁর ধমক শোনে নি। তারা তাঁর বেইজ্জতির বাকী রাখে নি। তাঁর জামা ছিঁড়ে দিয়ে—হাত ধরে টেনে—মাটিতে ফেলে—হিঁচড়ে চোট্টা বানিয়েছিল। কিন্তু ইমাদ উল মুল্ক গাজিউদ্দিন ওতে দমেন নি। কোনরকমে ঝামেলা মিটিয়ে—বারো হাজার তুর্কী জোয়ান, সিংদাগ রিসালার জঙ্গী ফৌজ, সব বরখাস্ত করে তাড়িয়ে দিলেন—যাও। কাম চাই না—দাম নেহি মিলেগা। এখন রোটীর জন্যে মজদুরী করো—যাও!

এও একটা চুক হয়ে গেছে, তাঁর নিজের সিপাহীদের রাখা উচিত ছিল। এই দু-দফার চুক।

ফের চুক। এক চুক, দো চুক—ফের এক চুক—তিন চুক। উমধা বেগমকে ফেলে সাদী করলেন গন্না বেগমকে। এক তওয়াইফের বেটী—সে গজল বানায়—সে গজল যখন গায় তখন বুলবুলের সরম লাগে—হিন্দোস্তানের কোয়লা চুপ মেরে যায়—এই নেশায় তিনি তাকেই বিয়ে করলেন উমধাকে ফেলে! সব থেকে বড় চুক এই চুক। নাহলে উমধা আর উমধার মা মুঘলানীর টানে আজ শাহ সকলের থেকে আগে তাঁকে ডাকতেন। তিনি বুক উঁচু করে গিয়ে শাহের সঙ্গে যোগ দিয়ে—দিল্লীতে এসে ঢুকতেন। সকলের আগে ঘোড়ার উপর থাকতেন ইমাদ উল মুল্ক—উজীর-এ-হিন্দোস্তান।

তিনি এসেই হঠাতেন বাদশা আলমগীরকে। বসাতেন আর একজন আপিংখোর শাহজাদাকে। নাজিবউদ্দৌলাকে কুর্নিশ করাতেন। দরকার মত—সাফ্—। হাঁ, একদম সাফ্ করে দিতেন। একে একে জাঠ সুরজমলের বল্লভগড় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতেন। দক্ষিণে মারাঠা ডাকুদের একদম বরবাদ করে দিয়ে এক নয়া হিন্দোস্তান গড়ে তুলতে পারতেন। চুক এক চুক দো চুক—তিন চুক হয়ে গেছে।

নাহলে আজ নাজিবউদ্দৌলা তার ফৌজকে দিয়ে তাঁর হাবেলী ঘেরাও করাতে সাহস করত না। ইমাদ এর প্রতিকারের জন্য মারাঠাকে ডেকে টাকা দিয়ে তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। আরও কিছুদিন আগে হলে হয়তো সুবিধা হত।

শয়তান নাজীর খাঁ জায়গীর ভোগ করছে। মাটির তলায় গেড়ে রাখছে খাজনার টাকা। সিপাহীদের তলবের বেলা দেখাচ্ছে হিন্দোস্তানের উজীরকে। শয়তান! বেইমান! বজ্জাত! দজ্জাল!

মনে পড়ছে আজ সকালে কথা হয়েছে। বলেছে—দু ক্রোর টাকা দিতে হুকুম হোক উজীর সাহেবের। আমার সিপাহীদের নিয়ে যাচ্ছি—দেব লড়াই শাহ আবদালীর সঙ্গে। না দিলে—লড়তে গিয়ে মরতে কেউ রাজী নয়। ওদের খুনের মধ্যে নুন কমে গেছে না তলব পেয়ে। তাগদ নেই!

জায়গীরের কথাটা সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

তারপর বলেছে—লড়াই দিয়েই বা কি হবে উজীর? কার সঙ্গে দেবে?

—দুরানী শাহের সঙ্গে।

—কিস লিয়ে?

—ইজ্জৎকে লিয়ে।

—ইজ্জৎ কার—

—বাদশাহের—আমার—

—বাদশাহের ইজ্জৎ? চাঘতাইদের ইজ্জৎ চলে গেছে অনেক দিন। যেদিন কাফির মারাঠা মনসবদারের পিছনে বাদশাহীকে খাড়া করেছ সেইদিন গেছে একদম। যেটুকু ছিল সেটুকুও গেছে। আর তোমার ইজ্জৎ? রসুল-এ-আল্লা! এক কসবীর বেটীর জন্যে সৈয়দের বেটী—তোমার মায়েরা বহেন—তাকে তুমি ভেবেছ ময়লা কাপড়!

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেছে তাঁর। তিনি এখনও ভাবছেন—মিটয়াটের নাম করে ডেকে—খতম—যেমন আকিবৎ খাঁকে—জাহিদ খাঁকে করেছেন!

আর গন্না!—হাঁ, ওই এক চুক!

—একটু পরে মনে হল—ঠিক আছে। ঠিক আছে। তবে ওকে আম্মার সঙ্গে রাজপুতানায় পাঠানোটা ভুল হয়েছে। তবে হিন্দু গণক বললে, উমধার সঙ্গে তার সাদী হবে, মুঘলানী তাঁকে বাঁচাবে শাহ আবদালীর হাত থেকে। ঠিক আছে—ঠিক আছে।

—হুজুর-আলি—

চমকে উঠলেন ইমাদ। সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠলেন—ক্যা হায়? কৌন্?

—সিপাহী। হুজুর-আলির তাঁবেদার!

—কি?

—হুজুর-আলি, ফিরোজশাহী কোটলার ভিতর একদল বদমাশ ভারী গুণ্ডা ঢুকে আস্তানা গেড়েছিল। তারা আঠ ছোকরীকে লুটে এনে এখানে বদমাশি করছিল। ওদের তিন আদমীকে আমরা পাকড়েছি, দু আদমী জখম হয়েছে—বোধ হয় বাঁচবে না। ছোকরীগুলো আছে। আর রূপেয়া আসবাব—বর্তন উর্তন সোনে চাঁদির—তাও আছে। সিপাহীরা বলছে—তাদের আরজি—

—কি আরজি—

—লুঠের মাল হুজুর-আলির তাঁবেদারদের বকশিশ করে দিতে হুকুম হয়ে যায়!

তার মুখের দিকে তাকালেন ইমাদ উল মুল্ক গাজিউদ্দিন। ঠিক এইভাবে লুঠের মাল বকশিশ বলে দাবি করে না সিপাহীরা। লোকটা দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বকশিশ চাচ্ছে।

তার অর্থ?—সে অর্থবোধ করতে বিলম্ব হল না ইমাদ উল মুল্কের। ওই বাদশাহী সিপাহী,

যারা তাঁর ঘর ঘেরাও করে হল্লা করছে, তাদের বিদ্রোহ এদের রক্তেও সাড়া জাগিয়েছে।

চুক—তাঁর চুকের জন্য তাঁর এই দুর্ভোগ! নাহলে শাহ আবদালী হিন্দোস্তানে ঢুকে লড়াই দিত কাফেরদের সঙ্গে এবং তিনিই হতেন সে লড়াইয়ে হিন্দোস্তানের বাদশাহী আর মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি—তাঁর স্থান হত শাহের পাশেই! চুক! চুক হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন উজীর, তারপর বললেন—জরুর, এ লুঠের মাল তোমাদের। কিন্তু দেখো, ঔরৎ নিয়ে যেন নিজেদের মধ্যে লড়াই করো না। খবরদার! হাঁ—আউর এক বাত। ঔরৎলোকের মধ্যে আমীর ওমরাহ বড় ঘরানাদের লেড়কী কেউ নেই তো!

—না—না হুজুর!

লোকটা ভিতরে চলে গেল, বলেও গেল না যে—আপনি ভিতরে এসে বসুন, আরাম করুন। উপরন্তু তাঁর কাছে যে দুজন সওয়ার দাঁড়িয়েছিল তাদেরও একজন চলে গেল। রইল কেবল সে-ই—সে খবর এনেছে তাঁর হাবেলী থেকে। কুদরৎ খাঁ। তাঁর বিশ্বস্ত সিপাহীদের একজন। এমন বিশ্বস্ত লোক তাঁর খুব বেশী নেই। বড় জোর পঞ্চাশ জন! এরাই তাঁর ভরসা।

এবারকার এই খুনখারাবি জঙ্গীবাদী লুঠতরাজের পালা শেষ হোক—তারপর এই পঞ্চাশ-জনকে পাঁচ হাজার করে তুলবেন ইমাদ উল মুল্ক। তিনি কখনও হারবেন না।

ইমাদ ডাকলেন—কুদরৎ!

—জনাব-আলি!

—চল, এখান থেকে চলে চল। এরা তো—

—হ্যাঁ জনাব, এরা এখন যাবে না আর ওই ঔরতের ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু করবে! কিন্তু কোথায় যাবেন এখন?

—শহরের দিকেই যাই চল। ওদিকের হল্লা যেন কমে এসেছে মনে হচ্ছে না?

কান পেতে শুনে কুদরৎ বললে—হাঁ জনাব-আলি, শোনা তো যাচ্ছে না।

—চল এগিয়ে যাই। আমি দিল্লী ফটকের বাইরে কোনও জায়গায় দাঁড়াব, তুমি ফটকে গিয়ে খবর নিয়ে আসবে পাহারাদারদের কাছে।

ফিরোজ শাহ কোটলা থেকে বেরিয়ে তারা এসে উঠল মথুরা সড়কে। রাস্তাটা খাঁ খাঁ করছে। জনমানব নাই। দুপাশের বসতি প্রাণহীন, কোথাও আলো জ্বলে না—কোথাও মানুষের সাড়া না। বিলকুল সব পালিয়েছে। শুধু দুটো ঘোড়ার নালবন্দী আটটা পায়ের খপ খপ খপ খপ শব্দ বেজে চলেছে। মধ্যে মধ্যে তাদের দেখে বসতির গলির মুখে কুকুর হাউ-হাউ করে চীৎকার করে উঠছে।

—কুদরৎ!

—জনাব-আলি!

—তোমার কি মনে হয় কুদরৎ—এরা হাবেলীর ফটক ভেঙে বাড়িতে ঢুকে লুঠতরাজ করে চলে গেল? নইলে কই—সে হল্লা তো শোনা যাচ্ছে না—আমরা তো ফটকের কাছে এসে পড়েছি।

ইমাদের চিন্তা হচ্ছে তাঁর হাবেলীর একটা ঘরে কুঁইয়া গেঁথে তার ভিতর তাঁদের তিনপুরুষ উজীরীর দৌলত পুঁতে মুখ খুব জবরদস্ত গাঁথনি করে বন্ধ করা আছে। উপরটা বহুত শক্ত গাঁথনি। অন্তত দু-তিন ক্রোর টাকার দৌলত! তবে সে সন্ধান কেউ জানে না। জানে একমাত্র তাঁর আম্মাজান! তিনি নেই। তাঁকে আর জেনানীলোকদের আজই রাজপুতানায়

পাঠিয়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত।

অল্পস্বল্প খুঁড়েও কেউ তার হদিস পাবে না। অন্তত মানুষভর খোদাই করলে তবে তখন বুঝতে পারা যায় যে, এর তলায় আছে কুয়ো—। না—তা কেউ পারবে না। আর সে এক চোরকোঠরীর সামনে—দেখে মনে হয় এখানে কোন কিছু নেই।

কুদরৎ উত্তর দিলে—না হুজুর-আলি, বাড়ি ওরা ঢুকতে পারে নি—এতে আমি নিশ্চিত।

—কি করে বুঝছ?

—হুজুর-আলি, আমি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে শুধু ওই হল্লার দিকেই কান পেতে ছিলাম, আমার মনও ওই দিকে ছিল। হুজুর-আলি ভাবনায় ডুবেছিলেন, কোন কিছুরই খেয়াল ছিল না। সে আমি ঠিক বুঝেছিলাম। কিন্তু আমি কান বাগিয়ে ছিলাম, বন্দুকের আওয়াজের জন্যে। হামলা জোর হলে আমাদের সিপাহীরা বন্দুক দাগবে ঠিক করে রেখেছিল। বন্দুকের আওয়াজ কিন্তু শুনি নি। আমাদের একশো বন্দুক তৈয়ার ছিল। একসঙ্গে একশও বন্দুক দাগলে সে আওয়াজ কোশভর দূর থেকে শোনা যায়।

—হুঁ। ঠিক বলেছ। কিন্তু—

—না জনাব-আলি, যে ছশো আদমী হাবেলীর মধ্যে আছে তারা কেউ পালাবে না জান থাকতে। তার উপর বেগম সাহেবা রয়েছেন; তাঁকে ফেলে পালাবার মত নিমকহারামি কখনও করবে না।

চমকে উঠলেন ইমাদ।—বেগম সাহেবা? কুদরৎ! কি বলছ তুমি? বেগম? কে বেগম? কৌন বেগম? বেগম সাহেবা আম্মাজান সব তো চলে গিয়েছে অমর সিং-এর সঙ্গে!

—জনাব-আলির বেগম সাহেবা ফিরে এসেছেন।

—ফিরে এসেছেন? সে কি? কখন?

—হুজুর-আলি যে-বক্ত ওই হিন্দু পণ্ডিতকে খত্‌ম্ করে দিয়ে ঘোড়ার পর সওয়ার হয়ে বেরিয়ে গেলেন তার আধাঘড়িও তখন হয় নি, তারপর, আমরা মুর্দাটাও সরাই নি, ঠিক সেই সময় বেগম সাহেবার পালকি ফিরে এল। ঢুকে গেল হাবেলীতে। শুনলাম, সাকিনা বিবি বললে—বেগম সাহেবার তবিয়ৎ খারাব হয়ে পড়েছে। কেবল বলছে—পানি—পানি! পানি দো! এই জাড়া—এত শীত-এর মধ্যেও 'গিলাস গিলাস' পানি খাচ্ছেন।

ইমাদ উল মুল্কের পায়ের গোড়ালি দুটো তার আরবী ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিলেন যেন আপনা থেকেই, হাতের চাবুকটার প্রান্ত সপ শব্দ করে পড়ল ঘোড়াটাব পিছনের পায়ের উপর। ঘোড়াটা চমকে উঠে চলনের চাল বদলে দ্রুততর গতিতে ছুটতে লাগল।

দেহ্‌লী ফটকের বন্ধ দরজার কাছে এসে হাঁকলে—এ ফটকদার! এ রিসালা—।

—কে? কৌন তুম?

ইমাদের পিছন থেকে কুদরৎ হাঁকলে—এও বেওকুফ, খুদ উজীর-এ-হিন্দোস্তান খান-ই-খানান আমীর উল উমরা ইমাদ উল মুল্ক গাজী-উদ্দীন বাহাদুর! খোল্—ফটক, খোল্!

বারো

হাবেলীতে ঢুকে মঞ্জেলের সামনে সিঁড়ির উপর লাফ দিয়ে নামলেন ইমাদ। হাবেলীর চারিপাশ তখন জনশূন্য। বিদ্রোহী সিপাহীদের এক আদমীও তখন সেখানে ছিল না। তারা সব চলে গেছে।

নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন ইমাদ। কাল তিনি দেখবেন নবাব নাজিবউদ্দৌলাকে। তাকে ডাকবেন মিটমাটের জন্তে। তারপর—। এখানে না আসে সে লালকিল্লায় বাদশাহের সামনে ডাকবেন—। তারপর সেখানেই হয়ে যাবে—খত্‌ম্। কি করে কি করতে হয় সে তাঁর চেয়ে কেউ ভাল জানে না।

নিশ্চিন্ত হয়ে গন্নাকে দেখবার জন্ম তিনি ব্যস্ত হয়ে লাফ দিয়ে নামলেন ঘোড়ার উপর থেকে। তবিয়ৎ খারাপ? কি হল তার?

তবে খোদা মেহেরবান। তবিয়ৎ খারাপ করে দিয়ে গন্নাকে ফিরিয়েছেন। এতক্ষণ তিনি চুকের কথা ভাবছিলেন—বার বার মনে হয়েছে তার মধ্যে—কি আপসোসের বাত। আবার চুক করলেন তিনি? গন্নাকে যদি না পাঠাতেন! ওঃ—

হন হন করে মঞ্জিলের ভিতরে ঢুকতেই তাঁকে অভিবাদন করে কোতোয়াল কাউলাদ খাঁ দাঁড়াল—হুজুর-আলি!

থমকে দাঁড়ালেন ইমাদ—ফাউলাদ খাঁ! কি খবর?

—বহুত জরুরী খবর নিয়ে বসে আছি জনাব পুরা ঘণ্টাভর!

—বহুত জরুরী খবর? কি সে খবর?

—মীর বক্সী নবাব নাজিরউদ্দৌলা খাঁ খান-ই-খানান তামাম বাদশাহী ফৌজ নিয়ে যমুনা পার হয়ে চলে যাচ্ছে।

—সে যাবে। জানি—যাক। সাহারানপুর আমি চষে দেব। থাক সে লুকিয়ে বসে।

—না জনাব-আলি। নবাব তার ফৌজ নিয়ে চলে যাচ্ছে শাহ আবদালীর ছাউনিতে। আজ দেড় পহর ভর রাতের সময় শাহ আবদালীর কাছ থেকে তার কাছে এ নিশান এসেছে। শাহ আবদালী তাকে খুশী হয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন। নবাব অবশ্য নিজেই লোক পাঠিয়েছিল এই দরখাস্ত দিয়ে—সে আমি দুরী দুরানী শাহানশাহ দুনিয়ার রুস্তম আবদালীর তাঁবেদারিতে যেতে চাই। এখানে উজীর ইমাদ উল মুল্ক হিন্দোস্তানে চাঘতাই বংশের বাদশাহীকে কাফের মারাঠা ডাকুদের তাঁবেদার করে ইজ্জৎ আর ধরম সব কিছু বরবাদ করে দিয়েছে—এ আমি বরদাস্ত করতে পারছি না।

—বেইমান—বেইমান!

—সারাদিন নবাব যাবার বন্দোবস্তই করেছে। হুজুর-আলির হাবেলী ঘেরাও করেছিল ঠিক এইজন্তে যে, হুজুর-আলি এখানেই বন্ধ থাকবেন—ওদিকের খবর কিছু পাবেন না। রসুল খাঁ চিঠি নিয়ে পহর-ভর রাতের সময় ফিরে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার সিপাহীদের তুলে নিয়ে আধাঘড়ির মধ্যেই রওনা হয়ে গেছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গেই এসেছি আপনাকে খবর দিতে। এসে দেখলাম—হুজুর-আলি নেই। অপেক্ষা করে বসে আছি।

উজীর ইমাদ উল মুল্ক গাজিউদ্দীন দুই হাতে মাথা ধরে একটা তক্তপোশের আসনের উপর বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে অজগরের মত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—ঠিক আছে ফাউলাদ খাঁ। তুমি যাও। আমার জান কবুল—তোমরা যারা আমাকে ধরে আছ, তাদের আমি বাঁচাব। নবাব নাজিবউদ্দৌলা বেওকুফ, রোহিলা আফগান। বুড়বক গিধ্বড়! আমার তার থেকে অনেক বেশী বুদ্ধি আছে। তাকে আমি চালমাত্ করে দেব। তুমি কেবল এক কাম কর। মুঘলানী বেগমের হাবেলী পাহারা দাও। কাল আমি যাব তার সঙ্গে মুলাকাত করতে। তার আগে যেন কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে না পায়। আর এক কাম করবে। কিছু আদমী যোগাড় করে একটা জোর হামলা জুড়ে দেবে হাবেলীর সামনে।

সকাল বেলাতেই। তারা—চিল্লাবে—মুঘলানীর ডাকে এসেছে আবদালী! তার জন্মেই দিল্লীর এই বিপদ! তারা মুঘলানীকে সাজা দেবে। ছিঁড়ে ফেলবে। তুমি লোকজন নিয়ে তাদের আটকে রেখেছ এই ভান করবে। ঠিক এই সময় আমি যাব।

উঠে উপরে চলে গেলেন ইমাদ। মতলব ফন্দী তাঁর এসে গিয়েছে। আচ্ছা ফন্দী!

দিল্লীর শীতের রাত্রির দ্বিপ্রহর পার হচ্ছে। তিন প্রহরের দিকে চলেছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। যেন সুই বিঁধছে। দিল্লীর কোলাহল কলরব স্তিমিত। নিদারুণ আতঙ্কের মধ্যেও ঝিমিয়ে পড়েছে কোলাহল। হয়তো ভয়ে বোবা হয়ে পড়েছে। ইমাদ উল মুল্ক এসে আপনার শয়নকক্ষে ঢুকলেন। মোমবাতির নরম আলো জ্বলছে মাত্র দুটি সামাদানে। আজ অন্য ঝাড়লণ্ঠনে বাতি জ্বলে নি। জ্বালাবার সময় ছিল না। ওই একটা দুটো আলো জ্বেলেই দায় সেরেছে। সারা মঞ্জিলটা নিঝুম। জেগে রয়েছে হারেমের খোজা চারজন।

শোবার ঘরে গন্না বেগম কই? বিছানা তো খালি পড়ে রয়েছে! এদিক-ওদিক তাকিয়ে নজরে পড়ল একটা মসনদের উপর উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে গন্না। মাথার ওড়নাটা খুলে গিয়েছে, ঘোর লাল রঙের কাশ্মিরী পশমী পাঞ্জাবির উপর কালো সাপের মত মোটা বেণীটা এঁকে বেঁকে নিথর হয়ে পড়ে আছে। ঘরখানা অনেকটা গরম মনে হল ইমাদের। বাইরের ঠাণ্ডা থেকে এসে ঘরে ভারী আরাম লাগল।

তাকিয়ে তাকিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন ঘুমন্ত গন্নাকে। মাথার মধ্যে ভিড়-করা হিন্দোস্তানের চিন্তাগুলোকে জঞ্জালের মত সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন তিনি।

সরানো ঠিক যাচ্ছে না। ভুখ লেগেছে। পেট জ্বলছে। ইমাদ ডাকলেন—কে আছিস?

খোজা বরদার এসে দাঁড়াল। ইমাদ বললে—বহুত ভুখ লেগেছে। খানা কি আছে দিতে বল বাবুর্চিকে।

হঠাৎ মনে পড়ল—ওঃ, আজ তো সন্ধ্যের পর নামাজ রাখা হয় নি! কসুর হয়ে গেছে। আল্লা-রসুল-এর খোদাতায়লা মেহেরবান, মেহেরবান পয়গম্বর হজরত মহম্মদ! বান্দার কসুর মাফ্ কর!

প্রার্থনা শেষ করে ফরাশের উপর মূল্যবান কাপড় বিছিয়ে খেতে বসে মনে হল—গন্না খায় নি তো!

ইমাদ জিজ্ঞাসা করলেন—বেগম খেয়েছে? কি খেয়েছে?

—কিচ্ছু না। একদম কিচ্ছু না।

—একদম কিচ্ছু না? স্রেফ পানি?

—পানিও খান নি হুজুর-আলি। প্রথম বারতিনেক পানি পিয়েছিলেন। তারপর—

—কি তারপর?

—স্রেফ শরাব সিরাজী পিয়েছেন। ভর্তি ভর্তি পিয়ালা। ওই বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন।

চমকে উঠলেন ইমাদ! রসুল-এ-আল্লা খোদা পয়গম্বর! শরাব—সিরাজী? শরাব সিরাজী পিয়েছে গন্না। গন্না শরাব পিয়েছে? কি হল? ফিরে এল পথ থেকে—তবিয়ৎ খারাপ। তারপর শরাব? শরীর খারাপ তো শরাব কি করে খেলে গন্না! যে গন্না কখনও শরাব খায় না! স্পর্শ করে না! সে—!

দারুণ ক্রোধে ইমাদ উঠে গিয়ে গন্নার বেণীতে ধরে তাকে টেনে তুললেন। চোখ তাঁর

জ্বলছিল। তাঁর কঠিন কণ্ঠে ডাকলেন—গন্না! গন্না!

বেণীটা ধরে নিষ্ঠুর ঝাঁকি দিলেন—'গন্না!'

গন্না এবার চোখ মেললে—চোখ দুটো রাঙা। দৃষ্টি বিহ্বল! নিশ্বাসের সঙ্গে শরাবের গন্ধ আসছে। একটু দেখে ইমাদকে চিনে সে অত্যন্ত ঘৃণাভরে বললে—তুমি ঝুটা আদমী!

—গন্না!—ক্রোধে ফেটে পড়লেন ইমাদ।

—এক ফকীরের একটি চোখের জন্যে তোমার কাছে আমি নিজেকে বিক্রী করেছিলাম! খৎ লিখেছিলাম। তুমি ঝুটা আদমী। তুমি আমাকে বলেছ, হাঁ, দিলাম তোমার দাম—ওই চোখের দৃষ্টি। কিন্তু—,

বিষাক্ত হাসি ফুটল গন্নার মুখে—যা তার মুখে কেউ কখনও দেখে নি। বললে—দাম তুমি দাও নি। অন্ধা করে দিয়েছ। তুম ঝুটা আদমী।

ইমাদের চোখ বাঘের চোখের মত জ্বলছিল।—তিনি চাপা গলায় বললেন—কে বললে তোকে? ঝুট বাত—

—হিন্দোস্তানের বাদশাহী আর ইজ্জতের কবর দেনেবালা—ঝুটা উজীর তুমি! ঝুট বাত বলে বলে মানুষের দেখা সত্যকেও তুমি ঝুট বল! পাঁচ বক্ত নামাজ পড়!—তাও তোমার ঝুট হয়ে যায়। ছি-ছি-ছি। ছি-ছি-ছি।

তীক্ষ্ণ কুটিল হাসি দেখা দিল উজীরের মুখে—বললেন, খুব আস্তে আস্তে—আমি কি করব? মর্জি খোদাকি—খেল নসীবকা। আমি কি করব?

—কিন্তু ইজ্জৎ ইনসানকি!

—ইজ্জৎ আমার হিন্দোস্তানের উজীরী। সে আমার আছে রে কসবীর বেটী! সে আমার আছে!

—আমি কসবীর বেটী? আর তুমি?

—আমি হিন্দোস্তানের উজীর-উল-মুল্‌ক্!

—উজীর! সে উজীরী-ই খতম্! আমা থেকেই তা খতম্ হবে। আফগানেস্তানের বাদশা আসছে। উজীরী খেল্ তোমার খতম্। আমার সঙ্গে বেইমানীর সাজা তোমার মিলবে।

ইমাদ ঠাস করে তার গালে এক চড় মেরে ফেলে দিলেন মেঝের উপর। গন্না অসাড় হয়ে পড়ে রইল। ইমাদ কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে ফিরে এসে বসলেন তাঁর খাবার জায়গায়। বড় ভুখ্ পেয়েছে তাঁর। খেতে খেতে তিনি ফিরে ফিরে দেখতে লাগলেন—বিস্রস্তবসনা মদের নেশায় আঘাতের ফলে প্রায় বেহুঁশ গন্নাকে।

পেট পুরে আসছে। ক্ষুধার জ্বালা নেই। দেহ মন সুস্থ হচ্ছে। গন্নার দিকে ফিরে তাকালেন ইমাদ। তাকিয়েই রইলেন। গন্না বড় খুবসুরত!

ইমাদ জানেন, গন্নাকে যেতে হবে। হ্যাঁ, যেতে হবে। শাহ আবদালী তাকে নিয়ে কি করবে তা জানেন না—তবে ইমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। হয়তো নিজেই নিয়ে যাবে। কসবী বাঁদী করে। শাহ আবদালীর উমর অনেক হয়েছে। নাকটা বেমারে বসে গেছে। তবু আবদালী চেয়েছে বাদশাহ মহম্মদ শাহের বেটী হজরত বেগমকে। ঔরতের ভুখ তার যায় নি। সাদী করবে।

গন্নাকেই বা বাঁদী করে নিয়ে যাবে না কেন?

যাক। যাক। কিন্তু তার আগে আজকের এই রাতটা—তিনি ওই গন্নাকে নিয়ে ক্ষুধা মিটিয়ে ভোগ করবেন।

গন্না বহুত খুবসুরত!

*　　　*　　　*

পরদিন সকালে উঠেই তিনি খোজা সর্দারকে ডেকে বললেন—বেগম রইল। খবরদার—না পালায়, না জওহর খায়, না মরে। যদি কিছু হয় তবে মাটিতে গেড়ে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো আমি! ডাক, বাঁদী সাকিনাকে ডাক!

সাকিনাকে ডেকেও ঠিক এই কথাগুলি বলে তিনি নিচে নামলেন। কয়েকজন বড় আমীর বসে আছে অপেক্ষা করে।

এক প্রশ্ন—কি হবে?

ইমাদ বললেন—কি হবে! নাদির শাহ এলে যা হয়েছিল তাই হবে। মীর বক্সী নাজিবউদ্দৌলা রোহিলা-শিয়াল ভেগে গিয়েছে ফৌজ নিয়ে, আমি কি করব? লড়াই দেবার সিপাহী নাই। তোপ দাগবার গোলন্দাজ নাই। তোপ টেনে নিয়ে যাবার জন্য বয়েল তাও হয়তো মিলবে না। করব কি? তবু বাঁচতে হবে। কোশিস করুন আপনারা। কোশিস আমিও করছি। ভরসা রাখুন আমার উপর। আমি করছি চেষ্টা। আপনারা বরং কিল্লায় গিয়ে বাদশাকে চোখে চোখে রাখুন। বাদশা ষড়যন্ত্র করছে। আমি সেখানে আসছি।

বলেই তিনি বেরিয়ে গিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বসলেন। দশজন খাস উজীরী নাসাকচি তাঁর সঙ্গে গেল। সঙ্গে নাকাড়াদার নিলেন না। উজীর চলেছে, নাকাড়া বাজিয়ে এ কথা ঘোষণা করে যাবার সময় এ নয়।

দিল্লীর বড় বড় পথগুলি প্রায় জনশূন্য। গোলমাল উঠছে মহল্লার ভিতরে ভিতরে, গলি-গলিতে। মহল্লার ফটকগুলো প্রায় বন্ধ করেছে এখন থেকেই। দোকানপাট বন্ধ। শুধু বেড়াচ্ছে কতকগুলো কুকুর। আর কতকগুলো বদমাশ গুণ্ডা আদমী।

*　　　*　　　*

মীর মান্নু—নিজাম উল মুল্কের সন্তান। খাঁটি সৈয়দের বংশ, সেই রক্ত তাদের শিরায় শিরায়। মীর মান্নু নিজে হিন্দোস্তানের আমীর-শাহীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বাদশাহ মহম্মদ শাহের বৃদ্ধ উজীর সাহেবের বড় ছেলে। মীর মইনুদ্দিন খান—পরে লাহোরের সুবাদার হয়েছিলেন খান-ই-খানান মইন উল মুল্ক আমীর উল মুল্ক। সাধারণের কাছে মীর মান্নু বলে পরিচিত। পয়গম্বর বংশের রক্তের সঙ্গে সংশ্রব। তাঁর পিতা-পিতামহ বংশানুক্রমে দিল্লীর উজীর উল মুল্ক। তাঁর ছোট্ ভাই ইন্তিজামউদ্দৌলাও উজীর হয়েছিলেন। তাঁকে হটিয়েই ইমাদ উল মুল্ক উজীর হয়েছেন। মীর মান্নু জঙ্গীদের মধ্যে রুস্তমের মত সাহসী এবং বীর। খাঁটি মুসলমান। মুঘলানী বেগম তাঁর স্ত্রী—উমধা বেগম তাঁর কন্যা।

মীর মান্নুর মৃত্যুর পর মুঘলানী বেগমের অনাচার-ব্যভিচার যতই প্রকাশ্য এবং প্রবল হয়ে উঠুক, উজীর ইমাদ তাদের বন্দী করে অসম্মান করতে সাহস করেন নি। চতুর ইমাদ, তিনি উমধার সঙ্গে হেনাবন্দী হওয়ার পরও—তাকে তার মায়ের কলঙ্কের জন্য বিবাহ করেন নি, কিন্তু সম্বন্ধটা ভেঙে দেন নি। দিল্লীতে তাদের নিজেদের হাবেলীতেই নজরবন্দী করে রেখেছিলেন। এই হাবেলীর আর একটা অংশে ইন্তিজামউদ্দৌলা বাস করে; সেও ইমাদের প্রতিদ্বন্দী; গোটা হাবেলীকে ঘিরে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করে নিশ্চিন্ত ছিলেন ইমাদ।

চুকের পর চুক করলেও এইখানে আর একটা চুক তিনি করেন নি। এই হাবেলীর ফটকের সামনে সেদিন ভোরবেলা থেকেই একদল লোক এসে হামলার জন্যে জমায়েত হয়ে চীৎকার করছিল।

—মুঘলানী বেগম! কোথা মুঘলানী বেগম? জাহান্নমে যাক মুঘলানী বেগম। তাকে আমরা ছিঁড়ে ফেলব। সে-ই। সে-ই ডেকে এনেছে আফগানেস্তানের লুঠেরা বাদশা আবদালীকে! আমরা তার বদ্‌লা চাই! নিকাল দো—ওহি—বদমাশ ঔরতকো।

চীৎকার করছে তারা প্রাণপণে। ক্রোধ তাদের ফেটে পড়ছে! কিন্তু দিল্লী শহরের খুদ কোতোয়াল ফাউলাদ খাঁ কোতোয়ালীর নাসাকচী নিয়ে খাড়া হয়ে গেছে ফটকের সামনে। তাদের রুখতে নাসাকচীরা বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

—খবরদার। এক পা এগুলে—গোলি দাগা যায়েগা।

ইমাদ মনে মনে তারিফ করলে ফাউলাদ খাঁকে।—বহুত আচ্ছা ফাউলাদ খাঁ। হাঁ—এই ঠিক হয়েছে।

হাবেলীর মধ্যে ঝরোকায় চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে উমধা বেগম। মুঘলানী কাল রাতে প্রচুর মদ্যপান করেছিল মনের আনন্দে; শাহ্ আবদালী তার 'ধরম বাপ'—তাকে তিনি কন্যার মত স্নেহ করেন; তিনি আসছেন দিল্লীতে। এবার সে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হবে। বাদশাহ আবদালীর পাশে থেকে কানে কানে সল্লা দেবে, শোধ নেবে, সে এর শোধ নেবে। সব থেকে তার বেশী রাগ ইমাদের উপর। ইমাদের সঙ্গে উমধার হেনাবন্দী হয়ে গেছে—তা নইলে সে তার গর্দান নিতে বলত আবদালীকে। তাকে গিধ্বড়ের উপর চড়িয়ে সারা দিল্লী শহর সে ঘোরাবে।

বাঁদীদের নাচগান শুনেছে আর উল্লাস করেছে। শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিল অঘোরে। মতলব ছিল সকালে উঠে আবার আরম্ভ করবে। নাচগান, শরাব আর তার সঙ্গে সে একটা ফর্দ করবে। দিল্লীর উমরাহদের মধ্যে কাকে কাকে দিতে হবে সাজাই। আর কার কার ঘরে মাটিতে গাড়া আছে দৌলত তার ফর্দ। সেটা সে পেশ করবে শাহ্ আবদালীর সামনে। কিন্তু ভোর হতে-না-হতে হল্লার আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেল—শুধু ঘুমই নয়—মৌজও ছুটে গেল। কে এরা? কারা? কি মতলব?

উমধা তার আগেই উঠে ঝরোকায় এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ তার বিবর্ণ হয়ে গেছে। উমধা উদ্ধত উগ্র কিন্তু সে মায়ের মত নয়। সে সৈয়দ বংশের মেয়ের মতই মায়ের অনাচার থেকে দূরে থাকে। সে বললে—ওরা দিল্লীর লোক! চিল্লাচ্ছে! হামলা করতে এসেছে।

—হামলা! কুত্তার দলকে আমি কেটে হাবেলীর সামনে মুণ্ডু দিয়ে পাহাড় বানাব। চলো। হারামীর দল জানে না—

সে প্রমত্ততার মধ্যেই, বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদের শাসাবার জন্যে বের হবার উদ্যোগ করেছিল। তার হাত চেপে ধরেছিল উমধা।

—কোথা যাবে?

—বারান্দায়—বলে দেব—শির নেব আমি।

—তার আগে ওরা হাবেলী ভেঙে তোমাকে ছিঁড়ে ফেলবে। শাহ এখনও যমুনার ওপারে, বিশ কোশ দূরে!

একটা প্রচণ্ড কোলাহল উঠেছিল বাইরে।—তোড়ো হাবেলী! নিকাল দো মুঘলানী শয়তানীকে।

চমকে উঠছিল মুঘলানী। বার দুই চোখের পলক ফেলে যেন বুঝতে চেষ্টা করেছিল ব্যাপারটার গুরুত্ব। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল—কত লোক?

—নিজের চোখে দেখ।

ঝরোকা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল উমধা। মুঘলানী এগিয়ে এসে ঝরোকায় পাথরের জালিতে চোখ রেখেছিল। দেখে তার নেশা ছুটে গিয়েছিল মুহূর্তে। একটা কম্পন বয়ে গিয়েছিল সারা শরীরে।

হাজারো আদমী! আরে বাপ!

সে ফিরে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মেয়ের মুখের দিকে। তারপর বলেছিল—তাই তো উমধা!

উমধা বলেছিল—যাও, ওখানে গিয়ে বস। এখনও টলছ তুমি।

মুঘলানী ফিরে এসে তখ্‌তপোশের উপর বসে পড়ে বলেছিল—বাঁদী! থোড়া শরাব দে আমাকে। নইতে দাঁড়াতে পারছি না!

তার মনশ্চক্ষে ভাসছিল—উন্মত্ত জনতা এসে হাবেলীর দরজা ভেঙে তার চুলের মুঠো ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে রাস্তায়। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। এই তো অল্প কজন —বড় জোর তিরিশ-চল্লিশ জন নাসাকচী এরা কতক্ষণ রুখতে পারে এই হাজার পাগলা আদমীকে!

—কি হবে?

উঃ, কী চীৎকার এদের! প্রতিটি চীৎকারে কলিজার অন্দরে জান চমকে চমকে উঠছে!

—পালাবার কি কোন পথ নেই? কোন দিন খোলা নেই?

খোজা বললে—চারিদিক ঘিরে ফেলেছে। কোন পথ নেই!

—ঘরে লুকোবার জায়গা—চোরকুঠরী! খুলে ফেল্ জলদি জলদি।

উমধা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলল—আম্মা!

কি? হাবেলীর ফটক ভেঙে ফেললে?

—না। গাজিমুদ্দিন ইমাদ—

—গাজিমুদ্দিন—?

—হাঁ, আম্মা—ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সিপাহী।

শিউরে উঠল মুঘলানী।—উমধা!

—আম্মা!

—ইমাদ কি—?

উত্তর দিতে পারলে না উমধা। প্রশ্নটা কিন্তু সে বুঝেছে। ইমাদ কি প্রতিহিংসা নিতে এসেছে?

—কি করবে? আমার চোখ দুটো—? একটু চুপ করে থেকে বললে—না আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ওই পাগলা কুত্তাদের মুখের কাছে ফেলে দেবে? আমাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেবে?

—এত ভয় করছ কেন আম্মা?

—না—চোখই গেলে দেবে। বাদশা আহম্মদ শাহের চোখ দুটোই গেলে দিয়েছিল! চোখই গেলে দেবে!

—আম্মা! আম্মা!

—কি? ঢুকছে—গাজিউদ্দিন ইমাদ উল মুল্ক?

—না আম্মা! আদমীদের ধমক লাগাচ্ছে। হঠে যেতে বলছে—তলোয়ার নিকাল

নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে—বলছে—হঠ যানা—হঠ যানা। আদমিরা হঠে যাচ্ছে মা। হঠে যাচ্ছে!

—হঠে যাচ্ছে?

খুব ব্যগ্রতার সঙ্গে ঝরোকায় ঝুঁকে পড়ল উমধা!

—আম্মা! গাজিউদ্দিন বলছে—আমার জান থাকতে সৈয়দ বংশের জেনানীর গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না! যদি দাও—তবে তোপ দেগে আমিই দিল্লী ভেঙে দেব শাহ আবদালীর আগে। চলে যাও তোমরা। চলে যাও!

—চলে যাচ্ছে?

—হাঁ, গাজিউদ্দিন ঘোড়সওয়ার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে—ওরা হটছে।

মুঘলানী উঠে এগিয়ে এসে বললে—সর, আমি দেখি!

কিছুক্ষণ দেখে—সে ফিরে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে—আঃ! তারপর বললে—বাঁদী! শরাব—

—গাজিউদ্দিন ভিতরে আসছে মা।

* * *

গাজিউদ্দিন ইমাদ উল মুল্ক—ভিতরে এসে মুঘলানীকে অভিবাদন করে বললেন—আমি খবর পাইনি বেগম সাহেবা। খবর পেতেই আমি তুরন্ত ছুটে এসেছি! ভয় নেই—ওরা ভেগে গেছে। উমধা, তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? তুমি বস। আমি যাই করে থাকি সে বাধ্য হয়েই করেছি। নইলে আমি আপনার লোক। তোমাদের নাজেহাল বেইজ্জতি আমি দেখতে পারি না।

উমধা চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল।

গাজিউদ্দিন ইমাদ উল মুল্ক বললেন—আমার উপর তোমার অনেক গোস্‌সা। হ্যাঁ, গোস্‌সা হবার কারণ আছে। গোস্‌সা তুমি করতে পার।

মুঘলানী এতক্ষণে বললে—ওরা চলে গেল! ঠিক আছে। কিন্তু তুমি এবার কি করবে, গাজিউদ্দিন? আমাকে কি অন্ধা করে দেবে?

গাজিউদ্দিন বললেন—তাই হয়তো দিতাম, বেগম সাহেবা। তুমি চিঠি লিখে শাহ আবদালীকে এনেছ হিন্দোস্তানে। দিল্লী-তক্ টেনেছ। আমি উজীর-ই-মুল্ক—আমার উপর তোমার গোস্‌সা। আমি তাই করতাম। কিন্তু বেগম সাহেবা—আমি বুঝতে পেরেছি। কসুর এখানে আমার! তোমার কসুর অনেক। কিন্তু আমার কসুর তার চেয়ে ভারী। হেনাবন্দী করেও আমি উমধাকে সাদী করি নি। উমধার আমি অপমান করেছি। এক তওয়াইফের বেটীর মোহে অন্ধা হয়ে আমার আপন বংশের—সৈয়দ হয়ে সৈয়দ বংশের বেটীর অপমান করেছি। আমি মুসলমান, আমি বাত দিয়ে বাত রাখি নি। ইমান রাখি নি। আমার আফসোসের সীমা নেই। বেগম সাহেবা—আমি কসুর সমঝেছি।

অবাক হয়ে গেল মুঘলানী! সে গাজিউদ্দিন ইমাদ উল মুল্কের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। উমধাও ফিরে তাকালে গাজিউদ্দিনের দিকে।

গাজিউদ্দিন ইমাদ উল মুল্ক বললেন—শোন বেগম সাহেবা। আমি জানি শাহ আবদালী এসেই আমার হাতে জিঞ্জির পরাবে। তা পরাক। আমার সাজাই হোক। আমার সাজাই দরকার। আমি লড়াই দেব না। হয়তো তুমি বলবে—লড়াই দেবার আমার জোর কোথায় যে লড়াই দেব। সাচ-বাত! লড়াই দেবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু পালাতে আমি

পারি। এত বড় মুল্ক হিন্দোস্তান। আবদালী সহজে পাকড়াও আমাকে করতে পারবে না। তাও পালাব না আমি। কেঁও কি—আমি আমার কসুর-এর মিলাপ, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হোক এই চাই বেগম সাহেবা—আমি কাল রাতে ঠিক করেছি, মনে মনেও তওয়াইফের বেটীকে তালাক দিয়েছি। সে আমার কেউ নয়।

উমধা এতক্ষণে কথা বললে—কিন্তু উজীর সাহেব তো কাল তাঁর আম্মাজানের সঙ্গে বেগম গন্নাকে দিল্লী থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—নহি। আম্মাজানকে এবং আর সব সৈয়দবংশের বহুবেটীকে পাঠিয়েছি সত্য কিন্তু গন্নাকে পাঠাই নি। তাকে আমি ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছি। তওয়াইফের বেটী তো। শরাব পিয়ে বেহোঁশ হয়ে পড়ে আছে। তোমার কাছে মাফি মাংতে এসেছি উমধা। বলতে এসেছি আমার সাজা মাথায় করে আমি কুরানের হুকুমতে তোমাকে সাদী করতে রাজী আছি। বল সাদীর পর—সঙ্গে সঙ্গে তালাক দিয়ে তোমাকে খালাস দিতেও রাজী আছি।

মুঘলানী বললে—গাজিউদ্দিন, বচপন থেকে তোমার সঙ্গে উমধার সাদী ঠিক হয়ে আছে। উমধা আমার বেটী—তুমি দামাদ—তুমি আমার বেটা। ডর তুম না করো বেটা। কুছ ডর নেহি। তুমি আজই আমাকে শাহের ছাউনিতে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। আমি সেখানে যাই। গিয়ে সব ব্যবস্থা আমি করব।

—খুদা কসম বেগম সাহেবা ?

—খুদা কসম বেটা!

—উমধা!

উমধা নতমুখে ওঘরে চলে গেল—কোন উত্তর দিলে না। ইমাদ উল মুল্ক উঠে তাকে অনুসরণ করে ওঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

—উমধা!

উমধা তার দিকে ফিরে তাকালে।

—আমাকে মাফ কর উমধা!

উমধা এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ইমাদ তাকে আপনার বুকের উপর টেনে নিলে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ইমাদ বললেন—গন্নাকে আমি সাজা দেব, উমধা। তোমার বাঁদী করে দেব।

তেরো

লালকিল্লার আম দরবারে তখন আমীর উমরাহ যারা দিল্লী ছেড়ে পালায় নি তারা বসেছিল উজীরের অপেক্ষায়।

খবর এসেছে—শাহ আবদালীর সিপাহসালার জাহান খাঁ যমুনার পূর্বদিকে লুনিতে এসে ছাউনি গেড়েছে। উজীর শাহ ওখানি খাঁ গরাই মীর পারওয়ারে এসে পৌঁছে গেছে।

যা করবার এখনি করতে হবে।

সকলে মিলে এর মধ্যেই কোনরকমে কয়েকটা 'রাহকালা' তোপ টেনে নিয়ে গিয়ে বসাবার ব্যবস্থা করেছে। হিন্দোস্তানের মান রাখতে অন্তত একটা লড়াই দেওয়া হোক।

উজীর ইমাদ উল মুল্ক এসে উপস্থিত হয়ে বললেন—না। ও আর হবে না।

—না ? ও আর হবে না—সে কি উজীর উল মুল্ক,—ইজ্জৎ—হিন্দোস্তানের,—মুঘল বংশের ইজ্জৎ—একদম বরবাদ করে দেবেন ?

উজীর একটু চুপ করে থেকে বললেন—ইজ্জৎ পানির মত, দুধের মত, একবার মাটিতে পড়ে গেলে—তাকে তুলে নিয়ে আর তাতে কাজ হয় না। শাহ নাদির দিল্লীতে এসে চাঘতাই বাদশাহীর ইজ্জতের পিয়ালা ফুটো করে দিয়েছে। দুধ তাতে যত ঢালা হল বিলকুল সব মাটিতে পড়ে গেছে। ফুটো পিয়ালা পড়ে আছে। উল্টে দিলেও তার থেকে ইজ্জতের দুধ মাটিতে পড়বে না। হিন্দোস্তানের বাদশা নিজে লোক পাঠিয়েছে শাহের কাছে। বলে পাঠিয়েছে—শাহ দুরানীর সঙ্গে কুটুম্বিতা করে বাদশাহ আলমগীর সানি ধন্য হতে চায়। তৈমুর-শাহী বংশের দুই বেটী—এক বাদশাহ মহম্মদ শাহের লেড়কী হজরত বেগমের সঙ্গে খুদ দুরানী বাদশাহের আর শাহজাদা তিমুরের সঙ্গে বাদশার বেটী মহম্মদী বেগম আফ্‌রোজবানুর সাদী দিতে চায়। সারা বেগম মহল এর জন্যে নাকি খুশ মেজাজে হেনাবন্দীর জন্যে তৈয়ার হচ্ছে। অথচ আমি শুনে এলাম—মালকা-ই-জমানি আর সাহেবা-ই-মহালের হাবেলীতে কান্নার রোল উঠেছে !

ইবাদুল্লা খাঁ কাশ্মিরী বললে—খুদ বাদশা কিল্লার অন্দরে খাস বাদশাহী মহল খালি করে চলে যাচ্ছেন দুসরা মহলে, মেহমান মহলে। চারি পাঠাচ্ছেন জাহান খাঁর কাছে। তিনি নিজে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। আফগানীরা আসছে বরিয়াত নিয়ে। তোপ দেগে তাদের রুখবার কথা ভুলে যান আপনারা !

আমীররা চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—তা হলে—

—তা হলে আর কি ? নিজের নিজের হাবেলীতে যান—গিয়ে শাহ আবদালীকে দেবার জন্যে নজরানা যোগাড় করে দরবারে হাজির হবার যা ইন্তিজাম হয় করুন ! শাহ মেহমান হয়ে আসছেন।

তাই সকলে চলে গেলেন। রইল কেবল ইবাদুল্লা খাঁ—আর উজীর ইমাদ উল মুল্ক।

ইমাদ উল মুল্ক বললেন—ইবাদুল্লা।

—জনাব আলি।

—তোমরা দুজন আমার ভরসা। তুমি আর খান-ই-খানান বাহাদুর খান বেলুচ। আগা রেজা দিল্লীতে নেই। আজ রাত্রি তিন পহরের সময় তোমরা তৈয়ার হয়ে আসবে ; দিল্লীর ভার কোতোয়াল ফাউলাদের উপর থাকবে। আমি স্রিফ তোমাদের দুজনকে নিয়ে বেরিয়ে যাব।

—কোথায় জনাব আলি ? রাজপুতানার দিকে ?—না সুরজমলের—?

—নেহি ইবাদুল্লা। শাহের ছাউনিতে। যমুনা পার হয়ে—ভোরে গিয়ে উঠব আবদালীর উজীর শাহ ওয়ালি খানের কাছে। শাহ ওয়ালি খান আমার মেহমান। তাকে ধরে গিয়ে শাহের দরবারে হাজির হব।

—উজীর সাহেব—। ইবাদুল্লা কাশ্মিরীর কণ্ঠস্বরে শঙ্কার আর পরিসীমা ছিল না।

উজীর একটু হেসে বললেন—ডর করো না ইবাদুল্লা। শির গেলে আমার যাবে।

—ডর আপনার জন্যেই উজীর-উল-মুল্ক।

—সে ডরও নেই ইবাদুল্লা। আগে থেকেই তার বন্দোবস্ত করেছি। আমার উকীল আমি পাঠিয়েছি। তারা যমুনা পার হয়ে চলে গেল। বেলা দুপহর তক পৌছে যাবে। শাহ আবদালী এ উকীলের ওকালতি নাকচ করতে পারবে না। কখনও না। আমি মুঘলানী আর উমধাকে পাঠিয়ে এসেছি !

—উজীর সাহেব! এ কি বলছেন আপনি? নালিশ তো মুঘলানীর আর উমধার! লুঠের জন্যে আসছে শাহ, এ দিন-দুনিয়ার লোক বলবে। কিন্তু শাহ আবদালী তো বলবেন —মুঘলানীর নালিশের বিচার করে উজীরকে সাজা দিতেই তিনি আসছেন!

—সে সব ঠিক হয়ে গেছে—আজ সকালেই—সব আপস—সুলেনামা করে নিয়েছি—ইবাদুল্লা! গন্নাকে তালাক দিয়ে উমধাকে আমি সাদী করব। আমার জন্যে ওকালতনামা নিয়ে মুঘলানী আর উমধা রওনা হয়ে গেছে। গন্নাকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রেখে দিয়েছি। তুমি এক কাজ কর,—মসজেদে হুকুমনামা জারী কর কি এই জুম্মাবার থেকে খুদবা পড়া হবে শাহ দুরানীর নামে। শাহ দুরী দূরানী বাদশাহ—আফগানেস্তানকে শাহ-ইন-শাহ, দুনিয়াকি শাহ আহমদ শাহ আবদালী।

সেদিন—২৬ রবিউসসানি ১১৭০ হিজরা—দিল্লীর দুর্জয় শীতের মধ্যে তিনজন অশ্বারোহী রাত্রির শেষ প্রহরে যমুনার ঘাটে এসে দাঁড়াল।

* * *

রাত্রির শেষ প্রহর, আতঙ্কিত দিল্লী, তার মধ্যেও বিচিত্র ভাবে মানুষ জেগে উঠেছে—তার পবিত্রতম কর্মটুকু করছে।

মসজেদে মসজেদে আজানের ধ্বনি উঠছে। দূরে দূরে মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টাও বাজছে। তবে সাধারণ সময়ের মত সে ধ্বনি প্রবল এবং উচ্চ নয়। ভীতার্তের মত। শব্দের কণ্ঠ ক্ষীণ।

গন্নার চেতনা হল।

আজ সারাটা দিন সে বেহুঁশের মত পড়েছিল। রুগ্‌ণ জ্বরাক্রান্তের মত। এখনও তার সারা দেহ জর্জর হয়ে আছে।

তার আগের দিন সে নিদারুণ মনের ক্ষোভে বিশ্বসংসারের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে শুধু মদই খেয়েছে। বাঁদী আমিনা তাকে বলেছিল—কলিজায় যদি জখম হয়ে থাকে কি যদি আগ্ লেগে থাকে, শরাব পিয়ো বেগম সাব। অনেক আরাম পাবে! আমি পেয়েছিলাম।

তাই সে খেয়েছিল। আরাম পায় নি—তবু সে পাগলের মত দিলের কথাগুলো চিৎকার করে বলে—বহুৎ খুশী হয়েছিল। ইমাদ উল মুল্ককে সে মুখেমুখে বেইমান বলে খুশী হয়েছে—তাকে অভিসম্পাত দিয়ে খুশী হয়েছে। এবং নিজেকে সে তওয়াইফের বেটী তওয়াইফ বলে মনে করতে পেরেছে।

কোন শরম নেই। কিসের বেইজ্জতি। সে তো বাঁদী হিসেবেই বিক্রী করেছিল নিজেকে। ইমাদ বিয়ের ভান করেছিল—কিন্তু কেনা বাঁদী চিরকালই বাঁদী-ই থাকে।

উদিপুরী বেগম—শাহাজাদা দারা শিকোর বাঁদী-বেগম। দারা শিকোর মৃত্যুর পর বাদশাহ আলমগীর তাকে বেগম করেছিলেন। উদিপুরীর প্রতি আলমগীর বাদশাহের অনুরাগের কথা সবাই জানে। তবুও আলমগীর বাদশা উদিপুরীর ছেলে শাহজাদা কামবক্সের উপর গোস্‌সা হলে বলতেন—'বাঁদীকি বাচ্চা কভি আচ্ছা নেহি হোতা হ্যায়।'

তওয়াইফের বেটী সে—তওয়াইফী মেজাজ—তওয়াইফী আচার-আচরণে কিসের শরম!

সেদিন রাত্রে তওয়াইফের মতই নিজেকে সমর্পণ করেছিল ইমাদের কাছে। ইমাদ—সে এক জানওয়ার। না—সে এক সাপ—তাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করে অসংখ্য বিষদংশনে জর্জরিত করে দিয়েছিল। ভোরে উঠে তাকে বেহুঁশ অবস্থায় ঘরে তালাচাবীবদ্ধ করে চলে গেছে। সারাদিন ফেরে নি। সেও সারাদিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিল। ভোরবেলা তার ধীরে ধীরে হুঁশ

ফিরছিল। এই সময় আজানের আওয়াজ এসে তার কানে পৌছুল।

—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ—শোভাহানাল্ মালেকেল কুদ্দ সে—

প্রথমে ক্ষীণ তারপর ক্রমশ সে স্পষ্ট শুনতে পেলে—"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ শোভাহানাল্" ;—তার সঙ্গে দূরের কাঁসর-ঘণ্টার শব্দও আসছে।

সে চোখ মেললে। সর্বাঙ্গে তার জরজর্জরতা এখনও কাটে নি। দেহ যেন যন্ত্রণায় খসে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা।

চোখ খুলতে চেয়েও খুলতে পারছে না। কিন্তু চোখ থেকে জল গড়িয়ে আসছে। বুকের মধ্যে সে ক্ষোভ যেন নেই। এক শোকার্ত বেদনায় হৃদয় যেন টন্‌টন্ করছে।

—হায় আল্লা—এ কি হল তার? কোন্ গুনাহে এই সাজা তুমি দিলে মেহেরবান! সে দিতে চেয়েছিল নিজেকে কুরবানী। বিনিময়ে চেয়েছিল তার হজরত—তার প্রিয়তম। হ্যাঁ, আদিল শাহ শুধু হজরত নন ওর—তিনি ওর প্রিয়তম—ওর মহবুব—তার আজিজ। নিজেকে কুরবানী করে চেয়েছিল তার একটি চোখের দৃষ্টি! এয় খোদা, তুমি তাও মঞ্জুর করলে না! না, তুমি মেহেরবান—তুমি জরুর মঞ্জুরি করেছিলে—কিন্তু ইমাদ উল মুল্ক গাজিউদ্দিন আসফজা যে শয়তান, তোমার মঞ্জুরি সে নাকচ করে দিয়েছে।

চোখ থেকে তার জল গড়াতে লাগল।

দুঃখ তার নেই। সে জানে—আজ হোক কাল হোক—আসছেন শাহ আবদালী দুর্রী দুররানী—তিনি এসেই তাকে নিষ্কৃতি দেবেন। সে ঔরৎ, কোতল করবার হুকুম হবে না। তবে হুকুম হবে মাটির তলায় আঁধার কুঠরীতে তাকে কয়েদ করবার। ইমাদেরও সাজাই হবে। তার দুঃখ নেই।

দুঃখ শুধু একটি চোখের জন্য!

তৃষ্ণায় তার ছাতি যেন ফেটে যাচ্ছে। বুকের ভিতরটা একদম শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। অন্ধকারে হাত্‌ড়ে দেখলে সে। জল, সাকিনা নিশ্চয় রেখে থাকবে! হাতড়াতে হাতড়াতে ঠেকল হাতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা ধাতব স্পর্শ। নিশ্চয় জলের গ্লাস। হ্যাঁ, জলের গ্লাসই বটে। হাতে ধরে গ্লাসটা মুখের কাছে তুলে ধরলে।

শীতের শেষ রাত্রে জল যেন বরফের মত ঠাণ্ডা। কনকন করে উঠবে দাঁত জিভ গলা বুক। তবু নিদারুণ তৃষ্ণায় ঢক-ঢক করে খেয়ে একটু সুস্থবোধ করল। আবার দারুণ ক্লান্তিবশে তার চোখ দুটি বন্ধ হয়ে এল। বরফের মত ঠাণ্ডা জল বুক এবং পেটের ভিতর যেন কাঁপন ধরাচ্ছে। গায়ের রেজাইটা টেনে নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে শুল। নিদ্ আসছে। শেষ রাত্রি। অন্য সময়ে এই শীতেও লোকে ওঠে। হিন্দোস্তানের বাদশাহী ও শাজাহানাবাদের কাজ শুরু হয়ে যায়; দেহাত থেকে গাড়ি-গাড়ি সব্‌জি আসে। কসাইখানার জন্যে পালে-পালে বকরাবকরী গরু আসে। ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ ওঠে। ভিখমাঙোয়ারা জেগে উঠে চেঁচায়। গোয়ালারা উঠে দুধ দোয়ায়। হিন্দুরা এরই মধ্যে যমুনাতে সিনানে যায়। লালকিল্লার নহবৎখানায় নহবৎ বাজে। আজ সব যেন নিস্তব্ধ।

হঠাৎ তার কানে এল—দূর থেকে একটা আওয়াজ যেন ভেসে আসছে। কে? কেউ যেন ডাকছে। যেন কিছু ফুকারু তুলে বলে যাচ্ছে কিছু। কোন ফকীর হবে। হায় ফকীর!—আল্লাকে ডাকতে বলছ? তুমি জান না—আল্লা নারাজ হয়েছেন দিল্লীর উপর। পয়গম্বর রসুলের ভ্রূকুটি জেগেছে। দিল্লীর উপর আঁধি আসছে। আঁধি আসছে উত্তর-পশ্চিম থেকে; কাবুল থেকে শাহ আবদালী আসুছে আঁধি তুলে। তার তলোয়ারের ঝলসানিতে বিজলী খেলছে।

—মরজি খোদাকি, খেল নসীবকা, ইজ্জৎ ইনসানকি! দিল্লীওয়ালে লোক—ওঠো জাগো, ইনসানিয়াতের ইজ্জৎ তো রাখো! এক লড়াই তো দাও!

ইয়ে জান—সো তো দেনে কে লিয়ে। জানওয়ারের মত মুখ বুজে দেবার জন্যে নয়। ওঠো! জাগো!

চমকে সে উঠে বসল।

ইজ্জৎ রাখো, নসীবের খেল ঘুরে যাবে, নারাজ খোদা রাজী হবেন—দিল্লীওয়ালে।

গন্না চীৎকার করে উঠল—হজরত! হজরত!

বদ্ধ ঘরের মধ্যে আওয়াজটা চারিদিকের দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগল—হয়তো কিছুটা ক্ষীণ ধ্বনি ওই বাইরের ধ্বনির মত বাইরে শীতের বাতাসে ছড়িয়ে গেল।

সাকিনার ঘুম ভেঙেছিল। সে শুয়েছিল পাশের ঘরে। সে উঠে লেপ তুলে সাড়া দিলে—বেগম সাহেবা!

—সাকিনা!

—এখনও রাত রয়েছে বেগম সাহেবা, এখন শুয়ে থাক।

—না সাকিনা, না। ওঠ্, সাকিনা—ওঠ্। শুনছিস না—হজরত ডেকে চলে যাচ্ছে। সাকিনা! তোকে আমি আমার মুক্তোর হার বকশিশ করব, তুই ওঠ্।

আওয়াজ তখন হাবেলীর সামনে।

—উজীর উল মুল্ক, হিন্দোস্তানের ইজ্জৎরাখয়নেওয়ালা, নিমক তুমি অনেক খেয়েছ—ইমাদ উল মুল্ক ওঠো! জাগো! গাজিউদ্দিন আসফজা!—ওঠো!

গন্না চীৎকার করে বদ্ধ দরজায় পাগলের মত আঘাত করে বললে—খুলে দে, সাকিনা—খুলে দে! তোর পায়ে ধরি, সাকিনা—তুই খুলে দে!

সাকিনাও বাইরের ও ডাক শুনে শিউরে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল সত্যি-সত্যিই যেন বেহেস্ত থেকে খুদাতায়লার পরওয়ানা নিয়ে এসেছে কোন দূত;—জারী করছে হিন্দোস্তানের উজীরের উপর।

তাড়াতাড়ি উঠে সে দরজার তালা খুলে দিলে। গন্না বেরিয়ে এল টলতে টলতে। দেহে তার বল নেই, সর্বাঙ্গে তার যন্ত্রণা—নিষ্ঠুর যন্ত্রণা—তবু তাই নিয়ে সে টলতে টলতে বেরিয়ে এল।

—আমাকে নিয়ে চল, সাকিনা—আমাকে নিয়ে চল।

—কোথায়?

—ওই হজরতের কাছে। নয় তো ওকে ডাক!—সাকিনা!

—তুমি কি অনবুঝ-পাগল বেগম সাহেবা? দরওয়াজায় নাসাকচী রয়েছে—আমাদের বাইরে যেতে দেবে কে? ওকেই বা আসতে দেবে কেন?

—তবে আমাকে ঝরোকায় নিয়ে চল্। জলদি!

বাইরের চারিদিক দেখবার জন্য,—জমায়েত লোকজনদের দেখা দিয়ে কথা বলবার জন্য বাদশাহী কায়দার অনুকরণে—উজীরের এক ঝরোকা আছে। রাস্তার দিকে সেটা।

সাকিনার ঘাড়ে ভর দিয়ে কোনরকমে গন্না এসে সেই ঝরোকায় দাঁড়াল। তখনও চারিদিকে আবছা অন্ধকার। শীতের ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস একঝাঁক সূচের মত যেন মুখে বিঁধল।

সাকিনা বললে—আয় বাপ!

গন্না কিন্তু গ্রাহ্য করলে না। সে ঝরোকার আলসেতে ঝুঁকে পথের দিকে তাকালে। ফটকের সামনে কাউকে দেখতে পেলে না। সে চোখ তুলে চারিদিক তাকিয়ে দেখতে পেলে —অনেকটা দূরে দু-তিনজন লোক চলে যাচ্ছে। তার মধ্যেও সে চিনতে পারলে—সামনে এক-জনের পিছনেই যে যাচ্ছে—সেই তার হজরত, তার মেহবুব, তার আজ্জিজ।

সে চীৎকার করে ডাকলে—হজরত! হজরত!

তার কথা ঢেকে দিয়ে হজরত আবার উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—হায় রে নসীব হিন্দোস্তানের, হায় রে কিস্‌মেত তৈমুরশাহী বাবুরশাহী বাদশাহীর! হায় রে হায়! হায় রে হিন্দু হায় রে মুসলমান! হায় রে হায়—হায় রে হায়।

গন্না আবার চীৎকার করলে—হ-জ-র-ত!

নিচে থেকে এবার নাসাকচী হেঁকে বললে— এ-একটা অন্ধা—একটা পাগ্‌লা, হুজুরাইন।

চোদ্দ

সাত দিন পর।

সেদিন শুক্রবার—জামার নামাজের দিন। কিন্তু দিল্লীর শাহী রাস্তাটা—শুধু শাহী সড়কই বা কেন—বিলকুল বড় বড় সড়ক খাঁ খাঁ করছিল। পথের উপর লোক তো নেই-ই; সড়কের উপর বড় বড় বাড়ির ঝরোকায় বারান্দায় পর্যন্ত একটি মানুষের মুখ তো মুখ—সাড়া পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। বড সড়কের পাশ থেকে যে-সব ছোট সড়ক মহল্লার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে—সে-সব সড়কের মুখে যে ফটকগুলো আছে—সেগুলোও বিলকুল বন্ধ।

মনে হচ্ছে—দিল্লী শহরের জিন্দগী শেষ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত মানুষ মরে গিয়েছে। মুর্দার শহর দিল্লী—প্রাণহীন শহর শাহজাহানাবাদ!

প্রাণ যদি থাকে তবে দম বন্ধ করে চুপ করে পড়ে আছে।—গরমী কালে যখন আঁধি আসে তখন যেমন সমস্ত দরজা জানালা খিড়কী বন্ধ করে মানুষ চুপচাপ বসে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে—ঠিক সেই রকম ভাবেই—দম বন্ধ করে ঘরের মধ্যেই তাকিয়ে আছে উত্তর-পশ্চিমের দিকে। হিন্দোস্তানের বিখ্যাত জ্যোতিষী বলেছে—"আঁধি, প্রলয়ের আঁধির মত আঁধি আসছে, দিল্লীর সমস্ত কিছু তছনছ করে দেবে। নাদিরশাহী আঁধিতে তৈমুরশাহী বংশের ইজ্জৎ শাজাহান বাদশার তক্তে-তাউস উড়ে গেছে। কোহিনুর তাজ উড়ে গেছে। এবার উড়ে যাবে বাকী যা আছে। তারপর জেনানীর ইজ্জৎ যাবে, হিন্দোস্তানের লছমী যাবে, মুণ্ডুর পাহাড় তৈরী হবে। আগুন লাগবে। সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।"

শুকদেব আচার্যের গণনা বিলকুল ফলে গেছে। আজ আফগানেস্তানের বাদশাহ দূরী দূরানী শাহানশাহ আহমদ শাহ আবদালী দিল্লী শহরে ঢুকছেন।

আঁধি দিল্লীর মাথার উপর আসমানে এসে গিয়েছে।

ওই দেখা যাচ্ছে ধুলো উঠেছে শহরের বাড়িগুলোর মাথা ছাড়িয়ে।

আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আফগান বাদশাহী নাকাড়ার। তার সঙ্গে হাজার হাজার ঘোড়ার চার চার পায়ের ক্ষুরের আওয়াজ!

ক্ষুরের আওয়াজের সঙ্গে দিল্লীর ঘরে ঘরে মানুষদের কলিজা লাফাচ্ছে।

কদিন আগে দিল্লীর বাদশাহ আলমগীর সানি শাহ আবদালীর কাছে নিমন্ত্রণ জানিয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন। শাহ আবদালী নিমন্ত্রণ নিয়ে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন আলমগীর সানিকে তাঁর ছাউনিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

হায় রে নসীব হিন্দোস্তানের! হায় রে কিসমেৎ তৈমুরশাহী বাবুরশাহীর! দু-চার ঘোড়া এক হাতী, তার তক্তে রেওয়ানে চেপে বাদশাহ আজিজুদ্দিন আলমগীর সানি পাঁচসাতজন আমীর সঙ্গে করে ছোট একটা জমিদার তালুকদারের মত গিয়েছিলেন আবদালী বাদশাহের ছাউনিতে।

দিল্লী শহরের লোকেরা যারা পথের উপর ছিল—তারা লজ্জায় শরমে মাথা হেঁট করে থেকেছে। চোখে দেখতে পারে নি। যারা ঝরোকায় ছিল তারা ঘরে গিয়ে ঢুকেছে আর মনে মনে বলেছে—হায় রে নসীব হিন্দোস্তানের! হায়, হায় রে কিসমেৎ! সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের নসীবকেও ধিক্কার দিয়েছে।

দিল্লীর বাদশাহ অনুগ্রহ-ভিক্ষুকের মত নজরানা দিতে চেয়েছে তৈমুর বংশের দুই বেটী। নিজের বেটী আফ্‌রোজ বানুকে বিয়ে দিতে চেয়েছে আবদালী বাদশাহের বেটা তিমুর শাহের সঙ্গে। আর ষাট বছরের বৃদ্ধ আবদালী বাদশাহকে দিতে চেয়েছেন হিন্দোস্তানের 'গুলেকমল' তৈমুর বংশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কন্যা বাদশাহ মহম্মদ শাহের বেটী হজরত বেগমকে।

সারা বেগম মহলে কান্নার রোল উঠেছিল। মহম্মদ শাহের বেগম মালকা-ই-জমানি সাহেবা-ই-মহল কেঁদে বলেছিলেন—জওহর খাইয়ে মেরে দেব বেটীকে। তবু না—তবু ওই আবদালীর সঙ্গে সাদী দেব না। বেটী হজরত বেগম—সেও বলেছিল—জওহর খাবে। কিন্তু হায় রে নসীব তৈমুরশাহীর। তাও তারা পারে নি। সে সাহসও তাদের হয় নি। তারা চোখের জল মুছতে মুছতে সাদীর ইন্তেজাম করছে।

কে একজন ভোররাত্রে কিল্লার পাশে যমুনার ধারে গম্ভীর আওয়াজে একদিন ফুকার তুলে বলে গেছে—

ইনসান, তুমি জান দিয়ে ইজ্জত রাখো! ইজ্জত ইনসানকী। দেখবে উলটে যাবে নসীবের খেল। নারাজ খোদার নারাজী বদলে যাবে। খুদা রাজী হবেন, সদয় হবেন। ইনসান, তুমি জান দিয়ে ইজ্জত রাখো। জানওয়ারের জান—মরবার জন্যে। ইনসানের জান—কুরবানীর জন্যে! কুরবানী করো। ইজ্জত দিয়ো না।

তা শুনেও সাহস হয় নি। শুধু ভয়ে সকলে চমকে উঠেছে। কানে আঙুল দিয়েছে। শুনতে পারে নি!

ফকীর হোক আর বেহেস্তের হাফিজ হোক—সে আক্ষেপ করে বলে গিয়েছে উচ্চকণ্ঠে—'হা রে নসীব হিন্দোস্তানের! হা রে কিসমেৎ তৈমুরশাহীর! হা রে হিন্দু আর মুসলমানের ইজ্জত! হা রে হিন্দুর ধরম—হা রে মুসলমানের ইমানদারি! সব বরবাদ হয়ে গেল রে! সব বরবাদ!

হা রে হিন্দোস্তানের নিমক, হা রে হিন্দোস্তানের পানি আর হাওয়া! কোন্ শয়তান এতে এমন করে জওহর মিশিয়ে দিলে রে। হিন্দুর ধরম বরবাদ হয়ে গেল—মুসলমানের ইমান বরবাদ হয়ে গেল। হায় রে হায়! হায় রে হায়!

ধ্বনিটা সবার বুকে প্রতিধ্বনি তুলেছে—কিন্তু মুখে বলতে কারুর সাহস হয় নি। ঘরের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছে—হায় রে হায়! হায় রে হায়! আর কপালে হাত দিয়ে বলেছে—নসীব! কিসমেৎ!

চুপ—চুপ—চুপ!

নাকাড়া এগিয়ে আসছে। ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ উঠছে। চুপ—চুপ। কাঁদিস নে বাচ্চা, কাঁদিস নে।

আবদালশাহী পরওয়ানা কাল নাকাড়া বাজিয়ে জারী হয়ে গেছে।

"হিন্দোস্তানের তৈমুরশাহী তক্তকে দক্ষিণের মারাঠা কাফির, পূবের জাঠ ডাকাইত হামলা করে করে নড়বড়ে করে দিয়েছে। তার সঙ্গে কতকগুলো বেইমান সুবাদার, নায়েব নাজিম, মনসবদার, রাজা আর নবাব মিথ্যা দেমাকে অন্ধা হয়ে বাদশাহী খাস ইলাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি মুসলমান; আমি দুরী দুরানী আবদালী আহমদ শাহ—আমি বাদশাহ আলমগীর সানির মেহমান! মেহমানের মত কয় রোজের জন্যে এসেছি। সাজাই দেব এইসব বদমাশ কাফিরদের—শায়েস্তা করে দেব এইসব বেইমান নবাব সুবাদার মনসবদারদের!

"হুঁশিয়ার গুণ্ডা আর দাঙ্গাবাজেরা! হুঁশিয়ার চোর আর ডাকাইতেরা! হুঁশিয়ার ঠগ আর বদমাশ বেতমিজেরা! হুঁশিয়ার লুচ্চা আর জাঁহাবাজরা! শহর শাজাহানাবাদ আর শহর দিল্লীর বাজার কি হাট কি পথ কি ঘাটের উপর দিন কি রাতে কাউকে তাদের দেখা গেলে—কোন হামলা হলে—তাদের জান চলে যাবে। গর্দান থেকে শির ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

"আর যারা কাফির তাদের উপর হুকুম এই যে তারা কপালে সিঁদুরের তিলক লাগাবে তাদের চিনবার জন্য। যারা না লাগাবে, ধরা পড়লে তাদের জরিমানা দিতে হবে।

"সবজিমণ্ডী বাজার বিলকুল যেমন চলে তেমনি চলবে!

"মহম্মদ আজিজুদ্দিন আলমগীর সানি—যেমন বাদশাহ ছিলেন তেমনি বাদশাহ থাকবেন।

"খান-ই-খানান কোমরউদ্দিন ইন্তিজামউদ্দৌলা হলেন উজীর উল মুল্ক!

"ইমাদ উল মুল্ক গাজিউদ্দিন আসফজা উজীরী থেকে খারিজ হয়ে গেল। তবে তার গুস্তাকী আর বেতমিজির কসুর আমি মাফ করেছি। খান-ই-খানান সৈয়দ মৈনুদ্দিন মীর মান্নু সাহেবের বেটী উমধা বেগমের সঙ্গে তার সাদীর বাত• সে খেলাপ করেছিল—সে সাদী হবে আমার সামনে।

"আর তামাম দিল্লীর আমীর, উমরাহ, সওদাগর, বানিয়া, গৃহস্থী, গরীবান, ভিখমাঙোয়া লোকের উপর হুকুমৎ এই যে, শাহানশাহ আবদালী বাদশাহ আহমদ শাহ দুরানী জামাবারে দিল্লীতে ঢুকবেন। সঙ্গে যাবে তাঁর হারেম আর তাঁর ফৌজ! সে সময় রাস্তার উপর কোন আদমী যেন না থাকে। তামাম ঝরোকা যেন বন্ধ থাকে। কেউ যেন চিকের আড়াল থেকেও উঁকি না মারে।"

* * *

দিল্লীর লোকে অবাক হয়েছে পুরনো উজীর ইমাদ উল মুল্কের নসীবের কথা শুনে! অবাক! নসীবের খেল্‌কে রুখে দিয়েছে ইমাদ উল মুল্ক!

তার সব কসুর মাফ হয়ে গিয়েছে! তার সঙ্গে উমধা বেগমের সাদী হবে! বাহা-রে-বাহা!

দিল্লীর বাদশাহ আলমগীর সানি শাহ আবদালীর কাছে গিয়ে নিজে আরজ জানিয়েছিলেন—বেইমান উজীরের গর্দান নেবার হুকুম হোক। এই গাজিউদ্দিন আসফজা ইমাদ উল মুল্কই মারাঠা কাফিরদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল—জাঠ রাজা সূরজমলের সঙ্গে ষড় করেছিল! বিলকুল তছরূপ আর বেবন্দোবস্তির জন্যে দায়ী ওই!

শাহ আবদালী বলেছেন—তাকে আমি আগেই যে মাফ করেছি, বাদশাহ! শাহানশাহের জবান যা একবার বেরিয়েছে—তা নাকচ হবে কি করে? তা তো হয় না! গাজিউদ্দিন-

আমার উজীরের হাতে নজরবন্দ হয়ে রয়েছে। সে তিন দিন আগে এসে আমার পায়ের কাছে শির রেখে মাফি চেয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া, বাদশাহ—মুঘলানী বেগম আমার ধরম-বেটী। তার বেটী উমধার সঙ্গে ইমাদের হেনাবন্দী হয়ে আছে।

—কিন্তু শাহানশাহ আবদালী, মুঘলানীর বেটীকে সে আজ দু বছর সাদী করব বলে সাদী করে নি। তার উপর এক বছরের কাছাকাছি তাদের দিল্লীতে এনে—তাদের হাবেলীতে আটক রেখেছে! আপনি মুঘলানীকে জিজ্ঞাসা করুন—সে কি চায়?

শাহ আবদালী হেসে বলেছিলেন—বাদশাহ আলমগীর, ঔরতের মেজাজ আর হিন্দোস্তানের রোদ-মেঘের মেজাজ এক রকম। ধুপ চড়ে উঠল তো মনে হল আগুন লেগে দুনিয়া জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু কোথা থেকে এল বাদ্‌লি ছায়, ঢেলে দিলে পানি। জাড়া লেগে গেল। ফির চলে গেল বাদল—উঠল আফতাপের রোশনি ঝলমল ঝকমক করে দিলে দুনিয়া। তাজ্জব কি বাত—ইমাদ উল মুল্ক আসবার আগেই এল মুঘলানী। উমধাকে নিয়ে আমার পা পাকড়ে বললে—ইমাদ উল মুল্ককে মাফ করতে হবে। পরের দিন ভোরে এসে হাজির হল ইমাদ!

পনেরো

জাদুর খেল জানে ইমাদ উল মুল্ক গাজিউদ্দিন আসফজা! দিল্লীতে মুঘল বাদশাহীর গোটা আমলের মধ্যে এমন জাদুকর উজীর আর হয় নি। সৈয়দ ভাইয়ারা খেল খেলে গেছে—বাদশাহীর বনিয়াদ তারাই ভেঙে গেছে; তাদের নাম করে এখনো লোকে আফসোস্ করে কিন্তু তাদের খেল ছিল জবরদস্তির খেল। বড়া সৈয়দ ছিল উজীর আর ছোটা সৈয়দ ছিল মীর বক্সী—ফৌজের মালেক। তারা জবরদস্তি চালিয়ে গেছে—বাদশাহদের নিয়ে পুতুল খেলেছে। কিন্তু ইমাদ উল মুল্ক এই ভাঙা হাটে এসে জাদু আর ভেল্কির খেল খেলে গেল। শতরঞ্জ খেলায় হারের পালা সে সিপাহীর কিস্তিতে উল্টে দিলে। বয়স তার—বড় জোর বিশ-বাইশ! শাহ আবদালীকেও সে জাদু করে দিয়েছে।

মুঘলানী বেগম আর উমধাকে তার জন্যে শাহের দরবারে ওকালতি করতে পাঠিয়েও সে নিশ্চিন্ত থাকে নি। সেইদিন শেষরাত্রে সে খান-ই-খানান বাহাদুর খাঁ বেলুচ আর ইবাদুল্লা খাঁ কাশ্মিরীকে সঙ্গে নিয়ে—শীতের শেষরাত্রে অন্ধকারে মধ্যে যমুনা পার হয়ে—সরাসরি এসে উঠেছিল শাহ আবদালীর উজীর শাহ ওয়ালীর ছাউনিতে। শাহওয়ালী তখন যমুনার ধারে ছাউনি ফেলেছেন—তাঁর ছাউনির পিছনে শাহদারায় শাহ আবদালীর ছাউনি।

শাহ্ ওয়ালী ইমাদ উল মুল্কের মেহমান। ইমাদ উল মুল্কের মায়ের আপনার লোক। শাহ ওয়ালী মেহমানের মান রেখেছিলেন। ইমাদকে আতর-পান দিয়ে খাতির করে বসিয়ে তিনি শাহ আবদালীর দরবারে গিয়ে তাঁর আসার খবর জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন—হিন্দুস্তানের উজীর শাহানশাহের পায়ের উপর তার তসলীম দাখিল করবার জন্য এসে হাজির হয়েছে।

শাহ আবদালী তখন মুঘলানী আর উমধার আরজি মন্‌জুর করে বসে আছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলেন—নিয়ে এস তাকে।

দস্তুর মাফিক ইমাদের হাতে রুমাল বেঁধে কয়েদীর মতই তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিলেন শাহ ওয়ালী। শাহ আবদালী তখন ভোরের নামাজ শেষ করে তাঁর দরবারী তাঁবুর

ভিতরে তখ্‌তের উপর তশরীফ রেখে বসেছিলেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আবদালফৌজের সিপাহ্‌-সালার জাহান খাঁ, তাঁর পাশে হিন্দোস্তানের বেইমান মীর বক্সী নাজিবউদ্দৌলা রোহিলা, আরও পাঁচ-পাঁচ মনসবদার দাঁড়িয়েছিলেন।

গাজিউদ্দিন আসফজা ইমাদ উল্ক মুল্ক হাঁটু গেড়ে বসে—পাঁচটি মোহর এবং বহুত দামী বাজু-বন্ধ নজরানা পেশ করে শাহের পায়ে ঠোঁট রেখে আত্মসমর্পণ করেছিল।

শাহ হুকুম করেছিলেন—হাত খুলে দাও। খাড়া হতে বল।

গাজিউদ্দিন উঠে দাঁড়িয়ে আবার কুর্নিশ জানিয়েছিল।

শাহ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুম্‌ গাজিউদ্দিন আসফজা? হিন্দোস্তানের উজীর-উল-মুল্ক? —দেখি—দেখি। আরও মুখ তোল!

গাজিউদ্দিন মুখ তুলেছিল—কিন্তু শাহের মুখের দিকে তাকায় নি।

শাহ আবদালী বলেছিলেন—হুঁ। সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসি তাঁর মুখে দেখা দিয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন—উমধা বেগমের কথা। মুঘলানী যখন গাজিউদ্দিনের জন্যে ওকালতি করেছিল—তখন উমধার মুখ বার বার রাঙা হয়ে উঠছিল। বাচ্চা খুবসুরত বটে। হাঁ। ঔরতের কলেজা ফতে করবার মত নওজোয়ান বটে!

তারপরই গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন—তুমি হিন্দোস্তানের উজীর-উল-মুল্ক! অাঁ?

—হাঁ জাঁহাপনা—আমি সেই বদবখ্‌ত—হতভাগ্য গাজিউদ্দিন!

—তো একি কথা—যে আমি এলাম, আফগানেস্তান থেকে সারা পাঞ্জাব হয়ে যমুনার কিনারায় এসে ছাউনি করলাম—কিন্তু হিন্দুস্তানী ফৌজের সঙ্গে মুলাকাত হল না! একটা লড়াই পর্যন্ত হল না? একটা লড়াইও তুমি দিলে না? কেমন উজীর-উল-মুল্ক তুমি?

জাহান খাঁ—নাজিবউদ্দৌলা—মুখ টিপে হেসেছিল। ইমাদ-উল-মুল্ক বহুত সেয়ানা—হুঁশিয়ার। সে বুঝতে পেরেছিল কি জবাবে শাহ আবদালীর মত রুস্তম খুশী হবেন। ভীরু ডরপোক্‌নার মত জবাবে এইসব রুস্তম কখনও খুশী হন না। সে মাথা তুলে—নাজিবউদ্দৌলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল—শাহানশাহ—গরীবের উপর গোস্‌সা করবেন না সত্য কথা বললে। ওই হিন্দোস্তানের বাদশাহের তামাম ফৌজের মালিক—মীর বক্সী খান-ই-খানান নাজিবউদ্দৌলা শাহানশাহের দরবারে হাজির রয়েছেন। শাহানশাহ মালেক!—আমি নবাব নাজির খানকে বার বার বলেছি—নবাব সাহেব, হিন্দোস্তানের ইজ্জতের জন্যেও এক লড়াই দিতে হবে। এক লড়াই দাও। কিন্তু হিন্দোস্তানের মীর বক্সী আমার কথা শোনেন নি। তারপর রাতের আঁধিয়ারার মধ্যে তিনি তামাম হিন্দোস্তানী ফৌজ নিয়ে এসে শাহানশাহের সঙ্গে মিলে গিয়েছেন। দিল্লীতে আমি উজীর—আমার হাতে ফৌজ নাই। সিপাহী নাই। কি করে লড়াই দেব আমি গরীব পরবর। আপনি বিচারক, বিচার করুন।

শাহ আবদালীকে চুপ করতে হয়েছিল। উজীর ইমাদ মিথ্যা কথা বলে নি। তিনিও ওকথা আর তোলেন নি—তুলেছিলেন উমধা আর মুঘলানীর কথা।

বলেছিলেন—হাঁ। এ বাত ঠিক বটে। কিন্তু তোমার একি বেশরমী বেধরমী কাম আসফজা, তুমি নিজে সৈয়দবংশের বেটা—তুমি তোমার মেহমান—তোমার একই বংশের এত বড় নামী আদমী তোমার চাচা—তোমার মামা সৈয়দ মীর মৈনুদ্দীন নবাব সাহেবের একমাত্র বেটী—যার দেহে সৈয়দের রক্ত—যার সঙ্গে তোমার বচপন থেকে সাদীর কথা, যার সঙ্গে তোমার হেনাবন্দী পর্যন্ত দু বছর আগে হয়ে গেছে—তাকে তুমি সাদী কর নি আজও; নওজোয়ানী বসে বসে দিন গুনছে। তুমি তাদের আটক করে রেখেছ দিল্লীতে। আর তাকে

খাটো করে সাদী করেছ এক তয়ফাওয়ালীর বেটীকে ? কি নাম ? হাঁ, গন্না বেগম ! বল গাজিউদ্দিন আসফজা, কি এর জবাব ? এক তয়ফাওয়ালীর বেটীর কালসে তুমি উমধার অপমান করেছ ? কেন ?

গাজিউদ্দিন এতেও বিহ্বল হয় নি—সে বলেছিল—শাহানশাহ আপনি বিচারের মালিক। খুদ খুদার কাজী ! হাঁ জনাব, বিলকুল বাত সত্যি। লেকেন জনাব, মুঘলানী বেগম সাহেবা হেনাবন্দীর বক্ত আমাকে এক কোরান শরীফের মলাটের পিঠে লিখিয়ে নিয়েছিলেন যে, উমধাকে সাদী করবার পর আর আমি কাউকে সাদী করতে পারব না। জাঁহাপনা—গন্না তয়ফাওয়ালীর বেটী কিন্তু তার বাপ খান-ই-খানান আলিকুইলি খাঁ ইরানী আমীর। মস্ত বড় সায়ের। জাঁহাপনা তার উপর আউধিয়ার নবাব সুজা এই লেড়কীকে নিয়ে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছিল—আমি আমার ইজ্জতের জন্যে গন্নাকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। উমধাকে সাদী করবার পর তাকে সাদী করবার উপায় ছিল না বলে উমধাকে সাদী করবার আগেই তাকে আমি সাদী করেছি। হাঁ জাঁহাপনা—সে তয়ফাওয়ালীর বেটী ! সেটা আমার ভাবা উচিত ছিল। আমি ভাবি নি। আজ আফসোস করছি। শাহানশাহ এ আফসোস আমি বেগম সাহেবার কাছে করেছি, উমধার কাছে করেছি, বলেছি চুক, বড় ভারী চুক আমার হয়েছে। আমি তাকে তালাক দেব। শাহানশাহ এ গুনাহ আমার খোদার কাছে—আমি জরুর এর প্রায়শ্চিত্ত করব !

গাজিউদ্দিন আসফজা ইমাদ উল মুল্ক হাতিয়ারের খেলায় বড় খেলোয়াড় নয় কিন্তু জবানবন্দীর খেলায় পাক্কা খেলোয়াড়।

শাহানশাহ তার চুস্ত খানদানী পার্সীতে এই জবানবন্দী শুনে সাবাস দিয়ে বললেন—সাবাস, সাবাস, ইমাদ—তুমি পাক্কা সেয়ানা হুঁশিয়ার উকীল। বড়া ভারী মামলাবাজী বুদ্ধি তোমার। বহুত ফিকির আর ফন্দীবাজ ! মুঘলানী কোরানের পিঠে লিখিয়ে নিয়েছে—উমধাকে সাদী করার পর আর কাউকে সাদী তুমি করবে না।. তুমি লিখে দিয়েছ। কিন্তু ফিকির তোমার বের করতে কষ্ট হয় নি। পরে সাদী করবে না কিন্তু আগে—পহেলে সাদী করলে রুখছে কে ? —বহুত আচ্ছা !

হা হা করে হেসেছিলেন শাহ আবদালী।

গাজিউদ্দিন আবার বলেছিল—আমি গন্নাকে তালাক দেব শাহানশা !

—হাঁ, হাঁ। তার মামলা হবে। ওয়ালী খাঁ !

ওয়ালী খাঁ কুর্নিশ করে বলেছিল—জাঁহাপনা।

—হিন্দোস্তানের উজীর ইমাদ তোমার মেহমান—তার উপর তুমি আমার উজীর-উল-মুল্ক। হিন্দোস্তানের উজীর-উল-মুল্ককে তোমার জিম্বাদারীতে আমি কয়েদ রাখলাম। দিল্লীতে এর রায় আমি দেব।

ষোল

হুঁশিয়ার সেয়ানা ইমাদ উল মুল্ক। সে এই কদিনের মধ্যেই শাহ আবদালার পিয়ারের আদমী হয়ে উঠেছে। শাহ আবদালী তাকে আবার উজীরীও দিতে চেয়েছিলেন। ইন্তেজামউদ্দৌলা শাহকে জানিয়েছে—উজীরী পেলে সে শাহকে দু ক্রোর টাকা নজরানা দেবে। শাহ ইমাদকে

বলেছেন—তুমি এক ক্রোর দাও ইমাদ—আমি উজীরী তোমাকেই দেব। তুমি মুঘলানীর বেটীকে সাদী করবে, আমার পিয়ারের আদমী হবে। তুমি এক ক্রোর দাও।

ইমাদ বহুত বহুত তসলিম জানিয়ে বলেছে—জাঁহাপনা সারা দিল্লী কুড়িয়ে আমার এক ক্রোর পাখল যোগাড় করবার ক্ষমতা নেই, আমি কি করে এক ক্রোর রূপেয়া দেব? শাহান-শাহ—ইন্তেজামকেই উজীরী দিন। আমার তামাম দৌলতের হিসাব শাহানশাহ চৌদা লাখের এক দামড়ী বেশী নয়। আমি উমধাকে নিয়ে গরীবানের মত জিন্দগী কাটিয়ে দেব। হিন্দোস্তানের উজীরী—যার না আছে ফৌজী হিম্মৎ—না আছে দৌলতি কিস্মত—ওতে আমার আর কোন লোভ নেই।

এইসব সাদা কথায় শাহানশান খুশি হয়েছেন।

এই দেখ—আবদালশাহী জলুসের সঙ্গে চলেছে ইমাদ উল মুল্ক সফেদ আরবী ঘোড়ায় চড়ে, কিজিলবাসী পোশাক পরেছে—ওই দেখ মাথার শিরপেঁচের মাথায় এক দামী হীরা বসানো সাদা পালক উড়ছে; এ সবই আবদালী বাদশাহ তাকে খেলাত দিয়েছেন!

দিল্লীর জনহীন রাজপথের উপর দিয়ে চলছে আবদালশাহী মিছিল। প্রথমেই চলছে আবদালশাহী নাকাড়া। উটের পিঠে সুসজ্জিত নাকাড়া বাজিয়েরা বসে আছে। তারপরই খাস আবদালীর বারো হাজার দুরানী দেহরক্ষক, চার ভাগে ভাগ হয়ে মাঝখানে শাহানশাহকে রেখে চলেছে। সামনে তিন হাজার, পিছনে তিন হাজার, দুই পাশে তিন-তিন হাজার। প্রত্যেকটি নওজোয়ান খুবসুরত—জঙ্গবাজ। পরনে কিজিলবাসী জঙ্গী পোশাক, মাথায় পাগড়ী, সামনে খানিকটা কাপড় উঁচু হয়ে আছে, পিছনে খানিকটা লম্বা হয়ে ঝুলছে। তার সঙ্গে প্রত্যেকের কানে বড় মুক্তা বসানো এক এক মাকড়ী।

এরই ঠিক মাঝখানে শাহদুরানী চলছেন আরবী ঘোড়ার উপর। একজন ছিলমবরদার ফুরসী নিয়ে চলছে পাশে পাশে। মধ্যে মধ্যে নল টেনে নিয়ে শাহদুরানী টানতে টানতেই চলেছেন। মন্থর গমনে চলছে জলুস। শাহদুরানী নল ছেড়ে দিয়ে মুখ ধুয়ে নিচ্ছেন—জলের পাত্র থেকে জল নিয়ে।

তার পিছনে উট চলছে।

ওদিকে তাকিয়ো না। বাদশাহী জুলুসের কোন আমীর উমরাহ পর্যন্ত ওদিকে তাকাতে সাহস পায় না। উটের উপর চারিদিক গাঢ় লালরঙের মখমল সাটিনে ঘেরা হাওদা! বড় ছোট হরেক রকমের। তার মধ্যে তখতের উপর বসে আছেন বাদশাহী হারেমের জেনানা। চারিদিকে মুক্তা দেওয়া ঝালর।

বাদশাহী হারেম।

তার পিছনে আমীর উমরাহ। তার পিছনে রসদখানা, আসবাবখানা। সে চলেছে বয়েল গাড়িতে, উটের গাড়িতে। তার পিছনে কামান। তার পিছনে সওয়ার। তার পিছনে পয়দল।

ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজে আওয়াজে আবদালশাহী মিছিলের তাল পড়ছে। শীতকালের সকালের প্রথম প্রহর পার হয়েছে। লালকিল্লার পাঁচিল ছাড়িয়ে সূর্য উঠেছে আকাশে। ঝলমল ঝকমক করছে আবদালশাহী জলুসের জৌলুস। আর আসমান পর্যন্ত ধুলো উঠেছে তিরিশ চল্লিশ হাজার সিপাহী আর ঘোড়া উটের পায়ে পায়ে।

বাড়ির ভিতর বসে দিল্লীর বাসিন্দারা দেখছে—লালে লাল হয়ে গেল আকাশ। শুকল্লব

আচার্য ঝুট বাত বলে নি। তার গণনা অব্যর্থ—নির্ভুল। আঁধি। এ আঁধি বটে।

হঠাৎ নাকাড়ার তাল কাটল।

একটা-দুটো ঘা যেন পড়ল না।

পিছনের আবদালীশাহের খাস সিপাহীর প্রথম সারি ঘোড়ার একটা কদম যেন থমকাল। সঙ্গে সঙ্গে সারা মিছিলে সবাই একটি কদমে হুঁচোট খেলে।

পরমুহূর্তেই—প্রথম সারির দু-তিনজন সিপাহী ছুটল। একটা ধ্বনি দিয়ে উঠল। উররা।

—কি হল ?

শাহ আবদালী লালকিল্লার ফটকের মিনারের দিকে তাকিয়ে চলছিলেন। ঘোড়ার রাশ শিথিল হয়ে পিঠে পড়ে ছিল। ঘোড়ার ঘাড়টা সামনে লম্বা হয়ে প্রসারিত ছিল। শাহ চমকে উঠে রাশ টেনে নিলেন। ঘোড়াটা মাথা খাড়া করে তুলে সওয়ারের ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠল।

শাহ প্রশ্ন করলেন—কি হল ?

তার উত্তরে এক সওয়ার একটা কাটা মুণ্ডু নিয়ে এসে শাহকে সেলাম করে বললে—পাগলটা মিছিলের সামনে এসে রুখবার জন্য দাঁড়িয়েছিল। আমি তার শির নিয়ে এসেছি।

শাহ বাঁ হাতে মাথাটার চুলের মুঠি ধরে তুলে দেখলেন। চিচকের দাগে ভরা মুখ। দুটো চোখই বন্ধ।

বললেন—অন্ধা! আর পাগল বলছ!

সওয়ার বললে—নইলে এমনি করে আসে ? রুখতে যায় ?

শাহ বললেন—ওটা বর্শায় গেঁথে নিয়ে চল। আচ্ছা হয়েছে। শেষতক পাগলা হোক অন্ধা হোক এক আদমী লড়াই দিয়া!

বর্শায় মুণ্ডুটা গেঁথে নিয়ে উঁচু করে তুলে ধরে মিছিল এগিয়ে চলল। ঢুকল গিয়ে লালকিল্লার ফটকের মধ্যে।

ইমাদ উল মুল্ক চমকে উঠল পিছনে ঘোড়ার উপর থেকে।

অন্ধা! সারা মুখে চিচকের দাগ!

এক প্রহরের মধ্যে দিল্লীর পথে পথে ফের নাকাড়া বাজতে লাগল। এক প্রহরের মধ্যে আবদালী শাহী কায়েম হয়ে গেল লালকিল্লায়, তামাম হিন্দোস্থানে। দিল্লীর বাদশাহের মেহমান দুরী দুরানী আবদালী বাদশাহ যতদিন থাকবেন—মেহমানের বাদশাহীতে বাদশাহী করবেন। তাঁর হুকুমৎ জারী হচ্ছে।

এই এক প্রহরের মধ্যেই কিছু আফগানী ফৌজ বেরিয়ে পড়ে বাদলপুরা বাজারে হামলা করে লুটতরাজ আরম্ভ করেছিল, ঘরে আগুনও দিয়েছিল কিন্তু এই নাকাড়া বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই তা থেমে গেল।

শাহ আবদালী কড়া হুকুম দিয়েছেন—"লুটতরাজ খুনখারাবি হামলা হাঙ্গামা যে আফগান সিপাহী করবে তার হাত কাটা হবে, দরকার হলে গর্দান যাবে।"

শোনা গেল জনকয়েকের নাক খুদ আবদালী বাদশাহ তাঁর 'তরকশ্' অর্থাৎ পিঠের তূণীর থেকে তীর বের করে জোর করে ঢুকিয়ে নাকটা ছাড়িয়ে নিয়ে সাজা দিয়েছেন।

তার সঙ্গে হুকুমৎ জারী হচ্ছে—"দিল্লীর প্রত্যেক বড়ং শড়কে আবদালশাহী মুন্সীর দপ্তর

পড়ছে। দিল্লীর প্রতি ঘরের আদমী এসে তার নিজের নাম যেন লিখিয়ে যায়। কত নজরানা দেবার মত তার অবস্থা তাও লিখিয়ে যেতে হবে।"

শাহ এসেছেন—নজরানা তাঁর প্রাপ্য, তাঁকে পেতে হবে!

তারই মধ্যে দিয়ে চলে গেল একদল দুরানী সওয়ার। সঙ্গে নবাব নাজিবউদ্দৌলার একজন মনসবদার। যাচ্ছে তারা উজীর ইমাদ উল মুল্কের হাবেলীর দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের কিছু লোক ফিরল। তাদের সঙ্গে একখানা ডুলি। ডুলির সঙ্গে একটা বয়েল গাড়িতে কজন বুরখাপড়া ঔরৎ। বাঁদী তারা। ইমাদ উল মুল্কের বাড়ির মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছে!

কে? কে? কাকে নিয়ে চলল ডুলিতে?

গন্না বেগম। গন্না বেগমকে আবদালশাহী ফৌজ এসে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। সঙ্গে সাকিনা বাঁদীকেও নিয়ে যাচ্ছে তারা। তার সঙ্গে আরও দুজন বাঁদী।

ডুলি চলে গেল বন্দীশিবিরের দিকে। সে-সব বন্দী যাবে শাহের সঙ্গে আফগানেস্তান।

ওদিকে ইমাদ উল মুল্কের হাবেলী খোঁড়া হচ্ছে দৌলতের জন্য।

ীর মহল্লায় মহল্লায় রোজ নাকাড়া বাজছে।

"হাজীর করো—দুরী দুরানী শাহ আবদালীর নজরানা হাজির করো। মহল্লায় মহল্লায় শাহের দপ্তর বসে গিয়েছে; সেই দপ্তরে হাজির করো আপন নজরানা।"

লালকিল্লায় শাহ আবদালী বাদশাহের খাসমহলে নিজের হারেম নিয়ে কদিন আরাম করে দেওয়ানী আমে দরবার করলেন।

নিয়ে এস নজরানা! জলদি! দু ক্রোর টাকার সোনা। নিয়ে এস!

দিল্লীর আমীর উম্‌রাহ সকলে শুনে সভয়ে তাকিয়ে রইল পরস্পরের মুখের দিকে। কোথায় দু ক্রোর টাকা!

বাদশাহী খাজাঞ্চীখানা? বাদশাহী খাজাঞ্চীখানায় যা ছিল, নিয়ে আসা হল। কিন্তু তাতে কি হবে? আর সেসব তো শাহ-দুরানী মেহমানের দৌলতখানায় যখন এসেছেন তখন তাঁর প্রাপ্যই। দিল্লীওয়ালা আমীর উমরাহ বানিয়া গৃহস্থী হিন্দু মুসলমান—তোমরা দাও। নিয়ে এস। নেহি তো—।

নেহি তো জবরদস্তি আদায় করতে জানেন আবদালী। তাই হলও।

আফগান সিপাহীরা তামাম দিল্লীর গৃহস্থী গরীব দোকানদার মুদির বাড়ি মুদিখানা লুঠতে লাগল। টাকা আসবাব ঔরৎ। সে হিন্দু হোক মুসলমান হোক রেহাই নেই ঔরতের। হিন্দু ঔরতের উপর ঝোঁক বেশী!

চীৎকার উঠেছে। টেনে নিয়ে যাচ্ছে দড়ি বেঁধে যুবতীর দলকে। মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে—বোরখা খুলে গেছে ছিঁড়ে গেছে—বাঁধা জানোয়ারের মত চীৎকার করতে করতে যাচ্ছে।

চীৎকার উঠছে—হে ভগবান বাঁচাও! তারপর শব্দ উঠছে—ঝপ। কুয়োতে লাফিয়ে পড়েছে মেয়ে।

চীৎকার উঠছে, রুক্ষ ভাঙা গলায় পুরুষের চীৎকার—যা চলে যা স্বর্গে কি বেহেস্তে। তার সঙ্গে হয়তো একটি আর্তনাদ। কেটে ফেলছে মা বোন স্ত্রীকে।

হিন্দু মুসলমান সবার ঘরে।

পথে খুন হয়ে পড়ে আছে মানুষ। হিন্দু মুসলমান দুই-ই। লালকেল্লার সামনে কাফেরের মুণ্ডের পাহাড়। এক এক মুণ্ডের জন্য আশরফ উল উজীরের খাজাঞ্চী টাকা দিচ্ছে।

দেওয়ানী আমের সামনে খাড়া হয়ে আছে দিল্লীর আমীররা। প্রথম খাড়া ইস্তিজামউদ্দৌলা। তার পাশে তে-কাঠা। টাকা কই? টাকা? না হলে বাঁধা হবে ওই তে-কাঠায়। কোড়া লাগানো হবে। ইস্তিজামউদ্দৌলা শাহ আবদালীর মীর বকসী সিপাহ-শালার সর্দার জাহান খাঁর মারফৎ জানিয়েছিলেন—ইমাদ উল মুল্কের উজীরী কেড়ে নিয়ে যদি তাকে দেওয়া হয়, তবে সে দু ক্রোর টাকা দেবে। সেই আরজী মন্‌জুর করে শাহ আবদালী তাকে উজীরী ফরমান পাঠিয়ে দিয়েছেন।—ইস্তিজাম, তুমি নিয়ে এস তোমার সেই দু ক্রোর টাকা!

ইস্তিজামউদ্দৌলার মুখ সাদা হয়ে গেল। দু ক্রোর টাকা?—কিন্তু টাকা তো নেই তার নিজের কাছে। থাকবার মধ্যে তার হাতে এক দামী হীরার আংটি আছে। আর কি আছে? যা আছে তার দাম সব জুড়ে দু লাখও হবে না! সে বলেছিল। কিন্তু নগদ টাকা তো তার নেই!

—ইস্তিজামউদ্দৌলা!

—শাহানশাহ! দিন দুনিয়ার মালেক! রূপেয়া তো—

—কি? বলো!

—নেই জাঁহাপনা!

—নেই! শাহ আবদালীর ভ্রূকুটি ভীষণ হয়ে উঠল। তামাশা! তার সঙ্গে মস্করা! রূপেয়া নেই! তোর বাপ ছিল উজীর—তার বাপ ছিল উজীর, হিন্দোস্তানের বাদশাহের তিন পুরুষের উজীর, আর এই সোনেকা হিন্দোস্তান—তোর বাড়িতে টাকা নেই! বল্, কোথায় তোদের তিন উজীরীর দৌলত?

বিবর্ণ রক্তহীন মুখে ইস্তিজাম বললে—জাঁহাপনা, খোদার নাম নিয়ে বলছি সে আমি জানি না। জানেন আমার আম্মাজান শোলাপুরী বেগম।

শোলাপুরী বেগমকে হাজির করো। ডুলি পাঠাও।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল সওয়ার।

•

শোলাপুরী বেগম দাঁড়ালেন। আবদালী বললেন—দৌলত কোথা গাড়া আছে যদি বল তবে তুমি আমার কাছে মা-বহেনের মত খাতির পাবে। না বললে তোমার আঙুলের নখে নখে সুই ফুটিয়ে দিয়ে কবুল আদায় করব। বল!

শোলাপুরী ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। মুখে জল দিয়ে জ্ঞান হল। আবদালী আবার বললেন—বল!

বৃদ্ধা কম্পিতকণ্ঠে বললেন—হাবেলীর একটা জায়গায় মাটির তলায় গাড়া আছে, বাদশাহ —আমি শুধু শুনেছি—আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

তিন দিন ধরে ইস্তিজামের হাবেলী খুঁড়ে ছাদ ভেঙে ষোল লাখ টাকা আর হীরা জহরত বসানো সোনা চাঁদির বাসন আসবাব বেরিয়েছে। তারপর সমস্ত আমীরদের হাবেলী খোঁড়া হয়েছে। ইমাদ উল মুল্কের হাবেলী খুঁড়ে ভেঙে যা পেয়েছে নিয়ে গেছে। সে অনেক, অনেক দৌলত। হাবেলীতে যে-সব পোষ্য আত্মীয়া আর বাঁদী ছিল তাদের টেনে রাস্তায় এনেছে।

শুধু ইস্তিজামউদ্দৌলার হাবেলী নয়। শাহের সিপাহীরা খান-ই-খানান দেওয়ান

সামসুদ্দৌলার বাড়ি এবং কোতোয়াল ফাউলাদ খাঁ, খানিসামান সামসুদ্দিন, দেওয়ান খালসা রাজা নাগরমল, জহুরী হীরাচাঁদের হাবেলী খুঁড়ে তছনছ করে বের করে আনলে তাদের দৌলত—টাকা মোহর হীরা জহরৎ সোনা রূপার আসবাব বর্তন! দৌলতের একটা পাহাড় বনে গেল।

শাহ হাস্‌লেন। তিনি জানেন। শাহ নাদের যখন হিন্দোস্তান লুটে নেন তখন নাদির শাহের নোকর ছিলেন তিনি। একটা কানে তাঁর হাত আপনি গিয়ে পড়ল। কানটা নেই। নাদির শাহ কেটে নিয়েছিলেন। দক্ষিণের নিজাম উল মুল্ক তখন উজীর। এই ইন্তিজামের দাদো। তিনি শাহ আবদালীর ললাট দেখে বলেছিলেন—এ আদমী একরোজ দুনিয়ায় বড় ভারী বাদশাহ হবে। শাহ নাদের কথাটা শুনতে পেয়ে আবদালীকে ডেকে বলেছিলেন—"শোন্।" বলে তাঁর কোমরবন্ধের ছোরা খুলে তার একটা কান কেটে নিয়ে বলেছিলেন—"যখন বাদশা হবি, তখন এই কাটা কান থেকে তোর মনে পড়বে আমাকে!"

মনে পড়ছে নাদির শাহকে। কোহিনূর—তক্তেতাউস আর মণ মণ সোনারূপা নিয়ে গিয়েছিলেন। কোহিনূর শাহ আবদালী পেয়েছেন। তক্তেতাউস সোনারূপা—সে ইস্পাহানের খাজাঞ্চিখানায় থেকে গেছে। কিন্তু হিন্দোস্তানের দৌলত ফুরোয় না। দেখ তার প্রমাণ! দেখ—কোমরুউদ্দিন ইন্তিজামের বাড়ি থেকে যে সোনার সামাদান—সে সামাদান পুরা জোয়ানের মত লম্বা—বেরিয়েছে, তার ওজন পুরো সাত মণের কম নয়। আর সামাদানের সংখ্যা হল—পুরো দুশো! হাঁ, এই দুশো সামাদান জ্বালিয়ে শাহ আবদালী দরবার করবেন।

অন্যান্যদের বাড়ি থেকেও কম দৌলত বের হয় নি। জহুরী হীরাচাঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছে—বহুত বহুত। ইমাদের হাবেলী থেকেও বের হয়েছে। ওখানে দু-রকম বিচার তিনি করেন নি।

মুঘলানীর তিনি ধরমবাপ। মুঘলানী তাঁকে দিল্লীর সমস্ত খবর দিয়েছে। তার অনুরোধে তিনি ইমাদকে মাফ করেছেন কিন্তু তার দৌলত না নিয়ে ছাড়েন নি।

পরওয়ানা তিনি পাঠিয়েছেন ফারাক্কাবাদে আহমদ খাঁ বাঙাশকে। পরওয়ানা গিয়েছে জাঠরাজা সুরজমলের কাছে, পরওয়ানা গেছে আউধিয়ার নবাব সুজাউদ্দৌলার কাছে। নজরানা দিয়ে তসলীম জানিয়ে যাও।

সুরজমল কাফির এল না। আহম্মদ খাঁ বাঙাশ পথে আসছে। হঠাৎ খবর এল জাঠ সুরজমলের দুর্দান্ত বেটা জবাহির সিং মারাঠা মনসবদার সমশের রাও জঙ্গ বাহাদুরকে নিয়ে ফারাক্কাবাদের দিকে পাঠানো আবদালশাহী ফৌজের একটা দলকে বিলকুল কেটে মেরে লুটে নিয়েছে তাদের ঘোড়া হাতিয়ার আর জঙ্গী সরঞ্জাম।

শাহ আবদালীর হুকুম হল—দিল্লীর কাম শেষ করো। বন্ধ করো দিল্লীর আদায়। চলতে হবে সামনে। কাফির সুরজমলের ভরতপুর কুম্হার, ডিগ কিল্লা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে তার গোস্তাকীর সাজাই দিতে হবে।

তার আগে বাদশাহ সাদী করবেন মৃত বাদশাহ মহম্মদ শাহের বেটী হজরত বেগমকে। আর শাহজাদা তিমুর শাহের সাদী হবে বাদশাহ আলমগীর সানির বেটী মহম্মদী বেগমের সঙ্গে।

আর সাদী দেবেন উমধা বেগমের ইমাদ উল মুল্কের সঙ্গে। কিন্তু তার আগে হবে বিচার।

দেওয়ানী খাসে বসবে এই আদালত। খুদ শাহ আবদালী করবেন এই বিচার। শাহ আবদালী বললেন—উজীর শাহ ওয়ালী! হাজির করো আসামীকে আর সেই তয়ফাওয়ালীর বেটীকে।

সতেরো

বদলী সরাইয়ে বন্দী ছিল গন্না বেগম। আপন মনে গজল তৈরী করছিল—আর গুনগুন করে গেয়ে নিজেকেই শোনাচ্ছিল।

কত গজল সে বানিয়েছে—আবার ভুলেও গেছে। লিখবার তো সরঞ্জাম নেই। হঠাৎ হুকুম এল—খোজা সর্দার এসে বললে—এই বান্দী উঠ্।—

তার দিকে তাকালে গন্না বেগম।

—উঠ্! শাহের পরওয়ানা এসেছে। উঠ্।

উঠে দাঁড়াল গন্না। প্রশ্নও করলে না—কোথায় যেতে হবে!

কি লাভ? মর্জি খোদাকি, খেল নসীবকা, ইজ্জত ইনসানকি!

তোর ইনসানিয়াতির ইজ্জত তোর চোখের জলে নয়। চোখের জল—আঁখোকি আঁশু শরম কি বাত। লোকে তাতে হাসে। ভয় কাকেও করিস নে—তাতেও দুনিয়া হাসে।

একটা গজল তার মনে গুনগুনিয়ে উঠল। এ গজলটা সে ভোলে নি।

বাইরে ডুলি তৈরী ছিল। উঠে বসল গন্না।

কি কাজ কিসমৎকে প্রশ্ন করে—আমাকে নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?

যায় মানুষ এক মোকামে! মোকামে দুই নেই।—

দু মোকাম যারা বলে,—বেহেস্ত আর দোজখ—তারা ঝুট বলে। স্রিফ ডর দেখায়।

ডর তুই করিসনে।

মেরি কিসমৎ, কোথায় নিয়ে যাবে চল।

হাসতে হাসতেই যাব!

আমি হারবো না—কভি না—কভি না!

হাসতে হাসতেই সে ডুলিতে চড়ল। কাঁদবি কেন গন্না? কান্না কিসের জন্য? বেদরদী দুনিয়ায় কি দরদের কথা চোখের জল ফেলে জানাতে আছে? হাসবে দুনিয়া। তুই হবি বেশরমী!' শরমই ইজ্জৎ গন্না। ইজ্জৎ ইনসানকি!

ডুলির মধ্যে গন্না বসেছিল···স্তব্ধ নিস্পন্দ হয়ে, এমন কি চিন্তা ভাবনা ভয় কোন কিছুই তার ছিল না। কোথায় যাচ্ছে সে চিন্তাও সে করে নি। চল্ যেখানে নিয়ে যাবি আমার কিসমৎ। চল্! মনের মধ্যে শুধু একটি গজলের কলি গুনগুন করছিল—

"বেদরদী দুনিয়ায় দর্দ্ খুঁজে হায়রানি তুই আর করিসনে—
সে হবে বেশরমীর কাজ! শরম দিয়ে ঢেকে রাখ তোর দর্দ্‌কে।
তোর চোখের জলকে তুই ঢাক তোর মুখের হাসি দিয়ে।"

হঠাৎ ডুলিখানা মাটিতে নামল। চমক ভাঙল গন্নার। ডুলি পৌঁছে গেছে! হ্যাঁ, রূঢ় কর্কশ কণ্ঠে আফগানী জবানে কেউ বললে—নামো! উত্‌রো!

সঙ্গে সঙ্গে ডুলির পর্দা খুলে দিলে। একজন তাতারনী হাতখানা ধরে তাকে আকর্ষণ করলে। গন্না নামল এবং তারই আকর্ষণে সে চলতে লাগল। বোরখার জালির মধ্য দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে—

সামনে দেওয়ানী খাস।

দেওয়ানী খাসে শাহ আবদালীর দরবার বসেছে। শাহ বসে আছেন মসনদে। তাঁর

মাথার পাগড়ী তাঁর বিরাট দেহ দেখে মুহূর্তের জন্য বুকটা তার কেঁপে উঠল। তারপর চোখে পড়ল তাঁর কপিশ চক্ষুতারকা। আর রূপোর ঢাকনা দেওয়া নাক!

তাতারনী কুর্নিশ করে বললে—সামনে দুরী দুরানী শাহ আবদালী। এই কমবক্তি—তোর খেয়াল নেই?

গন্না কুর্নিশ করলে। এতক্ষণে সে নিজেকে সামলে নিয়েছে। "বেশরমী, দুনিয়ায় ভয় করে ইট কাঠ পাথরকে হাসাস নি। চোখের জল সামলে রাখ, সামলে রাখ, তোর ইজ্জৎ ভেসে যাবে। কুছ ডর নেহি কুছ ডর নেহি! হেসে নে তুই হেসে নে।" সামনে শাহ বসেছেন মসনদে তার পাশে আর এক মসনদে বসে দিল্লীর বাদশা আলমগীর সানি। ওপাশে কে? বোধ হয় শাহ আবদালীর উজীর শাহ ওয়ালী খান-ই-খানান। তার পাশে হাতে রুমাল বাঁধা ইমাদ উল্ মুল্ক। এপাশে বোরখা পরা দুজন নারী। অনুমানে তার বুঝতে বাকী রইল না—একজন মুঘলানী বেগম, অন্যজন উমধা। চারিপাশে পাহারা দিচ্ছে তাতারনী মেয়েরা হাতে তাদের খোলা তলোয়ার।

কেবল শাহদুরানীর পিছনে চারজন বলিষ্ঠ আফগান দূরানী রিশালা দাঁড়িয়ে আছে, বাদশাহের দেহরক্ষক।

গন্না হাসলে। এ তা হলে তারই বিচারসভা! হায় বিচার! লা ইলাহা ইল্লাল্লা—এয় খোদা এ কি তামাশা তোমার দুনিয়ায়? হায়, হায়, হায়!

অকস্মাৎ, ভারী ভয়াল কণ্ঠস্বরে হুকুম হল—এই তয়ফাওয়ালীর বেটী গন্না বেগম?

তাতারনী বললে—হাঁ—মালেক-ই-মুল্ক—এই গন্না বেগম, গজল গাহ্‌নেবালী, হিন্দোস্থানের উজীর ইমাদ উল মুল্কের বেগম, ছাঙ্গা (ছ-আঙুলে) আলিকুইলি খাঁ আর এক তয়ফাওয়ালীর বেটী!

ইমাদ উল মুল্ক হাত বাঁধা অবস্থাতেই কুর্নিশ করে বললে—শাহান্‌শাহ—মালেক-ই-মুল্ক—আমি চুক করে ফেলেছি—আমি এই তয়ফাওয়ালীর বেটীকে সাদী করেছিলাম। শাহানশাহের সামনে খুদার নাম নিয়ে এই ঔরৎকে আমি তালাক দিচ্ছি। আমার চুক হয়েছিল—শাহান শাহ, তয়ফাওয়ালীর বেটী তয়ফাওয়ালী ছাড়া কিছু হয় না!

শাহের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আবার হুকুম হল—বুরখার মুখের ঢাকা খুলে দে তয়ফাওয়ালীর বেটীর।

তাতারনী খুলতে যাচ্ছিল—কিন্তু তার আগেই গন্না নিজেই তার বুরখার মুখের ঢাকাটা মাথার উপর তুলে দিয়ে কুর্নিশ করে চোখ নামিয়ে দাঁড়াল।

শাহ আবদালী বললেন—এই গন্না বেগম?!

বিস্মিত হয়েছেন তিনি। কোথায় গন্না বেগমের সুরত? ইমাদ বিস্মিত হয়েছে আরও বেশী। সাত দিনে গন্না এমন হয়ে গেছে!

বিশীর্ণ মুখ—তার গোলাপ ফুলের মত রঙ এবং লাবণ্য যেন শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে, চোখের কোলে একটা গভীরতর কালো দাগ। গন্না এমন হয়ে গেছে!

শাহ আবার বললেন—তুই গন্না বেগম?

কুর্নিশ করে গন্না বললে—হাঁ শাহান শাহ। বাঁদীর নামই গন্না বেগম!

হেসে শাহ ইমাদের দিকে তাকিয়ে বললে—আরে ছো ছো ছো গাজিউদ্দিন—এরই জন্যে তুমি সৈয়দ বংশের বেটি উমধাকে ফেলে রেখেছ—সাদী কর নি? ছো—ছো—ছো!

—আমার কশুর হয়ে গিয়েছে শাহান শাহ। চুক হয়ে গিয়েছে!

—কবুল করছ নিজের মুখে?

—হাঁ জাঁহাপনা। আগেই করেছি। এত বড় চুক এত বড় কশুর আর আমার জিন্দিগীতে হয় নি!

—তবে এই তয়ফাওয়ালীর বেটীকে তুমি সবার সামনে তালাক দাও!

ইমাদ অকম্পিত কণ্ঠে তালাক বাক্য উচ্চারণ করলে।—

শাহ বললেন—এই তয়ফাওয়ালীর বেটী, তোর দেন-মোহর মিলেছে?—সাদীর সময় দিয়েছে?

গন্না কুর্নিশ করে বললে—শাহান শাহ—বাঁদী যে, সে দামে বিক্রী হয়, সে কি দেন-মোহর পায়? আমি জানি না! শাহান শাহ আমি আমার দাম পাই নি। আমার নসীব। তাতেও আমার দুখ নেই নালিশ নেই।

—তুই বাঁদী? কে তোকে বিক্রী করেছিল? তোর তয়ফাওয়ালী মা?

—না শাহান শাহ, আমি নিজেই নিজেকে বেচেছিলাম—উজীর-ই-উল হিন্দোস্তানের কাছে!

—হাঁ! কি দামে বেচেছিলি? হেসেই প্রশ্ন করলেন শাহ। কৌতূহল হল তাঁর।

—শাহান শাহ—এক ফকীর—হজরত—তিনি—

ইমাদ ইল মুল্ক কুর্নিশ করলে—জানালে সে কিছু বলতে চায়।—

শাহ বললেন—এই তয়ফাওয়ালীর বেটী—সবুর। ইমাদ কি বলে শুনতে দে।—

—বল—ইমদি!

ইমাদ বললে—শাহান শাহ—ঝুট বলছে তয়ফাওয়ালীর বেটী! সে ফকীর নয়—সে ওর মাশুক্।

—মাশুক্! কে সে?

—শাহান শাহ,—আউধিয়ার নবাব মতলববাজ সফদরজঙ্গ এক সময় মহম্মদ শাহের বেটা বাদশাহ আহম্মদ শাহের উজীর ছিল,—সেই আমলে—বাদশাহের সঙ্গে বেইমানি করে সে—তার এক খোজা বান্দাকে জিন্দাপীর বাদশাহ আলমগীর গাজীর পোতা শাহজাদা ফিরুজমন্দ শাহের বেটা—আকবর আদিল শা বলে দাবি করে বাদশা করেছিল—কিস্‌সার আবু হোসেনের মত। শাহজাদা ফিরুজমন্দের বেগম বেটা-বেটী—দিল্লীতে আছে শাহান শাহ। এ আদমী বলে ফিরুজমন্দ ফকীর হয়ে মক্কা যাবার পথে এক চাচার মেয়েকে সাদী করেছিল, সে তার বেটা। এ আদমী সেই। এক ঝুটা আদমী। ঝুটা ফকীর—ফন্দীবাজ, সেই ওর মাশুক্!

—আঁ! ঘাড় নাড়লেন শাহ আবদালী।—কিরে তয়ফাওয়ালীর বেটী?

—শাহান শাহ,—দুনিয়ার মালেক, ঝুট কেন বলব? হাঁ তাই। তিনি আমার মাশুক—আমার মহবুব—আমার আজিজ! তবু তিনি ফকীর তিনি হজরত। তাঁর এক চোখ উজীর উল মুল্ক নিয়েছিলেন, নিয়েছিলেন—তাঁর কাছে তাঁর আঁকা এক তসবীরের জন্যে। সে তসবীর ভেঙে দিয়েছিল উমধা বেগম সাহেবা। উনি তাঁকে বলেছিলেন ফের এঁকে দাও। কিন্তু তিনি তা দেন নি। সাজাই হিসেবে উজীর উল মুল্ক তাঁর এক চোখ গেলে দিয়ে বলেছিলেন—এই চোখ তোর রইল—তসবীর আঁকার জন্যে। তসবীর এঁকে দিলে থাকবে। নইলে থাকবে না। তাঁকে কয়েদ করে এনেছিলেন ফারাক্কাবাদ—আমাকে যখন সাদী করবার জন্যে আসেন তখন। শাহান শাহ তখনই আমি তাঁর সেই চোখের জন্যে উজীর সাহেবের কাছে নিজেকে বিক্রী করেছিলাম বাঁদী হিসেবে। কিন্তু দাম তিনি দেন নি। আমার বিক্রীর খত

নিয়ে তাঁকে অন্ধ করে দিয়েছেন।

একটু হেসে গন্না বললে—তবু আমি ওঁর বাঁদী। ওঁর শাস্ত্রমতে সাদীকরা কবিলা নিজেকে কোনদিন ভাবি নি—ভাবতে পারি নি।

দরবারের লোকে বিস্মিত হয়েছে—এই মেয়ের প্রগল্‌ভতা দেখে। শাহ আবদালীর সামনে!

শাহান শাহ বললেন—ইমাদ উল মুল্ক!

—শাহান শাহ, আমি তার চোখ নিই নি। চোখ নিয়েছে আমার এক সিপাহী। আমার ছাউনির ইলাকার বাইরে।

—আচ্ছা। আচ্ছা। পাক্কা হিসাবী ইমাদ! তুমি নাও নি তোমার রিসালা নিয়েছে, তোমার ছাউনির বাইরে! আচ্ছা—আচ্ছা!

—শাহান শাহ দুনিয়ার মালেক—সে আদমীর চোখ আমার রিসালা নিয়েছিল ভালই করেছিল—নইলে শাহান শাহ যে দিন কিল্লায় এলেন জলুস করে সেদিন সে-আদমী একটা কাণ্ড করত। এ আদমী সেই লোক শাহান শাহ, যে সেদিন জলুসের সামনে ছুটে এসে—'জলুস রুখো' বলে দাঁড়িয়েছিল। যার মুণ্ডুটা সিপাহীরা সঙ্গে সঙ্গে কেটে নিয়ে বর্শার মাথায় তুলে এনেছিল।

—অন্ধা, মুখে চিচকের দাগ!

—হাঁ শাহান শাহ, দুনিয়ার মালিক, এ সেই!

সমস্ত দুনিয়া যেন দুলে উঠল। দেওয়ানি খাসের জহরৎ খচিত খিলান থাম্বাগুলো যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। শাহ আবদালীর ভয়াল মুখখানা প্রকাণ্ড বড় হয়ে ভয়ঙ্কর ভীষণ হয়ে উঠল। গন্না বেগম টলছিল, তবু সে প্রাণপণে চেষ্টা করলে খাড়া থাকতে! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! খুদা মেহেরবান! খাড়া রাখ বাঁদীকে! হজরত আদিল শাহকে গৌরবান্বিত কর। ইজ্জৎ ইনসানকি! ইনসানিয়াতের ইজ্জৎ তাঁর রেখেছ তুমি! কোন সাজাই পেতে দুঃখ নেই তার। দুখ তার জিন্দিগীর সহেলী হয়ে গেল!

শাহ আবদালী বললেন—তওয়াইফের বেটী, তুইও তওয়াইফ। এক খোজা বান্দা তোর মাশুক। তোর সাজাই হল—তুই বাল্‌খ্ মুলুকে যাবি, তওয়ায়েফ গিরি করবি। আর ইমাদ উল-মুল্ক গাজিউদ্দিন আসফজা—তুমি তৈয়ার হও; আজই এইখানে মোল্লা মৌলভী তোমার সঙ্গে উমধার সাদীর কাজ শেষ করবে। ওয়ালী শা—ডাক মোল্লা!

ওপাশ থেকে বুরখা পরা একটি নারীমূর্তি এবার ঝুঁকে পড়ে কুর্নিশ করলে। একজন তাতারনী তার কাছে গিয়ে কান পেতে দাঁড়ালে—তারপর বললে—শাহানশাহ মালেক, উমধা বেগম হজরত শাহের কাছে এক আর্জি পেশ করছেন।

—উমধা বেগম? বল কি আর্জি?

—শাহান শাহ জাহাঁপনা—উমধা বেগম হজরত শাহের কাছে কিছু বকশিশ চাচ্ছেন তাঁর সাদী উপলক্ষে।

—বল কি বকশিশ চায় উমধা বেগম! সৈয়দের বেটী! মুঘলানীর লেড়কী!

—বেগম বকশিশ চাচ্ছেন এক বাঁদী!

—হাঁ জাহাপনা, ওই তওয়াইফের বেটী তওয়াইফ গন্না বেগমকে সে এই সাদী উপলক্ষে বাঁদী হিসেবে বকশিশ চায়। উমধা বেগমকে সে গানা শোনাবে, সামনে নাচবে, তার পায়ে মেহেদী আর আলতা পরাবে!

শাহ বললেন—মন্‌জুর! তাতারণী, বাঁদীকে নিয়ে গিয়ে হাজির কর তার মালেকানের কাছে। আমার হুকুমে খুদার নাম নিয়ে তওয়াইফের বেটী—বল্‌ তুই উমধার বাঁদী।

গন্না তাতেও হাসলে। সে কুর্নিশ করে নতজানু হল উমধা বেগমের কাছে।

* * *

সেদিন রাত্রে উমধা বেগম সাদীর পর গাজিউদ্দীনের পাশে বসে তলব দিলে নতুন কেনা বাঁদীকে।

—গীত শুনা বাঁদী।

গন্না বীন্‌ তুলে নিলে। তারপর গুনগুন করে গাইলে—

"সুখ আমার মেহমান! দুখ আমার সহেলী!

মেহমান এসেছিল—তার জন্যে কত ইন্তিজাম।

মখমলের ফরাশ পেতেছিলাম—রোশনাই জ্বেলেছিলাম।

মেহমান চলে গেল। রোশনি নিভল। মখমল উঠিয়ে দিলাম।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মেহমান থাকতে বুকের দরদেও দুফোঁটা চোখের জল ফেলতে পাই নি। হাসতে হয়েছে।

বুকে বৃহৎ দর্দ। তা হোক। মেহমানের সামনে—কাঁদতে নেই। মৎ রোনা—মৎ রোনা।

হাস। হাস। বল আজ কি সুখের দিন!

সহেলী সুখ এসেছে। থোড়া সবুর। থোড়া সবুর আমার সহেলী। মেহমানকে বিদায় করেই আমি গিয়ে মাটির উপর তোমার গলা ধরে বসব।

কাঁদব। তখন কাঁদব।

অব মৎ রোনা, মৎ রোনা, মৎ রোনা!

উমধা বেগম ধমক দিয়ে বললে—মৎ গোনা। এ গান গাসনে বাঁদী। দুসরা গান কর।

ইমাদ উল মুল্ক গভীর চিন্তায় চিন্তান্বিত মুখে বসেছিল। সে ভাবছিল। হারের কিস্তি সামলে নিয়ে মোড় ফিরিয়েছে খেলার!

নসীব তার হেসেছে। নইলে উমধা গন্নাকে বাঁদী হিসেবে চাইবে কেন? গন্নাকে তার চাই! তার জোয়ানী তার সুরত তার গান এ না হলে দুনিয়া ফাঁকা ফাঁকা ঠেকত। উজীরীও তাকে ফিরে পেতে হবে।—জরুর পেতে হবে।

গন্না ফের গান ধরলে—সুখের গান!

আকাশে চাঁদ উঠেছে—বাগিচায় ফুটেছে গুলাব। লায়লীর কাছে এসেছে মজনু। লায়লী মজনুর বুকে মুখ লুকুচ্ছে। মজনু তার মুখে চুম্বন আঁকতে চায়। চাঁদ তাদের দেখে বলে—মুঝে মজনু বনাদে সাঁইয়া, মুঝে মজনু বনা দে। গুলাবও তাই বলে—মুঝে লায়লী বনা সাঁইয়া—মুঝে লায়লী বনা দে!

রাত্রি তৃতীয় প্রহর তখন—ঘুম আসছে উমধা বেগমের।

বেগম বললে—যা রে বাঁদী যা। এবার ঘুমোব আমি।

গন্না তসলীম জানিয়ে বেরিয়ে এল। তার আস্তানা হয়েছে বাঁদীমহলে। যে ঘরে আগে আমিনা থাকত সেই ঘরে।

টলতে টলতে এসে বিছানায় বসল।

গুনগুন করে গাইতে লাগল।

এবার এস ও আমার সহেলী দুখ—কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বসো। বলো, এবার বলো—গন্না তুই এবার খালাস! তুই এবার খালাস। মর্জি খুদার—খেল নসীবের। এবার তুই খালাস।

আঠারো

আঠারো বছর পর।

গন্না বেগম খালাস পেলে। দুখ তার সহেলী হয়েও তাকে খালাস দিতে পারে নি।

বাঁদী যে, তার খালাস কোথায়?

তার দিন নেই, রাত নেই, তার দুনিয়াও নেই। তার সুখ নেই তার দুখ নেই, তার হাসি নেই—তার কান্নাও নেই। তার খালাসও নেই।

তার হয়তো খুদাও নেই।

খুদার মর্জি সে শুধু বাদশাহ শাহান শাহের জন্য। খুদার মর্জি হয়—সেই মর্জিতে দুনিয়ায় মালিকানির ফরমান যে পায় সেই হয় শাহান শাহ।

বাকি আদমীর কাছে মর্জি বাদশাহের, শাহানশাহের। তাদের নসীব খেল খেলে—বাদশাহের মর্জিতে।

বাদশাহের মর্জিতে গন্না বেগম খালাস পেলে—প্রতারক ইমাদের বেগম-শাহী থেকে। তারই মর্জিতে হল—উমধা বেগমের বাঁদী। উমধার স্বামী ইমাদ উল মুল্ক তার কবিলার বাঁদীকে করলে ভোগের সামগ্রী। সারা বুকটা তার স্পর্শের আগুনে পুড়ে পুড়ে ক্ষতের দাগে দাগে ময়ূরের পেখমের মত বিচিত্রিত হয়ে গেছে।

গন্না বললে—সুরে গেয়েই বললে—চাঁদ-খাঁ-ভাই। শুনো শুনো।

"আ অব্ কসরতে দাগে গমে খুবাঁ সে তামাম—

সফ হ্যায় সিনা মেরা জলওয়ে তায়ূসী হ্যায়।"

বুক আমার ঝাঁঝরা হয়ে গেছে চাঁদ! চাঁদ আমার মা-বাপ দুজনেই কবি ছিলেন। আমার রূপ গুণ আর কলিজার সু-তার দেখে—ডাকতেন গন্না বলে। গন্না তো বহুত সুরস সুতার বহুত নরম মিঠি আখ (ইক্ষু)। তাই ওই নাম দিলেন। আমার পোশাকী নাম আর চালু হল না। লোকে ওই গন্না নামই বাহাল রাখলে। বলল—মিঠি সু-তার সু-রস এ বেটি সত্যিই গন্না। আমি এই নামে গজল লিখলাম। আমি তামাম হিন্দোস্তানে শুধু গন্নাই। ইমাদ আমাকে স্রিফ চিবিয়ে ছিবড়ে করে দিলে।

গন্না বেগম আজমীঢ় থেকে গোয়ালিয়রের পথে এক সরাইখানায় বসে—তার বাপের মনসবদার ইকবাল খাঁর ছেলে—সেই এককালের বাচ্চা চাঁদ খাঁ সে এখন ভর্তি জোয়ান, তাকেই বলছিল। আঠারো বছর পর।

গন্না এখনও যুবতী, বয়স তার চৌত্রিশ। কিন্তু শীর্ণ তার দেহ, জীর্ণ তার জীবন; দুঃসহ জ্বালা তার মনে; না জ্বালা নয়, বেদনা। দুনিয়াই তার কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে। ইজ্জৎও তার কাছে কথার-কথা, মিথ্যে, ঝুট বাত।

ইজ্জৎ ইনসানকি। তাতে হয় কি? হায় দশ দিনের বাদশাহ আকবর আদিল শাহ

ইনসানের ইজ্জৎ রাখতে গিয়ে হল কি তোমার ? তোমার দুই চোখ গেল, শেষ গেল তোমার জান। আবদাল শাহী দুরানী ফৌজের ঘোড়ার ক্ষুরে তোমার দেহটা টুকরা টুকরা হয়ে ধুলোয় মিশে গেল, কবর পর্যন্ত হল না ; তুমি সেই বান্দা পরিচয়েই হারিয়ে গেলে—দুনিয়ার লাখো লাখো ক্রোর ক্রোর বান্দাদের মুর্দার সঙ্গে। তোমার কাছে গন্না শিখেছিল কথাটা। তারই বা কি হল দেখ ! কি হল ? বাঁদীই সে হয়ে থাকল সারা জিন্দিগী।

আর ঝুট বাতের মিথ্যে কথার কারসাজি দেখ—ফল দেখ। দেখ ইমাদ উল মুল্ক গাজি-উদ্দিনকে—। ঝুটা কথা বেইমানি কামের কি ফল দেখ, যত দানই পড়ুক তার জীবনের পাশা খেলায়—সে উল্টে দিয়ে দিয়ে চলল। শাহ আবদালী প্রথমে তাকে উজীরী দেন নি। নাম কে ওয়াস্তে—উকীল-ই-সমালক বানিয়ে, দিল্লী থেকে ফৌজ নিয়ে রওনা হলেন বল্লভগড়ের দিকে। রাজা সুজরমল—আউধিয়ার নবাব সুজার সঙ্গে মুকাবিলা করতে।

জবাহির সিং, সুরজমলের বেটা জবাহির সিং। গন্নার মনে পড়ে সেই তাদের কিল্লার বাইরে গাছের তলায় সেই নওজোয়ান ফকীরকে, হিন্দু সাধু। মাথায় জটা—কপালে তিলক—নাঙ্গা দেহখানায় জোয়ানী আর জঙ্গী তাকতের আশ্চর্য বাহার। রুস্তমের মত। তাকে সে নীলার তাবিজ দিয়েছিল। হাত আর ললাট দেখে বলেছিল—এ তো ব্রিজরানীর মত সোহাগিনী হবে !

তার মা বুঝতে পারে নি, কিন্তু তার সন্দেহ হয়েছিল—সে-ই জবাহির সিং। চিঠি ছুঁড়ত তীরে বিঁধে !

একখানা চিঠির সে বয়েৎ তার মনে আছে।

তুমি পিয়ারী ব্রিজরানী-রাধা ; আমি কানাইয়ালাল ; তোমার নাম আমার বাঁশরী—আপনি পুকার দিয়ে ওঠে। চোখ বুজলে—আমি তোমায় স্বপ্ন দেখি। জেগে থাকলে—মনে হয় দূরে তোমার পাঁয়জোর বাজছে—ঝুম-ঝুম-ঝুম।

সে কত ! মিঠা তার লেগেছিল।

ঝুট আমি বলি না চাঁদ ভাইয়া, সত্যিই সে চিঠি আমার কুমারী-মনে আশাবরীর রেশ গুনগুনিয়ে তুলেছিল। কিন্তু ভাই—সেদিন মনকে আমার শাসন করেছিলাম। ছি-ছি-ছি। দেবতার মত আকবর আদিল শাহকে ভুলে গেলি ? শরম পেয়েছিল মন !

হাঁ—সেই জবাহির সিং—দিলে লড়াই শাহ আবদালীর সঙ্গে। হিন্দোস্তানের কেউ যা দিতে পারলে না—দিলে সেই জবাহির সিং।

বহুত চালাক—ইমাদ উল মুল্ক ; সে নতুন সাদীর নয়া পিয়ারী উমধা বেগম—আর তার বহুত লালসের এই গন্নার—সঙ্গসুখ ছেড়ে দিয়ে তাদের দিল্লীতে রেখে, নিজে শাহ আবদালীর ফৌজের সঙ্গে গেল।

চাঁদ—দু মতলব। এক মতলব—শাহের পিয়ারা হবে, তাকে নিজের কিস্মৎ দেখাবে, ঝুটা-মিথ্যে মিষ্টি কথা বলে শাহকে চালমাত করে জিতে যাবে। আর জবাহির সিং সুরজমল তার দুই দুশমনকে সে ঘায়েল করে দেবে। জবাহির সিং আমাকে লুঠতে এসেছিল—চাঁদ—সেদিন তো তুমি সঙ্গে ছিলে ! সেই রাগ।

জবাহির সিং দিলে লড়াই। চৌমুহা গাঁওয়ের বাইরে আবদালশাহী বিশ হাজার পল্টনকে রুখে দাঁড়াল—জবাহির সিংয়ের দশ হাজার জাঠ সিপাহী। কামান নাই আবদালীর মত—শিভল বন্দুক নাই—তবু দাঁড়াল।

সুবা—ভোর সকাল থেকে ন' ঘড়ি বেলা তিন প্রহর পর্যন্ত সে লড়াই যারা দেখেছে—তারা বলে—তাদের কাছে শুনেছি চাঁদ, বাপ রে—সে কি লড়াই!

বারো হাজার মুর্দা পড়ে গেল চৌমুহার মাঠে।—জবাহির সিং তারপর হঠল। তখন তার সিপাহী মাত্র দু-তিন হাজার বাকি। তারা হঠল। চলে গেল। শাহের ফৌজ তাদের পিছু নিতে ভরসা পায় নি ভাই। ইমাদ উল মুল্ক দিল্লী থেকে ভারী তোপ এনে বল্লভগড় ভাঙতে চেয়েছিল। ভেঙেও ছিল। লুঠও বহুত করেছিল। শাহ আবদালী উমধার খসমের উপর বহৎ খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু জবাহির সিং কি সুরজমলকে একতিয়ারের মধ্যে পান নি।

রাগের মাথায় আর লুঠের জন্যে গিয়ে পড়েছিলেন—হিন্দুদের মথুরার উপর।

চাঁদ, সে দিন ছিল হোলিপরবের দিন।

শাহ আবদালী এসে ঝড়ের মত পড়লেন—মথুরার উপর, আর মেতে গেলেন খুন-রক্ত নিয়ে হোলি খেলার আমোদে।

জোয়ান বালবাচ্চা—বুড়া-বুড়ী বিলকুল তলোয়ারের মুখে টুকরা টুকরা করে ফেলতে হুকুম দিলেন। আর হুকুম দিলেন—যে যত মুণ্ডু আনবে এক এক কাফেরের মুণ্ডুর জন্যে পাঁচ-পাঁচ রূপেয়া। আর হুকুম দিলেন ঔরৎ—যে লুটে আনবে তার।

আর হুকুম দিলেন—আগুন জ্বালিয়ে দাও! আর হুকুম দিলেন কাফেরদের পুতুল ভেঙে টুকরো টুকরো করে দাও।

ঔরতের বেলা হিন্দু নাই মুসলমান নাই। লুঠের বেলাতেও তাই—হিন্দু নাই মুসলমান নাই। স্রিফ গর্দানের বেলায় মুসলমানকে রেহাই দিতে হুকুম হল। কিন্তু তার নমুদ চাই প্রমাণ চাই।

মুণ্ডুর পাহাড় হয়ে উঠল শাহের দরবারী তাঁবুর সামনে। পথে পথে হিন্দুদের দেবতার পাথরের মুণ্ডুগুলো পাথরের গোলাইয়ের মত গড়াগড়ি দিল।

আর কুয়োগুলো ঔরতের লাশে ভরে উঠল। ঔরৎরা ইজ্জতের ভয়ে ঝাঁপ খেলে কুয়োতে। কতক ঝাঁপ দিলে দরিয়ায়—যমুনার জলে।

আর গন্নার মত যাদের নসীব—তারা ধরা পড়ল সিপাহীদের হাতে। তাদের ওরা দড়ি দিয়ে গরু ছাগলের মত বেঁধে নিয়ে গেল। না-দিন না-রাত ছাউনির মধ্যে চলল—ঔরতের গোস্ত আর তার খুনে খানা-পিনা।

আসমান ছেয়ে গেল তাদের কান্নায় আর চীৎকারে!

—বাঁচাও। জান বাঁচাও!

চাঁদ ভাই তখন ইজ্জতের কথা আর কেউ বলে নি। বলেছিল শুধু জানের কথা। শওয়ের মধ্যে হয়তো দু-চারজন বলেছিল ইজ্জতের কথা। কিন্তু যারা 'জান বাঁচাও' বলে চীৎকার করেছিল তারা হাজারে হাজারে—তাদের চীৎকারে জানের আকুতির মধ্যে 'মানের'—ইজ্জতের' ধ্বনি ডুবে হারিয়ে গিয়েছিল। কতজন মরে গেল অত্যাচারে, কতজন পাথরে মাথা ঠুকে মরল। কতজন কোনো ফিকিরে পালিয়ে গিয়ে যমুনার পানিতে ডুবল।

যমুনার কিনারায় থাকত বৈরাগী সন্ন্যাসীরা কুঁড়ে বেঁধে। তাদের একজনও বাঁচে নি। সবার গিয়েছিল গর্দান। জবেহ করা 'গরুর মাথা' তাদের কাটা মুণ্ডুর সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল বাদাকশানি আর দুরানী সিপাহীরা। খুনে—লালে লাল হয়ে গেল পথ ঘাট, এমন কি যমুনার জল—তাও লাল হয়ে গেল। যমুনার স্রোত বন্ধ হল মরা মানুষের লাশের বাঁধে।

এরই মধ্যে ইমাদ উল মুল্ক আবদালী বাদশাহের বান্দাগিরি করে তার নিজের কাজ হাসিল করছিল।

দিল্লীতে উমধা বেগমের বাঁদী গন্না মুঘলানী বেগম আর উমধা বেগমের দিল খুশ করছিল—গজল গেয়ে, নেচে; তয়ফাওয়ালী সুরাইয়ার বেটীকে শাহ আবদালীর হুকুমতে তয়ফাওয়ালী হতে হয়েছিল।

কতবার মনে তার হয়েছে—ইজ্জৎ ইনসানের। ইমান মানুষের। সেই ইজ্জৎ যখন গেল—তখন গন্না তুই মর। তুই মর।

মরবার কত পথ। বিষ খা। ছাদের উপর থেকে ঝাঁপ খা। পাথরে মাথা ঠোক; লোহার ডাণ্ডা মাথায় মার; যমুনার পাড়ে গিয়ে লাফ দিয়ে পড় দরিয়ার পানিতে; নয় তো আগুন জ্বালিয়ে দে তোর নাচওয়ালীর পোশাকে।

চাঁদ—তা গন্না পারে নি।

কেন পারে নি, জান? মরণের ভয়ও বটে, তবু মানুষের যখন বেইজ্জতি হয় তখন মানুষ মরে। মরতে পারে। মরতে পারত গন্না।

কিন্তু তার মনে জাগল শোধ নেবার ইচ্ছা। শরাপ সিরাজী খেলেই ওই মানস তার জেগে উঠত। বুকে বড় জ্বালা হত চাঁদ খাঁ। সেই জ্বালায় মাতাল গন্না বলত, যে গন্না তার দিলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদত—তাকে বলত—কাঁদিস নে গন্না! কাঁদিস নে। তোর বে-ইজ্জৎ তুই নিজেই করেছিস—ইমাদ উল মুল্কের কথায় বিশ্বাস করে বাঁদীগিরির খত লিখে দিয়ে। এবার তার দাম আদায় কর,—সুদে আসলে। ইমাদ উল মুল্কের বুকে আগ জালিয়ে দে। আর শোধ নে—ওই 'যামণ্ডি' অহঙ্কারী দেমাকি উমধার উপর। শাহ আবদালী একদিন চলে যাবে কাবুল। সেদিন ইমাদ উল মুল্ক এই খোলস ছেড়ে নতুন জোশে ফণা তুলবে। তুই হবি বেদিয়ানী—তুই তাকে বশ মানাবি। গলায় জড়িয়ে নিবি আর ছোবল মারবি উমধার বুকে কলেজায়। ও জ্বলবে। গন্নাকে শল্লা দিত আমিনা। সে তাকে যোগাতো সিরাজী শরাপ; যখনই গন্নার মন খারাপ হত তখনই বলত—পি লেও! আর বলত—তাই কর গন্না বেগম—তাই কর। দুনিয়ায় এসে হার মেনে কেন যাবে? জিতে যাও! শোধ নাও!

গন্না বলত—আর এক পিয়ালা শরাপ দে। খুব কড়া শরাপ।

মগজ চন্‌চন্ করে উঠত—আগ জ্বলত। গন্না বলত—ঠিক বলেছিস!

চাঁদ খাঁ, ভাই, তোমার কাছে গন্না সব বলছে—সব বলবে। কিছু গোপন করবে না। গন্না মধ্যে মধ্যে ভাবত—জবাহির সিংয়ের কথা।

সারা হিন্দোস্তানে জবাহির দিয়েছে শাহ আবদালীর সঙ্গে লড়াই। এই এক মর্দানা নওজোয়ান; সাবাস মর্দানা। এ পারবে—এই ইমাদ উল মুল্ককে সাজা দিতে! মনে পড়ত তাকে। আবদালী চলে গেলে—সে-ই, সে-ই পারবে।

তার দিল গাইত—গন্না তোর কলেজার রক্তবাটা হেনার পিয়ালার মত লাল টকটকে-টলমলে হয়ে উঠেছে। কার পায়ের তলা চুম্বন করে রাঙিয়ে দিবি?

হঠাৎ থেমে গেল গন্না। সরাইখানার জানালা দিয়ে বাইরের সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে গুন্‌গুন্ করে গেয়ে উঠল—

"হায় মেরি তরাঃ, জিগ্‌র্ খুন তেরা মুদ্দৎ সে
অয় হেন্না; কিসকি তুঝে খাওহিস পাবুসী হায়!

চাঁদ খাঁ, ভাই—এ কথার জবাব আজ আমার' মিলেছে। সে জবাব কি জান? ঔরতের কলেজা ও হেনার রসের পিয়ালার মত রাঙা টক্‌টকে রক্তের পিয়ালাই বটে। কিন্তু ঔরতের নসীবই হল ওই যে, সে যতই একজন—এক মাশুক এক আজিজের পায়ে নিজেকে ঢেলে দিতে চাক—তার ইচ্ছে পূর্ণ হয় না;—কত মানুষই না জবরদস্তি তার কলেজার পিয়ালায় নিজের নিজের পা চুবিয়ে নিয়ে চলে যায়! কেউ কেউ মরে বাঁচে। কিন্তু সে কজন?

হাসলে গন্না।

গন্না ওই প্রথমেই যদি মরত—তবে মরতে পারত। যে পিয়ালায় সে আকবর আদিলের পাবুসী কদমবুচি করতে চেয়েছিল, সে যদি সেই পিয়ালা আকবর আদিলের জান আর চোখ বাঁচাতে ইমাদের পায়ে ঢেলে না দিয়ে মরত আকবর শাহের সঙ্গে, তবেই সে মরে বাঁচত।

যাক। তার আগে যা হয়েছিল তাই বলি।

আবদালী বাদশাহকে ফিরতে হল। ওই মথুরাতে যে মানুষের কলিজার খুনে হোলি সে খেললে তাই তার কাছে বিষ হয়ে উঠল।

—যমুনার পানি মানুষের রক্তে লাল হয়েছিল—লাশের গাদায় পানি থম ধরে ছিল। তখন হিন্দোস্তানে গরমীকাল আসতে শুরু করেছে। সুরয আফতাপের রোদে সে পানির রঙ হয়ে উঠল হলুদ—আর হয়ে উঠল বিষ। সেই পানি পিয়ে আফগানী সিপাহীদের মধ্যে ধরল বেমারি। হায়জা বেমারি, এ দেশে বলে ওলাউঠা! পিঁপড়ের মত মরতে লাগল। ইম্‌লি এর দাওয়াই চাঁদ খাঁ। ইমলির দর আশী রূপেয়া হয়ে গেল। পল্টন বললে—আর তারা থাকবে না—আর তারা এগুবে না। তারা ফিরবে।

আবদালী বাদশা শাহান শাহ মানুষের শির নিতে পারে, আগ জ্বালাতে পারে, পাথরের পুতলী ভাঙতে পারে, গন্না বেগমের মত ঔরতকে বাঁদী বানাতে পারে—হজরত বেগমের মত বাদশাহের বেটীকেও জবরদস্তি ছিনিয়ে সাদী করতে পারে—কিন্তু চাঁদ খাঁ, যখন খুদ 'কাল' এসে সামনে দাঁড়ায় তখন এক ভিখমাঙোয়ার মতই সে অসহায়। তার ডর্‌-কে-মারে ওকে পালাতে হয়। তাকে কামান দেগে ঘায়েল করা যায় না, তলোয়ারে কাটা যায় না—তীরে বেঁধা যায় না। সে হা-হা করে এগিয়ে আসে। সব কুছ সে গিলে খেয়ে দেয়।

পালাল শাহ আবদালী।

না-হলে, গোকুলে নাগা সন্ন্যাসীরা এক বড় ভারী লাড়াই দিয়েছিল। তারা হটে নি। শাহ আবদালী তাদের মন্দির তাদের দেবতা ছুঁতে পারে নি—তার শোধ না নিয়ে দুরানী বাদশা কখনও হিন্দোস্তান ছাড়ত না।

চলে গেল দুরানী বাদশা, হিন্দোস্তানের বাদশাহীকে ফকীরশাহী করে, সোনার হিন্দোস্তানকে কবরস্তান বানিয়ে, আঠাইশ হাজার হাতী উট ঘোড়া বয়েল গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে গেল হিন্দোস্তানের দৌলত—যার দাম, চাঁদ খাঁ, কেউ বলে 'তিশ্‌ কোড়োর', কেউ বলে তার থেকেও বেশী। আর তার সিপাহীরা যা লুটলে, তা নিয়ে গেল আশী হাজার ঘোড়া। তাদের লেজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেল হাজার হাজার ঔরত। শাহ নিজে নিয়েছিলেন বাদশাহী হারেমের দুই বেটী, তার সঙ্গে ছিল আরও ষোলজন বেগম, তার সঙ্গে চারশও বাঁদী। আর সিপাহীরা যে যেমন নিয়েছিল—কেউ দুই কেউ তিন কেউ চার। পথে যেতে যেতে যারা মরল—তাদের ফেলে দিলে পথের ধারে, অনেকজন, রাত্রের অন্ধকারে পথ থেকে পালাল।—

কিছু বনে মরল, জলে ডুবল, ভুখে মরল, জাঁনোয়ারে খেলে, ডাকাইত বদমাশের হাতে পড়ল। চাঁদ খাঁ, দিল্লী থেকে সরহিন্দ লাহোর হয়ে আটকের ঘাট পর্যন্ত পথের ধারে আজও দেখতে পাবে হাড়—হাড় আর হাড়, মানুষের মাথা—মাথা আর মাথা। আর পাবে চুল। লম্বা—ঔরতের চুল, মাটির সঙ্গে চেপ্টে লেগে আছে! তারা মরে রেহাই পেয়েছে। গন্না বেগম শ্রিফ বাঁদী হয়ে রইল। এই ভাগ্য তো হিন্দোস্তানে থেকে আর কারুর হয় নি চাঁদ খাঁ। হয়েছে এক গন্না বেগমের। উমধা তার বিক্রীর খত নিয়ে তাকে দেখিয়ে শাসায়—তাকে নাচায় আর গান শোনে। তাকে তার পা পর্যন্ত টেপায় চাঁদ! কিন্তু দিন পাল্টাল। শাহ আবদালী চলে গেল কাবুল, ইমাদ ফিরল দিল্লী। সেও ফিরল লুটের মাল নিয়ে। মাথা উঁচু করে, মাথার তার শিরপেঁচের সামনে হীরা বসানো পালক উড়িয়ে আর হাতে উজীর উল মুল্কের সনদ। জিতেছে ইমাদ উল মুল্ক—শাহ আবদালী তাকে ফের উজীর করেছেন।

তাজ্জব। তাজ্জব চাঁদ খাঁ! ইমাদকে নসীব হারাতে পারে না খেলায়। সে-ই খেলা করে নসীবকে নিয়ে।

আর সেইদিন এসেই চাঁদ খাঁ, ইমাদ উল মুল্ক সকলকে দিলে বকশিশ ইনাম। হাবেলীর ফটকে নহবৎ বসে গেল।

আমাকে ডাকলে—গন্না!

আমিনা আমাকে ইশারা দিলে—বেগম, এইবার সময় এসেছে।

আমি ভাবছিলাম চাঁদ—যে আমি আমিনার কথা শুনব না—জহর নেই—আমি যাব—গিয়ে ইমাদ উল মুল্কের কোমরবন্ধের ছোরা নিয়ে মর যাউঙ্গী—বলে যাব—মর্জি খোদাকি—খেল নসীবকা—ইজ্জৎ ইনসানকি। আমার ইজ্জৎ নিয়ে আমি চললাম।

আমিনা কড়া শরাব পিয়ালা ভরে ধরলে সামনে—পি লেনা।

শরাব খেয়ে গন্না দুসরা গন্না হল। গিয়ে দাঁড়াল—ইমাদের সামনে।

ইমাদ গলার মুক্তোর মালা খুলে বললে—বিলকুল আগের কথা ভুলে যাও গন্না। সে-সব যা করেছি আমি আবদালীর ভয়ে করেছি। উপায় ছিল না। এখন ভুলে যাও। ইনাম নাও।

আমি বললাম—না। ও নেব না।

খুস মেজাজ ইমাদের তখন। সে বললে—কি নেবে তবে?

ঘাড় বেঁকিয়ে বললাম—তোমার কলিজা। তোমার কলিজায় আমাকে টেনে নাও—আর নাও—উমধার সামনে!

অবাক হয়ে উজীর তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

আমি চট্ করে চলে গিয়ে সিরাজীর পিয়ালা এনে বললাম—পি লেও।

—শরাব?

—উঁহু—সিরাজী!

—কি বলছ তুমি?

—আরে পিয়ার—আলমগীর গাজী হীরাবাঈয়ের হাতে তোলা সিরাজী ফেলে দেয় নি। তুমি খাও—প্রমাণ কর কি—তুমি যা করেছ—আবদালীর ভয়ে। দিল থেকে নয়। না হলে বুঝব—

ইমাদ লোভী; শরাব সিরাজীর উপর লোভ তার ছিল—সে ঠোঁটে ঠেকিয়ে একটুক্ষণও প্রতীক্ষা করে নি—হীরাবাঈয়ের মত পিয়ালা আমি টেনে নেব—বলব—না খেতে তোমাকে হবে না—আমি পরখ করছিলাম। সে চুমুক দিয়ে সুরা পেয়ালা শেষ করে ফেলে—আমাকে

বুকে টেনে নিয়েছিল চাঁদ।

বহুত পিয়ার করেছিল। আমি বাধা দিই নি। আত্মসমর্পণ করেছিলাম। তয়ফাওয়ালীর বেটী তয়ফাওয়ালীর মত। কিংবা যে-সব ঔরৎকে দুরানী সিপাহীরা নিয়ে গিয়েছিল আফ-গানেস্তান—তাদের মত। তাদের মধ্যে কেঁদে কেঁদে দিন কাটিয়েছে অনেক মেয়ে, কিন্তু চাঁদ খাঁ—বেশির ভাগ মেয়েই সব ভুলেছে—তারপর খেয়েছে দেয়েছে—হেসেছে গেয়েছে। আবার আমার মত দু-একজন হয়তো তাদের ঘরে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, পুড়িয়ে ছাইও করেছে। গন্নাও তাই করতে চেয়েছিল চাঁদ। চেয়েছিল—উমধার উপর শোধ নিতে, ইমাদের উপর শোধ নিতে! উমধার উপর শোধ তার সেই রোজই উঠে গেল। ইমাদ শরাব সিরাজী খেলে—গিলাসের পর গিলাস। রাতে সে মৌজ করে গানা শুনলে—আমি শোনালাম; সে আমাকে উমধার সামনে ছাতির উপর টেনে নিয়ে বললে—দেখ্ সৈয়দের বেটী, দেখ! আবদালী এখন আটক পার হয়ে গেল। এখন কি করবি বল!

উমধা কিন্তু সৈয়দের বেটী বটে—আর তেজী মেয়ে বটে, সে কিছু বললে না,—তার চোখ দুটো দপ্ দপ্ করে জ্বলতে লাগল। তারপর চলে গেল ঘর ছেড়ে। আর এল না। মনটা আমার কেমন হয়ে গেল। মনে হল হারলাম। কিন্তু আমিনা এসে বললে—উমধা বেগম তার কামরায় উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। তখন দিল্ খুশ হল। মনে হল জিত্‌লাম।

ইমাদের উপরও শোধ নিলাম চাঁদ। তাকে পিয়ার দেখালাম মুখে। আর তাকে শলাহ দিতে লাগলাম। ইমাদ উল মুল্ককে আবদালী শাহ বলেছিল—"ইমাদ হুঁশিয়ার মামলাবাজ! সে শলাহ কারু নেয় না—সে সিধা পথে চলে না, সচ্ বাত বলে না। আর এমন কাজ সে করে না—যে কাজ সাফা যে কাজ সাচ্চা।"

রোহিলা নবাব নাজিবউদ্দৌলা মীর বকসী সিপাহী-সালার, সে ইমাদের দুশমন; বাদশাহ আলমগীর সানি ইমাদকে পছন্দ করে না; সমস্ত বাদশাহী দরবারে ইমাদ একরকম একা। আমি হলাম সেই ইমাদের শলাহ-কার।

আবদালশাহীর ছাপ—একতিয়ার মুছে দিতে তার ইচ্ছে। আমি তাতে দিলাম হাওয়া। বললাম—দাও—বিলকুল মুছে দাও।

মুছে দিলে—উমধা একেবারে ধুলোয় লুটোবে। মুঘলানীর বেটী সে—মাম্মুর লেড়কী—আমাকে বলত তয়ফাওয়ালীর বেটী। ঘেন্না করে বলত। তার মা মুঘলানী—তয়ফাওয়ালী নয়, কিন্তু তার গুণার পাপের শেষ নেই। তামাম হিন্দোস্তান জানে—বলে। তবু সে আমাকে ওই বাত বলত। তার জোর আবদালী। আবদালীর আদমী নাজিবউদ্দৌলা, আবদালীর মেহমান আলমগীর সানি। আমি ইমাদকে শলাহ দিলাম—এই দুইকে শেষ করো।

আমি দিতাম ইমাদকে শলাহ। আমাকে শলাহ দিত আমিনা।

ইমাদ সেই শলাহ মেনে নিয়ে মারাঠা হিন্দুদের ডাকলে। নাজিবকে হঠাও!

মারাঠা এল। ফের শুরু হল দিল্লীতে লড়াই। কিন্তু—।—একটু স্তব্ধ থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে গন্না। তারপর হেসে বললে—আমি কি জানতাম চাঁদ খাঁ যে আমি নিজেই পাতছি আমার মরণের ফাঁদ! আমিই পড়ব ধরা আমার পাতা ফাঁদে! খেল নসীবকিই বটে চাঁদ, ও কথা ঝুট নয়! সেই কথা ভাবি। আজ ভাবি চাঁদ খাঁ। ভাবি কেন এ কাজ আমি করেছিলাম? এ কাজ করার আমার কথা নয়—তবু কেন

করলাম, কে করতে বললে তা ভেবে পাই না।

সেদিন চাঁদ খাঁ—শাওন মাস। দিল্লীতে তখনও বর্ষা নামে নি। ধুলো উড়ছে আকাশে আর মাটি পুড়ে ঝাঁঝরা হয়েছে—পাথর ভেঙে ফেটে চিড় খাচ্ছে। মারাঠারা খিজিরাবাদ এসে পৌঁছে গেছে। বাদশা আলমগীর সানি নবাব নাজিবউদ্দৌলা একজোট হয়েছেন ইমাদের বিরুদ্ধে। ইমাদ তখন দিল্লীতে একা। মারাঠা এলে সে হবে উজীর উল মুল্ক থেকে মালেক-ই-মুল্ক। বাদশাহের বাদশা। নাজির যাবে, বাদশাহ যাবে, তার সঙ্গে উমধার দেমাক গুমর একদম মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

আমিনা খুব হুঁশিয়ার, খুব চালাক, দু পুরুষ উজীর-উল-মুল্কের বাড়িতে সে আজীবন বাঁদী; অনেক হাতে নাজেহাল যেমন সে হয়েছে—তেমনি সে শিখেছে অনেক—বুঝেছে অনেক। সে বলে—আরও দূর তাকিয়ে দেখ গন্না বেগম—আরও দূরে তাকাও। দেখ, দিল্লী আসবে ইমাদের হাতে। মারাঠারা তারই জিম্মাদারিতে দেবে দিল্লী। তারপর ছুটবে উত্তর-পশ্চিমে লাহোর পর্যন্ত। লাহোরে শাহের বেটা তিমুর শাহকে জাহান খাঁকে খেদিয়ে দেবে।

আমিনা বললে—তারপর—ঠিক শাহ আবার আসবে। এবার ইমাদের রক্ষা থাকবে না। তুমি দেখো।

চাঁদ খাঁ—আমি সত্যিই যেন নেশার মধ্যে তাই দেখছিলাম। বাইরে তখন দু তরফে কামান দাগছিল। এক তরফে বারগীররা এক তরফে নাজিবউদ্দৌলা। ইমাদ-উল-মুল্ক চলে গেছে বারগীরদের ছাউনিতে। তার ভয় ছিল—তাকে পেলে—মারাঠারা দিল্লীতে ঢুকবার আগেই নাজিব খাঁ তাকে হয়তো খতম্ করে দিয়ে যাবে।

উমধা বেগম—তার কামরার মধ্যে চুপচাপ বসেছিল। কি করবে সে!

হঠাৎ—বাইরে উঠল হল্লা। একদম উজীরের হাবেলীর বাগিচাতে। মনে হল ফটকের মুখে!

কি হল? ছুটে গেল আমিনা। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে,—নাজির খাঁ সিপাহীদের হুকুম দিয়েছে—'লুঠ লো উজীরের হাবেলী। উজীরকে পেলে কোত্‌ল করো। না পেলে—উজীরের হাবেলী লুঠো—আর তার হারেমের তামাম ঔরৎকে টেনে বের কর একদম পথের উপর। বে-ইজ্জতি করো, উতর দেও বুরখা!—সৈয়দের বেটী উমধা বেগমকে—সবার আগে।'

নাজির খাঁর রাগ উমধার উপর পড়ল কেন জান—চাঁদ খাঁ? উমধার জন্যেই ইমাদ শাহ আবদালীর গোসা থেকে বেঁচে গেছে। উমধা বেগমের জন্যেই শাহ আবদালী তাকে নেক-নজরে দেখেছেন। তার উজীরী কেড়ে নিয়েও ফের তাকেই উজীরী দিয়েছেন। তা ছাড়া ইমাদ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে থাকে থাক—তার ইজ্জৎ আছে তার বেগমের বুর্খায়—তার বুর্খা ছিঁড়ে দিল্লীর পথে তাকে লুটিয়ে দিয়ে যাবে।

মারাঠা আসছে। ঢুকল বলে শাহজাহানাবাদ। নাজির খাঁ চলে যাবে দিল্লী ছেড়ে; তার আগে সে শোধ নিয়ে যাবে।

ইমাদের ফৌজ ছিল না। ছিল সামান্য, কিছু মাত্র শ' ছয়েক সিপাহী। তারা কি করবে? নাজির খাঁর সিপাহীরা কমসে-কম তিন হাজার—তাদের মনসবদার কুতব শাহ। কুতব শাহ শুধু মনসবদার নয়, সে মোল্লাও বটে, অনেকে বলে—জিন্দাপীরের সে খাদিম। সকলের আগে কুতব শাহ হাবেলীর হাতার মধ্যে ঢুকে হাঁকলে—নিকাল নিয়ে আয়—উজীরের বেগম

আর বাঁদীদের। চাঁদ খাঁ, তুমি সিপাহী। তুমি লড়াই কর। তুমি জান—এই হুকুম পেলে সিপাহীরা কি করে? দরওয়াজা ভেঙে পড়ল—হল্লা করে ঢুকল তারা ভুখা-নেকড়ার মত, চলতে লাগল লুঠ আর তার সঙ্গে—

বিচিত্রা হেসে গন্না বললে—বাঁদী মহলে চীৎকার উঠল।

যে চীৎকার উঠত দিল্লীতে আবদালশাহী ছাউনিতে, দিল্লী লুঠের সময়। গন্না বেগম দাঁড়িয়ে ভাবছিল। হঠাৎ তার খেয়াল হল—উমধা কি করছে—তাই দেখতে!

দেখলাম চাঁদ—সৈয়দের বেটীর মুখ হয়ে গেছে সাদা কাগজের মত। হাতে ধরে রেখেছে একটা ছোরা।

বললাম—কি করবে?

উমধা বললে—আপনার কলেজায় বিঁধে দেব। মরব।

—পারবে?

সে আমার মুখের দিকে তাকালে। আমি বললাম—উমধা বেগম—তা পারলে এতক্ষণ তা করতে। তা যখন পার নি তখন আর পারবে না। আবদালী বাদশাহকে সাদী করব না—জওহর খাব—বলে চীৎকার করেছিল হজরত বেগম, তার মায়েরাও বলেছিল—আমরা জওহর খাওয়াব। কিন্তু পারে নি!

হল কি জান চাঁদ খাঁ। সে কেঁপে উঠল—হাত থেকে ছোরাটা পড়ে গেল—আর দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল উমধা বেগম।

আমিনা ছুটে এল। কুতুব শা আসছে। বেগমকে খুঁজছে সে।

এবার ফুঁপিয়ে নয় চাঁদ খাঁ—ককিয়ে কেঁদে উঠল উমধা! ছোট বাচ্চার মত। অয় আল্লা—বাঁচাও মুঝে বাঁচাও—আমার ইজ্জৎ—

চাঁদ—আমার কি হয়ে গেল। কি হয়ে গেল তা বলতে পারব না—চাঁদ। কিন্তু আমি যা করলাম তা—কেন করলাম—কে করতে বললে—তা আমি জানি। খুদার হুকুম শুনলাম আমি। চাঁদ, মনে পড়ে গেল আকবর আদিল শা—অন্ধা হয়েও ছুটে এসে একা রুখতে গিয়েছিল—আবদালশাহী ফৌজকে। এক লহমায় শির গেল—তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেল তার শরীরটা।

আমি উমধাকে বললাম—ভয় নেই উমধা। যাও জলদি যাও। ও কামরায় গিয়ে খুলে ফেল হীরা জহরত—ওই দামী ওড়না ফেলে দাও, তোমার চুল উস্কোখুস্কো করো। তুমি উমধা নও। তুমি উমধা বেগমের বাঁদী। আমি উমধা—। যাও! যাও! তার ওড়নাখানা টেনে নিয়ে আমি দাঁড়ালাম চাঁদ খাঁ কামরার দরওয়াজায়। আর করলাম কি জান? আদিল শাহের দেওয়া সেই তাবিজ উমধার হাতে আমি পরিয়ে দিলাম। আমি জানি, আবদালশাহের সিপাহীরা বেইজ্জতি করতে পারে নি এই তাবিজের জন্তে।

আমিনা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি বলতে গেল সে—কিন্তু আমি বললাম—চুপ, আমিনা, চুপ।

পায়ের সাড়া নগিচে, আমি বুরখার ঢাকাটা ফেলে দিলাম। হাতে উমধার ছোরাটাও তুলে নিলাম।

কুতব শা সিঁড়ির মাথায় উঠতেই বললাম, রুখ্, যাও। নেহি তো—। বুরখার মুখের ঢাকা তুলে ছোরাটা দেখিয়ে বললাম—ছোরা দিয়ে তোমাকে মারব, না পারি নিজের কলেজায় বসাব! রুখ্, যাও।

চাঁদ খাঁ, ঔরতের সুরত আকাশের চাঁদের রোশনির চেয়েও সুন্দর! সিরাজীর নেশার চেয়েও বেশী বিহ্বল করে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কুতব শা থমকে গেল। আমি বললাম—আপনি কুতব শা, মনসবদার!

—হ্যাঁ।

—আমি উজীর উল মুল্কের বেগম—উমধা বেগম। কি চান আপনি?

—চাই? হেসে উঠল কুতব শা। তারপর বললে—দুশমনের কিল্লা ফতে করে সিপাহী মনসবদার যা চায় তাই চাই। সোনা-রূপা-হীরা-জহরত—আর তার কবিলা—তার বেগমকেও চাই। উজীর শয়তান। কাফিরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিল্লীকে সে বিকিয়ে দিলে। সিপাহীরা তলব পায় নি। ইজ্জৎ যাচ্ছে—তার বদলা নিয়ে তবে যাবে।

—শোন মনসবদার—। তুমি হীরা জহরত সোনা রূপা যা নেবে নাও। কিন্তু তুমি হারেমের ঔরতের বেইজ্জতি করো না। সিপাহীদের বলো—ওদের ছেড়ে দিতে।—তার বদলে—

—কি?

—তার বদলে আমার ইজ্জৎ তোমাকে মুখ দেখিয়ে তো গিয়েছেই, যেটুকু আছে—তাও দেব। খুদার নামে বল—আমার বাঁদীদের ছেড়ে দেবে!

অবাক আশ্চর্য হয়ে গেল—কুতব শা।

চাঁদ খাঁ।—সেদিন উমধাকে আমি বাঁচিয়েছিলাম। আমার বাত ছেড়ে দাও চাঁদ খাঁ। আকবর আদিলের একটা চোখের বদলে আমি নিজেকে বিক্রী করার সঙ্গে ইজ্জৎও বেচেছিলাম।

হাসলে গন্না বেগম। বললে—কিন্তু তার দাম মেলে নি। এবার দাম পেয়েছিলাম। উমধা বেঁচেছিল। বাঁদীগুলোর উপরও আর জুলুম হয় নি।

কুতব শাহ। তাদের সকলকে নিয়ে আমাকে সুদ্ধ বের করে দিয়েছিল—পথের উপর।

দিল্লীর ধুলোর উপর দাঁড়িয়েছিল—ইমাদ উল মুল্কের হারেমের জেনানীরা। বোরখা সবার মাথাতেই ছিল, ছিল না শুধু আমার মাথায়। আমি কেমন হয়ে গিয়েছিলাম চাঁদ খাঁ। শরম-ইজ্জৎ ধনদৌলত কোন কিছুর কোন দাম আমার কাছে ছিল না। ছোট হয়ে গিয়েছিল—আমি হয়েছিলাম—ওসবের চেয়ে অনেক উঁচু। খেয়াল আমার ছিল না চাঁদ যে—আমার পোশাক-আশাক চুল—চোখের কাজল সুরমা—সব কিছুর রঙ যেন ঘষে বেবাক্ বদরঙ্গা করে দিয়েছিল।

*   *   *

সেদিন আবিকৎ খাঁ কাশ্মিরীর ভাই—সয়ফুদ্দিন মহম্মদ—পথ থেকে আমাদের এনে তুলেছিল—রাজা নাগরমলের খালি হাবেলীতে। রাজা নাগরমল বাদশাহের দেওয়ান-ই-খালসা, সে পালিয়েছিল অনেক দিন আগে, তখনও ফেরে নি। হাবেলী খালি পড়েছিল।

পথে সেদিন আমি পেয়েছিলাম আমার জিন্দিগীর পুরা দাম, শ্রেষ্ঠ বকশিশ।

সয়ফুদ্দিন মহম্মদ আমাদের পথের ধারে একটা গাছের তলায় বসিয়ে কজন সিপাহীকে পাঠিয়েছিল—ডুলি আর বয়েল গাড়ি আনতে। উজীর হারেমের ঔরতের যে বেইজ্জতি হয়েছে—হয়েছে,—এর উপর বাজারের পথ দিয়ে পয়দলে হাজার হাজার লোকের নজরের উপর দিয়ে

নিয়ে যাবে না। আমরা বসে ছিলাম—সেই শাওন মাসের দুপহর বেলায়—গাছের ছায়ায়। দিল্লীর পথঘাট ময়দানে তখনও তামা পিতল কাঁসার ভাঙা বর্তন ছড়িয়ে পড়ে আছে—ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো তখনও লেগে আছে গাছের ডালে, সোনা রূপার টুকরা এও পড়ে আছে। সিপাহীরা দিল্লী লুঠেছে, সেই লুঠের মালের দু-চার টুকরো ছোট সোনা রূপা—আর ফেলে দেওয়া টুটা-ফুটা বর্তন পড়ে আছে। খসে পড়া দু-চার হীরা জহরত, তাও হয়তো পড়ে ছিল। চাঁদ খাঁ আমি আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিলাম। হঠাৎ অল্প মাটির তলা থেকে পেলাম—এক অঙ্গুশতরী। আংটি। পেলাম, হাতে তুলে নিয়ে দেখলাম। তামা কি পিতল কি রূপার আংটি হবে। ছোট বাচ্চার খেয়ালের মত খেয়ালের ঝোঁকে—তাকে হাত দিয়ে ঘষছিলাম।

হঠাৎ চমকে উঠলাম চাঁদ খাঁ। আংটির মাথায় পাথর ছিল না, মাজা—সীল আংটি, তার উপর মিনায় কি যেন লেখা। ভাল করে ঘষলাম। পড়লাম—আমার চোখের সামনে তামাম দুনিয়া আলো হয়ে গেল। সে কি আলো, চাঁদ খাঁ, সে কি আলো! আমি আংটিটা আঙুলে পরলাম। চোখ জলে ভরে গেল। বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল; আমার দিল থেকে আপনি আওয়াজ বেরিয়ে এল—খুদা মেহেরবান! তারপর কিছু মনে নেই চাঁদ খাঁ। আমি হুঁশ হারালাম, আমার মনে হল, জলুসের দুনিয়ায় আমি হারিয়ে গেলাম। যখন হুঁশ হল—চাঁদ খাঁ—তখন—আমি রাজা নাগরমলের হাবেলীতে শুয়ে আছি। আমার পাশে বসে হাওয়া দিচ্ছে—আমিনা।

এই দেখ সে আংটি, চাঁদ খাঁ। এ আজ এই আঠারো বছর লুকিয়ে রেখেছি। এই আসবার সময় আঙুলে পরেছি।

আংটি পরা আঙুলটা বাড়িয়ে দিল গন্না বেগম।

সোনার আংটি—মীনা করা, তার উপর লেখা—; চাঁদ খাঁ পড়ল—'আকবর আদিল'।

আকবর আদিলের দেহটা আবদালশাহী ঘোড়ার ক্ষুরে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল এর খানিকটা সামনেই, শাহী সড়কের উপর। সেখান থেকে কোন্ বিচিত্র পথে এখানে এসে মাটির তলায় গন্নার প্রতীক্ষায় ছিল—সে বলতে পারেন যিনি দিনের মালিক দুনিয়ার মালিক, দিন দুনিয়ার সকল অঘটন—সকল রহস্যের মালিক, তিনি। আদিল শাহের দেওয়া দোয়াগঞ্জল আরশের তাবিজ আমি উমধাকে দিয়ে ফকির হয়েছিলাম, এই অঙ্গুশতরী পেয়ে আবার আমি আমীর হয়ে গেলাম।

* * *

তারপর চাঁদ খাঁ—

মনে আর আমার গোস্‌সা থাকে নি উমধার উপর। ইমাদের উপর—না, তাও না।

ইমাদ শয়তান। চাঁদ খাঁ, তার মধ্যে ইমান নেই, রহম নেই, দর্দ নেই নিমকহালালি নেই;—দয়া মায়া কৃতজ্ঞতা সত্য—এ সবের কিছু নেই। কিছু নেই, আছে শুধু সে নিজে আর আছে তার ভুখ্। দুনিয়ার কিসে ভুখ্ নেই তার। আর তার সে-ভুখ্ কখনও মেটে না।

বলেছি তো তার ভুখের আগুনে আমি জলে পুড়ে গেছি। বুকখানা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। ঔরতের ভুখা নওজোয়ানিতে জোয়ানের থাকে,—জোয়ানিরও থাকে। হয়তো আদমী আর ঔরতের সারা জিন্দিগীই থাকে। কিন্তু তাদের ভুখ্ শুধু রক্ত আর মাংসের নয়, তারা তার সঙ্গে প্রেমের মধুও চায়। কিন্তু ইমাদ তা চায় নি—কারু কাছে চায় নি।

ইমাদ—আমার জিন্দিগীর সব মধু কেমন করে শুষতে চেয়েছে জান? তলোয়ারের মুখে খুঁচে যৌবনকে রক্তাক্ত করে সে রক্ত তলোয়ারের মুখেই শুষেছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে গন্না। তারপর গুনগুন করে গাইলে—

"এওয়াজ দর্দ মজেসে ওয়া বাহেরে হ্যায় সারে—
জিস লবে জখমনে সমশিরি তেরি চুষি হ্যায়।"

সে আমার 'মুদ্দই', আমার শত্রু, জালিয়াতি করে শুধু নালিশই করে গেল আমার উপর।

* * *

আমার, চাঁদ খাঁ, জীবনে আগুনই জ্বলল। আমার যৌবনের মধুর তৃষ্ণা ভুখা সে মিটল না! এক নওজোয়ান—যে দেবে মহব্বতি—যে দেবে মাশুকী—তাকে কামনাই করলাম, তাকে পেলাম না।

ইমাদেয় কথা জান। হিন্দোস্তানে কে-ই বা না জানে। তার সেই হারের পালার দান ওল্টানোর কেরামতি আজ বিলকুল বরবাদ হয়ে গিয়েছে।

নাজিব খাঁ পালাল। মারাঠা এল। আমিনা যা বলেছিল তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। লাহোর পর্যন্ত মারাঠা ফৌজ নিয়ে পেশবার ভাই রঘুনাথজী তিমুর শাহ আর জেহান খাঁকে তাড়িয়ে দিলে—আটক পার করে।

কাফির মারাঠার তাঁবেদারিতে ইমাদ হল বাদশারও মালিক। তখন কি যে জুলুম আর জবরদস্তি আমার উপর চালিয়েছিল ইমাদ সে তোমাকে বলতে পারব না।

. সময় সময় মনে হত জওহর খাইয়ে মেরে ফেলি শয়তানকে। নয় নিজে জওহর খাই। উমধা বেগম কাঁদত। তারই জন্যে পারি নি। আর পারি নি ওই মাটির নিচে কুড়িয়ে পাওয়া আকবর আদিলের আংটির জন্যে। আংটি বলত আমাকে—সয়ে যা গন্না। সয়ে যা।

সেলাম—বহুত বহুত তসলিমাত আকবর আদিল শাকে, তিনি আমার গুরু—খুদার খাদিম হজরত পীর। তাঁকে একসময় বলেছিলাম আমার মাশুক, আমার আজিজ। কিন্তু না চাঁদ খাঁ—আমার নসীব ভাল যে তাঁকে জীবনে পাই নি। তা হলে হয়তো উল্টোদিক থেকে জ্বলতাম—চাঁদ! যে মানুষ জীবনে শুধু খুদাকে চায়—তার ইজ্জৎ আর ধর্মই বড়, সে কখনও মানুষকে চায় না। স্ত্রী না পুত্র না—কাউকে না। আকবর আদিল আমাকে চাইত না। ইমাদ তলোয়ারে খুঁচে খুঁচে তার মুখ দিয়ে আমার সুরত আর জোয়ানীর রস আর যৌবনের রক্ত চুষেছে—আকবর আদিল আমাকে কুরবানি করত ধর্ম আর ঈশ্বরের দরবারে। আকবর আদিল আমার গুরু, আমার হজরত। তার সেই আংটি কথা বলত চাঁদ।

একটু চুপ করে থেকে গন্না আবার বললে, কি সে তাজ্জবের বাত চাঁদ—না বললে বুঝতে পারবে না। মারাঠারা লাহোর দখল করেছে, দিল্লী থেকে নাজির খাঁকে তাড়িয়েছে—এ খবর শাহ্ আবদালী শুনে এবার আবার রওনা হল কাবুল থেকে। এবার এল অনেক আয়োজন করে। ওদিকে দক্ষিণ থেকে মারাঠারাও সাজতে লাগল।

শয়তান ইমাদ দেখলে বিপদ। সে, আলমগীর সানি বৃদ্ধ অক্ষম বাদশাকে খুন করলে ফিরোজ শা কোটলায় নিয়ে গিয়ে। কারণ আলমগীর সানি শাহ আবদালীর মেহমান। তারপর খুন করলে ইন্তিজামউদ্দৌলাকে; ইমাদের চাচেরা ভাই, সেও ইমাদের দুশমন। তারপর নিজের হারেম আর চার-পাঁচ হাজার সিপাহী নিয়ে দিল্লী থেকে সরে পড়ল। যাবে কোথায়? ফারাকাবাদের এলাকা। সেখান থেকে জাঠ সুরজমলের সঙ্গে দোস্তি করে তার এলাকায়।

শয়তান না হলে এ কেউ পারে চাঁদ খাঁ? গেলবার বল্লভগড় ধ্বংস করেছিলেন শাহ আবদালী, তখন তার ডান হাত হয়েছিল ইমাদ উল মুল্ক। এর জন্যেই বেশী খুশী হয়ে শাহ

আবদালী তাকে ফের উজীর করেছিলেন।

সুরজমলের ইলাকায় রইল। সে এবার সুরজমলের হয়ে লড়বে। সুরজমলকে বললে—চুপ করে বসে থাক রাজা, করুক লড়াই মারাঠা আর আফগান, দুই হবে বরবাদ। তখন তুমি আর আমি হব হিন্দোস্তানের মালেক।

এই সময় চাঁদ খাঁ, জবাহির সিং—যে জবাহির সিং আমার জন্যে পাগল হয়েছিল, সে আবার নিশান পাঠাতে লাগল। আমি দু-চারবার জবাব দিয়েছি—গজল লিখেও পাঠিয়েছি! কিন্তু চাঁদ খাঁ এই আংটি আমাকে শাসাতে লাগল। গজল লিখে নিশান দিখি, আঙুলের ওই আংটি আমাকে শাসায়।

"ইমাদের পাপ ইমাদের, সে ভোগ করবে তার ফল। তুমি—গন্না বেগম, তুমি তা ক'রো না। জীবনের দুর্ভোগ কষ্টের ইনাম খুদা খোদ তোমাকে বকশিশ করবেন। বরবাদ করো না গন্না, তুমি তা বরবাদ করো না।"

পারি নি, চাঁদ খাঁ, আর আমি পারি নি—চুপ হয়ে গিয়েছিলাম নিজেই! জবাহির সিং নওজয়ান শেরের মত দুর্দান্ত কিন্তু তার বাপ সুরজমল শেরের শের; সে বেঁচে। লড়াই করবার শলাহ করছে সে ইমাদের সঙ্গে। তার ভয়ে জবাহির কিছু করতে পারে নি। চুপ করে গিয়েছিল।

ওদিকে পানিপথে মারাঠার সঙ্গে শাহ আবদালীর লড়াই হয়ে গেল। হিন্দোস্তানের তামাম মুসলমান—সে নবাব সুজাউদ্দৌলা পর্যন্ত যোগ দিলে আবদালীর সঙ্গে কিন্তু মারাঠাদের সঙ্গে কোন হিন্দু যোগ দিলে না। রাজপুত রাজারা না, জাঠ সুরজমল না, কেউ না।

তবু সে লড়াই নাকি—এমন লড়াই—যা হিন্দোস্তানে কখনও হয় নি। মারাঠা একদম ধ্বংস হয়ে গেল। আবদালী জিতল। কিন্তু সে জেতাও হারের সামিল। জখম্ হয়ে গেল সারে জিন্দিগীর মত।

লড়াই শেষ হল—ইমাদ তখন বের হল। ধূর্ত ইমাদ চতুর ইমাদ! জাঠ সুরজমলের ফৌজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বসে আছে। আবদালী পিছু ফিরলেই সে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। আবদালীও চালাক। উজীরী শাহ আবদালী ফের তাকেই দিয়ে চলে গেলেন কাবুল। সেই একদিন চাঁদ খাঁ। আমার জিন্দিগীর একটা দুর্যোগের রাত।

গন্না মুখে আউড়ে গেল তার গজল—

এওয়াজ দর্দ মজেসে ওয়া বাহেরে হ্যায় সারে—
জিস্ লবে জখ্‌মনে সমশেরি তেরি চুমি হ্যায়।

সেদিন শেষ রাতে ইমাদ কড়া আরক আর সিরাজী খেয়ে বেহোঁশ হয়ে গিয়েছিল। আমি তার ছোরাখানা বের করে নিতে গেলাম—কিন্তু চাঁদ—ওই আংটি আমাকে বললে—"না—গন্না, না। ছিঃ। সয়ে যা—গন্না সয়ে যা।"

ছোরাখানা ফেলে দিয়েছিলাম চাঁদ খাঁ—কিন্তু মনে মনে খুদার কাছে নালিশ করেছিলাম, হায় খুদা—আল্লাহ্‌তয়লা—মেহেরবান—বিচারক তোমার কাছে নালিশের আর্জি আমার এই জীবন। এ আর্জি দুনিয়ার সমস্ত ঔরতের। আমার হজরত আমার পীর বলেছে—মর্জি খোদাকি, খেল নসীবকা। কিন্তু এয় খুদা—কেন তোমার এই মর্জি—কেন নসীব দুনিয়াভোর ঔরৎকে নিয়ে এই খেলা খেলে। মরদ তার গায়ের জোরে তাকে লুঠে নেয়—ছিনিয়ে নেয়—তার সমশেরির মুখে তার জিন্দিগীকে রক্তাক্ত করে রক্ত চুষে নেয়—মধুর বদলে। কেন?

কান পেতে শোন মালিক—তারা কাঁদছে। গন্নার কান্নার মধ্যে সে তাকে জবান দিয়েছে। শোন তুমি!

*　　　　*　　　　*

আরও একবার চাঁদ খাঁ—জবাহিরের সঙ্গে আমার নিশান চালাচালি হয়েছিল। এর চার-পাঁচ বছর পর। তখন ইমাদের শয়তানি জাদু খুদার মর্জিতে ভেঙে গেছে। দেউলে হয়ে গেছে ইমাদ।

আলমগীর সানির বড় ছেলে শাহজাদা আলি গওহর বাদশা হলেন—শাহ আলম। বাপের হত্যাকারীকে শাহ আলম ক্ষমা করেন নি। ইমাদও তাকে হঠাবার জন্যে কম করে নি। অনেক করেছে! দিল্লীতে ঢুকে মসনদে বসতেই দেয় নি। কিন্তু নসীবকে নিয়ে খেলার খেলোয়াড় ইমাদের দান বদলাল। এল হারের পালা! ফিরিঙ্গী ইংরেজের আর মারাঠার সাহায্য নিয়ে শাহ আলম—ভাঙা বাদশাহীর হাটে এসে নড়বড়ে তক্তের উপর বসলেন—ইমাদকে পালাতে হল। পালিয়ে এল ইমাদ সেই ভরতপুর। জাঠ রাজার কাছে। এবার জাঠরাজা সুরজমল নেই—সে মরেছে। তার ছেলে—পাগলা শের জবাহির সিং জাঠ—এবার রাজা।

জবাহির সিং ইমাদকে ঠাঁই দিলে—ভরতপুরে—তাতে তার মতলবের বারো আনা ছিল—গন্নাকে ছিনিয়ে নেওয়া।

বুঝতে পেরেছিল ইমাদ। সে ফারাক্কাবাদের নবাবকে লিখে তার ফৌজ আনিয়ে—ভরতপুর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এবার আমি সায় দিয়েছিলাম—চাঁদ খাঁ। বুঝতে পেরেছিল ইমাদ। আমাকে বলেছিল—তুই বেইমান তুই কসবী, নওজোয়ান জবাহিরের ওপর লালস তোর!

হাঁ—বলেছি চাঁদ খাঁ—লালস আমার জবাহিরের উপর ঠিক ছিল না। ছিল এক নওজোয়ানের জন্যে—যে শুধু আমার সুরত আর জোয়ানীর খুন আর গোস্ত-এর ভুখা করবে না—আমার দিলের মহব্বতির মধুর তিয়াসও করবে। আমাকেও দেবে—তার মহব্বতির মধু!

আমি তাকে বলেছিলাম চাঁদ খাঁ। বলেছিলাম—শোন ইমাদ-উল-মুল্ক তা হলে শোন। তুমি ঝুট বল নি। বলেছিলাম—তুমি আমার উপর অবিশ্বাসের সিকায়েৎ বেফয়দা করছ ইমাদ-উল-মুল্ক। বেফয়দা। কোন লাভ নেই। আমি তো তোমার কবিলা নই। আমি বাঁদী। আমি তয়ফাওয়ালীর বেটী! হাঁ ইমাদ-উল-মুল্ক, আমার স্বভাব—সে হয় তো নারীরই স্বভাব—খাঁটি মাশুক—আসলি আজিজকে যে যতক্ষণ না পায়, ততক্ষণ সে মনে মনে নতুন মানুষ খোঁজে।—হাঁ ইমাদ-উল-মুল্ক, আমার দিলের ওই বুঝি স্বভাব—সে নতুন নতুন নওজোয়ানকে চায়, খোঁজে তার সেই মাশুককে—সেই আজিজকে!

"তোহমতে ইশ্‌ক্—অবস্ করতি হ্যায় মুঝ পর মিন্নত।
হাঁ—ইয়ে সচ্, মিলনে কি খুঁবা সে তুতক্ খুশি হ্যায়।"

সেইদিন তাকে বলেছিলাম তুমি আমার পিয়ার নও—আজিজ নও—তুমি আমার উপর নালিশ করনেওয়ালা দুশমন!

মুদ্দই হম সে সোখনসাজ বি সালুসী হ্যায়—
আব তামান্না—কো ইঁহা মুজদয়ে মায়ুসী হ্যায়।"

*　　　　*　　　　*　　　　*

বল্লভগড় থেকে পালাবার সময়ে ইমাদের সঙ্গে এ কথাগুলো হয়েছিল চাঁদ খাঁ। জবাহির

সিং আমাকে কেড়ে নিতে লোক পাঠিয়েছিল।

জবাহিরকে ধরা দিতে ইচ্ছে থাকলে দিতে পারতাম। জবাহিরের সিপাহীরা—সেই প্রথম পিয়ারাবাবার দরবার হয়ে সাদীর জন্যে লক্ষ্নৌ যাবার পথে যেমন হামলা করে পড়েছিল আমাকে লুঠবার জন্যে, এবারও ঠিক তেমনি করে তারা পড়েছিল। আমি পালকির মধ্যে এই আংটি ধরে বসে ছিলাম।

চুপচাপ বসে ছিলাম।

ইচ্ছে হলে নেমে আমি পালিয়ে যেতে পারতাম চাঁদ খাঁ, কিন্তু তা পালাই নি। বসেছিলাম আর বলেছিলাম মর্জি খোদাকি···খেল নসীবকা—যা হয় হোক। পুরা হোক খুদার মর্জি আর পুরা হোক নসীবের খেল! আমার ইজ্জৎকে বরবাদ আমি করব না। ইজ্জৎ ইনসানকি।

পারে নি লুটতে তারা। লোকে বলে—আমি মুসলমানী বলে জাঠ সিপাহীরা আমাকে নিয়ে যেতে চায় নি। হয়তো জবাহির মুসলমান হয়ে যাবে!

কিম্বা হয়তো জবাহির সিংয়ের বেগমরা ঘুষ দিয়েছিল—মনসবদারকে।—এনো না গন্নাকে। রাজা ওকে নিয়েই মেতে থাকবে। সব বরবাদ হবে।

তারপর চাঁদ খাঁ—তুমি সব জান। তুমি কোথায় ছিলে—রাজপুতানায় নোকরি করছিলে—এলে ফারাক্কাবাদে। আমি আছি শুনে—দেখা করতে এলে।

উমধা আমার সে সুবিধা করে দিলে।

তার মা যা করেছে করেছে—সে কিন্তু খাঁটি সৈয়দের বেটী। সে মুখ বন্ধ করেই থেকেছে। আমি যে সেদিন তার ইজ্জৎ বাঁচিয়েছিলাম নিজের ইজ্জৎ দিয়ে—তা সে ভোলে নি। কিন্তু তার হিংসেও ছিল। সে ইমাদকে পায় নি। আমি কতদিন বলেছি—উমধা বেগম—এ নালিশ আমার উপর করো না। করো খুদার কাছে—তামাম ঔরতের হয়ে। মরদরা—এই বটে। তারা নিজেদের কাউকে দেয় না। জবরদস্তি ঔরতের কলেজা তলোয়ারের খোঁচায় রক্তাক্ত করে তাই চুষে নেয়—ভাবে এই মহব্বতির মধু। ঔরতেরা সারা জিন্দিগী হাহাকার করে। তারা কেউ বেগম নয়, সব বাঁদী। সব বাঁদী। খুদাকে বলো—বদল্ করো মেহেরবান—ঔরতের নসীবের বদল করো।

* • * *

ফারাক্কাবাদ থেকে আজমীঢ়।

ইমাদ-উল-মুল্কের খেলা শেষ হয়ে গেল। হিন্দোস্তানের বাদশাহী নবাবীর খেলার আসর থেকে, নসীব তাকে ঘাড় ধরে বের করে দিলে।

ইমাদ আজমীঢ়ে এসে ঘর বাঁধলে। তসবী জপতে লাগল। দৌলত ভোগ করতে লাগল। গন্না শরাব খেলে। শরাব খেলে। শরাব খেলে।

নাচলে গাইলে। রেহাই নেই, রেহাই নেই।

রেহাই যে দেবার সে দিলে। খুদা! নসীব!

বেমার হল তার! খুন বের হতে লাগল তার মুখ থেকে। তার সুরতের জলুস গেল। জোয়ানির পাপড়ি শুকাতে লাগল, জিন্দিগীর খুসবু গেল।

উমধা বেগম এবার খালাস দিলে।

সেদিন এসে বললে—গন্না বহেন, আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। খত ফারখত করে দিলাম।

আমি বললাম—খুদা কসম।

—খুদা কসম গন্না। এই নাও শাহ আবদালী যে খত তোমাকে' সই করিয়ে আমাকে দিয়েছিলেন তা এই নাও, ছিঁড়ে দিলাম।

উমধা ছিঁড়ে দিলে খতখানা।

ইমাদ ছুটে এসে বলেছিল—না।

হাঁ, চাঁদ খাঁ, সেদিন দেখলাম উমধার এক চেহারা। সে সৈয়দের বেটী। সে ইমাদকে হটিয়ে দিলে। বললে—না, না, না। আমি বাত দিয়েছি সে ফিরবে না। ইমাদ-উল-মুল্ক, তুমি এই ঔরতের জন্ম আজ আজমীঢ়ে এসে তসবী জপছ। ইমাদ, তুমি যদি একে সাদী না করতে, তবে ভেবে দেখ আবদালীর কাছে আমার মা খত পাঠাতো না। তুমি ওকে সাদী না করলে শাহ আবদালীর দুশমন হতে না। তোমার এই হাল হত না, হিন্দোস্তানের এই হাল হত না। অথচ তুমি এমন একটা মেয়ের সারা জিন্দগী বরবাদ করে দিলে। না। ওকে যেতে দাও।

ইমাদ মাথা হেঁট করে চলে গেল। তারপর আমাকে বললে—তুমি চলে যাও গন্না, চলে যাও। কোথাও চলে যাও। বল কোথায় যাবে, পাঠিয়ে দিই।

—চাঁদ খাঁ, আমি বললাম—আমাকে নূরাবাদ পাঠিয়ে দাও। তানসেনের কবর আছে গোয়ালিয়রে, আমার মায়ের কবর আছে নূরাবাদে। এখনও সেখানে আছেন সেই পিয়ারা-বাবা। সেখানে পাঠিয়ে দাও। আর সঙ্গে দাও আমার ভাইয়ের মত সেই চাঁদ খাঁকে।

* * *

পরের দিন। সরাইখানা থেকে গন্না বেগম আবার রওনা হল—নূরাবাদের দিকে। পিয়ারাবাবার আশ্রয়ে গিয়ে জুড়োবে।

ডুলির মধ্যে বসে সে দেখছিল—তার হাতের আংটিটাকে। আকবর আদিলশাহ লেখাটা ঝিক্‌মিক্ করছে মীনার উপর।

পাশে পাশে চলছে চাঁদ খাঁ আর তিরিশ জন সিপাহী।

আংটিটা দেখতে ভাল লাগছে না!

মনে মনে সওয়াল উঠছে এত যে সে দুঃখ করলে, খুদার মর্জি নসীবের খেল বলে মেনে নিলে, এর জন্ম কি বকশিশ বা ইনাম সে খুদার দরবারে পাবে তা সে জানে না। কিন্তু নিজেও সে কোনদিন কাঁদলে না। দুনিয়ার কেউ তার জন্যে কোনদিন কাঁদলে না।

পিয়ার আজিজ মাশুক চুমার মধ্যে দেয় দর্দ।

মানুষ মানুষকে দর্দ দেয়, দেখায় চোখের জলের মধ্যে।

কেউ দু ফোঁটা চোখের জল তার জন্যে ফেললে না। তার নিজের পুরনো গজল মনে পড়ল। গুনগুন করে সে গাইতে লাগল।

সব ঠিক মনে পড়ছে না। তা না পড়ুক। নতুন তৈরী করেই গাইবে পুরনো গান। পুরনো গজল।

"সুখ সে আমার মেহমান। তার জন্যে কত ইস্তিজাম করতে হয়। মখমল বিছাতে হয়—রোশনাই জ্বালতে হয়। গান গাইতে হয়। হাসতে হয়। তোমার অভাব ঢাকতে হয়। বুকে দর্দ হলেও তা চাপতে হয়।

তখন কাঁদতে নেই।

কেঁদো না—কেঁদো না গন্না, খবরদার কেঁদো না।

হাসো—হাসো—হাসো।

মেহমান চলে গেল। সুখের পালা শেষ হল।

আলো নিভল। আসরের গালিচা মখমল উঠল।

দুখ সহেলী এল। মাটির উপর তোমার পাশে বসে তোমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে—কাঁদ গন্না—কাঁদ। প্রাণ ভরে কাঁদ। বুকের দর্দ উজাড় করে দাও।

কাঁদ। কাঁদ। বুক ভাসিয়ে কাঁদ।"

চোখ দিয়ে তাঁর দরদর ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কি আরাম! কি সুখ! এত কাল পরে আজ।

একটুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইল। পালকি চলছে। পাশে পাশে ঘোড়সওয়ার চলছে। বেশ লাগছে।

হঠাৎ সে চোখ খুললে। পালকির দরওয়াজা একটু ফাঁক করে ডাকলে—চাঁদ!

চাঁদ ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে কাছে এসে বলল—সাহেবজাদী!

—সাহেবজাদী না চাঁদ। বহেন বল!

—তাই। বল কি বলছ।

—দেখ, আমার কবরের উপর যেন এই কথাটা তুই খোদাই করে দিস। ওগো, তোমরা গন্না বেগমের জন্যে একটু কাঁদো! আহ ঘম্-ই গন্না বেগম।

চোখ ফেটে জল সেই মুহূর্তে বেরিয়ে এল চাঁদের।

—আহ ঘম্-ই গন্না বেগম। দেবে, তাই লিখে দেবে। আহ ঘম্-ই গন্না বেগম।

* * *

তা দিয়েছে চাঁদ খাঁ। এবং কেঁদেছে। শুধু চাঁদ খাঁ নয়—অনেক জন কাঁদে। আহ ঘম্-ই গন্না বেগম!

বসন্ত রাগ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চ রথ এবং বিরাটকায় প্রস্তর হস্তী সমৃদ্ধ তীর্থস্থল মহাবলীপুরম ও উত্তরে মান্দ্রাজের কাছাকাছি একটি স্থান। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ। মান্দ্রাজ তখন নামে মাত্র শহর, প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে—প্রায় সমুদ্রতটে একটি সুন্দর তপোবনের মত আশ্রম। সুন্দর সুগঠিত,—কি বলব, বাড়ি? না, বাড়ি বলতে যা বোঝায় তা নয়, তবে কুটির? না তাও নয়। কুটির বলতে যা বোঝায় তা থেকে অনেক সমৃদ্ধ; এবং বাড়ি বলতে যা বোঝায় তা থেকে আয়তনে আকারে স্থান-সঙ্কুলানে অনেক ছোট। চারটি পাথরের থামের মাথায় পাথরের ছাদের একটি ছয় হাত প্রস্থ বারো হাত দীর্ঘ বারান্দা, তার কোলে এমনি আয়তনেরই একখানি ঘরকে দুখানি করে নেওয়া হয়েছে; একখানি ছোট, একখানি বড়। সামনে ঘন বৃক্ষবেষ্টনীর মধ্যে কয়েক কাঠা পরিমিত জমিতে পরিচ্ছন্ন একটি উদ্যান। কিছু দূরেই নারিকেল তাল গাছের সুদীর্ঘ সারি, তারই কোলে মহাসমুদ্রের বেলাভূমি। গাঢ় কৃষ্ণাভ নীল সমুদ্র-তরঙ্গ সাদা ফেনা মাথায় নিয়ে কলকল্লোল তুলে আছড়ে এসে পড়ছে। তরঙ্গশীর্ষে রৌদ্রচ্ছটা ঝিকমিক করছে। অবিরাম কল্লোল ধ্বনিতে মুখরিত।

বারান্দায় ঘরে সজ্জার উপকরণ স্বল্প কিন্তু সেগুলি বড় সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। ছোট ঘরখানির পাশেই অল্প একটু, হয়তো বা দশ হাত পরিমিত স্থান তফাতে আর একখানি ঘর। নারিকেল পাতায় আচ্ছাদিত একখানি মাটির ঘর। বেশ সুগঠিত ও পরিচ্ছন্ন। সামনে দুটি হৃষ্টপুষ্ট ধবলাঙ্গী গাভী রোমন্থন করছে।

একটি আশ্রম, সত্যই একটি আশ্রম। নির্জন পরিবেষ্টনীর মধ্যে এমন মনোরম পরিচ্ছন্ন স্বল্পায়তন গৃহকে আশ্রম ছাড়া কিছু বলাও যায় না। আজ কিন্তু স্থানটি নির্জন নয়। বারান্দায় এবং বারান্দার সামনে উদ্যানের মধ্যে বহু জনের ভিড়। উত্তেজিত অথচ চাপা কোলাহল কোন অতিকায় মধুচক্রের উত্তেজনা-চঞ্চল মধুমক্ষিকার গুঞ্জন-ধ্বনির মত ধ্বনিত হচ্ছে। প্রতিটি লোকই মুখর—চাপা গলায় প্রত্যেকে কথা বলছেন। স্বর অনুচ্চ কিন্তু সুরে উত্তেজনা রয়েছে—উত্তপ্ত বায়ুস্পর্শের মত স্পষ্ট। কিন্তু একটি কথা বা শব্দও বোঝা যায় না—বহু জনের উচ্চারিত কথায় কথায় জড়িয়ে সব দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে এবং অদূরবর্তী সমুদ্র-কল্লোলের ধ্বনি তার উপর একটি আবরণ টেনে দিয়ে তাকে আরও অস্পষ্ট করে তুলেছে। শুধু মনে হচ্ছে—একটি হায় হায় হায় হায় আক্ষেপ সব কিছুর মধ্যে। উদাস সমুদ্রের একটানা ধ্বনির মধ্যেও, এবং এই কথাবার্তার চাপা কণ্ঠস্বরের মধ্যেও।

জনতার পিছন দিকে দূরে আশ্রম-প্রবেশ-পথের বাঁদিকে—যে দিকে ঐ গাভী দুটি বাঁধা ছিল—সেই দিকে বিষণ্ণতায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে ম্লান মুখে দাঁড়িয়েছিল শূদ্রকন্যা লল্লা। মনে হচ্ছিল যেন রৌদ্রতাপক্লিষ্ট একটি শ্যামলতা। রৌদ্রম্লান পাতার মত তার সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ক্লিষ্টতার চিহ্ন। নির্বাক হয়ে সে শুনবার চেষ্টা করছিল, কে—কি বলছে!

এসেছে বহুজন। ব্রাহ্মণ শূদ্র—সকলেই কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান এবং বিদগ্ধজন। কারও প্রতিষ্ঠা বেশী, কারও কম। বৈদগ্ধ্যেও তাই। যার যেমন বেশী প্রতিষ্ঠা সে-ই তেমন আগে দাঁড়িয়েছে, স্বাভাবিক ভাবে। লল্লা দাঁড়িয়ে আছে একা—সকলের পিছনে।. সে-ই শুধু নির্বাক—শুধু শুনছে।

আরও একজন নির্বাক। অর্ধশায়িত অবস্থায় নির্বাক হয়ে শুয়ে আছেন—দক্ষিণের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সুকণ্ঠ গায়ক বীনকার রঙ্গনাথন,—বৈষ্ণব সঙ্গীতাচার্য রঙ্গনাথন। তিনিও নির্বাক হয়ে শুনছেন। তাঁর কপালে আঘাত-ক্ষতকে আবৃত করে বেশ পুরু কাপড়ের আবরণী বাঁধা, মুখ

চোখ ফুলেছে একটু। তিনিও ক্লিষ্ট।

তিনি আহত। তাই এত লোকের সমাগম। মহাগুণী আচার্য রঙ্গনাথন। সুরের জাদুকর। কণ্ঠস্বর বংশীধ্বনির মত। শুধু তাই নয়, নিজেই তিনি গীত রচনা করেন—নিজেই সুরারোপ করে বীণা বাজিয়ে গেয়ে বেড়ান। বড় বড় মন্দিরের প্রাঙ্গণে গিয়ে প্রথম তাঁর নূতন গান দেবতাকে শুনিয়ে আসেন; তারপর রাজার ধনীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। মন্দিরের পুরোহিতেরা তাঁর নূতন গানের সংবাদ পেলেই তাঁকে নিমন্ত্রণ পাঠান; তিনি পত্রখানি মাথায় ধরে বলেন—শিরোধার্য—গিয়ে বলো, যথা সময়ে উপস্থিত হব। মন্দির-প্রাঙ্গণে আসর পড়ে, দীপাধারে উজ্জল আলো জ্বালা হয়—তৈলদীপ, বর্তিকা, সুগন্ধি ধূপশলাকা জ্বলে। চারিপাশে হাজার হাজার শ্রোতা সমবেত হয়। নিয়মানুযায়ী শূদ্রেরা অচ্ছুতেরা দূরে দাঁড়িয়ে শোনে। তাঁর বীণা ঝঙ্কার দেওয়া মাত্রেই মোহের সঞ্চার হয় শ্রোতার মনে। বীণা মন্ত্রপূত নয়, ঝঙ্কারের মধ্যেও কোন জাদু নেই। কিন্তু তাঁর গান যাঁরা পূর্বে শুনেছেন—তাঁদের মনে জেগে ওঠে পূর্ব স্মৃতি; তাই করে মোহের সঞ্চার, যাঁরা নূতন তাঁদের মনে এর ছোঁয়াচ লাগে। তিনি আলাপ শুরু করেন। কণ্ঠস্বর—বীণার ঝঙ্কারের সঙ্গে মিশে কিন্তু সত্যই মোহ সৃষ্টি করে। স্বর এমন মধুর অথচ বলিষ্ঠ। ভারতবর্ষের সানাইয়ের সুর ওঠে যেন। তারপর গান শুরু হয়। গানও রঙ্গনাথনের নিজের রচনা। তাঁর মধ্যেও আছে এক নূতন ভাব ও ভাবনার প্রকাশ।

প্রতিবারই তাঁর বীণায় তিনি আঙুলের কৌশলে প্রথমেই শব্দ তোলেন—ঝম। যারা সঙ্গত করে তারাও করতাল ধ্বনিতে মৃদঙ্গ শব্দে অনুরূপ ধ্বনি মিশিয়ে দেয়। তারপর তিনি গেয়ে ওঠেন—অনাদি সৃষ্টির আদিতে নিস্তরঙ্গ শব্দের মধ্যে প্রথম নটরাজ চরণপাতে তাঁর নূপুর ঝঙ্কারের মধ্যে জন্ম নিল ধ্বনি। বিশ্বের সকল ধ্বনিই সঙ্গীত। প্রলয় তাণ্ডবের ভীম ভয়ঙ্কর নিনাদ থেকে ব্রজের বংশীধ্বনি, যুদ্ধক্ষেত্রের আর্তনাদ হুঙ্কার থেকে বেতসকুঞ্জে প্রণয়ী যুগলের মৃদু গুঞ্জন—আকাশের মেঘ গর্জনের বজ্রনাদ থেকে কোকিলের কুহুরব—সঙ্গীত-ঝঙ্কার সবের মধ্যেই। সব আছে এবং জন্ম নেয় নটনাথের নূপুরপাতে। হে নটনাথ—তা থেকেই প্রসাদস্বরূপ আহরণ করেছি এই যৎকিঞ্চিত সুর ও সঙ্গীতকণা। তাই আবার নিবেদন করি নটনাথ, নটরাজ, তোমারই চরণে।

এটুকু তাঁর প্রতিটি সঙ্গীতের বা তাঁর সঙ্গীত সাধনারই ভূমিকা। বঙ্গদেশে এমন ভূমিকার নাম চৈতন্যের আবির্ভাবের পর থেকে গৌরচন্দ্রিকা। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে এর নাম বন্দনা। মহাভারতে ব্যাসদেব শুরু করেছেন—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্—দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়োমুদীরয়েৎ।"

রঙ্গনাথনেরও এটুকু তাই। এদিক দিয়ে তিনি মহাভারতের অনুরাগী এবং মহাভারতকারের অনুসরণকারী। তারপর আরম্ভ হয় আসল গান। পুরাণ থেকে কাহিনী নিয়ে তিনি গান রচনা করে তাই গেয়ে থাকেন। পালা গানের মত। কিন্তু গায়ক তিনি একক। মধ্যে মধ্যে সূত্রধারের মত কাহিনীর সূত্রটি টেনে নিয়ে যান। আবার উপনীত হন সঙ্গীতে। যতক্ষণ গান করেন ততক্ষণ শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ বা স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বুকের মধ্যে নানা ভাবতরঙ্গ অবিরাম উচ্ছ্বসিত হয়—করমণ্ডল বেলাভূমের সমুদ্রের মত। লোকেও তাই বলে। সমুদ্রতটবাসী মানুষগুলি সমুদ্রকে বড় ভালবাসে;—তারা সমুদ্র-শঙ্খের অলঙ্কার পরে, তাই দিয়ে কত শিল্প রচনা করে, তটভূমের নারিকেল ফল ও বৃক্ষ তাদের সম্পদ,—বেদনার আনন্দে তারা বেলাভূমে গিয়ে বসে, সমুদ্রকল্লোলে হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শোনে, সমুদ্রের বাতাস তাদের নিদ্রা আনে, সমুদ্রের ঝড় তাদের ঘর উড়িয়ে ভাসিয়ে দেয়; সমুদ্রের নীলকজ্জল বর্ণের আভা তাদের অঙ্গলাবণ্যে

সুষমা সঞ্চার করে ; জীবনের উপমায় সমুদ্র তাদের রত্নাকর। সকালের সমুদ্র, দ্বিপ্রহরের সমুদ্র, সন্ধ্যার সমুদ্র, রাত্রের সমুদ্র, উচ্ছ্বসিত সমুদ্র, শান্ত সমুদ্রেই তাদের জীবনের প্রতিবিম্ব দেখতে তারা অভ্যস্ত। ভাবোচ্ছ্বসিত হৃদয়ের উপমা তাদের সমুদ্রে। রঙ্গনাথনের গান যখন তারা শোনে—তখন তাদের হৃদয়ের উপমা রাতের সমুদ্রের মত। শুধু তরঙ্গের পর তরঙ্গ। অন্য চিন্তার একটি নৌকাও তখন থাকে না। তারপর কখন গান শেষ করেন রঙ্গনাথন। বীণাটি পাশে রেখে দেন। হাত জোড় করে বলেন—ত্রুটি বিচ্যুতি সব ক্ষমা কর। আপনারাও করুন—আপনারা শ্রোতা, আপনারা দেবতা।

এতক্ষণে শ্রোতারা যেন মোহমুগ্ধতা থেকে মুক্ত হয়। তারা সমবেত স্বরে ধ্বনি দিয়ে ওঠে—জয় রঙ্গনাথন!

রঙ্গনাথন হাত তোলেন—না।

স্তব্ধ হয়ে যায় শ্রোতারা সবিস্ময়ে।

রঙ্গনাথন বলেন—না। বলুন—জয় বিশ্বরঙ্গ-পতি রঙ্গনাথন,—নটরাজ শিব জয়!

এই রঙ্গনাথন। লোকপ্রিয় রঙ্গনাথন। সুন্দর রঙ্গনাথন। মধুরপ্রকৃতি সঙ্গীতসাধক রঙ্গনাথন।

এই গুণী গীতিকার লোকপ্রিয় রঙ্গনাথন গত রাত্রে মাদ্রাজ শহরে এক বর্ধিষ্ণু শ্রেণীর নিমন্ত্রণে গান করতে গিয়েছিলেন, কিরাতার্জুনীয় উপাখ্যান। প্রত্যাবর্তনের পথে একদল অজ্ঞাত আততায়ী পথের মধ্যে আক্রমণ করে তাঁর মাথায় আঘাত করেছে। তিনি আহত হয়েছেন। রাত্রের অন্ধকারে মাথায় আঘাত করে তারা অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। স্বল্প কয়েকজন সঙ্গী ছিল, তারা তাঁকে কোন রকমে বয়ে এখানে এনেছে।

ঘরের মধ্যে তিনি একখানি কাষ্ঠাসনের উপর বিছানো শয্যায় গোলাকার একটি উপাধানের উপর ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে আছেন। হাতের কাছে বীণাটি রয়েছে। একখানি হাত বীণার তারের উপর অলস বিশ্রামে পড়ে আছে। কপালের ক্ষতস্থান পরিচ্ছন্ন বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বাঁধা। রক্তের একটি শীর্ণ রেখার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। রক্ত এখনও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নি। সারা মুখে একটি বিষণ্ণ বেদনার ছায়া পড়েছে। দৃষ্টিও তাঁর উদাস বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন, সামনের জানালার ভিতর দিয়ে আকাশের নীলিমার মধ্যে যেন সান্ত্বনা খুঁজে ফিরছে। তাঁর শয্যার সামনে মেঝের উপর বিস্তৃত আসনে বসে আছেন এখানকার কয়েকজন অতিবিশিষ্ট ব্যক্তি। এখানকার শাসনকর্তার প্রতিনিধিও রয়েছেন তাঁদের মধ্যে। আরও যারা আছেন তাঁরা স্থানীয় বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট চিকিৎসক, কয়েকজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণও রয়েছেন, ব্রাহ্মণেরা স্বতন্ত্র আসনে বসে আছেন অবশ্য।

মৃদু স্বরে কথা চলছে ; একটি কথাই বিভিন্ন ভঙ্গিতে বলছেন সকলে—এ অরাজক। এতবড় অন্যায় আর হয় না। বর্বরতার চূড়ান্ত।

ব্রাহ্মণেরাও তাই বলছেন ; কিন্তু তাঁদের প্রকাশভঙ্গি অতি কঠোর, অতি রূঢ়। বলছেন—এ পাপ। মহাপাপ। বিধর্মী রাজশক্তির উদাসীনতাই এর কারণ। কিন্তু দেবতা ক্ষমা করবেন না।

রাজপ্রতিনিধি শ্রীনিবাসন প্রশ্ন করে উত্তরের প্রতীক্ষায় রঙ্গনাথনেরই মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু রঙ্গনাথন সেই উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিরুত্তর হয়ে বসে আছেন। ব্রাহ্মণদের কথা শ্রীনিবাসনের কানে যেতেই তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে আবার প্রশ্ন করলেন—বলুন আচার্য, আততায়ীদের কাউকেই কি আপনি চিনতে পারেন নি ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রঙ্গনাথন ঘাড় নাড়লেন—না।

—কাল ছিল তিথিতে ত্রয়োদশী, আজ রাত্রে পূর্ণিমা, আকাশেও মেঘের লেশ ছিল না। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যেও আপনি চিনতে পারলেন না! আশ্চর্য!

পণ্ডিত চিদম্বরম এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন, এবার বলে উঠলেন—আপনি রাজপ্রতিনিধি হয়ে ব্রাহ্মণ-প্রকৃতি বিস্মৃত হয়েছেন শ্রীনিবাসন। রঙ্গনাথন ব্রাহ্মণ এবং গায়ক। সম্ভবত ভয়ে তাঁর চোখের সামনে গতরাত্রির এমন জ্যোৎস্নালোক গাঢ় অন্ধকারে পরিবর্তিত হয়েছিল। ভয়ে বোধ করি উনি চক্ষু মুদ্রিত করে ছিলেন।

তাঁর কথার মধ্যে শ্লেষ যেন রণ-রণ করছিল।

এবার একটু বিষণ্ণ হাস্যের সঙ্গে রঙ্গনাথন বললেন—আচার্য চিদম্বরম, অম্বর চিন্ময় হলে তাতে তার স্বরূপ আবৃত হয় না, কিন্তু মৃত্তিকা-জাত কার্পাস থেকে তৈরী বস্ত্রে তারা অতি সাবধানে তাদের স্বরূপকে আবৃত করে ছিল। এবং আমিও কিছু অন্যমনস্ক ছিলাম। সঙ্গীরা পশ্চাতে পড়েছিল। সুতরাং সঠিক চেনা তো সম্ভবপর হয় নি!

রাজপ্রতিনিধি শ্রীনিবাসন বললেন—তারা তো কিছু যেন বলেছিল আপনাকে! কি বলেছিল?

—হ্যাঁ বলেছিল। এই বিকৃত ব্যাখ্যা কোথা থেকে পেলে তুমি?

চিদম্বরম বললেন—তাদের বাক্যবিন্যাস—উচ্চারণ—

বাধা দিয়ে রঙ্গনাথন বললেন—তাঁরা ব্রাহ্মণ নন আচার্য। অবশ্য গ্রাম্য মূর্খ ব্রাহ্মণের তো অভাব নেই দেশে। বাক্‌ভঙ্গি, উচ্চারণ দিয়ে সিদ্ধান্ত করা দুরূহ। কিন্তু তবুও তারা ব্রাহ্মণ নয়।

চিদম্বরম বললেন—সন্তুষ্ট হলাম রঙ্গনাথন। তোমার গানে তুমি পুরাণের যে ব্যাখ্যা করেছ তাতে তুমি আঘাত করেছ ব্রাহ্মণদেরই। তোমার প্রেম সহানুভূতি ওই সকল কৃষ্ণকায়দেরই উপর। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও মূর্খ অবশ্যই আছে। তবুও তোমার এই সিদ্ধান্তের জন্য আমি প্রীত। তার কারণ এ নয় যে তুমি ব্রাহ্মণদের সন্দেহ কর নি—নিছক প্রীতির বশে বা ভয়ে। ব্রাহ্মণ-প্রকৃতির সত্য তুমি উপলব্ধি করেছ।

শ্রীনিবাসন বললেন—আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন না? কণ্ঠস্বর আকার আয়তন এগুলি তো বস্ত্রাবরণের ছদ্মবেশে ঢাকা যায় না!

বেশ একটু চিন্তা করে নিয়েই যেন রঙ্গনাথন বললেন—না।

দৃষ্টি তাঁর সেই জানালা দিয়েই বাইরে নিবদ্ধ। বাইরে গোশালার ধারে বিষণ্ণ ক্লিষ্ট শ্যাম-লতার মত শূদ্রকন্যাটি গোশালার কাঠের খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়েই আছে। বিষণ্ণ বেদনাচ্ছন্ন মুখ—চোখে যেন জল টলটল করছে। তিনি ওকে চেনেন। বড় ভাল মেয়ে। এখান থেকে অল্প দূরেই ওদের বাস। কন্যাটি সুকণ্ঠী। অন্ধ মায়ের হাত ধরে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াত এই কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত। তাঁর সম্মুখে বা কাছে বিশেষ আসে নি। ভয়ে আসে নি—অধর্মের ভয়, শাসনের ভয় এবং লজ্জার ভয়ও বটে। গান তাঁর সামনেও কখনও গায় নি। এই সুকণ্ঠী কিশোরীর দূরাগত সঙ্গীতধ্বনি শুনে তাঁরও কখনও কখনও ইচ্ছা হয়েছে ডেকে ওর গান শোনেন। কিন্তু সামাজিক অনুশাসন এবং মর্যাদার সঙ্কোচে ডাকতে পারেন নি। তার দু-চারদিন পরই হয়তো বিস্মৃত হয়েছেন। এক মাস আগে সমুদ্রতটে একদিন ওর সঙ্গে ক'টি কথা বলেছিলেন। তারপর আর এদিকে আসে নি। কাল রাত্রে ওকে দেখেছিলেন। গানের সময় অনেক দূরে চত্বরের বাইরে জনতার প্রথম শ্রেণীতে একটি কাঠের দীপদণ্ডের সামনেই যেন ও দাঁড়িয়ে ছিল।

তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ওর চোখের অশ্রুধারা। আজও এসেছে—তাঁর আঘাতের কথা শুনেই এসেছে। নইলে এতটা নিকটে তাঁর আশ্রয়ের মধ্যে প্রবেশ করে গোশালার খুঁটি ধরে ও দাঁড়াতে সাহস করত না। আজও ওর চোখে জল।

শ্রীনিবাসন বললেন—এ না—কি না রঙ্গনাথন? আমি বললাম মানুষের কণ্ঠস্বর আকার আয়তন এগুলি বস্ত্রাবরণের ছদ্মবেশে ঢাকা পড়ে না। আপনি 'না' বলে তাই সমর্থন করেছেন?,

রঙ্গনাথন বললেন—মাননীয় শ্রীনিবাসন, আমি আপনার দুটি বাক্যাংশের উত্তরেই না বলেছি। আপনার যুক্তি সত্য—ছদ্মবেশে আকার আয়তন ঢাকা যায় না; একে সমর্থন করেও বলেছি—না। আবার কাউকে সন্দেহ করি কি না এর উত্তরেও বলেছি—না, কাউকে সন্দেহ করি না।

চিদম্বরম বললেন—অজ্ঞাত আঘাতকারী এবং রঙ্গনাথন অসাধুতার এবং সাধুতার দুই দূরতম প্রান্তে অবস্থান করেন শ্রীনিবাসন। রেখাটি কাল অকস্মাৎ গোলাকার হতেই মুহূর্তের জন্য পরস্পরের নিকটতম স্থানে পৌঁছে সংঘর্ষ হয়েছে—তারপরই আবার সরলরেখায় দূরতম প্রান্তে চলে গেছে। সুতরাং সাধুতার উচ্চতম বা শেষতম বিন্দুতে স্থিত রঙ্গনাথন অসাধুতম ব্যক্তিকে দেখেও চেনেন নি, কণ্ঠস্বর শুনেও শোনেন নি, জেনেও জানেন না। অবান্তর প্রশ্নে লাভ নেই।

রঙ্গনাথন এবার বললেন—আচার্য চিদম্বরম, প্রণাম আপনাকে, অনুমান অভ্রান্ত আপনার। শুধু আমি সাধুতার শেষতম বা উচ্চতম বিন্দুতে পৌঁচেছি এই কথাটির প্রতিবাদ করি। আচার্য, যে পাণ্ডিত্য সাধুতার শেষতম বিন্দুর পথ বলে দেয়—তা আমার নেই। বোধ করি আপনি ওই বিন্দুতে থেকে পথের মাঝখানের যে রেখাটি ঠিক সন্দেহের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে না—তার অন্তরটি দেখতেও পারছেন না, বুঝতেও পারছেন না। আচার্য, আঘাত আমার সত্য। বেদনা দুঃখ সত্য। রক্তপাত তার সাক্ষী। যারা মেরেছে তারা ব্রাহ্মণ নয় এও সত্য। কিন্তু তারা মারলে কেন আমাকে? আমি তো তাদের আঘাত করি নি। আমার শত্রু বলে কাউকে তো মনে করতে পারছি না।

—তুমি উদার। তাই বা কেন—উদারতম ব্যক্তি। তুমি শবর চণ্ডালও ব্রহ্মবিদ হতে পারে বলে বিশ্বাস করেছ।

—আমি মহাভারত থেকে উপাখ্যান নিয়েছি আচার্য। মহর্ষি বেদব্যাস স্বয়ং এ সত্য মহাভারতের অঙ্গীভূত করেছেন। কেবল দুটি বিভিন্ন অংশকে আমি একত্রিত করেছি। কিরাতার্জুনীয় উপাখ্যানের আগে ধর্ম ব্যাধ উপাখ্যানের সারমর্মটুকু ভূমিকাস্বরূপ জুড়ে দিয়েছি।

—কিন্তু তার ব্যাখ্যা সে তোমার নিজস্ব। "কৃষ্ণবর্ণ চর্মের অন্তরালে যিনি বসবাস করেন তিনিই বসবাস করেন বৈকুণ্ঠে। যিনি বসবাস করেন বৈকুণ্ঠে তিনিই বাস করেন শবর পল্লীতে, সকল পতিত পল্লীতে, ওই ওদের মধ্যে ওদের কৃষ্ণচর্মের অন্তরালে। কৈলাসে যিনি বাস করেন ভবানীপতি, তিনিই আছেন ওদের মধ্যে। ওদের কৃষ্ণচর্ম দেখে যদি তোমার ঘৃণা হয়, ওদের পল্লীর অপরিচ্ছন্নতায়, কটু গন্ধে যদি তোমার দ্বিধা হয় কাছে যেতে, তবে তোমার জানা হবে না তাঁকে। ব্রাহ্মণ তনয়, তুমি ব্রহ্মাভিলাষী—ক্রোধে ঘৃণায় অহঙ্কারে শিক্ষার মধ্যে তোমার জানা হয় নি ব্রহ্মকে। আমি নারী, আমার ধর্মে আমি অধিষ্ঠিতা। আমার যিনি পতি তিনি শুধু আমার পূজ্যই নন তিনি আমার প্রিয়, প্রিয়তম। তাঁর সেবা আমার ধর্মই শুধু

নয়, সেই আমার জীবনধর্ম, সে-ই আনন্দ যার স্বাদে আর ব্রহ্মের স্বাদে প্রভেদ নেই। তুমি তাতে আমার উপর ক্রুদ্ধ হলে। সে ক্রোধে কোন ক্ষতি হয় নি বা হবে না আমার। সুতরাং তোমার পরম সত্য পরম তত্ত্বকে জানা সম্পূর্ণ হবে ব্যাধ-পল্লীতে ব্যাধ-ধর্মে অধিষ্ঠিত ধর্ম ব্যাধের কাছে। ঘৃণা করো না, নাসিকা কুঞ্চন করে প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থেকো না, প্রবেশ করো। তুমি কি জান ভবানীপতি মহারুদ্র কিরাত রূপেই দেখা দিয়েছিলেন তপস্যাপরায়ণ অর্জুনকে? অর্জুন কিরাত বলে অবজ্ঞা করেছিল, ঘৃণাও করেছিল, কিরাতরূপী ভগবান তাঁর সে শক্তির অবজ্ঞা চূর্ণ করেছিলেন। হিমগিরির কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণচ্ছটায় প্রতিভাত স্বর্ণকান্তি কিরাত নীলগিরিতে যখন আসেন তখন তিনি সুনীল সমুদ্রলাবণ্যে অবগাহন করে হন নিবিড় নীলকান্তি।" এ তো তোমারই ব্যাখ্যা রঙ্গনাথন।

—আমি কি ভ্রান্ত বা বিকৃত ব্যাখ্যা করেছি আচার্য?

—সে কথা তুমি খৃষ্টান পাদ্রীদের জিজ্ঞাসা কর রঙ্গনাথন।

শ্রীনিবাসন বললেন—এর মধ্যে খৃষ্টান পাদ্রীদের কথা তুলছেন কেন আচার্য চিদম্বরম?

চিদম্বরম বললেন—তার কারণ কি, রাজপ্রতিনিধি আপনি, আপনার সুবিদিত নয় শ্রীনিবাসন? মান্দ্রাজের চারিপাশ, সারা তেলেঙ্গানা ওদিকে ত্রিবাঙ্কুর কোচিন আজ তারা গির্জা গড়ে বসেছে। মান্দ্রাজে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত। মহারাষ্ট্র-শক্তি পানিপথে প্রায় শেষ। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল নানা ফড়নবীশের মৃত্যুতে তাও গেল। তিন বছর যেতে না যেতে পেশোয়া ইংরেজের কাছে অধীনতার খত লিখেছে। মহীশূরে সুলতান টিপু বিগত। সুলতান টিপু হিন্দু-ধর্মের বন্ধু ছিল না, কিন্তু পাদ্রীদেরও কঠোর শাসনে শাসিত রেখেছিল। নিজাম আজ অক্ষম। দক্ষিণে ইসলাম তিন শত বৎসরেও সনাতন ধর্মের ক্ষতি করতে পারে নি। কিন্তু খৃষ্টান ধর্মের প্রসার দেখ। এরা যে কৌশলে ধর্মের প্রসার করে সে তো কারো অবিদিত নেই। তার উপর এই নিষ্কণ্টক অবস্থায় তারা অতি উগ্রভাবে ধর্ম প্রসারে শক্তি নিয়োগ করেছে। তারা অস্পৃশ্যদের এই পন্থায় বিদ্রোহী করে তুলে পরিশেষে তাদের খৃষ্টান করছে। সুতরাং কারণটা তুমি সম্ভবত জেনেও অস্বীকার করছ।

শ্রীনিবাসন বললেন—এ সব আলোচনা রাজনৈতিক আচার্য। অস্বীকার করছি না যে, এ আলোচনায় আমার অধিকার নেই। তবু অপরাধীকে জানতে পারলে শাস্তি নিশ্চয় দেব।

চিদম্বরম বললেন—কারণবশতঃ কার্য হয় শ্রীনিবাসন; কিন্তু ওই কারণটিও স্বয়ম্ভুর মত তার পূর্ববর্তী কোন কার্য বা কারণ ভিন্ন উদ্ভূত হয় না। এ আঘাত করেছে অস্পৃশ্যরা এবং অস্পৃশ্যদের উত্তেজিত করেছে ওই খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা। রঙ্গনাথন যে ব্যাখ্যা করেছে তার গানের মধ্যে, তাকে বিকৃত করে বুঝিয়েছে ওই পাদ্রীরাই। এ সংবাদ আমি নিশ্চিতরূপে জানি। অপরাধীকে আবিষ্কার করলেও তোমাকে প্রসারিত হস্ত সঙ্কুচিত করতে হবে শ্রীনিবাসন।

শ্রীনিবাসন বললেন—আমি প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি, আমি তাদের আবিষ্কার করব, শাস্তি দেব। শুধু রঙ্গনাথনকে বলতে হবে—আমি চিনেছি, আকার আয়তন কণ্ঠস্বর এক—শুধু এইটুকু। সকলের সম্মুখে এ আমি শপথ করছি। তারপর রাজপ্রতিনিধিত্ব পরিত্যাগ করতে হলে তাও করব আমি।

সকলে একবাক্যে বলে উঠল—সাধু সাধু সাধু।

ওপাশে বসেছিলেন বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী গোপালন। তিনি বললেন, আততায়ীর নাম বা সন্ধান তিন দিনের মধ্যে আমি আপনাকে দেব মাননীয় শ্রীনিবাসন। আমি ব্যবসায়ী—আমার দোকানে বহুলোকের সমাগম হয়, বহুজন কর্ম করে। এ সন্ধান পেতে আমার দেরি হবে না।

তবে আচার্য চিদম্বরমের কথা সম্পূর্ণ সত্য। এ কথা আমিও জানি। আচার্য রঙ্গনাথন এই গান করেন প্রথম কাঞ্জীভরমে। তাঁর ব্যাখ্যা বহু উচ্চবর্ণের জ্ঞানী-গুণীর কাছে প্রীতিদায়ক হয় নি, ব্যথিত হয়েছেন—বলেছেন, এ তত্ত্ব, এ ব্যাখ্যা সকলের জন্য নয়; তবু অস্বীকার করেন নি, সাধুবাদ উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু শবরদের মধ্যে এ ব্যাখ্যা ক্ষোভের কারণ হয়েছে। আপনারা বর্ধিষ্ণু শবর ব্যবসায়ী খৃষ্টান যোশেফকে জানেন? খৃষ্টান হয়েছে—ইংরাজী ভাষা শিখেছে—তবু সে যে শবর সে কথা ভুলতে পারে নি। সেও বোধ হয় কাঞ্জীভরমে গিয়েছিল গান শুনতে। আমার কাছে কিছুদিন আগে সে নারিকেল আর নারিকেল দড়ির চালান এনেছিল। রঙ্গনাথনের গানের কথাই আলোচনা হচ্ছিল। আমরা সকলেই প্রশংসা করছিলাম একবাক্যে। অপূর্ব এবং হৃদয়স্পর্শী ব্যাখ্যা। যোশেফের মুখ চোখ ক্ষোভে কঠিন হয়ে উঠল। বললে, কুৎসিৎ, কুৎসিৎ—শেঠ গোপালন, অতি কুৎসিৎ ব্যাখ্যা। অতি সুকৌশলে আমাদের জাতিকে হেয় করা অবজ্ঞা করা ছাড়া আর কিছু নয়। কোথায় আমাদের পল্লীতে আবর্জনা, কোথায় দুর্গন্ধ? রঙ্গনাথন এতে ঈশ্বরের দয়া পাবে না, তাঁর কাছে শাস্তি পাবে। এ আমি নিশ্চিত বলে দিলাম—তুমি দেখো। হাতের মুষ্টিটা দৃঢ়বদ্ধ করে বললে, আমরা শবর থেকে খৃষ্টান হয়েছি, তবুও আমরা শবর। এই উক্তি এবং তার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার এলাকা, তার সঙ্গে আঘাতকারীরা ব্রাহ্মণ নয়—

ঘরের সামনের বারান্দা থেকে কেউ বললে—ব্রাহ্মণ এবং শবর ছাড়া কি আর কারুর বা কাদেরও দ্বারা এ কাজ হতে পারে না শ্রেষ্ঠী গোপালন?

—কে? আলি নাসের সাহেব—

—হ্যাঁ, আমি।

—আপনি এসেছেন? তা বাইরে কেন?

—ভিতরে স্থান সংকীর্ণ। বাইরেই রয়েছি। রঙ্গনাথন আমার বড় প্রিয় গায়ক। আমি মুসলমান হলেও এসব পালাগান শুনতে ভালবাসি। যেদিন বিষ্ণুকাঞ্চীতে রঙ্গনাথন এই গান প্রথম করেন সেদিন আমি ব্যবসায়সূত্রে ওখানে গিয়েছিলাম। রাত্রেও ছিলাম। সেখানে শিবকাঞ্চীর একদল আধা সন্ন্যাসী ভক্তের আলোচনা আমি শুনে এসেছি। আমাকে তারা গ্রাহ্য করে নি। তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল, এর জন্য রঙ্গনাথনের শাস্তি বিধান করবে তারা। বৈষ্ণব ধর্মের এই একাকার করার পন্থার প্রতি, রঙ্গনাথনের ব্যাখ্যার প্রতি তাদের আর ঘৃণার শেষ ছিল না।

তাঁর কথায় ঘরের ভিতরের প্রত্যেকেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল অর্ধোন্মাদ কোপন স্বভাবের ভক্ত আছে বটে।

শ্রীনিবাসন বললেন আচার্য চিদম্বরমকে—আচার্য!

আচার্য চিদম্বরম বললেন—হ্যাঁ, শুনলাম। একটু স্তব্ধ থেকে আবার বললেন—অসম্ভব নয় শ্রীনিবাসন। আমাদের গুণ-বারিধির সীমা পরিসীমা নেই। ধর্মে ধর্মে বিরোধ সে ছেড়েই দিলাম। ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধও অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ডের মত জ্বলছে। রঙ্গনাথন ধর্মের অগ্নিতে হবি দিতে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিরোধের বহ্নিও জ্বলে উঠে থাকতে পারে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তা হলে আকার আয়তন কণ্ঠস্বর বাক্‌বিন্যাস থেকে রঙ্গনাথনকে কষ্ট করে আততায়ীর স্বরূপ অনুমান করতে হবে না। তাদের গাত্রগন্ধ থেকেই অনুমান হবে সর্বাগ্রে। তাদের গায়ের একটি গন্ধ আছে—যেমন বৈষ্ণবেরও আছে। রঙ্গনাথন—

শ্রেষ্ঠী গোপালন বললেন—শৈব অর্ধোন্মাদদের সন্দেহ করে খৃষ্টান যোশেফ এবং পাদ্রীদের ছেড়ে দেওয়া অনেকটা নিরাপদও হবে।

শ্রীনিবাসন বললেন—নিরাপত্তার কথা পরে শ্রেষ্ঠী গোপালন। আগে আচার্য রঙ্গনাথন বলুন।

রঙ্গনাথন বললেন—গন্ধের কথা স্মরণ করতে পারছি না রাজপ্রতিনিধি। তবে হতে পারে না এমন কথা বলতে পারি না। এবং এর পর সনাতনধর্মী মূর্খ গোঁড়ার দলই যে হতে পারে না তাই বা কেমন করে বলব আচার্য চিদম্বরম, আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি।

চিদম্বরম বললেন—রঙ্গনাথন, ভালই বলেছ তুমি। তুমি উদার।

ঠিক এই মুহূর্তে একজন বারান্দা থেকে ঘরে প্রবেশ করল এবং অতি সন্তর্পণে দেওয়ালের প্রান্তভাগ ঘেঁষে গোপালনের কাছে গিয়ে অতি মৃদুস্বরে প্রায় কানে কানে কিছু বললে।

গোপালন চমকে উঠে বললেন—কই, কোথায়?

—ওই যে গোশালার কাঠের খুঁটি ধরে। জানালার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সেও সবিস্ময়ে বলে উঠল—কই! ওই তো ওইখানেই তো দাঁড়িয়েছিল। কই!

সকলেই বিস্ময়ভরে প্রশ্ন করলেন—কে? কি?

—যোশেফদের গ্রামের একটি মেয়ে। লল্লা বলে একটি মেয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে, সেই-ই। ওই গোশালার খুঁটি ধরে সেই সকাল থেকেই ওখানে দাঁড়িয়েছিল। আপনাদের কথা শুনে আমি ভিতরে বলতে এসেছি—আর দেখি নি। আমার সন্দেহ হয়েছিল এই কথাগুলি শুনে অবশ্য যে ও এখানে এসেছে সংবাদ সংগ্রহের জন্য। তাহলে ঠিক তাই।

রাজপ্রতিনিধি শ্রীনিবাসন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে পড়লেন এবং ঘরের বাইরে এসে ডাকলেন—থিরুমল!

কোতোয়ালীর কর্মচারী থিরুমল এসে সম্ভ্রমভরে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

—দেখ তো থিরুমল, এই স্থানটি তন্ন তন্ন করে সন্ধান করে দেখ—এখানে লল্লা বলে কোন শবরকন্যা—

—গান গেয়ে সে তো তার অন্ধ মায়ের হাত ধরে ভিক্ষা করে বেড়াত। তাকে তো চিনি। সে তো এখানেই ছিলো। ওইখানে ওই গোশালার ধারে।

—খোঁজ। তাকে খোঁজ। বের কর তাকে। সত্বর কাউকে আশ্রমের বাইরে পাঠাও দেখি।

রঙ্গনাথন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন—আচার্য, রাজপ্রতিনিধি, এ কী করছেন? এই-খানেই বসে আমি দেখেছি একটি ম্লানমুখী শবর বালিকা গোশালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু সে কী অপরাধ করলে রাজপ্রতিনিধি?

রাজপ্রতিনিধি বললেন—আমার কর্তব্যকর্মে বাধা আপনি দেবেন না রঙ্গনাথন। আপনি সরল—

আচার্য বললেন—সরল নয়, নির্বোধ।

রঙ্গনাথনকে চুপ করতে হল।

থিরুমল তার চৌকিদারদের নিয়ে তল্লাস শুরু করলে। গোশালার অভ্যন্তর ঘরের মাচান, বাইরে প্রতিটি গাছের আড়াল—গাছের ঘন পল্লব ভেদ করে শাখাপ্রশাখায় দৃষ্টি সঞ্চালন করে দেখলে কোথায় গেল। তাদের সঙ্গে সমবেত লোকেদেরও কিছু লোক যোগ দিলেন সন্ধানে। কই—কোথায়? আশ্রম থেকে বেরিয়ে চারপাশ তারা দেখলে—চারপাশে যতদূর দৃষ্টি যায়

দেখলে। কই—কোথায় ?

একজন বললে—বেলাভূমি তো দেখা হয় নি !

ছুটে গেল একজন। তার পিছন পিছন আরও কয়েকজন। বেলাভূমি নির্জন। ঝিনুক শামুক বিকীর্ণ—দূর সুদূর মনে হয়। দিগন্ত পর্যন্ত বালুতট চলে গেছে। কোলে কোলে অশান্ত গাঢ় নীল সমুদ্র গর্জন করে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। দুরন্ত বাতাস নিরন্তর ক্রন্দন করে বয়ে চলছে হা হা করে। একদল উপকূলবর্তী নারিকেল তালের সারির অন্তরালে যথাসম্ভব সন্ধান করলে। কিন্তু কই ? সে কোথায় ? নেই তো !

শ্রীনিবাসন বললেন—আমি এর প্রতিকার করবই ! অপরাধীকে দণ্ড দেবই। সকলজনের সম্মুখে দেবতা সাক্ষী করে শপথ করলাম আমি। সে তারা যে-ই হোক। শৈব অর্ধোন্মাদ অথবা খৃষ্টান প্রচারক নিয়োজিত নির্বোধ যোশেক—যেই হোক।

আচার্য চিদম্বরম বললেন—শ্রীনিবাস তোমার সংকল্পে দেবতা এবং ধর্ম তোমাকে সাহায্য করবেন। শুধু—। রঙ্গনাথন !

—আচার্য !

—তোমাকে দৃঢ়চিত্ত হতে হবে।

—সত্য বাক্য বলব আমি আচার্য। সত্যে স্থিতির চেয়ে তো দৃঢ়তা আর হতে পারে না আচার্য !

—হ্যাঁ রঙ্গনাথন ; মহাভারতে আছে—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামা হত উচ্চকণ্ঠে বলে নিম্নকণ্ঠে ইতি গজ বলে সত্য বলার নীতির নিয়ম রক্ষা করেছিলেন কিন্তু ধর্ম তাঁকে ক্ষমা করে নি। তাঁকে নরক দর্শন করতে হয়েছিল। মনে রেখো। চল শ্রীনিবাসন।

শ্রীনিবাসন বলেন—এখানে প্রহরার জন্য জন দুয়েককে রেখে যাই।

রঙ্গনাথন হাত জোড় করে বললেন—মার্জনা করুন রাজপ্রতিনিধি। তার চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

শ্রীনিবাসন সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রঙ্গনাথন বললেন—কতদিন আমাকে প্রহরাধীনে রেখে রক্ষা করবেন আপনি ? অসম্মান করবার জন্য কথাটা বলি নি আমি। আপনি চিন্তা করে দেখুন।

শ্রীনিবাসন উত্তর দিলেন না। প্রহরীদের নিয়ে তিনি চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রেষ্ঠী গোপালন, আচার্য চিদম্বরম এবং তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপর সকলেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশ্রম প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল।

রঙ্গনাথন আশ্রমে একরকম একাই বাস করেন। জীবন তাঁর বিচিত্র। ব্রাহ্মণের সন্তান কিন্তু শাস্ত্রবিদ্ বা পণ্ডিত তিনি নন। নিতান্ত বাল্যকালে পিতামাতৃহীন হয়ে অনাথে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁকে পালন করেছিলেন একজন বৈষ্ণব সাধু। রঙ্গনাথনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি—রঙ্গনাথনের সুস্বর এবং সঙ্গীতে জন্মগত অনুরাগ ও অধিকার দেখে। তিনিই তাঁকে গান শিখিয়েছিলেন। এবং পুরাণ কথা মুখে বলে শুনিয়ে পুরাণে পারঙ্গম করে তুলেছিলেন। তারপর পাঠিয়েছিলেন কর্ণাটক সঙ্গীতের একজন কর্ণধারের কাছে। ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সাধুর তিনি ছিলেন ভক্ত। বালকের অনুরাগ, অধিকার এবং সুস্বর দেখে তো মুগ্ধ তিনি হয়েই ছিলেন—কিন্তু তারও থেকে বেশী মুগ্ধ তাঁকে করেছিল বালকের হৃদয়ের মমতার তৃষ্ণা। মমতার কাঙাল ছিল। শুধু পাবার জন্যই নয়, তার আপন মমতা রাখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে

আধার খুঁজে সে ফিরত। ক্রমে তার সঙ্গীত-রচনার শক্তি স্ফুরিত হল,—তখন সে যুবা; সঙ্গীত-গুরু তখন তাকে বিদায় দিলেন; পাঠিয়ে দিলেন বৈষ্ণব সাধুর কাছে। তাঁকে জানিয়ে ছিলেন এর পর নিজের পথ সে নিজেই করে নেবে। এখন শুধু চাই এর জীবনের সঞ্চয় রাখবার একটি আধার। আপনি নিজে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন।

কথাটা সত্য। এক গানের সময় ছাড়া বাকী সময় সে এক নিরবচ্ছিন্ন উদাসীনতায় মগ্ন থাকত। বৈষ্ণব গুরু জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এমন উদাসীন হয়ে তুমি কেন থাক রঙ্গনাথন?

তরুণ রঙ্গনাথন বলেছিলেন—জানি না প্রভু। হয়তো—

—হয়তো কি রঙ্গনাথন?

—ঠিক জানি না প্রভু, মনে হয় বড় একা আমি।

—তুমি সংসার কর রঙ্গনাথন। আমি আমার গৃহী শিষ্যদের বলি—তারা একটি সুন্দরী সুশীলা পাত্রী দেখে দেবে।

হাত জোড় করে রঙ্গনাথন বলেছিলেন—না প্রভু, না।

—কেন?

—সংসারে আমি অনুপযুক্ত। আমার ভয় করে।

—ভয় করে?

—হ্যাঁ প্রভু। বড় ভয় আমার। আপনি আমাকে পালন করেছেন। আপনি গুরু। আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলছি না।

গুরু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করেছিলেন—তোমার কিসে সবচেয়ে উল্লাস বোধ হয় বলো তো? নিজেকে বুঝে সন্ধান করে বল। কখনও কোন মুহূর্তেই তুমি এই উদাসীনতা থেকে মুক্তি পাও না? ক্ষণেকের জন্যও কি মনে হয় না তুমি আনন্দ বোধ করছ? তুমি খুশী?

অনেকক্ষণ পর রঙ্গনাথন বলেছিলেন—হ্যাঁ প্রভু, সঙ্গীত-গুরুর সঙ্গে কয়েকবার সঙ্গীতের বড় আসরে গান গাইবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বহু শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে যখন আমাকে সাধুবাদে অভিনন্দিত করেছিল তখন মনে হয়েছিল আমি সুখী।

—একলা বসে কখনও কি আনন্দ অনুভব কর না?

—করি প্রভু। সে বিচিত্র অবিশ্বাস্য কথা। কেঁদে আমি আনন্দ পাই। যখন "আমার কেউ নেই"—এই চিন্তা গাঢ় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, তখন চোখ থেকে জল গড়িয়ে আসে আপনিই। আরও একটি কারণে কান্না আমার পায়—মানুষের দুঃখ দেখে।

গুরুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন—এইটিই আমার শেষ প্রশ্ন। বল রঙ্গনাথন যখন বিপদ হয়, দুঃখ খুব গভীর হয়—কাকে ডাকতে ইচ্ছে করে? কাকে মনে পড়ে? কার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়?

—ঠিক জানি না। তবে বিপদে পড়লে আপনার কথা মনে পড়ে, মনে হয় আপনার কাছে গেলেই পরিত্রাণ পাব। কিন্তু দুঃখ গভীর হলে তো কাউকে মনে পড়ে না। মনে হয় আমি একা। কেউ নেই আমার।

কয়েকদিন পর গুরু তাকে ডেকে বলেছিলেন—রঙ্গনাথন, এ কয়েকদিন চিন্তা করে আমি দেখলাম। জীবনের আধেয় তোমার অমৃতের মত। সে অমৃত রাখবার স্বর্ণপাত্র নেই, পাচ্ছ না বলে তোমার এই বেদনা, এই দুঃখ। গানের প্রশংসায় তোমার আনন্দ। গানই হোক তোমার কর্ম; অনেক প্রশংসা পাবে—প্রতিষ্ঠা পাবে। সে সব যদি তুমি গোবিন্দ-চরণের

আধারে সঞ্চয় করতে পার তবে এই জন্মেই মুক্তি হবে তোমার।

সেই সাধনাই করে আসছেন রঙ্গনাথন। একাই চলেছেন তাঁর বীণাটি হাতে। তাঁর বাদকেরা আছে, প্রয়োজনমত আসে। না হলে একাই থাকেন। ঠিক একা নয়—পরিচারক আছে বৃদ্ধ কুড়ুমনি।

সঙ্গীতের জন্য তাঁর খ্যাতি হয়েছে। তাঁর গান হবে শুনলে সহস্র জনের সমাগম হয়। গানের সময় তাদের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে তাঁর বুক ভরে ওঠে আনন্দে। গুরুর কথা স্মরণ করে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে বলেন—তোমাতে অর্পণ করছি। গান-শেষে প্রসাদী মাল্য নিয়ে ফিরে আসেন; ধনীর গৃহ থেকে সম্মান-অর্থ নিয়ে ফিরে আসেন; পথ থেকেই সে আনন্দ মিলিয়ে যেতে শুরু করে। বাড়ীতে এসে বীণাটি পাশে রেখে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই উদাসীনতা আবার তাঁকে আশ্রয় করে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার মধ্যে তাঁর মধ্যমাঙ্গুলি বীণার তারে মৃদু আঘাত করে, মনে যেন ধ্বনি ওঠে—কেউ নেই তাঁর। বিগ্রহের মুখ স্মরণ করতে চেষ্টা করেন। স্মরণ হয় না, তার বদলে ভেসে ওঠে সপ্রশংস-দৃষ্টি কোন শ্রোতার মুখ। কখনও কখনও দুঃখীজনের মুখ মনে পড়ে। কোন ভিক্ষুক। কোন নিপীড়িত মানুষ। তার মধ্যে নারীর মুখও আছে। কিন্তু কোন বিশেষ একটি নারীর মুখ বার বার ভেসে ওঠে না। কিছুদিন থেকে তাঁর মনকে আলোড়িত করেছে এই শবরদের দুঃখ। কিছুদিন আগে তিনি মহাবলীপুরমে সমুদ্রতটভূমি ধরে পদযাত্রা করেছিলেন উত্তরমুখে। এই উদাসীনতা যেন হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের কুয়াশা ও ঘন শীতে বরফ হয়ে জমে স্তূপীকৃত হয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অনেক বেদনাতুরতা ও ভারাক্রান্ততার পর একদিন সারারাত্রি কেঁদে-ছিলেন। পরদিন তুষারাচ্ছন্ন জীবনভূমি ও নির্মল মানসাকাশ নিয়ে তিনি পড়তে বসেছিলেন মহাভারত। সাবিত্রী উপাখ্যান মনকে আকৃষ্ট করেছিল। তার প্রধান কারণ মদ্ররাজ কন্যা মহীয়সী সাবিত্রী। মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা। তিনি যাচ্ছিলেন মাল্যবান পর্বতবেষ্টিত পম্পা-সরোবর দেখতে এবং সেখানে স্নান করতে। ইচ্ছা ছিল সেখানে বসেই সাবিত্রী উপাখ্যান নিয়ে পালা গান রচনা করবেন। ওইখানেই আছে সেই মহামহিমময় ভূমি—যেখানে কৃষ্ণাচতুর্দশীর প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে মৃত সত্যবানের মাথা কোলে রেখে বসে চোখে দেখেছিলেন কৃষ্ণ-জ্যোতিষ্মান মৃত্যুদেবতাকে। ইচ্ছা ছিল গভীর রাত্রে বনে বসে বীণা বাজিয়ে মনে মনে গেঁথে যাবেন স্বর এবং কথা। কিন্তু তা হয় নি। হঠাৎ তিনি রুদ্ধগতি হয়ে গিয়েছিলেন একখানি শবরপল্লীতে। ঝড় উঠেছিল সমুদ্রে। আকাশ নিকষ কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে এল, তার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়। সমুদ্র-বেলাভূমির বালুকণা উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। ভেঙে পড়ছিল তাল নারিকেল শীর্ষ। শাখাপ্রশাখা সমন্বিত গাছ যেগুলি সেগুলির শাখা ভাঙছিল, পাতাগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে যাচ্ছিল, মধ্যে মধ্যে দু'চারটি সমূলে উপড়ে গিয়ে মাটিতে অন্য গাছের উপর সবেগে আছড়ে পড়ছিল। উচ্ছ্বসিত সমুদ্রতরঙ্গ পাহাড়ের মত উঁচু আকার নিয়ে বেলাভূমি পার হয়ে স্থলভাগে এসে প্লাবন বইয়ে দিচ্ছিল। রঙ্গনাথন সমুদ্রকে পিছনে রেখে পশ্চিমমুখে স্থল-ভূমির অভ্যন্তরে আত্মরক্ষার জন্য প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। বহু কষ্টের পর একখানি শবরপল্লী পেয়ে বেঁচেছিলেন। কালটা দিনমান ছিল তাই পেয়েছিলেন—নইলে পেতেন না। নাতিউচ্চ পার্বত্য অঞ্চল। সবটাই ছোট ছোট গাছের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তারই মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ পেয়ে যথাসাধ্য দ্রুত যেতে যেতে হুঁচোট খেয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। জ্ঞান হলে দেখেছিলেন টোডা জাতীয় শবরদের পল্লীতে শুয়ে আছেন একটি ছোট কুটিরে। ঝড় তখন কেটে গেছে। ছোট গ্রাম, পনের-কুড়ি ঘর মানুষের বাস। কুটির নামেই কুটির। তৃণাচ্ছাদিত

কুঁড়ে। কৃষ্ণকায় সরল নরনারীর দল। বন থেকে জীবিকা সংগ্রহ করে। এদের দক্ষিণী রূপ রঙ্গনাথন দেখেছেন। উত্তরে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছিল সে রূপের। মেয়েরা বুকের উপরে কাপড় পরে। কাঁধ খোলা। পুরুষদের কাপড় সামান্য, কোমর থেকে জানু পর্যন্ত। তাও অনেকের নেই, সামান্য কৌপীন সম্বল। জ্ঞান যখন হয়েছিল তখন শিয়রে বসেছিল এক বৃদ্ধা। তাকে তিনি তামিল ভাষাতেই প্রশ্ন করেছিলেন—তোমরা আমাকে বাঁচিয়েছ ?

প্রৌঢ়ার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, কথা সে বলতে পারে নি। এর পর খবর পেয়ে এসেছিল পল্লীর কর্তা। সে বলেছিল, বাঁচাবার মালিক তোমাকে বাঁচিয়েছে। আমরা অচেতন অবস্থায় তোমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। বাঁচবে সে আশা করি নি।

কর্তার পিছনে দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছিল পল্লীর সমস্ত লোক। প্রতিটি জনের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন আনন্দ এবং মমতায় মিশ্রিত প্রসন্ন দৃষ্টি। অকস্মাৎ পিছন থেকে একটা তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ চীৎকার উঠেছিল। নারীকণ্ঠে কে চীৎকার করে বলেছিল—রক্ত রক্ত—ওর রক্ত নে। আমাদের রক্ত নিলে। নে নে। ছাড়্—পথ ছাড়্।

গ্রামের কর্তা চকিত হয়ে বলেছিল—যা যা, ওকে নিয়ে যা। এখানে এল কি করে ? তারপর তাঁর বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন—ও পাগল।

সন্ধ্যার পর থেকে সারারাত চীৎকার করেছিল মেয়েটি। আতঙ্কের চীৎকার। যেন দলে দলে আততায়ীরা তাকে আক্রমণ করতে এসেছে। নিদারুণ আতঙ্কে চীৎকার করেছে।

কর্তা তার বীণাটি এনে পাশে রেখে বলেছিল—এটি আপনার পাশেই পড়েছিল।

—হ্যাঁ। আমার বীণা। ভেঙে গেছে, এতে আর কাজ হবে না। অক্ষত থাকলে গান শোনাতাম। তোমরা প্রাণ বাঁচিয়েছ।

—গান ! কর্তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তুমি গান গাও ?

—হ্যাঁ গাই।

—আমাদের শোনাবে ? আমরা গান ভালবাসি।

—তোমরা গান গাও না ? মেয়েরা নাচে না ?

—নাচত। গাইত। খুব ভাল। ওই পাগল মেয়েটা সবচেয়ে ভাল নাচত। ওটা আমার মেয়ে। কিন্তু—এখন পাগল। শুধু চেঁচায়। ওই চেঁচাচ্ছে, সারারাত চেঁচাবে। মাঝে মাঝে ঘুম আসে, হঠাৎ ঘুম ভাঙে আর চেঁচায়। এলো—এলো। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে। ওর উপর বড় জুলুম করেছে। মরে যদি যেত—

রঙ্গনাথন কি উত্তর দেবেন ? কি বলবেন ? চুপ করে ছিলেন নির্বাক হয়ে। কিছুক্ষণ পর বলেছিলেন—গান গাইব ? শুনবে ? শুধু গলাতেই ?

—গাও। গাও। সেটা ওরও ভাল লাগবে।

তিনি গেয়েছিলেন। ছোট একটি পালা গান। রামায়ণের—গুহক চণ্ডালের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিতালি।

ওই পাগলিনী এসে বসেছিল শান্ত হয়ে। সকলের পুরোভাগে বসেছিল। আশ্চর্য শ্রীময়ী মেয়ে। নিতান্ত তরুণ বয়স। কুড়ির নিচে।

গান শেষ হলে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল—রামচন্দ্রের লোকেরা এসে ঘর পুড়িয়ে দিলে না ?

কর্তা উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে হাত ধরে বলেছিল—উম্মি, উম্মি—সীতারাম, সীতারাম। বলতে নাই। সীতারাম।

—হ্যাঁ। সীতারাম। ভগবান।

—হ্যাঁ। ভ-গ-বা-ন।

—ভগবান দুঃখ দেয় না। জবরদস্তি জুলুম করে না। মানুষ—মানুষে করে। তারপরই চীৎকার করে উঠেছিল—মরে যা। মানুষ মরে যা।

রাত্রে রঙ্গনাথন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—উন্নি কেন ও-কথা বললে?

কর্তা তাকে বলেছিল সব কথা। এ গ্রাম তাদের সেই প্রাচীনকালের বাসভূমি নয়। তাদের বাস ছিল সমুদ্রের ধারে বন্দর শহরের কাছে—খানিকটা দূরে। একসঙ্গে তারা থাকত—প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার। জুলুম তাদের উপর হয়—হত। কিন্তু গত দু-বৎসরে মারাঠা নিজাম আংরেজদের লড়াই হয়েছে। সেই লড়াইয়ে তাদের গোটা গ্রামটা জলেছে চারবার। দুবার জালিয়েছে বর্গীরা, একবার ইংরেজ, একবার নিজাম। যার পথে যখন পড়েছে, সে জালিয়েছে—জুলুম করেছে। ওই মেয়েটাকে—উন্নিকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ধরে রেখেছিল তিন দিন। তিন দিন পর যখন ছেড়ে দিলে—তখন ও পাগল। রাত্রি হলেই চীৎকার করে—না—না—না। ছেড়ে দে। ছেড়ে দে। মেরে ফেল্ মেরে ফেল্। সারারাত। দিনের বেলা নতুন লোক দেখলে ছুটে গিয়ে লুকোয়। লোকজন থাকলে তখন চেঁচায়—রক্ত নে, রক্ত নে। ওরা কেন রক্ত নিলে! আমাদের গ্রামে চারবারে তারা কুড়িজনের বেশী লোককে খুঁচিয়ে মেরেছে ও দেখেছে। সেই থেকে আমরা গ্রাম ছেড়ে এই বনে এসে ঘর বেঁধেছি। এই দেখ—এখনো ঘরগুলান ভাল করতে পারি নি। ঝুপড়ি বেঁধে আছি। এখনও সব বলছে—ইখানেও নয়—চল—আরও বনের ভিতরে চল। যেখানে কেউ খোঁজ পাবে না।

রঙ্গনাথনের চোখ জলে ভরে উঠেছিল। সারারাত ঘুমোতে পারেন নি। পরের দিন তিনি তাদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে মাল্যবান পম্পাসরোবরের দিকে পিছন ফিরে, ফিরে এসেছিলেন মান্দ্রাজের প্রান্তে তাঁর আশ্রমে।

মনের মধ্যে শুধুই ভেবেছিলেন এদের কথা। এই সরল মানুষ, দীন মানুষ, বঞ্চিত মানুষ, পদানত মানুষদের কথা। কেন? কেন এত অত্যাচার এদের উপর? কেন এত অবজ্ঞা? কেন এত ঘৃণা? মহাভারত মনে পড়েছিল।

মহাবলীপুরমে পাথরের বুকে খোদাই করা অর্জুনের তপস্যা-কাহিনী মনে পড়েছিল।* অর্জুনের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে স্বয়ং মহারুদ্র এসেছিলেন কিরাত বেশে—সঙ্গে এসেছিলেন কিরাত নারীবেশে স্বয়ং পার্বতী। এইটি অবলম্বন করেই তিনি নতুন গান রচনা করে বলবেন এরা সেই রুদ্রের বংশধর। অস্পৃশ্য নয়, পরম পবিত্র—বিপুল শক্তির অধিকারী। তারপর মনে পড়েছিল—ধর্মব্যাধের কথা, যাঁর কাছে গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ কুমার কৌশিক ব্রহ্মকে জানবার জন্য। তার কিছুটাও জুড়ে দিয়েছিলেন।

কৌশিককে ব্যাধের কাছে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন এক পতিতা নারী। তিনিই বলেছিলেন—ঘৃণা নিয়ে যেয়ো না। মনে রেখো—ওই কৃষ্ণবর্ণ মানুষগুলির অন্তর-মন্দিরে যিনি বসবাস করেন—তাঁরই বসতি সর্বোচ্চ স্বর্গে, গোলক নিবাসে। এইটুকুই হয়েছিল ভূমিকা এবং এইটুকুই কিছু বিশদ করে হয়েছিল উপসংহার। পথেই শুরু হয়ে গিয়েছিল রচনা। ফিরে এসে রচনা করেছেন আর কেঁদেছেন। এই রচনার সময়েও একদিন তিনি ওই শবরকন্যা লল্লার দূরাগত সঙ্গীত শুনেছিলেন। ভগবানের স্তবগান করে বোধ হয় ভিক্ষা করছিল। কন্যাটি

* এখন এই খোদাই চিত্র ভগীরথের তপস্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে অর্জুনের তপস্যা নামেই পরিচিত ছিল।

বিচিত্র। শুনেছিলেন যোশেফের আপন জন, নাকি আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরের কন্যা। এই ব্যবসায় আরম্ভ করেছিল লল্লারই বাপ। যোশেফ তখন যোশেফ হয় নি। তবে পাদ্রীদের কাছে যাতায়াত ওর অনেক দিন থেকেই। গীর্জার সংলগ্ন বাগানেও কাজ করত। বাড়ি থেকে ঝগড়া করে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর লল্লার বাপের মৃত্যুর পর গ্রামে ফিরে দাদার ব্যবসায়ের ভার নিয়েছিল। অল্প চার-পাঁচ বছরেই সে সমৃদ্ধ করে তুলেছে তার ব্যবসায়। এখন ব্যবসায় তার। এরই মধ্যে সে নিজে খৃষ্টান হয়েছে, তার গ্রামের আরও অনেককে খৃষ্টান হতে প্রলুব্ধ করেছে। মাদ্রাজে কোম্পানীর চাকরি বড় প্রলোভন। তার সঙ্গে পোশাক, মর্যাদা—অনেক কিছু। হিন্দু-সমাজের যারা মাননীয়, যাদের সঙ্গে এক পথে হাঁটবার উপায় নেই, যাদের গায়ে কোনরকমে তাদের ছায়া পড়লে তাদের অপরাধ হয়—তাদের উপেক্ষা করার, অস্বীকার করার অধিকার পেয়ে ওরা প্রমত্ত উল্লাসে মেতে উঠেছে। মুক্তিও পেয়েছে বইকি। গ্রামে তাদের এখন পাদ্রীদের পাঠশালা হয়েছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পাচ্ছে। লল্লাও শিক্ষা পেয়েছিল। তার মায়ের আপত্তিতেই ধর্মান্তর তারা গ্রহণ করে নি। নইলে—। না না, তা তো নয়। মেয়েটির গান শুনে তা তো মনে হয় না। মেয়েটি সুকণ্ঠী—তার ওপর ওই টোডা মেয়েটির—ওই উন্নির চেয়েও সুশ্রী। তার উপর একটি মার্জনা আছে। শিক্ষার মার্জনা—নগর বাসের মার্জনা। এই মেয়ে—। সে কি এইখানে এসেছিল সংবাদ সংগ্রহ করতে? তার চোখে যে জল তিনি দেখেছিলেন—তা কি শান্ত সমুদ্রের নিস্তরঙ্গতাকে বিষণ্ণতা ধরে নেওয়ার মত একটি কল্পনা! মাত্র স্বেচ্ছাকৃত ভ্রম! যোশেফও তাঁর অপরিচিত নয়। তার সঙ্গীরাও তাঁর পরিচিত। কতদিন তারা গান শুনে যায় তাঁর আশ্রমের সামনে ওই বেলাভূমে বসে। দেখা হলে প্রসন্ন হাসিতে ভরে ওঠে তাদের মুখ, চোখ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে জলন্ত প্রদীপের মত। অপরিমেয় ভালবাসা তারা ব্যক্ত করেছে সামান্যতম উপলক্ষে। আশ্রমের বাঁশের কটকটির পাশে রেখে যায় ফুলের গুচ্ছ। সবুজ কাঁচা নারিকেল, পরিপুষ্ট কলা, অমৃত ফলের সময় অমৃত ফল—বাঁশের নতুন আধারে সাজিয়ে এসে ডাকে—আচার্য! আচার্য!

তিনি শুনতে পেলেই বাইরে এসে বলেন—এস। আমার এখানে কোন সঙ্কোচ নেই। এস।

তারা হাসিমুখে এসে পাত্রটি নামিয়ে দিয়ে বলে—আমার বৃক্ষের ফল। আপনার জন্য এনেছি।

তিনি তুলে নিয়ে বলেন—আজ আমার দেবতা পরম তৃপ্তিতে ভোজন করবেন ভদ্র।

রঙ্গনাথন তাদের ভদ্র ছাড়া সম্বোধন করেন না।

অবশ্য এসব আদান-প্রদান খৃষ্টান শবরদের সঙ্গেই বেশী হয়। খৃষ্টানেরাও আসে—যোশেফই এসেছে। সে একবার তাঁকে নারিকেল রজ্জুর সুন্দর পাপোশ তৈরী করে এনে দিয়ে গেছে। তার কণ্ঠস্বর সঙ্কোচহীন কিন্তু সহজ নয়। ওই সঙ্কোচ বর্জনের প্রয়াসেই কিছুটা যেন অস্বস্তিকর। ডেকে বলেছিল—সঙ্গীতাচার্য, রয়েছ নাকি?

—কে?

—আমি যোশেফ।

—এস এস।

—তোমার জন্য এই পাপোশটি নিয়ে এসেছি। দেখ তো, সুন্দর হয় নি?

—সুন্দর—সুন্দর হয়েছে ভদ্র।

—ভদ্র কেন বলছ। বল যোশেফ।

—বেশ তাই বলব।

—হ্যাঁ। আমি তো এখন একজন খৃষ্টান জেন্টু। জান তো?

—হ্যাঁ জানি।

—আমি তোমাকে সঙ্গীতাচার্য রঙ্গনাথন বলব। কিছু মনে করবে না তো?

—না না। কেন মনে করব!

—এই কারণেই তোমার জন্যে এটি আনবার ইচ্ছা হল। ওই সব ব্রাহ্মণ আচার্যদের আমি এ সব দিই না। তারপর বলেছিল, জান সঙ্গীতাচার্য, তোমার গান শুনবার আমার ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমরা অনেকেই তো প্রভু যীশুকে ভজনা করি। তাই ভয় হয় যদি প্রভু রুষ্ট হন। পাদ্রী বাবারা রুষ্ট হবেন এ নিশ্চিত। নইলে রীতিমত তোমার দক্ষিণা দিয়ে পালা গান শুনে একদিন আনন্দ করতাম। তুমি যেতে আচার্য?

একটু ভাবতে হয়েছিল তাঁকে। গেলে হয়তো উচ্চবর্ণের সমাজে, দেবমন্দিরে তাঁর প্রবেশপথ রুদ্ধ হতে পারে।

যোশেফ বলেছিল—তোমার ইচ্ছা আছে সে আমি জানি আচার্য। আমার মত তোমারও ভাবতে হচ্ছে পুরোহিত পণ্ডিত সমাজপতিদের কথা। হ্যাঁ, ভাবনার কথা।

—হ্যাঁ যোশেফ, ভাবছি তাই।

—থাক আচার্য। তোমার গান আমরা দূর থেকেই শুনব। কিন্তু তোমার গানে তুমি বড় বেশী কাঁদাও।

কালো মানুষটি শুভ্র সুন্দর সুগঠিত দুপাটি দন্ত বিস্তার করে হেসেছিল—আমরা হাসতে ভালবাসি। বলে সে চলে গিয়েছিল। যেতে যেতে আবার ফিরে এসে বলেছিল—আচ্ছা একটা কথা বলতে পার?

—কি বল।

—হাসতে ভালবাসি। তোমার গানে কাঁদতে হয়। তবু যাই। আর কেঁদেও সুখ হয়। কেন বল তো? হেসে রঙ্গনাথন বলেছিলেন—তোমারই মত—ওর উত্তর আমি জানি না যোশেফ।

—আমার ভাইঝি—সে খুব ভাল গান গায়। খুব ভাল কণ্ঠ। আর শুনেই শিখে নেয়! মধ্যে মধ্যে যখন মেজাজ খারাপ হয় ওকে ডাকি। গান গাইতে বলি। শুনে মেজাজ ভাল হয়।

—হ্যাঁ। দূর থেকে ওর গান শুনেছি আমি। সুন্দর কণ্ঠ।

—ওকে দেখেছ? সুন্দর দেখতে। ওকে আমাদের খৃষ্টান পাঠশালায় লেখাপড়াও শিখিয়েছি। দাদা মারা গেল। ভার তো আমার ওপর। ইচ্ছা ছিল ভাল লেখাপড়া শেখাব, খৃষ্টান করে দেব—ভাল বিয়ে হয়ে যাবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কত ছোকরা ইংরেজ কর্মচারী আসে। তারা এখানে বিয়ে করে। তা দাদা ছিল গোঁড়া আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ওর বউটা আরও বেশী। সেই মা-ই ওকে হতে দেয় নি খৃষ্টান। রাগ করে আমার কাছ থেকে একমুঠো চালও নিত না। ভিক্ষে করে খেতো। আমিও খুব কড়া লোক, খুব কড়া। আমিও দিই নি। তা ছাড়া আইনের ভয় আছে। জান তো, ও থেকেই ওরা বলতে পারে আমরা এক সংসার। সব কিছুতে তাদের ভাগ আছে। মেয়েটার বিয়ে হবে—জামাই দাবী করবে। ওর মা-টা অন্ধ হয়েছিল—মেয়ের হাত ধরে গান গেয়ে ভিক্ষে করত। রোজগার ভাল হত আচার্য। মেয়েটা এখন মায়ের গোঁড়ামি পেয়েছে। মা বলত, খৃষ্টান হতে কখনও দেব না।

তার চেয়ে কোনও মন্দিরে দিয়ে আসব, মন্দিরের চারপাশ ঝাড়ু দেবে, বাইরে দাঁড়িয়ে গান করবে—ওর গতি হয়ে যাবে।

অবাক হয়ে শুনেছিলেন রঙ্গনাথন। এ সবই নূতন কিছু নয়। শুনেছেন। তিনি বৈষ্ণব—কত অচ্ছুৎ ভক্ত জীবনে সন্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এমন করে চোখের সামনে ঘটছে—অথচ জানেন না—এইটেতে বিস্ময় তাঁর।

যোশেফ বলেছিল—মেয়েটা নাচতেও পারে। এখন ওর ইচ্ছে ভাল করে নাচ শেখে, গান শেখে। কোন কথাকলির দলে ওকে দেওয়া যায় না আচার্য? তুমি একটু সাহায্য করতে পার না? ঠিক বলছি তোমাকে, লল্লা খুব নাম করবে। খুব ভাল পারবে।

এ সব ঠিক পম্পাসরোবর যাবার আগের কথা। পম্পাসরোবর যাবেন—স্নান করবেন—সাবিত্রীর উপাখ্যান নিয়ে পালা রচনা করবেন এই ভাবনার মধ্যে যোশেফ লল্লা এদের কথা মনেই পড়ে নি। পথে ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে টোডা গ্রাম থেকে ফিরে আসবার পথে কিন্তু ওই উন্নি মেয়েটির সঙ্গে লল্লার স্মৃতি জড়িয়ে গিয়েছিল। উন্নিকে মনে হলেই তার পিছনে লল্লা এসে দাঁড়াত। মনে হত লল্লার ভাগ্যেও হয়তো এমনই দুর্গতি লেখা আছে। ভেবেছিলেন যোশেফকে ডেকে বলবেন—যোসেফ, লল্লা তোমার ভাইঝি! দেশকাল তো দেখছ। আজ যুদ্ধ—কাল যুদ্ধ। রাজারা সব সামুদ্রিক ঝড়ে নারিকেল সুপারি বৃক্ষের মত পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে লল্লাকে এমন ভিক্ষা করে বেড়াতে দিয়ো না। ওর বিয়ে দাও। সংসারী করে দাও। পল্টনের সিপাহী—সে তোমার যেমন দেশী হিন্দু মুসলমান, তেমনি ফিরিঙ্গী। এদের কাছে আমরা সবাই দুর্বল। তার উপর মান্দ্রাজ নগর দিন দিন বড় হচ্ছে। নানান স্থানের ধনী আসছে, দুষ্ট আসছে। এরাও বর্বর। সংসারে মানুষ ভূমি আর নারীর প্রলোভনে জন্তু হয়ে যায়। কন্যাটির বিয়ে দিয়ে ওকে কিছুটা রক্ষা কর, নিরাপদ কর।

ভেবেছিলেন বলবেন, কিন্তু তাও ভুলে গেছেন। বলা হয় নি। যোশেফও এদিকে আসে নি। লল্লার কণ্ঠস্বর দূর থেকে তাঁর কানে আসে নি। তিনি নিজেও রচনার কাজে এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগ ছিল না।

লল্লাকে এরপর দেখেছিলেন কাঞ্জীভরমে—বরদরাজের মন্দিরচত্বরে এই গান প্রথম দেবতা ও সাধারণের সামনে গাইবার দিন। মন্দির প্রবেশপথে গোপুরমের বাইরে সে দাঁড়িয়েছিল অস্পৃশ্য শ্রোতাদের মধ্যে।

মেয়েটিকে দেখে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। এ কি লল্লা নয়? হাতে করতাল, কাঁধে ভিক্ষার ঝোলা? রঙ কৃষ্ণবর্ণ নয়, শ্যামবর্ণ। সুন্দর মুখশ্রী। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী। পরনের হরিদ্রাবর্ণ মোটা কার্পাস বস্ত্রখানি নিম্নপ্রান্ত বাহুবন্ধনীর আকর্ষণে হাঁটুর উপরে উঠেছে। খাটো অঞ্চলখানি কোনমতে বুকের বক্ষাবরণীকে ঢেকে কাঁধ পার হয়ে পিঠে পড়েছে। মাথায় রুক্ষ কালো চুলের রাশি—রঙীন ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে তাল পাকিয়ে পরিষ্কার বাঁধা। তাতে একগুচ্ছ ফুল।

দেখে একটি টুকরো স্মিত হাসি বিকশিত হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখে। ভিখারিণী হলে কি হবে, জীবনে যৌবন-ধর্মের লীলা অমোঘ। তৈলহীন অবিন্যস্ত চুলের বোঝার উপরে পুষ্পগুচ্ছটি গুঁজেছে লল্লা। লল্লার দৃষ্টিতে মুগ্ধ সম্ভ্রম। তার প্রতি দৃষ্টিপাতের জন্য তার চোখে ওই মুগ্ধ সম্ভ্রমের শিখা জ্বলে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে সশ্রদ্ধ হাসি। সে যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। করতাল নিয়েই হাত দুটি কৃতাঞ্জলিতে আবদ্ধ করেছিল লল্লা। মণিবন্ধে অনেকগুলি শঙ্খবলয় পরেছে, হাতের আঙুলগুলি দীর্ঘ—তার অনামিকায় পিতলের অঙ্গুরীয়। পায়ে? পায়ে

ভূষণ পরে নি ? হ্যাঁ, তাও পরেছে। রূপদস্তার চরণভূষাও পরেছে।

আসবার সময়ও দেখেছিলেন। গোপুরমের মাথায় ঝোলানো বড় দীপাধারটির আলো পরিপূর্ণভাবে তার মুখে পড়েছিল। শুভ্র চক্ষুচ্ছদ রক্তাভ মনে হয়েছিল। চক্ষুপল্লবের দীর্ঘ রোমগুলি সিক্ত। লল্লা গান শুনে কেঁদেছিল।

সেদিন রাত্রে লল্লার কথা ভেবেছিলেন। চিন্তিত হয়েছিলেন। যে যৌবন-ধর্ম পুষ্পিত বৃক্ষের পুষ্পগুচ্ছের দিকে তার অন্নকাঙাল ভিক্ষাপাত্রবাহী হাতটিকে ভিক্ষাপাত্রের কথা ভুলে প্রসারিত করে—সেই যৌবন-ধর্মে মানুষ মাটির বন্ধুরতার কথা ভুলে গিয়ে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে পথ হাঁটে। মৃত্তিকা পরমাশ্রয়—সে আশ্রয়ে পাথর কাঁটা কীট পতঙ্গ সরীসৃপ খানাখন্দরের তো অভাব নেই। আবার জ্যোৎস্নার বিষম-লাগা চোখে রঙীন সাপকে মালা ভ্রম করে গলায় পরাও তো বিচিত্র নয়।

মনে পড়েছিল উন্নিকে। শিউরে উঠেছিলেন। লল্লাও পাগল হয়ে যাবে না তো! কাঞ্চীভরম থেকে ফিরে এসেই তিনি যোশেফকে বলবেন ভেবেছিলেন। কাঞ্চীভরম থেকে পরদিন প্রাতে এক প্রহরের সময় রওনা হয়েছিলেন। সকলে প্রত্যাশা করেছিলেন শিবকাঞ্চী থেকে তাঁর আহ্বান আসবে। এর পূর্বে পূর্বে তাই হয়েছে। তিনি বৈষ্ণব—বরদরাজের শতস্তম্ভ মণ্ডপে গান তিনি প্রথম করে থাকেন, তারপর আহ্বান আসে শিবকাঞ্চী থেকে। একে একে একাম্বরেশ্বর, মাতঙ্গেশ্বর, ঐরাবতেশ্বর, ত্রিপুরান্তকেশ্বর মণ্ডপে গান তিনি করেন। কোনবার এক যাত্রাতেই সেরে আসেন—কোনবার এক যাত্রায় সম্ভবপর হয় না, দুবার তিনবার যেতে হয় কাঞ্চীভরমে। এবার কোন মন্দির থেকে আহ্বান আসে নি। তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন একাম্বরেশ্বর মন্দিরে কর্তৃপক্ষের কাছে। রঙ্গনাথন কাল প্রভু বরদরাজকে গান শুনিয়েছিলেন—আজ প্রভু একাম্বরেশ্বরের মণ্ডপে—

মধ্যপথেই রূঢ়ভাবে বাধা দিয়ে মঠাধীশ বলেছিলেন—না।

লোকটি বিস্মিত হয়েছিল। সঠিক বুঝতে পারে নি। সে কিছুটা বিভ্রান্তের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই ছিল, বলতে কিছু পারে নি, চলে আসতেও পারে নি।

মঠাধীশ বলেছিলেন—একাম্বরেশ্বর সম্প্রতি দ্বাররুদ্ধ করেছেন। অর্জুনের তপস্যায় যে কিরাত বেশে এসেছিলেন—সেই কিরাত বেশের জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করবেন চিন্তা করছেন। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হলে রঙ্গনাথন পালাটিকে যখন সম্পূর্ণ করবে তখন শুনবেন একাম্বরেশ্বর।

লোকটি ফিরে এসে সব বলতে রঙ্গনাথনও একটু চিন্তিত হয়েছিলেন। তিনি কি ভুল করেছেন ? কোথাও কোন অপরাধ করেছেন মহেশ্বর মহিমা কীর্তনে ? চিন্তান্বিত হয়েই ফিরেছিলেন আশ্রমে।

আশ্রমে ফিরে আগাগোড়া রচনাটি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন—খুব যত্ন এবং তীক্ষ্ণ সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছিলেন। কোথাও কোন অপরাধ তো চোখে পড়ে নি! হঠাৎ মনে হয়েছিল—ব্যাস লিখেছেন—স্বর্ণকান্তি কিরাতরূপী মহাদেব। হ্যাঁ, এখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন—হিমগিরির অরণ্যে যিনি হিমাচলে কাঞ্চনজঙ্ঘার জ্যোতিস্নাত হয়ে স্বর্ণকান্তিতে বিচরণ করেন—তিনিই নীলগিরিতে বিচরণ করেন নীলাভ কৃষ্ণকান্তিতে, নীলসমুদ্রের লাবণ্য অঙ্গে মেখে শবর বেশে। তাতে অপরাধ হয়েছে ? না—কখনও না! আর কি ? মহাভারতে অঙ্গগন্ধের কথা নেই। তিনি অঙ্গগন্ধের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, দেবতা যখন ব্যাধ শবর বেশ ধারণ করেন তখন তাঁর দেবগন্ধকে লুকিয়ে কটুগন্ধই ধারণ করেন অঙ্গে। এতে অপরাধ হয়েছে ? না। স্বীকার করতে তিনি পারেন নি।

পরদিন পত্র লিখতে বসেছিলেন তিনি।" লিখেও ছিলেন—"মহামান্ত পূজ্যপাদ আচার্যদেব, দেবাদিদেব একাম্বরেশ্বর দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিরাতবেশ ধারণের জন্ত 'প্রায়শ্চিত্তের চিন্তা করিতেছেন অবগত হইয়া কৌতূহলবশে একটি প্রশ্ন নিবেদন করিতেছি। দেবাদিদেব কি অনাদিকাল হইতে শ্মশানবাসের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত-কথাও চিন্তা করিতেছেন না?"

লিখে অনেকক্ষণ পত্রখানি ধরে বসেছিলেন। পাঠাবেন?

এই সময়েই তিনি গান শুনতে পেয়েছিলেন। সমুদ্রতটে বসে কেউ গাইছে। অতি মিষ্ট নারীকণ্ঠ। এই লল্লা! লল্লা গাইছে। উপকূল অভিমুখী সমুদ্রবায়ু বয়ে নিয়ে আসছে। তিরক্কুলের পদ। দ্রাবিড় ভারতের ঋষি তিরুবল্লুবর, প্রণাম তোমাকে। কি রচনাই দিয়ে গেছ! লল্লা গাইছে—

বেণু বীণা রবে কেন এত মিছে মোহ—
বালগোপালের হাসি-কাকলী
শুনিস নি কি তোরা কেহ?

বাঃ! এর আগে অবশ্য এমন করে মন দিয়ে কখনও লল্লার গান শোনেন নি রঙ্গনাথন। কানে ঢুকেছে—ভাল লেগেছে ওই পর্যন্ত। তখন লল্লা সম্পর্কে কোন বিশেষ কৌতূহল ছিল না। সেদিন তাঁর মনে কৌতূহলের অনেক কারণ ছিল।

ওর সম্পর্কে যোশেফের কথাগুলি রঙ্গনাথনের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। খৃষ্টান হয়েছে বলে যোশেফের তণ্ডুলমুষ্টির সাহায্যও নেয় না। খৃষ্টান হবে না বলে গান গেয়ে ভিক্ষা করে খায়। ওদের পোশাকের লোভ সামলেছে। ওদের প্রবল প্রতাপের মোহেও আচ্ছন্ন হয় নি। ওদের সাদা রঙ ওর চোখে কাজল পরায় নি। মনে মনে হয়েছিল—বাঃ বাঃ বাঃ।

তারপর উন্নিকে দেখে ওর সম্পর্কে একটি আশঙ্কা জেগেছিল। যদি অসহায়া বালিকাটি এমনি করে পাগল হয়ে যায়! আহা-হা-হা!

পরশু কাঞ্চীভরমে গোপুরমের সামনে কৃতাঞ্জলিপুট লল্লার চোখের শ্রদ্ধাভারাবনত দৃষ্টি দেখে অন্তরে অন্তরে স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

আজ গান গাইছে—সে গান মহর্ষি তিরুবল্লুবরের তিরক্কুলের পদ। সপ্রশংস হয়ে উঠলেন রঙ্গনাথন—অনেক শিখেছে লল্লা।

তিনি সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সমুদ্রতটে এসে দেখেছিলেন নারিকেলকুঞ্জে একটি বৃক্ষকাণ্ডে ঠেস দিয়ে বসে সে গাইছে।

কৃষ্ণ গোপাল—কৃষ্ণ গোপাল—কৃষ্ণ গোপাল—
বরদরাজ—বরদরাজ—বালগোপাল!

অংশটুকু লল্লা নিজে জুড়েছে ওর সঙ্গে। বুদ্ধিমতী লল্লা। বাঃ! পিছন দিক থেকে এসে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে সরবে 'বাঃ' কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন।

চমকে উঠেছিল লল্লা। চকিত ভঙ্গিতে পিছন ফিরে তাঁকে দেখেই লজ্জায় আনত হয়ে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যেন পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গিয়েছিল। রঙ্গনাথন বলেছিলেন—বাঃ! তুমি তো বড় চমৎকার গান কর! সুন্দর!

লল্লা উত্তর দিতে পারেনি। নীরবে আরও একটু যেন নত হয়ে গিয়েছিল। রঙ্গনাথন আর কথা খুঁজে পাননি। না পেয়েই বোধ হয় বলেছিলেন—থামলে কেন? গাও।

অতি মৃদু জড়িত কণ্ঠে সে বলেছিল—না প্রভু। আপনার সামনে গাইতে পারব না।

তার সে কথায় আশ্চর্য আবেগ ছিল, কথা বলতেই কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সেইটিই

তার সব থেকে বড় আকৃতি।

এবার রঙ্গনাথন বলেছিলেন—তিরুককুলের পদ শিখলে কি করে?

—মঠে শুনেছি প্রভু। শুনে শিখেছি।

—শুনে?

—হ্যাঁ প্রভু। যেটুকু মনে থাকে লিখে রাখি।

—লিখতে পার তুমি? ও হ্যাঁ—যোশেফ বলেছিল, তুমি পাদরীদের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখতে।

—অল্প শিখেছিলাম। তারপর মা আর পড়তে দেয়নি।

—শুনেছি।

—মা বলেছিল, লল্লা, তোর বাপ বলত কলাত্তন্নী আমার বরদরাজ স্বামীর কিরূপা পাবে।

—কলাত্তন্নী কে?

এবার মুখ তুলে স্মিত হেসে বলেছিল—আমি প্রভু। ডাকনাম আমার লল্লা। ছেলেবেলা থেকে গাইতে পারতাম, নাচতাম গান গেয়ে, বরদরাজের নাম গেয়ে। তালি দিত বাপ, তাল ভঙ্গ হত না। তাই বাবা নাম রেখেছিল—, কাঞ্চীতে গিয়ে নামটা নিয়ে এসেছিল; এক বৈষ্ণব সাধুর কাছে বাবা আমার কথা গল্প করেছিল—আমার গল্প ফুরোত না তার। সাধু বলেছিলেন, এ কন্যা তোমার কলাত্তন্নী কন্যা—বরদরাজ কিরূপা করবেন।

রঙ্গনাথন বুঝলেন, একটু হেসে বললেন—ও! কলাবন্তী!

—হ্যাঁ প্রভু, কলাবন্তী। লজ্জিত ভাবে আবার সে মাথাটি নামাল।

আপন মনে রঙ্গনাথন শব্দটি বার তিনেক উচ্চারণ করলেন—কলাবন্তী। কলাবন্তী। কলাত্তন্নী।

তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন—কলাত্তন্নী—কল্যাণী! কল্যাণী! তুমি কল্যাণী হবে তার চেয়ে।

মাথা সে আবার তুললে—কল্যাণী!

—হ্যাঁ, কল্যাণী। কলাবন্তীও তুমি বটে, কল্যাণীও তুমি বটে। তোমার কল্যাণী রূপটিই আমার ভাল লাগে লল্লা। আমি তোমাকে কল্যাণীই বলব।

মুগ্ধ কণ্ঠে কৃতার্থের মতই সে বলেছিল—কল্যাণী!

—হ্যাঁ, কল্যাণী। নৃত্যগীতে পারঙ্গমা হয়ো তুমি। কলাবন্তী নাম তোমার সার্থক হোক। কিন্তু জীবনে তুমি কল্যাণী হবে।

দূর থেকেই সে প্রণতা হয়েছিল বেলাভূমের উপর। রঙ্গনাথন পরম স্নেহে এগিয়ে গিয়ে তার মাথার রুক্ষ কেশরাশিতে হাত রেখে বলেছিলেন—কল্যাণী হও।

সেই ভূমিষ্ঠ অবস্থাতেই সে চমকে উঠেছিল—তার সে চমক তিনি মাথায় হাত দিয়েই অনুভব করেছিলেন। সে উঠে কাতরস্বরে বলেছিল—আমাকে ছুঁলেন প্রভু!

রঙ্গনাথন বলেছিলেন—তুমি সেদিন আমার গান শুনেছ কাঞ্চীভরমে। শোন নি, বৈকুণ্ঠ-ধামে যাঁর বসতি তিনিই বাস করেন পৃথিবীতে, মানুষের সাদাকালো সকল চর্মের অন্তরালে? এ কি, তুমি কাঁদছ?

হাসবার চেষ্টা করে চোখ মুছে সে বলেছিল—এ শুনলে আমার কান্না পায় প্রভু। এমন কথা তো কেউ বলে না। আপনি বড় ভাল—প্রভু, আপনি বড় ভাল।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়েছিল যোশেফকে যে কথাটা বলবেন ভেবেছিলেন সেই কথাটা। এই

মেয়ে, এমন কণ্ঠস্বর, এমন সুগঠিত দেহ—নবপল্লবের মত শ্যাম দেহবর্ণ যা শবরদের মধ্যে দুর্লভ; এই দুটি দীর্ঘায়ত চোখ; এই কন্যা—আর এই মাৎস্যন্যায়ের কাল, এর—

উন্নিকে মনে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন—তোমার অভিভাবক কে কল্যাণী?

তিনি তার দিকে চেয়ে ছিলেন, সে আনত দৃষ্টিতে মাথা নীচু করে বসে ছিল। নীরবতার পর এই বাক্যক'টি হারিয়ে গিয়েছিল, সে ধরতে পারেনি। তিনি আবার ডেকেছিলেন—কল্যাণী!

—আমাকে বলছেন প্রভু?

—হ্যাঁ। এই মাত্র যে তোমার নাম দিলাম কল্যাণী।

হেসে সে বললে—কলাত্তম্মী নামও আমার সবসময় খেয়াল থাকে না। লল্লা না বললে—হাসলে আরও একটু।

—তোমার অভিভাবক কে? যোশেফ?

—অভিভাবক? না প্রভু। মানুষ কেউ আমার অভিভাবক নেই। নিতান্ত বালিকা বয়সে, আমার তখন ছ-সাত বছর বয়স—

—জানি, যোশেফ আমাকে বলেছে। বলেছে—সে তোমাকে খৃষ্টান-ধর্মে—

—ও কথা শুনতেও আমাকে বারণ করে গেছে আমার মা। আমার বাবা বলে গেছে আমি বরদরাজের কৃপা পাব। আমার কাকা আমার অভিভাবক নয়।; সে আমাদের সব নিয়ে নিয়েছে। ও ব্যবসা তো আমার বাবার ব্যবসা। বাড়ি জমি তাও নিয়েছে। আমাকে হয়তো—আমাকে বেচে দেবে ফিরিঙ্গীদের কাছে।

তার সুন্দর শান্ত চোখ দুটি উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। মসৃণ ললাটখানি ভরে উঠেছিল সারি সারি কুঞ্চনরেখায়। রঙ্গনাথন বলেছিলেন—তাহলে কে তোমার অভিভাবক?

—মা মরবার সময় বলে গেছে—লল্লা, বরদরাজ তোকে দেখবেন।

কথাটা এবার ঘুরিয়ে পেড়েছিলেন তিনি—তোমার বাবা কি তোমার বিয়ের কোন সম্বন্ধ করে যায় নি?

—না প্রভু।

—তোমার মা?

—তিনিও না। তিনি বলে গেছেন, এদের কাউকে বিশ্বাস নেই লল্লা। এরা সব খৃষ্টান হয়ে যাবে। তুই ওই বরদরাজের মন্দিরের চারপাশ ঝাড়ু দিবি। ভিক্ষা করবি।

—তা হলে—

—আমি তাই করব প্রভু। গান গাইতে পারি, ছেলেবেলা থেকে গান গেয়ে ভিক্ষে করি। বাইরে—দেবস্থানেই বেশী কেটেছে আমার। গ্রামে কখনও কখনও আসি। এদের মতন থাকা—সে আমি আর পারব না প্রভু।

সে অকস্মাৎ সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরালে। তারপর বললে—আজ আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম প্রভু। কথাকলি নাচ শিখবার আর গান শিখবার যদি কোন সুবিধা করে দেন—

—তোমার কাকাও আমাকে বলেছিল—

—সে আমার শত্রু। তার নাম আপনি করবেন না। শুধু আমার নয়—আপনারও। আজ সকালে কাঞ্চী থেকে এসে গ্রামে গিছলাম। সেখানে দেখলাম কাকা আপনার নামে গজরাচ্ছে। বলছে, গান গেয়ে শবরদের আপনি অপমান করেছেন। আপনাকে দেখবে।

রঙ্গনাথন সবিস্ময়ে বললেন—আমি অপমান করেছি ?

—তারা তাই বলছে।

—তুমি ? তুমিও তো শবরকন্যা কল্যাণী। তোমার মনেও কি আঘাত লেগেছে ?

—সেদিন রাত্রে গান শুনতে শুনতে কেঁদেছিলাম। আপনি যখন বেরিয়ে এলেন তখনও চোখের পাতায় জল লেগে ছিল। ভালবাসায় মানুষ কাঁদে—সে কান্না সেইদিন কেঁদে বুঝেছি।

—তবে এরা কেন রাগ করলে বলতে পার ?

—তা তো জানি না। শুধু এরাই নয়, শিবকাঞ্চীতে তারা নাকি আপনাকে কখনো ডাকবে না।

—সেটা জানি।

তারপর অনেকক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে—লল্লা ছিল মাটির জগতের দিকে তাকিয়ে। সমুদ্র দ্বিপ্রহরের আভাসে ঘনতর নীল এবং তরঙ্গশীর্ষ তীব্রোজ্জ্বল রৌদ্রচ্ছটায় ঝলমল করে উঠে পরক্ষণেই গাঢ় নীলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। তিনি শুধু ভাবছিলেন—কেন ?

—কেন ? এরা এমনি—

—প্রভু !

—কিছু বলছ ?

—আপনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। এবার যাবার সময় আমি চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করি ?

—নিশ্চয়। তুমি কল্যাণী। আর আমার প্রভুর কাছে সংসারে সব মানুষ সমান। হয়তো লল্লা, সবাই তিনি। ভক্ত শুধু আমি।

—কি সুন্দর কথা প্রভু !

প্রণাম করে উঠে সে বলেছিল—আমার নাচগান শিখবার সুযোগ কি হবে না প্রভু আমি শবরী বলে ?

—দেখব আমি। এবং হবে, নিশ্চয় হবে।

বেলাভূমির নারিকেল সুপারির ঘন বীথিকার মধ্য দিয়ে সে চলে গিয়েছিল। তিনি চিন্তিত মনে ফিরে এসেছিলেন—কেন ? কেন ? কোথায় কোন্ ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটল ?

অনেকক্ষণ পর তিনি চিত্তকে দৃঢ় করে বলে উঠেছিলেন—না, আমার অন্যায় হয় নি—হয় নি। আমি সত্যকে প্রকাশ করেছি। সত্যেরও আঘাত আছে। মিথ্যাশ্রয়ী এবং ভ্রান্তজনেরা সে আঘাতে আহত হয়। ক্রুদ্ধ হয়। হোক—তাই হোক। তিনি আবার এই গান করবেন। সারা দেশে এই গানে সুরে কথায় আচ্ছন্ন করে দেবেন।

এ সব তো এই এক মাস আগের কথা। এক মাস পর শুক্লা ত্রয়োদশী ছিল কাল, কাল ওই গান গেয়ে ফিরবার পথে এই ঘটনা।

* * * *

কালও লল্লা ছিল—বাইরে যেসব শ্রোতা দাঁড়িয়ে শুনছিল তাদের প্রথম সারিতে। কালও একটি দীপাধারের আলো তার মুখের উপর পড়েছিল। সে তাঁকে শ্রদ্ধা করে—গভীর শ্রদ্ধা; সেটা সে তাঁকে প্রতিবার নিবেদন-কালে জানাতে চায়; তাই সে এমন করে দাঁড়ায় প্রতিবার। কালও তার দীর্ঘ অক্ষিপল্লবগুলি ভিজে ছিল। তিনি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। কাল

তার সঙ্গে কথা বলবার তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কন্যাকুমারীর একদল যাত্রী এসেছিল পার্থসারথি ও কপালীশ্বর দর্শনে। তাঁদের এক প্রৌঢ়া কুমারী সন্ন্যাসিনী তাঁকে এসে অভিনন্দিত করতে গিয়ে তাঁর বিলম্ব করে দিয়েছিল—সেই সময় সে চলে গিয়েছিল। আজ সে এসেছিল তাঁকে অজ্ঞাত আততায়ীরা আঘাত করে আহত করেছে শুনে। ছুটে এসেছিল। এসে দূরে গোশালার চালায় বেদনার আর্তিতে যেন নিজে ভেঙে পড়ে কোন রকমে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখ ছলছল করছিল তিনি দেখেছেন। ঠোঁট দুটিও কাঁপছিল নিশ্চয়। শান্ত কোমল-প্রকৃতি ভক্তি-মতী মেয়েটি কথা কইবার সুযোগ পেলে বোধ হয় শুধু 'প্রভু' এই কথাটি উচ্চারণ করেই রুদ্ধবাক হয়ে যেত। চোখের কোণ দুটি থেকে অশ্রুর দুটি ধারা গড়িয়ে পড়ত। ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠত প্রবল কম্পনে। তাকে এরা ধরেছে শবরদের চর।

কিন্তু তারা কি শবর? শবরই যদি হয় কেন তাকে তারা আঘাত করলে? তিনি তো তাদের ভালবেসেই ওই পরম সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সমস্ত জীবনাবেগ দিয়ে। তারা তো এর পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে গভীর ভালবাসা দিয়ে অভিষিক্ত করেছে। এদের বালক বালিকা যুবক প্রৌঢ় যে মুগ্ধ দৃষ্টিতে, প্রশংসা-প্রসন্ন হাসিতে তাঁর যে আরতি করেছে তা তো ব্রাহ্মণ শৈব ধনী বিদ্বানেরা করে নি। তারা দিয়েছে প্রসাদ, এরা করেছে পূজা। তবে? তা ছাড়া—। গন্ধের কথা এঁরা তুলেছিলেন। কথাটা খুব যুক্তিসঙ্গত। গাত্রগন্ধ একটা আছে। সেটা ছদ্ম-বেশে ঢাকা পড়ে না। গাত্রগন্ধ একটা পেয়েছিলেন। সেটা কি শবরদের?

না।

তবে? শৈবদের?

তাঁরাই বা এতটা ক্ষিপ্ত হবেন কেন? হতে পারে। ধর্মের আবেগ—প্রবলতম আবেগ। স্বর্গলোক থেকে পৃথিবীর বুকে যে বেগের প্রচণ্ডতা নিয়ে গঙ্গা ঝরে পড়েছিলেন, সে বেগের মুখে ঐরাবত ভেসে গিয়েছিল, তার থেকেও এ আবেগের বেগ প্রচণ্ড—প্রবলতর, প্রচণ্ডতর।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কি করবেন তিনি? তিনি তো দ্বন্দ্ব কলহ হিংসা চাননি। বরং উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। তবে এমন কেন হল!

—আচার্য রঙ্গনাথন রয়েছ?

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন রঙ্গনাথন। যোশেফের কণ্ঠস্বর। যোশেফ—

—আচার্য—

নিজেকে সংযত করে নিয়ে তিনি উত্তর দিলেন—যোশেফ, এস এস।

যোশেফ এসে ঢুকল। চোখে তার প্রখর দৃষ্টি, পদক্ষেপ যেন যুদ্ধকামীর মত উদ্ধত এবং অপ্রয়োজনে দীর্ঘ ও সবল।

—তোমাকে কারা আঘাত করেছে শুনলাম রাত্রির অন্ধকারে?

একটু হেসে রঙ্গনাথন বললেন—হ্যাঁ। মাথায় আঘাত করে তারা দ্রুত-পদে চলে গেল। সঙ্গের সঙ্গীরা সংখ্যায় তাদের থেকে বেশী ছিল এবং কাছেই ছিল। নইলে হয়তো—

—আমি দুঃখিত আচার্য। কিন্তু তার থেকেও বড় দুঃখে ক্ষুব্ধ যে তুমি আমাদের সন্দেহ করছ!

—আমি করি নি যোশেফ, করেছেন অপর সকলে। তুমি মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠী গোপালনের দোকানে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিলাম। মনে আঘাত লেগেছিল আমার।

—একটা প্রশ্ন করব তোমাকে ?

—মেরেছি কি না ? আচার্য, আমি মারলে এইটুকু আঘাত দিতাম না। উচ্চবর্ণের হিন্দু, বিশেষ করে আয়ার যারা তারা দেহের শক্তিতে দুর্বল ভীরু, কিন্তু কুটিল এবং মারাত্মক তাদের বিষ। সাপের মত। এদের মাঝখানে পা দিয়ে ছেড়ে দেওয়ায় বিপদ আছে। আমি একেবারে মেরে ফেলতাম।

—তা আমি প্রশ্ন করি নি।

—ও তবে খৃষ্টান হয়েছি বলে জিজ্ঞাসা করছ ? শোন আচার্য, খৃষ্টান হয়েও শবর ছিলাম এটা ভুলতে পারি না।

—তাও নয় ভাই। আমার প্রশ্ন আমি তো তোমাদের ভালবাসি এবং সেই কথাই তো বলেছি। তবে কেন দুঃখ পেলে তোমরা ?

—কেন ?

এ প্রশ্নে স্তব্ধ হয়ে যোশেফ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বোধ হয় ভেবে নিলে। তার পর বললে—কথাটা তোমার সত্য। এতটা ভাবি নি। তবে এটা সত্য রঙ্গনাথন, গান শুনে রাগ হয় আমাদের। সঙ্গে সঙ্গে এও বলি, আঘাত আমরা করি নি। এটা বিশ্বাস করো।

—বিশ্বাস করলাম যোশেফ।

—আমার ভাইঝি লল্লা এসেছিল ? তাকে এখানে শ্রীনিবাস চৌকিদার দিয়ে পাকড়াতে চেয়েছিল আমাদের গুপ্তচর বলে ?

—হ্যাঁ। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম যোশেফ। কিন্তু তারা শোনে নি।

—তাও শুনেছি। কিন্তু সে তোমার ভক্ত। ভক্তি করে। তোমার গান সে আমাদের সকলের চেয়ে ভালবাসে। তাই সে এসেছিল বোধ হয়। গুপ্তচর আমাদের নয়। আমাদের কেউই সে নয় আর। তার মা তাকে আমাদের পর করে দিয়ে গেছে। তাকে ভিক্ষুক করে দিয়ে গেছে। মন্দির ঝাঁট দিয়ে খেতে বলেছে। সে ভিক্ষুক। শবরদের চেয়েও অধম। গুপ্তচর হলে শৈবদের—আমাদের নয়।

একটু তিক্ত হেসে বললে—চর সে কারুরই নয় রঙ্গনাথন—সে তোমার উচ্ছিষ্ট-সন্ধানী লোভী কুক্কুরী।

—যোশেফ !

রঙ্গনাথনের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে উঠল এবার।

হেসে যোশেফ বললে—সেদিন বালুবেলায় তোমাদের আলাপ আমাদের কেউ কেউ দেখেছে, শুনেছে। তার কাছে তুমি বড় ভাল—বড় ভাল রঙ্গনাথন। তুমি তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছ, সে তোমার পায়ে হাত দিয়েছে, এর কিছু অজানা নেই আমাদের। সে যদি আমাদের হত, তা হলে তোমার কাছে এর জন্য কৈফিয়ত চাইতাম। কিন্তু সে ভিক্ষুক। আমাদের সে কেউ নয়। আচার্য রঙ্গনাথন, তোমাকে আঘাতকারী যদি কেউ লল্লার প্রতি লুব্ধ ব্যক্তি হয়, তবে তাও আশ্চর্য হব না আমি। তোমার গান শুনতে শুনতে সে যেন মোহগ্রস্ত হয়, এলিয়ে পড়ে। এ হয়তো তুমি জান না, কিন্তু আমরা জানি। শবরদের যারা পালা গান শুনতে যায় তারা বলেছে আমাকে। সেদিনই বলেছে. ওই কথাপ্রসঙ্গে।

রঙ্গনাথন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যোসেফ বললে—তুমি আঘাত পেয়েছ, তার জন্যে আমি দুঃখিত। আমি আঘাত করলে তোমাকে হত্যা করতাম। কন্যাটি আমাদের কেউ নয়। আচ্ছা, চললাম।

চলে গেল সে। রঙ্গনাথন দাঁড়িয়ে রইলেন স্তম্ভিতের মত।

সামনের সমস্ত কিছু যেন অর্থহীন হয়ে গেছে। দুর্বোধ্য একটা এলোমেলো বিশৃঙ্খলা—সব যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। চিত্তলোক অন্ধকার। কানে কিছু শুনছেন না।

বুকে একটা কিসের আঘাত চলেছে। অনুভবে বুঝছেন।

হে বরদরাজ স্বামী! ক্ষমা কর। ক্ষমা কর প্রভু।

অকস্মাৎ একটি যন্ত্রণা-কাতর মৃদু আর্তনাদ তাঁর কানে এসে ঢুকে তাঁকে সচেতন এবং ঈষৎ চকিত করে তুললে।

উঃ! উঃ! উঃ মা!

কি? কে? কোথায়?

উঃ-হু-হু!

এ তো সেই লল্লা! কিন্তু—।

দিক লক্ষ্য করে রঙ্গনাথন গোশালার দিকে তাকালেন। গোশালার চালার পাশেই বিচালির স্তূপ। পোয়াল অর্থাৎ, এলো খড় স্তূপের মত করে রাখা হয়েছে। সেটার মাথা নড়ছে। শব্দ ওখান থেকেই আসছে। তিনি দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, পড়ে গেল পোয়ালের মাথাটা। পোয়ালের পিছন দিকেই ঘন বৃক্ষবেষ্টনী। সেই দিক থেকে পোয়াল ঠেলে উঠে দাঁড়াল লল্লা। মাথায় রুক্ষ চুলে মুখে খড়ের কুটি লেগেছে কিন্তু সেদিকে তার লক্ষ্য ছিল না—একটা যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। দাঁড়িয়ে সে যেন এই যন্ত্রণার মধ্যেও সঙ্কোচে প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে।

—কি হল? লল্লা! লল্লা!

—ওঃ, কিসে আমাকে কামড়েছে প্রভু!

—কোথায় কামড়েছে? কোন্ জায়গায়?

—পিছন দিকে। ঠিক ঘাড়ের নীচে। চুলের মধ্যে ঢাকা পড়েছে।

—দেখি দেখি।

লজ্জায় সে যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল, বললে—না প্রভু, আমি যাই, সমুদ্রের জলে গিয়ে ডুব দিই। তাতে সেটা ছেড়ে দেবে।

—না, দেখি। তোমার লজ্জার এতে কারণ নেই।

—আমি শবরী।

—না, তুমি মানুষ। অবাধ্য হতে নেই। বস পিছন ফিরে।

বলতে বলতেই তিনি নিজেই তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেও অবাধ্য হল না, বসল। রঙ্গনাথন সন্তর্পণে তার অযত্ন-বদ্ধ, রুক্ষ, পোয়ালের ধুলায় ধূসর চুলের বোঝায় হাত দিলেন। লল্লা বললে—দেখবেন প্রভু, আপনাকেও হয়তো কামড়াবে।

রঙ্গনাথন সন্তর্পণে চুলের বোঝা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন—ওখানে ঢুকলে কেন?

—ভয়ে প্রভু। ঘরে যখন শবরদের কথা বলছিলেন শ্রেষ্ঠী গোপালন, তখন বাইরে কয়েক-জন কে আমার দিকে আঙুল দেখাচ্ছিল। আমি ভয়ে ওই পোয়ালের পিছনদিকে গিয়ে লুকিয়েছিলাম। তারপর আমার নাম করতে ভয়ে ওই পোয়ালের ভিতর—

রঙ্গনাথন বললেন—এ কি! এ যে—! এঃ, রক্ত বের করেছে কামড়ে!

বিষাক্ত বৃশ্চিক জাতীয় কীট। কর্কটের মত দুটো দাড়ায় তার পিঠের মাংস কেটে কামড়ে ধরেছে এবং হুল দিয়ে দংশন করেছে। দাড়ায় কাটা, ক্ষত থেকে রক্তের একটি ধারা গড়িয়ে

এসেছে। তখনও ছাড়ে নি। নিষ্ঠুর আক্রোশ হয়েছে কীটটার। রঙ্গনাথন মুহূর্ত চিন্তা করে তাঁর পুরু উত্তরীয়ের ভাঁজে কীটটাকে সন্তর্পণে দৃঢ় দুটি আঙুলে চেপে ধরে সজোরে টেনে নিলেন। লল্লা যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল। উঃ—

কিন্তু অর্ধপথেই নিজেকে সংযত করে স্তব্ধ হল। হাতে টিপেই সেটাকে মেরে ফেলে দিয়ে রঙ্গনাথন বললেন—লল্লা, এ বিষাক্ত ছোট বৃশ্চিক। তুমি কি যন্ত্রণার সঙ্গে অবসন্নতা বোধ করছ?

—হ্যাঁ প্রভু।

—তোমাকে বিশ্রাম করতে হবে। আমার কাছে ওষুধ আছে লাগিয়ে দেব। ওঠ। উঠতে পারবে?

—আমায় কোন গাছতলায় শুইয়ে দিন প্রভু।

—না। ঘরে বিশ্রাম করবে।

—না।

আর্তস্বরে সে বলে উঠল।

—না নয়। ওঠ।

—তা হলে ওই গোশালায়—

—না। না। ওঠ। একি তুমি যে কাঁপছ!

—বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। আর—

মুখ ঠোঁট যেন শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটির পাতা ঢলে আসছে। দাঁড়িয়ে ভেঙে পড়ছে। রঙ্গনাথন তাকে দুই হাত প্রসারিত করে, হাতের উপর শুইয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। বিড় বিড় করে প্রতিবাদই করলে লল্লা, কিন্তু কণ্ঠস্বর জিহ্বা যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। রঙ্গনাথন তার মুখে খানিকটা জল দিলেন খাবার জন্য। মুখ ধুইয়ে দিলেন। মাথাটা ধোয়ানোর প্রয়োজন। পিছনের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে প্রচুর জল ঢাললেন মাথায়। আরও খানিকটা জল খাওয়ালেন। এতে একটু সুস্থ হয়ে চোখ মেলতে চেষ্টা করলে লল্লা। রঙ্গনাথন বললেন—চুপ করে শুয়ে থাক। আমি বাইরে থেকে একটা শিকড় তুলে আনি। খাওয়ালেই এবং ওই-খানে ঘষে লাগালেই অনেকটা সেরে যাবে। কিন্তু কথা শুনো, উঠো না তুমি।

বাইরে এসে নিজের বাগান খুঁজে শিকড় ওষুধ তুলে এনে গোলমরিচ মিশিয়ে বেটে খানিকটা খাইয়ে দিলেন,—কয়েক মুহূর্ত পরেই লল্লা যন্ত্রণা উপশমের আরামে বলে উঠল, আঃ। সঙ্গে সঙ্গে হাতখানি বাড়িয়ে কিছু যেন খুঁজলে।

রঙ্গনাথন জিজ্ঞাসা করলেন—কি, কি খুঁজছ?

—আপনার চরণের ধুলো একটু—

—না।

—প্রভু, দিন। তাতে আমার মনে বল হবে।

এবার দ্বিধা করলেন না রঙ্গনাথন। তিনি বিশ্বাসের বলকে জানেন। নিজে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—এবার ঘুমোও দেখি একটু।

—আমাকে এইবারে বাইরে—

—চুপ কর।

উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তিনি জানালার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালেন। বৃক্ষবেষ্টনীর একটি ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে শহর থেকে গ্রামে আসবার যে পথটা

তাঁর আশ্রমের সুমুখ দিয়ে চলে গেছে, সেই পথে দূরে, জন দুই সওয়ার এবং কয়েকজন লোক আসছে। সওয়ারদের পোশাক যেন কোতোয়ালীর পোশাক। মাদ্রাজের ফিরিঙ্গিদের কোতোয়ালী কোথায় যাবে? এখানে নয় তো? যদি হয়! হওয়া খুবই সম্ভব! হঠাৎ তাঁর মাথাটা ঘুরল যেন আপনা-আপনি।

লল্লা অবসন্ন লতার মত পড়ে আছে! বোধ হয় ঘুম আসছে। বিষ এবং ওষুধ দুয়ের ক্রিয়াতেই এখন ও আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকবে কয়েক প্রহর। তারা লল্লাকে খুঁজেছিল। শ্রীনিবাসন প্রতিজ্ঞা করে গেছে, এর প্রতিকার সে করবেই। লল্লাকে যদি ধরে! মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেললেন রঙ্গনাথন। পাশের ছোট ঘরটির দরজা খুলে ফেললেন। ঘরটিতে আবার দুখানি ঘর। একখানি ভাণ্ডার, তার ওপাশের খানি পূজার। পূজার ঘরে সুন্দর একখানি সিংহাসনে বরদরাজ স্বামীর অনুকৃতি, তাঁর পাশে লক্ষ্মী, আর একটি আসনে পিত্তলের নটরাজ-মূর্তি। নানান ধরনের সুশোভন সামুদ্রিক শঙ্খ, কড়ি ঝিনুক দিয়ে সাজানো। ফুল বিছানো। এই ঘরে, দেবতার সামনে মেঝের উপর, লল্লার অসাড় নমনীয় দেহখানি বয়ে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। মনে মনে বললেন, ওর অপরাধ কিছু নেই প্রভু। যদি অপরাধ হয় তবে আমার। দণ্ড আমাকে দিয়ো। তুমি ওকে রক্ষা কর।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে তালা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ভাণ্ডার ঘর থেকে এ ঘরে এসে, দরজা বন্ধ করে আপন আসনে বসলেন।

মাথার ক্ষতে এতক্ষণে যেন যন্ত্রণা বোধ করছেন। ক্লান্তিও বোধ হচ্ছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললেন, হে বরদরাজ! হে বৈকুণ্ঠেশ্বর!

অশ্বপদশব্দ যেন আশ্রমের বাইরেই থামল। রঙ্গনাথন বুঝলেন, তাঁর অনুমান মিথ্যা হয় নি। যারা আসছিল তারা এখানেই এসেছে। কণ্ঠস্বরও শুনলেন পরমুহূর্তে—আচার্য রঙ্গনাথন!

—আসুন।

ভিতরে এলেন কোতোয়ালীর কর্মচারী। অভিবাদন করে দাঁড়ালেন। রঙ্গনাথন উঠে বাইরে এলেন—বলুন।

—মাননীয় শ্রীনিবাসন আমাদের পাঠালেন। বললেন, আচার্যের আশ্রম পাহারা দিতে হবে। সারা শহরে নানান গুজব রটেছে। বলছে, আচার্যের আশ্রম যে কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে।

—সে কি! কে আক্রমণ করবে? এবং কেনই বা করবে?

—যারা আক্রমণ করেছিল, এবং যে কারণে করেছিল তারাই করবে, সেই কারণেই করবে।

রঙ্গনাথন বিব্রত হয়ে উঠলেন এবং তিক্তও হলেন—না না না। এ ধারণা ভ্রান্ত। এ হতে পারে না। আপনারা যান।

—আমরা আদেশের দাস। স্থানত্যাগের তো আদেশ নেই।

—বেশ, আমি স্থানত্যাগ করছি।

—তাহলে, প্রভু, আমরা একজন আপনার সহগামী হব, একজন এখানে আপনার গৃহ রক্ষার জন্য থাকব।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রঙ্গনাথন। সারা চিত্ত বিদ্রোহী হয়ে বলে উঠল, এ কী অত্যাচার!

কর্মচারীটি বললেন—শুধু তাই নয় আচার্য, মাননীয় শ্রীনিবাসন বলে দিয়েছেন যে আপনি যেন এখন তাঁকে না জানিয়ে কোথাও গান করতে যাবেন না।

—কাঞ্চীভরম এবং মহাবলীপুরম তাঞ্জোর এসব স্থান এখনও কোম্পানীর অধিকারের বাইরে। সেখানে নিশ্চয় এ আদেশ বলবৎ নয়।

—তা নয়। কিন্তু মাদ্রাজের এলাকা পর্যন্ত আমরা সঙ্গে থাকব। তারপর অন্য সীমানায় পা দিলেই আমরা ফিরে চলে আসব। আচার্য, জানেন না আমরা শুনে আসছি শহরে উত্তেজনা প্রবল। পাদরীরা উত্তেজিত হয়েছে তাদের উপর দোষারোপ করা হয়েছে বলে, হিন্দুদেরও শৈব যারা তারা উত্তেজিত হয়েছে, তাদের সন্দেহ করা হয়েছে বলে। আপনার গুণমুগ্ধেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ আপনার উপর আক্রমণের জন্য। ওদিকে প্রভু শ্রীনিবাসন কোম্পানীর বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তিনি আদেশ দিয়েছেন আক্রমণকারীদের সন্ধান করা চাই। সারা শহরে লোক বেরিয়েছে, খুঁজছে কোথায় গেল সেই শবর ভিখারিণী।

অসহায় অথচ তিক্ত কণ্ঠে রঙ্গনাথন বললেন—তার জন্য আমাকেই গৃহবন্দীর মত আপনাদের প্রহরাধীনে বাস করতে হবে ?

—না না না। আমরা আপনার আজ্ঞাধীন, আপনাকে রক্ষা করবার জন্যই এসেছি। আপনার মঙ্গলের জন্য।

—আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছি। আমি মনে করি আমার শত্রু কেউ নেই। আমি কারুর শত্রু নই। রক্ষা আমাকে করেন এবং করতে পারেন একমাত্র আমার দেবতা আমার প্রভু শ্রীবরদরাজ।

কিসের যেন শব্দ উঠছে না ? রঙ্গনাথন কথা বলতে বলতেও উৎকর্ণ হয়ে আছেন। প্রায় চেতনাহীন হয়ে পড়ে আছে লল্লা। তার তো নিজের উপর কোন সংযম নেই, সে তো জানে না এদের উপস্থিতির কথা।

কোতোয়ালীর কর্মচারী বললে—আচার্য জানেন না এমন কথা অনেক আছে।

দৃঢ় কণ্ঠ উষ্ণ হয়েই বললেন রঙ্গনাথন—সব কথা কেউ জানে না ভাই। ভাল, এখন আমার অনুরোধ—আপনারা কোন বৃক্ষতলে ছায়াতে বিশ্রাম করুন। আমার পূজার সময় হয়েছে। আমি পূজা করব। এ সময়—

—নিশ্চয়। নিশ্চয়। তাই আমরা যাচ্ছি।

তারা বারান্দা থেকে নেমে ছায়াঘন একটি লতামণ্ডপের তলদেশে গিয়ে বসল।

রঙ্গনাথন ছোট ঘরটির প্রথম দরজা খুলে ভাণ্ডার ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর ঢুকলেন পূজার ঘরে। অসম্বৃতবাসা লল্লা লুটিয়ে পড়ে আছে লতার মত। মুখে এখনও যন্ত্রণার ছাপ রয়েছে। তার একখানি হাত গিয়ে পড়েছে পূজোপকরণগুলির উপর। ছোট একটি ধূপাধারে ধূপশলাকা পুড়ছিল—সেটি পড়ে গেছে। হাতখানির চাপে ধূপশলাকা নিভে গেছে। শব্দটি সম্ভবত এই জন্য হয়েছে। মৃদু কাতর শব্দ একটি মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে আসছে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। রঙ্গনাথন নাড়ী দেখলেন। নাড়ী দুর্বল—কিন্তু আশঙ্কা করার মত কিছু নয়। একটু দুধ দিলে বোধ হয় উপকার হত। ভোগের দুধ আছে। পূজাতে তাঁর আড়ম্বর নেই। অল্প কিছু ফুল-চন্দন-ধূপ-দীপ আর ভোগ—দুধ ও শর্করা এবং নারিকেল ও কদলী ; ভোরের পূজা হয়ে গেছে। দ্বিপ্রহরের পূজার সামগ্রী সাজিয়ে তারপর তিনি সহানুভূতি-জ্ঞাপনকারীদের সঙ্গে দেখা করেছেন। এখন দ্বিপ্রহরের পূজা কেমন করে করবেন ? ভোগ না দিয়েই বা দুধ কেমন করে খাওয়াবেন লল্লাকে ? লল্লা হাঁ করছে—জল চাইছে। চোখ মেলেও চাইলে একবার। চোখ রক্তবর্ণ হয়ে

উঠেছে। চোখের তারা দুটি যেন স্বচ্ছ। তিনি মৃদু স্বরে ডাকলেন—লল্লা!

লল্লা সাড়া দিলে না। আবার হাঁ করলে।

রঙ্গনাথন দেবতার চরণোদক নিলেন কুশীতে, তারপর ঢেলে দিলেন তার মুখে। আবার সে হাঁ করলে, আবার—আবার। একবার আরক্ত চোখ মেলে বিভ্রান্তের মত লল্লা বললে—আঃ! তারপর তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে—বড় জ্বালা সর্বাঙ্গে।

বলেই আবার সে চোখ বন্ধ করলে। রঙ্গনাথন ভাবলেন একটু, তার পর সংকল্প স্থির করে দেবতার সামনে থেকে একটু সরিয়ে পুজোপকরণগুলি আবার ঠিক করে নিয়ে বসে করজোড়ে বললেন—হে বরদরাজ! করুণাময়! যদি অপরাধ হয়, সে দণ্ড আমাকে দিয়ো। তোমার ভক্তিতে বিগলিত এই বালিকার প্রাণরক্ষার জন্য তোমার পূজা করব সংক্ষেপে এবং তোমার প্রসাদ দিয়েই ওর সেবা করব।

আবার লল্লা অস্ফুট স্বরে বললে—বড় দাহ, বড় জ্বালা!

রঙ্গনাথন ভেবে নিলেন এক মুহূর্ত। তারপর আসন ছেড়ে উঠে ভাণ্ডার ঘরের কোণে রক্ষিত বড় মাটির কলসী থেকে বড় ভৃঙ্গার পরিপূর্ণ করে নিয়ে এসে বসলেন। আচমন করে, সংক্ষেপে প্রাথমিক কৃত্যগুলি সেরে, ভৃঙ্গারের জল নিয়ে উচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করে দেবতার মাথায় কুশীতে করে জল ঢেলে গোটা ভৃঙ্গারটি নিয়ে উঠে এসে লল্লার শিয়রে বসে আবার উচ্চ কণ্ঠেই উচ্চারিত মন্ত্রের সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ জলধারায় অভিষিক্ত করে দিলেন।

আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযুর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী॥
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
সর্বা সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ॥
সিন্ধু-ভৈরব-শোনাখ্যা যে হ্রদা ভুবি সংস্থিতা।
সর্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥
লবণেক্ষু—সুরাসপির্দ্দধিদুগ্ধ-জলাত্মকাঃ।
সন্তেতে সাগরাঃ সর্বে ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥

অভিসিঞ্চনের স্নিগ্ধতায় লল্লার দেহের জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল। সে আবার চোখ মেলে চাইলে। মৃদুস্বরে বললে—আরও। আঃ!

আবার এক ভৃঙ্গার জল এনে দেবতার চরণ স্পর্শ করিয়ে নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে তাকে স্নান করিয়ে দিলেন। লল্লার ধূলি-ধূসরতা ধুয়ে গেল—শুষ্কতাও মুছে গেল খানিকটা। সে আবার মৃদুস্বরে বললে—আঃ!

এবার পূজা সারলেন রঙ্গনাথন। লল্লার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগস্পর্শ না থাকলেও তার অস্তিত্বের স্পর্শ রঙ্গনাথন অনুভব করেও নিজেকে অশুচি মনে করলেন না। পূজা সেরে ভোগ নিবেদন করে দুধটুকু নিয়ে তিনি লল্লার মাথার গোড়ায় বসে মৃদুস্বরে ডাকলেন—লল্লা!

লল্লা চোখ মেলে চেয়ে বললে—অ্যাঁ! তারপর সকৃতজ্ঞ হেসে বললে—প্রভু!

—দুধটুকু খাও তো। হাঁ কর আমি ঢেলে দিই। হাঁ কর।

লল্লা কিন্তু হাতে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করলে। একটু উঠেই সে সভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। তিনি এক হাতে লল্লার মুখ চেপে ধরে বললেন—চুপ কর লল্লা। বাইরে কোতোয়ালীর লোক—

থরথর করে কাঁপছে লল্লা। ফিসফিস করে বললে—আমি শবর-কন্যা, পূজার ঘরে—

—চুপ কর। না হলে উপায় ছিল না। দেবতা তাতে রুষ্ট হন নি। তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন। আমি বলছি। খাও। তুমি খাও। ওদের অনেক অর্ধসত্যে ছলনা করে বৃক্ষতলে বসিয়ে রেখে এসেছি। তুমি সুস্থ হয়ে ঘুমোও। আর ভয় নেই। এবার সুস্থ হয়ে উঠবে। শুধু শব্দ করো না।

বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে রঙ্গনাথন বেরিয়ে গেলেন। লল্লা হাত জোড় করে বরদরাজের ক্ষুদ্র অনুকৃতিটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল। কিন্তু একটু পরেই আবার ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

রঙ্গনাথন বাইরে এসে দেখলেন প্রহরী দুটি বৃক্ষচ্ছায়াতলে সমুদ্রের আর্দ্রবায়ুস্পর্শে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তিনি ওপাশের বারান্দায় রান্নাঘরে রান্নার আয়োজনে বসলেন। এ বাড়িতে তিনি একাই বাস করেন। এ পর্যন্ত কোনদিন শত্রুর ভয় তিনি করেন নি। রমণীহীন সম্পদহীন গৃহ, থাকবার মধ্যে দুটি দুগ্ধবতী গাভী। তা নিয়েও চোরের ভয় ছিল না। নিজেও সুস্থ-সবল-দেহ যুবা। বাল্যাবধি কর্মের পরিশ্রমে অভ্যস্ত। বৈষ্ণব গুরুর আশ্রমে এবং সঙ্গীত শিক্ষক আচার্যের গৃহে শ্রমসাধ্য কর্মে তাঁদের সাহায্য করতেন। কুড়ুল দিয়ে কাঠ-চেলানো এবং নিজ হাতে কুপিয়ে বাগান করা ছিল তাঁর প্রিয় কর্ম। জলও তুলতেন কূপ থেকে। এখানে নিজের আশ্রমে এখনও কাজগুলি অবসরমত করে থাকেন। পরিচারক বৃদ্ধ কুড়ুমণির কর্মের লাঘব করে দেন। বৃদ্ধ পরিচারক কুড়ুমণির পাশের গ্রামেই বাড়ি। সে রাত্রে বাড়ি যায়, সকালে আসে। গরু দুটির পরিচর্যা করে। শহর থেকে প্রয়োজনমত জিনিসপত্র আনে। তিনি গানের নিমন্ত্রণে বাইরে গেলে সে অবশ্য এখানেই শোয়। আজ ভোরবেলাতেই তিনি তাকে পাঠিয়েছেন তিরু আল্লিকেনি—পার্থসারথি মন্দিরে। সেখানে আজ পূর্ণিমায় তাঁর গানের কথা ছিল। দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে মার্জনা চেয়েছেন রঙ্গনাথন। সংবাদ হয়তো তাঁরা পেয়েছেন, কিন্তু তবু তাঁর দিক থেকে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর সঙ্গের যন্ত্রীরা কজন কাল রাত্রে এখানে থেকে সকালে আপন আপন বাড়ি চলে গেছে। নিরীহ যন্ত্রশিল্পী—তারা ভয়ও পেয়েছে। তাদের বাড়ি সব এই দিকেই কাছাকাছি পল্লীতে। বৃদ্ধকে না পাঠিয়ে উপায় ছিল না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রঙ্গনাথন। ভাগ্যে বৃদ্ধ এখানে ছিল না। থাকলে তার চোখ এড়িয়ে বেচারা লল্লা ওই পোয়ালের মধ্যে আত্মগোপন করতে পারত না। কোতোয়ালীতে তার লাঞ্ছনার সীমা থাকত না। আজ তার চেয়ে এই বৃশ্চিক-বিষ-জ্বালাও তার পক্ষে অনেক ভাল।

বরদরাজ তাকে রক্ষা করেছেন। তাঁর পায়েই তাকে উনি রেখে এসেছেন।

আবার তিনি বললেন—এবার স্ফুট কণ্ঠেই বললেন—হে বরদরাজ। তুমি পতিতের ভগবান। আজ তোমার চরণে তার আশ্রয় নেওয়ায় যদি অপরাধ হয়ে থাকে তবে সে অপরাধ আমার—তার নয়। দণ্ড দিতে হলে আমাকে দিয়ো। তুমি অন্তর্যামী, তুমি জান—তোমার জন্য তার কত আকুতি। তুমি তাকে রক্ষা কর।

* * *

বরদরাজস্বামী—পতিতের ভগবান! বিপন্নের রক্ষক! অনন্ত করুণার আধার! রঙ্গনাথনের উপলব্ধি মিথ্যা নয়। তিনি সঠিক সত্যকেই উপলব্ধি করে গান রচনা করেছিলেন—"যিনি বসবাস করেন বৈকুণ্ঠে তিনিই বাস করেন শবর-পল্লীতে, সকল পতিত পল্লীতে—ওই ওদের

মধ্যে—ওদের কৃষ্ণচর্মের অন্তরালে। কৈলাসে যিনি বাস করেন ভবানীপতি—তিনিও আছেন ওদের মধ্যে। ওদের কৃষ্ণচর্ম দেখে যদি তোমার ঘৃণা হয়, ওদের পল্লীর অপরিচ্ছন্নতার কটু গন্ধে যদি তোমার দ্বিধা হয় কাছে যেতে, তবে তোমার জানা হবে না তাঁকে। ব্রাহ্মণ-তনয় তুমি, ব্রহ্মাভিলাষী,—ক্রোধে,—ঘৃণায়, অহংকারে শিক্ষার মধ্যে তোমার জানা হয় নি ব্রহ্মকে। আমি নারী—আমার ধর্মে আমি অধিষ্ঠিতা। আমার যিনি পতি তিনি শুধু আমার পূজ্যই নন, তিনি আমার প্রিয়—প্রিয়তম। তাঁর সেবা আমার ধর্মই শুধু নয়—সে-ই আমার জীবনধর্ম, সেই আনন্দ—যার স্বাদে আর ব্রহ্মের স্বাদে প্রভেদ নেই। তুমি তাতে আমার উপর ক্রুদ্ধ হলে। সে ক্রোধে ক্ষতি হয় নি, হবে না আমার। সুতরাং তোমার পরমসত্য পরমতত্ত্বকে জানা সম্পূর্ণ হবে ব্যাধ-পল্লীতে, ব্যাধধর্মে অধিষ্ঠিত ধর্মব্যাধের কাছে। ঘৃণা করো না, নাসিকা কুঞ্চন করে প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে যেয়ো না। প্রবেশ করো। তুমি কি জানো, ভবানীপতি মহারুদ্র কিরাতরূপেই দেখা দিয়েছিলেন তপস্যা-পরায়ণ অর্জুনকে। অর্জুন কিরাত বলে অবজ্ঞা করেছিল, ঘৃণাও করেছিল। কিরাতরূপী ভগবান তার সে শক্তির অবজ্ঞা চূর্ণ করে-ছিলেন তার বুকে একটি মুষ্ট্যাঘাত করে। ঘৃণাকে উপহাস করেছিলেন—অর্জুনের ইষ্টকে নিবেদন করা মাল্যখানি তাঁর কণ্ঠে ধারণ করে। হিমগিরির কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণচ্ছটায় প্রতিভাত স্বর্ণকান্তি কিরাত নীলগিরিতে যখন আসেন তখন তিনি সুনীল সমুদ্রলাবণ্যে অবগাহন করে হন নিবিড় নীলকান্তি।"

অপার বরদরাজের করুণা। এবং হয়তো আশ্চর্য সত্য তাঁর উপলব্ধি। লল্লা যেন রহস্যের মহিমা দেখিয়েই গভীর রাত্রে ঘুমন্ত প্রহরীদের ব্যঙ্গ করে অন্তর্হিতা হয়ে গেল।

অপরাহ্ণে সুস্থ হয়ে উঠেছিল লল্লা এবং কেঁদেছিল। তাঁকে বলেছিল—আর নয়, এবার আমার জ্ঞান হয়েছে, আমি সুস্থ হয়েছি। প্রভু, এ পূজা-মন্দিরে আতুর বলে চেতনাহীনা আমার যে অধিকার ছিল সে আর নেই। আমার অপরাধের জন্য আমি ভাবি না প্রভু, রাজপ্রতিনিধির শাস্তি-লাঞ্ছনাকেও আমার ভয় নেই। আপনি আমাকে বের করে প্রহরীদের হাতে সমর্পণ করুন। প্রভু—

রঙ্গনাথন বলেছিলেন, না।

—আমার জন্য বরদরাজ আপনার উপর রুষ্ট হবেন। আপনার তপস্যা—

বাধা দিয়ে রঙ্গনাথন বলেছিলেন, আমার তপস্যা এতেই পূর্ণ হবে কল্যাণী। তুমি লল্লা নও, নও কলাবন্তী, তুমি কল্যাণী। তুমি থাক। দেবতার মহিমার মত তুমি এই ঘরে থাক। মিথ্যা বলব না কল্যাণী, আমি যে বরদরাজের করুণাধন্য মহিমাকে আজ প্রত্যক্ষ করছি আমার পূজার ঘরে। কিন্তু আর কথা বলো না। ওরা এখনও সন্দেহের অবকাশ পায় নি। এরপর কখন কোন মুহূর্তে সন্দেহ করে বসবে। এই প্রভুর প্রসাদ রইল—দুধ, শর্করা, কদলী। খেয়ো। দুর্বল হয়েছ—বল প্রয়োজন।

—কিন্তু কতদিন রাখবেন প্রভু?

—ওই ওঁকে প্রশ্ন কর।

—যদি আমার অস্তিত্ব ওরা জানতে পারে তবে আপনাকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। প্রভু, না—

—চুপ। তারপর স্মিত হেসে বলেছিলেন—সেই লাঞ্ছনায় আমার তপস্যা পূর্ণ হবে লল্লা।

লল্লা শব্দটির মধ্যে সঙ্গীত আছে। শব্দটি আপনি বেরিয়ে এসেছিল কল্যাণীর পরিবর্তে।

তিনি বাইরে এসে বীণা বাজিয়ে গান করেছিলেন। প্রথমেই সঙ্গীত অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বন্দনা করে গেয়েছিলেন গোটা দক্ষিণ ভারতে বহু প্রচলিত স্তবগান—

কলাদেবতে শরণম
বন্দে মধুর চরণম—
বন্দে মধুর সঙ্গীত দেবতে কলাদেবতে শরণম—
সত্য স্বর স্বরূপিণী
সমস্তকে দুখহারিণী
আনন্দ মৃদবাহিনী
আনন্দ ভৈরব মোহিনী
তালমেল সম্মিলিত নাশিত
রাগরঙ্গিণী হৃদয়হাসিনী
মেঘ মধুরিম মঙ্গল বদনম্
মোহ দরদী
জীবজীবনী জীবজীবনী
কলাদেবতে—
কলাদেবতে শরণম।

প্রহরী দুটি বিভোর হয়ে শুনেছিল। কুড়ুমণি বাড়ি যেতে যেতেও যেতে পারে নি। কুড়ুমণি পার্থসারথি মন্দির থেকে ফিরে এসেছে একটু আগে। বৃদ্ধ মানুষ, তার উপর একটু পেটুক সে। সেখানে প্রসাদ পেয়ে দুপুরে বিশ্রাম করেছে। তার উপর নদী পার—সমুদ্রের কাছাকাছি নদীগুলি মোহনার কাছে বিস্তারে বিপুল ; খরায় নৌকা এপার থেকে ওপারে গেলে ফিরতে প্রায় একবেলা কেটে যায়। আদিয়ায় নদী পার হতে দেরি হয়েছে। ফিরবার পরই সে বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। তাকে এবং প্রহরী দুটিকে তাদের রাত্রের খাবার দিয়ে তিনি বীণা নিয়ে বসেছিলেন। তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন গানে। তাঁর নিজের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল, প্রহরী দুটি বার বার চক্ষু মার্জনা করেছিল, কুড়ুমণি ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। তিনি বেশ অনুভব করেছিলেন পূজার ঘরেও লল্লা কেঁদেছিল শুয়ে শুয়ে। রাত্রির প্রথম প্রহর পার হয়ে গেলে বীণাটি তিনি রেখে তাঁর শয্যার উপর শুয়ে পড়েছিলেন। কান পেতে জেগে ছিলেন, নিদ্রা তাঁর আসে নি লল্লার সাড়ার জন্য। লল্লা কি ঘুমিয়েছে ? ঘুমন্ত অবস্থায় গভীর দীর্ঘায়িত শ্বাস-প্রশ্বাস উঠছে কি ? কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রহরী দুটির মৃদু নাসারব উঠতে শুরু করেছিল। কুড়ুমণির নাসাগর্জন প্রবল। লল্লা কি এখনও জেগে ? কই, তার শ্বাস-প্রশ্বাস তো গভীর হয়ে ওঠে নি! উঠে গিয়ে দেখতেও সাহস হয় নি। কি জানি কখন কে জেগে উঠবে। সন্ধ্যায় ভোগ ও দীপারতির পর দেবতার শয়ন হয়, তারপর সে দ্বার প্রভাত পর্যন্ত খোলা হয় না। দরজা খুললে যদি শব্দে জেগে ওঠে! দরজা তিনি তালাবন্ধ আজ করেন নি এই জন্যই। ভেজানো আছে। তবু যদি দেখে, শব্দ হয়! রাত্রে প্রহরী দুটিকে গাছতলা দেখিয়ে দিতে পারেন নি। তারা বারান্দায় শুয়ে।

এরই মধ্যে তাঁরও তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ পায়ে কিছুর স্পর্শে তিনি জেগে উঠেছিলেন। চোখ মেলে চেয়ে দেখে তিনি যেন পাথর হয়ে গেলেন। লল্লা! লল্লা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। সে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। তাঁর কণ্ঠ থেকে একটা চীৎকার বেরিয়ে আসতে চেয়েও পথ পেলে না। কে যেন তাঁর কণ্ঠ রোধ করে চেপে ধরেছে। লল্লা, কিন্তু

দাঁড়াল না, কোন কথাও বললে না, প্রণাম করেই লঘু পদে ঘর থেকে বেরিয়ে ঘর এবং বারান্দার মাঝের দরজায় ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াল ; বাইরে পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না, দুগ্ধ-শুভ্র স্বচ্ছতায় প্রকৃতি যেন ক্ষীরসমুদ্রে অবগাহন করে অমলধবল স্পষ্টতায় স্পষ্ট ; অদূরবর্তী সমুদ্রে পূর্ণিমার জোয়ার উঠেছে। তরঙ্গাঘাতের শব্দের সঙ্গে কল্লোলধ্বনি উঠছে। লল্লা মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে —বোধ হয় বারান্দায় ঘুমন্ত তিনজন মানুষকে দেখে নিয়ে সন্তর্পিত লঘু পদক্ষেপে তাদের পাশের খালি জায়গার উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে নেমে গেল বারান্দা থেকে। উদ্যানে জ্যোৎস্নার মধ্যে ওকে স্পষ্ট দেখলেন। লঘু দ্রুত পদে লল্লা উদ্যান প্রবেশমুখে আশ্রমপ্রবেশের ফটকে গিয়ে দাঁড়াল। সেও ক্ষণেকের জন্য—তারপর সে বেরিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতক্ষণে তাঁর স্তম্ভিত চেতনা ফিরল তড়িতাহতের মত। তিনি চীৎকার করতে চাইলেন, লল্লা! কিন্তু সংযত করলেন নিজেকে। এবং উঠে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। এই গভীর রাত্রি, এই রাত্রে একা কিশোরী লল্লা কোথায় যাবে? মাৎস্যন্যায়ের কাল। রাজশক্তি সারা দেশে ভেঙে পড়েছে। গ্রামে গ্রামে হিংস্রক চোর ডাকাত লম্পট ঘুরে বেড়ায় দল বেঁধে। শহরে কোম্পানীর তেলেঙ্গী সিপাই, গোরা সিপাই মদ খেয়ে সমুদ্রতটে হল্লা করে। ধনীর উদ্যান-বাটিকায় মত্ত কণ্ঠের স্খলিত বাক্য, তাল-ছন্দ-কাটা নূপুরধ্বনি নটরাজের অপমান করে। ভগবানের পৃথিবীতে ধ্যানমগ্ন ভগবানের অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হয় অশুচি আবর্জনা—এই রাত্রে ও যাবে কোথায়? তার উপর আজ সারাটা দিন বৃশ্চিক-বিষে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। মৃত্যু-যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা ভোগ করেছে। ও যাবেই বা কতদূর? দ্রুতপদে তিনি আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলেন। কই, কোথায় লল্লা?

জ্যোৎস্না-প্লাবিত পৃথিবী ; গাছের তলদেশে শুধু অন্ধকার। তিনি তাকালেন লল্লাদের গ্রামের পথের দিকে। কই? সারা বালুময় পথটা জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে। শূন্য পথ। মাদ্রাজ যাবার পথের দিকে চাইলেন। সেদিকেও তাই। অনেক দূরে শহরের দুটো পাকা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আলো জ্বলছে শীর্ষদেশে। বহু দূর থেকে ভেসে আসছে কয়েকটা কুকুরের চীৎকার। কিন্তু লল্লা কই? নেই তো! পূর্ব দিকে সমুদ্রবেলা। তবে কি এদিকে গেল! ছুটে এগিয়ে গেলেন তিনি। উঁচু বালুর বালিয়াড়ি ক্রমশ নিম্নভূমিতে নেমে গেছে। তার পরেই তাল নারিকেল সুপারি বনের সারি ; পূর্ণিমার চাঁদ মধ্যগগনে, গাছগুলির ছায়া তাদের পায়ের তলায় জমেছে ঘন হয়ে, মধ্যে মধ্যে পত্র-পল্লবের ফাঁক দিয়ে গড়া টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না দীর্ঘ রশ্মিভল্লের মত ওই ছায়াকে বিদ্ধ করছে। বায়ু-তাড়নায় পল্লব-আন্দোলনে যেন উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। হ্যাঁ, ওই যে, ওই চঞ্চল দোলায়মান জ্যোৎস্নার খণ্ডগুলি কখনও একটি মনুষ্য-মূর্তির মাথায়, কখনও পিঠে কখনও পায়ে পড়ছে। তার আভায় সর্বাঙ্গ আভাসে ছায়ামূর্তির মত দেখাচ্ছে। লল্লা চলেছে ওই নারিকেল তালের সারির কোল ঘেঁষে, ওরই ছায়ায় আত্ম-গোপন করে চলতে চাচ্ছে।

তিনি আবার চীৎকার করে ডাকতে গিয়ে থেমে গেলেন। প্রহরীরা জেগে উঠবে। তিনি নিজেই ছুটলেন। এসে দাঁড়ালেন নারিকেল তালের সারির মধ্যে। সামনে সমুদ্র, পূর্ণিমায় উত্তাল জোয়ারে উচ্ছ্বসিত। আঘাতের পর আঘাত করছে তটভূমিতে, এক একটা বৃহৎ উচ্চ তরঙ্গ আছড়ে পড়ে এই গাছগুলির তলদেশ পর্যন্ত চলে আসছে। একটা তরঙ্গ তাঁর পা ভিজিয়ে দিল।

ওই চলেছে লল্লা! ওই! টুকরো টুকরো আলোর মধ্যে রহস্যমূর্তির মত দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। তিনি আবার ছুটলেন দক্ষিণ মুখে। ওই মুখেই লল্লা চলেছে, সম্ভবত মহাবলীপুরমের

দিকে।

খানিকটা গিয়ে আবার তিনি দাঁড়ালেন। কতদূরে লল্লা! লল্লা, যেও না, এত দূর পথ! তুমি দুর্বল, তুমি যুবতী, এই গভীর রাত্রি। লল্লা, তুমি দাঁড়াও। কিন্তু কই, আর তো দেখা যাচ্ছে না!

স্বল্প উচ্চকণ্ঠে তিনি ডাকলেন—লল্লা!

সমুদ্রের কলরোলে ঢাকা পড়ে গেল। একটা ঢেউ আবার আছড়ে পড়ে এগিয়ে এসে তাঁর পা ডুবিয়ে দিল। আবার অগ্রসর হলেন। ডাকলেন—লল্লা!

এবার চোখে পড়ল, নারিকেল সারির ছায়ার মধ্যে সঞ্চরমাণ জ্যোৎস্নার একটি ফালি তাঁকে দেখিয়ে দিল একটি নারিকেল কাণ্ডে ঠেস দিয়ে বসেছে লল্লা। তার দেহের কাপড়ের কয়েকটি অংশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। লল্লা বসেছে। ক্লান্ত হয়ে বসতে বাধ্য হয়েছে। এ কি! এলিয়ে পড়ল যেন!

দ্রুতপদে তিনি এগিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, লল্লা নারিকেল গাছের তলায় কাত হয়ে শুয়ে পড়েছে। একটু নত হয়ে তিনি ডাকলেন—লল্লা!

চমকে উঠল লল্লা—কে?

—ভয় নেই লল্লা, আমি।

—প্রভু! আপনি!

সে আবার স্থির হল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—ভেবেছিলাম, পারব চলে যেতে। কিন্তু পারছি না। বড় দুর্বল বোধ হচ্ছে।

—কেন চলে এলে লল্লা? ছি ছি ছি!

রঙ্গনাথন বসলেন তার শিয়রে। মাথাটি তুলে নিলেন কোলে—তুমি বেরিয়ে এলে, আমি তোমাকে কথা বলতে পারলাম না ওরা জেগে উঠবে বলে।

তার ললাটে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—দেখি তোমার নাড়ী।

মণিবন্ধটি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন—দুর্বল! এ দুর্বল অবস্থায় কি করলে বল তো!

লল্লা চুপ করে রইল শিষ্ট বালিকার মত।

রঙ্গনাথন ভাবলেন কি করবেন একে নিয়ে। মহাবলীপুরম অনেক দূর। মাদ্রাজ, তার নিজের গ্রাম, তার জন্য বন্ধনরজ্জু আর নির্যাতনের দণ্ড ধরে বসে আছে। জ্যোৎস্নার একটি মোটা টুকরো এসে পড়ল তাঁদের উপর। তিনি দেখলেন লল্লা একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টিও নিবদ্ধ হয়ে গেল লল্লার মুখের উপর। লল্লার চুল একরাশি এবং সেগুলি ঘন কুঞ্চনে কুঞ্চিত। চোখ দুটি আয়ত, প্রশান্ত, প্রসন্ন। শুভ্রচ্ছদ দুটি মুক্তাগর্ভ শুক্তির ভিতরদিককার মতই নীলাভ শুভ্র, গাঢ় কালো মুক্তার মতই তারা দুটি টলটল করছে। চন্দ্রালোকে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

লল্লা বোধ হয় সচেতন হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টিতে। সে চোখ বুজল। রঙ্গনাথন ডাকলেন—লল্লা!

—প্রভু—

—কি ভাবছিলে লল্লা?

বলতে পারলেন না, কি দেখছিলে লল্লা আমার দিকে তাকিয়ে। কণ্ঠস্বর তাঁর গাঢ় হয়ে এসেছে। একটা উত্তাপ যেন তাঁকে উত্তপ্ত করে তুলছে। একটা মাদকতার ক্রিয়ার মত

ক্রিয়া তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করছে। দেহের শিরায় রক্তের প্রবাহে মাথায় স্নায়ুর মধ্যে কি যেন উষ্ণতা; কিছু যেন; সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন করবার মত তীব্র একটা কিছু বয়ে যাচ্ছে। মুদিত-চক্ষু লল্লার ললাটে জ্যোৎস্নার প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে। ললাটে হাত বুলিয়ে দিয়ে আবার ডাকলেন—লল্লা!

লল্লার ললাট শীতল। চোখ বুজেই অতি ক্ষীণ হেসে সে উত্তর দিল—ভাবছিলাম আপনিই আমার সাক্ষাৎ বরদরাজস্বামী।

আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন রঙ্গনাথন। গভীর স্নেহে মুখটি আনত করে হঠাৎ থামলেন। আপন মুখের উপর তাঁর উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শে চোখ মেললে লল্লা। বিস্ফারিত চোখে বললে—প্রভু!

রঙ্গনাথন উত্তর দিলেন না, বিরত হলেন না, তার ললাটে একটি চুম্বন দিয়ে বললেন—এ তোমার বরদরাজের আশীর্বাদ।

একমুহূর্তে কেঁদে আকুল হয়ে পড়ল লল্লা। শুধু বাক্যহীন রোদন।

রঙ্গনাথন তাঁর কাঁধ ধরে একটু আকর্ষণ করে বললেন—ওঠ। পারবে উঠতে?

মন্ত্রমুগ্ধার মতই লল্লা উঠল। রঙ্গনাথন বললেন—আমার কাঁধে ভর দাও। না পার তো বয়ে নিয়ে যাব। বল।

—কোথায় প্রভু?

—কেন আমার গৃহে।

—প্রভু—

—কোন ভয় নেই লল্লা।

—প্রভু, প্রহরীরা—

—কোন ভয় নেই। তোমায় ধরে নিয়ে যেতে পারবে না তারা। দেব না। ভেবো না তুমি।

—আপনার বিপদ হবে। না না—

—হবে না।

—কি বলবেন? কি করে বাঁচাবেন প্রভু? একটা ভিখারিণী শবরকন্যার জন্য আপনি সুদ্ধ জাতিচ্যুত হবেন।

—জাতিচ্যুত! না।

স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রঙ্গনাথন বললেন—না। তবুও তোমাকে ছেড়ে দেব না।

আবার বললেন উচ্চতর কণ্ঠে—না। তোমাকে কোন কালে ছেড়ে দেব না। না।

দৃষ্টি তাঁর উন্মাদের মত। দেহ তাঁর কাঁপছে। হাতে তাঁর অগ্ন্যুত্তাপ। শঙ্কিত কণ্ঠে লল্লা বললে—প্রভু!

রঙ্গনাথন বললেন—ভয় পেয়ো না। আমাকে ঘৃণা করো না লল্লা। প্রয়োজন হয় তোমার জন্য জাতিচ্যুত হব। আমি শবর হব। তোমাকে ছাড়তে আমি পারব না।

লল্লাকে সবলে বুকের মধ্যে আকর্ষণ করলেন রঙ্গনাথন। যৌবনের যে নিত্যলীলায় অকস্মাৎ একদা শীতান্তে, বাতাসের স্পর্শে গতি পরিবর্তিত হয়, সূর্যের স্পর্শে নব তাপের সঞ্চার হয়, পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কামনা জাগে, সেই তাপে কামনায় রঙ্গনাথনের এত কালের সব সংকল্প ভেসে গেল।

লল্লার অধরোষ্ঠের উপর নিজের অধরোষ্ঠ স্থাপন করে মূক করে নিলেন তাকে, নিজেও মূক হয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পর তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—কামনার কাছে আমি পরাজিত হয়েছি, মাথায় করে নিয়েছি তাকে, কিন্তু আমি কামার্ত পশু নই লল্লা। তোমাকে আমি বিবাহ করব।

নিজের গলা থেকে তুলসীর মালাখানি খুলে তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন—সমুদ্র সাক্ষী রেখে তোমাকে বরণ করলাম আমি। প্রয়োজন হয় আমি জাতিচ্যুত হব। আমি জানি সমাজ জাতিচ্যুত করলেও বরদরাজ ত্যাগ করবেন না। একান্তে দূরে চলে যাব দুজনে। শবরী নয়, ব্রাহ্মণী হবে তুমি।

লল্লা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে—আপনিই আমার বরদরাজ।

—তুমি তা হলে লক্ষ্মী।

আবার তাকে তুলে বুকে ধরলেন। তারপর বললেন—চল।

—না। শান্ত কণ্ঠে লল্লা বললে—বড় ভাল লাগছে এখানে। কি সুন্দর চাঁদ! অপরূপ জ্যোৎস্না! সমুদ্রের কি রূপ!

—বেশ, এই সমুদ্রবেলাভূমে হোক আমাদের বাসর।

সস্নেহে রঙ্গনাথন লল্লাকে নারিকেল কুঞ্জতলে বসিয়ে দিয়ে তার পাশে বসলেন।

একটি উচ্ছ্বসিত উত্তাল তরঙ্গ বেলাভূমে আছড়ে পরে তাঁদের পা পর্যন্ত এসে স্পর্শ করে ফিরে গেল।

রঙ্গনাথন বললেন—আজ পূর্ণিমা, সমুদ্র উতরোল হয়ে উঠেছে।

* * * *

বালুচরে পাতা বাসরশয্যায় তাঁরা দুজনেই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙল পাখীর কলরবে। সামুদ্রিক পাখীর দল ভোরের মরা জ্যোৎস্নায় দল বেঁধে চক্রাকারে উড়তে শুরু করেছে আকাশ থেকে ঝরে-পড়া শুভ্রদল আকাশকুসুমের মত। স্থলচারী বিহঙ্গেরা গাছের মাথায় মাথায় কলরব করছে। যে দু-একটি শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট গাছ আছে তার পত্রপল্লবের মধ্যে ছোট পাখীরা দলবদ্ধ শিশুর মত প্রভাতী কাকলীতে মুখর হয়ে উঠেছে। পূর্বে অন্তহীন সমুদ্রের যেখানে আকাশ সমুদ্র-জলে অবগাহনে নেমেছে—সেখানে দীর্ঘায়ত একটি পাণ্ডুর রেখা জেগেছে; তারই মধ্য-বিন্দুর ঈষৎ উত্তর দিকে একস্থানে সে পাণ্ডুরতা মণ্ডলাকারে ক্রমশ আয়তনে বাড়ছে। পূর্বদিগন্তে একপাদ আকাশে জ্যোৎস্না ম্লান বিবর্ণ হয়ে গেছে, আকাশের প্রথম পাদ-সীমার একটু উপরে শুকতারা নীলাভ জ্যোতিতে হাসছে।

এ পাশে পশ্চিম দিগন্তে দিগন্তশায়ী পূর্ণচন্দ্র। রক্তাভ পাণ্ডুর হয়ে এসেছে। কিন্তু তার জ্যোৎস্না এখনও পশ্চিমে দিগন্ত থেকে আকাশের ত্রিপাদ পর্যন্ত আলো করে রেখেছে। সে জ্যোৎস্না পড়ে রয়েছে শাখা-প্রশাখাহীন দীর্ঘশীর্ষ নারিকেল বৃক্ষগুলির পশ্চিম ভাগে, শীর্ষদেশ থেকে তলভূমি পর্যন্ত আলোকিত করে। পূর্বভাগে বালুচরে সমুদ্রগর্ভ পর্যন্ত জেগে রয়েছে অস্পষ্ট ছায়া। পশ্চিম দিগন্তাগত খানিকটা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে শবরীর মুখের উপর। নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন লল্লা।

প্রথম ঘুম ভাঙল রঙ্গনাথনের। রাত্রি শেষ হয়েছে। আর এক দণ্ডের মধ্যেই ওই পাণ্ডুর মণ্ডলটি ঈষৎ রক্তরাগে ভরে উঠবে। তারপর সে রক্তরাগ একদিকে সমুদ্রের জল একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে পরিধিতে আকাশের উর্ধ্বলোক পরিব্যাপ্ত করবে এবং কেন্দ্রে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে হতে জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্য মাথা তুলবেন। যেন সমুদ্রবক্ষতল থেকেই সূর্যদেব উঠে

আসছেন। তারপর একসময় লাফ দিয়ে উঠবেন আকাশে, সমুদ্রের নীল তরঙ্গশীর্ষে রক্তরাগের ছটা বাজবে।

পাশে শবরকন্যা এখনও নিদ্রিতা। রঙ্গনাথন তার মুখের দিকে তাকালেন। বারেকের জন্য চিত্ত যেন নিজের উপরেই বিরূপ হয়ে উঠল রঙ্গনাথনের। ভাবাবেগে এ তিনি কাল কি করেছেন?

হে বরদরাজ, এ কি করলে! তোমার চরণতলে কাল বিষজর্জরা চেতনাহীনা এই কন্যাকে আশ্রয় দেবার সময় বলেছিলাম, এতে যদি অপরাধ হয় তবে সে অপরাধের দণ্ড আমাকে দিও। দোষ তো এর নয়। আমার। তুমি কি আমাকে মোহগ্রস্ত করে আমার ব্রত ভঙ্গ করিয়ে তপস্যাচ্যুত করিয়ে তারই দণ্ড দিলে? স্থির হয়ে গেছেন তিনি, পাষাণ হয়ে গেছেন যেন। দিবালোক যত স্পষ্ট হচ্ছে, পৃথিবী যত বাস্তব রূপে প্রকাশিত হচ্ছে তত তিনি যেন পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন। এ কি করেছেন তিনি! দয়া করতে গিয়ে এ কি বন্ধনে নিজেকে শৃঙ্খলিত করেছেন! লল্লাকে ডাকতে পারছেন না তিনি। চোখ মেলেই লল্লার নিদ্রা-জড়িমা-মুক্ত চোখে সমুদ্র-বক্ষে রক্তিম সূর্যের আবির্ভাবের মত প্রেমের দীপ্তি ফুটে উঠবে। তার সারা মুখ কোমল অনুরাগচ্ছটায় অনুরঞ্জিত হবে। সলজ্জ হাসির রেখায় ঠোঁট দুটি বিকশিত হবে। কি করবেন তিনি তখন?

লল্লার গলায় তাঁর গলার বৈষ্ণবজনের মালাটি পড়ে রয়েছে।

অকস্মাৎ রঙ্গনাথন যেন বেত্রাহতের মত অধীর হয়ে উঠলেন। লল্লাকে একটি বৃশ্চিকে দংশন করেছিল—তাঁর মনে হল তাঁকে যেন সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করেছে।

কি করবেন তিনি? লল্লা যেন এখনও তাঁকে বৃশ্চিকের মত ধরে আছে। লল্লার একখানি হাত তাঁর কোলের উপর সত্যই পড়ে ছিল। তিনি আতঙ্কিত ব্যক্তির মতই হাতখানাকে সজোরে কোল থেকে বালুচরের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। লল্লা সেই আঘাতেই চোখ মেলল। সদ্য ঘুম-ভাঙা দৃষ্টির মধ্যে আঘাতের বেদনাবোধও ছিল না। ছিল শুধু প্রসন্ন অনুরাগ। নিদ্রা-ঘোরের মধ্যে সে আঘাতটা পূর্ণমাত্রায় অনুভব করে নি, এবং অনুমানও করে নি, বা করবার কোন কারণ ঘটে নি তার। চোখ মেলে চেয়ে সে স্মিতহাস্যে বললে—প্রভু! বোধ হয় তার মনে হয়েছিল রঙ্গনাথন তাকে ডাকছে। রঙ্গনাথন তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। প্রভু বলে সাড়ার মধ্যে লল্লার প্রশ্ন ছিল—কি বলছেন প্রভু? কিন্তু রঙ্গনাথনের বলার কিছু ছিল না। পথিপার্শ্বে নিদ্রিত চোর যেমন ভোরের আলোয় জেগে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায় তেমনি ভাবে তিনি পালিয়ে গেলেন। লল্লা উঠে দাঁড়াল। তার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এমন করে ছুটে পালালেন কেন? প্রহরী! চঞ্চল হয়ে উঠল সে। পরমুহূর্তেই তার সব চঞ্চলতা স্থির হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল—কাল রঙ্গনাথন তাকে ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন—কিসের ভয়? তুমি আমার পত্নী। তুমি যাবে আপনার গৃহে—

তা হলে? তা হলে?—

সে যে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার কণ্ঠে যে এখনও তাঁরই পরানো মালা—বৈষ্ণব-জনের মালাখানি দুলছে! তবে?

পাথর-মূর্তির মতই সে দাঁড়িয়ে রইল। প্রহরীর ভয় আর তার নেই। নিয়ে যাক, তারা তাকে ধরে নিয়ে যাক। করুক, নির্যাতন করুক, লাঞ্ছনা করুক।

সূর্য উঠবে। একটি মণ্ডলাকার রক্তানুরঞ্জন ধীরে ধীরে আকাশলোকে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে, পাখীরা দূরদূরান্তরে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলেছে। সমুদ্রবক্ষে নৌকা দেখা দিয়েছে। দূর উত্তরে

মাদ্রাজ বন্দরে জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। বড় বড় নৌকা পাল তুলে বের হচ্ছে। ছোট মাছ-ধরা নৌকা সারি সারি ছুটছে গভীর সমুদ্রের দিকে। মানুষের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। সূর্য উঠছে। কিন্তু সে কোথায় যাবে? দিনের আলোয় কি করে সে পথে বের হবে? সে সব বুঝেছে। আর কিছু তার অগোচর নেই। এই হয়। এই বুঝি নিয়ম! সূর্য উঠল। আলো রৌদ্র হয়ে ফুটল—উত্তাপের স্পর্শ লাগল দেহে। সেই স্পর্শে সে সচকিত হয়ে উঠল। যেতে হবে—কোথাও যেতে হবে। অনেক দূরে, অনেক দূরে। পালাতে হবে তাকে। দ্রুতপদে সে বনবীথির ঘন-সন্নিবিষ্ট নারিকেল তালের কাণ্ডগুলির মধ্য দিয়ে চলতে লাগল। দক্ষিণ মুখে।

আবার সকালে জোয়ার আসছে। তার পদচিহ্নগুলি ধুয়ে দিয়ে গেল জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস।

* * * *

রঙ্গনাথন বেত্রাহতের মত ছুটে আসছিলেন।

প্রহরী দুজনও সকালে ঘুম ভেঙে তাঁকে না পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। তাঁকে দেখে আশ্বস্ত হল, কিন্তু তাঁর অবস্থা দেখে তাঁকে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে আচার্য? ভোরবেলা উঠে কোথায় গিয়েছিলেন? সমুদ্রকূলে বুঝি?

তিনি বললেন—অ্যাঁ— ? হ্যাঁ।

বলেই তিনি তাদের পিছনে ফেলে প্রায় ছুটে এসে ঘরে আপন শয্যার উপর গড়িয়ে পড়লেন। সর্বাঙ্গের বালুকণা ঝরে পড়ল শয্যার উপর। কিন্তু তার পীড়া অনুভব তিনি করলেন না। মুখ গুঁজে পড়ে রইলেন।

এ কি মর্মপীড়া! এ কি করলেন! হে বরদরাজ! এ কি শাস্তি দিলে তুমি! আবার উঠলেন। উঠে ভাণ্ডার ঘরের দরজা ঠেলে পুজোর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু প্রবেশ করতে গিয়েও প্রবেশ করতে পারলেন না।

স্নান করতে হবে তাঁকে। বেরিয়ে এলেন। কুড়ুমণিকে এবং প্রহরী দুটিকে বললেন—আমি স্নান করতে যাচ্ছি সমুদ্রে। মধ্যপথ থেকে ফিরে এলেন। যেতে পারলেন না। লল্লা—লল্লা নিশ্চয় নারিকেল কুঞ্জতলে এখনও পড়ে আছে। কাঁদছে। তাঁকে দেখলেই সে 'প্রভু' বলে এগিয়ে আসবে। পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদবে।

ফিরে এসে বললেন—না কুড়ুমণি, শরীর আমার অসুস্থ। সমুদ্রস্নান সহ্য হবে না। কূপ থেকে জল তুলে স্নান করে পুজোর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। ঘরখানি এখনও লল্লার অবস্থানের চিহ্নে মলিন হয়ে আছে। সযত্নে তিনি সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে পূজার আয়োজন করে পূজায় বসলেন। কিন্তু হ'ল না, পূজা হ'ল না। চোখ বন্ধ করলেই লল্লাকে দেখছেন। একটি দিনে লল্লা যেন শতমূর্তিতে নিজেকে তাঁর মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

লল্লা গোশালার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে ম্লান-মুখে, সজল চোখে, ক্লিষ্ট শ্যাম-লতার মত।

লল্লা বিচালি স্তূপ থেকে যন্ত্রণাকাতর ভয়ার্ত-মুখে বের হয়ে আসছে।

লল্লা বৃশ্চিক-বিষে চেতনাহীন হয়ে ভেঙে পড়েছে।

লল্লা তাঁর বাহুর উপর।

লল্লাকে তিনি বরদরাজের সম্মুখে শুইয়ে দিয়ে বলছেন—তোমারই চরণপ্রান্তে একে সমর্পণ করলাম প্রভু। তুমি তাকে রক্ষা করতে পারবে না দেবতা? বুকের ভিতরটা তাঁর কেমন করে উঠল। চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল দরদর-ধারে। পরমুহূর্তেই তিনি চমকে উঠলেন। চোখ

দুটি খুলে গেল। বিস্ফারিত হয়ে উঠল। মনের ভিতর থেকে বিপরীত প্রশ্ন জেগে উঠল। দেবতা তো তাকে ওঁরই হাতে দিয়েছিলেন! দেবতা তো প্রতারণা করেন নি!

ওঃ! লল্লার সেই মুখ মনে পড়ছে। সেই দৃষ্টি মনে পড়ছে। তাঁর নিজের মালাখানি তার গলায় যখন পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—কামনা আমার আছে, কিন্তু কামার্ত পশু নই আমি। লল্লা, তোমাকে ছাড়তে পারব না আমি! এই মালা পরিয়ে তোমাকে সমুদ্র সাক্ষী রেখে বরণ করছি—তুমি আমার পত্নী—সেই মুহূর্তের লল্লার সেই অপরূপ সুষমা-দীপ্ত, প্রসন্ন-ক্লান্ত মুখখানি মনে পড়ছে। সারা ঘরখানিতে এখনও লল্লার দেহগন্ধ পাচ্ছেন তিনি।

লল্লা, লল্লা, লল্লা। সারা অন্তর ভরে লল্লাকে আহ্বান করে উঠল তাঁর হৃদয়। লল্লা! লল্লাকে তিনি ভালবাসেন। লল্লাকে তিনি পত্নী বলে গ্রহণ করেছেন। বরদরাজের যে প্রেরণায়, যে ইঙ্গিতে ওই গান তিনি রচনা করেছিলেন—কৃষ্ণচর্মের অন্তরালে যে দেবতা বাস করেন—সেই দেবতাই বাস করেন বৈকুণ্ঠে—যে দেবতা বাস করেন বৈকুণ্ঠে—তিনিই বাস করেন কৃষ্ণবর্ণ চর্মের অন্তরালে—সেই প্রেরণাতে তিনি তাকে গ্রহণ করেছিলেন। হৃদয়ের অকপট, অকৃত্রিম, ছলনাহীন কামনা—যে কামনার পুণ্যে নারী পূর্ণ হয় পুরুষের মধ্যে, পুরুষ পূর্ণ হয় নারীর মধ্যে—সেই অকৃত্রিম পবিত্র কামনায় কাল তিনি তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। ভুল—ভুল করেছেন তিনি পালিয়ে এসে। ভুল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। ভুল সংশোধন না হলে জীবনের সে ক্ষতি আর পূর্ণ হয় না।

হে বরদরাজ—এ কি মতিভ্রান্তিতে তুমি ছলনা করলে?

কেন? কেন? কেন এমন ভ্রান্তি হল তাঁর? এত বড় আঘাতে তিনি বিচলিত হন নি, মিথ্যা বলেন নি। কারুর ভয়ে তাঁর উপলব্ধ সত্যকে অসত্য বলেন নি। কিন্তু তাঁর জীবনের চরমতম সত্যকে কি করে, কেন তিনি এই ভাবে মুহূর্তের ভ্রান্তিবশে সাগর বালুবেলায় ফেলে দিয়ে চোরের মত পালিয়ে এলেন?

আসন ছেড়ে উঠে পড়ছিলেন। আবার বসলেন। প্রণাম করে বললেন—লল্লাকে ফিরিয়ে আনতে চললাম প্রভু। লল্লা আমার জীবনের চরম সত্য। তাকে আমি ভালবাসি। তাকে আমি চাই তোমার প্রসাদের মত। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি চললেন সমুদ্রতটের দিকে। প্রহরী দুটিকে বললেন—আমি চললাম সমুদ্রতটে। তটভূমি ধরে আমি যাব মাদ্রাজ পর্যন্ত। তোমরা ফিরে যাও।

কুড়ূমণিকে বললেন—ঘর রইল। ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

সাগর তটভূমে এসে দাঁড়ালেন।

রৌদ্র-ঝলমল সাগরজল—রৌদ্র এবং রৌদ্রকরোজ্জ্বল সাগরজলচ্ছটায় প্রদীপ্ত বেলাভূমি পরম শুচিতায় পরিমার্জিত দেবতার অঙ্গনের মত প্রসারিত। নারিকেল সুপারি বৃক্ষের তরবারির মত দীর্ঘ পাতাগুলি ঝিকমিক করছে। সরসর সরসর শব্দ উঠছে তাদের আন্দোলনে। সমুদ্র-কল্লোল অবিরাম—অশ্রান্ত। কাঁদছে—

কান্নাই মনে হচ্ছে তাঁর এই মুহূর্তে।

শূন্য বালুচরে লল্লা তো নেই।

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন—উত্তর-মুখে।

প্রথমে যাবেন লল্লাদের গ্রামে। তারপর মাদ্রাজে। মাদ্রাজে মায়লাপুরে—পার্থসারথি মন্দিরে দেখবেন। তারপর মহাবলীপুরম। তারপর কাঞ্জীভরম। লল্লাকে না পেলে যে হবে না তাঁর! নাহলে যে সব মিথ্যে হয়ে যাবে! জীবন মিথ্যা হয়ে যাবে!

*   *   •   *   *

বেলা প্রথম প্রহর পার হচ্ছে। সমুদ্র নৌকোয় নৌকোয় ভরে গেছে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়েই ভাবছিলেন তিনি। একটি বড় যাত্রীবাহী নৌকা থেকে হাত তুলে কারা নমস্কার করলে। তাদের মধ্যে গৈরিকধারিণী এক প্রৌঢ়া। তিনি চিনলেন। পুরী থেকে ফেরার পথে পার্থসারথি দর্শনের জন্য মাদ্রাজে নেমেছিল। সেদিন রাত্রে গান শুনে প্রৌঢ়া এসে তাঁকে হাত ধরে বলেছিল, শতায়ু হও। তারা ফিরছে আজ। পথে সমুদ্রতটে তাঁকে দেখে চিনে অভিবাদন করছে। কিন্তু চিন্তামগ্ন রঙ্গনাথন যেন দেখেও দেখলেন না। প্রত্যভিবাদন না করেই উত্তর-মুখে হাঁটতে শুরু করলেন। লল্লা। লল্লা। যোশেফদের গ্রামের প্রবেশ-পথে থমকে দাঁড়ান নি—কিন্তু যোশেফের বাড়ির দরজায় থমকে দাঁড়ালেন। গ্রামের পুরুষেরা অধিকাংশই বাইরে গেছে কাজে। মেয়েরা বিস্মিত হল। তাঁর পথ থেকে সরে দাঁড়াল, আপন আপন ঘরের ভিতর গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। আচার্য একজন প্রবেশ করেছেন তাদের গ্রামে। চোখমুখে তাদের উত্তেজনা ফুটে উঠল।

—হে বরদরাজ! হে মহেশ্বর!

খৃষ্টানেরা ঘরে ঢুকল না, পথের পাশে সরে দাঁড়াল। রঙ্গনাথন যত অগ্রসর হলেন যোশেফের দরজার দিকে তত যেন দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। অকস্মাৎ এক সময় যেন সম্পূর্ণ পরাভূত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর বুকের ভিতর আলোড়ন উঠেছে আবার। কি বলবেন তিনি? কি করে বলবেন? কি করে বলবেন লল্লাকে তিনি কাল রাত্রে সমুদ্র সাক্ষী করে—শেষ হল না মনের প্রশ্ন। একজন খৃষ্টান যুবক উত্তেজিত উদ্ধত ভঙ্গিতে পাশের গলিপথ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। মুষ্টি উদ্যত করে বললে—কেন প্রবেশ করেছ তুমি আমাদের পল্লীতে? কি প্রয়োজন তোমার? গোক্ষুর সর্প, কাকে দংশন করতে এসেছ?

চোখ বুজলেন রঙ্গনাথন। মনে মনে বরদরাজকে স্মরণ করে নিজের মন দৃঢ় করতে চেষ্টা করলেন। মনের মধ্যে যে অগ্নি জ্বলছিল, যার শিখা গ্রামে প্রবেশ করার থেকেই নিভে আসছে ধীরে ধীরে, তাতে আবেগ এবং সংকল্পের ইন্ধন ও হবি দিয়ে তাকে জ্বালাবার চেষ্টা করলেন।

যুবকটি বললে—তোমাকে কে আঘাত করলে আর তুমি নাম করলে আমাদের!

চমকে উঠলেন রঙ্গনাথন, বললেন—না। আমি কারও নাম করি নি। আমি কাউকেই তাদের চিনতে পারি নি। অসত্য আমি বলি না।

ধীরে ধীরে পাশে লোক এসে জমেছিল। তাদের মধ্যে থেকে একটি নারী-কণ্ঠস্বর বলে উঠল—উনি বলেন নি, বলেছে লল্লা। সমস্ত খৃষ্টানদের সে শত্রু। শবরদেরও সে ঘৃণা করে—সেই বলেছে। আমি গোড়া থেকে বলছি। তার কথাতেই কোতোয়ালীতে আমাদের জোয়ানদের ধরেছে।

রঙ্গনাথনের মনে আগুন জ্বলল আবার। তিনি প্রশ্ন করলেন—কাকে ধরেছে? কবে ধরেছে?

—মাদ্রাজ শহরে থাকে আমাদের যে সব জোয়ানরা তাদের দশজনকে ধরেছে আজ ভোরে। লোক এই কিছুক্ষণ আগে সংবাদ এনেছে।

আর একজন বললে—ন্যাকা সাজছে। কিছু যেন জানে না।

অন্য জনে বললে—গ্রামে ও এসেছে আমাদের মুখ দেখে চিনতে। ওকে ধর ধর—ঘরে বন্ধ কর। রাত্রে—

কলরব করে উঠল লোকেরা। কিছু লোক পালিয়ে গেল। রঙ্গনাথন তখন মনের বল ফিরে পেয়েছেন। বললেন—বরদরাজের নাম নিয়ে বলছি—আমি কিছুই জানি না। লল্লাও কিছু জানে না। জান তোমার লল্লা কোথায়? তাকে কি তোমরা সন্দেহ করে আটকে রেখেছ? দোহাই তোমাদের, সত্য বল?

নির্ভীকতা শুধু আক্রমণকারীকে প্রতিহত করে না, খানিকটা পশ্চাৎপদও করে দেয়। এই নির্ভীকতার সঙ্গে সহৃদয় আকুতি থাকলে আক্রমণকারীর বিদ্বেষকেও নষ্ট করে। বিস্ময় জাগায়।

তাই হল। এরা রঙ্গনাথনের কথায় স্তব্ধ হয়ে সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রঙ্গনাথন বললেন—আমাকে একটি সত্য কথা বল—লল্লা কোথায়? আমি নিজে এখনি কোতোয়ালীতে যাচ্ছি। নিশ্চিন্ত থাক—আমি মিথ্যা বলব না। তারা সঙ্গে সঙ্গেই ছাড়া পাবে। বল।

একজন প্রৌঢ় এসে বললে—মেইরীর নামে শপথ করে বলছি আচার্য, লল্লা কোথায় আমরা জানি না। সে তো গ্রাম পরিত্যাগ করেছে তার মায়ের মৃত্যুর পর।

—আজ! আজ সকালে! আজ সকালে সে আসে নি?

—না আচার্য। শপথ করে বলছি। বিশ্বাস করুন।

রঙ্গনাথন আর দাঁড়ালেন না। তিনি মাদ্রাজের পথে ছুটলেন।

এ কি বাধা, এ কি বিঘ্ন তাঁর গতিকে অন্যদিকে ভিন্ন মুখে আকর্ষণ করছে! লল্লার সন্ধান থেকে বিরত হয়ে তাঁকে যেতে হবে কোতোয়ালী। সেখানে তারা যে কি করবে—কতক্ষণ তাঁকে আটকে রাখবে কে জানে। লল্লা কোন দূরদূরান্তরে ছুটে পালাচ্ছে লজ্জায়, ঘৃণায়—তাঁর প্রতি ঘৃণায়। লল্লাকে যে তাঁকে ধরতে হবে—বলতে হবে, লল্লা, আমি বুঝেছি; লোক-লজ্জার ভ্রান্তি আমার কেটেছে, সমাজের ভয় আমার নেই। তোমার মধ্যে আমার জীবনের লালসাকে তো নয়—আমার ভালবাসাকে পেয়েছি—ভালবাসার কাছে ভ্রান্তি ভয় সব তুচ্ছ। আমাকে ক্ষমা কর। ফিরে এস।

সে পথে এ কি বাধা!

কোতোয়ালীতে তখন শ্রীনিবাসন তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন। এর মধ্যে তাঁর কাছে সওয়ার চলে গেছে। কোতোয়ালীর কর্মচারীরা গোপন তদন্ত করে দশজন শবর খৃষ্টান এবং পাঁচজন শৈবকে ধরেছেন। এরা নামে শৈব হলেও ধর্মের কোন ধার ধারে না—আসলে দুষ্ট-প্রকৃতির লোক।

শ্রীনিবাসনের ঘরের বারান্দায় যোশেফ বসে আছে, একজন ফাদার বসে আছেন। মায়লা-পুরের শিবমন্দিরের একজন প্রতিনিধি বসে আছেন। আচার্য চিদম্বরমও এসেছেন।

শ্রীনিবাসন বললেন—কোথায় গিয়েছিলেন আচার্য? সওয়ার ফিরে এসে বললে, আপনি মাদ্রাজ রওনা হয়েছেন প্রাতঃকালে পূজা সেরেই?

রঙ্গনাথনের দৃষ্টির মধ্যে একটি প্রখরতা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

লল্লার কামনা—নিজের অনুশোচনা তাঁকে অধীর করে তুলেছে। একটা উন্মত্ত বিদ্রোহ তাঁকে ক্ষিপ্তপ্রায় করে তুলেছে। নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সমাজ ধর্ম সবকিছুর বিরুদ্ধে। কোতোয়ালীর বিরুদ্ধেও। কারণ কোতোয়ালী লল্লাকে খুঁজছে। মিথ্যা সন্দেহে খুঁজছে। যোশেফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আচার্য চিদম্বরমের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ। সবাই সবাই যেন হেতু—

যার জন্য তিনি লল্লাকে ফেলে কুৎসিত প্রকৃতির ভীমু চোরের মত পালিয়ে এসেছেন। মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন জাগছে একটা; আশ্চর্য, একটি নারীর জন্য একি উন্মত্ততা! সঙ্গে সঙ্গে সে উন্মত্ততা প্রবলতর হয়ে চীৎকার করে উঠেছে—হ্যাঁ, লল্লাকে না পেলে আমি উন্মাদ হয়ে যাব। এখন অর্ধোন্মাদ। পরে পূর্ণোন্মাদ হয়ে যাব।

প্রখর কণ্ঠেই বললেন রঙ্গনাথন—আপনি রাজকর্মচারী। আপনি আপন অধিকারের মানুষদের রাজকর্মের প্রয়োজনমত চালিত করতে চান। কিন্তু মানুষের হৃদয় তো সে প্রয়োজনে চলে না। বরদরাজের অনুজ্ঞায় হৃদয়ের প্রয়োজনে আমি গিয়েছিলাম যোশেফদের পল্লীতে। সেখানে সংবাদ পেলাম আপনারা সন্দেহবশে কয়েকজন মাদ্রাজের বাসিন্দা ওই গ্রামের যুবকদের ধরেছেন। কয়েকজন শৈবধর্মানুরাগীকেও ধরেছেন। সংবাদ পেয়েই আমি ছুটে আসছি। আমি তো বার বার বলেছি—আমি তাদের কাউকে চিনতে পারি নি এবং সন্দেহও কাউকে করি না। সুতরাং কেন অনর্থক সন্দেহবশে—

বাধা দিলেন শ্রীনিবাসন—আচার্য রঙ্গনাথন, দেশের আইন যা তা আপনি মানতে বাধ্য। ধর্মত বাধ্য। নন কি?

চুপ করলেন রঙ্গনাথন। একটু নীরব থেকে বললেন—বেশ, বলুন কি করতে হবে?

—যাদের সন্দেহবশে আমরা ধরেছি তাদের দেখুন। চিন্তা করে মনে মনে মিলিয়ে বলুন, কারও সঙ্গে আকার আয়তন অবয়ব দৃষ্টিগত কোন সাদৃশ্য আছে কি না?

—চলুন।

কোতয়ালীর পশ্চাৎভাগে একটি খোলা জায়গায় প্রহরাধীন লোক কয়েকজনকে এনে দাঁড় করানো হল। রঙ্গনাথন সামনে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীনিবাসন বললেন—ভাল করে দেখুন।

রঙ্গনাথন তাকালেন তাদের দিকে। বিচিত্র। একবার মুখখানা পাংশু হল—পরমুহূর্তে কঠিন হল, পরমুহূর্তে মাথাটা ঝাঁকি দিলেন অকারণে। খৃষ্টান শবরদের দেখা হয়ে গেলে বললেন —না, মাননীয় শ্রীনিবাসন, আমি কারুর সঙ্গে কোন মিল দেখতে পাচ্ছি না। এরা কেউ নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

মানুষগুলির মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল একমুহূর্তে। স্মিত হাসি ফুটল মুখে—প্রসন্ন হয়ে উঠল মুখ। দৃষ্টি এমন কিছু বললে যা রঙ্গনাথনের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে উঠল।

শ্রীনিবাসন বললেন—ছেড়ে দাও এদের। চলুন, এবার ওদিকে চলুন। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছিল শৈবধর্মানুরাগীরা। সেখানেও সেই একই ঘটনা ঘটল।

রঙ্গনাথন বললেন—এবার আমাকে মুক্তি দিন, আমি যাই।

শ্রীনিবাসন বললেন—আপনি ইচ্ছাপূর্বক চিনতে চাইলেন না রঙ্গনাথন।

—ইচ্ছাপূর্বক চিনতে চাইলাম না? প্রশ্ন করলেন। বোধ হয় নিজেকেই করলেন। তার-পর বললেন—না।

—আর যেন দোষীকে ধরতে না পারার জন্য আমাকে দোষ দেবেন না।

—না। দিই নি, দেব না। আমি আসি মাননীয় রাজপ্রতিনিধি। আমার দাঁড়াবার সময় নেই।

—কোথায় যাবেন?

—আমি? ক্ষণেক স্তব্ধ থেকে বললেন—ঠিক জানি না। উদ্দেশ্যহীন যাত্রা শ্রীনিবাসন! বিস্মিত হবেন না। বরদরাজের অনুজ্ঞা—হৃদয়ের নির্দেশ আমাকে তাড়না করে ছোটাচ্ছে।

বাইরে আসতেই পাদ্রীটি উঠে বললেন—আপনি সত্যবাদী। ঈশ্বর আপনার উপর খুশী হবেন। ধন্যবাদ আপনাকে।

যোশেফ বললে—আচার্য রঙ্গনাথন, আপনাকে শ্রদ্ধা করি আমি। আমরা এ কখনও ভুলব না।

রঙ্গনাথনের চোখ দুটি মুহূর্তের জন্যে বিস্ফারিত হল—কোন চিন্তার প্রতিফলন পড়ল। তার পর বললেন—একটা অনুরোধ করব তোমাকে?

—বলুন আচার্য। আমরা অকৃতজ্ঞ নই।

—লল্লা যদি ফিরে আসে তাকে বলো সে যেন আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার জন্যে আমার ঘরে অপেক্ষা করে। বলো আমার পূজোর ঘরে যে বরদরাজের ছোট মূর্তি আছে—তার সেবার অধিকার তাকে আমি দিয়ে গেলাম।

—আচার্য! প্রবল বিস্ময়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল যোশেফ। সমবেত জনমণ্ডলীরও বিস্ময়ের সীমা রইল না।

রঙ্গনাথনের চোখে অর্ধোন্মাদের চোখের অস্বাভাবিক দৃষ্টি। তিনি বললেন—কাল রাত্রে আমায় বরদরাজ এই আদেশ করেছেন।

—বরদরাজ আদেশ করেছেন?

ওদিক থেকে আচার্য চিদম্বরম বলে উঠলেন—হাঁ-হাঁ, করবেন বই কি! কালের মহিমা। কলিযুগ, হিন্দুকাল বহুদিন বিগত, মুসলমানকালেও দেবতা এমন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন নি। এবার এসেছে শ্বেত ইংরাজ। এবার দেবতাদেরও ম্লেচ্ছাচারে অনাচারে রুচি না হলে কাল-মহিমা প্রকট হবে কেন? কিন্তু আচার্য রঙ্গনাথন—দেবতার এ আদেশ আমরা মানব না। দেবমূর্তি কলুষিত হলে আমরা তা নিক্ষেপ করি নদীগর্ভে। সমুদ্রগর্ভে। এই কলুষ-অশুচি-অভিলাষী তোমার দেবমূর্তিটাকে তুমি সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ কর—নতুবা তোমাকে ক্ষমা করব না আমরা। তুমি পতিত—শবরতুল্য হলে আজ থেকে।

রঙ্গনাথন বললেন—জয় বরদরাজ স্বামী! তোমার অমৃত প্রসাদ আমাকে দাও। হে প্রভু!

তিনি বেরিয়ে এলেন কোতয়ালী থেকে। চললেন পার্থসারথির দিকে।

মন্দিরে তিনি ঢুকলেন না। যেদিকে ভিক্ষার্থীরা থাকে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—লল্লাকে দেখেছ?

—না তো প্রভু।

মায়লপুরে কপালীশ্বর শিবনিকেতনের আশপাশের ভিক্ষার্থীদেরও ওই প্রশ্ন করলেন—লল্লা? লল্লা কোথায় জান?

—কই, না তো!

চল, তবে মহাবলীপুরম। পথ চলতে চলতে হঠাৎ স্মরণ হল একবস্ত্রে কপর্দকহীন হয়ে বেরিয়ে এসেছেন তিনি।

কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন। তারপর আবার চলতে শুরু করলেন। এই ভাল। এই শ্রেয়। ফিরে গিয়ে অর্থ এবং কাপড়চোপড় আনতে যে সময় যাবে তার মধ্যে লল্লা কত—কত দূরান্তরে চলে যাবে। লল্লার জন্য তিনি অধীর উন্মাদ হয়ে যাচ্ছেন মুহূর্তে মুহূর্তে। ধর্ম নয়, কর্তব্য নয়, তার থেকেও বড় কিছু। জীবনের তৃষ্ণা—শুধু তৃষ্ণা নয়, অমৃত তৃষ্ণা!

চলো মহাবলীপুরম—

মহাবলীপুরমেই বা কই লল্লা? সে তো আসেনি।

চলো কাঞ্জীভরম—

কাঞ্জীভরমেই বা কই লল্লা? কাঞ্জীভরমে শুধু এইটুকু শুনলেন—তাঞ্জোরে অনেক যাত্রী গেছে। ভিক্ষুক দলও গেছে। সেখানে বিরাট উৎসব।

চলো তাঞ্জোরে। একমাত্র বস্ত্র ধূলি-মলিন হয়ে গেল; দাড়িগোঁফে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল মুখ; পাদুকা ছিন্ন হয়ে গেল, ফেলে দিলেন। উত্তরীয়খানি থেকে তৈরী করলেন ভিক্ষার ঝুলি। গান রচনা করলেন—সুর যোজনা করলেন, সেই গান গেয়ে ভিক্ষাজীবী রঙ্গনাথন চললেন। অমৃতপ্রসাদ দাও হে দাও—জয় বরদরাজ হে! হায়, কোথায় অমৃত প্রসাদ!

হায়—কোথায় অমৃত প্রসাদ!

অমৃত হয়তো কথার কথা। না, একবার তো তার সৌরভ অনুভব করেছিলেন। মুখের কাছে পাত্রখানি ধরে মুগ্ধ হয়ে বসেই ছিলেন; তারপর ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আর মিলল না। সম্ভবত একবারই মেলে। যে পান করে সে অমর হয়—যে ফেলে দেয় তার আর মেলে না। তৃষ্ণার্ত ধরিত্রী শোষণ করে নেয়; অথবা পরিত্যক্ত পাত্রের আধেয় বাতাস রৌদ্র পান করে ধন্য হয়। পড়ে থাকা পাত্রখানিতে তার আর কোন চিহ্ন পর্যন্ত মেলে না। শূন্য পাত্রখানি হাতে নিয়ে তখন উপলব্ধিতে আসে আসল সত্য। 'সব মিথ্যা' এইটেই সত্য।

* * *

জীবনে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কতবার এই কথা রঙ্গনাথনের মনে হল—তার সংখ্যা তাঁর মনে নেই। তাঞ্জোরে মনে হয়েছে। মাদুরায় মনে হয়েছে। প্রতি স্থানেই মনে হয়েছে এই কথা। আজও নিজের বীণাখানির উপর হাত রেখে এই কথাই ভাবলেন।

চার বৎসর পর। চার বৎসরের মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে তাঁর জীবনে। সংসারে সব মিথ্যা। তাঞ্জোর গিয়ে তিনি বিতাড়িত হলেন—মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করতে পেলেন না। তাঁর আসবার পূর্বেই মান্দ্রাজে আচার্য চিদম্বরমের দণ্ডের কথা তাঞ্জোরে পৌঁছে গিয়েছিল। মহাবলীপুরম যখন পৌঁছেছিলেন—তখন সেখানে বার্তা পৌঁছয় নি। তিনিই সেদিন সেই মুহূর্তের প্রথম যাত্রী মান্দ্রাজ থেকে মহাবলীপুরমমুখে। কাঞ্জীভরমেও তিনি যাত্রা করতে বিলম্ব করেন নি। কাঞ্জীভরম থেকে যাত্রা করে পথে তিনি বিলম্ব করেছিলেন। তিনি সমুদ্রতটের দিকে ফিরেছিলেন পথ থেকে। খোঁজ করতে চেয়েছিলেন তটভূমে এমন একটি কিশোরীর মৃতদেহ কি কেউ পড়ে থাকতে দেখেছে?—কয়েক দিন পর মনে হয়েছিল—না। সে তা করবে না। তার বাবা তাকে বলে গেছে—সে বরদরাজের প্রসাদ পাবে। তার মা তাকে বলে গেছে—কোন দেবমন্দিরের চারিপাশ মার্জনা করে গোপুরমের বাইরে দাঁড়িয়ে তার সুন্দর কণ্ঠে বন্দনা গাইলেই জীবন চরিতার্থ হবে। সে তো সমুদ্রে ঝাঁপ খাবে না। আবার ফিরে তাঞ্জোরেই গিয়েছিলেন। তখন তিনি একেবারে ভিক্ষুক।

গোপুরমের বহির্দেশে কাঞ্জীভরমের একজন শৈবপাণ্ডা একদল তীর্থযাত্রী সঙ্গে করে তাঞ্জোরের শিবমন্দিরের পাণ্ডাদের হাতে দিচ্ছিলেন। তিনি ওঁকে দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই ব্যক্তি তার নিজের বরদরাজ মূর্তিকে খৃষ্টান শবরদের হাতে দিয়েছে। নিজে খুঁজে বেড়াচ্ছে এক শবরীকে। এ লোকটা গায়ক কিন্তু কি গান করে জান? গান করে শবর ব্রাহ্মণে ভেদ নেই। এ পাষণ্ড, পাষণ্ড—! এর পদার্পণে মন্দির অপবিত্র হবে!

মন্দিরে তিনি প্রবেশ করেন নি। প্রয়োজনও ছিল না। লল্লা থাকলে মন্দিরের বাইরেই

থাকবে। কিন্তু ব্রাহ্মণরা ইঙ্গিতে ও বক্র বাক্যে নানান জনে তাঁকে নানা লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত করেছিল। বিদ্রূপের আর অন্ত ছিল না। ভেঙে পড়েছিলেন আর একবার।

লল্লার জন্য আর এমন করে উন্মাদের মত ঘুরবেন না। ফিরে যাবেন মান্দ্রাজে। একটি বৃক্ষতলে সারারাত্রি পড়ে ছিলেন। মধ্যে মধ্যে মনে মনে বলেছিলেন—হল না। পারলাম না। লল্লা, লল্লা।

পরদিন তাঞ্জোর ত্যাগ করে মান্দ্রাজের পথে খানিকটা এসে আবার ফিরেছিলেন। লল্লাকে না পেলে বেঁচে তাঁর লাভ নেই। এর পর কিন্তু তাঁর আর সন্ধানে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। পথে পথে চলেছিলেন, যে দিকে বেশী লোক চলে সেই দিকে—সে পথে যে স্থান পড়ে, সেই স্থানেই তাকে খুঁজেছেন। গান গেয়ে ভিক্ষা করেছেন, কিছু সঞ্চয় করেছেন, আবার চলেছেন। এমনি করে আট মাস ঘুরেছিলেন। তিনি তখন প্রায় উন্মাদ।

সারাদেশে অরাজক। একে একে হিন্দুমুসলমান রাজবংশ সামুদ্রিক ঝড়ে সমুদ্রতটের নারিকেল তালবৃক্ষের মত উৎপাটিত হয়ে পড়েছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির ভাই কর্নেল ওয়েলেসলি ঝড়ের মত বিক্রম নিয়ে একের পর এক মারহাট্টা টিপুসুলতান ত্রিবাঙ্কুর রাজশক্তিকে পরাভূত করছে। ওদিকে পিণ্ডারী, ঠগ চোর-ডাকাতে দেশ পরিপূর্ণ। এর মধ্যে পূর্ণোন্মাদ বলেই তাঁর ঘোরা সম্ভবপর হয়েছিল। দেহের শ্রীও তখন পথের ধূলায় ঢাকা পড়েছে; মলিন বেশবাস এবং কাঁধের ভিক্ষার ঝোলাই ছিল আত্মরক্ষার বর্ম। আর একটি অস্ত্র ছিল। সে তাঁর গান। যেই হোক—গান শুনে তারা করুণাই করেছে। তারপর এক ঘটনা ঘটল। তিনি তখন শ্রীরঙ্গমে। সেই অবস্থাতেই গোদাদেবীর উপাখ্যান নিয়ে গান রচনা করে মুখেই শুধু গেয়ে ভিক্ষা করতেন। তাঁর বড় ভাল লেগেছিল এ উপাখ্যান। বিষ্ণুভক্ত পারিয়ার কন্যা গোদা; স্বপ্নাদেশ দিয়ে শ্রীরঙ্গনাথস্বামী পারিয়ার কন্যা গোদাবরীকে বিবাহ করেছিলেন। এ কাহিনীর মধ্যে কোথায় যেন লল্লার সঙ্গে মিল দেখতে পেতেন। মধ্যে মধ্যে ভাবতেন—লল্লা আর নেই। লল্লা তাকে বলেছিল বরদরাজ।—তার সে ভুল ভেঙে দিয়েছেন বরদরাজ। রঙ্গনাথনকে দিয়েই নিজের স্বরূপ নিজে খুলিয়ে দিয়েছেন। এবং তাকে টেনে নিয়েছেন। লল্লাও গোদাবরী কন্যার মত মরদেহ থেকে মুক্ত হয়ে বরদরাজের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। যিনি শ্রীবরদরাজ তিনিই শ্রীরঙ্গনাথন। অর্থ তাঁর কিছু জমেছিল। শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর বিশাল মন্দিরের স্তরে স্তরে বিন্যস্ত চত্বরের মধ্যে পাগলের মত খুঁজতেন—লল্লা! লল্লা! লল্লা!

একদিন একজন লোক তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল—বাঈ সাহেব ডাকছেন। প্রশ্ন করেছিলেন ক্রুদ্ধ ভাবেই—কে বাঈ?

নাম শুনে সম্ভ্রমে মাথা নত করেছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে সে নাম তাঁর স্মরণে ছিল। বিখ্যাত সরস্বতী বাঈ; সঙ্গীতজ্ঞদের আম্মা। মা। তিনি শ্রীরঙ্গনাথস্বামী দর্শনে এসেছেন, দুদিন তাঁর গান শুনেছেন। শুনে ডেকেছেন।

পক্বকেশী বৃদ্ধা সরস্বতী বাঈ। তিনি তাঁকে পুত্র বলে সম্বোধন করেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন—এমন মূলধন থাকতে ভিক্ষা কর কেন? প্রথমটা রঙ্গনাথন মৌন ছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে হৃদয়ের উত্তপ্ত স্পর্শে বিগলিত হয়েছিলেন।

তিনি তাঁর পিঠে মলিন বস্ত্রের উপর পরম স্নেহে হাত রেখে বলেছিলেন—দেবতাকে খোঁজ?

তিনি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন—সে কি মেলে পুত্র? আমি তো বলতে পারব না। জানি না। আমার জীবনে তো—। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—প্রথম জীবনে রূপ আর কণ্ঠের জন্য বিক্রী হয়েছিলাম। রাজা সুলতানের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে দেখলাম মনোরঞ্জন করা যায়, সেও অল্প ক্ষণ বা দিনের জন্যে। সম্পদ মেলে। মন মেলে না। এ বয়সে বিগ্রহ দর্শন করতে এসেছি। দর্শনই মিলল, তার বেশী কিছু না।

তবুও তিনি কিছু বলতে পারেন নি তাঁকে। তারপর বলেছিলেন—আমি খুঁজছি একজনকে।

—মানুষ?

—হ্যাঁ।

—নারী?

—হ্যাঁ।

—তোমার স্ত্রী?

—হ্যাঁ।

—হারিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

সরস্বতী বাঈ বলেছিলেন—পুত্র, ঈশ্বর হলে বলতাম হয়তো পেতে পার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বলছি আর তো পাবে না তাঁকে।

—পাব না?

—না। সে যুবতী। দেশ অরাজক। অরাজক বলেই বা কেন, পুরুষদের মধ্যে লম্পট কামুক বেশী। নরখাদকের চেয়েও তারা হিংস্র। হারিয়ে গিয়ে থাকলে পাবে না। নিজের কথা মনে পড়ছে। বললাম না আমার রূপ ছিল কণ্ঠ ছিল। ফলে—

—তারও আছে।

—তবে আর কি! সে হয় মরেছে নয় হাটে-বাজারে বিক্রী হয়ে গেছে। খুঁজতে খুঁজতে দেখা হয় তো পাবে কিন্তু সেও তোমাকে চিনবে না, তুমিও চিনতে পারবে না, চিনতে পারলে আত্মহত্যা করবে।

রঙ্গনাথন উন্মাদের মত উঠে চলে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আম্মা তাঁর হাত ধরে বলেছিলেন—আমি আম্মা, পুত্র। যেও না, আমার কথা শোন। তোমার এমন কণ্ঠ, এমন গান। বস। পথে মরলে বড় কষ্ট পাবো। বস। গান গাও। শোনাও আমাকে কিছু।

—পারব না। মার্জনা করুন।

বৃদ্ধা বলেছিলেন—তাহলে আমিই গাই শোন। বলেই তাঁর বীণা নিয়ে বসেছিলেন। গেয়েছিলেন রঙ্গনাথস্বামীর স্তোত্র।

> পদ্মাধিরাজে-গরুড়াধিরাজে বিরিঞ্চিরাজে গুররাজরাজে
> ত্রৈলোক্যরাজেঽখিললোকরাজে শ্রীরঙ্গরাজেরমতাং মনোমে।
> লক্ষ্মী নিবাসে জগতাং নিবাসে-উৎপন্ন বাসে রবিবিম্ববাসে—
> ক্ষীরাব্ধিবাসে ফণিভোগবাসে শ্রীরঙ্গবাসেরমতাং মনোমে!

শান্ত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন শ্রীরঙ্গনাথন। আম্মা বলেছিলেন—কিছুদিন আমার কাছে থাক। সুস্থ হও। তুমি অসুস্থ।

তাই ছিলেন তিনি। তাঁর পরামর্শেই তিনি পালাগান ফেলে দক্ষিণী মার্গসংগীত নতুন

করে চর্চা করেছিলেন। মাস চারেক পর। তখন তাঁরা পণ্ডিচেরীতে। গোলযোগ তখন ঘনিয়ে উঠছে দক্ষিণ পথের উত্তর অংশে। দক্ষিণ পর্যন্ত তার ঢেউ এসেছে। ভোঁসলে সিন্ধিয়া হোলকার একসঙ্গে মিলে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দক্ষিণমুখে আসছে। সরস্বতী বাঈ শেষ মহীশূর যুদ্ধে শ্রীরঙ্গপত্তনে ছিলেন। সে রক্তপাত লুঠতরাজের স্মৃতি তাঁকে বিহ্বল করেছিল। বলেছিলেন, পুত্র, মানুষ যখন যুদ্ধ করতে নামে তখন রাক্ষস হয়ে যায়। আমি জানি। চল। পণ্ডিচেরী ফরাসী এলাকা; সেখানে চল।

পণ্ডিচেরীতে এসে আম্মা সরস্বতী বাঈয়ের কাছে কয়েক মাস ছিলেন। তাঁর কাছে নতুন করে চর্চা করেছিলেন মার্গসঙ্গীতের। মন তাঁর ধীরে ধীরে অনেক সুস্থ হয়ে এসেছিল।

পণ্ডিচেরীতে কয়েকটা মজলিসে গান গেয়ে খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। হঠাৎ এরই মধ্যে মনে পড়েছিল লল্লাকে। লল্লা যদি মাদ্রাজে এর মধ্যে ফিরে এসে থাকে! কয়েক দিনের মধ্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। একদিন বলেছিলেন সরস্বতী বাঈকে—আমাকে যেতেই হবে আম্মা। আমাকে যেতেই হবে। আমার মন বলছে—সে এতদিনে মাদ্রাজ ফিরেছে।

আম্মা বাধা দেন নি। পণ্ডিচেরী থেকে একদিন আম্মা-সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে মাদ্রাজে ফিরেছিলেন। স্থলপথে নয়, সমুদ্রপথে বড় মালবাহী নৌকোয়। আম্মা তাঁকে অর্থ দিয়েছিলেন, আর একটি বীণা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—পুত্র, মনকে বাঁধো। তাকে আর পাবে না। এই দুনিয়ায় হারানোই নিয়ম। মানুষ হারাতেই আসে। বেঁচেও যদি থাকে তবুও ঠিক সেই তাকে আর পাবে না।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—খুঁজতে বারণ করবার অধিকার আমার নেই। নিজে এই বৃদ্ধ বয়সে ওই ছাড়া তো বাঁচবার পথ দেখি না। তবুও বারণ করছি। তোমার মূলধন আছে। ওই ভাঙিয়ে যদি চিরকাল রাখতে পার তবে যে সুখ পাবে সে চোখের জলের সুখ।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন—তার থেকে তুমি ঈশ্বরকে খুঁজো। না পেলেও দুনিয়া তেতো হবে না। তাঁকে শুধু জীবনেই মেলে না, মরণেও মেলে। কিন্তু—

তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

তারপর বলেছিলেন—কিন্তু—। তুমি কি এখানেই থাকতে পার না পুত্র? শবরীকে তুমি পত্নী হিসাবে গ্রহণ করতে চাও—তুমি কি আমাকে জননী হিসাবে গ্রহণ করে আমার কাছে থাকতে পার না? তোমাকে সম্পদের লোভ দেখাব না। কিন্তু সঙ্গীত, সে তো দেবদুর্লভ সম্পদ। তাই দেব আমি তোমাকে।

রঙ্গনাথন বলেছিলেন—আম্মা, ভেবে দেখুন—রামচন্দ্র বনবাসে এসেছিলেন—এসে সীতাকে হারিয়েছিলেন। বনবাস-অন্তে সীতা উদ্ধার করে ফিরেছিলেন। সীতাকে না নিয়ে তিনি কি কৌশল্যা মাতার কাছে ফিরতে পারতেন? ফিরলে কৌশল্যা মাতাও কি তাঁকে ফিরিয়ে দিতেন না, বলতেন না, সীতাকে নিয়ে তবে তুমি ফিরে এস?

সরস্বতী বাঈ বলেছিলেন—ঠিক বলেছ পুত্র। আমিও তোমাকে তাই বলছি—তুমি যাও। লল্লাকে নিয়ে তবে তুমি ফিরে এস। আর না পেলেও যেন এস।

রঙ্গনাথন প্রথমেই ফিরেছিলেন মাদ্রাজ। প্রথম দেখা হয়েছিল যোশেফের সঙ্গে।

যোশেফ প্রশ্ন করেছিল—তুমি কোথায় গিয়েছিলে আচার্য?

—তারই সন্ধানে।

—লল্লার?

—হাঁ যোশেফ। আমি তোমার কাছে সত্য বলব। তাকে আমি বরদরাজের নাম নিয়ে

সমুদ্র সাক্ষী করে বিবাহ করেছিলাম। সেইদিন রাত্রে যে দিন—। সংক্ষেপে সবই বলেছিলেন তিনি যোশেফকে। বলেছিলেন—আমার অপরাধ। আমার অপরাধে—। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি।

যোশেফ সবিস্ময়ে বলেছিল—তুমি শবর হয়েছ রঙ্গনাথন ?

রঙ্গনাথন বলেছিলেন—না, যোশেফ, লল্লাকে ব্রাহ্মণী করব বলে গ্রহণ করেছিলাম।

যোশেফ আক্ষেপ করে বলেছিল—হতভাগিনী, সে হতভাগিনী। নির্বোধ। সে আমার কাছে এল না কেন ? একটু পরে সে প্রশ্ন করেছিল—কিন্তু তুমি এখন কি করবে রঙ্গনাথন ?

—ঠিক তো জানি না।

যোশেফ সাগ্রহে বলেছিল—একটা কথা বলব আচার্য ?

—বল।

—তুমি খৃষ্টান হবে ? তোমার সঙ্গে আমি খুব সুন্দরী খৃষ্টান কন্যার বিবাহ দেব। যারা ব্রাহ্মণ থেকে খৃষ্টান হয়েছে তাদের কন্যা। পাদরীরা আমার কথা শুনবে।

হেসে রঙ্গনাথন বলেছিলেন—না যোশেফ। লল্লা—লল্লা ছাড়া আর কারুর আমার জীবনে স্থান নেই। সে হয় না যোশেফ।

যোশেফ একটু চুপ করে থেকেছিল, তারপর বলেছিল—তা হলে তুমি আর মাদ্রাজে থেকো না রঙ্গনাথান। এ কথা প্রকাশ হলে—

—তাতে তো আমি লজ্জিত হব না যোশেফ। পতিত তো আমি হয়েই আছি।

লজ্জিত তিনি সত্যই হন নি। মাদ্রাজকে তিনি জয় করেছিলেন গানে। পালাগান গান নি। মার্গসঙ্গীত গেয়ে তিনি নতুন করে মানুষকে জয় করেছিলেন। মন্দিরে নয়—সঙ্গীত-বিলাসী মানুষদের নিমন্ত্রণে শুধু মানুষের আসরে। তাঁর অপূর্ব সঙ্গীতের জন্য তাঁর পাতিত্যকে মানুষের হৃদয় আর প্রশ্রয় দেয় নি। লোকে বলেছিল, রঙ্গনাথন পাগল হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছে গানে।

আচার্য চিদম্বরম বলেছিলেন—তুমি একটা প্রায়শ্চিত্ত কর রঙ্গনাথন।

রঙ্গনাথন হেসে বলেছিলেন—মার্জনা করবেন আচার্য !

*　　　　*

সমাজ থেকে দূরে তিনি সেই সমুদ্রতটে আপনার ঘরে বাস করতে লাগলেন। কাটাবেন লল্লার তপস্যায়। লল্লার স্মৃতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। নিশীথ রাত্রে পূর্ণিমার দিন—সমুদ্রে যখন জোয়ারের ডাক উঠত তখন অকস্মাৎ তাঁর মনে হত সমুদ্রতটে নারিকেল বনের বাতাসে যেন একটি নারী-কণ্ঠের আকুল ডাক ভেসে আসছে।

—প্রভু ! প্রভু ! বরদরাজ ! লল্লার বরদরাজ !

তিনি উৎকর্ণ হয়ে শুনতেন।

নিরবচ্ছিন্ন আহ্বান ভেসেই আসত—ভেসেই আসত।

রঙ্গনাথন উদভ্রান্তের মত বেরিয়ে পড়তেন ঘর থেকে। সমুদ্রতটের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করতেন। উঁচু বালিয়াড়ি পার হয়ে নিচে নামতেন সমুদ্রতটে। সেই নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর দীর্ঘ ছায়া আর পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার দুগ্ধধবল আলোয় চিত্রিত-বিচিত্রিত বালুবেলার উপর তিনি ঘুরে বেড়াতেন। চীৎকার করে ডাকতেন—লল্লা—লল্লা—। আমার জীবনলক্ষ্মী ! কোথায় তুমি ?

সমুদ্রবক্ষে সমুদ্রবিহঙ্গের দল—রাত্রেও তাদের বিশ্রাম নেই—তারা জ্যোৎস্নার মধ্যে কলরব

করে উড়ে বেড়াত।

কতদিন সেই নারিকেল বৃক্ষজোড়ার তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। ভোররাত্রে ঘুম ভাঙত; পাশের দিকে তাকাতেন—। লল্লা নেই। চুপ করে তিনি কিছুক্ষণ বসে থেকে তারপর উঠতেন। বাড়ি ফিরতেন। এসে পূজার ঘরে বসতেন; কাঁদতেন।

পূজার ঘরটিতে সবই আছে, নেই কোন মূর্তি। সেই যে বরদরাজের মূর্তিটি চুরি গেছে, স্থানটি শূন্য হয়েছে, সে স্থান তিনি আর পূরণ করেন নি।

এক-একদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠেও তাঁর ভ্রম দূর হত না। তিনি সেই সেদিনের মতই ভাবতেন—লল্লা তাঁকে না পেয়ে চলে গেছে। তিনি সমুদ্রতট ধরে হাঁটতে শুরু করতেন যোশেফদের পল্লীর দিকে।

যোশেফদের পল্লীর ছেলেমেয়েরা তাকে দেখে হাসত। ব্যঙ্গের হাসি। বলত—কি আচার্য? লল্লাকে চাই?

—লল্লা? কোথায় সে? কোথায়?

—আছে। কাল সে ফিরেছে গো।

—ডাক। তাকে ডাক। আঃ!

—কিন্তু সে তো আসবে না!

—কেন?

—সে খৃষ্টান হয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তার শরণ নিয়েছে। তুমি যদি খৃষ্টান হও তবে সে তোমাকে দেখা দিতে পারে।

ধীরে ধীরে তাঁর স্বাভাবিক চেতনা ফিরত। তিনি বুঝতে পারতেন—এরা তাঁকে ঠাট্টা করছে। বিষণ্ণচিত্তে তিনি ফিরে আসতেন।

মধ্যে মধ্যে যোশেফের সঙ্গে দেখা হলে সে তাঁকে সম্ভ্রম করে অভিবাদন করে বলত—আচার্য, আবার তুমি রাত্রে বেরিয়েছিলে? পূর্ণিমার ভ্রমে পেয়েছিল তোমাকে!

রঙ্গনাথন বলতেন—হ্যাঁ যোশেফ। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরের মধ্যে অকস্মাৎ যেন লল্লার ডাক শুনতে পেলাম। বার বার শুনেছি। ভ্রম তো ঠিক নয়।

যোশেফ গায়ে ক্রশ এঁকে বলত—মেরী তোমাকে রক্ষা করুন আচার্য। প্রভু তোমাকে দয়া করুন। ভ্রম হয়তো নয়, এ সত্যই হয়তো বটে। লল্লা মরেছে তাহলে, তার প্রেতাত্মা তোমাকে ডাকে। ডেকে নিয়ে যায় সমুদ্রকূলে। তার কামনা সে তোমাকে ওই সমুদ্রে ফেলে তোমাকে আত্মহত্যা করাবে। তারপর তোমার আত্মাকে তার সঙ্গী করবে।

চুপ করে থাকতেন রঙ্গনাথন। ভাবতেন—তাই কি? মন বলত—না।—লল্লা যদি মরেই থাকে তবু সে তাকে কখনও আত্মহত্যায় প্রলুব্ধ করবে না। না। তা সে কখনও করতে পারে না। তার তো কামনা ছিল না। ছিল প্রেম—শুধু প্রেম—সে তো লীলাময়ী নয়—তাই তার নাম লল্লার বদলে কলাবন্তী থেকে কল্যাণী করে দিয়েছিলেন। তার শ্যামবর্ণ মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

মাস কয়েক পর এই ভ্রান্তিটা যেন তাঁর কমে আসতে আসতে ঘুচে গেল। কিন্তু রঙ্গনাথন তাতে তৃপ্তি পেলেন না। মনে হল সব যেন শূন্য হয়ে গেছে। এই ভ্রান্তির মধ্যে তিনি যেন লল্লাকে হারিয়েও লল্লার সঙ্গে বাস করেছিলেন।

কতদিন রাত্রে এই ভ্রমের বশে কত নারিকেল ছায়ার মধ্যে শীর্ণ একটি জ্যোৎস্নার ফালিকে লল্লা বলে মনে করে ছুটে গেছেন; সেখানে তাকে পান নি—তবু ভ্রম ভাঙে নি, মনে হয়েছে

লল্লা। কৌতুকভরে বা অভিমানবশে এখান থেকে সরে গিয়ে গাঢ় ছায়ার মধ্যে লুকিয়েছে—তিনি খুঁজেছেন। খুঁজে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে সেই জোড়া নারিকেল বৃক্ষের তলদেশে শুয়েছেন; ভেবেছেন—সে একসময় এসে তাঁর পাশে বসে তাঁকে মৃদুস্বরে ডাকবে, প্রভু, আমি এসেছি। আমার বরদরাজ, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেছেন। স্বপ্নঘোরে মনে হয়েছে লল্লা তাঁর পাশে শুয়ে আছে। হাত দিয়ে তিনি নারিকেল বৃক্ষের গোড়াটি জড়িয়ে ধরেছেন। ঘুম ভেঙে গেছে।

সে যেন মিথ্যার মধ্যেও তিনি বিরহ-মিলনের পরম-আনন্দের সত্যলোকে বাস করেছেন। সেই বাস্তবে আনন্দলোক ক্রমে ক্রমে পরমসত্য কোথায় যেন মিলিয়ে গেল!

তিনি অনেক ভেবে স্থির করলেন—আবার তিনি দেবতা মন্দিরের বাইরে বসে দেবতাকে গান শোনাবেন।

সেদিন তিনি মান্দ্রাজ ছেড়ে আবার গেলেন কাঞ্জীভরমে বরদরাজের মন্দিরের সম্মুখে। মন্দির-চত্বরের বাইরে একটি গাছতলায় বসে তিনি বীণা নিয়ে ভজন শুরু করলেন।—

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং
মধু তোঽপি মধুরং মধুরং মধুরং।
মধুরং বদনং মধুরং বচনং
মধুরং মধুরং কলেবরং।
মধুরমধীরম নিরুতি মধুবং
মধুতোঽপি মধুরং পীতাম্বরং
মধুরং চরণং চরণাভরণং
মধুরস্মুরঃ স্থিত রত্নং।
মধুর স্মিতমেতদহো
প্রেক্ষণম তনু মনোহরং।

আপনমনে তিনি গেয়ে চলেছেন। কোনদিকে দৃষ্টি তাঁর ছিল না। আত্মমগ্ন হয়ে গাইছিলেন। হঠাৎ মন্দিরচত্বরের মধ্য থেকে কাঁসরঘণ্টা শিঙা এবং দামামা বাজিয়ে একদল লোক এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। তখন দেখলেন অনেক লোক তার চারিপাশে জমে গেছে, তাদেরও ওপাশে মন্দিরের সিংহদ্বার থেকে বেরিয়ে একদল লোক এসে উচ্চরোলে বাজনা বাজাচ্ছে, যার মধ্যে নিজের কণ্ঠস্বর তিনি নিজেই শুনতে পাচ্ছেন না। মধ্যপথেই গান বন্ধ করলেন তিনি। বুঝলেন পুরোহিতেরা তাঁকে ক্ষমা করেন নি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন।

—নাঃ। দেবমন্দির থেকে তিনি নির্বাসিত হয়েছেন। দেবমন্দিরে দেবতা কেউ নন। পুরোহিতেরাই সব। ভুল হয়েছিল তাঁর। ভুল হয়েছিল।

সেখান থেকে উঠে কাঞ্চীপুরমের প্রান্তদেশে এসে রাত্রিটা কাটিয়ে দিলেন উন্মুক্ত আকাশের তলায়। আশ্রয় কারুর কাছে নেবেন না তিনি। তিনি পথিক। সন্ধানে চলেছেন—লল্লার সন্ধানে। পথই তাঁর আশ্রয়।

ঘুম তাঁর আসে নি। ক্ষুধা পেয়েছিল। দুরন্ত ক্ষুধা। ক্ষুৎকাতর অবস্থায় জেগে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। অকস্মাৎ কিছু দূরে মানুষের সাড়া পেয়ে তিনি একটু শঙ্কিত না হয়ে পারেন নি। মনে পড়েছিল এই বরদরাজের মন্দিরে তাঁর সেই প্রথম পালাগানের কথা। পালাগান সেরে সমুদ্রতটে নৌকা ধরবার জন্য যখন আসছিলেন তখন তাঁকে অজ্ঞাত আততায়ীরা

মাথায় আঘাত হেনেছিল। প্রশ্ন করেছিল, এই গান রচনা করতে কে শেখালে তোমাকে?

আবার আজও কি তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে? সেদিন যারা আঘাত করেছিল, তাদের তিনি চিনেছিলেন। তারা যোশেফের দল। তারা খৃষ্টান হয়ে আজ নতুন শিক্ষা পেয়েছে, উন্নত হয়েছে, তারা আজ শবরদের সমাজে পতিত বললে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তিনি তাদের প্রতি উচ্চবর্ণের অন্যায় অত্যাচারের বেদনায় তাদেরই জয়ধ্বনি তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা বোঝে নি। আঘাত করেছিল।

আর আজ নিঃসন্দেহে যারা আসছে, তারা ঐ পুরোহিতের দল। তারা তাঁকে ক্ষমা করে নি। তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে শবরকন্যাকে ভালবেসেছেন, তাকে বরদরাজের মূর্তিটি দিতে বলেছিলেন যোশেফকে, সে কথা শুনে অবধি তাঁর প্রতি তাদের মর্মান্তিক ক্রোধ। তিনি ফিরে এসে মার্গ-সঙ্গীতে সাধারণ মানুষের চিত্ত জয় করেছেন, সম্মান পেয়েছেন, সম্পদও পেয়েছেন, পেয়ে পেয়ে ভেবেছিলেন তিনি পুরোহিতদের চিত্তও জয় করেছেন। কিন্তু না। এদের জয় তিনি করতে পারেন নি। তারা তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেছিল—তাও তিনি করেন নি। তাতে ওদের আক্রোশ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আজ বরদরাজের মন্দির-সীমানার বাইরে বসে গান করাটাকে তারা চরম স্পর্ধা ধরে নিয়ে তাকে নিষ্ঠুর আঘাত করতে আসছে। তিনি স্থির হয়ে বসলেন। আসুক, যা আসবে আসুক।

লোক কটি কিছু দূরে এসে দাঁড়াল।

তিনি প্রশ্ন করলেন—কে? কারা তোমরা?

—আপনি আচার্য রঙ্গনাথন?

হেসে রঙ্গনাথন বললেন—আচার্য কি না জানি না। তবে আমি রঙ্গনাথন।

—আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বিস্ময়ে চমকে উঠলেন রঙ্গনাথন। এ যে নারীকণ্ঠ!

সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনে আবৃত করে একটি বালকমূর্তির মত কেউ তাঁর দিকে এগিয়ে এল। এসে তাঁর সামনে বালুর উপর হাঁটু গেড়ে বসল। নিজের অঙ্গের আচ্ছাদন সে খুলে ফেলে বললে—প্রণাম আচার্য।

সেদিন পূর্ণিমা ছিল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় প্রান্তর ঝলমল করছিল। সেই জ্যোৎস্নায় অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন রঙ্গনাথন। কি রূপ! এ কৃষ্ণাঙ্গী নয়, গৌরী—অপরূপ লাবণ্যবতী পূর্ণযৌবনা একটি মেয়ে।

রঙ্গনাথন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

মেয়েটি বললে—আমি সামান্যা। আমার নাম 'হেমাম্বা'।

—হেমাম্বা! বিস্ময়ের আর অবধি রইল না রঙ্গনাথনের। দেবদাসীশ্রেষ্ঠা হেমাম্বা! অনেককাল আগে তাকে দেখেছেন রঙ্গনাথন। সে দেখেছেন আলোকমালায় উজ্জ্বল নাটমন্দিরের মধ্যে, নর্তকীর বেশে। অপূর্ব প্রসাধনে প্রসাধিতা, পুষ্পমাল্যে অলঙ্কারে সজ্জিতা। আর এ মেয়ের অঙ্গে সে-সবের চিহ্ন নেই। কিন্তু তার থেকেও অনেক শ্রীমতী মনে হচ্ছে। তার উপর এই ভুবনভরা জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার আলোয় সূর্যের দীপ্তি নেই, উত্তাপ নেই, কিন্তু একটি আশ্চর্য রহস্য আছে। রূপকে সে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে বিশ্লেষিত করে না, একটি কুহেলী রহস্যে রহস্যময়তায় অপরূপা করে তোলে। শুভ্র সৌন্দর্যের একটি বিলেপনের প্রসাধন বুলিয়ে দেয়। মনের মধ্যে তাঁর গুঞ্জন করে উঠল—

"স্বর্ণ-কমলবর্ণাভাং সুকোমলাং সুলোচনাং শুভ্রজ্যোৎস্নাবিলেপিতাং অপরূপাং মনোরমাং—।"

সলজ্জ হেসে হেমাম্বা বললে—আচার্য, আপনাকে আমি আহ্বান করতে এসেছি আমার গৃহে। যখন পুরোহিতেরা দামামা নাকাড়া শিঙা বাজিয়ে আপনাকে গানে বাধা দিয়ে স্তব্ধ করে দেয়, তখন আমি নিজেকে আচ্ছাদনে আবৃত করে ওই জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনার গান শুনছিলাম। চোখ থেকে আমার জল পড়েছিল। আপনি গান বন্ধ করলেন। তারপর উঠে নগরের পথ ধরে চলে গেলেন, আমি অনেক দুঃখ পেলাম। কাঞ্চীভরমে আপনি কোথায় যাবেন, কোথায় স্থান পাবেন তা বুঝতে পারলাম না। একটি অনুগত লোককে আপনার পিছনে পিছনে পাঠিয়েছিলাম আপনি কোথায় যান তাই দেখতে। সে গিয়ে বললে, আপনি নগর পার হয়ে এই বালুপ্রান্তরে এসে উত্তরীয় পেতে শুয়েছেন তার উপর। অভুক্ত। কারণ সে আপনাকে কোথাও খেতে দেখে নি। তাই আমি এসেছি আচার্য। কিঞ্চিৎ আহার্য নিয়ে এসেছি, দয়া করে গ্রহণ করুন, আর দয়া করে আমার গৃহে আসুন, রাত্রির মত অবস্থান করবেন।

অবাক হয়ে গেলেন রঙ্গনাথন।

বললেন—দাও, আহার্য দাও। সত্যিই বড় ক্ষুধা পেয়েছিল আমার। কিন্তু তোমার ঘরে আমি যাব না দেবদাসীশ্রেষ্ঠা, তাতে তোমার বিপদ হবে।

হেমাম্বা বললে—আর আমি দেবদাসী নই আচার্য। বোধ হয় আপনি জানেন না। একদিন রাত্রে মন্দির থেকে বেরিয়ে যাবার পথে আমি অপহৃতা হয়েছিলাম। ফিরিঙ্গী পল্টনের কজন গোরা আমাকে ধরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সকালে আমি অচেতন হয়ে পড়ে ছিলাম নগর থেকে ক্রোশখানেক দূরে। তারপর থেকে আর আমি দেবদাসী নই। এখন আমি গণিকা।

মাথা হেঁট করে বসে রইল হেমাম্বা।

রঙ্গনাথন বললেন—দাও, আমাকে আগে খেতে দাও। বলে হাত পাতলেন তিনি। আহার করে জলপান করে বললেন—আঃ! প্রাণ আহার নইলে বাঁচে না। তুমি আমাকে আহার দিলে না—প্রাণ দিলে!

হেমাম্বা বললে—এবার আমার ঘরে চলুন। আমি জানি শ্রীরঙ্গমে আপনি আম্মা সরস্বতী বাঈএর ঘরে অনেক দিন ছিলেন। আম্মা আপনাকে মায়ের মতই স্নেহ করতেন।

কণ্ঠস্বর মৃদু করে সে বললে—আজীবন আপনার ক্রীতদাসী হয়ে থাকব আচার্য। আপনি এক শবরীকে ভালবেসে তাকে হারিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে গেছেন। গৃহহীন বৈরাগী আপনি। আমি শবরীর চেয়ে বেশী ভালবাসতে জানি প্রভু। আমি শুধু একদিনের জন্য নয়, চিরদিনের জন্য আপনাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। আমার অর্থ আছে প্রভু। আমি আপনাকে নিয়ে শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করে চলে যাব। মান্দ্রাজে আপনার লজ্জা হবে হয় তো। মান্দ্রাজ নয়, চলে যাব পণ্ডিচেরীতে, নয় তো কলকাতায়। যেখানে বলবেন আপনি।

স্তব্ধ নিস্পন্দ মাটির মূর্তির মত বসে রইলেন রঙ্গনাথন।

—আচার্য!

—দেবী!

—দেবী নয়, আমি হেমাম্বা—আপনার দাসী।

—অমৃতের মত বাক্য তোমার মধুর থেকেও মধুর। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

একটু চুপ করে থেকে হেমাম্বা বললে—একটা প্রশ্ন করব আচার্য?

—বল।

—কৃষ্ণাঙ্গী লল্লা এর, অর্থাৎ যে সব গুণ-রূপের কথা বললেন, তার থেকেও অধিকতর রূপ-গুণের অধিকারিণী ?

—তা আমি বলছি না, দেবী !

—তবে ?

—একদিন সমুদ্রতটে, আজকের মতই এক পূর্ণিমা রাত্রে সে আমাকে বলেছিল, আপনি আমার বরদরাজ। আমি তাকে বলেছিলাম, আমি যদি তোমার বরদরাজ হই লল্লা, তবে তুমি আমার লক্ষ্মী। অথবা গোদাদেবী, যিনি লক্ষ্মী হয়েও অনার্য গৃহে জন্ম নিয়ে নিজ তপস্যায় নারায়ণের পাশে নিজ অধিকার অর্জন করে আজও প্রতিষ্ঠিতা আছেন।

—কিন্তু সে তো হারিয়ে গেছে আচার্য।

"—মনে সে অক্ষয় হয়ে আছে হেমাম্বা। নইলে তোমার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতাম না। মাথায় করে নিতাম। সে আমার কাছে বরদরাজের নির্মাল্য, আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।" তুমি আমাকে মার্জনা কর।

হেমাম্বা কয়েক মুহূর্ত নতমস্তকে চুপ করে রইল, তারপর প্রণাম করে উঠে ভোজনপাত্রটি হাতে করে চলে গেল। রঙ্গনাথন দেখলেন, জ্যোৎস্নার আলোয় তার গালের উপর দুটি রেখা চকচক করছে। কাঁদছিল হেমাম্বা।

সেদিন তিনিও কেঁদেছিলেন, তবে তারপরে—

পরদিন ভোরবেলা যাত্রা করে মান্দ্রাজ এসে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কাঞ্চীভরম থেকে এল বিচিত্র সংবাদ, মান্দ্রাজের উচ্চবর্ণের সমাজে এ নিয়ে পরিহাস ও ব্যঙ্গের আর অবধি রইল না।

ম্লেচ্ছ উচ্ছিষ্টা দেবদাসী হেমাম্বার ঘরে অন্নজল গ্রহণ করেছেন রঙ্গনাথন। রঙ্গনাথনের উপাধি রটে গেল "হেমাম্বার জার" "শবরীর অধরপিয়াসী"।

মান্দ্রাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মজলিসে মার্গসঙ্গীতের আসরে তিনি গান ধরলেই কোথাও থেকে কেউ বলে উঠত—"জয় লল্লা"। গান শেষ হলে ধ্বনি উঠত, "জয় হেমাম্বা"।

তিক্ত হয়ে একদিন রঙ্গনাথন অনেক তদ্বির করে ইংরেজদের জাহাজে স্থান সংগ্রহ করে চড়ে বসলেন। যাবেন কলকাতা। কলকাতা থেকে উত্তর ভারত ঘুরবেন।

* * * *

উত্তর ভারতের তীর্থে তীর্থে। বারাণসী প্রয়াগ অযোধ্যা বৃন্দাবন পর্যন্ত গিয়ে আর যেতে পারলেন না। সমগ্র উত্তর ভারত তখন একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অযোধ্যার নবাবের রাজ্যে কিছু শান্তি। বৃন্দাবনে কিছুদিন থাকলেন। রাধা আর কিষণজী। কিষণজীর থেকেও রাধা প্রধান। রাধারাণীর রাজ্য। জগতের পতি, পুণ্যাবতার কিষণজী তাঁর অধীন। পায়ে ধরে মান-ভঞ্জন করেছিলেন। তারপর চলে গিয়েছিলেন। সারা জীবন কেঁদেছিলেন রাধা।

কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরে বেড়াতেন, কান পেতে শুনতেন সে ক্রন্দন শোনা যায় কিনা। তার মধ্যে মিল পেতেন নিজের জীবনে। লল্লার ক্রন্দন আর রাধার ক্রন্দনে তফাৎ ছিল না তাঁর কাছে।

বিচিত্র মানুষের মন। আবার একদিন উতলা হয়ে উঠল। মনে হল দক্ষিণের কথা। মান্দ্রাজ! লল্লা যদি ফিরে এসে থাকে! মনে মনে নানান কাহিনী রচনা করেন। লল্লা পথভ্রান্ত হয়ে গিয়ে পড়েছিল কোন স্থানে হয়তো। মারাঠাদের এলাকায় কিম্বা নিজামের

এলাকায়—যেখানে লড়াই চলছেই চলছেই। সর্বত্র আছে ইংরেজ ফিরিঙ্গী। তারা হয়তো তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। অথবা নির্মম অত্যাচার করেছিল। মনে পড়েছিল মাল্যবান পর্বত যাবার সময়কার সেই আশ্রয়স্থল শবরপল্লী। সেই "উন্নি" মেয়েটি। ওদের গোষ্ঠীপতির কন্যা। অত্যাচারে পাগল হয়ে গিয়েছিল। দিনরাত্রি চীৎকার করত—'না-না-না ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। মেরে ফেল। মেরে ফেল আমাকে। মেরে ফেল।' সেই 'উন্নি'র মতই হয়তো পাগল হয়ে পথে পথে ফিরে আবার ক্রমে সুস্থ হয়েছে এতদিনে। সুস্থ হয়ে মান্দ্রাজ ফিরে এসেছে। যোশেক তাকে নিশ্চয় সব বলেছে। হয়তো বা যোশেফদের পল্লীতেই তাঁর পথ চেয়ে সে বসে আছে।

ভাবতে ভাবতে মনে বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়ে ওঠে। শেষে একদিন স্বপ্ন দেখলেন। পরদিন তিনি আবার ওঠেন। চল মান্দ্রাজ। আবার মান্দ্রাজ ফিরে যাবেন। বৃন্দাবন থেকে শহুরে শহরে বড় বড় মজলিসে গান শুনিয়ে উপার্জন করে, কোথাও নৌকায়, কোথাও উটের গাড়িতে, কোথাও পদব্রজে ঘুরে কলকাতা এসে পৌছুলেন। এবার ফিরিঙ্গী কোম্পানীর জাহাজে স্থান সংগ্রহ করবেন। মান্দ্রাজ যাবেন। মান্দ্রাজে নেমেই নিশ্চয় যোশেফদের পল্লীর কারুর সঙ্গে দেখা হবেই। তারা নৌকায় কাজ করে।

জাহাজে একটু নিজের স্থানের জন্য গিয়ে কিন্তু যোশেফের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়ে গেল।

—যোশেফ!

যোশেফও কম আশ্চর্য হয় নি, সে বললে—আশ্চর্য!

—তুমি কি আমাকে খুঁজতে কলকাতায় এসেছ? লল্লা ফিরেছে?

যোশেফ হাসলে। অতি বিষণ্ণ সে হাসি। বললে—সে দুর্ভাগিনীকে এখনও তুমি ভুলতে পার নি, আচার্য?

—ভুলতে কি পারি যোশেফ! তাকে যে আমি সত্যই ভালবেসেছি। শুধু সমাজের ভয়ে কয়েক দণ্ড বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। তার জন্য এতদিন দুঃখ পাচ্ছি। কিন্তু তার কত বড় দুঃখ, কত বড় দুর্দশা হয়েছে ভাব তো! ওঃ—।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যোশেফ বললে—না আচার্য, সে তো ফেরে নি।

—ফেরে নি! স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রঙ্গনাথন। এত বড় বিশ্বাস, তীর্থের স্বপ্ন সব মিথ্যা হয়ে গেল! সংসারে কি সবই মিথ্যা! সত্য কি কিছুই নেই! হে বরদরাজ! হে শ্রীরঙ্গনাথন প্রভু! হে একাম্বরেশ্বর! হে কন্যাকুমারী! তোমার অনাদিকালের মহেশ্বর কামনায় তপস্যা, তাও কি মিথ্যা?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেই ফিরছিলেন রঙ্গনাথন। যোশেফ তাঁকে ধরে আটকালে।

—কোথায় যাবে?

—জানি না যোশেফ। যেমন পথে পথে ফিরছি, তেমনিই ফিরব। এখানে থাকি কিছুদিন। আবার উঠব।

—না। ফিরেই চল আচার্য। মান্দ্রাজ চল। তোমার অভাব আমরা অনুভব করি। আর মান্দ্রাজের লোক তোমার বিপক্ষে যাবে না। তুমি বারাণসীতে আর বৃন্দাবনে মন্দিরে গান করেছ, সেখানকার প্রশংসা লোকের মুখে মুখে মান্দ্রাজ পর্যন্ত পৌছেছে। চল, ফিরে চল।

শুনে ভাল লাগল রঙ্গনাথনের। সে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—সেই জন্যই এসেছিলাম এখানে। কোম্পানীর জাহাজে জায়গার জন্য। বৃন্দাবনে স্বপ্ন দেখেছিলাম যোশেফ, লল্লা মান্দ্রাজে তোমাদের পল্লীর সমুদ্রতটে আমার জন্যে বসে আছে। সেই বিশ্বাসে ফিরছিলাম

বড় আশা নিয়ে। আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, তবে তাই চল।

যোশেফ তার হাত চেপে ধরে বললে—আমি বড় নৌকা নিয়ে এসেছি ব্যবসায়ীদের মাল নিয়ে। এখন আমি নিজে মালের বড় নৌকা করেছি। এখানকার মাল নিয়ে আবার কালই রওনা হব। চল তুমি।

সেই নৌকোয় ফিরেছিলেন রঙ্গনাথন। নৌকো পথে মধ্যে মধ্যে কূলে ভিড়িয়ে বিশ্রাম করে। প্রয়োজন হয় পানীয় জলের। খাবার-দাবারেরও দরকার হয়। নৌকো সেই কারণেই ভিড়েছিল পুরীতে।

নীলমাধবের রাজধানী পুরী। সমুদ্র থেকে তার মন্দিরচূড়া দেখা যায়। হঠাৎ রঙ্গনাথনের চিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠল।

মহাতীর্থ জগন্নাথধাম। আচণ্ডালের পরমতীর্থ! জগন্নাথ নীলমাধবের পরম প্রিয় এই শবরেরা। শবরেরাও তাঁর সেবক। সেবার অধিকারী। মহাপ্রসাদে জাতিভেদ নেই, স্পৃশ্যা-স্পৃশ্য নেই। সর্ব জাতির হাতের মহাপ্রসাদ অন্ন ফিরিয়ে দেবার হুকুম নেই এখানে। এখানে সব সমান, সব সমান। ভাবতে ভাবতে রঙ্গনাথনের চোখে জল এল। আপসোস হল, এতকাল সে এই মহাপ্রভু—মহান দেবতাটিকে গান শোনায় নি!

রঙ্গনাথন বীণা হাতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—যোশেফ, আমি এখানে নামব। জগন্নাথকে আমার আজও গান শোনানো হয় নি। আমি নামব।

যোশেফ হেসে বললে—নামবে আচার্য? কিন্তু মান্দ্রাজ?

—যাব। যাব। পরে যাব। এখন আমাকে নামিয়ে দাও।

একখানা ছোট নৌকো ডাকলে যোশেফ। বললে—মান্দ্রাজকে ভুলো না।

* * * *

সেই অবধি রঙ্গনাথন এইখানে রয়ে গেছেন। বড় ভাল লেগেছে। বড় ভাল লেগেছে।

প্রথম যেদিন বীণা হাতে মন্দিরচত্বরে ঢুকে পাণ্ডাদের অনুমতি নিয়ে মহাপ্রভুকে গান শোনাতে বসলেন সেইদিন সেই গানই গেয়েছিলেন। যে গান গেয়ে তিনি তিরস্কৃত হয়েছিলেন কাঞ্জীভরমে—সেই গান—"কৃষ্ণবর্ণ চর্মের অন্তরালে যিনি বাস করেন, তিনিই বাস করেন বৈকুণ্ঠে। তিনিই বাস করেন শ্বেত পীত গৌর শ্যাম সকল-বর্ণ-চর্মাবৃত মানুষের দেহের মধ্যে। জীবের মধ্যে। যিনি বসবাস করেন বৈকুণ্ঠে, তিনিই বাস করেন ব্রাহ্মণপল্লীতে এবং শবর পল্লীতেও তিনিই বাস করেন। ওই কৃষ্ণচর্মের অন্তরালে যিনি, তিনিই কোথাও বরদরাজ, কোথাও জগন্নাথ, কোথাও শ্রীরঙ্গনাথন, কোথাও রামেশ্বরম, কাশীতে তিনিই বিশ্বনাথ। কৈলাসের ভবানীপতি যিনি, তিনিই কিরাতরূপী হয়ে অর্জুনের প্রণতি এবং পূজার মাল্য কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন।"

জয়ধ্বনি উঠেছিল চারিদিকে—জয় জয় জগন্নাথ, জয় নীলমাধব! একদিনেই তিনি সকলের স্নেহ প্রশংসা দুই অর্জন করেছিলেন। চিত্ত তাঁর ভরে উঠেছিল। উঠে আসবার সময় প্রভুকে প্রণাম করে বলে এসেছিলেন, সান্ত্বনা তোমার কাছেই পাব। এখানেই রইলাম জীবনের বাকী দিনগুলি।

সেই অবধি এখানেই থেকে গেছেন। শবরপল্লীর পূর্বদিকে ঘন ঝাউবন, পশ্চিমে চক্রতীর্থের ধার থেকেও ঝাউবন, সম্মুখে বেলাভূমি সেখানে অশান্ত সমুদ্রকল্লোল, উত্তরে নীলমাধবের মন্দির। এরই মধ্যে বেছে বেছে শবরপল্লীর পূর্বদিকের ঝাউবনের মধ্যে তিনি একটি কুটির তৈরী

করালেন। মনোরম ছোট একটি কুটির। দক্ষিণমুখে একটি বারান্দা, পশ্চিমে একটি বারান্দা। সকালে উঠে পশ্চিমদিকের বারান্দায় বসে বীণায় ঝঙ্কার তুলে আলাপ করেন ভৈরবী। আবার সন্ধ্যায় চলে যান মন্দিরে, আরতি দর্শন শেষে প্রণাম করে চলে এসে দক্ষিণের বারান্দায় বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আপনমনেই সঙ্গীত আলাপ করেন। সম্মুখে সমুদ্রবক্ষে উদ্বেল তরঙ্গ-শীর্ষে বিচিত্র দীপমালা জ্বলে ওঠে মধ্যে মধ্যে। মনে মনে বলেন···এই ভাল, এই ভাল···

জপ কোটি গুণংধ্যানং ধ্যান কোটি গুণংলয়ঃ।
লয় কোটি গুণং গায়ং গানাৎ পরতরং নহি।

এর মধ্যেই জীবন তাঁর পূর্ণ হয়ে উঠুক।

মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ আসে। দেবদাসীদের নৃত্য দেখবার জন্য মন্দিরের পুরোহিত বলে পাঠান—আজ নাটমন্দিরে প্রভুর সম্মুখে এক দেবদাসী নৃত্য দেখাবার নিমন্ত্রণ করেছেন আচার্য। উপস্থিত থাকবেন আপনি।

বাকী সময়টা কাটে তাঁর ওই শবর বালক-বালিকাদের নিয়ে। কিন্তু তার মধ্যেও অকস্মাৎ লল্লা সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। মধ্যে মধ্যে এমনও হয় যে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে যান।

মনে হয় জগন্নাথদেবের মন্দিরের মধ্যে মণিবেদীর সম্মুখে দেবতাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে লল্লা। কখনও কখন দিনরাত্রি সব বিষণ্ণতায় ভয়ে যায়।

তখন চলে যান পুরী ছেড়ে। ভুবনেশ্বরের দিকে।

বিন্দু-সরোবর-প্রান্তে গিয়ে বসেন। সরোবরের মাঝে মন্দির। বৈশাখে চন্দনযাত্রায় ভগবান এসে ওই মন্দিরে বাস করেন। কখনও ঘোরেন মন্দিরে মন্দিরে। দেবাদিদেব মহাদেব এবং মহাদেবীর চত্বরে বসে গান শোনান।

কখনও মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ বনস্পতি-কাণ্ডে লীলায়িত দেহের ভার ন্যস্ত করে প্রতীক্ষমানা তরুণীকে দেখেন। তার মধ্যে লল্লার ছায়া দেখতে পান।

কখনও চলে যান খণ্ডগিরি উদয়গিরিতে। সেখানকার চারিদিকে গভীর বন জমে উঠেছে। বাঘের ভয় আছে। সাপের ভয় আছে। কিন্তু সে ভয় যেন তাঁর চলে গেছে। সেইখানেই কোন একটি গুহাতে বসে কাটিয়ে দেন দিন। অপরাহ্ণ হলে চলে আসেন। কিছুদিনের মধ্যে ভুবনেশ্বরেও ছোট একটি কুটির তৈরী করলেন।

পুরীধামে যাত্রীদের ভিড় হলে এখানে চলে আসেন। মানুষের ভিড় তাঁর সহ্য হয় না। শুধু ভাবতে ভাল লাগে।

আম্মা সরস্বতী বাঈ ঠিক বলেছিলেন—পুত্র, সব মিথ্যা। আমি জন্মেছিলাম উচ্চকুলে, রূপের জন্য কণ্ঠের জন্য ঘর-সংসার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মানুষ আমাকে নর্তকী করে আমার যত অপমান করুক—আমাকে নিরাসক্তি একটি দিয়েছে। নিরাসক্ত হয়ে পৃথিবীকে দেখবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। দেখে বুঝেছি, মানুষ পৃথিবীতে নিতে আসে না—দিতে আসে, পেতে আসে না, হারাতে আসে। পাওয়াটা মিথ্যা, হারানোটাই সত্যি। সব হারিয়ে ফকির হয়ে পথে দাঁড়াতে অনেক দুঃখ পুত্র। তাই যে জীবনের প্রথম থেকে ফকির সে কিছু হারায় না। লল্লাকে তুমি পেয়েছিলে, লল্লা সত্যই তোমার কাছে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিল—তাই তাকে হারিয়েছ—এবং এত দুঃখ তোমার। ভুলতে হলে আর কাউকে পেতে হবে। তাই বলি ভগবানকে পেতে চেষ্টা কর। যাকে পেলে হারাতে হয় না।

লল্লা হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাকে ভুলতে তিনি পারছেন না—পারবেন না। দেবতাকেও তিনি পেতে চাইতে গিয়েও যেন চাইতে পারছেন না। তাতে যে লল্লাকে হারানোর দুঃখ

হারিয়ে ফেলতে হবে।

লল্লা হারিয়েছে—কিন্তু তাকে হারানোর দুঃখ তিনি ভুলতে পারবেন না। কিছুতেই পারবেন না। তা হলে লল্লা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

*　*　*　*

সেদিনও বীণায় হাত রেখে ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন। ফাল্গুন মাস—পুরীতে ভগবানের দোলযাত্রার মহোৎসব। যাত্রীরা দলে দলে আসতে শুরু করেছে। ভিড় জমছে দিন-দিন। কোলাহল ছেড়ে পালিয়ে ভুবনেশ্বর-প্রান্তে নির্জনে তাঁর কুটিরটিতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন রঙ্গনাথন।

আজ বসে আছেন বিন্দু সরোবরের ধারে। কোথায় পুষ্পিত হয়েছে চম্পকবৃক্ষ। মদির গন্ধ আসছে। কাছে একটি নিমগাছকে আচ্ছন্ন করে একটি মাধবীলতা পীতমর্ম শুভ্রবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পস্তবকে যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। বেলা প্রায় এক প্রহর। কোলের উপর বীণাটি রয়েছে, তাতে সুর বেঁধে তিনি তারে ঝঙ্কার দিয়ে সুর তুলছেন। কি বাজাচ্ছেন—সে সম্পর্কে খুব সচেতন নন। আঙুল তাঁর বাজিয়ে চলেছে অবচেতন মনের খেয়ালে। তিনি নিজে ভাবছেন সব মিথ্যা, এইটেই সব থেকে বড় সত্য।

পুষ্পস্তবক আচ্ছন্ন করে বন্য মধুমক্ষিকারা গুঞ্জন করছে। সে গুঞ্জনে প্রমত্ততা রয়েছে। বীণাতে তাঁর আঙুল ওই গুঞ্জন ঝঙ্কারকে তুলে চলেছে।

একটি কলরব এসে কানে পৌঁছল।

তিনি চোখ তুললেন। কলরবের ভাষা তাঁকে আকৃষ্ট করল। তামিল ভাষায় কথা বলছে। দক্ষিণের যাত্রী এই সময় আসে বেশী। এই ইংরেজ মারাঠা নিজাম পিণ্ডারীদের তাণ্ডবের মধ্যে স্থলপথ বিপদসঙ্কুল। সমুদ্রপথ আষাঢ় মাসে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। তাই নৌকো করে তারা এই বসন্তোৎসব দোলযাত্রার সময় বেশী আসে। তামিল-ভাষী যাত্রী। স্বাভাবিকভাবেই তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন। একদল নারী-পুরুষ। সন্ন্যাসিনী একজন। অনাবৃত মস্তক, মাথার রুক্ষ কেশভার চূড়া করে বাঁধা। ও কে? গলায় তুলসীর মালা! ও কে?

মুহূর্তে পঙ্গু হয়ে গেলেন তিনি।

লল্লা! লল্লা সন্ন্যাসিনী! কণ্ঠে তার তাঁরই সেই তুলসীর মালা! গৈরিক-বাসা—শীর্ণা, তপস্বিনী। আয়ত দৃষ্টিতে বৈরাগ্য। সে লল্লায় এ লল্লায় অনেক প্রভেদ। তবুও সে লল্লা। লল্লাও তাঁকে দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। স্থির দৃষ্টিতে দেখছে। নিষ্পলক স্থির দৃষ্টি।

যাত্রীরা তাকে বলছে—কি হল? এস। কল্যাণী! কল্যাণী! লল্লা নিরুত্তর।

তিনি চীৎকার করে ডাকতে চাচ্ছেন, কিন্তু কণ্ঠ কি তাঁর রুদ্ধ হয়ে গেল?

হে বরদরাজ—হে রঙ্গনাথস্বামী—ভাষা দাও, ভাষা দাও।

লল্লা নড়েছে। স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে কম্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। সে কাছে এসে নতজানু হয়ে বসল। চারিদিকের জনতাকে গ্রাহ্য করলে না। তিনি এবার বললেন—কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেছে তাঁর—বললেন—লল্লা!

সে হাত জোড় করে স্মিত হেসে বললে—আমি কল্যাণী। কন্যাকুমারিকায় দেবী কুমারী-মাতার মন্দিরের বহির্দেশ পরিমার্জনা করি—আর মাতার দৃষ্টিতে তপস্যা করি। বরদরাজকে আমার কামনা। লল্লাকে আমি জানতাম। সে সেদিন সমুদ্রজলে ডুবে মরতে গিয়েছিল। তাকে তুলেছিলেন কন্যাকুমারীর সন্ন্যাসিনী মাতা। তাঁরা নৌকোয় ফিরছিলেন পার্থসারথি দর্শন করে।

৯

সেদিন ভোরে যখন রঙ্গনাথন চলে গেলেন তার দিকে না তাকিয়ে, তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে চোরের মত, তখন লল্লা প্রথম ভেবেছিল, বোধ হয় প্রহরীরা তাঁকে খুঁজতে এসেছে—এদিকে, তাদের সাড়া পেয়ে তিনি উঠে চলে গেলেন তাদের পথ রোধ করতে। তাকে বাঁচাতে। সে সভয়ে উঠে বসেছিল। নারিকেল বৃক্ষের সন্নিবেশ যেখানে নিবিড় সেখানে গিয়ে সে লুকিয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মনের ভয় স্থির হয়ে গিয়ে জেগেছিল সংশয় ও প্রশ্ন।

রঙ্গনাথন কাল তার সঙ্গে সমুদ্রতটে বাসর পেতে তাকে বুকে টেনে নেবার সময় বলেছিলেন—কিসের ভয়? তুমি আমার পত্নী। তুমি যাবে আপনার গৃহে।

তবে? তাহলে? বার বার—তার গলায় ঝুলছিল যে তুলসীর মালাখানি, যেখানি তিনিই পরিয়ে দিয়েছিলেন পত্নীরূপে বরণ করে, সেখানিকে সে হাত দিয়ে বার বার স্পর্শ করেছিল। এ তো তার স্বপ্ন নয়। মিথ্যা নয়। এ তো সব সত্য। তবে, তাহলে?

এর উত্তর নারীকে কাউকে দিতে হয় না। নারীর নিজের অন্তর দিয়ে দেয়।

ওঃ, তার সারা অঙ্গে রঙ্গনাথনের দেহের উষ্ণ স্পর্শ এখনও লেগে রয়েছে। তার অধরোষ্ঠে তাঁর চুম্বনের স্পর্শ অনুভব করেছে। কি আবেগ—কি গাঢ়তা সে চুম্বনে। সে ভেবেছিল তার নারীদেহ সার্থক, নারীজীবন সার্থক। সে ধন্য, সে ধন্য। সে ধন্য হয়ে গেল।

সে তাকে বলেছিল, আপনিই আমার বরদরাজ!

তিনি বলেছিলেন, তা হলে তুমিই আমার লক্ষ্মী!

সব মিথ্যা! সব মিথ্যা! সব মিথ্যা! সত্য এমন করে মিথ্যা হয়ে যায়? হে বরদরাজ! চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল লল্লার। কিন্তু ভয়ে সে পারে নি। ভয় হয়েছিল তার নারীত্বের ব্যর্থতার লজ্জা প্রকাশের, ভয় হয়েছিল নিজের লাঞ্ছনার, ভয় হয়েছিল রঙ্গনাথনের লাঞ্ছনা হবে, জাতিচ্যুতি ঘটবে তাঁর সমাজে। কিন্তু সে কি করবে?

সূর্য উঠছে তখন। পূর্ব দিগন্তে আকাশমণ্ডল এবং সমুদ্রগর্ভে একটি রক্তানুরঞ্জিত মণ্ডল ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। এইবার একসময় ওই অনুরঞ্জন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে হতে সমুদ্রগর্ভ থেকেই যেন সূর্য লাফ দিয়ে উঠবেন আকাশলোকে। তিনি দেখবেন ওর এই লজ্জিত কলঙ্কিত লাঞ্ছিত মুখ? ছি ছি ছি!

মর্মযন্ত্রণার ক্ষোভের আর সীমা ছিল না তার। সে ভেবেছিল মৃত্যু ভাল। সে মরবে, সে মরবে।

উন্মত্ত ক্ষোভে যন্ত্রণায় মানুষের এক-একটি মুহূর্ত আসে যখন তার মৃত্যুভয় থাকে না। পৃথিবীর ভয় বড় হয়ে ওঠে। মৃত্যু তখন পরমাশ্রয় বলে মনে হয়। সে মুহূর্তে তার কর্তব্য স্থির করে নিয়ে তার বক্ষবন্ধনীখানি খুলে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল খাড়া বালুচরের উপরে। তখন আবার জোয়ার এসেছে। বালুচরের নিচেই সমুদ্রজল গভীর হয়ে উঠেছে, উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে আঘাতের পর আঘাত হানছে।—সেখানে বসে সে নিজের পা দুটি বেঁধেছিল ওই বক্ষবন্ধনী দিয়ে। আর গলায় শক্ত করে পাক দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছিল তুলসীর মালাটিকে—যেন খুলে পড়ে না যায়। থাক তার ওই পরিচয়—সে পরপার পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাবে।

সমুদ্র-জলতলে আত্মগোপনই তার ভাল। কিন্তু সে সমুদ্রতটবাসী শবরকন্যা। সাঁতার সে জানে। শৈশব থেকেই সমুদ্রের বুকে ঝাঁপ দিয়ে সে খেলা করেছে। হয়তো ঝাঁপ দিয়ে পড়েও সে সাঁতার দেবে—পালিয়ে আসবে রত্নগর্ভ সমুদ্রতল থেকে বালুচরে। সমুদ্রগর্ভে বাতাস

নেই। তাই সে বেঁধেছিল তার পা দুটো। তারপর বসে বসেই কিনারায় এসে উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁপ খেয়েছিল।

ডুবেও ছিল। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে খোলা হাত দুটো দিয়ে সাঁতার কেটে উঠেছিল উপরে। কিন্তু বাঁধা পায়ের জন্ম আবার ডুবেছিল। আবার উঠেছিল। আবার ডুবেছিল। তারপর আর মনে নেই। জ্ঞান হারিয়েছিল সে।···

যখন চেতনা হয়েছিল, তখন সে একখানা বড় নৌকোর উপর। তার মাথার কাছে বসে এক গৈরিক বস্ত্রধারিণী সন্ন্যাসিনী।

সন্ন্যাসিনী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, সুস্থ বোধ করছ?

অবাক হয়ে তাঁর শান্ত প্রসন্ন মুখের দিকে সে তাকিয়েছিল এবং তাঁকে সে চিনতেও পেরেছিল। মাদ্রাজে পার্থসারথির মন্দিরে সে তাঁকে দেখেছে। দরিদ্রদের দান করেছিলেন। চাল দিয়েছিলেন। সাধারণ মুষ্টিভিক্ষা নয়। এক-একজনকে একদিনের আহারের উপযোগী চাল। তারপরও তাঁকে সে দেখেছে; দেখেছে তাঁকে রঙ্গনাথনের গানের আসরে। চোখ বন্ধ করে গান শুনছিলেন। শুনেছিল—কন্যাকুমারীর সন্ন্যাসিনী তিনি। গিয়েছিলেন নাকি জগন্নাথধাম, মহাপ্রভু দর্শন করতে। সেখান থেকেই ফিরছেন। পথে মাদ্রাজে নেমেছিলেন আহার্য জল সংগ্রহের জন্য, এবং তার সঙ্গে দেবতা দর্শনও করেছেন।

তিনি আবার প্রশ্ন করেছিলেন, তোমার পা এমন করে বাঁধা কেন? তুমি নিজে বেঁধেছিলে?

সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করেছিল, চোখের পাতার চাপে জল গড়িয়ে পড়েছিল গণ্ডদেশ বেয়ে। কথা বলতে পারে নি। ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল, হ্যাঁ।

—তা হলে মরবার জন্যই এমন করে ঝাঁপ খেয়েছিলে?

সে চুপ করে চোখ বুজে শুয়েছিল। শুধু অশ্রুই পড়েছিল গড়িয়ে গড়িয়ে।

—কেন? মরতে চাও কেন?

সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। কথা বলতে পারে নি।

—আচ্ছা থাক। বলতে হবে না। তিনি আর তাঁকে প্রশ্ন করেন নি। জানতে চেয়েছিলেন পরিচয়। সে বলেছিল, সে অনাথা। মা বাপ ভাই কেউ নেই।

—স্বামী?

আবার কাঁদতে শুরু করেছিল সে।

তিনি তখন তাকে আর প্রশ্ন করেন নি।

পরে সুস্থ হলে সে ধীরে ধীরে সবই বলেছিল মাতাজীকে। শুধু রঙ্গনাথনের নাম করে নি। বলেছিল—এক ব্রাহ্মণ তাকে সমুদ্রতটে সমুদ্রকে সাক্ষী করে বিবাহ করেছিল। সাক্ষী তার এই তুলসীর মালা। কিন্তু—

আর বলতে পারে নি লল্লা।

মাতাজী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তার পর?

সে একটু ঘুরিয়ে বলেছিল, তারপর যে তিনি কোথায় চলে গেলেন!—একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, আর সন্ধান জানি না। হয়তো তাঁর সমাজ—

মাতাজী তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, সমাজ নিষ্ঠুর। শাস্ত্রও নিষ্ঠুর। মানুষের হৃদয়কে সে পাথর চাপিয়ে পিষ্ট করে দেয়। কুটিল তাদের চক্রান্ত। ঋষি দুর্বাসা চক্রান্ত করে এমনি ভাবেই এক কুমারীর তপস্যা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন কল্যাণী।

লল্লা তাঁকে তার লল্লা নাম বলে নি—বলেছিল তার নাম কল্যাণী।

মাতাজী বলেছিলেন, তিনি আজও কুমারী অবস্থাতেই স্বামীর তপস্যা করছেন—অথচ তিনি কে জান ? তিনি আদ্যাশক্তি। স্বয়ং পার্বতী। কন্যাকুমারী তীর্থের নাম শুনেছ ?

ঘাড় নেড়ে লল্লা তাঁকে জানিয়েছিল, হ্যাঁ—জানে।

—সেই কন্যাকুমারীতে আমি থাকি। আমিও তাঁর পূজা করি। আমিও কুমারী। বাণ অসুরকে বধ করতে দেবী পার্বতী কুমারীকন্যার রূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। অসুরকে বধ করে তিনি কামনা করলেন পশুপতিনাথ-মহেশ্বরকে। তিনি বিবাহ করলেন, তপস্যা করতে লাগলেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবতারা এসে বিবাহের লগ্ন স্থির করে গেলেন। এই লগ্নে বিবাহ হবে। দেবী সেদিন বিবাহের সজ্জায় সেজে বরমাল্য হাতে নিয়ে সজ্জিত মণ্ডপে বসে রইলেন। ওদিকে দেবতারা মহেশ্বরকে নিয়ে মর্ত্যলোকে যাত্রা করে এলেন। কিন্তু মহর্ষি দুর্বাসা চাইলেন না এ বিবাহ। সেও এই প্রশ্ন। দেবী পার্বতী হিমাচলদুহিতা উত্তরাবর্তের গৌরী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। আর এ দক্ষিণের নীলগিরি-দুহিতা, শ্যামাঙ্গিনী। দুর্বাসা চক্রান্ত করে বিবাহলগ্ন ভ্রষ্ট করে দিলেন। বিবাহ আর হল না। শিব আজও কন্যাকুমারী মন্দিরের কিছুদূরে প্রতীক্ষা করে রয়েছেন। কিন্তু সে লগ্ন আজও ফিরে আসে নি। অনন্তকাল কুমারীকন্যা তার মাল্যখানি হাতে সেই তপস্যাই করে চলেছেন।

আমি তাঁরই সেবিকা। ছোট আশ্রম আছে। আমার যিনি কাম্য তিনি পৃথিবীতে নেই। পরপারে তাঁর সঙ্গে মিলব। তিনি মহেশ্বরে লীন হয়েছেন। চল, তুমি আমার সঙ্গে চল। সেখানে থাকবে। পার তো তপস্যা করবে। যাবে ?

আর যদি ফিরে আসতে চাও মাদ্রাজ তবে মাদ্রাজগামী নৌকোতে তোমাকে ফিরে পাঠিয়ে দেব।

লল্লার চিত্ত ভরে উঠেছিল। সে তপস্যাই বেছে নিয়েছিল।

আর সে লল্লা নয়—লল্লা মরে গেছে সমুদ্রের জলে ; যে বেঁচে আছে সে তপস্বিনী কল্যাণী।

* * * *

সে শবরী। দূর থেকে সে দর্শন করেছে কন্যাকুমারীর অপূর্ব লাবণ্যময়ী সর্বালঙ্কারভূষিতা বিবাহের কন্যাবেশিনী অপূর্ব মূর্তি। মুগ্ধ হয়ে গেছে। তার সব সন্তাপ যেন মুছে গেছে।

সে মাতাজীর আশ্রমে থাকে। আশ্রমের কাজ করে। গাভীর সেবা করে। বাগানের গাছের পরিচর্যা করে।

মাতাজী বলেন—তুমি আর শবরী নও কল্যাণী, তুমি ব্রাহ্মণী। তোমার ব্রাহ্মণ প্রিয়তমের মাল্য তোমার কণ্ঠে, আচারে-আচরণে পবিত্র। কেন, দূরে থাক কেন ?

লল্লা হাসে। সবিনয়ে বলে—মাতাজী, আপনার করুণাই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ওই আমার ব্রাহ্মণত্ব। ওতে আর আমার প্রলোভন নেই। মানুষকে আমি চাই না মাতাজী—আমি চাই ভগবানকে।

মাতাজী তাকে বলছিলেন—তুমি তীর্থদর্শন কর কল্যাণী। নিশ্চয় তুমি ভগবানের দয়া পাবে। তুমি পরিপূর্ণা হয়ে যাবে।

লল্লা প্রথমেই এসেছে দোলযাত্রায় পুরী। নীলমাধব দর্শনে। বরদরাজ ও নীলমাধবে ভেদ নেই।

দোলযাত্রায় নীলমাধবকে দর্শন করে তাঁর বসন্তোৎসবের আবীর কুমকুম প্রসাদ নিয়ে ধন্য হয়েছে। জীবনে মানুষ রঙ্গনাথনের শূন্যস্থান তিনি পূর্ণ করে বসেছেন। তারপর আজ এসেছে

সে ভুবনেশ্বরে দর্শনে।

এসে দূর থেকে বিন্দু সরোবর প্রান্তে ওই পুষ্পিত মাধবীলতার তলায় রঙ্গনাথনকে দেখে প্রথমটা অবশ পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। তারপর আত্মসম্বরণ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তপস্যাকে সে আজ পরিপূর্ণ করবে। রঙ্গনাথনের সম্মুখে হৃদয়ের দ্বারখানি বন্ধ করে দিয়ে বিদায় নিয়ে বলবে—তোমাকে নীলমাধবরূপে পেয়েছি হৃদয়ে। আর তো স্থান নেই।

সেই কথা বলতেই সে এসে নতজানু হয়ে বসে প্রণাম করে বললে—প্রভু, সন্ন্যাসিনী লল্লাকে অচেতন অবস্থায় সমুদ্র থেকে তুললেও সে বাঁচে নি। সে মরে গেছে। আমি লল্লা নই, আমি কল্যাণী। তবে লল্লা মরবার সময় এইটি আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে। লল্লার প্রিয়তম আপনি। আপনাকে দিতে বলে গেছে।

বলে গলার মালাগাছি খুলে তাঁর পায়ের তলায় রেখে প্রণাম করলে।

রঙ্গনাথন জড়িত কণ্ঠে আর একবার বললেন—লল্লা!

—আমি কল্যাণী। আমি আসি প্রভু।

লল্লা চলে যাচ্ছে। মালাগাছি পড়ে রয়েছে। তিনি স্থাণুর মত বসেই রইলেন।

চোখ বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। বোধ হয় আপনা থেকেই। চোখের ভিতর জল ছলছল করছে। রঙ্গনাথন আর্তকণ্ঠে ডাকলেন, কল্যাণী!

সে আহ্বানে না দাঁড়িয়ে পারল না সন্ন্যাসিনী।

রঙ্গনাথন প্রশ্ন করলেন—চোখ থেকে তখন অশ্রুধারা উদ্গত হচ্ছে—আর্তস্বরেই বললেন—পৃথিবীর কি সবই মিথ্যা? সন্ন্যাসিনী সহসা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে উত্তর খুঁজে নিয়েই বললেন—না প্রভু, সবই সত্য। বৃক্ষশাখার বৃন্তে পুষ্পকলিও সত্য—বিকশিতদল পুষ্পও সত্য। আবার বিগলিতদল ফুলও সত্য। এবার আসি। সব সত্য।

চোখ বন্ধ করেই বসে রইলেন রঙ্গনাথন। চোখ খুলতে সাহস হল না। শুধু আঙুলগুলি চলছে বীণার তারের উপর। পদশব্দ কি মিলিয়ে যাচ্ছে?

হঠাৎ মনে হল—এ কি, কি বাজাচ্ছেন তিনি?

ক্ষীণ একটি হাস্যরেখা ফুটে উঠল তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে।

এ তো বসন্ত রাগ!

মিথ্যা কথা। জীবনে বসন্ত রাগ একবার আসে। তারপর সে চিরদিনের মত মিথ্যা হয়ে যায়। শুধু রেশ—না, রেশও থাকে না, থাকে স্মৃতি। লল্লা মিথ্যা হয়ে গেছে—সত্য হয়ে উঠেছে কল্যাণী। না, সেও না। সত্য এক তপস্বিনী। তাকে দেখে স্মৃতিবিভ্রমে বসন্ত রাগ বেজে উঠেছে আঙুলে। বাজুক। চোখ বুজে বাজাতে লাগলেন। হঠাৎ কানে গেল—প্রভু!

চোখ মেললেন রঙ্গনাথন। দেখলেন লল্লা ফিরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের দিকে তাকালেন রঙ্গনাথন। বীণায় বসন্ত রাগ বেজে চলেছে। থামবার উপায় নেই। লল্লা বললে—মালাগাছি—ও গাছি আমি ফিরে চাচ্ছি প্রভু। লল্লা মরেছে—তার আত্মা ফিরে চাচ্ছে। ওতেই সে বাঁধা আছে প্রভু।

বলে মালাগাছি সে তুলে নিয়ে চলে গেল। বসন্ত রাগ অকস্মাৎ যেন বীণার তারে জীবন্ত অবস্থায় বাজতে লাগল।